মহাভারতের সমাজ

কলকাতা ৭০০ ০০৯

সেপ্টেম্বর ১৯[illegible]

প্রকাশক : অমল গুপ্ত অয়ন ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড (ত্রিতল)

কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর : রবীন্দ্রনাথ দাস মুদ্রাকর প্রেস

১০/১সি মারহাট্টা ডিচ লেন কলকাতা ৭০০ ০০৩

ব্লক ও মুদ্রণ : দি আর্টিজান

১০৭/এ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট কলিকাতা ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

যাঁহার অনুগ্রহে

সমগ্র মহাভারত পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম,

যাঁহার আদেশে

এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম,

সেই

পুণ্যশ্লোক রবীন্দ্রনাথের

পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া

পাঠক-পাঠিকাদের হাতে

এই গ্রন্থ

সমর্পণ করিলাম।

নিবেদন

পরমেশ্বরের কৃপায় 'মহাভারতের সমাজ' দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইল।

মহাভারত ভারতীয় সভ্যতার নিত্যকালের ইতিহাস এবং ধর্ম্মগ্রন্থ। স্বয়ং বেদব্যাসই ইহাকে পঞ্চম বেদ-নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিষয়ের গুরুত্বে এবং আকৃতির বিশালতায় এই গ্রন্থ জগতে অতুলনীয়। এই গ্রন্থের উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সমুদ্রের মত এই গ্রন্থ একমাত্র নিজেই ইহার উপমাস্থল। মানুষের জীবনে এমন কোন অবস্থাই থাকিতে পারে না, যাহাতে মহাভারতের দৃষ্টান্ত বা উপদেশের অবকাশ নাই। স্বয়ং গ্রন্থকার মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এই বিরাট গ্রন্থের প্রকৃষ্ট পরিচয়—

ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ॥ আদি ২।৩৯০

'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে'—এই প্রাচীন প্রবাদ ব্যাসবাক্যের প্রতিধ্বনিমাত্র। প্রধানতঃ ইতিহাস হইলেও মহাভারত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। অধ্যাত্মশাস্ত্ররূপেও ইহার তুলনা হয় না। উপনিষৎ ও দর্শনাদির চরম তত্ত্ব মহাভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আলোচিত হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, সনৎসুজাতীয়, মোক্ষধর্ম্ম প্রভৃতি অংশের তুলনা অপর কোন অধ্যাত্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থের সহিতও করা চলে না। সকল সম্প্রদায়ের নিকটেই মহাভারত পরম আদরের বস্তু। যদিও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া মহাভারত রচিত হইয়াছে, তথাপি যুদ্ধবর্ণনা ইহার গৌণ উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক ঘটনা এবং উপাখ্যানের উপদেশের মধ্য দিয়া সকল বিষয়ে পথ-নির্দ্দেশ এবং সত্যপ্রচারই মহাভারতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দেশে যে-বিদ্যা, যে-মননধারা, যে-ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন কি, দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, একসময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ ক'রে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সর্বকালের

ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে, তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 'মহাভারত' নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন, 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমগুলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্তভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্মে কর্মে রাজনীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক। তার পর থেকে ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্মগ্রন্থি বারম্বার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জর, কিন্তু ইতিহাস-বিস্মৃত সেই যুগের সেই কীর্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেকপ্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান। সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হোত, তা হোলে দুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত। সেইদিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি।......

ভারতে এই যে মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-যুগের উল্লেখ করলেম, সেই যুগের মধ্যে তপস্যা ছিল, তার কারণ ভাণ্ডারপূরণ তার লক্ষ্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল, সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্বোধন, চারিত্রসৃষ্টি"।[১]

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ্যমাত্র।...ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে।...রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।...স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড় সমালোচকই হই না কেন, একটি

১ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, 'শিক্ষা'।

সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাসপ্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয়, তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।...রামায়ণ ও মহাভারতকেও আমি বিশেষতঃ এইভাবে দেখি। ইহার সরল অনুষ্টুপ্‌ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে”।[১]

কবির এই সশ্রদ্ধ সমালোচনার পর মহাভারত সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার থাকে না। আমরা এই কালজয়ী গ্রন্থের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া শুধু রচয়িতা ঋষি-কবির চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেছি—

“নমঃ সর্ব্ববিদে তস্মৈ ব্যাসায় কবিবেধসে”।

প্রাচ্য পণ্ডিতগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, খৃষ্টের জন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল এবং পরীক্ষিতের দেহত্যাগের পরে জনমেজয়ের সর্পসত্রের পূর্ব্বে মহাভারত রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৪১ অব্দে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতের রচনা আরম্ভ করেন এবং তিন বৎসরে রচনার পরিসমাপ্তি হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাভারতকে আরও দুইহাজার বৎসর পরের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে প্রাচ্য পণ্ডিতগণের অভিমত দৃঢ় যুক্তিপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাভারতের অন্তর্গত জ্যোতিষের বচনগুলির সাহায্যেও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দৃঢ় হইয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা ভারতাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রকাশিত মহাভারতের ভূমিকায় এইসকল বিষয়ে অনেক তথ্য পাইতে পারেন।

উপাখ্যান-ভাগের সহিত মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা একলক্ষ। উপাখ্যান-ভাগ ছাড়া মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা চব্বিশ হাজার। মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বা সূচী অনুক্রমণিকাধ্যায়ে (আদি ১ম অঃ) দেড়শত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

এই বিশাল গ্রন্থ রচনা করিয়া ব্যাসদেব প্রথমতঃ আপনপুত্র শুকদেবকে পড়াইয়াছিলেন, তারপর পৈল, সুমন্তু, জৈমিনি ও বৈশম্পায়ন—এই চারিজন শিষ্যকেও পড়াইয়াছিলেন। আদিপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে এইসকল বিষয় বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

মহাভারতের প্রথম প্রচার তক্ষশিলায় (পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি জিলায়)

১ প্রাচীন সাহিত্য

জনমেজয়ের সর্পসত্রে। ব্যাসদেবও সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ জনমেজয় ও ব্রাহ্মণগণের বিশেষ আগ্রহে ব্যাসদেব তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট আপন শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত বলিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে মুনি বৈশম্পায়ন সেই যজ্ঞে ভারতকথা শোনাইয়াছিলেন। সেখানে অনেক মুনিঋষি ও গুণিজন উপস্থিত ছিলেন। মহাভারতের দ্বিতীয় আবৃত্তি নৈমিষারণ্যে, কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক সত্রে। সেখানে লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতি বক্তা এবং সমবেত যাজ্ঞিক ও যজ্ঞদর্শকগণ শ্রোতা। সুতরাং 'মহাভারতের সমাজ' বলিলে আজ হইতে পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতের সমাজকে বুঝিতে হইবে।

মহাভারতে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। রচনাকালের অনেক পূর্ব্বের ঘটনা ও উপাখ্যানাদি ইহাতে স্থান পাইয়াছে—রামায়ণের বৃত্তান্ত, নলোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যান ইত্যাদি। প্রত্যেক পর্ব্বেই পুরাতন অনেক ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বিশেষতঃ শান্তি ও অনুশাসনপর্ব্বে ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে অসংখ্য প্রাচীন ইতিহাসের কথা আছে। সেইসকল বর্ণনাকে প্রাক্-মহাভারতীয় স্তররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহাভারতে বর্ণিত পাত্রপাত্রীর চরিত্র এবং তাৎকালিক অপরাপর ইতিবৃত্তকে মহাভারতীয় স্তররূপে গ্রহণ করিতে পারি। মহাভারত-রচনার পরে অর্থাৎ কলিযুগে যে-সকল আচার-ব্যবহার চলিবে, তাহারও কিঞ্চিৎ বর্ণনা মার্কণ্ডেয়-সমাস্যা (বনপর্ব্ব) প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। সেইসকল প্রকরণকে পরমহাভারতীয় স্তররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, প্রাক্-মহাভারতীয় সমাজ পাঁচহাজার বৎসরেরও প্রাচীন এবং পরমহাভারতীয় সমাজ মহাভারত-রচনার দুই চারিশত বৎসর পরের। অর্থাৎ আজ হইতে সাড়ে চারিহাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রায় একহাজার বৎসরের ভারত-ইতিহাস মহাভারত বহন করিতেছে।

কোন কোন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মহাভারতের অনেক অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহারা শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতাকেও প্রক্ষিপ্ত বলিতে ছাড়েন নাই। কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত অংশ বুঝিবার কৌশলও আবিষ্কার করিয়াছেন। একেবারে কোন অংশই প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, ইহা যেরূপ বলা চলে না, সেইরূপ স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ যত্র তত্র প্রক্ষেপই করিতেছিলেন—ইহা বলাও যুক্তিযুক্ত নহে। মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

নানা কারণে মূল পাঠের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন বিচিত্র নহে। দেশভেদে লিপিভেদে, কীটদষ্ট স্থানে আনুমানিক সংযোজন, কথক এবং পাঠক মহাশয়গণের স্বরচিত শ্লোকের ক্রোড়পত্র ও তাঁহাদের লিখিত প্রাচীন কিম্বদন্তী তাঁহাদের লোকান্তরের পর অপর লেখকের দ্বারা মূলের মধ্যে সংযোজন—ইত্যাদি কারণ নিশ্চয়ই ছিল। অন্যথা পাঠভেদ, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার অসামঞ্জস্য ইত্যাদি ঘটিতে পারিত না। পরন্তু মহাভারতের ন্যায় বৃহদাকার গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত-নির্দ্ধারণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিরোধী বচনের সমাধানের চেষ্টা না করিয়া প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও একপ্রকার দুঃসাহস। রুচিবিরুদ্ধ অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করা সহজ হয়, কিন্তু শাস্ত্রবিচারের ভারতীয় পদ্ধতি অন্যরূপ। ভারতীয় পণ্ডিতগণ পদ-বাক্য-প্রমাণশাস্ত্রের (ব্যাকরণ, পূর্ব্বমীমাংসা ও ন্যায়) সাহায্যে শাস্ত্রগ্রন্থের আপাতবিরোধী অংশেরও সমাধানের চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টায় বিফলকাম হইলে অগত্যা বহুবিরোধী অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে বাধ্য হন। পুণার ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ ইন্‌স্‌টিটিউটের প্রকাশিত মহাভারতের পাঠান্তর প্রদর্শনের কাজে দীর্ঘকাল লিপ্ত থাকায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হস্তলিখিত অনেকগুলি মহাভারতের পুঁথির পাঠ দেখিবার অবকাশ আমার ঘটিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের গ্রন্থের ভিতর আকাশ-পাতাল বৈষম্য কোথাও চোখে পড়ে নাই। দীর্ঘকালের ব্যবধানে গ্রন্থে প্রচুর পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু এখন বেদব্যাস-রচিত যথার্থ অংশ বাছিয়া বাহির করা সম্ভবতঃ অসাধ্য। নিজের অক্ষমতার জন্য সেই দুঃসাহস করি নাই।

মানুষের সঙ্ঘকে সমাজ বলে। মহাভারতে মানুষকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। হংসগীতায় (শা ২৯৯তম অঃ) গীত হইয়াছে—

"গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি,
ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"।

—গুহ্য একটি মহৎ তত্ত্ব বলিতেছি, মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।

মহাভারতকার মানুষকে মানুষরূপেই দেখিয়াছেন, দেবত্বে উন্নীত করেন নাই। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ব্যাপারের বিচিত্র সমাবেশে মহাভারত সমৃদ্ধ। দেবতা ও মানুষের আত্মীয়তা, ঋষিদের তপস্যা ও সাময়িক স্খলন, বর ও শাপপ্রদান, স্ত্রী-পুরুষের অসংকোচ-মিলন, অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি বহুবিধ ঘটনার বর্ণনায় মহাভারত যেন মর্ত্ত্যলোকের গ্রন্থ হইয়াও

ত্রিলোকবাসীর পাঠ্যগ্রন্থ। ইহার পাত্রপাত্রীদের জীবন্ত চরিত্র যেমন বিচিত্র, সামাজিক আচার-ব্যবহারও তেমনই বিচিত্র। পরন্তু অনেকগুলি আচার এখনও ভারতীয় সমাজে সচল রহিয়াছে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। প্রাচীন সমাজের অনেক অধুনালুপ্ত আচরণ দেখিয়া আমরা কৌতূহল বোধ করি এবং তখনকার মানুষকে যেন জীবন্তরূপে দেখিতে পাই। মহাকালের নির্ব্বিকার সাক্ষীর মত নিরাসক্ত চিত্তে মহর্ষি তাঁহার এই অপূর্ব্ব রসসমৃদ্ধ সংহিতা রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রকাশ করিয়াও মধ্যে মধ্যে তাঁহার চরিত্রে মানুষী মায়ার খেলা লক্ষ্য করিয়াছেন। একমাত্র মহামতি বিদুরের চরিত্র ব্যতীত আর সকলের চরিত্রেই দুই চারিটি দুর্ব্বলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, গান্ধারী, যুধিষ্ঠির—কেহই বাদ পড়েন নাই। সরল ভাষায় আপনার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেও সত্যসন্ধ গ্রন্থকার মহর্ষির কণ্ঠ কম্পিত হয় নাই, অথচ সেই যুগেও সমাজে কানীন-পুত্রের স্থান খুব ভাল ছিল না। মহর্ষি কবির এই অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা মহাভারতের সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশকে শিরোধার্য্য করিয়া মহাভারতের সমাজচিত্র অঙ্কণের চেষ্টা করিয়াছি। সমাজেই মানুষের বড় পরিচয়। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বলিয়া প্রমাণরূপে উদ্ধৃত বচনগুলিও পাদটীকায় বাঙ্গালা অক্ষরেই লিখিয়াছি। অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাদের নিকট বঙ্গবাসী-প্রকাশিত মূল মহাভারত থাকিবার সম্ভাবনা, এইহেতু ১৮২৬ শকাব্দে বঙ্গবাসী-প্রেস হইতে প্রকাশিত পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত মহাভারত হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। মহাভারতে আঠারটি পর্ব্ব—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক, ও স্বর্গারোহণ। খিল-হরিবংশ গ্রন্থখানি মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে পণ্ডিত-সমাজে আদৃত হইয়া থাকে। মহাভারতেও হরিবংশের পরিশিষ্টতা স্বীকৃত হইয়াছে। হরিবংশে তিনটি পর্ব্ব—হরিবংশ, বিষ্ণু ও ভবিষ্য। সঙ্কলনে হরিবংশের প্রমাণও গৃহীত হইয়াছে। পাদটীকায় প্রমাণের উদ্ধৃতিতে পর্ব্বের নামের আদ্যক্ষর বা প্রথম দুই অক্ষর গৃহীত হইয়াছে। যেমন—বিরাট পর্ব্বের সাঙ্কেতিক সংক্ষেপ 'বি', আদি পর্ব্বের 'আদি' ইত্যাদি। যে বিষয়ে একার্থক অনেকগুলি উক্তি মহাভারতে পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে বক্তব্যের সমর্থকরূপে

দুই একটিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট উক্তিগুলির পর্ব্ব, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা একসঙ্গেই যোগ করিয়াছি। প্রথম উদ্ধৃত বচনের সহিত সেইগুলির ভাষা এক না হইলেও ভাবের মিল রহিয়াছে।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির 'শিক্ষা' প্রবন্ধটি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের দুই স্থানে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত মন্তব্য গ্রন্থের ১২১ তম ও ১৩৪ তম পৃষ্ঠার পাদটীকায় সন্নিবেশিত হইল।

বিষয়বস্তু-সঙ্কলনে স্বর্গত পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের 'শ্রীমহাভারতের বৃহৎস্থূচী' গ্রন্থ হইতে বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি। বিশ্বভারতীর কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপকমহাশয় হইতে নানা বিষয়ে উপদেশ পাইয়াছিলাম। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদের নাম স্মরণ করিতেছি—স্বর্গত অধ্যাপক দেশিকোত্তম হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, অধ্যাপক দেশিকোত্তম শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয় ও অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়। ইঁহাদের উপদেশ ও সহায়তা আমার উৎসাহবৃদ্ধি এবং পথপ্রদর্শন করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহদান ও নানাপ্রকার সহায়তার কথা চিরদিন স্মরণ করিব। তাঁহার উদ্যোগেই এই গ্রন্থ প্রথমতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রথম প্রকাশের পর যে-সকল সুধীজন বিভিন্ন পত্রিকায় গ্রন্থখানির সমালোচনা করিয়াছিলেন, যে-সকল হিতাকাঙ্ক্ষী মহানুভব ব্যক্তি ব্যক্তিগত পত্রদ্বারা গ্রন্থবিষয়ে নানাবিধ আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের উপকার কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। এই সংস্করণে তাঁহাদের উপদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে।

ইহাতে কোন কোন বিষয় নূতনভাবে সংযোজিত হইয়াছে এবং কোন কোন প্রবন্ধের স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পরন্তু প্রবন্ধসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই।

এই সংস্করণেও শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর মহাশয় গ্রন্থখানিকে নির্দ্দোষ করিবার নিমিত্ত যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা ভাষার দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। শুধু প্রুফ্ দেখাই নহে, সমালোচকের দৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর অদল-বদল করিতেও তিনি আমা-অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার এই স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তা না পাইলে গ্রন্থখানির অঙ্গহানি ঘটিত।

বিশ্বভারতীর স্পেশ্যাল অফিসার (পাব্লিকেশন্) শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উদ্যোগ ব্যতীত এই সংস্করণ এত শীঘ্র প্রকাশিত হইত না। তাঁহার সদাশয়তা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতেছি।

'নাভানা'-প্রেসের সদ্ব্যবহার ও তৎপরতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। গ্রন্থের বর্ণাশুদ্ধির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেও মুদ্রাকর মহাশয় বিস্মৃত হন নাই। বিশেষ নিপুণতার সহিত প্রেসকর্ত্তৃপক্ষ গ্রন্থখানি ছাপাইয়াছেন। তাঁহাদের কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকার নিকট গ্রন্থখানি পূর্ব্বের মতই আদৃত হইবে। ইতি

জন্মাষ্টমী, ১৩৬৬
বিশ্বভারতী, বিদ্যাভবন,
শান্তিনিকেতন।

শ্রীসুখময় শর্ম্মা

সূচী

প্রথম খণ্ড

মদ্রদেশে (পাঞ্জাব), ঋচীকের পত্নীগ্রহণ ১৭ ; কাশীরাজদুহিতা মাধবীর শুল্ক, শুল্কগ্রহণ বিক্রয়ের সমান, শুল্কের নিন্দা ১৮ ; কন্যার নিমিত্ত অলঙ্কারগ্রহণ দোষাবহ নহে, শুল্কদাতাই প্রকৃত বর, শুল্কদাতা বিবাহের পূর্ব্বে বিদেশ চলিয়া গেলে অন্য পুরুষ-সংসর্গে পুত্রোৎপাদন, প্রথম প্রস্তাবক বরপক্ষ ১৯ ; পারিবারিক প্রাচীন ব্যক্তির দায়িত্ব, পুরোহিত পাঠাইবার নিয়ম, ব্রাহ্মণদের ঘটকতা, বর-কর্ত্তৃক কন্যা-প্রার্থনা ২০ ; পূর্ব্বে প্রস্তাব না করিয়া কন্যাদান, বাগ্‌দান, অনিবার্য্য কারণে বাগ্‌দানের পরেও অন্য পাত্রে কন্যাসম্প্রদান, সর্ব্বত্র ঐ নিয়ম ছিল না, স্বয়ংবর কন্যার পিত্রালয়ে, রাক্ষসবিবাহ বরের বাড়ীতে ২১ ; কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে বিবাহ, বরযাত্রী, বরের মা এবং অন্যান্য মহিলাও যাইতেন, উৎসবে আত্মীয়স্বজনের নিমন্ত্রণ, লগ্ন স্থিরীকরণ, বিবাহে হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান ২২ ; পুরোহিতকর্ত্তৃক হোম, দম্পতির অগ্নিপ্রদক্ষিণ, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমনে বিবাহ পূর্ণ হয় ২৩ ; হরিদ্রাস্নান, বিবাহসভা-বর্ণন, স্বয়ংবর-বর্ণনা ২৪ ; কন্যাদাতার প্রদত্ত যৌতুক, খাওয়া-দাওয়া ২৫ ; ব্রাহ্মণকে দান, আত্মীয়স্বজনের উপহার-প্রদান, বরের বাড়ীতে কন্যাপক্ষীয়ের সৎকার ২৬ ।

বিবাহ (খ) ঃ বিবাহে বর্ণবিচার ২৬ ; প্রতিলোম বিবাহের নিন্দা ২৭ ; অনুলোম বিবাহ, দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রাগ্রহণ নিন্দিত, দ্বিজাতির শূদ্রাগ্রহণে মতভেদ ২৮ ; বিভিন্ন জাতির মিলনে উৎপন্ন সন্তানের পরিচয়, সঙ্করজাতীয় সন্তানগণের মাতৃজাতিতে পরিচয়ের নিয়ম, দেবতা, যক্ষ প্রভৃতির সহিত মানুষের বিবাহ ২৯ ; সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে বিবাহ, স্ত্রীপুরুষের মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য, আদর্শ-স্খলন, বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ৩০ ; পুত্র শব্দের অর্থ, পুত্রের প্রকারভেদ, স্বয়ংজাত, প্রণীত, পরিক্রীত পৌনর্ভব, কানীন, স্বৈরিণীজ ৩১ ; দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, সহোঢ়, জ্ঞাতিরেতা, হীনযোনিধৃত, পঞ্চবিধ পুত্র, বিশপ্রকার পুত্র ৩২ ; পুত্রিকাপুত্র মাতামহের বংশরক্ষক, ক্ষেত্রজ-পুত্রে ক্ষেত্রীরই অধিকার, বীজীর নহে ; কুমারীর সন্তানে পাণিগ্রহীতার অধিকার ৩৩ ; কৃতকপুত্রের সংস্কারাদির নিয়ম, কানীনপুত্রের নিয়ম, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কানীন হইলেও 'শান্তনুপুত্র'-নামে পরিচিত হন নাই, কর্ণ পাণ্ডুরই কানীন পুত্র, কানীন ও অধ্যূঢ় পুত্রের নিন্দা ৩৪ ; কুমারীর সন্তানপ্রসবে কলঙ্ক ৩৫ ; বহুপুত্র-প্রশংসা, একমাত্র পুত্র অপুত্রের মধ্যে গণ্য, তিন পুত্র জন্মিলে অপুত্রতাদোষ নাশ হয়, বহুপুত্রবত্তার নিন্দা ৩৬ ; রুচিভেদে মতভেদ, পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের গৌরব,

গ্রহণে বিধিনিষেধ, আপৎকালে ভোজ্যাভোজ্যের বিচার চলে না ২০৮ ; আর্থিক অবস্থার তারতম্যে খাদ্যের তারতম্য, ধনী ও দরিদ্রের ভোজন-শক্তির প্রভেদ ২০৯ ; পাক ২১০ ; পাকপাত্র, ভোজনপাত্র, ভোজনের অন্যান্য নিয়ম ২১১ ।

পরিচ্ছদ ও প্রসাধন : বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র, ব্রাহ্মণগণের সাদা কাপড় ও মৃগচর্ম্ম, শুক্ল বস্ত্রের শুচিতা, রাজাদের প্রাবার-ব্যবহার, কার্য্যবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রের ব্যবহার, যুদ্ধে রক্তবস্ত্র ২১৩ ; দেশভেদে বস্ত্রভেদ, রাক্ষসদের বস্ত্রপরিধান, উষ্ণীষ, পুরুষদের অঙ্গদাদি অলঙ্কার-ব্যবহার, রাজাদের মুকুটে মণি, গলায় নিষ্কনির্মিত হার ২১৪ ; সোণার শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি, পুরুষদের মাথায় লম্বা চুল, বেণী প্রভৃতি, শৃঙ্গের আকারে কেশবিন্যাস ২১৫ ; কাকপক্ষ, ব্যাস ও দ্রোণাচার্য্যের শ্মশ্রু, ব্রহ্মচারীর পোশাক, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণের পরিচ্ছদাদি, যজ্ঞে যজমানের পরিচ্ছদ ২১৬ ; মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহের বস্ত্র, স্বর্ণমাল্য প্রভৃতি অলঙ্কার, স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে কুণ্ডলের ব্যবহার, ভ্রূমধ্যে কৃত্রিম চিহ্ন ২১৭ ; ছাতা ও জুতা, চন্দন, চন্দন মাল্য প্রভৃতি, তুঙ্গ ও কৃষ্ণাগুরু ২১৮ ; ঈঙ্গুদ ও এরণ্ডতৈল, পিষ্ট রাইসরিষা, স্নানান্তে পুষ্পাদিধারণ, পুষ্পমাল্য, পুষ্পপ্রীতি ২১৯ ; কেশবিন্যাস ও অঞ্জনলেপন, বিধবাদের নিরাভরণতা ২২০ ।

সদাচার : সদাচার শব্দের অর্থ, আচারপালনের ফল ২২০ ; সদাচার-প্রকরণ, অন্তঃশুদ্ধি ২২১ ; আর্য্য ও অনার্য্য ২২২ ।

পারিবারিক ব্যবহার : পিতা ও মাতা, পিতা ও মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে মতভেদ, কল্যাণ গুরুজনের সেবার অধীন ২২৩ ; আচার্য্যপূজা, গুরুজনের প্রীতিউৎপাদন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ২২৪ ; গুরুজনের সেবাতে স্বর্গবাস, পিতৃমাতৃভক্ত ধর্ম্মব্যাধ, দেবব্রতের মৃত্যুঞ্জয়তা, গুরুজনের ভরণপোষণ না করিলে পাপ ২২৫ ; প্রত্যূষে মহাগুরুপ্রণতি, গুরুজনের আগমনে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন, সকল কার্য্যে অনুমতি-গ্রহণ, পিতামাতার দোষ ধরিতে নাই, তাঁহাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিলে পাপ হয়, মহাগুরুর তৃপ্তিতে বিশ্বের তৃপ্তি ২২৬ ; পিতৃত্রয়, দীন পুত্রের প্রতি পিতামাতার স্নেহ বেশী, ভ্রাতা ও ভগিনী, পাণ্ডবগণ ও বিদুরের আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম ২২৭ ; জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের আচরণ ২২৮ ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবমাননা করা অনুচিত, নলরাজার আদর্শ

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

বিপজ্জনক, যথেচ্ছ ভোগ নিন্দনীয়, প্রজার আনন্দ রাজার ধর্ম্মনিষ্ঠার অনুমাপক, ধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ৩৭৯ ; অপ্রমাদ, উদ্যোগ, শুচিতা প্রভৃতি গুণ ; ধর্ম্ম, অর্থ, মিত্র প্রভৃতির ভূরিতা কাম্য ; আর্য্যসেবিত কর্ম্মে রুচি, গুহ্য মন্ত্রণা ও সুবিবেচনা ৩৮০ ; আলস্যত্যাগ (উষ্ট্রবৃত্তান্ত), বিনয় (সরিৎসাগর-সংবাদ), সচিবের সহায়তাগ্রহণ, সন্ধিবিগ্রহাদি-পরিজ্ঞান, কর্ম্মচারি-নিয়োগে নিপুণতা (ঋষিসংবাদ) ৩৮১ ; অসংযমের দোষ (গান্ধারীর উপদেশ), আদর্শ গৃহীর সমস্ত সদ্‌গুণ রাজাতে থাকা চাই, সময়বিশেষে অবস্থার পরিবর্ত্তন ৩৮২ ; মন্ত্রগুপ্তি, স্বয়ং কার্য্যপরিদর্শনাদি, শীলের মাহাত্ম্য (ইন্দ্রপ্রহ্লাদসংবাদ), অভয়-প্রদত্ব ও প্রজাবাৎসল্য ৩৮৩ ; ধর্ম্মপথে অর্থব্যয়, যথাশাস্ত্র ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের ভোগ ; শত্রুমিত্রাদির কার্য্যপরিজ্ঞান, পরিণাম-চিন্তন, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর নিয়োগ, রাজকুমারদের শিক্ষার ব্যবস্থা, পণ্ডিতসংগ্রহ, সামুদ্রিক দৈবজ্ঞ পণ্ডিতের নিয়োগ, দক্ষ কর্ম্মচারীর বেতনাদিবৃদ্ধি, রাজহিতার্থ বিপন্ন ব্যক্তিদের পরিবার-প্রতিপালন ৩৮৫ ; কোষাদির তত্ত্বাবধানে বিশ্বস্তের নিয়োগ, আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যরক্ষা, মদ্য-দ্যূতাদিত্যাগ, শেষরাত্রিতে ধর্ম্মার্থচিন্তন, শিষ্ট ও দুষ্টের পরীক্ষা, শারীর ও মানস রোগের প্রতীকার, সুবিচার, পুরবাসী প্রজার চরিত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রধান পুরুষদের সহিত সদ্ভাব, অগ্নিহোত্র, দান ও সদ্ব্যবহার, শিল্পী ও বণিক্‌দের উন্নতিবিধান ৩৮৬ ; হস্তসূত্রাদি শিক্ষণীয় বিষয়, রাষ্ট্ররক্ষা ও বিপন্নকে দয়া, অতিনিদ্রাদি ষড়্‌দোষ-পরিত্যাগ, মধ্যপন্থা-অবলম্বন, বিরক্তের সন্তুষ্টিবিধান, আত্মামাত্যাদি সপ্তাত্মক রাজ্যের রক্ষণ, 'রাজা কালস্য কারণম্' ৩৮৭ ; প্রজাকৃত পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ, প্রজার হৃত ধনের সন্ধান না পাইলে রাজকোষ হইতে অর্পণ, ব্রহ্মস্বরক্ষণ, লোভসংযম, অমাত্যাদির দোষপরিজ্ঞান, রাজকোষের কল্যাণকামী পুরুষের লক্ষণ, আত্মরক্ষা ৩৮৮ ; মূঢ় লুব্ধ নৃপতির শ্রীভ্রংশ, সময়পরিজ্ঞানের সুফল, অপ্রিয় পথ্যবচন শ্রবণের ফল, সশঙ্কভাব ও সুবিবেচনা, সহায়সংগ্রাহক ব্যবহার ৩৮৯ ; বিদ্যাবৃদ্ধের পরামর্শ শ্রবণ, দিন-কৃত্য, ছলনা পরিত্যাগ ও সাধু আচার, বলবৃদ্ধি, আত্মমর্য্যাদা-রক্ষণ, দস্যু, নিষ্কর্ম্মা ও অতিকৃপণের ধন হরণ করা উচিত ৩৯০ ; ভবিষ্যচ্চিন্তন (শাকুলো-পাখ্যান), সময়বিশেষে শত্রুদ্বারাও মিত্রকার্য্য সাধিত হয় (মার্জ্জারমূষিক-সংবাদ), স্বার্থসাধন, কূটনীতি ৩৯১ ; জ্ঞাতিবিরোধের কুফল, কুমারী বা পরস্ত্রীতে আসক্ত হইতে নাই, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতিও কু-শাসনের ফল ৩৯২ ; অধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে দুর্গতি, নৃশংস পুরুষকে অবিশ্বাস, কৃতঘ্নের সহিত

সম্বন্ধা-বর্জ্জন, রাজার সামান্য ত্রুটিতেও প্রভূত ক্ষতি, রাজাও সমাজেরই একজন ৩৯৩ ; রাজার আদর্শ অতি উচ্চ, উত্তরাধিকারীর কারণাধীন অধিকারচ্যুতি, অর্দ্ধ সম্পত্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের অধিকার, বিদুরের অধিকারসূচক কোন কথা নাই ৩৯৪ ; পুত্রের অভাবে কন্যার অধিকার ৩৯৫ ।

রাজধর্ম্ম (খ) ঃ একাকী রাজ্যপরিচালনা অসম্ভব, বিচক্ষণতাঅর্জ্জন শিক্ষাসাপেক্ষ, রামায়ণ ও মনুসংহিতার অনুসরণ ৩৯৫ ; বীর ও শাস্ত্রবিদের সহায়তা প্রয়োজন, মন্ত্রীর গুণাদিপরীক্ষা, ব্রাহ্মণই প্রধানতঃ মন্ত্রিত্বে বরণীয়, সৎকুলোৎপন্ন সচিব নিয়োগের ফল, উৎকৃষ্ট মন্ত্রীর নিয়োগে রাজ্যের মঙ্গল ৩৯৬ ; অপণ্ডিত সুহৃৎকেও নিয়োগ করিতে নাই, বংশপরম্পরায় মন্ত্রণাপটু পুরুষের নিয়োগে সুফল, তেজস্বী বীরপুরুষ, শাস্ত্রজ্ঞ ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তির নিয়োগ, শিষ্ট ও স্থিরমতি পুরুষের নিয়োগ ৩৯৭ ; নৃপতি ও সচিবের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য, সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতের ক্ষমতা বেশী, অমাত্যহীন রাজা অতি বিপন্ন, দুষ্ট সচিবের নিয়োগে নৃপতির বিনাশ, গুণবানের নিয়োগে শ্রীবৃদ্ধি, রহস্যবেত্তা ও সন্ধি-বিগ্রহবিৎ সচিব উত্তম, ন্যূনকল্পে তিনজন মন্ত্রীর নিয়োগ ৩৯৮ ; আটজনের বিধান, বিভিন্ন জাতির ছত্রিশজন মিত্র এবং একজন বিচক্ষণ সূতের গ্রহণ, সাঁইত্রিশজন মিত্রের মধ্যে আটজন মন্ত্রী, সহার্থাদি চতুর্ব্বিধ মিত্র ৩৯৯ ; সত্যনিষ্ঠের পঞ্চমপ্রকার মিত্রত্ব, ভজমান ও সহজের প্রাধান্য, গুণবান্ বহুদর্শী বয়স্ক ব্যক্তিই উপযুক্ত অমাত্য, প্রজ্ঞাদি পঞ্চবিধ বল, মন্ত্রণাপদ্ধতি, মন্ত্রগুপ্তির শুভফল ৪০০ ; প্রত্যেক অমাত্যের অভিমত বিভিন্ন সময়ে গ্রহণীয়, রাত্রিতে মন্ত্রণা নিষিদ্ধ, অরণ্যে বা তৃণশূন্য ভূমিতে বসিয়া মন্ত্রণা কর্ত্তব্য, মন্ত্রণাগৃহের সুসংবৃতত্ব, বামন, কুব্জ প্রভৃতি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় ৪০১ ; গিরিপৃষ্ঠ বা নির্জ্জন প্রাসাদে, নৌকায় বসিয়া পরিষ্কার স্থানে, মন্ত্রী ভিন্ন অপরের উপস্থিতি নিষিদ্ধ ; পক্ষী, বানর, জড়, পঙ্গু প্রভৃতি বর্জ্জনীয়, অননুরক্ত মন্ত্রী বর্জ্জনীয় ৪০২ ; শত্রুপক্ষাবলম্বী বর্জ্জনীয়, নবীন মিত্রও বর্জ্জনীয় ; রাজদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুত্র বর্জ্জনীয়, অপরিণামদর্শীর মন্ত্রণা অগ্রাহ্য, স্বামী ও অমাত্যের মিলিত মন্ত্রণায় উন্নতি, মন্ত্রণার পরক্ষণেই কাজ আরম্ভ করিতে নাই ৪০৩ ; রাজপুরোহিত সকলের উপরে, মন্ত্রীদের প্রতি রাজার ব্যবহার, উপযুক্ত পুরুষকে শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিয়োগ, সম্মানের দ্বারা অমাত্যের চিত্তজয়, শুভানুধ্যায়ী অমাত্য পিতৃবৎ বিশ্বস্ত ৪০৪ ; অমাত্যের সম্মানে শ্রীবৃদ্ধি, সদৃশকর্ম্মে নিয়োগ, পাত্রমিত্রকে

রাজধর্ম্ম (গ)ঃ মানুষের শত্রু পদে পদে ৪৩৯ ; পরিবারস্থ শত্রু, কেহই শত্রুহীন নহেন, শত্রু ও মিত্রের পরিচয় সহজ নহে ৪৪০ ; ক্ষুদ্র শত্রুও উপেক্ষণীয় নহে, শত্রুতার প্রতীকার, গুপ্তচর দ্বারা শত্রুচেষ্টিত-পরিজ্ঞান ৪৪১ ; সামাদির প্রয়োগপদ্ধতি, শত্রুর সহিতও প্রথমে সাম-ব্যবহার, অগত্যা দণ্ডপ্রয়োগ, ষড়্‌বর্গ-চিন্তা ৪৪২ ; বাহিরে সরল ব্যবহার, সামাদির ক্রমিক প্রয়োগ, শত্রুর ক্ষতিসাধন, অপরাধের স্থান-পরিত্যাগ, কৃতবৈরে অবিশ্বাস ৪৪৩ ; বৈরভাব কখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না, বৈর উৎপত্তির পাঁচটি কারণ, প্রীতি বিনষ্ট হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না ৪৪৪ ; বংশানুক্রমে শত্রুতা, সন্ধি করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই, কুটিল রাজধর্ম্ম, স্বয় দুর্ব্বল হইলে কপট বিনয়প্রদর্শন ৪৪৫ ; শত্রুকে নিরপেক্ষ করিতে নাই, কুশল জিজ্ঞাসা, স্বচ্ছিদ্র-গোপন, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই, শত্রুর শত্রুর সহিত মিত্রতা বিধেয় ৪৪৬ ; কপট বেশভূষায় বিশ্বাস উৎপাদন, 'মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে,' সময়বিশেষে অন্ধাদির মত ব্যবহার, শত্রুবিনাশের কৌশল, গৃধ্রদৃষ্টি, বকধ্যান ইত্যাদি ৪৪৭ ; বীর, লুব্ধ প্রভৃতির প্রতি ব্যবহার, দূরে থাকিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই, বিষকন্যার পরীক্ষা, আশা দিয়া দীর্ঘকাল বঞ্চনা, সাম ও দান ৪৪৮ ; দানের দ্বারা প্রতিপক্ষের সন্তোষবিধান, সাম বা সন্ধি, বলবানের সহিত সন্ধি, হৃত সম্পত্তি কৌশলে উদ্ধারের চেষ্টা ৪৪৯ ; সন্ধির পর গোপনে শক্তিবর্দ্ধন, সন্ধিকাম প্রতিপক্ষের পুত্রকে স্বসমীপে রক্ষণ, সন্ধিকাম হইতে উৎকৃষ্ট ভূমি প্রভৃতি গ্রহণ, ভেদ-প্রয়োগ, শত্রুর ক্ষতিসাধন ৪৫০ ; বিফলতায় দণ্ডপ্রয়োগ, শত্রুর মূলোৎপাটন, স্থিরপ্রতিজ্ঞ পুরুষে ভেদনীতি বিফল (কর্ণ), বুদ্ধিহীন পুরুষে সফল (শল্য), বিপক্ষের গৃহবিবাদ প্রার্থনীয় ৪৫১ ; ভেদনীতির প্রয়োগ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসাপেক্ষ, ভেদনীতি সম্বন্ধে উপাখ্যান, স্বপক্ষের ভেদে বিনাশ নিশ্চিত ৪৫২ ; বিগ্রহ, সময়ের প্রতীক্ষা, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ কর্ত্তব্য, দূরস্থ শত্রুর উদ্দেশ্যে অভিচারাদি ক্রিয়া ৪৫৩ ; স্বয়ং বলবত্তর না হইলে বিগ্রহ নিষিদ্ধ, বালক শত্রুকেও উপেক্ষা করিতে নাই, স্থান ও কালের অনুকূলতা আবশ্যক, দুর্ব্বলের বিগ্রহের ফল (পবনশাল্মলিসংবাদ), ভেদাদি প্রয়োগে শত্রুকে দুর্ব্বল করিয়া পরে বিগ্রহ, উৎসাহশক্তি প্রভৃতি পরীক্ষণীয় ৪৫৪ ; পূর্ব্বোপকারী শত্রু অবধ্য, বিজিত শত্রুকে ক্ষমা করা মহত্ত, গুপ্তচর, চর হইতে খবর জানিয়া কাজ করা ৪৫৫ ; চর হইতে লোকচরিত্রপরিজ্ঞান, পুত্রাদির উদ্দেশ্যপরিজ্ঞান, গুপ্তভাবে চর প্রেরণের বিধি, গুপ্তচরের যোগ্যতা, ভিক্ষুকাদি-বেশে চরের সাজ ৪৫৬ ; উদ্যানাদিতে প্রেরণ, বিপক্ষপ্রেরিত গুপ্তচরকে ধরিবার

সাধারণ নীতি ঃ নীতিশাস্ত্রে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক ৪৭৮ ; নীতিশাস্ত্রে মহাভারত উপজীব্য, ভার্গবনীতির প্রাচীনতা, বৃদ্ধবচনের গুরুত্ব ৪৭৯ নৈতিক উপদেশবহুল অধ্যায় ৪৮০ ।

যুদ্ধ ঃ 'মহাভারত' মহাযুদ্ধের ইতিহাস, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, সাম্রাজ্যলিপ্সায় যুদ্ধ ৪৮১ ; ধর্ম্ম্য যুদ্ধ, পাণ্ডবদের ন্যায়ানুবর্ত্তিতা, যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর, অনন্যোপায় হইলে যুদ্ধ কর্ত্তব্য, যুদ্ধবিদ্যায় ভরদ্বাজের জ্ঞান, যুদ্ধ অপেক্ষা সামাদির শ্রেষ্ঠতা ৪৮২ ; যুদ্ধ-প্রারম্ভে উভয় পক্ষের সরলতা, ধর্ম্ম্য যুদ্ধের নিয়ম ৪৮৩ ; সর্ব্বাবস্থায় অবধ্য, বিপন্নকে ক্ষমা করাই মহত্ত্ব ৪৮৫ ; বিপন্নকে উপযুক্ত শস্ত্রাদি-দান, সমান যানে থাকিয়া যুদ্ধ, বিপরীত দৃষ্টান্ত (গজ ও রথ), সঙ্কুল-যুদ্ধে নিয়ম-উল্লঙ্ঘন ৪৮৬ ; রাত্রিতে যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দুর্নীতি, আদর্শ-স্খলন, প্রাত্যহিক যুদ্ধের শেষে পরস্পর মিত্রতা হয় নাই ৪৮৭ ; তিনবৎসর-ব্যাপক যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রায় শুভ মুহূর্ত্ত, জয়িনী সেনার লক্ষণ ৪৮৮ ; যুদ্ধের উৎকৃষ্ট কাল, মহাভারতের যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধশিবিরে শিল্পীর স্থান, বৈদ্য ৪৮৯ ; সূত-মাগধাদির স্থান, সংগৃহীত দ্রব্য, যাত্রাকালে ব্রাহ্মণের পূজা প্রভৃতি, স্বস্ত্যয়ন, অর্জ্জুন-পঠিত দুর্গাস্তব ৪৯০ ; অস্ত্রাধিবাস, ত্রৈয়ম্বক-বলি, রথাভিমন্ত্রণ, শঙ্খনিনাদ ও রণবাদ্য, শূরগণের শঙ্খপ্রীতি ৪৯১ ; যুদ্ধের পরিচ্ছদ, মাল্যচন্দন, গোধাঙ্গুলিত্রাণ, তনুত্রাণ বা কবচ ৪৯২ ; লৌহবর্ম্মের বর্ণনা, কবচধারণে মন্ত্রপাঠ, অস্ত্রাদিপূর্ণ গরুর গাড়ী, ধনুর্ব্বেদ চতুষ্পাদ ও দশাঙ্গ, চতুরঙ্গ বাহিনী ৪৯৩ ; সেনাপতি, সেনাপতিপতি, দলে দলে সেনাপতি, রথের সারথি ৪৯৪ ; সারথির গুরুপরম্পরা, সারথিকৃত যমকাদি-মণ্ডল, যাত্রা ও দুর্গবিধান, স্থানবিশেষে সেনাযোগ ৪৯৫ ; আক্রমণপদ্ধতি, গুরুর সহিত যুদ্ধ, আততায়ীর বধে পাপ হয় না, অর্জ্জুনের আশঙ্কা ৪৯৬ ; সমাধান, অশ্বত্থামার মুক্তি, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞ, জয় অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা প্রধান, যুদ্ধকালে উপাসনাদি, শান্তিকাম ব্রাহ্মণ মধ্যস্থ হইলে যুদ্ধবিরতি ৪৯৭ ; অস্ত্রশস্ত্র, অঙ্কুশ, অশ্মগুড়ক, অসির উৎপত্তি-বিবরণ ৪৯৮ ; একুশ-প্রকার অসিসঞ্চালন, অসির কোষ, ঋষ্টি, কচগ্রহ-বিক্ষেপ, কণপ, কর্ণি ও কম্পন (?), কুলিশ, ক্ষুর ৪৯৯ ; ক্ষুরপ্র, গদা, গদাযুদ্ধের মণ্ডলাদি ৫০০ ; নাভির অধোদেশে প্রহার করিতে নাই, চক্র, চক্রাশ্ম, তুলাগুড়, তোমর, ধনু, নখর, নারাচ, নালীক, পট্টিশ, পরশ্বধ ৫০১ ; পরিঘ, পাশ, প্রাস, বিপাঠ, ভল্ল, ভিন্দিপাল, ভুশুণ্ডী, মুদ্গর, মুষ (স) ল, যমদংষ্ট্রা, যষ্টি, রথচক্র, শক্তি, শতঘ্নী

৫০২; শর, বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণের শর ৫০৩; নামাঙ্কিত শর, তূণীরে শর-স্থাপন, লৌহশরাদির তৈলধৌতি, শূল, হল, অস্ত্রাদিতে কারুকার্য্য, সমীপে ও দূরে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ ৫০৪; অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ, দিব্যাস্ত্র ও প্রয়োগবিধি ৫০৫; ত্বাষ্ট্রাস্ত্রের শক্তি, মায়াযুদ্ধ ৫০৬; দেশ এবং জাতিবিশেষে যুদ্ধবৈশিষ্ট্য, নিবাতকবচগণের জলযুদ্ধ, ব্যূহরচনা ও ব্যূহভেদ, প্রাচীন অভিজ্ঞ বৃহস্পতি, ভীষ্ম ও দ্রোণের কুশলতা, অর্দ্ধচন্দ্র ৫০৭; ক্রৌঞ্চ (ক্রৌঞ্চারুণ), গরুড় (সুপর্ণ), চক্র, বজ্র, মকর, মণ্ডলার্দ্ধ, শকট বা চক্রশকট, শৃঙ্গাটক ৫০৮; শ্যেন, সর্ব্বতোভদ্র, সাগর, সূচীমুখ, নিযুদ্ধ, নিযুদ্ধের কৌশল ৫০৯; বাহুকণ্টক নিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধের পরিভাষা ৫১০; মল্লযুদ্ধ অপ্রশস্ত, উৎসবাদিতে মল্লযুদ্ধ, উৎসবের নিযুদ্ধে প্রাণহানি, বিজয়ী শূরের নগরপ্রবেশ ৫১১; বিজয়ে প্রাপ্ত ধনরত্নাদির ভোগ, যুদ্ধে বিপন্ন পরিবারের বৃত্তির ব্যবস্থা ৫১২।

চতুর্থ খণ্ড

আয়ুর্ব্বেদ ঃ রাজসভায় আয়ুর্ব্বেদবেত্তার সম্মান, কৃষ্ণাত্রেয়ের চিকিৎসাজ্ঞান, ত্রিধাতুর সমতাই স্বাস্থ্য, 'ত্রিধাতু' ঈশ্বরেরও নাম, শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, চিকিৎসার উদ্দেশ্য ৫১৫; সাধারণতঃ রোগের কারণ, স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল ব্যবস্থা, মিতাহার ও প্রসাধনাদি ৫১৬; পথ্যাশন, ভোজনের নিয়মাবলী, বালবৎসার দুগ্ধ অপেয়, অর্কপত্রের অভক্ষ্যতা ৫১৭; শ্লেষ্মাতক ভক্ষণের দোষ, নস্যকর্ম্ম, বর্জ্জনীয় কর্ম্ম, জরোৎপত্তির বিবরণ ৫১৮; প্রাণিভেদে জ্বরের প্রকাশ, ইন্দ্রিয়ের অসংযমে যক্ষ্মারোগ, রোগে শুশ্রূষা, শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি ৫১৯; মূর্চ্ছারোগে চন্দনোদক, বিষের দ্বারা বিষনাশ, রসায়ন, বিশল্যকরণী প্রভৃতি, শল্য-চিকিৎসা, অরিষ্টলক্ষণ ৫২০; মন্ত্রাদিপ্রয়োগে রোগবিনাশ, বিষনাশক মন্ত্র, সর্পাদির বিষহারক ঔষধ, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ৫২১; ভবিতব্যের অবশ্যম্ভাবিতা, জন্মতত্ত্ব ৫২২; শুক্রের উৎপত্তি ৫২৩; মনোবহা-নাড়ীর কাজ শুক্রাকর্ষণ, সন্তানদেহে মাতাপিতার দেহের উপাদান, স্ত্রীলোকের জননীত্ব এবং পুরুষের প্রজাপতিত্ব ৫২৪; সন্তানজননে জননীর আনন্দাধিক্য, দ্রোণাচার্য্যাদির অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তান্ত, সূতিকাগারের চিত্র, পার্থিব দেহে অগ্ন্যাদির অবস্থিতি ৫২৫; বায়ুপঞ্চকের কাজ, জাঠরাগ্নির নিয়ন্ত্রণে যোগসাধন ৫২৬।

পশু ও বৃক্ষাদির চিকিৎসা ঃ দীর্ঘতমার গোধর্ম্ম-শিক্ষা ৫২৬ ; অশ্ব-চিকিৎসায় নকুলের পটুতা, নল ও শালিহোত্রের পটুতা, গো-চিকিৎসায় সহদেবের প্রবীণতা, সর্ব্বত্র প্রাণের স্পন্দন, বৃক্ষলতাদির শ্রবণ-স্পর্শনাদিশক্তি ৫২৭ ; বৃক্ষাদির জীবন ও পুষ্টি প্রভৃতি, বিষপ্রয়োগে বৃক্ষাদির মূর্চ্ছা ৫২৮ ; বৃক্ষাদিও পুত্রবৎ পরিপালনীয়, করঞ্জকবৃক্ষে দীপদান, সকল প্রাণীরই ভাষা আছে ৫২৯।

গান্ধর্ব্ব ঃ গন্ধর্ব্বগণের আচার্য্যত্ব ৫২৯ ; দেবর্ষি নারদের অভিজ্ঞতা, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, কচ, মহিলাগণের গান্ধর্ব্ব-শিক্ষা, অপ্সরাগণ ৫৩০ ; উৎসবাদিতে সঙ্গীতের স্থান, নৃপতিদের নিদ্রাকালে ও নিদ্রাভঙ্গে বৈতালিক, যাগযজ্ঞে সঙ্গীত, রাজসভায় বিশেষ সমাদর ৫৩১ ; বাদ্যযন্ত্র, শতাঙ্গ তূর্য্য, মাঙ্গলিক কার্য্যে ও যুদ্ধভূমিতে শঙ্খধ্বনি, ছালিক্য-গান, ষড়্‌জাদি সপ্তস্বর, গান্ধর্ব্বে অত্যাসক্তি নিন্দনীয় ৫৩২।

ব্যাকরণ ও নিরুক্তাদি ঃ ব্যাকরণ অবশ্য-পঠনীয়, বৈয়াকরণ-শব্দের অর্থ, শিক্ষাদি ষড়ঙ্গপাঠে শ্রেয়োলাভ ৫৩৩ ; আর্ষপ্রয়োগ, ষড়ঙ্গের কথা, যাস্কের নিরুক্ত, নির্ঘণ্টু, মূলকারণ শ্রীভগবান্ ৫৩৪ ; গালব-মুনির ক্রম (কল্প) ও শিক্ষাপ্রণয়ন ৫৩৫।

জ্যোতিষ ঃ গণিত, ফলিত ও শাকুনবিদ্যা, সূর্য্য গতিশীল, সূর্য্যকিরণের পাপনাশকতা, চন্দ্র রসাত্মক, সকল প্রাণীর উপর চন্দ্রের প্রভাব ৫৩৫ ; মহা-প্রলয়ে সপ্তগ্রহকর্তৃক চন্দ্রের বেষ্টন, গ্রহগণ নক্ষত্রমণ্ডলের উর্দ্ধে, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের নক্ষত্রতাপ্রাপ্তি, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, শ্বেতগ্রহ (ধূমকেতু ?), তিথি-নক্ষত্রের কথন অন্যায় ৫৩৬ ; নক্ষত্রের সাহায্যে দিক্‌নির্ণয়, ব্রাহ্ম দিন ও রাত্রি, চতুর্যুগ, অধিমাস-গণনা, মানুষের উপর গ্রহের আধিপত্য, জাতপত্রিকা (যুধিষ্ঠিরাদির) ৫৩৭ ; বিবাহাদিতে শুভ দিন, যাত্রায় দিনক্ষণের বিচার, মঘানক্ষত্রে যাত্রার কুফল, ভাগ্যগণনা ও সামুদ্রিকাদির নিন্দা, উৎপাত বা দুর্নিমিত্ত ৫৩৮ ; শুভ-নিমিত্ত, শাকুন-বিদ্যা অশুভসূচক বর্ণনার বাহুল্য, দুর্নিমিত্ত, দিনে শৃগালের চীৎকার প্রভৃতি, পশুপক্ষীদের দারুণ আচরণ ৫৩৯ ; গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিবেষের ঘোরত্ব, রূক্ষ বায়ু প্রভৃতি, অশ্বাদির উদ্দীপনারাহিত্য

মহাভারতের সমাজ

প্রথম খণ্ড

বিবাহ (ক)

ভারতীয় সমাজবন্ধনে বিবাহের স্থান সর্ব্বপ্রথম। এই কারণে 'বিবাহ' হইতেই আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা হইল।

অতি প্রাচীন কালে স্ত্রী-পুরুষের স্বৈরাচার—বিবাহপ্রথা যে সমাজে অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে তাহা নহে। নরনারীর যথেচ্ছ মিলনই সুপ্রাচীন প্রথা। নারী বহু পুরুষে এবং পুরুষ বহু নারীতে আকৃষ্ট হইলেও সামাজিক হিসাবে কোন দোষ হইত না। এইপ্রকার স্বৈরাচারকেই সেই যুগে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইত। শ্রুতিতেও দেখা যায়, বামদেব্যব্রতে সমাগমার্থিনী নারীর মনোবাসনা পূর্ণ করা ধর্ম্মকৃত্যের মধ্যে গণ্য।

স্বৈরাচারই প্রাকৃতিক—পশুপক্ষীরা চিরদিন এইপ্রকার ব্যবহারেই অভ্যস্ত। তাহাদের মধ্যে প্রাচীন প্রথার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মহাভারতের সময়েও উত্তরকুরুতে এই আচার—উত্তরকুরুতে এই স্বৈরাচার প্রথা বহুদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। পাণ্ডুর উক্তি হইতে জানা যায়, তাহার রাজত্বকালেও উত্তরকুরুতে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয় নাই। এইপ্রকার আচরণকে স্ত্রীলোকের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[১]

শ্বেতকেতুকর্ত্তৃক বিবাহমর্য্যাদা স্থাপন—কালক্রমে সমাজে বিবাহ-ব্যবস্থা স্থাপিত হইল। উদ্দালকনামক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু প্রথম বিবাহ-প্রথার নিয়ম করিলেন। বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা শ্বেতকেতু পিতামাতার নিকটে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মাতার হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন, 'চল, আমরা যাই'। শ্বেতকেতু অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্মণের অশিষ্টতায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে উদ্দালক বলিলেন, 'বৎস, ক্রুদ্ধ হইও না, স্ত্রীলোকগণও গাভীর মত অনাবৃতা এবং স্বৈরচারিণী'।

১ অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে। ইত্যাদি। আদি ১২২।৪-৮

দ্রষ্টব্য নীলকণ্ঠ।

অনাবৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা নরাশ্চ বরবর্ণিনি।
স্বভাব এষ লোকানাং বিকারোঽন্য ইতি স্মৃতঃ। বন ৩০৬।১৫

উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষদ্যাপি পূজ্যতে।
স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ আদি ১২২।৭

ঋষিপুত্র পিতার বাক্যে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি এই নিয়ম করিতেছি, অদ্যাবধি মনুষ্যসমাজে স্ত্রী-পুরুষ কেহই যৌনব্যাপারে স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না। আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হইবেন। আর যে নারী পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত পতির আদেশ পাইয়াও অপর পুরুষের সহিত মিলিত না হইয়া আদেশ লঙ্ঘন করিবে, তাহাকেও ঐ পাপ স্পর্শ করিবে"।[২]

দীর্ঘতমাকর্ত্তৃক নারীদের একপতিত্ব-বিধান—দীর্ঘতমা নামে জনৈক ঋষি জন্মান্ধ ছিলেন। তিনি প্রদ্বেষীনাম্নী কোনও সুন্দরী ব্রাহ্মণকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি কামধেনুর পুত্র হইতে গোধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া তাহার (প্রকাশ্য মৈথুন) আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অশিষ্ট আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া আশ্রমস্থ মুনিগণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করেন। প্রদ্বেষীও তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন না। অন্ধ দুর্বিনীত পতি তাঁহার উপরই নির্ভর করিয়া চলিতেন। তিনি পতিকে জবাব দিলেন, "আমি আর তোমার ভরণপোষণ করিতে পারিব না"। পত্নীর কঠোর বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘতমা বলিলেন, "আমি অদ্যাবধি এই নিয়ম করিয়া দিলাম, কোন নারী কখনও একাধিক পতি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। স্বামীর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর যে নারী অপর পুরুষকে গ্রহণ করিবেন, তিনি লোকসমাজে নিন্দিতা হইবেন। পতিহীনা নারীগণ কোনও সমৃদ্ধি ভোগ করিতে পারিবেন না।"[৩]

দীর্ঘতমার অনুশাসনের ব্যতিক্রম—দীর্ঘতমাকৃত নিয়ম মহাভারতের সমসাময়িক সমাজব্যবস্থায় খুব আদৃত হয় নাই। পরে এই বিষয় আলোচিত হইবে।

ঋতুকাল ভিন্ন স্বচ্ছন্দ বিহার—ঋতুকাল ভিন্ন অন্য কালে নারীগণ ইচ্ছামত বিহার করিতে পারিতেন, কেবল ঋতুকালে পতিকে অতিক্রম করিতেন না, এই নিয়ম এক সময়ে সমাজে ছিল।[৩(ক)]

বিবাহের সংস্কারত্ব ও পবিত্রতা—বিবাহ স্ত্রী ও পুরুষের সংস্কারবিশেষ।

---

২ মর্য্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা। ইত্যাদি। আদি ১২২।১০-২০

৩ জাত্যন্ধো বেদবিৎ প্রাজ্ঞঃ পত্নীং লেভে স বিদ্যয়া। ইত্যাদি। আদি ১০৪।২৩-৩৭

৩ (ক) ঋতাবৃতৌ রাজপুত্রি স্ত্রিয়া ভর্ত্তা পতিব্রতে। ইত্যাদি। আদি ১২২।২৫, ২৬

ইহা অতি পবিত্র বন্ধন। মহাভারতের 'আশ্রমধর্ম্ম' এবং 'পতিব্রতাধর্ম্মে'র আলোচনায় এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। গার্হস্থ্যধর্ম্মের সমস্ত সুখ-শান্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ঐ পবিত্র বন্ধনের উপরই নির্ভর করে।

বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন—বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য পিতৃঋণ পরিশোধ করা। সন্তান উৎপাদনের দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ হয়। পিতৃগণের অবিচ্ছিন্ন সন্ততিধারাকে রক্ষা করিলেই তাঁহারা প্রীত হন। ('চতুরাশ্রম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

গৃহস্থের অবশ্য বিবাহকর্ত্তব্যতা—ব্রহ্মচর্য্যের পর যিনি গৃহস্থ সাজিতে চান, পত্নী গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য। জরৎকারুর সহিত তাঁহার পিতৃগণের যে কথোপকথন হয়, তাহাতে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, গৃহীর পক্ষে দারগ্রহণ অবশ্যকর্তব্য। অন্যথা পিতৃগণ নিরয়গামী হন।[৪]

পুত্রলাভের শ্লাঘ্যতা—জগতে পার্থিব লাভসমূহের মধ্যে পুত্রলাভই সর্ব্বাপেক্ষা শ্লাঘনীয়। ধর্ম্মপত্নীতে পুত্রোৎপাদনে বংশের অবিচ্ছিন্ন সন্ততিধারা রক্ষিত হয়।[৫]

একমাত্র পুত্রের বিবাহের অপরিহার্য্যতা—যে ব্যক্তি তাহার পিতার একমাত্র পুত্র, তাহার পক্ষে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ। পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত তাহাকে পত্নীগ্রহণ করিতেই হইবে। জরৎকারু-তৎপিতৃসংবাদে পুনঃপুনঃ এই কথাটি বলা হইয়াছে।[৬]

দ্বাপরযুগ হইতে স্ত্রীপুংমিলনে প্রজাসৃষ্টি— কথিত হইয়াছে যে, সত্যযুগে মানুষের মৃত্যু স্বেচ্ছাধীন ছিল, যমের ভয় মোটেই ছিল না। তৎকালে সঙ্কল্প হইতেই প্রজার উৎপত্তি হইত। ত্রেতাযুগেও মৈথুনধর্ম্মের প্রচলন হয় নাই, কামিনীস্পর্শেই প্রজাসৃষ্টি হইত। দ্বাপরযুগে স্ত্রীপুরুষের

---

৪ আদি ১৩ শ অ।
রতিপুত্রফলা নারী। সভা ৫।১১২, উ ৩৮।৬৭
উৎপাদ্য পুত্রাননৃণাংশ্চ কৃত্বা। উ ৩৭।৩৯

৫ বিবাহাংশ্চৈব কুর্ব্বীত পুত্রানুৎপাদয়েত চ।
পুত্রলাভো হি কৌরব্য সর্ব্বলাভাদ্ বিশিষ্যতে॥ অনু ৬৮।৩৪
কুলবংশপ্রতিষ্ঠাং হি পিতরঃ পুত্রমব্রুবন্। আদি ৭৪।৯৮
বৃথা জন্ম হ্যপুত্রস্য। বন ১৯৯।৪

৬ আদি ১৩ শ অ। আদি ৪৫ শ ও ৪৬ শ অ।

সংযোগ প্রথম আরম্ভ হয়। (এইসকল উক্তি বিচারসহ কি না, সুধীগণের বিবেচ্য।) সুতরাং পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত দারগ্রহণের প্রচলনও তখন হইতে সমাজে স্থান পাইয়াছে।[৭]

সম্ভবতঃ অতি প্রাচীনকালে সমাজে ব্যাপকভাবে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয় নাই, এই কারণেই যুগভেদে ব্যবহারবৈষম্যের উল্লেখ।

সাধারণের পক্ষে বিবাহ না করা খুব শুভ আদর্শ নহে— শতকরা নিরানব্বই জন স্ত্রীপুরুষ তৎকালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। যে-সব স্ত্রীলোক বা পুরুষ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদেব কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদেব প্রতি সাধারণসমাজের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেবব্রত ভীষ্ম ও তপস্বিনী সুলভার নাম গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পরদারে আসক্তি অতিশয় নিন্দিত— পরন্তু যাহারা বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া যথেচ্ছ চলাফেরা করিতেন, তাহারা সমাজে অতিশয় ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। পরস্ত্রীতে আসক্তি ঐহিক ও পারত্রিক যাবতীয় অকল্যাণের হেতু। সুতরাং যাহারা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, তাহাদিগকে বিবাহ কবিতেই হইত। বিবাহের বন্ধন অতিশয় পবিত্র। ভার্য্যাকে বলা হইত সহধর্ম্মিণী।

ভার্য্যাই ত্রিবর্গের মূল— ভার্য্যাই মানবেব ত্রিবর্গ লাভের প্রধান সাধন— ইত্যাদি অসংখ্য বাক্য বিবাহেব অনুকূলে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম চারিণী ভার্য্যার সহিত মিলিতভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম (ত্রিবর্গ) একসঙ্গে মিলিত হয়। গার্হস্থ্যধর্ম্মে ত্রিবর্গেব মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। একমাত্র পতিব্রতা ভার্য্যাব সহায়তায় পুরুষ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-রূপ ত্রিবর্গ ভোগ কবিতে পারেন।[৮]

৭ যাবদ যাবদভূচ্ছ্রদ্ধা দেহং ধাবয়িতুং নৃণাম্।
তাবত্তাবদজীবংস্তে নাসীদ্ যমকৃতং ভয়ম্॥ ইত্যাদি। শা ২০৭।৩৭-৪০

৮ পবদারেষু যে সক্তা অকৃত্বা দাবসংগ্রহম্।
নিরাশাঃ পিতবস্তেষাং শ্রাদ্ধকালে ভবন্তি হি॥ ইত্যাদি। অনু ১২৯।১০২
অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা। ইত্যাদি। আদি ৭৪।৪১-৪৮
যদা ধর্ম্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ॥ বন ৩১২।১০২।

ধর্ম্মপত্নীর স্থান বহু উচ্চে— সমাজের শুচিতা এবং অন্যান্য নানা-প্রকার উন্নতির প্রধান হেতু যে বিবাহপ্রথা, তাহা তৎকালে মনীষিগণ বিশেষভাবেই চিন্তা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপত্নীকে তাঁহারা যে গৌরব দিয়াছেন, তাহা প্রাচীন সমাজসভ্যতার এক উজ্জ্বল চিত্র সন্দেহ নাই। বিবাহসংস্কারের দ্বারা গৃহস্থজীবনকে মধুময় করিবার আদর্শ বহুস্থানে নানাভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

নারীর উজ্জ্বল ছবি— নারীর কন্যাত্ব, সহধর্ম্মিণীত্ব ও মাতৃত্বের মধ্যে অসাধারণ স্নেহ প্রেম ও ভক্তির যে সব চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়, সেইগুলি সত্যই তাৎকালিক সমাজের এক উজ্জ্বল পবিত্র চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে।

গার্হস্থ্যের দায়িত্ব— পতিপত্নীর প্রণয়ের মধ্যেও নিখিল বিশ্বের কল্যাণের দায়িত্ব নিহিত ছিল। গার্হস্থ্যাশ্রমের দায়িত্ব যে কত বেশী, তাহা প্রবন্ধান্তরে (চতুরাশ্রম) আলোচিত হইবে। শুধু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে বিবাহের কর্ত্তব্যতা স্থিরীকৃত হয় নাই। পরিপূর্ণ মানবজীবন যাপনই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। (এই বিষয়ে 'নারী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) ভার্য্যার ও গার্হস্থ্যের প্রশংসামুখর অধ্যায়গুলি পাঠ করিলে তদানীন্তন সমাজের চিন্তার আদর্শ বেশ বুঝিতে পারা যায়।

পতি ও পত্নীবাচক কয়েকটি শব্দের অর্থ— পতিবাচক ও পত্নী-বাচক কয়েকটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করেন বলিয়া ভর্ত্তা ও পতিশব্দে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হয়।[৯] পত্নীকে পুত্র প্রদান করেন বলিয়া স্বামীকে বলা হয় 'বরদ'।[১০] পত্নী পুরুষের অবশ্য ভরণীয়া, এই নিমিত্ত তাহাকে 'ভার্য্যা' বলা হয়।[১১] পতি (শুক্ররূপে) স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্র-রূপে জন্মপরিগ্রহ করেন, এই নিমিত্ত পত্নীকে 'জায়া' বলা হয়।[১২]

৯ ভার্য্যায়া ভরণাদ্ ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ। আদি ১০৪।৩০।শা ২৬৫।৩৭।অশ্ব৯০।৫২

১০ পুত্র প্রদানাদ্বরদঃ। অশ্ব ৯০।৫৩। ১১ ভর্ত্তব্যত্বেন ভার্য্যাঞ্চ। শা ২৬৫।৫২

১২ ভার্য্যাং পতিঃ সংপ্রবিশ্য স যস্মাজ্জায়তে পুনঃ।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং পৌরাণাঃ কবয়ো বিদুঃ॥ আদি ৭৪।৩৭
আত্মা হি জায়তে তস্যাং তস্মাজ্জায়া ভবত্যুত। বন ১২।৭০। বি ২১।৪১

পত্নী সকল সময়েই আদরের পাত্রী, এইজন্য তাহাকে 'দারা' বলা হয়।[১৩] পতির ব্যসনে দুঃখিত হন বলিয়া পত্নীকে 'বাসিতা' বলা হয়।[১৪]

মাতৃবাচক কয়েকটি শব্দের নিরুক্তি— জঠরে ধারণ করেন বলিয়া মাতাকে 'ধাত্রী', জন্মের হেতু বলিয়া 'জননী', সন্তানের অঙ্গের পুষ্টি সম্পাদন করেন বলিয়া 'অম্বা', বীর পুত্র প্রসব করেন বলিয়া 'বীরসূ', শিশুর শুশ্রূষা করেন বলিয়া 'শুশ্রূ' নামে অভিহিত করা হয়।[১৫]

বিবাহের বয়স নিরূপণ— বর ও কন্যার বয়স সম্বন্ধে মহাভারতকার অতি সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলিয়াছেন। ত্রিশ বৎসরের বর দশবৎসর-বয়স্কা এবং একুশ বৎসরের বর সপ্তবর্ষা নগ্নিকার পাণিগ্রহণ করিবেন। আচার্য্য গৌতম সমাবর্ত্তনকালে প্রৌঢ় অন্তেবাসী উতঙ্ককে বলিয়াছিলেন, "যদি তুমি আজ ষোড়শবর্ষীয় যুবক হইতে, তাহা হইলে আমার কন্যাটিকে তোমার হাতে সমর্পণ করিতাম।" এই উক্তিতে দেখা যায়, পুরুষের ষোড়শ বর্ষও বিবাহের কাল।[১৬]

নগ্নিকাবিবাহ একটিও নাই— অজাতরজস্কা অনাগতযৌবনা কুমারীর বিবাহ দেওয়াই শাস্ত্রীয় অভিপ্রায়। কিন্তু সমাজে সেই আদর্শ অতি অল্পই অনুসৃত হইয়াছে। বিবাহের সব চিত্রই যুবকযুবতীর বিবাহ। বালিকা-বিবাহ একটিও দেখিতে পাই না।

মহাভারতের মহিলাগণ যৌবনে বিবাহিত— মহাভারতে যে-সব প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই, দময়ন্তী, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি কেহই বিবাহের সময় অনাগতযৌবনা বালিকা ছিলেন না। একমাত্র সীতা বালিকা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতা যে ভীষণ পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে হয়ত দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকাও অসম্ভব ছিল না। সুতরাং শিশু-বালিকার বিবাহের দৃশ্য মহাভারতে উদ্ধৃত প্রাচীন ইতিহাসেও নাই বলিতে পারি।

১৩ দারা ইত্যুচ্যতে লোকে। ইত্যাদি। অনু ৪৭।৩০ (দ্রষ্টব্য নীলকণ্ঠ)

১৪ ব্যসনিত্বাচ্চ বাসিতাম্। শা ২৬৫।৫২

১৫ কুক্ষিসন্ধারণাদ্ধাত্রী জননাজ্জননী স্মৃতা। ইত্যাদি। শা ২৬৫।৩১,৩২

১৬ ত্রিংশদ্বর্ষো দশবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।
একবিংশতিবর্ষো বা সপ্তবর্ষামবাপ্নুয়াৎ ॥ অনু ৪৪।১৪
যুবা ষোড়শবর্ষো হি যদ্যদ্য ভবিতা ভবান্। ইত্যাদি। অশ্ব ৫৬।২২

মহাভারতের পাত্রীদের মধ্যে সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকা, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, উলূপী প্রমুখ মহিলাগণ প্রত্যেকেই পূর্ণযৌবনে পরিণীতা হইয়াছিলেন। তৎকালে যে-সকল যুবতী স্বয়ংবরা হইতেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই, পিতামাতাপ্রমুখ অভিভাবকগণও প্রায়ই বাল্যজীবন অতিক্রম হওয়ার পর কন্যার বিবাহ দিতেন। কুন্তী তো বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহেই সন্তান (কর্ণ) প্রসব করিয়াছিলেন। ঋষি কুণিগর্গের কন্যা বিবাহবিষয়ে পিতার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, এরূপ উদাহরণও মহাভারতে পাওয়া যায়।[১৭] নিতান্ত বালিকার পক্ষে এতখানি সাহস করা সম্ভবপর নয়।

বয়স্কা কন্যা ঘরে থাকিলে পিতামাতার দুশ্চিন্তা— যদিও যুবতী-বিবাহের প্রচলনই বেশী ছিল, তথাপি ঘরে অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যা থাকিলে সেই যুগেও প্রতিবেশীরা কন্যার পিতাকে মধ্যে মধ্যে সচেতন করিয়া দিতেন। সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতিকে নারদঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কন্যা ত যুবতী হইল, বিবাহ দাও না কেন?" অশ্বপতিও সাবিত্রীকে বর স্থির করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "যে পিতা যথাকালে কন্যার বিবাহ না দেন, তিনি সমাজে নিন্দনীয়।"[১৮]

প্রতিবেশীদের অকারণ জিজ্ঞাসা— কন্যার বয়স কিছু বেশী হইলে পিতা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িতেন, বিশেষতঃ প্রতিবেশীদের অযাচিত দৃষ্টি আকর্ষণে।[১৯]

পিতৃগৃহে ঋতুমতী কন্যার তিন বৎসর পরে বরনিরূপণে স্বতন্ত্রতা— পিতৃগৃহে ঋতুমতী হইলে কন্যা তিন বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, পিতা উপযুক্ত বর সংগ্রহ করেন কি না। তিন বৎসরের পর পিতার মতামতের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই পতি স্থির করিবে। মহাভারতের এই বিধান।[২০]

---

১৭ শল্য ৫২।৬-৮

১৮ কিমর্থং যুবতীং ভর্ত্রে ন চৈনাং সংপ্রযচ্ছসি। বন ২৯৩।৪
অপ্রদাতা পিতা বাচ্যঃ। বন ২৯২।৩৫

১৯ বৈদর্ভীন্তু তথাযুক্তাং যুবতীং প্রেক্ষ্য বৈ পিতা।
মনসা চিন্তয়ামাস কস্মৈ দদ্যামিমাং সুতাম্॥ বন ৯৬।৩০

২০ ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কন্যা ঋতুমতী সতী।
চতুর্থে ত্বথ সম্প্রাপ্তে স্বয়ং ভর্ত্তারমর্জ্জয়েৎ॥ অনু ৪৪।১৬

আটপ্রকার বিবাহ— আটপ্রকারের বিবাহের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। স্বায়ম্ভুব মনু এই আটপ্রকার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।[২১]

ব্রাহ্ম— বরের বিদ্যা বুদ্ধি বংশ প্রভৃতির সবিশেষ খবর জানিয়া সদ্বংশজ সচ্চরিত্র বরকে আহ্বানপূর্ব্বক কন্যাকর্ত্তা যদি কন্যা সম্প্রদান করেন, তবে সেই বিবাহের নাম 'ব্রাহ্ম'।[২২]

দৈব— যজ্ঞে বৃত ঋত্বিক্‌কে যদি কন্যা দান করা হয়, তবে সেই বিবাহের নাম 'দৈব'।[২৩] (রাজা লোমপাদ দৈববিধানে ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার বিবাহ দিয়াছিলেন।)

আর্ষ— কন্যার শুল্কস্বরূপ বরের নিকট হইতে দুইটি গো-গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা-দান করাকে 'আর্ষ' বিবাহ বলে।[২৪]

প্রাজাপত্য— বরকে ধনরত্ন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া পরে যদি তাহাকে কন্যা-দান করা হয়, তবে সেই বিবাহকে 'প্রাজাপত্য'নামে অভিহিত করা যায়।[২৫]

আসুর— কন্যাদাতাকে প্রভূত ধন দিয়া অথবা কন্যার পরিবারবর্গকে নানা প্রকারে প্রলোভিত করিয়া যদি কন্যা গ্রহণ করা হয়, তবে সেই বিবাহের নাম 'আসুর'।[২৬]

গান্ধর্ব্ব— বর ও কন্যার পরস্পরের মধ্যে প্রণয়পূর্ব্বক যে বিবাহ সম্পাদিত হয়, তাহার নাম 'গান্ধর্ব্ব'। অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, কামী পুরুষ যদি সকামা কুমারীর সহিত নির্জ্জনে মিলিত হন, তবে সেই মিলনই 'গান্ধর্ব্ব' বিবাহ।[২৭]

২১ অষ্টাবেব সমাসেন বিবাহা ধর্ম্মতঃ স্মৃতাঃ। ইত্যাদি। আদি ৭৩।৮,৯।১০২।১২-১৬

২২ শীলবৃত্তে সমাজ্ঞায় বিদ্যাং যোনিং চ কর্ম্ম চ। ইত্যাদি। অনু ৪৪।৩,৪

২৩ ঋত্বিজে বিততে কর্ম্মণি দদ্যাদলঙ্কৃত্য স দৈবঃ। অনু ৪৪।৪ (নীলকণ্ঠ)

২৪ আর্ষে গোমিথুনং শুল্কম্। অনু ৪৫।২০

গোমিথুনং দত্ত্বোপযচ্ছেত স আর্ষঃ। অনু ৪৪।৪ (নীলকণ্ঠ)

২৫ যো দদ্যাদনুকূলতঃ। অনু ৪৪।৪ (নীলকণ্ঠ)

২৬ ধনেন বহুধা ক্রীত্বা সম্প্রলোভ্য চ বান্ধবান্। ইত্যাদি। অনু ৪৪।৭

২৭ অভিপ্রেতা চ যা যস্য তস্মৈ দেয়া যুধিষ্ঠির।

গান্ধর্ব্বমিতি তং ধর্ম্মং প্রাহুর্ব্বেদবিদো জনাঃ॥ অনু ৪৪।৬

সা ত্বং মম সকামস্য সকামা বরবর্ণিনি

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন ভার্য্যা ভবিতুমর্হসি॥ আদি ৭৩।১৪,২৭

রাক্ষস— কন্যাকর্ত্তা কন্যাপ্রদানে অসম্মত হইলেও উদ্ধত পরিণেতা যদি কন্যাপক্ষীয়গণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই বিবাহকে বলা হয় 'রাক্ষস' বিবাহ'।[২৮]

পৈশাচ— সুপ্ত অথবা প্রমত্ত কন্যাতে বলাৎকারপূর্ব্বক রমণ করার নাম 'পৈশাচ' বিবাহ।[২৯]

বিবাহের ধর্ম্মাধর্ম্মত্ব— বর্ণিত বিবাহগুলির মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব ও প্রাজাপত্য এই তিনটি ধর্ম্মসঙ্গত। আর্ষ ও আসুর বিবাহে কন্যাকর্ত্তা ধন গ্রহণ করেন বলিয়া ঐ উভয় বিবাহ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মসম্মত নহে। বিশেষতঃ আসুর বিবাহ অত্যন্ত নিন্দনীয়। গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস বিবাহ তেমন প্রশস্ত না হইলেও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্মজনক নহে। পৈশাচ বিবাহ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।[৩০]

জাতিবিশেষে বিবাহের প্রকারভেদ— অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণদের পক্ষে প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ঐ চারিটি এবং গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ প্রশস্ত। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে 'আসুর' বিবাহও নিন্দনীয় নহে। পৈশাচ বিবাহকে শাস্ত্র সমর্থন করেন না। রাক্ষস বিবাহও অন্য কোন প্রশস্ত বিধানের সহিত মিশ্রিত হইলেই নিন্দিত হয় না।[৩১]

মিশ্রিত বিবাহবিধি— উল্লিখিত আটটি বিধানের যে-কোনও একটি অবিমিশ্ররূপে সব সময় সমাজে চলিত না। কখনও কখনও দেখিতে পাই, একই বিবাহে দুইটি বিধানই যেন মিশ্রিত হইয়াছে। দময়ন্তীর স্বয়ংবরে ব্রাহ্ম- এবং গান্ধর্ব্ব মিশ্রিত, রুক্মিণীর বিবাহ রাক্ষস ও গান্ধর্ব্বমিশ্রিত, সুভদ্রার বিবাহে রাক্ষস ও প্রাজাপত্য বিধান মিলিত হইয়াছে।[৩২]

গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস লোকচক্ষে খুব ভাল মনে হইত না— গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বেশ প্রচলিত থাকিলেও লোকচক্ষুতে তাহা যেন

২৮ হত্বা ছিত্বা চ শীর্ষাণি রুদতাং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য হরণং তাত রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ অনু ৪৪।৮

২৯ অনু ৪৪।৮ (নীলকণ্ঠ)। আদি ৭৩।৯ (নীলকণ্ঠ)

৩০ পঞ্চানান্তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্ম্যৌ যুধিষ্ঠির।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কথঞ্চন॥ অনু ৪৪।৯। আদি ৭৩।১১

৩১ প্রশস্তাংশ্চতুরঃ পূর্ব্বান্ ব্রাহ্মণস্যোপধারয়। ইত্যাদি। আদি ৭৩।১০-১৩
প্রসহ্য হরণঞ্চাপি ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্যতে। আদি ২০৯।২২, ১০২।১৬

৩২ অনু ৪৪।১০ (নীলকণ্ঠ)

একটু নিন্দনীয় ছিল! একমাত্র পাত্র ও পাত্রীর পরস্পর মিলন হইলেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হইত। কাহারও অভিভাবকের সম্মতির অপেক্ষা থাকিত না। আর রাক্ষস বিবাহ একমাত্র বরের ইচ্ছা ও দৈহিক বল-সাপেক্ষ। মার্জ্জিত ভাষায় তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলিলেও ঐ প্রথা ছিল একপ্রকার গুণ্ডামির মধ্যে গণ্য। এই কারণেই বোধ হয়, সমাজের অনেকে ঐগুলিকে খুব পছন্দ করিতেন না। স্বয়ংবরপ্রথাও অনেকাংশে গান্ধর্ব্ব বিবাহেরই মত। তাই স্বয়ংবরও সকলের নিকট খুব প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইত না।[৩৩]

সমাজে গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিধির প্রসার— সমাজে বড় আদর্শের মধ্যে স্থান না পাইলেও গান্ধর্ব্ব বিবাহের বর্ণনাই বেশী। ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত ভীষ্মের কাশীরাজকন্যাহরণ, দুর্য্যোধনের চিত্রাঙ্গদকন্যাহরণ, অর্জ্জুনের সুভদ্রা-হরণ এবং কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ রাক্ষস বিধানের অন্তর্গত। অপরগুলিতে অন্যান্য বিধান মিশ্রিত থাকিলেও ভীষ্মের হরণে শুধু গায়ের জোরই প্রকাশ পাইয়াছিল।

ব্রাহ্মবিধানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত—ব্রাহ্মবিধান অন্যান্য বিধান হইতে প্রশস্ত ছিল। উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ব্রাহ্মবিধানে কন্যাদান করেন, তিনি ইহলোকে দাস, দাসী, ক্ষেত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি উপভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুর পর পুরন্দরলোকে বাস করেন।[৩৪]

বিবাহে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ—কোন্ কন্যা বিবাহের যোগ্যা এবং কে অযোগ্যা এইবিষয়ে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। বরসম্বন্ধেও দুইচারিটি কথা দেখিতে পাই; কন্যার বিবাহ্যত্ব ও অবিবাহ্যত্ব নির্ণয় করিতে তাহার শারীরিক শুভাশুভসূচক লক্ষণগুলিও দেখিবার নিয়ম ছিল। বাহ্যিক শুভলক্ষণা কন্যা শাস্ত্রীয় হিসাবে বিবাহ্যা কি না তাহাও নিপুণ-ভাবে ঋষিবচনের দ্বারা বিচার করিতে হইত। যদিও শাস্ত্রীয় নিষেধ অমান্য করিলে দৃষ্টতঃ বিবাহের কোন বাধা হয় না, তথাপি নিষেধ-উল্লঙ্ঘনে বর ও কন্যার দুরদৃষ্টের উৎপত্তি হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের ঐহিক ও পারলৌকিক

৩৩ এতত্তু নাপরে চক্রুরপরে জাতু সাধবঃ। অনু ৪৫।৫

৩৪ যো ব্রহ্মদেয়াস্তু দদাতি কন্যান্। বন ১৮৬।১৫
দাসীদাসমলঙ্কারান্ ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ।
ব্রহ্মদেয়াং সুতাং দত্ত্বা প্রাপ্নোতি মনুজর্ষভ॥ অনু ৫৭।২৫

নানাবিধ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটিবে—এই ধর্ম্মবিশ্বাসে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বিবাহব্যাপারেও মানা হইত। সেই সময়কার শাস্ত্রব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে অপরিবর্ত্তিতভাবেই চলিতেছে।

হিন্দুসমাজে বিবাহের স্থান— পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে—কেবল শারীর প্রয়োজনই বর্ণাশ্রমিসমাজের বিবাহের চরম লক্ষ্য ছিল না, হিন্দুগণ বিবাহকে ধর্ম্মের অন্যতম অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে মনে করিতেন এবং শাস্ত্রীয়-সংস্কারের মধ্যেও বিবাহকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিতেন। গার্হস্থ্যধর্ম্ম এবং সমাজভিত্তির মূলই ছিল বিবাহসংস্কারের পবিত্রতা।[৩৫]

বর-কন্যার বংশ-পরীক্ষা— বিবাহে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, বর ও কন্যার পিতৃবংশ ও মাতামহবংশ যেন প্রশস্ত হয়। উৎকৃষ্ট বা সমান কুল হইতে কন্যা গ্রহণ করিলে বিবাহের ফল শুভ হয়।

স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাচ্চাপি— বংশের দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত নীচ হইলেও যদি রূপে ও গুণে কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হয়, তবে সেই স্ত্রীরত্নকে দুষ্কুল হইতেও গ্রহণ করিবে।[৩৬]

কন্যার বাহ্যিক শুভাশুভ-বিচার— হীনাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, বয়োজ্যেষ্ঠা, প্রব্রজিতা, অন্যাসক্তা, পিঙ্গলবর্ণা, চর্ম্মরোগগ্রস্তা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, অপস্মারী ও শ্বিত্রীর কুলে সমুদ্ভূতা কন্যা বিবাহে অতিশয় নিন্দিতা। বুদ্ধিমান্ পুরুষ শাস্ত্রোক্ত শুভলক্ষণা কন্যাকেই গ্রহণ করিবেন, নতুবা নানাবিধ অনিষ্টের আশঙ্কা।[৩৭]

বরের শারীর লক্ষণ-বিচার— কন্যার বেলায় যে-সব অশুভ লক্ষণ বর্জ্জন করিতে বলা হইয়াছে, বরের বেলায়ও তাহা সম্পূর্ণভাবে খাটিবে। "সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যাকে পিতামাতা অনুরূপ বরের হাতে সমর্পণ করিবেন, অন্যথা তাহাদের ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হইবে"—এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারি—

৩৫ ভার্য্যাপত্যোর্হি সম্বন্ধঃ স্ত্রীপুংসোঃ স্বল্প এব তু।
রতিঃ সাধারণো ধর্ম্ম ইতি চাহ স পার্থিবঃ॥ অনু ৪৫।৯

৩৬ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাচ্চাপি বিষাদপ্যমৃতং পিবেৎ। শা ১৬৫।৩২
কুলীনা রূপবত্যশ্চ তাঃ কন্যাঃ পুত্র সর্ব্বশঃ॥ আদি ১১০।৬

৩৭ বর্জ্জয়েদ্ব্যঙ্গিনীং নারীং তথা কন্যাং নরোত্তম। ইত্যাদি। অনু ১০৪।১৩১-১৩৩
মহাকুলে প্রসূতাঞ্চ প্রশস্তাং লক্ষণৈস্তথা। অনু ১০৪।১২৪

বরের শারীরিক শুভলক্ষণও দেখিবার বিষয় ছিল।[৩৮] মহাভারতের শাস্ত্রীয়—(অদৃষ্ট ফলের জন্য যাহা করা হয়) সিদ্ধান্তগুলি মনুসংহিতার অনুরূপ। বিধি-নিষেধসম্পর্কে মনুর অনুশাসন পালন করাই মহাভারতের উদ্দেশ্য। তাই দেখিতে পাই— মনুর বচন উদ্ধৃত করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আপনার অভিমত সমর্থন করেন।

পিতার ও মাতামহের সম্বন্ধ-বিচার— মনুর শাসন অনুসারে বর নিজের বংশে এবং মাতামহবংশে বিবাহ করিতে পারিবে না। মাতামহ বংশের সহিত রক্তসম্বন্ধে পঞ্চম স্থানীয় কন্যা পর্য্যন্ত অবিবাহ্যা। মাতামহ হইতে গণনা করিয়া ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন পাঁচপুরুষের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তির শাখাতে যে কন্যা পাঁচপুরুষের মধ্যে পড়িবে তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে না। সেইরূপ পিতা হইতে গণনা করিয়া ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন সাতপুরুষের মধ্যে যে-কোন পুরুষের শাখাতে সপ্তম-স্থানীয়া কন্যা পর্য্যন্ত অবিবাহ্যা।[৩৯]

সমান গোত্র-প্রবর-পরিত্যাগ—সমানগোত্রা বা সমানপ্রবরা কন্যা বিবাহে নিষিদ্ধা।[৪০]

মাতুলকন্যা-বিবাহ— মনুর এইসকল নিয়ম সমাজে সর্ব্বত্র পালিত হয় নাই। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে, সহদেব মদ্ররাজকন্যাকে, শিশুপাল ভদ্রাকে এবং পরীক্ষিৎ উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করেন। প্রত্যেক কন্যাই পরিণেতাদের মাতুলকন্যা।[৪১]

পরিবেদন পরিবেত্তা প্রভৃতি— মাতুলকন্যা-বিবাহ এখন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে। সহোদর ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারিবে না। যদি করে, তবে তাহাকে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বিবাহিতা

৩৮ আত্মজাং রূপসম্পন্নাং মহতীং সদৃশে বরে। ইত্যাদি। অনু ২৪।৯

৩৯ অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
ইত্যেতামনুগচ্ছেত তং ধর্ম্মং মনুরব্রবীৎ। অনু ৪৪।১৮
মাতুঃ স্বকুলজাং তথা। অনু ১০৪।১৩১

৪০ সমার্ষাং ব্যঙ্গিতাম্। ইত্যাদি। অনু ১০৪।১৩১

৪১ সভা ৪৫।১১। আদি ২২০।৮। আদি ৯৫।৮০
শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৬।২

পত্নীকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পুত্রবধূর মত ব্যবহারের জন্য কনিষ্ঠ আপন স্ত্রীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট উপস্থিত করিবেন, পরে জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে পুনরায় তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলে পাপমুক্ত হইবেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি গার্হস্থ্য অবলম্বনে অনিচ্ছুক হন এবং কনিষ্ঠকে বিবাহের অনুমতি দেন, অথবা জ্যেষ্ঠ যদি পতিত হন, তবে কোনও পাপ হইবে না। ভ্রাতাদের মধ্যে উল্লিখিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যিনি বিবাহ করেন— তাহাকে বলা হয় "পরিবেত্তা", আর অবিবাহিত জ্যেষ্ঠকে বলা হয় "পরিবিত্তি"।[৪২]

নিয়মের উল্লঙ্ঘন, ভীমের হিড়িম্বা-বিবাহ— যুধিষ্ঠিরের বিবাহের পূর্ব্বেই ভীমসেন গান্ধর্ব্ববিধানে হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করেন। সুতরাং দেখিতেছি — উল্লিখিত শাস্ত্রনিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। কুন্তী ও যুধিষ্ঠির কামাতুর হিড়িম্বার কাতর প্রার্থনায় ভীমসেনকে অনুমতি দিয়াছিলেন— এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।[৪৩]

জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের নিয়ম— শ্বশুরের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণের পর তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে যে ব্যক্তি বিবাহ করে তাহাকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠা যদি আমরণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে চান অথবা দীর্ঘকালস্থায়ী কোনও রোগের দরুন যদি তাহার বিবাহ না হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠার বিবাহে বর বা কন্যা কাহারও পাপ হইবে না। যিনি জ্যেষ্ঠার বিবাহের পূর্ব্বে কনিষ্ঠাকে বিবাহ করেন, তাহাকে বলা হয়— "অগ্রেদিধিষু"। কনিষ্ঠার বিবাহের পর যিনি জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করেন, তাহাকে বলা হয়— "দিধিষূপপতি"।[৪৪]

ভ্রাতৃহীনা কন্যা অবিবাহ্যা— যে কন্যা ভ্রাতৃহীনা, তাহাকে বিবাহ

৪২ পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যা চৈব পরিবিদ্যতে।
পাণিগ্রাহস্তধর্ম্মেণ সর্ব্বে তে পতিতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ইত্যাদি শা ১৬৫।৬৮—৭০
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা। ইত্যাদি। শা ৩৪।৪

৪৩ আদি ১৫৫তম অঃ।
ভিক্ষিতে পারদার্য্যঞ্চ তদ্ধর্ম্মস্ত ন দূষকম্। শা ৩৪।৪

৪৪ দিধিষূপপতির্যঃ স্যাদগ্রেদিধিষুরেব চ ॥ শা ৩৪।৪

করিতে নাই। এই নিষেধের কারণও বর্ণিত হইয়াছে। অপুত্রক ব্যক্তি দৌহিত্রের প্রদত্ত শ্রাদ্ধ-দ্বারা সদ্গতি লাভ করিতে পারেন। যদি কোন অপুত্রক কন্যাবান্ ব্যক্তি মনে মনে সঙ্কল্প করেন যে— "আমার কন্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে'ই আমার এবং আমার পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদান করিবে ;" তাহা হইলে সেই দৌহিত্রটি মাতামহের 'পুত্রিকাপুত্র' বলিয়া শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই স্থলে দৌহিত্র মাতামহবংশেরই শ্রাদ্ধ করিবে, পিতৃকুলের কিছুই করিতে পারিবে না। সুতরাং তাঁহাদ্বারা তাহার পিতৃপিতামহগণের বংশরক্ষা হয় না। অতএব অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাকে গ্রহণ না করাই উচিত— ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এইজন্যই ভ্রাতৃহীনা কন্যা সাধারণতঃ বিবাহ করিতে নাই। কিন্তু যদি জানা যায় যে— কন্যার পিতার সেইরূপ কোন অভিপ্রায় নাই, তাহা হইলে বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ।[৪৫]

গুরুকন্যা-বিবাহ নিষিদ্ধ— কচ-দেবযানী সংবাদে দেখিতে পাই— পরস্পরের আসক্তি যথেষ্টই ছিল, কচ অপেক্ষা দেবযানীর আসক্তিই অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছে। দেবযানীর আত্মনিবেদনের উত্তরে কচ বলিয়াছেন— "তুমি ধর্ম্মতঃ আমার ভগিনী, তুমি গুরুপুত্রী ; এই কারণে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না।"[৪৬] প্রত্যাখ্যাতা দেবযানী কচকে অভিসম্পাত করিলে কচ বলিলেন— "দেবযানি, আমি ঋষি-প্রোক্ত ধর্ম্মের কথাই বলিতে-ছিলাম, অভিসম্পাত করিবার তো কোন কারণ নাই।"[৪৭]

এই প্রকরণের আলোচনায় দেখা যায়— গুরুকন্যা-বিবাহ প্রাচীন কাল হইতেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ ছিল।

নিষেধের প্রতিকূলে সমাজ-ব্যবহার— মহাভারতে গুরুকন্যা-বিবাহের একাধিক উদাহরণ পাওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়— তখন হইতেই শাস্ত্রীয় সেই নিষেধের মাহাত্ম্য যে-কোন কারণেই হউক— সমাজে অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ঋষি উদ্দালক শিষ্য কহোড়কে এবং আচার্য্য গৌতম শিষ্য

৪৫ যস্যাস্তু ন ভবেদ্ ভ্রাতা পিতা বা ভরতর্ষভ।
নোপযচ্ছেত তাং জাতু পুত্রিকা-ধর্ম্মিণী হি সা॥ অনু ৪৪।১৫
পুত্রিকাহেতুবিধিনা সংজ্ঞিতা ভরতর্ষভ॥ ইত্যাদি। আদি ২১৫।২৪, ২৫

৪৬ ভগিনী ধর্ম্মতো মে ত্বং মৈবং বোচঃ সুমধ্যমে। ইত্যাদি। আদি ৭৭।১৪-১৭

৪৭ আর্ষং ধর্ম্মং ব্রুবাণোহহং। ইত্যাদি। আদি ৭৭।১৮

উতঙ্ককে কন্যা দান করেন।[৪৮] দীর্ঘকাল একত্র বাস করার ফলেই হউক, অথবা গুরু ও গুরুপত্নীর অত্যধিক স্নেহের আকর্ষণেই হউক, উল্লিখিত উভয় শিষ্যই সমাবর্ত্তনের পর গুরুকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। শুক্রাচার্য্য যদি কচকে অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে তিনিও যে দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিতে আপত্তি করিতেন না— তাঁহার উক্তিতে সেই ইঙ্গিতটিও প্রকাশ পাইয়াছে।[৪৯] সুতরাং শাস্ত্রীয় নিষেধ থাকিলেও সমাজে সর্ব্বত্র সেই নিষেধ প্রতিপালিত হয় নাই। (আধুনিক সমাজে গুরুকন্যা-বিবাহের যথেষ্ট উদাহরণ আছে।) সব জায়গায়ই দেখিতে পাই— শাস্ত্রের আদর্শ এবং সমাজের ব্যবহারে কখনও সম্পূর্ণ মিল হয় নাই।

বিমাতৃভগ্নী-বিবাহ— আপাতদৃষ্টিতে যে আচার বিসদৃশ মনে হয়, সেই-রকম ব্যবহারও বিবাহাদিতে দেখিতে পাই। ভীমসেন তাঁহার বিমাতা মাদ্রীর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।[৫০]

জাতিভেদে কন্যাগ্রহণ— জাতি বর্ণ হিসাবেও বিবাহের কতকগুলি বিধিনিষেধ মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। যিনি ব্রাহ্মণ তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কন্যাকে, বৈশ্য বৈশ্যকন্যাকে এবং শূদ্র কেবল শূদ্রকন্যাকেই গ্রহণ করিবার অধিকারী। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শূদ্রকন্যা গ্রহণে চারিবর্ণেরই অধিকার শাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু অনেক ঋষিই ঐ অভিমতে সম্মতি দেন না। তাঁহারা বলেন— দ্বিজ যদি শূদ্রকন্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন, তবে তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন।[৫১]

৪৮ তস্মৈ প্রাদাৎ সদ্য এব শ্রুতঙ্ক,
ভার্য্যাঞ্চ বৈ দুহিতরং স্বাং সুজাতাম্॥ বন ১৩২।৯
দদানি পত্নীং কন্যাঞ্চ স্বাং তে দুহিতরং দ্বিজ। অশ্ব ৫৬।২৩
ততস্তাং প্রতিজগ্রাহ যুবা ভূত্বা যশস্বিনীম্। অশ্ব ৫৬।২৪

৪৯ গুরুণা চাননুজ্ঞাতঃ। আদি ৭৭।১৭

৫০ ইয়ং স্বসা রাজচমূপতেশ্চ
প্রবৃদ্ধনীলোৎপলদামবর্ণা।
পস্পর্দ্ধ কৃষ্ণেন সদা নৃপো যো।
বৃকোদরস্যৈষ পরিগ্রহোঽগ্র্যঃ॥ আশ্র ২৪।১২

৫১ তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু॥ ইত্যাদি। অনু ৪৪।১১-১৩। অনু ৪৭।৪

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণজাতীয়া ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ার প্রাধান্য— ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণজাতীয়া এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়জাতীয়া পত্নীই প্রধান। তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে ধন-বিভাগ বিষয়েও পার্থক্য আছে। ("দায়বিভাগ" প্রবন্ধে বলা হইবে।)[৫২]

অভিভাবকের কর্তৃত্বে বিবাহ স্থির করাই সমীচীন— স্বয়ংবরপ্রথা সাধারণের নিকট খুব সমাদর পাইত না—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে—"সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি সাধ্বীদের স্বয়ংবর সম্বন্ধেও সমাজের ধারণা খুব ভাল ছিল না। কন্যাকে বর অনুসন্ধান করিতে অনুমতি দেওয়া অভিভাবকদের পক্ষে একান্ত গর্হিত। স্ত্রীলোককে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া এক প্রকার আসুর ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য। প্রাচীন কালে এইরূপ ব্যবহার ছিল না। ভার্য্যা ও পতির সম্পর্ক অতিশয় সূক্ষ্ম। যদিও পরস্পরের প্রতি অনুরাগ যুবক-যুবতীর সাধারণ মনোবৃত্তি, তথাপি কেবল সাময়িক উত্তেজনায় অন্ধ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিণাম সুখকর হয় না।"[৫৩]

বিপক্ষমতের প্রবলতা— এই উক্তি হইতে জানা যায়—বিবাহ বিষয়ে যুবক-যুবতীর নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা তখনকার সমাজেও সুবিবেচক ব্যক্তিগণ খুব পছন্দ করিতেন না। কিন্তু সমগ্র মহাভারতের আলোচনায় অবশ্যই বলিতে হয়—এই শ্রেণীর মতবাদের বিরুদ্ধে তখনও একটা শক্ত দল ছিল এবং তাঁহাদের প্রতিকূল আচরণই যেন সমাজে অধিকতর জয়যুক্ত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত প্রকরণগুলি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-সংবাদ— রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বলিয়াছিলেন—"তোমার শরীর তোমারই অধীন, পিতার অপেক্ষা করিয়া লাভ কি? আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার গতি। অতএব তুমি নিজেই আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে পার।"[৫৪]

পরাশর-সত্যবতী-সংবাদ— সত্যবতী পরাশরকে বলিয়াছিলেন—"ভগবন্, আমি পিতার অধীন, সুতরাং আপনি সংযত হউন। আমার কন্যাত্ব

৫২ ব্রাহ্মণী তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়স্য তু। অনু ৪৪।১২ অনু ৪৭।৩১

৫৩ স্বয়ং-বৃতেন সাজ্ঞপ্তা পিত্রা বৈ প্রত্যপদ্যত। ইত্যাদি। অনু ৪৫।৪-৯

৫৪ আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্ত্তুমর্হসি ধর্ম্মতঃ। আদি ৭৩।৭

দূষিত হইলে কিরূপে গৃহে অবস্থান করিব ?” অতঃপর নানাবিধ বরের দ্বারা সম্মত করিয়া ঋষিবর সত্যবতীর কন্যাত্ব নাশ করেন।[৫৫]

সূর্য্যকুন্তী-সংবাদ— কুন্তীদেবী পিতৃগৃহেই রজস্বলা অবস্থায় একদা সূর্য্যকে আহ্বান করেন। কিন্তু সূর্য্যকে উপস্থিত দেখিয়াই তিনি ভীতিবিহ্বল-চিত্তে প্রার্থনা করিলেন—“দেব ! আমার পিতামাতা-প্রমুখ গুরুজন আমাকে দান করিবার অধিকারী। দয়া করিয়া আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত করিবেন না।” বলা বাহুল্য— কুন্তীর প্রার্থনা বিফল হইল।[৫৬]

পণ-প্রথা, কন্যাশুল্কই বেশী প্রচলিত— মহাভারতের সময়েও কোন কোন সমাজে পণ-প্রথা বর্ত্তমান ছিল। তখনকার দিনে কন্যাপক্ষই বেশীর ভাগে পণ গ্রহণ করিতেন। বরপক্ষে পণ গ্রহণের সাক্ষাৎ-দৃষ্টান্ত না থাকিলেও এক জায়গায় ঐ প্রথার নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং মনে হয়— বরপক্ষও শুল্কগ্রহণ করিতেন।[৫৭] কন্যাপক্ষে শুল্কগ্রহণ কোন কোন অভিজাত বংশে কুলপ্রথা-রূপে বর্ত্তমান ছিল।

মদ্রদেশে (পাঞ্জাব)— বরকর্ত্তা ভীষ্ম মদ্ররাজের পুরীতে উপস্থিত হইয়া মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মদ্রপতি শল্য সানন্দে সম্মতি দিয়া বলিলেন—“এরূপ বরে ভগিনী দান করা খুবই শ্লাঘার বিষয়, কিন্তু আপনাকে কিঞ্চিৎ শুল্ক দিতে হইবে— এই কথা বলিতে লজ্জা হইতেছে, অথচ আপনি ত আমাদের কুলধর্ম্ম জানেন ? সাধুই হউক, আর অসাধুই হউক, কুলধর্ম্ম ত ত্যাগ করিতে পারি না ?” ভীষ্ম শল্যের বাক্যে সন্তুষ্ট হইলেন এবং নানাবিধ রত্নাদি শুল্কে শল্যকে সম্মত করিয়া মাদ্রীকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।[৫৮]

ঋচীকের পত্নীগ্রহণ— ঋচীক মুনি কান্যকুব্জপতি গাধির সমীপে কন্যা প্রার্থনা করিলে গাধি উত্তর করিলেন— “আপনাকে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি, কিন্তু আমাদের কুলপ্রথা, তাই না বলিলেও চলে না। একহাজার

৫৫ বিদ্ধি মাং ভগবন্ কন্যাং সদা পিতৃবশানুগাম্। আদি ৬৩।৭৫

৫৬ পিতা মাতা গুরবশ্চৈব যেঽন্যে
দেহস্যাস্য প্রভবন্তি প্রদানে॥ বন ৩০৫।২৩

৫৭ নৈব নিষ্ঠাকরং শুল্কং জ্ঞাত্বাসীত্তেন নাহৃতম্। ইত্যাদি। অনু ৪৪।৩১-৪৬
যো মনুষ্যঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি। অনু ৪৫।১৮

৫৮ পূর্ব্বৈঃ প্রবর্ত্তিতং কিঞ্চিৎ কুলেঽস্মিন্ নৃপসত্তমৈঃ। ইত্যাদি। আদি ১১৩।৯—১৬

শ্বেতবর্ণ দ্রুতগামী অশ্ব আমাদের বংশের কন্যাদের শুল্ক, অশ্বগুলির একখানি কান কাল-রংএর হওয়া চাই।" ঋচীক বরুণরাজা হইতে সেইরূপ একহাজার ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া গাধিকে দেন, এবং তাঁহার কন্যা সত্যবতীকে গ্রহণ করেন।[৫৯]

কাশীরাজ-দুহিতা মাধবীর শুল্ক— গালব-চরিতে উক্ত হইয়াছে, গালব কাশীরাজ যযাতির অপরূপ সুন্দরী কন্যা মাধবীকে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন রাজাদের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মাধবীকে শুল্ক-দাতাদের পত্নীরূপে প্রদান করেন।[৬০]

এইসকল বর্ণনা হইতে বুঝা যায়— কোন কোন সম্ভ্রান্ত বংশেও কন্যাশুল্ক গ্রহণের প্রথা ছিল।

শুল্কগ্রহণ বিক্রয়ের সমান— উক্ত হইয়াছে যে— কন্যা বা পুত্রের বিবাহে শুল্কগ্রহণ করিলে তাহাদিগকে শুল্কদাতার নিকট বিক্রয় করা হয়। শুল্কগ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ দেওয়াকে দান বলা যায় না।[৬১]

শুল্কের নিন্দা— অতি প্রাচীন কাল হইতেই শুল্কগ্রহণ প্রথার নিন্দা চলিয়া আসিতেছে। এই বিষয়ে মহর্ষি যমের একটি গাথা পৌরাণিকগণ কীর্ত্তন করেন। গাথাটি এই— "যে ব্যক্তি আপনার পুত্র অথবা কন্যাকে বিক্রয় করে, অর্থাৎ যে তাহাদের বিবাহে শুল্ক গ্রহণ করে, সে কালসূত্র-নামক নরকে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আর্ষবিবাহে শুল্ক-স্বরূপ যে গো-যুগল গ্রহণের প্রথা, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, অল্পই হউক আর বেশীই হউক, শুল্কস্বরূপ কিছু গ্রহণ করিলেই তাহা বিক্রয়ের সমান। লোভের বশে কেহ কেহ শুল্কপ্রথার আচরণ করেন সত্য, কিন্তু তাহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। সেইরূপ 'রাক্ষস' বিবাহও অত্যন্ত পাপজনক। পশুকেও বিক্রয় করা অনুচিত; তাহাতে মানুষের আর কথা কি? বিশেষতঃ পুত্র-কন্যা-বিক্রয় অতিশয় গর্হিত।"[৬২]

---

৫৯ কান্যকুব্জে মহানাসীৎ পার্থিবঃ সুমহাবলঃ। ইত্যাদি বন ১১৫।২০-২৯ অনু ৪।১০

৬০ উঃ ১১৬ তম অধ্যায়—১১৯ তম অঃ।

৬১ ন হি শুল্কপরাঃ সন্তঃ কন্যাং দদতি কর্হিচিৎ॥ অনু ৪৪।৩১

৬২ যো মনুষ্যঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি।
কন্যাং বা জীবিতার্থায় যঃ শুল্কেন প্রযচ্ছতি॥ ইত্যাদি। অনু ৪৫।১৮-২২
অন্যোঽপ্যথ ন বিক্রেয়ো মনুষ্যঃ কিং পুনঃ প্রজাঃ। অনু ৪৫।২৩

কন্যার নিমিত্ত অলঙ্কার গ্রহণ দোষাবহ নহে— অন্যত্র উক্ত হইয়াছে —কন্যার পিতা যদি কন্যাকে অলঙ্কারাদি দিবার জন্য বরপক্ষ হইতে শুল্ক গ্রহণ করেন, তবে তাহাতে কোন দোষ নাই। ঐরূপ গ্রহণে কন্যা-বিক্রয় হয় না। বরপক্ষ হইতে কন্যার আভরণাদি গ্রহণ করিয়া কন্যাকে দান করিবার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত।[৬৩]

শুল্কদাতাই প্রকৃত বর— কন্যার পিতা যদি বরপক্ষ হইতে শুল্ক গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অপর বরের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন না। অন্য কোন পুরুষ ধর্ম্মানুসারে ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না।[৬৪]

শুল্কদাতা বিবাহের পূর্ব্বে বিদেশ চলিয়া গেলে অন্যপুরুষ-সংসর্গে পুত্রোৎপাদন— শুল্কদানের পর বিবাহের পূর্ব্বেই যদি শুল্কদাতা দীর্ঘকালের জন্য বিদেশে কোথাও চলিয়া যান, তবে সেই বাগদত্তা কন্যা অপর উত্তম পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া সন্তান প্রসব করিতে পারেন। কিন্তু সেই সন্তান শুল্কদাতার সন্তান-রূপেই গণ্য হইবে, বীজীর তাহাতে কোন অধিকার নাই।[৬৫]

প্রথম প্রস্তাবক বরপক্ষ— গুরুজনের রুচি অনুসারে তাঁহাদেরই কর্ত্তৃত্বে যে-সকল পাত্র-পাত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হইত, সেইগুলিতে বরপক্ষ হইতে প্রথম প্রস্তাব চলিত। শান্তনু, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর প্রমুখ ব্যক্তিদের বিবাহে তাঁহাদের পক্ষ হইতেই প্রথম প্রস্তাব করা হইয়াছে।[৬৬] অভিমন্যুর বিবাহে কন্যাপক্ষই প্রথম প্রস্তাবক। অজ্ঞাতবাসের পর অর্জ্জুনাদি বীরগণের প্রকৃত

দদাতু কন্যাং শুল্কেন। অনু ৯৩।১৩৩। অনু ৯৪।৩১
স্বসুতাং চোপজীবতু। অনু ৯৩।১১৯
বিক্রয়ঞ্চাপ্যপত্যস্য কঃ কুর্য্যাৎ পুরুষো ভুবি। আদি ২২১।৪
ন হ্যেব ভার্য্যা ক্রেতব্যা ন বিক্রয্যা কথঞ্চন। অনু ৪৪।৪৬

৬৩ অলঙ্কৃত্বা বহস্বেতি যো দদ্যাদনুকূলতঃ॥ ইত্যাদি। অনু ৪৪।৩২, ৩৩

৬৪ যাপুত্রকস্য ঋদ্ধস্য প্রতিপাল্যা তদা ভবেৎ। অনু ৪৫।২

৬৫ তস্যার্থেঽপত্যমীহেত যেন ন্যায়েন শক্নুয়াৎ॥ অনু ৪৫।৩

৬৬ অভিগম্য দাশরাজং কন্যাং বব্রে পিতুঃ স্বয়ম্। আদি ১০০।৭৫
ততো গান্ধাররাজস্য প্রেষয়ামাস ভারত। আদি ১১০।১১
তামহং বরয়িষ্যামি পাণ্ডোরর্থে যশস্বিনীম্। আদি ১১৩।৬
ততস্তু বরয়িত্বা তামানীয় ভরতর্ষভঃ।
বিবাহং কারয়ামাস বিদুরস্য মহামতেঃ। আদি ১১৪।১৩

পরিচয় জানিতে পারিয়াই মৎস্যরাজ তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিবার জন্য অর্জ্জুনকে কন্যা-দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ প্রস্তাব নীতিসঙ্গত মনে না করায় অর্জ্জুন উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিলেন এবং অবশেষে তাহাই ঘটিল।[৬৭]

পারিবারিক প্রাচীন ব্যক্তির দায়িত্ব— পরিবারের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যক্তি তিনিই পুরোহিতাদি সহ কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে যাইয়া সম্বন্ধের প্রস্তাব করিতেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের বিবাহে ভীষ্ম ছিলেন বরকর্ত্তা।

পুরোহিত পাঠাইবার নিয়ম— কখন কখন বিবাহের প্রথম প্রস্তাবে নিজে না যাইয়া অভিজ্ঞ পুরোহিতকে পাঠাইবারও নিয়ম ছিল। দ্রুপদরাজা অর্জ্জুনের লক্ষ্যবেধের পর প্রচ্ছন্নচারী পাণ্ডবদের নিকট তাঁহার পুরোহিতকে পাঠাইয়াছিলেন।[৬৮]

ব্রাহ্মণদের ঘটকতা— ব্রাহ্মণদের কেহ কেহ নানা কার্য্য-উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতেন এবং প্রসঙ্গতঃ পাত্র-পাত্রীরও সন্ধান করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা ছিলেন অনেকটা ঘটকদের মত।[৬৯]

বর-কর্ত্তৃক কন্যা-প্রার্থনা— বর স্বয়ং কন্যাদাতার সমীপে উপস্থিত হইয়া কন্যা-প্রার্থনা করিয়াছেন— এরূপ উদাহরণও মহাভারতে বিরল নহে। মহর্ষি অগস্ত্য বিদর্ভরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যা প্রার্থনা করেন।[৭০] ঋচীক-মুনি কান্যকুব্জপতি গাধির নিকট কন্যা প্রার্থনা করেন।[৭১]

রাজা প্রসেনজিতের নিকট জমদগ্নি কন্যা প্রার্থনা করেন।[৭২] শান্তনু দাশরাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সত্যবতীকে প্রার্থনা করেন।[৭৩] অর্জ্জুন মণিপুরপতি চৈত্রবাহনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কন্যা প্রার্থনা করেন।

৬৭ বিঃ—৭১ তম ও ৭২ তম অধ্যায়।

৬৮ পুরোহিতং প্রেষয়ামাস তেষাম্। আদি ১৯৩।১৪

৬৯ অথ শুশ্রাব বিপ্রেভ্যো গান্ধারীং সুবলাত্মজাম্। আদি ১১০।৯

৭০ বরয়ে ত্বাং মহীপাল লোপামুদ্রাং প্রযচ্ছ মে। বন ৯৭।২

৭১ ঋচীকো ভার্গবস্তাঞ্চ বরয়ামাস ভারত। বন ১১৫।২১

৭২ স প্রসেনজিতং রাজন্নধিগম্য জনাধিপম্।
রেণুকাং বরয়ামাস স চ তস্মৈ দদৌ নৃপঃ॥ বন ১১৬।২

৭৩ স গত্বা পিতরং তস্যা বরয়ামাসতাং তদা॥ আদি ১০০।৫০

৭৪ অভিগম্য চ রাজানমবদৎ স্বং প্রয়োজনম্। আদি ২১৫।১৭

পূর্ব্বে প্রস্তাব না করিয়া কন্যাদান— পূর্ব্বে কোনও প্রস্তাব না করিয়া অশ্বপতি পাত্র মিত্র পুরোহিত ও কন্যা সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে কন্যা দান করিবার উদ্দেশ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হন। যদিও দ্যুমৎসেন দারিদ্র্যনিবন্ধন প্রথমতঃ সম্মত হন নাই, তথাপি অশ্বপতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত সম্মত হইতে বাধ্য হন।[৭৫]

বাগ্‌দান—অভিভাবকদের কর্ত্তৃত্বে যে-সব বিবাহ সম্পন্ন হইত, সেইগুলিতে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে যে পাকা কথা দিতেন, তাহার নাম ছিল— "বাগ্‌-দান"।[৭৬]

অনিবার্য্য কারণে বাগ্‌দানের পরেও অন্য পাত্রে কন্যাসম্প্রদান— বাগ্‌দানের পরে যদি বরের শারীরিক বা চরিত্রগত কোনও দোষ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করাই বিধেয়। পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে কেবল বাগ্‌দানের দ্বারা কন্যাত্ব নাশ হয় না।

সর্ব্বত্র ঐ নিয়ম ছিল না— এই অভিমত সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল না। সাবিত্রী তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন— "মাত্র একজনকেই কন্যা প্রদান করা যাইতে পারে। সুতরাং একবার যাঁহাকে মনে মনে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি, তিনিই আমার স্বামী।"[৭৭]

স্বয়ংবর কন্যার পিত্রালয়ে, রাক্ষসবিবাহ বরের বাড়ীতে— স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠান কন্যার পিত্রালয়েই হইত, আর রাক্ষসবিবাহ একমাত্র বরের বাড়ীতেই হইত। অন্যান্য বিবাহে এই বিষয়ে কোন নিয়ম ছিল না। বরের বাড়ীতে কন্যাকে আনিয়াও বিবাহ হইত, আবার কন্যার বাড়ীতে বরকে আহ্বান করিয়াও হইত। ভীষ্ম সত্যবতীকে হস্তিনাপুরীতে আনিয়া শান্তনুর সহিত বিবাহ দেন।[৭৮] গান্ধার-রাজপুত্র শকুনি ভগিনী সহ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া গান্ধারীকে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহ দিলেন।[৭৯]

---

৭৫ বন ২৯৪ তম অধ্যায়।

৭৬ দাস্যামি ভবতে কন্যামিতি পূর্ব্বং ন ভাষিতম্। অনু ৪৪।৩৪

৭৭ তস্মাদাগ্রহণাৎ পাণের্যাচয়ন্তি পরস্পরম্। ইত্যাদি। অনু ৪৪।৩৫,৩৬
যথেষ্টং তত্র দেয়া স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা। অনু ৪৪।৫১
সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে। বন ২৯৩।২৬

৭৮ আগম্য হাস্তিনপুরং শান্তনোঃ সংন্যবেদয়ৎ। আদি ১০০।১০০

৭৯ ততো গান্ধাররাজস্য পুত্রঃ শকুনিরভ্যগাৎ। ইত্যাদি। আদি ১১০।১৫,১৬

ভীষ্ম মাদ্রীকে লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন এবং শুভ লগ্নে পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। [৮০] বিদুরের বিবাহও হস্তিনাপুরিতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। [৮১]

কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে বিবাহ— দ্রৌপদীর বিবাহ হয়— তাঁহার পিত্রালয়ে। লক্ষ্যবেধের পর দ্রুপদরাজা অনুসন্ধানে জানিলেন যে, পাণ্ডু-পুত্র অর্জ্জুনই দ্রৌপদীর বর। তখন তিনি পুরোহিত পাঠাইয়া পাণ্ডবগণকে আপন পুরীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার বাড়ীতেই পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহ সম্পন্ন হয়। [৮২] অভিমন্যুর বিবাহও শ্বশুরবাড়ীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। [৮৩]

উল্লিখিত উভয় বিবাহের সময়ই পাণ্ডবরা গৃহহীন বনবাসী ছিলেন। সেই কারণেও শ্বশুরবাড়ীতে বিবাহোৎসব সম্পন্ন করা অসম্ভব নয়।

বরযাত্রী—দ্রৌপদী ও উত্তরা দুইজনের বিবাহেই বরপক্ষ অনেক আত্মীয় স্বজন সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পুরোহিত এবং অপর বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণকেও সসম্মানে বরযাত্রী করা হইয়াছে।

বরের মা এবং অন্যান্য মহিলাও যাইতেন— বরের মা এবং অন্যা সম্পর্কিত মহিলাগণও বরের সঙ্গে যাইতেন। [৮৪]

উৎসবে আত্মীয়স্বজনের নিমন্ত্রণ— আত্মীয়স্বজন সকলেই বিবাহে নিমন্ত্রণ পাইয়া উৎসবে উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিতেন। তখনও অন্যা উৎসব অপেক্ষা সমাজে বিবাহ-উৎসবেরই প্রাধান্য ছিল। [৮৫]

লগ্ন স্থিরীকরণ— উভয়পক্ষের সম্মতি অনুসারে বিবাহের সময় স্থির ক হইত। নির্দ্দিষ্ট শুভ লগ্নে কন্যার পিতা বা অপর কেহ অগ্নিসমীপে কন্যা দ করিতেন।

বিবাহে হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান— বর অগ্নিতে আহুতি প্রদান কি অগ্নিসাক্ষিপূর্ব্বক কন্যাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন। মন্ত্রপূর্ব্বক পত্নীগ্রহ

৮০ স তাং মাদ্রীমুপাদায় ভীষ্মঃ সাগরগাসুতঃ। ইত্যাদি। আদি ১১৩।১৭,১৮

৮১ ততস্তু বরয়িত্বা তামানীয় ভরতর্ষভঃ। ইত্যাদি। আদি ১১৪।১৩

৮২ আদি ১৯৯ তম অধ্যায়।

৮৩ বিঃ ৭২ তম অধ্যায়।

৮৪ কুন্তী তু কৃষ্ণাং পরিগৃহ্য সাধ্বীমন্তঃপুরং দ্রুপদস্যাবিবেশ। আদি ১৯৪।৯
বিঃ৭২ তমঅধ্যায়।

৮৫ বিঃ ৭২ তম অধ্যায়।

প্রকৃত বিবাহ—মহাভারতের এই অভিমত।[৮৬] উমামহেশ্বরসংবাদে উক্ত হইয়াছে যে—যদিও বর ও কন্যার অভিভাবকদের পাকপাকি কথাতেই বিবাহ সম্পন্ন হয়, তথাপি অগ্নিসমীপে বরকন্যার পরস্পরের প্রতিজ্ঞাই সহধর্ম্মাচরণের কারণ। সহধর্ম্মাচরণ দম্পতির সনাতন ধর্ম্ম।[৮৭]

পুরোহিতকর্ত্তৃক হোম— দ্রৌপদীর বিবাহবর্ণনায় দেখিতে পাই—পুরোহিত ধৌম্য প্রজ্বলিত সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছেন।[৮৮]

দম্পতির অগ্নি-প্রদক্ষিণ— দম্পতি পরস্পরের হাত ধরিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেন।[৮৯]

পাণিগ্রহণ— বরকর্ত্তৃক কন্যার পাণিগ্রহণ বিবাহের অন্যতম প্রধান অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। গান্ধর্ব্ব এবং স্বয়ংবর-বিধানেও পাণিগ্রহণের নিয়ম ছিল। শকুন্তলা, দেবযানী, দ্রৌপদী প্রভৃতির বিবাহে ঐ অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে।[৯০] পাণিগ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিবাহের অপর নাম "পাণিগ্রহণ"।

সপ্তপদীগমনে বিবাহ পূর্ণ হয়— বিবাহসংস্কারে শাস্ত্রীয় আরও একটা অনুষ্ঠান আছে— তাহার নাম "সপ্তপদীগমন"। বর ও কন্যাকে একসঙ্গে সপ্ত পদ অগ্রসর হইতে হয়। আমরণ সকল কাজে দম্পতি যে পরস্পরের সঙ্গী ও সহায়ক তাহারই একটা ইঙ্গিত সপ্তপদী-অনুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত। এই

৮৬ বন্ধুভিঃ সমনুজ্ঞাতে মন্ত্রহোমৌ প্রযোজয়েৎ। ইত্যাদি। অনু ৪৪।২৫-২৭
অনুকূলামনুবংশাং ভ্রাত্রা দত্তামুপাগ্নিকাম্। অনু ৪৪।৫৬

৮৭ স্ত্রীধর্ম্মঃ পূর্ব্ব এবায়ং বিবাহে বন্ধুভিঃ কৃতঃ।
সহধর্ম্মচরী ভর্ত্তুর্ভবত্যগ্নিসমীপতঃ॥ অনু ১৪৬।৩৪
দম্পত্যোরেষ বৈ ধর্ম্মঃ সহধর্ম্মকৃতঃ শুভঃ॥ অনু ১৪৬।৪০
হুত্বা সম্যক্ সমিদ্ধাগ্নিম্। বিঃ ৭২।৩৭

৮৮ ততঃ সমাধায় স বেদপারগঃ।
জুহাব মন্ত্রৈর্জ্বলিতং হুতাশনম্। আদি ১৯৯।১১

৮৯ প্রদক্ষিণং তৌ প্রগৃহীতপাণী। আদি ১৯৯।১২

৯০ জগ্রাহ বিধিবৎ পাণৌ। ৭৩।২০
পাণিধর্ম্মো নাহুষায়ং ন পুংভিঃ সেবিতঃ পুরা॥ আদি ৮১।২১
পাণিং কৃষ্ণায়াস্ত্বং গৃহাণাদ্য পূর্ব্বম্॥ আদি ১৯৯।৫
পাণিগ্রহণমন্ত্রাশ্চ প্রথিতং বরলক্ষণম। দ্রো ৫৩।১৬

ক্রিয়াটি না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। পিত্রাদিকর্ত্তৃক অগ্নিসমীপে কন্যাদান, বরের পাণিগ্রহণ ও "ইনি আমার ভার্য্যা" এইরূপ জ্ঞান এই কয়েকটি অনুষ্ঠানকেই বলা হয়— বিবাহ। আর সপ্তপদীগমনই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। সপ্তপদীগমনের পর নারী পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হন।[৯১]

হরিদ্রাস্নান— ববাহে আরও একটি অনুষ্ঠান ছিল— তাহা কেবল আচাররূপেই গণ্য হইত। বর ও কন্যা হরিদ্রাচূর্ণদ্বারা পরস্পরের পায়ে রঙ্ মাখাইয়া দিতেন। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে মাঙ্গলিক কতকগুলি অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, সেইগুলির মধ্যে হরিদ্রাস্নানও একটি।[৯২]

বিবাহসভা-বর্ণন— বিবাহসভাকে উৎকৃষ্ট অগুরু দ্বারা ধূপিত করা হইত। চন্দনোদক এবং নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইত। বিবাহসভার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সাধ্য অনুসারে কেহই ত্রুটী করিতেন না। মাঙ্গলিক শঙ্খ এবং তূর্য্যনিনাদে বিবাহবাসর সব সময় মুখরিত থাকিত। বিবাহবাসরে আনন্দ কোলাহলের অবধি ছিল না। "দীয়তাং" "ভোজ্যতাম্" শব্দে এবং আত্মীয় অনাত্মীয় নির্ব্বিশেষে স্ত্রীপুরুষের যাতায়াতে বিবাহবাসর এক মুহূর্ত্তের জন্যও মৌনী থাকিতে পারিত না। মহাভারতে যে দুই চারিটি বিবাহবাড়ীর চিত্র আঁকা হইয়াছে— সব কয়টিই খুব উজ্জ্বল।[৯৩]

স্বয়ংবর বর্ণনা— স্বয়ংবর সভাগুলিতে দেখিতে পাই—উৎসব-মুখরিত সভামণ্ডপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সবই উপস্থিত। যাঁহারা কন্যাপ্রার্থী তাঁহাদের পোশাক-পরিচ্ছদের পরিপাটীও কম নহে। কানে কুণ্ডল, গলায় মহামূল্য হার, মহার্হ বস্ত্র ও উত্তরীয় তাঁহাদের পরিধেয়। চন্দন কুঙ্কুম প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে অনুলিপ্ত হইয়া সোৎকণ্ঠ-আনন্দে তাঁহারা

---

৯১ পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাৎ সপ্তমে পদে ॥ অনু ৪৪।৫৫
নন্বেষাং নিশ্চিতা নিষ্ঠা নিষ্ঠা সপ্তপদী স্মৃতা। দ্রো ৫৩।১৬

৯২ পাদপ্রক্ষালনং কুর্য্যাৎ কুমার্য্যাঃ সন্নিধৌ মম ॥ উ ৩৫।৩৮। নীলকণ্ঠ দ্রষ্টব্য।
সর্ব্বমঙ্গলমন্ত্রং বৈ। অনু ৪৪।৫৪। নীলকণ্ঠ দ্রষ্টব্য।

৯৩ তূর্য্যৌঘশতসঙ্কীর্ণঃ পরার্দ্ধ্যাগুরুধূপিতঃ। ইত্যাদি। আদি ১৮৫।১৮-২২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ। ইত্যাদি। বি ৭২।২৭
তন্মহোৎসবসঙ্কাশং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতম্।
নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ॥ বি ৭২।৪০

প্রত্যেকেই অপেক্ষা করিতেছেন। (কেহ কেহ হয়ত দুই-তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন।) যথাসময়ে শুভমুহূর্ত্তে সুবসনা সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা কন্যা হাতে একগাছি পুষ্পমালা বা কাঞ্চনমালা লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক তূর্য্যধ্বনিতে মুখরিত। পুরোহিত সভামণ্ডপেই কুশণ্ডিকা করিয়া অগ্নিতে বেদমন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিলেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে স্বস্তিবচন পাঠ করিলেন। তারপর কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তূর্য্যধ্বনি বিরত হইল। সভা নিঃশব্দ। কন্যার ভ্রাতা (বা ভগিনী বা অন্য কোনও নিকট-আত্মীয়) সমাগত পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যেকের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া ভগিনীর নিকট পরিচয় দিতে লাগিলেন। কন্যা যদি পূর্ব্বেই কাহারও শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। মাল্যের সঙ্গে বরকে শুক্লবস্ত্র দিবার প্রথাও ছিল। অতঃপর কন্যার পিতা শাস্ত্রীয়বিধান অনুসারে শুভমুহূর্ত্তে কন্যার মনোনীত বরের হস্তে কন্যা-সম্প্রদান করিতেন।[১৪]

কন্যাদাতার প্রদত্ত যৌতুক— কন্যার বিবাহে প্রত্যেকেই শক্তি অনুসারে কন্যাকে অলঙ্কৃত করিতে কার্পণ্য করিতেন না। বরকেও কন্যার পিতা উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ যথেষ্ট পরিমাণেই দিতেন। বিবাহের পর বরকে হাতী, ঘোড়া, মণি, মাণিক্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, দাস, দাসী প্রভৃতি সাধ্যমত যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হইত।[১৫] যৌতুক প্রদানের যে কয়েকটি উদাহরণ দেখিতে পাই— সবকয়টিই ধনিসমাজের। দরিদ্রদের মধ্যে কিরূপ ব্যবহার চলিত, মহাভারতে তাহার কোন উদাহরণ নাই।

খাওয়া-দাওয়া—বিবাহবাসরে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকলকেই যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া প্রচুর পরিমাণে খাওয়ান হইত।[১৬]

---

১৪ আদি ১১২তম অধ্যায়। আদি ১৮৫তম অঃ। বন ৫৭তম অঃ।
আদায় শুক্লাম্বরমাল্যদাম, জগাম কুন্তীসুতমুৎস্ময়ন্তী। আদি ১৮৮।২৭

১৫ কৃতে বিবাহে দ্রুপদো ধনং দদৌ। ইত্যাদি। আদি ১৯৯।১৫-১৭
তেষাং দদৌ হৃষীকেশো জন্যার্থে ধনমুত্তমম্॥ ইত্যাদি। আদি ২২১।৪৪-৫০
তস্মৈ সপ্তসহস্রাণি হয়ানাং বাতরংহসাম্। ইত্যাদি। বিঃ ৭২।৩৬,৩৭
দত্ত্বা স ভগিনীং বীর যথার্হঞ্চ পরিচ্ছদম্। আদি ১১০।১৭

১৬ উচ্চাবচান্ মৃগান্ জঘ্নুঃ। বিঃ ৭২।২৮
ভোজনানি চ হৃদ্যানি পানানিবিবিধানি চ॥ বিঃ ৭২।৪০

ব্রাহ্মণকে দান— উপস্থিত দ্বিজাতিগণকে যথাশাস্ত্র অর্চ্চনা করিয়া ধন-রত্ন দক্ষিণা দেওয়া হইত। উভয় পক্ষই ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন।[৯৭]

আত্মীয়স্বজনদের উপহার প্রদান— বিবাহের পর আত্মীয়স্বজন বর ও কন্যাকে নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি উপহার দিতেন। যাঁহারা স্বয়ং উৎসবে উপস্থিত হইতে পারিতেন না, তাঁহারা লোকমারফতে পাঠাইতেন। পাণ্ডবদের বিবাহের পর শ্রীকৃষ্ণ প্রচুর উৎকৃষ্ট উপহার পাঠাইয়াছিলেন। অভিমন্যুর বিবাহেও তিনি নানাবিধ উপহার সঙ্গে লইয়া স্বয়ং উপপ্লব্যে উপস্থিত হন।[৯৮]

বরের বাড়ীতে কন্যাপক্ষীয়ের সৎকার— নূতন সম্বন্ধ স্থাপনের পর নববধূর ভ্রাতা বা পিতৃপক্ষীয় অন্য নিকট-আত্মীয় বরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে খুব আমোদআহ্লাদের ধুম পড়িত। পুনরায় ফিরিবার সময় বর-পক্ষীয়েরাও তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার মণিরত্নাদি উপহার দিতেন।[৯৯] যে-সকল বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, সবগুলিই ধনিসমাজের। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র-সম্প্রদায়ের উৎসবাদি বিষয়ে কোন চিত্র নাই। ধনিসমাজের নিয়মগুলি সম্ভবতঃ সকল সমাজেই আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে প্রচলিত ছিল। আনন্দ সকলের পক্ষেই সমান। শ্রেষ্ঠদের অনুকরণ সমাজে সকল বিষয়েই চিরকাল প্রচলিত।

বিবাহ (খ)

বিবাহে বর্ণ বিচার— আলোচনায় দেখা যায়— তখনকার সমাজে ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কন্যা বিবাহে কোন বাধা ছিল না। ক্ষত্রিয়গণও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের কন্যা বিবাহ করিতেন। বৈশ্য কেবল বৈশ্যের কন্যাই বিবাহ করিতে পারিতেন। শূদ্রের পক্ষে অন্য বর্ণের কন্যা বিবাহের নিয়ম ছিল না।

৯৭ অর্চ্চয়িত্বা দ্বিজন্মনঃ। বিঃ ৭২।৩৭
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং যদুপাহবদচ্যুতঃ॥ বিঃ ৭২।৩৮

৯৮ ততস্তু কৃতদারেভ্যঃ পাণ্ডুভ্যঃ প্রাহিণোদ্ধরিঃ।
বৈদূর্য্যমণিচিত্রাণি হৈমান্যাভরণানি চ॥ ইত্যাদি। আদি ১৯৯।১৩-১৪

৯৯ রত্নান্যাদায় শুভ্রাণি দত্তানি কুরুসত্তমৈঃ। আদি ২২১।৬২

প্রতিলোম-বিবাহের নিন্দা— প্রতিলোম-বিবাহ মহাভারতে অতিশয় নিন্দিত। ক্ষত্রিয়রাজা যযাতি ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ধর্ম্মগ্লানির ভয়ে দেবযানীর প্রার্থনায় তিনি সম্মত হন নাই। পরে শুক্রাচার্য্য যখন বলিলেন—"তুমি বিবাহ কর, আমি তোমার অধর্ম্মের প্রতীকার করিব"— তখনই রাজা সম্মত হইয়াছিলেন।[১]

বিদুর ইচ্ছা করিলে ক্ষত্রিয়কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন না— তাহা নহে, ধর্ম্মনাশের ভয়েই তিনি দেবকরাজার পারশবী (ব্রাহ্মণ যাহার পিতা এবং শূদ্রা মাতা) কন্যাকে বিবাহ করেন।[২]

শকুন্তলোপাখ্যানেও দেখিতে পাই— দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণদুহিতা মনে করিয়া একটু নিরাশের সুরেই যেন তাঁহার কুলশীল জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়াই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া শকুন্তলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। প্রতিলোম-বিবাহের প্রচলন থাকিলে ব্রাহ্মণকন্যা-বিবাহে ক্ষত্রিয়ের আশঙ্কার কোন কারণ থাকিত না, দুষ্মন্ত পূর্ব্বেই প্রস্তাব করিতে পারিতেন।[৩]

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় ব্রাহ্মণাদি সকল জাতীয় পুরুষই উপস্থিত হইয়াছিলেন। কর্ণও সেই সভায় লক্ষ্যবেধের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। তিনি ধনুতে বাণ সন্ধান করিতেই দ্রৌপদী উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন— "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।"[৪] সেই সভাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহই কর্ণকে নিষেধ করেন নাই। ধৃষ্টদ্যুম্নও উপস্থিত ছিলেন, তিনিও কিছু বলেন নাই। অথচ সকলেই কর্ণকে সূতপুত্ররূপে জানিতেন। ইহাতে মনে হয়, প্রতিলোম-বিবাহ নিষিদ্ধ বা নিন্দিত হইলেও সমাজে একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। যে স্বয়ংবরাদি ব্যাপারে বীরত্বেরই পণ থাকে, সেইসকল স্থলে জাতিধর্ম্ম বিচার করা সম্ভবপর হয় কি না তাহাও বিবেচ্য। বীরত্ব বা রণকৌশল দেখিয়া কন্যাদান করিলে জাতিবর্ণ-বিচারের অবকাশ কোথায় ?

---

১ বিদ্ধ্যৌশনসি ভদ্রন্তে ন ত্বামর্হোঽস্মি ভাবিনি।
অবিবাহ্যা হি রাজানো দেবযানি পিতুস্তব ॥ আদি ৮১।১৮-৩০

২ অথ পারশবীং কন্যাং দেবকস্য মহীপতেঃ। ইত্যাদি। আদি ১১৪।১২,১৩

৩ আদি ৭১ তম ও ৭২ তম অধ্যায়।

৪ দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈ-
র্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্ ॥ আদি ১৮৭।২৩

অনুলোম-বিবাহ— অনুলোম-বিবাহের উদাহরণ অসংখ্য। পরাশরের সত্যবতী-বিবাহ (আদি ৬৩ তম অঃ), চ্যবনঋষির সুকন্যা-বিবাহ (বন ১২২ তম অঃ), ঋচীকের গাধিকন্যা-বিবাহ (বন ১১৫।২১, অনু ৪।১৯), ঋষ্যশৃঙ্গের শান্তা-বিবাহ (বন ১১৩ তম অঃ), অগস্ত্যের লোপামুদ্রা-পরিণয় (বন ৯৭ তম অঃ), জমদগ্নির রেণুকা-বিবাহ (বন ১১৬।২) প্রভৃতি অনুলোম-বিবাহের উদাহরণ। বিবাহের পূর্ব্বে শান্তনু সত্যবতীকে ধীবরকন্যা বলিয়াই জানিতেন। ধীবরকন্যাকে বিবাহ করা যাইতে পারে কিনা— এই বিষয়ে কোন সন্দেহই তাঁহার মনে উপস্থিত হয় নাই, অকুণ্ঠচিত্তে দাশরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাতেও স্পষ্ট বুঝা যায়— অনুলোম-বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। (আদি ১০০ তম অধ্যায়)

দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রাগ্রহণ নিন্দিত— দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রজাতীয়া পত্নী গ্রহণ কোন কোন সমাজে প্রচলিত থাকিলেও নিন্দিত ছিল। অনেকেই ঐ ব্যবহার সমর্থন করিতেন না।[৫] কৃতঘ্নোপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে— মধ্যদেশ-প্রসূত কোন ব্রাহ্মণ আপনার পরিচয়প্রসঙ্গে বলিতেছেন— "আমি শবরালয়ে বাস করি, আমার ভার্য্যা শূদ্রা, বিশেষতঃ পুনর্ভূ (পূর্ব্বে অন্যের সঙ্গে বিবাহিতা)। ব্রাহ্মণ যে নিতান্ত কদাচার ছিলেন— তাহা সেই প্রকরণের আলোচনায় বেশ বুঝা যায়।[৬] আরও এক স্থানে কোন ব্রাহ্মণের নিষাদী পত্নীর বর্ণনা পাওয়া যায়।[৭]

দ্বিজাতির শূদ্রাগ্রহণে মতভেদ— মহাভারতে বিবাহকথন-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে— দ্বিজগণ একমাত্র রতির নিমিত্ত শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন — ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের সন্তানসন্ততিকে ধর্ম্মানুসারে পারলৌকিক কার্য্যের অধিকার দেওয়া হইবে না, আর কেহ কেহ বলেন যে, শূদ্রাবিবাহ দ্বিজাতির পক্ষে একান্ত গর্হিত। যেহেতু পতি স্বয়ং পত্নীর উদরে পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।[৮]

৫ আহো স্বিদন্ততো নষ্টং শ্রাদ্ধং শূদ্রীপতাবিব। দ্রো ৬৯।৩

৬ মধ্যদেশপ্রসূতোঽহং বাসো মে শবরালয়ে। ইত্যাদি। শা ১৭১।৫

৭ নিষাদী মম ভার্য্যেয়ং নির্গচ্ছতু ময়া সহ। আদি ২৯।৩

৮ রত্যর্থমপি শূদ্রা স্যান্নেত্যাহুরপরে জনাঃ।
অপত্যজন্ম শূদ্রায়াং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ॥ অনু ৪৪।১২। নীলকণ্ঠ দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন জাতির মিলনে উৎপন্ন সন্তানের পরিচয়— অনুলোম-বিবাহের সন্তানগণ সমাজে কোথাও পিতৃপরিচয়ে কোথাও বা মাতৃপরিচয়ে গৃহীত হইতেন। দেবযানীর গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃজাতিত্বে পরিচিত ছিলেন, জননী ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণ হন নাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধীবর পালিতা ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভজাত হইলেও পিতৃ-পরিচয়ে ব্রাহ্মণরূপেই সমাজে গৃহীত হইয়াছেন। বিদুর ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিয়াও জননীর জাতি অনুসারে শূদ্ররূপেই সমাজে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং দেখিতেছি—সন্তানের জাতি পরিচয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না।

সঙ্করজাতীয় সন্তানগণের মাতৃজাতিতে পরিচয়ের নিয়ম—সাধারণতঃ বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের মিলনে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে— তাহারা জননীর জাতিতেই পরিচিত হইবার নিয়ম।[১] কিন্তু মহাভারতের সমাজে এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না। সমানবর্ণ বর-কন্যার বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত।

মহাভারতের আলোচনায় আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়—অধিকাংশ ধার্ম্মিক ও বীরপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সূচনা করে। অনেক স্থলেই পিতা ও মাতার জাতি বিভিন্ন। এইপ্রকার বিবাহের বিশেষ কোন কারণ ছিল কি না— ভাবিবার বিষয়।

দেবতা যক্ষ-প্রভৃতির সহিত মানুষের বিবাহ— দেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ, নাগ, সুপর্ণ প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও পরস্পর বিবাহপ্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। নাগ, সুপর্ণ প্রভৃতিও মানুষই ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। রাক্ষসনামে যে সম্প্রদায়কে আমরা বিভীষিকার দৃষ্টিতে চিন্তা করিয়া থাকি, সেই সম্প্রদায়ও বস্তুতঃ তাহা ছিল না। হয়ত তাহারা মানুষেরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত উগ্রপন্থী। দেবতাও এইস্থলে সম্ভবতঃ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য-সম্প্রদায়েরই নামান্তর। এইপ্রকার সিদ্ধান্ত না করিলে বিবাহ-সম্বন্ধের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। মহাভারতে অনেকগুলি বিবাহ জাতিবৈচিত্র্যের উদাহরণ। শান্তনু এবং গঙ্গার বিবাহ, জরৎকারু ঋষি এবং বাসুকিভগিনী জরৎকারুর বিবাহ, ভীম ও হিড়িম্বার বিবাহ, অর্জ্জন ও উলূপীর বিবাহ, মহর্ষি

১ ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ॥ অনু ৪৮।৪। দ্রষ্টব্য নীলকণ্ঠ।

মন্দপাল ও শারঙ্গীর পরিণয় প্রভৃতি। নাগরাজ বাসুকি ভীমকে তাঁহার দৌহিত্রের দৌহিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১০] তাহাতে সপ্রমাণ হয়— মহাভারত-রচনার বহু পূর্ব্ব হইতে সমাজে এইসকল ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে বিবাহ— শুধু সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে— এরূপ উদাহরণ মহাভারতে বহু দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তনু ও গঙ্গার বিবাহ, অর্জ্জুনের সহিত চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীর বিবাহ এবং ভীম ও হিড়িম্বার বিবাহকে প্রধান উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে যুবকই প্রথম প্রস্তাবক, কোথাও বা যুবতীই প্রথমতঃ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

স্ত্রীপুরুষের মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য— যদিও সন্তানোৎপাদন-পূর্ব্বক বংশধারা রক্ষা করাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য ছিল, তথাপি সেই আদর্শ তাৎকালিক সমাজেও কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্ত্রী-পুরুষের চিরন্তন মিলনাকাঙ্ক্ষাকেই মহাভারতে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। পুত্রসত্ত্বেও শান্তনুর পুনর্ব্বিবাহ, বিচিত্রবীর্য্যের একাধিক বিবাহ, পাণ্ডুর দুই বিবাহ এবং ব্রহ্মচারী অর্জ্জুনের উলূপী- ও চিত্রাঙ্গদা-পরিণয় হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

আদর্শ-স্খলন— আদর্শ এক দিকে এবং সমাজের গতি অন্য দিকে। কোন সমাজ কোন কালেও আদর্শের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারে নাই। মহাভারতে বহু উচ্চ আদর্শের বিধান থাকিলেও সমস্ত সমাজ তাহা মানিয়া চলিতে পারে নাই। তাই বিবাহাদি প্রধান প্রধান বিষয়েও সময় সময় আদর্শ স্খলনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ মহাভারতের ইহাই বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকের চরিত্রেই মানুষসুলভ দুই-চারিটি দোষ বা দুর্ব্বলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিবাহেও হয়ত সেই দুর্ব্বলতাই জয়যুক্ত হইয়াছে।

বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য— শাস্ত্রীয় বিধানে দেখিতে পাই— বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য পুত্রলাভ। মহাভারতে বহু স্থানে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে।[১১]

১০ তদা দৌহিত্রদৌহিত্রঃ পরিষ্বক্তঃ সুপীড়িতম্। আদি ১২৮।৬৫

১১ বহুকল্যাণমিচ্ছন্ত ঈহন্তে পিতরঃ সুতান্। শা ১৫০।১৪
ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষ্বিব চাননম্। ইত্যাদি। আদি ৭৪।৪৯-৬৬
অনপত্যঃ শুভাল্লোকান্ন প্রাপ্স্যামীতি চিন্তয়ন্। আদি ১২০।৩০

পুত্র শব্দের অর্থ— ইহকালে ও পরকালে সমস্ত অশুভ হইতে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্রের পুত্রত্ব।[১২]

পুত্রের প্রকারভেদ— মহাভারতে দ্বাদশ-প্রকার পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) স্বয়ংজাত— বিবাহিতা পত্নীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করা হয়— তাহার সংজ্ঞা "স্বয়ংজাত"।

(খ) প্রণীত— বিবাহিতা পত্নীতে অপর উত্তম পুরুষ-দ্বারা যে পুত্র লাভ করা হয় তাহার নাম "প্রণীত"।

(গ) পরিক্রীত— অপর পুরুষকে ধনদানে প্রলোভিত করিয়া আপন-বিবাহিতা পত্নীতে নিয়োগের ফলে যে পুত্র লাভ হয়— তাহাকে "পরিক্রীত" বলে।

(ঘ) পৌনর্ভব— অপরের বিবাহিতা পত্নীকে পরে যদি অন্য কোন পুরুষ দ্বিতীয়বার স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করে, তবে দ্বিতীয় পতির ঔরসে সেই স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্রের উৎপত্তি হয় তাহার সংজ্ঞা— "পৌনর্ভব"। পৌনর্ভব-পুত্র জনকেরই পুত্ররূপে সমাজে গৃহীত হয়।

(ঙ) কানীন— বিবাহের পূর্ব্বেই কুমারীর গর্ভে যে পুত্রের উৎপত্তি হয় তাহার নাম "কানীন"।

(চ) স্বৈরিণীজ— বিবাহিতা স্বৈরিণী মহিলার গর্ভে পতি ব্যতীত অপর কোন সমানজাতীয় বা উত্তমজাতীয় পুরুষ যে পুত্র উৎপাদন করেন সেই পুত্রকে বলা হয় "স্বৈরিণীজ"।

উল্লিখিত ছয় প্রকার পুত্রের মধ্যে "স্বয়ংজাত" ও "পৌনর্ভব" পুত্রকে "ঔরস" পুত্র বলা হইত। কানীন পুত্র "ঔরস" না হইলেও তাহাকে বলা হইত—

তত্তারয়তি সন্তত্যা পূর্ব্বপ্রেতান্ পিতামহান্। আদি ৭৪।৩৮

কুলবংশপ্রতিষ্ঠাং হি পিতরঃ পুত্রমব্রুবন্। আদি ৭৪।৯৮

বৃথা জন্ম হ্যপুত্রস্য। বন ১৯৯।৪

রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ। আদি ৭৪।১১১

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ী বিদ্যাসন্তানমপি চাক্ষয়ম্॥

সর্ব্বাণ্যেতান্যপত্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ আদি ১০০।৬৮

১২ সর্বথা তারয়েৎ পুত্রঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। আদি ১৫৯।৫

"ব্যবহিত-ঔরস-পুত্র"। 'প্রণীত', 'পরিক্রীত' এবং "স্বৈরিণীজ" এই তিনপ্রকার পুত্রই "ক্ষেত্রজ পুত্র"। উল্লিখিত ছয়প্রকার পুত্রকে বলা হইত— "বন্ধুদায়াদ", অর্থাৎ তাহারা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত।

অন্য যে ছয়প্রকার পুত্রের উল্লেখ করা হইবে তাহারা পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইত না, এই কারণে তাহাদিগকে বলা হইয়াছে— "অবন্ধুদায়াদ"।

(ছ) দত্ত— জনকজননী যে পুত্রকে অন্য অপুত্রক ব্যক্তির পুত্ররূপে দান করেন, তাহার নাম "দত্ত"।

(জ) ক্রীত— মূল্যের বিনিময়ে যদি কাহারও পুত্র খরিদ করিয়া আনা হয়, তবে সেই পুত্রকে বলা হয়— "ক্রীত"।

(ঝ) কৃত্রিম— যদি কোনও বালক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কাহাকেও পিতৃসম্বোধন করে, তাহা হইলে সেই পুত্রকে 'কৃত্রিম' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়।

(ঞ) সহোঢ়— যদি বিবাহের সময়ই পাত্রী গর্ভবতী থাকেন, তবে সেই গর্ভজাত সন্তানকে বলা হয় 'সহোঢ়'।

(ট) জ্ঞাতিরেতা— সহোদর ভিন্ন অন্য জ্ঞাতির পুত্রকে বলা হয় 'জ্ঞাতি-রেতা'।

(ঠ) হীনযোনিধৃত— নিজ অপেক্ষা অধম জাতীয়া স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্রকে বলা হয়— 'হীনযোনিধৃত'।

উল্লিখিত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্র প্রশস্ত।[১৩]

পঞ্চবিধ পুত্র— অন্যত্র পাঁচপ্রকার পুত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে। ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পাঁচপ্রকার পুত্র ইহকালে ধর্ম্ম ও প্রীতি বর্দ্ধন করে এবং পরলোকে পিতৃগণকে নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে।[১৪]

বিশপ্রকার পুত্র— ভীষ্মযুধিষ্ঠির-সংবাদে বিশপ্রকার পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশপ্রকার ব্যতীত যে আটপ্রকার পুত্রের কথা বলা হইয়াছে— তাহারা বিভিন্ন জাতির স্ত্রীপুরুষের মিলনে উৎপন্ন সঙ্কর সন্তান।[১৫]

---

১৩ স্বয়ংজাতঃ প্রণীতশ্চ পরিক্রীতশ্চ বা সুতঃ। ইত্যাদি। আদি ১২০।৩৩-৩৫।
দ্রষ্টব্য— নীলকণ্ঠ

১৪ স্বপত্নীপ্রভবান্ পঞ্চ লব্ধান্ ক্রীতান্ বিবর্দ্ধিতান্। ইত্যাদি। আদি ৭৪।৯৯,১০০

১৫ অনু ৪৯ শ অধ্যায়।

পুত্রিকাপুত্র মাতামহের বংশরক্ষক— "পুত্রিকাপুত্র" মাতামহের বংশ-রক্ষকরূপে গৃহীত হইত। ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে কেন অবিবাহ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার বিচার করিতে গিয়া এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।[১৬] বভ্রুবাহন (অর্জ্জুনের পুত্র) তাঁহার মাতামহের পুত্রিকাপুত্রস্থানীয় ছিলেন।[১৭] টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন— দক্ষিণকেরলে পুত্রিকাপুত্রই মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হয়, ঔরসপুত্র সম্পত্তি পায় না।[১৮]

ক্ষেত্রজ-পুত্রে ক্ষেত্রীরই অধিকার, বীজীর নহে— ক্ষেত্রজপুত্র সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায়, ক্ষেত্রজ সব সময়েই পাণিগ্রহীতার পুত্র, উৎপাদকের নহে। ব্যাসের ঔরসে জন্ম হইলেও ধৃতরাষ্ট্রাদি তিন ভাই বিচিত্রবীর্য্যেরই ক্ষেত্রজ-পুত্র। পঞ্চ পাণ্ডবও পাণ্ডুরই পুত্র বলিয়া সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। মহাভারতে এইরূপ অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুশাসন পর্ব্বের পুত্রবিভাগ-প্রকরণে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, "যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করেন, তবে সেই পুত্রে উৎপাদকেরই অধিকার; কিন্তু যদি উৎপাদক পিতা লোকাপবাদের ভয়ে সেই পুত্রকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে যে নারীর গর্ভে পুত্র জন্মিয়াছে, সেই নারীর পাণিগ্রহীতাই পুত্রের পিতা হইয়া থাকেন।"[১৯] মহাভারতে কোথাও এই নিয়মের অনুকূলে কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মনে হয়, ঐ নিয়ম হয়ত তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল না। সর্ব্বত্র ক্ষেত্রীই পুত্রের অধিকারী হইতেন, বীজীর কোন অধিকার সমাজ স্বীকার করিত না।

কুমারীর সন্তানে পাণিগ্রহীতার অধিকার— যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতেন, তবে সেই গর্ভজাত সন্তান পাণি-গ্রহীতারই সন্তানরূপে সমাজে স্থান পাইত।[২০] কিন্তু মহাভারতে গর্ভবতী-

১৬ বিবাহ (ক) ১৩ পৃঃ

১৭ পুত্রিকাহেতুবিধিনা সংজ্ঞিতা ভরতর্ষভ। ইত্যাদি। আদি ২১৫।২৪,২৫

১৮ অদ্যাপি পুত্রিকাপুত্রস্যৈব রাজ্যমিতি দক্ষিণকেরলেষু আচারো দৃশ্যতে। নীলকণ্ঠ-টীকা—আদি ২১৫।২৫

১৯ আত্মজং পুত্রমুৎপাদ্য যস্ত্যজেৎ কারণান্তরে।
ন তত্র কারণং রেতঃ স ক্ষেত্রস্বামিনো ভবেৎ ॥ অনু ৪৯।১৫

২০ পুত্রকামো হি পুত্রার্থে যাং বৃণীতে বিশাম্পতে।
ক্ষেত্রজং তু প্রমাণং স্যান্ন বৈ তত্রাত্মজঃ সুতঃ ॥ অনু ৪৯।১৬। দ্রঃ—নীলকণ্ঠ।

বিবাহের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুতরাং এই বিষয়ে সমাজে কিরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, ঠিক বুঝিবার উপায় নাই।

"কৃতক"-পুত্রের সংস্কারাদির নিয়ম— যে পুত্রকে তাহার জনক-জননী গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করেন, সেই পুত্রকে দয়া করিয়া যে ব্যক্তি লালনপালন করেন, তিনিই তাহার পিতা। এইরূপ পুত্রকে বলা হইত 'কৃতক'-পুত্র। ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্ব্বে যদি পালক তাহার জনক-জননীর খবর পান, তবে জনকের জাতি-ধর্ম্ম-অনুসারে সংস্কার-ক্রিয়া সম্পাদন করিবার নিয়ম, আর যদি জাতি-ধর্ম্ম কিছুই জানা না যায়, তবে আপনার জাতিগোত্র অনুসারেই সংস্কারাদি করিতে হইবে।[২১] কুন্তীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কর্ণকে রাধা ও অধিরথ নামক কোনও সূত-দম্পতি প্রতিপালন করেন এবং সূতজাতির বিধান অনুসারেই কর্ণের বিবাহান্ত সংস্কার-ক্রিয়া সম্পাদন করেন।

কানীনপুত্রের নিয়ম— জাতপুত্রা কুমারীকে পরে যিনি বিবাহ করিতেন, কানীনপুত্র তাঁহাকেই পিতা বলিয়া পরিচয় দিত।[২২]

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'কানীন' হইলেও "শান্তনু-পুত্র" নামে পরিচিত হন নাই—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সত্যবতীর কানীনপুত্র হইলেও তাঁহাকে কোথাও শান্তনু-নন্দন বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয় নাই। "সত্যবতীসুত" এবং 'পারাশর্য্য' নামেই তিনি পরিচিত। সুতরাং উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বিধান সমাজ সর্ব্বত্র স্বীকার করে নাই।

কর্ণ পাণ্ডুরই কানীনপুত্র— কর্ণ প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডুরই কানীনপুত্র ছিলেন। কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে কুন্তী তাঁহাকে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেওয়ায় তিনি যে কুন্তীর গর্ভজাত, তাহা সমাজে অপ্রকাশিত ছিল। সেই কারণেই তিনি সূতদম্পতির কৃতক-পুত্র।

কানীন ও অধ্যূঢ়-পুত্রের নিন্দা— কানীন ও অধ্যূঢ়পুত্র সমাজে প্রশস্ত স্থান পায় নাই, তাহাদের জীবন যেন অভিশপ্ত ছিল। মহাভারতকার তাহাদিগকে 'কিল্বিষ'-(পাপ)-আখ্যা দিয়াছেন। পালক-পিতা আপনার বর্ণ-গোত্র-অনুসারে তাহাদের বৈদিক সংস্কার করিবেন— এই নিয়মে তাহাদের

২১ মাতাপিতৃভ্যাং যস্ত্যক্তঃ পথি যস্তং প্রকল্পয়েৎ।
ন চাস্য মাতাপিতরৌ জ্ঞায়েতাং স হি কৃত্রিমঃ॥ ইত্যাদি। অনু ৪৯।২০-২৫

২২ বোঢ়ারং পিতরং তস্য প্রাহুঃ শাস্ত্রবিদো জনাঃ॥ উ ১৪০।৮

প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যগোত্র বা অন্যবর্ণজ হইলেও সংস্কারের দ্বারা সংস্কর্ত্তারই বর্ণ এবং গোত্রভাগী হইবে, কিন্তু সেই বর্ণোচিত ক্রিয়াকলাপে কানীনাদি পুত্রকে অধিকার দেওয়া হইবে কি না এই বিষয়ে মহাভারতকার কিছু বলেন নাই। 'কিল্বিষ'—বিশেষণ হইতে অনুমিত হয়, তাহাদের অধিকারও সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধই ছিল, ব্যাসদেব কানীন হইলেও তাঁহার বিষয় সাধারণ হইতে পৃথক্।[২৩]

কুমারীর সন্তান-প্রসবে কলঙ্ক—পিতৃগৃহে কুমারীর সন্তান প্রসব সমাজে খুব কলঙ্কের বিষয় ছিল। কুন্তীদেবী কুমারী অবস্থায়ই গর্ভধারণ করেন; কিন্তু অত্যন্ত গোপনে তিনি কাল কাটাইতেছিলেন। কেবল একটি ধাত্রী ব্যতীত অপর কেহ ঐ সংবাদ জানিতেন না। যথাকালে তিনি সন্তান প্রসব করিলেন। পরমুহূর্ত্তেই কলঙ্কের কথা স্মরণ করিয়া সেই ধাত্রীর সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক মোম্-দ্বারা উত্তমরূপে একটি মঞ্জুষাকে (বাক্স) নিশ্ছিদ্র করিলেন। কুমারীর গর্ভধারণ একান্ত গর্হিত— তাহা কুন্তী ভালরূপেই জানিতেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমাজের ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পেটিকার মধ্যে সদ্যোজাত শিশুকে স্থাপন করিয়া নদীর দিকে চলিলেন, নিতান্ত অধীরভাবে স্রোতের মধ্যে সেই মঞ্জুষাটি ভাসাইয়া দিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতাদের নিকট পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া পুনরায় গভীর রাত্রিতে সেই ধাত্রীসহ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। এই অসহ্য বেদনা তিনি সমস্ত জীবন বুকে ধারণ করিয়াছিলেন। সমাজের নির্য্যাতন-ভয়ে কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, কর্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত প্রথম যুধিষ্ঠিরকে বলিতে গিয়া সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।[২৪]

এই ঘটনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়, কানীনপুত্র এবং অধ্যূঢ়-পুত্র সমাজে ভাল স্থান পাইতেন না। কুমারীর গর্ভধারণও অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। সেইজন্য সমাজের ভয়ে কুন্তী আমরণ তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াছেন। কুন্তীর চরিত্র আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারি, এই ঘটনার পর হইতেই

---

২৩ কানীনাধ্যূঢ়জৌ বাপি বিজ্ঞেয়ৌ পুত্র কিল্বিষৌ।
তাবপি স্বাবিব সুতৌ সংস্কার্য্যাবিতি নিশ্চয়ঃ॥ অনু ৪৯।২৫। দ্রঃ-নীলকণ্ঠ।

২৪ গূহমানাপচারং সা বন্ধুপক্ষভয়াৎ তদা।
উৎসসর্জ্জ কুমারং তং জলে কুন্তী মহাবলম্॥ আদি ১১১।২২
বন ৩০৭তম অঃ।

তাঁহার অন্তঃকরণ যেন অনেকটা কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিল। মহাপ্রস্থানিক-পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত প্রব্রজ্যাগ্রহণ-কালেও কুন্তীর এই মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। পরে তিনি ব্যাসদেবের নিকট কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

বহু-পুত্র-প্রশংসা— কোন কোন স্থলে বহু-পুত্র-উৎপাদনের প্রশংসা করা হইয়াছে। আরণ্যকে গয়ামাহাত্ম্যবর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে— "গৃহী ব্যক্তি বহু পুত্রের কামনা করিবেন। কারণ বহুসংখ্যক পুত্র জন্মিলে কেহ পিতৃলোকের গয়া-শ্রাদ্ধ করিবে, কেহ-বা অশ্বমেধযজ্ঞ-দ্বারা পিতৃপুরুষের প্রীতি উৎপাদন করিবে, আবার কেহ হয়ত পিতৃগণের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে।"[২৫]

একমাত্র পুত্র অপুত্রের মধ্যে গণ্য—এক পুত্র ত পুত্রই নহে। শান্তনু ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন— "ধর্ম্মবাদীরা বলিয়া থাকেন, একপুত্রতা অনপত্যতার মধ্যে গণ্য। যাহার একটিমাত্র পুত্র, তাহার বংশরক্ষার ভরসা অতি ক্ষীণ।"[২৬]

শান্তনুর এই উক্তিকে খুব প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায় না, কারণ সত্যবতীর অসাধারণ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইবার নিমিত্ত তিনি তখন ব্যাকুল ছিলেন। সেই কারণেই "এক পুত্র পুত্রই নহে" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের দোহাই দিয়া উপযুক্ত পুত্র দেবব্রতকে কৌশলে মনোভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিন পুত্র জন্মিলে অপুত্রতাদোষ নাশ হয়— দানধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে যে, তিনটি পুত্র জন্মিলে অপুত্রতাদোষ বিনষ্ট হয়। এইসকল উক্তির তাৎপর্য্য অন্যরূপ। শব্দের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না, কারণ একটি পুত্র জন্মিলেই গৃহী পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন। অতএব বলিতে হইবে- বহু পুত্র উৎপাদনের প্রশংসাখ্যাপনই উদ্দেশ্য।[২৭]

বহুপুত্রবত্তার নিন্দা— অন্যত্র দেখা যায়—যাঁহাদের পুত্রের সংখ্যা বেশী তাঁহারা মোটেই আনন্দিত হইতেন না। দরিদ্রের পক্ষে বহু পুত্রের জনক হওয়া

২৫ এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥ বন ৮৪।৯৭

২৬ অনপত্যতৈকপুত্রত্বমিত্যাহুর্ধর্ম্মবাদিনঃ। আদি ১০০।৬৭

২৭ অপুত্রতাং ত্রয়ঃ পুত্রাঃ। অনু ৬৯।১৯

অভিশাপরূপে বিবেচিত হইত।[২৮] বহু পুত্রের দরিদ্র জনককে সমাজে একটু করুণার চক্ষে দেখা হইত। দানধর্ম্মে বলা হইয়াছে, "যাঁহার পুত্রসংখ্যা অনেক, তাঁহাকে দান করিলে দাতা উত্তম লোক প্রাপ্ত হন।"[২৯] প্রকারান্তরে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করা সমাজের পক্ষে উচিত বলিয়াই কি এই ফলশ্রুতি?

রুচিভেদে মতভেদ—ব্যক্তিগত রুচি অনুসারেই বোধ করি—এক পুত্র এবং বহু পুত্রের নিন্দা ও প্রশংসা। এইসকল বিষয়ে কখনও সকলের একরূপ অভিমত হইতে পারে না। সেই সময়েও জনকজননীগণ এইসকল বিষয়ে নানারূপ চিন্তা করিতেন—উল্লিখিত বিরুদ্ধ মতবাদ তাহারই সূচনা করে।

পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের গৌরব—দেশের শাসন-প্রণালীর সুব্যবস্থায় এবং সকলেরই নানাপ্রকার আয়ের পথ থাকায় পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব সাধারণসমাজে দুর্ব্বিষহ অভিশাপের বোঝা ছিল না। সুতরাং বহু সন্তানের জনকজননীদের চিন্তার কোন কারণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনে তখনকার সমাজে কোনও সমস্যা দেখা দেয় নাই। তাই দেখিতে পাই, সন্তান-মুখ দেখিবার নিমিত্ত বহু জনকজননী নানা কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যাতে আত্মনিয়োগ করিতে একটুও কষ্টবোধ করিতেন না। সপত্নীক অশ্বপতি, দ্রুপদ ও সোমদত্তের তপস্যার বর্ণনায় তাহা বুঝা যায়। ('দেবতা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

বন্ধ্যাত্ব বেদনাদায়ক—উপযুক্ত বয়সে সন্তানের মুখ না দেখিতে পাইলে মহিলাদের কষ্টের সীমা থাকিত না। নারীদের পক্ষে বন্ধ্যাত্ব অসহ্য বেদনার কারণ ছিল।[৩০]

নিয়োগ-প্রথা বা অন্যান্য উপায়ে সন্তান উৎপাদনের বিধানেও সেই মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে কি না ভাবিবার বিষয়।

ধনীর সন্তানসংখ্যা কম, দরিদ্রের বেশী—প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, ধনী ব্যক্তির সন্তান-সন্ততির সংখ্যা কম। অনেক বড় বড় পরিবারে দত্তকপুত্র-গ্রহণ যেন পুরুষানুক্রমে নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি সন্তানের

---

২৮ অগতির্বহুপুত্রঃ স্যাৎ। অনু ৯৩।১২৮

২৯ ভিক্ষবে বহুপুত্রায় শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে।
দত্ত্বা দশ গবাং দাতা লোকানাপ্নোত্যনুত্তমান্। অনু ৬৯।১৬

৩০ অপ্রসূতিরকিঞ্চনঃ। অনু ৯৩।১৩৫

উপযুক্ত ভরণপোষণ করিতে অক্ষম, নিয়তি তাহারই ঘর শিশুতে পূর্ণ করিয়া দেন ; দরিদ্রসমাজে অপুত্রক ব্যক্তি বড় দেখা যায় না। মহাভারতে ঠিক এইরূপ উক্তি আছে—"যে-সকল গরীব পিতা আর সন্তান চাহেন না, তাঁহাদের ঘরেই শিশুর হাট এবং যাঁহারা ধনী, বহু শিশুকে লালন-পালন করিয়া মানুষ করিতে সমর্থ, তাঁহারা পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিত, বিধির এই বিচিত্র লীলা।"[৩১] চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞগণ ইহাকে বিধির লীলা না বলিয়া অন্য কারণের উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু মহাভারতকার এই বিষয়ে শুধু অদৃষ্টের দোহাই দিয়াই বিরত হইয়াছেন।

নিয়োগপ্রথা—সন্তান-উৎপাদনে অসমর্থ হইলে কোন কোন পুরুষ আপনার পত্নীর সহিত অপর উৎকৃষ্ট পুরুষের মিলনে পুত্রোৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেন। কোন কোন স্থলে স্বামীর মৃত্যু হইলে অপুত্রা নারী বংশলোপের ভয়ে কোনও উত্তম-পুরুষের সহযোগে গর্ভধারণ করিতেন। এইপ্রকার মিলনের নাম ছিল—"নিয়োগ-প্রথা" এবং এইভাবে জাত পুত্রকে বলা হইত—"ক্ষেত্রজ"।

নিয়োগপ্রথা ধর্ম্মবিগর্হিত নহে—এই নিয়ম ধর্ম্মবিগর্হিত নহে—ইহাই মহাভারতের অভিপ্রায়। সেই সময়কার সমাজে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।[৩২] পরবর্ত্তী কালে এই রীতি সমাজে অচল হইয়া পড়ে। মনুসংহিতাতেও এই রীতির পক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে কলিযুগের জন্য এই প্রথাকে নিষেধ করা হইয়াছে। স্মৃতিনিবন্ধকারগণও একবাক্যে বলিয়াছেন—কলিতে এই নিয়ম চলিতে পারিবে না।

ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ের জন্ম—পরশুরাম ক্রমান্বয়ে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। তখন বিধবা ক্ষত্রিয়-রমণীগণ বংশরক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হন। সংশিতব্রত ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মবুদ্ধিতে সমাগমার্থিনী বিধবাদের গর্ভসঞ্চার করেন। তাঁহারা শুধু ঋতুকালেই অভিগমন করিয়াছিলেন,

৩১ সন্তি পুত্রাঃ সুবহবো দরিদ্রাণামনিচ্ছতাম্।
নাস্তি পুত্রঃ সমৃদ্ধানাং বিচিত্রং বিধিচেষ্টিতম্॥ শা ২৮।২৪

৩২ মন্নিয়োগান্মহাবাহো ধর্ম্মং কর্ত্তুমিহার্হসি। আদি ১০৩।১০
মমৈতদ্বচনং ধর্ম্ম্যং কর্ত্তুমর্হস্যনিন্দিতে। আদি ১২২।২৫
সজ্জনাচরিতে পথি। সভা ৪১।২৪

কামতঃ স্পর্শও করেন নাই। এইভাবে পুনরায় পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল।[৩৩]

"তপস্বী" "সংশিতব্রত" প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ হইতে বুঝা যায়, সেইসকল ক্ষত্রিয়জনক ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া ক্ষত্রনারীর সহিত মিলিত হন নাই, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত এইরূপ করিতে হইয়াছিল।

বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মদাতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কাশীরাজকন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণিগ্রহণের পর বিচিত্রবীর্য্য সাত বৎসর পরে যক্ষ্মারোগে মারা যান। তাঁহার কোন সন্তান জন্মে নাই।[৩৪]

ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত সত্যবতীকর্ত্তৃক ভীষ্মকে অনুরোধ—বিচিত্রবীর্য্যের জননী সত্যবতী ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "তুমি শ্রুতি, স্মৃতি, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত আছ, শান্তনুর বংশ প্রতিষ্ঠার ভার এখন তোমার উপর। অকালে পরলোকগত নিঃসন্তান বিচিত্রবীর্য্যের রূপযৌবনসম্পন্না দুই বধূই পুত্রকামা। হে মহাবাহো, তুমি আমার নিয়োগ অনুসারে তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা কর।" অপর সুহৃদ্গণও দেবব্রতকে এই সম্বন্ধে অনুরোধ জানান।

ভীষ্মের অস্বীকৃতি—দেবব্রত বিমাতাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মাতঃ, আপনি যাহা বলিলেন তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত—সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি ত আমার প্রতিজ্ঞা জানেন? আমি কিছুতেই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিতে পারিব না।"[৩৫]

গুণবান্ ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিতে ভীষ্মের প্রস্তাব—অতঃপর ভীষ্ম জননীর নিকট দীর্ঘতমার উপাখ্যান বিবৃত করিয়া বলিলেন—"মাতঃ, কোনও গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধনরত্ন দিয়া এই কার্য্যে নিয়োগ করা আমি উচিত মনে করি।"[৩৬]

৩৩ তদা নিঃক্ষত্রিয়ে লোকে ভার্গবেণ কৃতে সতি।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়া রাজন্ সুতার্থিন্যোঽভিচক্রমুঃ ॥ ইত্যাদি। আদি ৬৪।৫-৮।
আদি ১০৪।৫,৬

৩৪ তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহরন্ পৃথিবীপতিঃ।
বিচিত্রবীর্য্যস্তরুণো যক্ষ্মণা সমগৃহ্যত ॥ ইত্যাদি। আদি ১০২।৭০,৭১

৩৫ আদি ১০৩তম অঃ।

৩৬ ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিদ্ধনেনোপনিমন্ত্র্যতাম্।
বিচিত্রবীর্য্যক্ষেত্রেষু যঃ সমুৎপাদয়েৎ প্রজাঃ ॥ আদি ১০৫।২

সত্যবতী-ব্যাস-সংবাদ—সত্যবতী মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম ভীষ্মের নিকট প্রস্তাব করিবামাত্র ভীষ্ম সন্তুষ্টচিত্তে সমর্থন করিলেন। সত্যবতী কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলে তিনি উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সত্যবতী প্রকৃত বিষয় উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "বৎস, বিচিত্রবীর্য্য তোমার ছোট ভাই ছিল; তাহার যুবতী বিধবা-পত্নীদ্বয় পুত্রকামা, তুমি ধর্ম্মতঃ তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া কুরুবংশ রক্ষা কর।"[৩৭] ব্যাস বলিলেন —"মাতঃ, আপনি নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ধর্ম্মের রহস্য অবগত আছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞে, আপনার বুদ্ধি ধর্ম্মের অনুকূল। আমি আপনার নিয়োগ অনুসারে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ভ্রাতৃবধূদের গর্ভোৎপাদন করিব। ইহা সনাতন ধর্ম্মেও দৃষ্ট হয়। বধূদ্বয়কে আমার নির্দ্দেশ মত একবৎসর কাল ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। ব্রতাদি দ্বারা বিশুদ্ধ না হইলে কোন নারী আমাকে সহ্য করিতে পারিবে না।"[৩৮]

ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম— সত্যবতী দীর্ঘকাল রাজ্যকে অরাজক অবস্থায় রাখা অনুচিত বিবেচনায় শীঘ্র গর্ভাধান করিতে দ্বৈপায়নকে অনুরোধ করিলেন। অম্বিকা ও অম্বালিকা উভয়েই দ্বৈপায়নকে সহ্য করিতে পারিলেন না। ফলে অম্বিকার পুত্র হইলেন জন্মান্ধ, আর অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডুবর্ণ। সত্যবতী পুনরায় অম্বিকাকে নিয়োগ করিলেন; কিন্তু অম্বিকা নিজে না যাইয়া তাঁহার দাসীকে উৎকৃষ্ট আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া শয়নমন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। দাসীর সযত্ন পরিচর্য্যায় মহর্ষি তৃপ্ত হইলেন। দাসীর গর্ভে দীর্ঘদর্শী বিদুরের আবির্ভাব হইল।[৩৯]

পাণ্ডুকর্ত্তৃক কুন্তীর নিয়োগ— কিন্দম-মুনির অভিশাপে সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ হইয়া পাণ্ডু কুন্তীদেবীকে সদৃশ বা উৎকৃষ্ট কোনও পুরুষ হইতে গর্ভধারণের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন।[৪০] কুন্তী অধর্ম্মের আশঙ্কায় প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। পরে পাণ্ডুর উদাহৃত বহু নিদর্শন ও শাস্ত্রবচনে আশ্বস্ত হইয়া

৩৭ যবীয়সস্তব ভ্রাতুর্ভার্য্যে সুরসুতোপমে।
রূপযৌবনসম্পন্নে পুত্রকামে চ ধর্ম্মতঃ। ইত্যাদি। আদি ১০৫।৩৭,৩৮

৩৮ বেত্থ ধর্ম্মং সত্যবতি পরঞ্চাপরমেব চ। ইত্যাদি। আদি ১০৫।৩৯-৪৩

৩৯ আদি ১০৬ তম অঃ।

৪০ সদৃশাচ্ছ্রেয়সো বা ত্বং বিদ্ধ্যপত্যং যশস্বিনি। আদি ১২০।৩৭

অগত্যা ক্রমান্বয়ে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র হইতে গর্ভধারণ করিয়া তিনটি পুত্র প্রসব করিলেন।[৪১]

নকুল ও সহদেবের উৎপত্তি— মাদ্রীও কুন্তীর সহায়তায় অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের প্রসাদে নকুল ও সহদেবকে লাভ করেন।[৪২]

মহাভারতের মূল ঘটনার মধ্যে উল্লিখিত কয়েকজন ক্ষেত্রজসন্তানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া এই বিষয়ে আরও কয়েকটি পুরাবৃত্ত মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের পুনরুদ্ভব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজা সৌদাস তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহার কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মদয়ন্তী ও বশিষ্ঠ হইতে জাত পুত্রের নাম ছিল অশ্মক।[৪৩]

বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমার পুত্র-জনন— ধর্ম্মজ্ঞ রাজা বলি দীর্ঘতমা-মুনিকে আপন পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুনিকে বৃদ্ধ এবং অন্ধ দেখিয়া সুদেষ্ণা নিজে তাঁহার সমীপে না যাইয়া একজন ধাত্রেয়িকাকে পাঠাইয়া দেন। দীর্ঘতমা হইতে সেই ধাত্রেয়িকার গর্ভেই কাক্ষীবান্ প্রমুখ পুত্রগণের জন্ম হয়। পরে দীর্ঘতমা হইতে সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিয়া রাজা পুনরায় সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট পাঠান। সুদেষ্ণা ক্রমান্বয়ে পাঁচটি পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম ছিল—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। প্রত্যেকের নামে এক-একটি দেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।[৪৪] বলি-রাজা পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ ছিলেন, এমন কোন কথা মহাভারতে নাই। সম্ভবতঃ উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিক পুত্র লাভের জন্যই তিনি মুনিকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

নিয়োগপ্রথায় শারদণ্ডায়িনীর তিনটি পুত্র— শারদণ্ডায়িনী নামে

৪১ আদি ১২৩ তম অঃ।

৪২ আদি ১২৪ তম অঃ।

৪৩ সৌদাসেন চ রম্ভোরু নিযুক্তা পুত্রজন্মনি।
মদয়ন্তী জগামর্ষিং বশিষ্ঠমিতি নঃ শ্রুতম্। ইত্যাদি। আদি ১২২।২১,২২
রাজ্ঞস্তস্যাজ্ঞয়া দেবী বশিষ্ঠমুপচক্রমে। আদি ১৭৭।৪৩

৪৪ জগ্রাহ চৈনং ধর্ম্মাত্মা বলিঃ সত্যপরাক্রম।
জ্ঞাত্বা চৈনং স বব্রেহথ পুত্রার্থে ভরতর্ষভ। ইত্যাদি। আদি ১০৪।৪৩-৪৫

কোনও মহিলা তাঁহার পতির আদেশে এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে গর্ভধারণপূর্ব্বক দুর্জ্জয়াদি তিনটি মহারথ পুত্র প্রসব করেন।[৪৫]

আচার্য্যপত্নীতে সন্তান-উৎপাদন— উদ্দালক-নামক আচার্য্য তাঁহার পত্নীতে সন্তান-উৎপাদনের নিমিত্ত একজন শিষ্যকে নিয়োগ করেন। শিষ্যের ঔরসে শ্বেতকেতুর জন্ম হয়।[৪৬] এই ব্যবহারটি যেন নিতান্ত গর্হিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যেখানে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবল, কামের প্রেরণা সেখানে প্রশ্রয় পায় না, ইহাই এইসকল ঘটনার মূল কথা কি না চিন্তা করিবার বিষয়।

নিয়োগ-প্রথায় তিন পুত্রের অধিক আকাঙ্ক্ষা করা নিন্দিত—তিনটি পুত্রের জন্মের পর পাণ্ডু পুনরায় কোনও উৎকৃষ্ট পুরুষ হইতে গর্ভধারণ করিবার জন্য কুন্তীকে বলিলেন। কুন্তী উত্তরে বলিলেন, "আপৎকালেও তিনটির অধিক সন্তান কামনা করিবার কথা কোন শাস্ত্রে নাই। যে নারী চারিবার পরপুরুষের সহিত মিলিত হয়, তাহাকে বলা হয়— স্বৈরিণী, আর যে পাঁচবার এইরূপ কার্য্য করে, সে বেশ্যার সমান।"[৪৭]

নিয়োগ-প্রথায় অধর্ম্ম আশঙ্কা— যদিও নিয়োগ-প্রথাকে ধর্ম্মসঙ্গত বলা হইয়াছে, তথাপি অনেকেই তাহাতে আশঙ্কা করিতেন। সত্যবতী গোপনে অম্বিকার নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে মহাকষ্টে সম্মত করান।[৪৮] পাণ্ডু যখন কুন্তীর নিকট ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের প্রস্তাব করেন, তখন কুন্তী বলিয়াছিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ, আপনাতে নিতান্ত আসক্তা এই ধর্ম্মপত্নীকে এরূপ আদেশ করিবেন না।"[৪৯]

পাণ্ডু নানা প্রাচীন উদাহরণ দেখাইয়াও যখন কুন্তীকে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন বলিলেন, "হে ভীরু, আমাদের জন্মের ইতিবৃত্ত তো তোমার জানা আছে? কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুরুবংশ রক্ষার জন্য আমাদের জনকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্রকাররা বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই

৪৫ শৃণু কুন্তি কথামেতাং শারদণ্ডায়িনীং প্রতি। ইত্যাদি। আদি ১২০।৩৮-৪০

৪৬ উদ্দালকঃ শ্বেতকেতুং জনয়ামাস শিষ্যতঃ। শা ৩৪।২২

৪৭ নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাপৎস্বপি বদন্ত্যুত।
অতঃপরং স্বৈরিণী স্যাদ্বন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ। আদি ১২৩।৭৭

৪৮ সা ধর্ম্মতোঽনুনীয়ৈনাং কথঞ্চিদ্ধর্ম্মচারিণীম্। আদি ১০৫।৫৪

৪৯ ন মামর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ বক্তুমেবং কথঞ্চন। আদি ১২১।২

হউক, পতির আদেশ সব সময়ই পত্নীর শিরোধার্য্য। বিশেষতঃ, হে অনবদ্যাঙ্গি, পুত্রমুখ দেখিবার দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা আমাকে ব্যাকুল করিয়াছে। আমি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমার বাসনা পূর্ণ কর। তোমারই অনুগ্রহে আমি উত্তম লোক প্রাপ্ত হইব।" পাণ্ডুর করুণ প্রার্থনায় কুন্তী অগত্যা সম্মত হইলেন।[৫০]

পুত্র উৎপাদন করিবার নিমিত্ত পতিকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও যে নারী পুরুষান্তরের সহিত মিলিত হন না, তিনি পাপে লিপ্ত হন।[৫১] মুখে ধর্ম্মের দোহাই দিলেও ঐ নিয়ম ধর্ম্মসঙ্গত কি না সেই বিষয়ে পাণ্ডুরও সন্দেহ ছিল। মাদ্রীর প্রার্থনার পরে পাণ্ডুর মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। কুন্তীর পুত্র-গণকে দেখিয়া মাদ্রীও একদিন গোপনে পাণ্ডুকে তাঁহার মনোভাব জানাইলেন যে, তিনিও অগত্যা নিয়োগ-প্রথায় ক্ষেত্রজ পুত্রের মুখ দেখিতে চান। পাণ্ডু বলিলেন, "আমারও মনে মনে এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল, কিন্তু তুমি কি বলিবে সেই আশঙ্কায় তোমার নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হই নাই।"[৫২]

ক্ষেত্রজ পুত্রকে সমাজ খুব ভাল চক্ষে দেখিত না—ক্ষেত্রজ পুত্রকে সর্ব্বসাধারণ খুব ভাল চক্ষে দেখিত না। অস্ত্র-বিদ্যা পরীক্ষার রঙ্গমঞ্চে কর্ণ অর্জ্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলে ভীমসেন সূতপুত্র বলিয়া কর্ণকে উপহাস করেন। সেই বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরে দুর্য্যোধন বলিলেন, "ভীম, কর্ণকে বিদ্রূপ করা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই। তোমাদের জন্মের ইতিবৃত্তও আমাদের জানা আছে।"[৫৩] জয়দ্রথ, দুঃশাসন ও দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে প্রায়ই "পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সেই সত্য উক্তির মধ্যেও গূঢ় ইঙ্গিত ছিল। জন্ম-বিষয়ে ঠাট্টা করিলে মানুষ স্বভাবতই উত্তেজিত হয়।[৫৪]

অর্থিনী ঋতুস্নাতা উপেক্ষণীয়া নহে—ঋতুস্নাতা যে-কোনও স্ত্রীলোক

৫০ অস্মাকমপি তে জন্ম বিদিতং কমলেক্ষণে।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাত্তীক কুরূণাং বংশবৃদ্ধয়ে॥ ইত্যাদি। আদি ১২২।২৩-৩২

৫১ পত্যা নিযুক্তা যা চৈব পত্নী পুত্রার্থমেব চ।
ন করিষ্যতি তস্যাশ্চ ভবিষ্যতি তদেব হি॥ আদি ১২২।১৯

৫২ মমাপ্যেষ সদা মাদ্রি হৃদ্যর্থঃ পরিবর্ত্ততে।
ন তু ত্বাং প্রসহে বক্তুমিষ্টানিষ্টবিবক্ষয়া॥ আদি ১২৪।৭

৫৩ ভবতাঞ্চ যথা জন্ম তদপ্যাগমিতং ময়া॥ আদি ১৩৭।১৬

৫৪ পাণ্ডোঃ ক্ষেত্রোদ্ভবাঃ সুতাঃ॥ দ্রো ৩৮।২৫
যোহসৌ পাণ্ডোঃ কিল ক্ষেত্রে জাতঃ শক্রেণ কামিনা দ্রো ৭২।৪

কোন পুরুষকে প্রার্থনা করিলে উপেক্ষা করা পাপজনক বলিয়া মহাভারতে উক্ত হইয়াছে।[৫৫]

শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির পুত্রোৎপাদন উপরি-উক্ত শাস্ত্রানুশাসনের দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে।[৫৬]

বিধবা ক্ষত্রিয়াদের গর্ভে ব্রাহ্মণগণের, বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণার দাসীর গর্ভে দীর্ঘতমা-মুনির এবং অম্বিকার দাসীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পুত্রোৎপাদনও উল্লিখিত শাস্ত্রদ্বারাই সমর্থিত হইতে পারে। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই বিষয়ে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন— সমাগমার্থিনী নারীকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে, ইহা বামদেব্যব্রতে উল্লিখিত হইয়াছে। কামার্ত্ত পরদার-গমনে তেজস্বী পুরুষদের পাতক না হইতে পারে, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে পরদাররতি দোষাবহ সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোকদেরও পরপুরুষ-সংযোগে পাপ জন্মে। তেজস্বীদের আচরণ সাধারণ-সমাজে অনুকরণীয় নহে।[৫৭]

বিধবার বিবাহ—বিধবা নারীদের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই উত্তম-কল্প। (সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে "নারী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) মহাভারতে বিধবার পত্যন্তর-গ্রহণের বিধানও দেখিতে পাই। পতির অভাবে দেবরকে পতিত্বে বরণ করিবার অনুকূলে দুই চারিটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।[৫৮] কিন্তু দেবরকে পতিত্বে বরণ করিবার কোন উদাহরণ মহাভারতে প্রদর্শিত হয় নাই। মহাভারতে পত্যন্তর-গ্রহণের কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। পুত্র-নিরূপণ প্রসঙ্গে 'পৌনর্ভব' পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। 'পৌনর্ভব' পুত্রের জননী একাধিকবার বিভিন্ন পতি গ্রহণ করিয়া থাকেন।[৫৯] নলরাজার নিরুদ্দেশের

৫৫ ঋতুং বৈ যাচমানায়া ন দদাতি পুমানৃতুম্।
ভ্রূণহেত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্ স ইহ ব্রহ্মবাদিভিঃ। ইত্যাদি। আদি ৮৩।৩৩-৩৫
প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ। আদি ১২২।৭

৫৬ পুত্রয়ামাস শর্ম্মিষ্ঠাং ধর্ম্মঞ্চ প্রত্যপাদয়ৎ। আদি ৮২।২৪

৫৭ দৃশ্যতে চ বেদে "ন কাঞ্চন পরিহরেৎ"। ইত্যাদি। নীলকণ্ঠ—আদি ১২২।৭-১৮

৫৮ নারী তু পত্যভাবে বৈ দেবরং কুরুতে পতিম্। অনু ৮।২২
উত্তমাদ্দেবরাৎ পুংসঃ কাঙ্ক্ষন্তে পুত্রমাপদি। আদি ১২০।৩৫
দেবরং প্রবিশেৎ কন্যা তপ্যেদ্বাপি তপঃ পুনঃ। অনু ৪৪।৫২
পত্যভাবে যথৈব স্ত্রী দেবরং কুরুতে পতিম্। শা ৭২।১২

৫৯ "পৌনর্ভবঃ পূর্ব্বমন্তেন ঊঢ়া" ইত্যাদি। নীলকণ্ঠ, আদি ১২০।৩৩

পর তাঁহার পত্নী দময়ন্তী অযোধ্যায় সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, "নলরাজা অনেকদিন হইতে নিরুদ্দিষ্ট, তিনি জীবিত আছেন কিনা জানা যায় না। সুতরাং দময়ন্তী আগামী কল্য অন্যকে পতিত্বে বরণ করিবেন।" সংবাদ পাইয়া অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণ তৎক্ষণাৎ দময়ন্তীর পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যদি নারীর পত্যন্তর-গ্রহণ সমাজে একান্তই অপ্রচলিত হইত, তাহা হইলে ঐ সংবাদ এবং ঋতুপর্ণের যাত্রার কোন সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না।[৬০]

এই সময়ে দময়ন্তী দুইটি সন্তানের জননী, অজাতপুত্রা নহেন। অতএব বুঝা যায়, তখনকার সমাজে বিবাহিতা পুত্রবতী নারীও ইচ্ছা করিলে কোন কোন অবস্থায় অপর পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিতেন।[৬১]

নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলূপী প্রথমতঃ কোনও নাগজাতীয় পুরুষকে বিবাহ করেন। তাঁহার স্বামী সুপর্ণকর্তৃক হৃত হইলে তিনি বৈধব্য অবলম্বন করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে থাকেন। অর্জ্জুন তীর্থযাত্রাকালে একদা গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বার) উপস্থিত হইয়া স্নান করিবার জন্য নদীতে অবতরণ করিলে উলূপী তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার পিতার পুরীতে লইয়া যান। অর্জ্জুনের রূপে মোহিত হইয়া তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে অর্জ্জুন সেই রাত্রি নাগরাজ-ভবনে অতিবাহিত করেন।[৬২] এই বর্ণনা হইতেও বুঝা যায়, অর্জ্জুন "ন কাঞ্চন পরিহরেৎ" সেই নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, উলূপীর পিতা অর্জ্জুনের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করেন। অর্জ্জুন কামার্ত্তা উলূপীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে ইরাবান্ নামক এক বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপাদন করেন।[৬৩] (কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন— উলূপী বিধবা ছিলেন না, তাঁহার স্বামী শুধু হৃত হইয়াছিলেন।) বিধবার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্রের উৎপাদন ব্যতীত এই কয়েকটি বিবাহের উদাহরণও মহাভারতে আছে।

---

৬০ সূর্য্যোদয়ে দ্বিতীয়ং সা ভর্ত্তারং বরয়িষ্যতি।
ন হি স জ্ঞায়তে বীরো নলো জীবতি বা ন বা॥ বন ৭০।২৬

৬১ হয়াংস্তত্র বিনিক্ষিপ্য সূতো রথবরঞ্চ তম্।
ইন্দ্রসেনাঞ্চ তাং কন্যামিন্দ্রসেনঞ্চ বালকম্॥ বন ৬০।২৩

৬২ আদি ২১৪ তম অঃ।

৬৩ অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্ নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥ ইত্যাদি। ভী ৯০।৭-৯

কলিযুগে নিষিদ্ধ—টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, বিধবাদের পত্যন্তর-গ্রহণ বা দেবরের দ্বারা সুতোৎপাদন কলিকালে বিহিত নহে, শাস্ত্রে নিষেধ করা হইয়াছে।[৬৪]

দাসীদের নৈতিক শিথিলতা—ধনিপরিবারে যে-সকল দাসী থাকিত, তাহাদের নৈতিক শুচিতা অতিশয় শিথিল ছিল। প্রভুর সহিত সর্ব্ববিধ সম্পর্কে তাহাদের যেন কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। অধিকাংশ পরিবারেই দাসীদের এই দুর্গতি দেখিতে পাই। বিশেষতঃ উৎসবাদিতে সুন্দরী দাসী দান আভিজাত্যেরই অন্যতম অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। ('নারী' প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।) পতির জীবদ্দশায় পত্যন্তর-গ্রহণ বা প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ দাসীদের পক্ষে সামাজিক হিসাবে দূষণীয় ছিল না। বিরাটসভায় কীচক-কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা সহৃদয় পাঠকমাত্রেরই বেদনাদায়ক। কীচকের নিকট দ্রৌপদীকে পাঠাইবার জন্য রাজমহিষীর ষড়যন্ত্র ততোধিক ন্যক্কারজনক। বিরাটরাজার ভীরুতা এবং অধর্ম্ম-পক্ষপাতিতাও এই উপলক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য। পরিচারিকাদের উপর নরপশুদের শ্যেনদৃষ্টির বিশেষ কোন প্রতিকার বিরাটের রাজ্যে ছিল, এরূপ মনে হয় না। অন্য কোথাও এরূপ জঘন্য চিত্র নাই।[৬৫]

কুরুসভায় দুঃশাসন-লাঞ্ছিতা পাঞ্চালীর প্রতি কর্ণের একটি উক্তি অত্যন্ত অশিষ্টোচিত বলিয়া মনে হয়। কর্ণ বলিয়াছেন—"হে সুন্দরি, পাণ্ডবগণ ত পরাজিত, তুমি ইচ্ছামত অন্য পতি বরণ কর। দাসীদের পক্ষে পত্যন্তর-সেবা মোটেই নিন্দনীয় নহে।"[৬৬] ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দুর্য্যোধনের (দ্রৌপদীকে) বাম উরু প্রদর্শনেও দাসীকে অপমানিত করার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।[৬৭] কর্ণের উক্তি শুনিয়া ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের উপর ভীষণ চটিয়া যান। অত্যন্ত রাগের মাথায়ও তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে, "সূতপুত্র পাঞ্চালীকে যাহা বলিতেছে, তাহা অশাস্ত্রীয় নয়। তোমার ব্যসনেই ত আজ এতসব অপ্রিয় কথা শুনিতে হইল।"[৬৮] বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, ভদ্র সমাজেও

৬৪ কলৌ দেবরাৎ সুতোৎপত্তের্নিষেধাৎ। নীলকণ্ঠ— অনু ৪৪।৫২

৬৫ বি ১৫শ ও ১৬শ অঃ।

৬৬ অবাচ্যা বৈ পতিষু কামবৃত্তির্নিত্যং দাস্তে বিদিতং তত্তবাস্তু। সভা ৭১।৩

৬৭ দ্রৌপদ্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ সব্যমূরুমদর্শয়ৎ। সভা ৭১।১২

৬৮ নাহং কুপ্যে সূতপুত্রস্য রাজন্ এষ সত্যং দাসধর্ম্মঃ প্রদিষ্টঃ। সভা ৭১।৭

পরিচারিকারা মানসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে পারিত না। এই বিষয়ে সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত পঙ্কিল ছিল। পরিচারিকাদের বিবাহ শুধু কথার কথা, তাহাদের সতীত্বের কোন মূল্য ছিল না। সাধারণ লোকের মনেও তাহাদের সতীত্বের কথা জাগিতই না।

বিচিত্রবীর্য্যের জ্যেষ্ঠা পত্নী অম্বিকা একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া আপনার বসনভূষণে সুসজ্জিত করিয়া পরিচারিকাটিকে শয়নমন্দিরে পাঠাইয়া দেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহে পরিচারিকা বিদুরের জননী হইলেন।[৬৯] মহাভারতের ঘটনারও বহু পূর্ব্বে বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণার ব্যবহারে অম্বিকার ব্যবহারের অনুরূপ পরিচয় পাই। তিনিও পতির আদেশ অমান্য করিয়া একজন স্বলঙ্কৃতা পরিচারিকাকে দীর্ঘতমা-মুনির শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দেন।[৭০] এই দুই রাজমহিষীর আচরণে অনুমান করা যায়, দাসীদের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ছিল না। তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সবই ছিল— "যথা নিযুক্তাস্মি তথা করোমি"। দাসীদ্বয়ের মধ্যে কেহই ত কিছুমাত্র আপত্তি জানান নাই। অপরাপর জড় বস্তুর মত পরিচারিকাদিগকেও ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকার প্রভুদের ছিল।

দাসীগণও প্রভুদের স্ত্রীরূপেই বিবেচিত হইতেন—বিদুরকে বলা হইয়াছে— 'কুরুবংশবিবর্দ্ধন'।[৭১]

দাসীর গর্ভজাত মহর্ষিপুত্র কেন "কুরুবংশজ" বলিয়া গণ্য হইলেন, এই প্রশ্ন প্রথমেই মনে জাগে। তবে কি দাসীগণও রাজাদের স্ত্রীরূপেই গৃহীত হইতেন? এই প্রশ্নের উত্তরও মহাভারতেই পাওয়া যায়। বিদুরজননী পরিচারিকাকে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্র (স্ত্রী) বলিয়া মহাভারত বর্ণনা করিয়াছেন।[৭২] সুতরাং অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, অন্তঃপুর-চারিণী পরিচারিকাগণও ধনিসমাজে সর্ব্ববিধ প্রসাদের পাত্রী ছিলেন।

---

৬৯ ততঃ স্বৈর্ভূষণৈর্দ্দাসীং ভূষয়িত্বাপ্সরোপমাম্।
প্রেষয়ামাস কৃষ্ণায় ততঃ কাশিপতেঃ সুতা। আদি ১০৬।২৪

৭০ স্বাং তু ধাত্রেয়িকাং তস্মৈ বৃদ্ধায প্রাহিণোত্তদা। আদি ১০৪।৪৬

৭১ জজ্ঞিরে দেবগর্ভাভাঃ কুরুবংশবিবর্দ্ধনাঃ। আদি ১০৬।৩২
বিদুরঃ কুরুনন্দনঃ। আদি ১১৪।১৪

৭২ এতে বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রে দ্বৈপায়নাদপি। আদি ১০৬।৩২
"ক্ষেত্রত্বং দাস্যা অপি ইত্যনেনৈব গম্যতে ইতি কেচিৎ।" নীলকণ্ঠ। আদি ১০৬।৩২

শর্ম্মিষ্ঠা যযাতিকে বলিয়াছিলেন—"মহারাজ, আপনি আমার সখীর পতি, সখীর পতিকে পতিত্বে বরণ করা অন্যায় নহে। আমি দেবযানীর দাসী; সুতরাং দেবযানীর ন্যায় আমিও আপনার অনুগ্রহ আশা করিতে পারি। দয়া করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করুন।"[৭৩] এই প্রার্থনার ভঙ্গীতেও বুঝা যায়, প্রভুব নিকট সন্তান কামনা করা দাসীর পক্ষে দূষণীয় ছিল না।

রক্ষিতা-পোষণ—গান্ধারী যখন প্রৌঢগর্ভা, তখন একজন বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যা করেন। তাঁহারই গর্ভে যুযুৎসুর জন্ম হয়। সেই মহিলা দাসীদের মধ্যে গণ্য ছিলেন—এরূপ কোন কথা মহাভারতে নাই। সামাজিক আচরণ হিসাবে এইসব উদাহরণকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইসকল ব্যবহার অনেকাংশে রক্ষিতাপোষণের মত।[৭৪]

পুরুষের একসঙ্গে একাধিক বিবাহ—পুরুষ ইচ্ছা করিলে একসঙ্গে একাধিক বিবাহ করিতে পারিতেন।

পত্নীবিয়োগে পুনর্ব্বিবাহ—পত্নীবিয়োগেও পুনর্ব্বিবাহে কোন বাধা ছিল না। উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষদের পক্ষে বহুপত্নীকতা দোষের নহে, তাহাতে ধর্ম্মহানি হয না।[৭৫] বিচিত্রবীর্য্য, পাণ্ডু এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার প্রত্যেকেরই একাধিক ভার্য্যা বর্ত্তমান ছিলেন। যুধিষ্ঠির গোবাসন-শৈব্যের দেবিকানাম্নী কন্যাকে স্বয়ংবরে লাভ করিযাছিলেন। শল্যের ভগিনী কালী, কাশীরাজ-দুহিতা বলন্ধরা এই দুইজনও ভীমের ভার্য্যা। ধৃষ্টকেতুর ভগিনী করেণুমতী নকুলের ভার্য্যা। মদ্ররাজসুতা বিজয়া এবং জরাসন্ধের দুহিতা সহদেবের ভার্য্যা ছিলেন। অর্জ্জুনের বহুবিবাহ সুবিদিত।[৭৬]

৭৩ সমাবেতৌ মতৌ রাজন্ পতিঃ সখ্যাশ্চ যঃ পতিঃ।
সমং বিবাহমিত্যাহুঃ সখ্যা মেঽসি বৃতঃ পতিঃ ॥ আদি ৮২।১৯
দেবযান্যা ভুজিষ্যাস্মি বশ্যা চ তব ভার্গবী।
সা চাহঞ্চ ত্বয়া রাজন্ ভজনীয়ে ভজস্ব মাম্ ॥ আদি ৮২।২১

৭৪ গান্ধার্য্যাং ক্লিশ্যমানায়ামুদরেণ বিবর্দ্ধতা।
ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজং বৈশ্যা পর্য্যচরৎ কিল ॥ ইত্যাদি। আদি ১১৫।৪১-৪৩

৭৫ ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ বহুপত্নীকতা নৃণাম্ ॥ আদি ১৫৮।৩৬
নাপরাধোঽস্তি সুভগে নরাণাং বহুভার্য্যতা ॥ অশ্ব ৮০।১৪
একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন। আদি ১৯৫।২৭

৭৬ আদি ৯৫ তম অঃ। আশ্র ২৫।১২। শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২২ অঃ।

একপত্নীকতার প্রশংসা— বহু পত্নী-গ্রহণ সমাজে প্রচলিত থাকিলেও একমাত্র পত্নী গ্রহণই প্রশস্ত—ইহা মহাভারতের অভিপ্রায়।[৭৭]

পত্নীদের প্রতি সমান প্রীতিব্যবহার কর্ত্তব্য—একাধিক পত্নী থাকিলে সকলের প্রতি সমান প্রীতি-ব্যবহার করা উচিত, চন্দ্র ও দক্ষের উপাখ্যানের মধ্য দিয়া এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। চন্দ্রের সাতাইশ-জন ভার্য্যা ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি একজনকেই (রোহিণী) বেশী ভালবাসিতেন। সেই কারণে দক্ষের অভিশাপে তিনি যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া পড়েন।[৭৮]

প্রাচীন কাল হইতেই বহুপত্নীকতা প্রচলিত— অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমাজে বহুপত্নীকতা চলিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মার মানস পুত্র দক্ষ-প্রজাপতি মারীচ-কাশ্যপকে তেরটি এবং ধর্ম্মকে দশটি কন্যা দান করেন। এইরূপে তিনি চন্দ্রকে সাতাইশটি কন্যা দান করিয়াছিলেন।[৭৯]

দুশ্চরিত্রা ও অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী পরিত্যাজ্যা— অপ্রিয়বাদিনী এবং দুশ্চরিত্রা পত্নীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ—ইহা মহাভারতের উপদেশ। অপ্রিয়বাদিনীর সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেও তাহার ভরণপোষণ স্বামীকে করিতেই হইবে। দুশ্চরিত্রার ভরণপোষণ করিতে স্বামী বাধ্য নহেন। সেরূপ স্থলে স্বামীর ইচ্ছা হইলে করিতেও পারেন, না করিলেও ক্ষতি নাই।

প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা—সকল অবস্থাতেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ব্যভিচার-রূপ পাপে পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের প্রায়শ্চিত্ত সমান।[৮০]

বলাৎকারে স্ত্রীলোকের দোষ নাই— সমাজে সেই যুগে স্ত্রীজাতির উপর নরপশুদের পাশবিকতা যে একবারে ছিল না, তাহা নহে। ("নারী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) কোনও মহিলা ধর্ষিত হইলে সমাজে তাহার দণ্ডবিধান ছিল না, কিন্তু তাহার ভর্ত্তাকেই কাপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। চিরকারিকোপাখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে, নারীদের স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহারা

---

৭৭ শা ১৪৪ তম অঃ।

৭৮ শল্য ৩৫শ অঃ।

৭৯ শল্য ৩৫শ অঃ। শা ২০৭ তম অঃ।

৮০ ভার্য্যাং চাপ্রিয়বাদিনীম্। শা ৫৭।৪৫
স্ত্রিয়াস্তথাপচারিণ্যা নিষ্কৃতিঃ স্যাদদূষিকা। শা ৩৪।৩০
ভার্য্যায়াং ব্যভিচারিণ্যাং নিরুদ্ধায়াং বিশেষতঃ।
যৎ পুংসঃ পরদারেষু তদেনাং চারয়েদ্ ব্রতম্। শা ১৬৫।৬৩

পুরুষের অধীন। পুরুষ যদি তাহাদিগকে আপদ্-বিপদে রক্ষা করিতে না পারে, তবে সে পুরুষই নয়। পুরুষের অক্ষমতার জন্য নারীকে দোষ দেওয়া উচিত নহে।[৮১]

স্ত্রীর ভরণপোষণ করেন বলিয়া পুরুষকে বলা হয়—ভর্ত্তা, আর স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, এই কারণে তাহাকে বলা হয়—পতি। যদি কাহারও পত্নী দুর্ব্বৃত্তকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং পতি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে না পারেন, তবে বুঝিতে হইবে সেই পতি নিতান্তই কাপুরুষ, ভর্ত্তা বা পতি নামের অযোগ্য।[৮২]

স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে কঠোর শাস্তি—যদি কোনও নারী স্বেচ্ছায় পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাহার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। পতি ত তাহাকে ত্যাগ করিবেনই, অধিকন্তু রাজা কোনও প্রকাশ্য স্থানে সর্ব্বসমক্ষে কুকুর দ্বারা তাহাকে ভক্ষণ করাইবেন। স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণী স্ত্রী এবং পরদারধর্ষক ব্যভিচারী পুরুষকে উত্তপ্ত লৌহশয্যায় একত্র শয়ন করাইয়া বধ করান রাজার কর্ত্তব্য।[৮৩]

পরদার-গমনের নিন্দা ও পাপখ্যাপন—পুরুষের পক্ষেও পরদাররতি অত্যন্ত পাপজনক বলিয়া বহু স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। এত বড় আয়ুঃক্ষয়কর দুষ্কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। নানাবিধ নরক ও কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা দেখিলেই বুঝা যায়, এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিবার জন্য তাৎকালিক সমাজে কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা ছিল।[৮৪]

নারীর বহুপতিকতার প্রচলন ছিল না—পুরুষের এককালীন একাধিক বিবাহের মত নারীদেরও একই সময়ে একাধিক পুরুষকে পতিত্বে বরণ করার দৃষ্টান্ত বিরল।

৮১ নাপরাধোঽস্তি নারীণাং নর এবাপরাধ্যতি।
সর্ব্বকার্য্যাপরাধ্যত্বান্নাপরাধ্যন্তি চাঙ্গনাঃ॥ শা ২৬৫।৪০

৮২ ভরণাদ্ধি স্ত্রিয়ো ভর্ত্তা পাত্যাচ্চৈব স্ত্রিয়ঃ পতিঃ।
গুণস্যাস্য নিবৃত্তৌ তু ন ভর্ত্তা ন পুনঃ পতিঃ। শা ২৬৫।৩৭

৮৩ শ্রেয়াংসং শয়নং হিত্বা যান্যং পাপং নিগচ্ছতি।
শ্বভিস্তামর্দ্দয়েদ্ রাজা সংস্থানে বহুবিস্তরে॥ ইত্যাদি। শা ১৬৫।৬৪, ৬৫

৮৪ অনু ১০৪ তম অঃ। শা ১৬৫ তম অঃ।

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী, নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র—একমাত্র দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী গ্রহণকে নিয়মের ব্যভিচার বলা যাইতে পারে। কারণ, পাঁচ ভ্রাতাই পাঞ্চালীকে বিবাহ করিবেন, যুধিষ্ঠিরের মুখে কুন্তীদেবীর এই অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া দ্রুপদরাজা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠেন। দ্রুপদরাজা তখন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "তুমি শুচি ও ধর্ম্মজ্ঞ, তোমার মুখে এরূপ লোকবেদ-বিরুদ্ধ কথা? তোমার এই বুদ্ধিভ্রংশের কারণ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"[৮৫] সমাজে প্রচলন থাকিলে দ্রুপদরাজা নিশ্চয়ই এতটা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না। যুধিষ্ঠিরও জননীর আদেশের উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ প্রস্তাব করিতে পারিয়াছিলেন।[৮৬]

যুধিষ্ঠির দ্রুপদকে আরও বলিয়াছেন—"মহারাজ, ধর্ম্মের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম, আমরা তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"[৮৭] যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া দ্রুপদরাজা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়েন। ঠিক সেই সময়ে মহর্ষি ব্যাসদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাচীন যুগের দুইজন নারীর বহুপতিকত্বের উপাখ্যান দ্রুপদরাজার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাহাতেও দ্রুপদের সংশয় মিটিল না। তখন দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বিশদভাবে বিবৃত করিয়া তাঁহার পঞ্চ পতি প্রাপ্তির কারণ প্রদর্শন করিলেন। ব্যাসদেবের মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া পাঞ্চালরাজ সানন্দে পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেন।[৮৮]

অতি প্রাচীন যুগে জটিলা ও বার্ক্ষীর বহুপতিকতা—প্রাচীন যুগের যে দুইজন নারীর বহুপতিকত্বের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের একজনের নাম জটিলা এবং অপরের নাম বার্ক্ষী। জটিলা সাতজন ঋষিকে একসঙ্গে বিবাহ

৮৫ লোকবেদবিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ।
কর্ত্তুমর্হসি কৌন্তেয় কস্মাত্তে বুদ্ধিরীদৃশী॥ আদি ১৯৫।২৮
ন চাপ্যাচরিতঃ পূর্ব্বৈরয়ং ধর্ম্মো মহাত্মভিঃ॥ আদি ১৯৬।৮

৮৬ এবং প্রব্যাহৃতং পূর্ব্বং মম মাত্রা বিশাম্পতে। আদি ১৯৫।২৩
এবমেব বদত্যম্বা। আদি ১৯৫।৩০

৮৭ সূক্ষ্মো ধর্ম্মো মহারাজ নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্। আদি ১৯৫।২৯

৮৮ আদি ১৯৭ তম ও ১৯৮ তম অং।

করিয়াছিলেন, আর বার্ক্ষী প্রচেতা-নামের দশজন সংশিতব্রত পুরুষের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। সেই দশজন পরস্পর ভ্রাতা ছিলেন।[৮৯]

মাধবীর পর পর চারিবার বিবাহ—গালবোপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, যযাতি-কন্যা মাধবী পর পর চারিজন পুরুষকে বিবাহ করিয়াছিলেন।[৯০]

এইসকল প্রাচীন নিদর্শন থাকিলেও দ্রুপদের উক্তিতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, মহাভারতের ঘটনার সময়ে সমাজে মহিলাদের বহুপতিকতা সমর্থিত হইত না।

কুরু প্রভৃতি দেশে নারীদের বহুপতিকত্ব—কুরু প্রভৃতি উত্তর দেশে সেই সময়েও নারীদের মধ্যে বহু পুরুষকে পতিত্বে বরণ এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রথা কিছুটা প্রচলিত ছিল। কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।[৯১]

সকল পতিকে সমান-ভাবে না দেখা পাপের হেতু—সকল পতির প্রতি দ্রৌপদীর সমান ভাব ছিল না, অর্জ্জুনকেই তিনি মনে-প্রাণে পতিত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতকার এই পক্ষপাতিতাকে পাপের হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাঞ্চালীর প্রতি সকলের ভাল ধারণা ছিল না—দুঃশাসনের অভদ্র অত্যাচারের সময় কর্ণ বলিয়াছেন, "দেবতারা স্ত্রীলোকের একজন মাত্র ভর্ত্তার বিধান করিয়াছেন; দ্রৌপদী ত অনেকের পত্নী। সুতরাং ইনি 'বন্ধকী' (বেশ্যা)। একবস্ত্রা অথবা বিবস্ত্রা করিয়া ইহাকে রাজসভায় আনা দোষের নহে।"[৯২]

বহুপতিকতা নিষিদ্ধ—এক নারীর বহুপতি গ্রহণ যে অতিশয় গর্হিত

৮৯ শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।
ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাং বরা॥
তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৄনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ॥ আদি ১৯৬।১৪, ১৫

৯০ উ ১১৬।২১

৯১ উত্তরেষু চ রম্ভোরু। কুরুষদ্যাপি পূজ্যতে। আদি ১২২।৭

৯২ ইয়ং ত্বনেকপতিকা বন্ধকীতি বিনিশ্চিতা। ইত্যাদি। সভা ৬৮।৩৫, ৩৬
পক্ষপাতো মহানস্যা বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে। মহাপ্র ২।৬

সেই বিষয়ে কয়েকটি সুস্পষ্ট উক্তি মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে।[২৩] তাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দ্রৌপদীর বিবাহ সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তাহাকে সমর্থন করিতে গিয়া সুপ্রাচীন ব্যবহার, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল এবং সর্ব্বোপরি মায়ের আদেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইয়াছে। নিয়মের ব্যতিক্রম না হইয়া যদি সামাজিক ব্যবহার ঐরূপই হইত, তবে এত আশঙ্কা ও তাহার সমাধানের নিমিত্ত নানাপ্রকার কল্পনার প্রয়োজন ছিল না।

পাত্রনির্ব্বাচনে দরিদ্রের অনাদর—বিবাহের পাত্রনির্ব্বাচনে দরিদ্র চিরদিনই সমাজে উপেক্ষিত। পিতৃগণের আদেশে দারগ্রহণে ইচ্ছুক জরৎকারু বলিয়াছেন, "আমি দরিদ্র, কে আমাকে কন্যা দিবে?"[২৪] অগস্ত্যমুনি বিদর্ভরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কন্যা লোপামুদ্রাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন। মুনির প্রার্থনায় রাজা মহা মুস্কিলে পড়িলেন। বিফলমনোরথ হইলে মুনি অভিসম্পাত করিবেন, পক্ষান্তরে এরূপ দরিদ্রের হাতে কি করিয়া কন্যাকে দেওয়া যায়? পরে লোপামুদ্রার ইচ্ছানুসারে রাজা অগত্যা অগস্ত্যকে কন্যাদান করেন। দরিদ্রকে কন্যাদান করিতে অনেকেই ইতস্ততঃ করিতেন, সুদর্শনোপাখ্যানেও এই কথাই দেখিতে পাই।[২৫] সমাজের এই মনোভাব শাশ্বত। কেহই সমর্থপক্ষে দরিদ্রকে কন্যাদান করিতে চান না।

ধনীর কন্যা বিবাহ করিলে দরিদ্রের বিপত্তি—একদা ঋতুস্নাতা লোপামুদ্রা স্বামীকে বলিলেন, "আমার পিতৃগৃহে প্রাসাদে যেরূপ খাট ও শয্যায় আমি শয়ন করিতাম, সেইরূপ প্রাসাদে সেইরকমের খাট ও শয্যার

২৩. একো ভর্ত্তা স্ত্রিয়া দেবৈর্বিহিতঃ কুরুনন্দন। সভা ৬৮।৩৫
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ। আদি ১৯৫।২৭
ন হ্যেকা বিদ্যতে পত্নী বহূনাং দ্বিজসত্তম। আদি ১৯৬।৭
স্ত্রীণামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে। আদি ১৫৮।৩৬
নাপরাধোঽস্তি সুভগে নরাণাং বহুভার্য্যতা।
প্রমদানাং ভবত্যেষ মা তেঽভূদ্‌বুদ্ধিরীদৃশী। অশ্ব ৮০।১৪

২৪. দরিদ্রায় হি মে ভার্য্যাং কো দাস্যতি বিশেষতঃ। আদি ১৩।৩০

২৫. প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ প্রদাতুঞ্চৈব নৈচ্ছত। ইত্যাদি। বন ৯৭।৩-৭
দরিদ্রশ্চাসবর্ণশ্চ মমায়মিতি পার্থিবঃ।
ন দিৎসতি সুতাং তস্মৈ তাং বিপ্রায় সুদর্শনাম্। অনু ২।২২

ব্যবস্থা কর। তুমিও স্রক্চন্দনে বিভূষিত হও, আমাকেও দিব্য আভরণে অলঙ্কৃত কর। এই পবিত্র চীরকাষায় পরিধান করিয়া আমি তোমার সমীপে যাইতে ইচ্ছা করি না।" পত্নীর বাক্য শুনিয়া দরিদ্র অগস্ত্যমুনি মহা বিপদে পড়িলেন। স্ত্রীর অভিলাষও পূর্ণ করিতে হইবে, অথচ এই দিকে ঋতুর ষোল দিনের দুই-চারিদিন মাত্র অবশিষ্ট। মুনি ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে পত্নীর অভিলষিত বস্তু সংগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্মরক্ষা করেন।[৯৬] দরিদ্রের পক্ষে ধনীর কন্যা বিবাহের পরিণাম যে প্রায়ই আনন্দপ্রদ হয় না, এই উপাখ্যানে সেই উপদেশটি অতি স্পষ্ট।

সমান ঘরে সম্বন্ধাদি সুখকর—অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, যাহাদের আর্থিক অবস্থা এবং শিক্ষা-দীক্ষা সমান, তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা ভাল। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আদান-প্রদানের ফল ভাল নহে।[৯৭]

পত্নী বা শ্বশুরের গলগ্রহ হইলে দুঃখ—পত্নীর টাকাকড়ি নিজের কাজে খরচ করা এবং শ্বশুরের গলগ্রহরূপে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা সমাজে আজকালও যেমন খুব সুখের নহে, তখনকার সমাজেও এইরূপই ছিল। এই দুই উপায়ে ঘৃণ্য জীবন যাপন করা পুরুষের পক্ষে অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত হইত।[৯৮]

গর্ভাধানাদি-সংস্কার

দশ সংস্কার—বর্ণাশ্রমিসমাজে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম্ম, উপনয়ন এবং বিবাহ এই দশটি সংস্কার অতি প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গরূপে চলিয়া আসিতেছে। উপনয়ন শুধু দ্বিজাতির পক্ষে বিহিত। অপর নয়টি সংস্কার

---

৯৬ বন ৯৭ তম ও ৯৮ তম অঃ।

৯৭ যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমং শ্রুতম্।
তয়োর্ব্বিবাহঃ সখ্যঞ্চ নতু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ। আদি ১৩১।১০
সমৈর্বিবাহং কুরুতে ন হীনৈঃ। উ ৩৩।১২১

৯৮ ভার্য্যয়া চৈব পুস্তু। অনু ৯৪।২২।
শ্বশুরাৎস্ত বৃত্তিঃ স্যাং। " "

শূদ্রেরও আছে। একসময়ে সমাজে কন্যাদেরও উপনয়ন সংস্কার ছিল, কালে তাহা রহিত হইয়া যায়। মহাভারতে বিস্তৃতভাবে সকল সংস্কারের বর্ণনা পাওয়া যায় না। যে দুই চারিটির বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

ব্রাহ্ম সংস্কার, যজ্ঞ, দৈব সংস্কার, পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ এবং সোমসংস্থবর্গে মোট চল্লিশটি সংস্কারের উল্লেখ কোন কোন ধর্ম্মসূত্র ও স্মৃতিসংহিতায় করা হইয়াছে, কিন্তু মনু যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতির স্মৃতিগ্রন্থে দশটি সংস্কারেরই উল্লেখ আছে। চল্লিশটি সংস্কারবিষয়ে মহাভারতে কোন বর্ণনা নাই।

(ক) গর্ভাধান বা ঋতুসংস্কার—মহাভারতে গর্ভাধানের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গৃহ্যসূত্র এবং মন্বাদিস্মৃতির সহিত মহাভারতের বিধির কোন বিরোধ নাই। হোমের সময় বহ্নি যেমন কালের প্রতীক্ষা করেন, সেইরূপ ঋতুকালে স্ত্রীগণ পুরুষকে কামনা করেন। অতএব ঋত্বভিগমন প্রত্যেক বিবাহিতের ধর্ম্মকৃত্যের মধ্যে গণ্য। ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে যিনি স্ত্রীসম্ভোগে বিরত, তিনি গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত।[১]

ঋত্বভিগমনের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা—"কেবলমাত্র ঋতুকালে যাঁহারা সন্তান-কামনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সন্তানগণ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে, তাহারা ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ হয়। পশুপক্ষীরাও অতি প্রাচীন কাল হইতে অনৃতুতে প্রবৃত্ত হয় না, মানুষের কথা আর কি বলিব? আধিব্যাধিবিমুক্ত সন্তানের জনক হইতে ইচ্ছা থাকিলে সংযতচিত্তে শুধু ঋতুকালেই অভিগমন কর্ত্তব্য।"[২]

অনৃতুগমন নিন্দিত—ঋত্বভিগমন ধর্ম্মকৃত্যের অন্তর্গত। অন্য কালে স্বচ্ছন্দ বিহার মহাভারতের মতে অতিশয় নিন্দিত।[৩]

১ হোমকালে যথা বহ্নিঃ কালমেব প্রতীক্ষতে।
ঋতুকালে তথা নারী ঋতুমেব প্রতীক্ষতে॥ ইত্যাদি। অনু ১৬২।৪১, ৪২

২ স্বদারতুষ্টশ্চর্তুকালগামী। শা ৬১।১১
অভ্যগচ্ছন্ ঋতৌ নারীং ন কামান্নানৃতৌ তথা।
তথৈবান্যানি ভূতানি তির্য্যগ্‌যোনিগতান্যপি॥ ইত্যাদি। আদি ৬৪।১০-১২

৩ অভ্যগচ্ছন্ ঋতৌ নারীং ন কামান্নানৃতৌ তথা॥ আদি ৬৪।১০
ঋতুকালাভিগামী চ। অনু ১৪৩।২৯

ঋত্বনভিগমনে পাতক—সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপত্নীসম্ভোগ গৃহস্থের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ঋতুকালে স্ত্রীকে উপেক্ষা করিলে পাপ হয়।[৪] একটি পুত্রের জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিধান। পরে উপেক্ষায়ও পাপ হয় না।

ঋত্বভিগমনে ব্রহ্মচর্য্য স্খলিত হয় না—ঋত্বভিগমনে ব্রহ্মচর্য্যব্রত স্খলিত হয় না। গৃহীদের মধ্যেও যাঁহারা ব্রহ্মচারী, তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া আনন্দে জীবন অতিবাহিত করেন।[৫]

চতুর্থাদি রাত্রিতে অভিগমন—ঋতুমতী পত্নীকে তিন রাত্রি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে। চতুর্থ রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভাধানে বিহিত।

অযুগ্মে কন্যা এবং যুগ্মে পুত্রের জন্ম—অযুগ্ম রাত্রিতে গর্ভাধান হইলে সাধারণতঃ কন্যার এবং যুগ্ম রাত্রিতে গর্ভাধানে পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে।[৬]

সম্ভোগের গোপনীয়তা—অতিশয় নির্জ্জন স্থানে গোপনে মিলনের নিয়ম। সভ্য সমাজে এইসকল নিয়ম স্থান বা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না।[৭]

পরিত্যাজ্য কাল—অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী এবং রবিসংক্রান্তিতে সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়। এইগুলিকে পর্ব্বকাল বলে।

গ্রাম্যধর্ম্মং ন সেবেত স্বচ্ছন্দেনার্থকোবিদঃ।
ঋতুকালে তু ধর্ম্মাত্মা পত্নীমুপশয়েৎ সদা॥ অনু ১৪৩।৩৯
স্বদার-নিরতা যে চ ঋতুকালাভিগামিনঃ। অনু ১৪৪।১৩
ন চাপি নারীমনৃতাহ্বয়ীত। শা ২৬৮।২৭
নানৃতাবাহ্বয়েৎ স্ত্রিয়ম্। শা ২৪২।৭
অনৃতৌ মৈথুনং যাতু। অনু ৯৩।১২৪

৪ যাত্রার্থং ভোজনং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্॥ শা ১১০।২৩
স্বভার্য্যামৃতুকালেষু। ইত্যাদি। দ্রো ১৬।৩২

৫ ভার্য্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি চৈব হ। অনু ৯৩।১১
নান্যদা গচ্ছতে যস্তু ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তৎ স্মৃতম্। অনু ১৬২।৪৩
ব্রহ্মচর্য্যেণ জীবিতম্। অনু ৭।১৪

৬ স্নাতাং চতুর্থদিবসে রাত্রৌ গচ্ছেদ্বিচক্ষণঃ। ইত্যাদি। অনু ১০৪।১৫১, ১৫২

৭ মৈথুনং সততং গুপ্তমাহারঞ্চ সমাচরেৎ। অনু ১৬২।৪৭

পর্ব্বকালে স্ত্রী-সহবাসে পাপ হইয়া থাকে।[৮] দিনের বেলায় এবং রজোদর্শনের প্রথম তিন রাত্রিতে সহবাস একান্ত নিষিদ্ধ। এই নিষেধকে উপেক্ষা করিলে নানাবিধ রোগ জন্মে এবং অকালমৃত্যু হইয়া থাকে।[৯]

প্রথম তিন রাত্রি পরিত্যাগ—ঋতুকালে প্রথম তিন রাত্রির মধ্যে স্ত্রী-সহবাস গর্হিত। ঐ সময়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলাও পাপজনক। উক্ত হইয়াছে, যে-ব্যক্তি ঐ সময়ে পত্নীসহবাস করে, সে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়। সম্ভবতঃ কামুক পুরুষকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তই এরূপ শক্ত পাপের ভয় দেখান হইয়াছে।[১০]

গর্ভিণীগমন গর্হিত—গর্ভিণীগমনও অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।[১১]

অভিগমনের পর শুদ্ধি—ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগের পর স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হয়।[১২]

সহবাসকালে উৎকৃষ্ট সন্তানের কামনা—স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উৎকৃষ্ট সন্তানলাভের কামনা করিয়া থাকেন। সহবাসের সময়ে এই কামনা করা একান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই উৎকৃষ্ট সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা সমধিক। কারণ গর্ভাধানের পর গর্ভিণী সর্ব্বদাই গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন।[১৩]

---

৮ নাযোনৌ ন চ পর্ব্বসু। শা ২২৮।৪৫
পর্ব্বকালেষু সর্ব্বেষু ব্রহ্মচারী সদা ভবেৎ। অনু ১০৪।৮৯
অমাবস্যাং পৌর্ণমাস্যাং চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অষ্টম্যাং সর্ব্বপক্ষানাং ব্রহ্মচারী সদা ভবেৎ। অনু ১০৪।২৯

৯ ন দিবা মৈথুনং গচ্ছেন্ন কন্যাং ন চ বন্ধকীম্।
ন চাস্নাতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেত্তথায়ুর্বিন্দতে মহৎ॥ অনু ১০৪।১০৮

১০ উদকায়া চ সম্ভাষাং ন কুর্ব্বীত কদাচন॥ অনু ১০৪।৫৩
ন চাস্নাতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ। অনু ১০৪।১০৮
রজস্বলাসু নারীষু যো বৈ মৈথুনমাচরেৎ।
তমেষা যাস্যতি ক্ষিপ্রং ব্যেতু বো মানসো জ্বরঃ॥ শা ২৮১।৪৬

১১ ন চাজ্ঞাতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেদ্ গর্ভিণীং বা কদাচন॥ অনু ১০৪।৪৭

১২ মৈথুনেন সদোচ্ছিষ্টাঃ। অনু ১৩১।৪

১৩ দম্পত্যোঃ প্রাণসংশ্লেষে যোঽভিসন্ধিঃ কৃতঃ কিল।
তং মাতা চ পিতা চেতি ভূতার্থো মাতরি স্থিতঃ॥ শা ২৬৫।৩৪

অত্যাসক্তি নিন্দনীয়—যে ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাসকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করে ও পত্নীতে কামভাবে অত্যন্ত আসক্ত হয়, সেই ব্যক্তি নিতান্তই কাপুরুষ।[১৪]

উৎকৃষ্ট সন্তানলাভের নিমিত্ত তপস্যা—তপস্যা, দেবতার্চ্চন, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন্দনা, তিতিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, উপবাস, ব্রত প্রভৃতি সৎকার্য্যের দ্বারা জনক-জননী ধার্ম্মিক, সুশ্রী এবং দীর্ঘায়ুঃ সন্তান লাভ করিতে পারেন। কেবল ইন্দ্রিয়চরিতার্থতায় সুপুত্র লাভ হয় না। প্রজাপতি, ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে সৎপুত্র লাভ করিয়াছিলেন। সৎপুত্র-লাভের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের কঠোর তপস্যার কথা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে।[১৫]

পিতামাতার শুচিতার ফল—পিতামাতা হইতেই পুত্রের উৎপত্তি। মিলন সময়ে তাঁহাদের মানসিক অবস্থা দ্বারা সন্তানের মানসিক ভাব গঠিত হয়। সাধারণতঃ পিতামাতার পুণ্যবলেই সন্তান ধর্ম্মপরায়ণ হয়। সুতরাং জনকজননীর শুচিতা খুবই আবশ্যক, বিশেষতঃ সেইসময়ে

ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "সকল প্রাণীর মধ্যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কামরূপে আমিই অবস্থিত।" কাম-শব্দের অর্থ বাসনা। যে কামনাতে ধর্ম্মের ক্ষতি হয় না, তাহাই ভগবৎস্বরূপ। কোন কামনা ধর্ম্মের অনুকূল, আর কোন কামনা ধর্ম্মের বিরুদ্ধ, তাহা বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে। আসঙ্গলিপ্সা শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত হইয়াছে—ঋতুকালে পুত্রকামনায় প্রবৃত্ত হইবে—ইত্যাদি। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলভাবে শাস্ত্রের অনুশাসনকে উপেক্ষা না করিয়া সংযতভাবে কামের উপভোগ করা দূষণীয় নহে।[১৭]

১৪ সম্ভোগসংবিদ্বিষমঃ। উ ৪৩।১৯। উ ৪৫।৪
পানমক্ষাস্তথা নার্য্যঃ……প্রসঙ্গোঽত্র দোষবান্॥ শা ১৪০।২৬

১৫ বহুকল্যাণমিচ্ছন্ত ঈহন্তে পিতরঃ সুতান্।
তপসা দৈবতেজ্যাভির্বন্দনেন তিতিক্ষয়া॥ শা ১৫০।১৪। শা ৭।১৩, ১৪
এবংবিধস্তে তনয়ো দ্বৈপায়ন ভবিষ্যতি। শা ৩২৩।২৭
অনু ১৪শ অঃ।
আরাধ্য পশুভর্ত্তারং রুক্মিণ্যাং জনিতাঃ সুতাঃ॥ অনু ১৪।৩২

১৬ সুক্ষেত্রাচ্চ সুবীজাচ্চ পুণ্যো ভবতি সম্ভবঃ। শা ২৯৬।৪

১৭ ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ গী ৭।১১

সঙ্কলিত মহাভারতবচন হইতে বুঝা যায়, বংশের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সুসন্তান লাভ করিতে হইলে জনকজননীর সংযম ও তপস্যা চাই। উচ্ছৃঙ্খল মিলনে সুস্থ সবল সন্তান আশা করা যাইতে পারে না। এইজন্যই গর্ভাধান-সংস্কার সম্বন্ধে এত কথা বলা হইয়াছে।

গর্ভাধান-সংস্কার ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের হেতু—ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, "গর্ভাধান-সংস্কার ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের হেতু। ধার্ম্মিক সদ্‌বৃত্ত পুরুষ গর্ভাধানোক্ত বিধানে যদি সৎপুত্র কামনায় পত্নীসহবাস করেন, তাহা হইলে যোনি-সংস্কাররূপ ধর্ম্ম, পুত্ররূপ অর্থ এবং সম্ভোগ-রূপ কাম, এই তিনটিই লাভ করিতে সমর্থ হন। গর্ভাধান-সংস্কারের শুচিতার উপর সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। সংযমই উপভোগের প্রধান সহায়।"[১৮]

(খ) পুংসবন, (গ) সীমন্তোন্নয়ন—পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন সম্বন্ধে বিস্তৃত কোনও বর্ণনা করা হয় নাই। কিন্তু সমস্ত সংস্কারেরই নাম গ্রহণ করা হইয়াছে।[১৯]

(ঘ) জাতকর্ম্ম—সন্তান জন্মিলে পর যে বৈদিক সংস্কার করিবার নিয়ম, তাহার নাম জাতকর্ম্ম। মহাভারতে বহু স্থানে জাতকর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। পুত্র জন্মিলে যেরূপ জাতকর্ম্মের বিধান, কন্যার বেলায়ও সেই বিধান দেখিতে পাই। মহারাজ শান্তনু বন হইতে কুড়াইয়া কৃপ ও কৃপীকে আপন গৃহে আনয়ন করেন। উভয়েরই জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করা হয়। অশ্বপতি সাবিত্রীর জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিয়াছিলেন। শিখণ্ডীরও সমস্ত সংস্কারই করা হইয়াছিল। আরও অনেকের জাতকর্ম্ম সংস্কারের বর্ণনা আছে।[২০]

নবজাত সন্তানের কল্যাণে দান-দক্ষিণা—সন্তান জন্মিলে তাহার

১৮ যদা তে স্যুঃ সুমনসো লোকে ধর্ম্মার্থনিশ্চয়ে।
কালপ্রভবসংস্থাসু সজ্জন্তে চ ত্রয়স্তদা॥ শা ১২৩।৩ নীলকণ্ঠ দ্রঃ।

১৯ ভর্ত্রা চৈব সমাযোগে সীমন্তোন্নয়নে তথা। শা ২৬৫।২০ নীলকণ্ঠ দ্রঃ।

২০ ততস্তস্য তদা রাজা পিতৃকর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। ইত্যাদি। আদি ৭৪।১১৯
জাতকর্ম্মাদিসংস্কারং কণ্বঃ পুণ্যকৃতাং বরঃ। আদি ৭৪।৩
জাতকর্ম্মাদিকাস্তস্য ক্রিয়াঃ স মুনিসত্তমঃ। আদি ১৭৮।২
সংস্কারৈঃ সংস্কৃতাস্তে তু। আদি ১০৯।১৮
অথাপ্রবন্তো বেদোক্তান্ সংস্কারান্ পাণ্ডবাস্তদা। আদি ১২৮।১৪

কল্যাণ কামনায় নানাবিধ দান-দক্ষিণা করা হইত। তখন আনন্দমুখর গৃহ হইতে কেহই রিক্ত হস্তে ফিরিত না।[২১]

শিশুকে আশীর্ব্বাদী প্রদান—আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা নবজাত শিশুর মুখ দেখিতে ধনরত্ন একটা কিছু আশীর্ব্বাদী দিতেন।[২২] এই রীতি এখনও সমাজে অব্যাহত আছে।

(ঙ) নামকরণ—শিশুদের নামকরণও একটি বৈদিক সংস্কার। জন্মের একাদশ বা দ্বাদশ দিনে ঐ সংস্কার করার বিধান। মহাভারতে এই সংস্কারও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নাই। দুই এক স্থানে অতি সংক্ষিপ্তরূপে বলা হইয়াছে।[২৩]

(চ) নিষ্ক্রমণ, (ছ) অন্নপ্রাশন—নিষ্ক্রমণ ও অন্নপ্রাশন সম্বন্ধে উল্লেখ না থাকিলেও জাতকর্ম্মাদি শব্দে "আদি" শব্দের দ্বারা এই দুইটি গৃহীত হইয়াছে।

(জ) চূড়াকর্ম্ম, (ঝ) উপনয়ন—চূড়া ও উপনয়ন সংস্কারের বিস্তৃত বর্ণনা মহাভারতে নাই। শুধু নাম গ্রহণ করা হইয়াছে।[২৪]

(ঞ) বিবাহ—বিবাহ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করা হইয়াছে।

গোদান—দশ সংস্কারের মধ্যে যদিও গোদানের স্থান নাই, তথাপি

স হি মে জাতকর্ম্মাদি কারয়ামাস মাধব। উ ১৪১।৯। শা ২৩৩।২। আদি ২২১।৭১

আদি ২২১।৮৭। উ ১৯০।১৯।অনু ৯৫।২৬

ততঃ সংবর্দ্ধয়ামাস সংস্কারৈশ্চাপ্যযোজয়ৎ। আদি ১৩০।১৮

ক্রিয়াশ্চ তস্যা মুদিতশ্চক্রে স নৃপসত্তমঃ। বন ২৯২।২৩। উ ১৯০।১৯

২১ যস্মিন্ জাতে মহাতেজাঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অযুতং গা দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদান্নিষ্কাংশ্চ ভারত॥ আদি ২২১।৬৯

২২ তস্য কৃষ্ণো দদৌ হৃষ্টো বহুরত্নং বিশেষতঃ
তথান্যে বৃষ্ণিশার্দ্দূলাঃ…। অশ্ব ৭০।১০

২৩ অভিমন্যুমিতি প্রাহুরার্জ্জুনিং পুরুষর্ষভম্। আদি ১২১।৬৭
নাম চাস্যাকরোৎ প্রভুঃ। অশ্ব ৭০।১০

২৪ জাতকর্ম্মাণ্যানুপূর্ব্ব্যাৎ চূড়োপনয়নাদি চ
চকার বিধিবদ্ ধৌম্যস্তেষাং ভরতসত্তম। আদি ২২১।৮৭
জাতকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ব্রতোপনয়নানি চ। অনু ৯৫।২৫
ক্রিয়া স্যাদাসমাবৃত্তেরাচার্য্যে বেদপারগে। শা ২৩৩।২

"গোদান" নামে একটি বৈদিক ক্রিয়া ছিল। কেশচ্ছেদন তাহার মুখ্য অঙ্গ। গো-শব্দের এক অর্থ 'কেশ', এবং দান শব্দের এক অর্থ 'ছেদন'।[২৫]

উপকর্ম্ম—উপকর্ম-নামক আরও একটি বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। গৃহ্যবিহিত সমস্ত সংস্কারের বাহিরে বলিয়া তাহার নাম "উপকর্ম্ম"। পিতা প্রবাস হইতে গৃহে আসিয়া পুত্রের মাথায় হাত দিয়া কতকগুলি মন্ত্র জপ করিতেন। ঐ জপ উপকর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।[২৬]

নারী

নারী-সম্বন্ধে যে-সকল বর্ণনা দেখিতে পাই, আপাতদৃষ্টিতে সেইগুলিকে পরস্পর অতিশয় বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। অনেক স্থলে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নারীকে নরকের দ্বারও বলা হইয়াছে, আবার স্বর্গারোহণের সোপানরূপেও কল্পনা করা হইয়াছে।

নারী ও পুরুষ দুই-এর মিলনেই গৃহস্থের সংসার। গার্হস্থ্য-নির্ব্বাহে নারীকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের অধিকারকে মহাভারতে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে অধিকারের ক্ষেত্র অস্বাভাবিক প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়। হস্তিনারাজ্যের কোষের ভার দ্রৌপদীর উপর ন্যস্ত করা, প্রকাশ্য মন্ত্রণা-সভায় গান্ধারীর সাহচর্য্য প্রভৃতিকে উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কর্ম্মক্ষেত্রের দিক দিয়া নারীদের ও পুরুষদের মধ্যে অনেক বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও একের কর্ম্মে অপরের সহায়তাকে বিশেষভাবে স্বীকার করা হইয়াছে।

পুত্র ও কন্যার সমতা—সমস্ত মহাভারতের আলোচনায় কোনও উদাহরণে তাৎকালিক সমাজে কন্যাকে একটা দুঃসহ বোঝা বলিয়া দেখা যায় না। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে জনকের মুখে চিন্তাকালিমার একটি ছবিও নাই। কোনও ব্রাহ্মণকুমারীর কথায় কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়—"কৃচ্ছ্রন্তু দুহিতা কিল"।[১] রামায়ণের ঋষি আক্ষেপ করিয়াছেন—"কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি

২৫ গোদানানি বিবাহশ্চ। অনু ৯৫।২৫

২৬ জাতকর্ম্মণি যৎ প্রাহ পিতা যচ্চোপকর্ম্মণি॥ শা ২৬৫।১৬

১ আদি ১৫৯।১১

সর্ব্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিনাম্”।[২] মহাভারতীয় সমাজে কন্যার জন্ম কোন-প্রকার করুণ রসের আলম্বন ছিল, তাহা মনে হয় না। দুহিতাকে কেন যে কৃচ্ছ-স্বরূপ বলা হইল, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। আলোচনায় বিপরীত চিত্রই দেখিতে পাই।

নারীর স্থানবিচারে প্রধান বিষয় চরিত্র—তখনকার নারীরা ছিলেন পুরুষের পরিপূরক, তাঁহারা ছিলেন কর্ম্মসঙ্গিনী। সর্ব্বত্র নারীর সহযোগিতাই দেখা যায়। নারীর অজ্ঞতায় কোথাও পুরুষের অগ্রগতি প্রতিহত হয় নাই। গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সত্যভামা, বিদুলা প্রমুখ রমণীগণের চরিত্রে যে ওজস্বিতা ও কমনীয়তার সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কালের নারীর স্থান বিচার করিতে তাহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। অবশ্য সকল নারীই সেইরূপ তেজস্বিনী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন তাহা বলা চলে না। কারণ সাধারণ সমাজের বা সমাজের নিম্ন স্তরের নারীদের সম্বন্ধে কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। সেরূপ স্থলে নারীদের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে যে-সকল বিধিনিষেধ ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে অনুমান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। মহাভারতে যে-সকল নারীর চরিত্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, কেবল নারীত্বের মধ্যে তাঁহাদের পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে তাঁহাদের পরিচয়। তাঁহাদের পূর্ণতা ও মহিমা অতি উচ্চ ধরণের।

কন্যারও জাতকর্ম্মাদি সংস্কার—পুত্র এবং কন্যার মধ্যে বড় একটা ইতরবিশেষ ছিল না। জাতকর্ম্মাদি সংস্কার পুত্রের বেলায় যেমন করা হইত, কন্যার বেলায়ও সেইরূপ। মহারাজ শান্তনু বন হইতে কুড়াইয়া কৃপ ও কৃপীকে (গৌতমের পুত্রকন্যা) আনিলেন এবং যথাশাস্ত্র তাঁহাদের নামকরণাদি সংস্কার করিলেন।[৩] মহারাজ অশ্বপতিও সাবিত্রীর জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিয়াছিলেন।[৪]

---

২ উত্তরকাণ্ড ৯।১১

৩ যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা। অনু ৪৫।১১

ততঃ সংবর্দ্ধয়ামাস সংস্কারৈশ্চাপ্যযোজয়ৎ।

প্রাতিপেয়ো নরশ্রেষ্ঠো মিথুনং গৌতমস্য তৎ। আদি ১৩০।১৮

৪ প্রাপ্তে কালে তু সুষুবে কন্যাং রাজীবলোচনাম্।

ক্রিয়াশ্চ তস্যা মুদিতশ্চক্রে চ নৃপসত্তমঃ। বন ২৯২।২৩

পিতৃগৃহে কন্যার শিক্ষা—বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে কন্যাদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। (‘শিক্ষা’ প্রবন্ধের স্ত্রীশিক্ষা-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। কোন কোন কুমারী পূজাঅর্চ্চাদিও করিতেন। পিতৃগৃহে গান্ধারীর শিবপূজার উল্লেখ করা হইয়াছে।[৫] কুন্তী ব্রাহ্মণ এবং অতিথিদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন।[৬]

দত্তক পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও দান করা—অপত্যহীন ব্যক্তি অপরের কন্যাকেও গ্রহণ করিতেন, সেই প্রথা যেন অনেকটা দত্তক গ্রহণের মত। যদুশ্রেষ্ঠ শূর তাঁহার কন্যা পৃথাকে আপন পিস্তুত ভাই কুন্তিভোজকে দান করিয়াছিলেন।[৭] কুন্তিভোজ তাঁহাকে আপন কন্যাজ্ঞানে প্রতিপালন করেন এবং স্বয়ংবর বিধানে তাঁহার বিবাহ দেন। কুন্তিভোজের কন্যা বলিয়া পৃথার নাম হইয়াছিল “কুন্তী।” পরে সর্ব্বত্র কুন্তীকে কুন্তিভোজের দুহিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[৮] তাই মনে হয়, পালিত কন্যাও যেন অনেকটা দত্তকের মত। কন্যাও যদি পুত্রের সমান আদর না পাইত, তবে কুন্তিভোজ হয়ত অন্যের কন্যাকে গ্রহণই করিতেন না। স্নেহবশতঃ গ্রহণ করাও বিচিত্র নহে।

পিতৃগৃহে বালিকার কাজকর্ম্ম—পিতৃগৃহে পারিবারিক কোন কোন কাজে কন্যারা বেশ সাহায্য করিতেন। ধীবরদুহিতা সত্যবতী পিতার আদেশে যমুনা নদীতে খেয়া নৌকায় খেয়ানীর কাজ করিতেন।[৯]

কুন্তীর অতিথিপরিচর্য্যার কথা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মহর্ষি কণ্ব

৫ অথ শুশ্রাব বিপ্রেভ্যো গান্ধারী সুবলাত্মজাম্।
আরাধ্য বরদং দেবং ভগনেত্রহরং হরম্ ॥ আদি ১১০।৯

৬ নিযুক্তা সা পিতুর্গেহে ব্রাহ্মণাতিথিপূজনে ॥ আদি ১১১।৪

৭ অগ্রজামথ তাং কন্যাং শূরোঽনুগ্রহকাঙ্ক্ষিণে।
প্রদদৌ কুন্তিভোজায় সখা সখ্যে মহাত্মনে ॥ আদি ১১১।৩

৮ নিযুক্তা সা পিতুর্গেহে ব্রাহ্মণাতিথিপূজনে। আদি ১১১।৪
দুহিতা কুন্তিভোজস্য পৃথা পৃথুললোচনা। আদি ১১২।১

৯ আজগাম তরীং ধীমাংস্তরিষ্যন্ যমুনাং নদীম্।
স তার্য্যমাণো যমুনাং মামুপেত্যাব্রবীত্তদা। আদি ১০৫।৮
সাঽব্রবীদ্দাশকন্যাস্মি ধর্ম্মার্থং বাহয়ে তরীম্। আদি ১০০।৪৮
পিতুর্নিয়োগাদ্ ভদ্রং তে দাশরাজ্ঞো মহাত্মনঃ। আদি ১০০।৪৯

ফল আহরণ করিতে যাইবার কালে শকুন্তলার উপর অতিথিসংকারের ভার দিয়া গেলেন। তাই দেখিতে পাই, দুষ্মন্ত সাড়া দিতেই তাপসীবেষধারিণী শকুন্তলা রাজাকে স্বাগত অভ্যর্থনা করিয়া পাদ্যাদি-প্রদানপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিতেছেন।[১০]

বিবাহকাল পর্য্যন্ত কন্যা পিতৃগৃহেই প্রতিপালিত হইতেন। বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে সাধারণতঃ বরপক্ষ হইতেই সম্বন্ধের প্রস্তাব চলিত।

কোন কোন কুমারীর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য—সাধারণতঃ সকল কন্যাই বিবাহিত হইয়া ঘরসংসার করিতেন। কেহ কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যকেও বরণ করিতেন। কুমারী-ব্রহ্মচারিণীর সংখ্যা খুব অল্প ছিল।

যোগিনী সুলভা—সুলভা-নামে একজন যোগিনী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। মোক্ষবিদ্যার আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন। মিথিলায় ধর্ম্মধ্বজ-নামক জনক-রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি যে যোগৈশ্বর্য্য ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মোক্ষধর্ম্মে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি প্রথমতঃ ভিক্ষুকীর বেশে মিথিলার রাজসভায় প্রবেশ করেন। রাজা তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যে এবং যোগজ-দিব্যকান্তি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হন। যোগিনী সুলভা ধর্ম্মধ্বজকর্ত্তৃক যথারীতি অর্চ্চিত হইয়া রাজার যোগশক্তি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যোগ-বন্ধের দ্বারা নিজের বুদ্ধ্যাদি বৃত্তিকে রাজার বুদ্ধ্যাদি বৃত্তির সহিত যুক্ত করিয়া রাজাকে নিশ্চল করিতে চেষ্টা করিলেন। রাজাও যোগপ্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিচলিত না হইয়া নানা অপ্রিয় প্রশ্নে সুলভাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুলভার মোক্ষশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধায় শির অবনত করিলেন। সুলভা রাজার নিকট আপন পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "রাজন্, আমি প্রধান-নামক রাজর্ষির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি ব্রহ্মচারিণী, আমার উপযুক্ত ভর্ত্তা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি গুরুগণ হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছি এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া একাকিনী ভ্রমণ করিতেছি। আমি লোকমুখে শুনিয়াছি, আপনি মোক্ষধর্ম্মে নিষ্ণাত, এইকারণে আপনার সহিত দেখা করিবার উদ্দেশ্যে মিথিলায় আসিয়াছি।"[১১]

---

১০ শ্রুত্বাথ তস্য তং শব্দং কন্যা শ্রীরিব রূপিণী।
নিশ্চক্রামাশ্রমাৎ তস্মাৎ তাপসীবেষধারিণী। ইত্যাদি। আদি ৭১।৩-৫

১১ শা ৩২০ তম অঃ।

তপস্বিনী শাণ্ডিল্যদুহিতা—প্রাচীন কালে কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটে একটি সিদ্ধ আশ্রম ছিল। শাণ্ডিল্যদুহিতা সেখানে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। তিনিও কৌমার-ব্রহ্মচারিণী ছিলেন।[১২]

সিদ্ধা শিবা—শিবা-নাম্নী বেদপারগা একজন ব্রাহ্মণদুহিতা সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেন। ইনিও ব্রহ্মচারিণী।[১৩]

নারীর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিকূলে একটি উদাহরণ—শল্যপর্ব্বে সারস্বতোপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, কুণির্গর্গঋষির কন্যা বার্দ্ধক্যকাল পর্য্যন্ত তপস্যায় অতিবাহিত করিতেছিলেন। এত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সুতরাং জীর্ণ কলেবর ত্যাগ করিয়া পরলোকগমনে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তাঁহাকে দেহত্যাগে ইচ্ছুক জানিয়া নারদঋষি বলিলেন, "তুমি অসংস্কৃতা (অবিবাহিতা), কোনও উৎকৃষ্ট লোকে তোমার স্থান নাই।"[১৪] পরে সেই বৃদ্ধা তাপসী প্রাক্‌শৃঙ্গবান্‌-নামক ঋষিকুমারের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং অল্পকাল পরেই লোকান্তরিত হন। নারদের এই বিধানের প্রতিকূলেই উদাহরণের আধিক্য। সুতরাং এই বিধানকে স্বীকার করা চলে না।

নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—বিবাহের পূর্ব্বে এবং বৈধব্য ঘটিলে নারীদের সন্ন্যাসে অধিকার আছে।[১৫] এই উক্তি হইতেও বুঝা যায়, নীলকণ্ঠ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য সমর্থন করেন নাই। নীলকণ্ঠের সময়ে সম্ভবতঃ নারীদের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য সকলে পছন্দ করিতেন না। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বারাণসী প্রভৃতি তীর্থস্থানে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী যোগিনী নারী দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবাদিনী প্রভাসভার্য্যা—হরিবংশে দেখিতে পাই, অষ্টম বসু প্রভাসের

১২ অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী।
যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী॥ ইত্যাদি। শল্য ৫৪।৬-৮

১৩ অত্র সিদ্ধা শিবা নাম ব্রাহ্মণী দেবপারগা।
অধীত্য সাখিলান্ বেদান্ লেভে স্বং দেহমক্ষয়ম্॥ উ ১০৯।১৯

১৪ অসংস্কৃতায়াঃ কন্যায়াঃ কুতো লোকাস্তবানঘে॥ শল্য ৫২।১০

১৫ 'স্ত্রীণামপি প্রাগ্ বিবাহাদ্ বৈধব্যাদূর্দ্ধং বা সন্ন্যাসেঽধিকারোঽস্তি।' নীলকণ্ঠ টীকা—শা ৩২০।৭

ভার্য্যা, বিশ্বকর্ম্মার জননী (বৃহস্পতির ভগিনী) ব্রহ্মবাদিনী এবং যোগসিদ্ধা ছিলেন। তিনিও নানা দেশে পরিব্রাজিকার ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছেন।[১৬] এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে, জননী হইয়াও পরে নারী ইচ্ছা করিলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিতেন।

স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্য—স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য মহাভারতে স্বীকৃত হয় নাই। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইত। অবশ্য যাঁহারা চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদের বেলা এই নিয়ম খাটিত না।[১৭]

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পিত্রালয়াদিতে সাময়িকভাবে গমন—বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণ স্বামিগৃহে বাস করিতেন, এই ছিল সাধারণ নিয়ম কারণাধীন সময় সময় পিত্রালয়ে এবং আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতেও যাতায়াত চলিত। পাণ্ডবেরা যখন বনে যাত্রা করেন, তখন সুভদ্রা-প্রমুখ নারীগণ পুত্রকন্যাদি সহ স্ব স্ব পিত্রালয়ে গমন করেন। তাঁহাদের ভ্রাতারা তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন।[১৮] কৃষ্ণ বনে পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সত্যভামা তাঁহার সহচরী ছিলেন।[১৯]

দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস নিন্দিত—বিবাহিতাদের পক্ষে দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস করা লোকচক্ষে ভাল দেখাইত না।[২০]

১৬ বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী।
যোগসিদ্ধা জগৎ কৃৎস্নমসক্তা বিচচার হ॥ হরি পঃ ৩।১৬০

১৭ পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাশ্চ স্থাবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। অনু ৪৬।১৪। অনু ২০।২১
নাস্তি ত্রিলোকে স্ত্রী কাচিৎ যা বৈ স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ অনু ২০।২০
প্রজাপতিমতং হ্যেতন্ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। অনু ২০।১৪

১৮ রামমভিমন্যুঞ্চ রথমারোপ্য কাঞ্চনম্।
আরুরোহ রথং কৃষ্ণঃ পাণ্ডবৈরভিপূজিতঃ॥ ইত্যাদি। বন ২২।৪৭-৫১

১৯ উপাসীনেষু বিপ্রেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
দ্রৌপদী সত্যভামা চ বিবিশাতে তদা সমম্॥ বন ২৩২।১

২০ নারীণাং চিরবাসো হি বান্ধবেষু ন রোচতে।
কীর্ত্তিচারিত্রধর্ম্মঘ্নস্তস্মান্নয়ত মা চিরম্॥ আদি ৭৪।১২
বিপ্রবাসমলাঃ স্ত্রিয়ঃ। উ ৩৯।৮০। জ্ঞাতীনাং গৃহমধ্যস্থা। অনু ৯৩।১৩২

অনপত্যা বিধবাদের পিতৃগৃহে বাস—অনপত্যা নিরাশ্রয় বিধবাদের বেলায় পিতৃগৃহে থাকাই সমধিক প্রচলিত ছিল।[২১]

পাতিব্রত্যই আদর্শ সতীত্ব—পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপরে খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে সতীত্বের বর্ণনার বাহুল্য দেখিতে পাই। বিবাহিতা নারীর পরম ধর্ম্ম ছিল—পতিভক্তি। পতির পরিবারের সকলকে সন্তুষ্ট করা সতীর প্রধান কাজরূপে পরিগণিত হইত। তাই দেখা যায়, বিবাহের পরেই গান্ধারী সমস্ত কুরুবংশের সন্তুষ্টিবিধানে ব্যস্ত।[২২]

সতীত্ব পরম ধর্ম্ম—সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সত্যভামা, সুভদ্রা প্রমুখ নারীগণের চরিত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, আদর্শ সতীত্বের চিত্রই বেদব্যাস অঙ্কন করিয়াছেন। সতীত্ব রক্ষায়ই নারীর চরিত্র সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কি গৃহে, কি অরণ্যে, সর্ব্বত্রই নারী তাঁহার স্বামীর পরম সহায় এবং সহধর্ম্মিণী। নারীই গৃহলক্ষ্মী।

নারীর তেজস্বিতা—শকুন্তলা, গান্ধারী, কুন্তী এবং দ্রৌপদীর চরিত্রে অনন্যসাধারণ তেজস্বিতাও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শকুন্তলা—পুত্রসহ শকুন্তলা হস্তিনাপুরীতে দুষ্মন্তের সমীপে উপস্থিত হইলে দুষ্মন্ত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন স্ফুরমাণৌষ্ঠসম্পুটা শকুন্তলার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার তেজস্বিতার ব্যঞ্জক। তিনি রাজাকে তখন যে-সকল নীতিসঙ্গত উগ্র বাক্য শুনাইয়াছেন, ক্রোধের সময়েও সেইরূপ সুসঙ্গত সময়োপযোগী বাক্য প্রয়োগ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। তেজস্বিতার সহিত ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার এরূপ সম্মিশ্রণ শকুন্তলাচরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।[২৩]

বিদুলা—বিদুলা-নামে ক্ষাত্রধর্ম্মরতা দীর্ঘদর্শিনী এক নারীর কথা পাই। তাঁহার পুত্র সঞ্জয় সিন্ধুরাজকর্তৃক পরাভূত হইয়া নিতান্ত দীনভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। জননী পুত্রকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে নানা উদ্দীপক উপদেশ দিয়া কহিলেন, "পুত্র, তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তান, তুষাগ্নির ন্যায়

২১ ভগিনী চানপত্যা। উ ৩৩।৭৪

২২ গান্ধার্য্যাপি বরারোহা শীলাচারবিচেষ্টিতৈঃ।
তুষ্টিং কুরূণাং সর্ব্বেষাং জনয়ামাস ভারত॥ আদি ১১০।১৮

২৩ আদি ৭৪ তম অঃ।

মৃদু মৃদু জ্বলিও না, বেশী না পারিলে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দাবাগ্নির মত শিখ বিস্তার করিয়া জগৎকে দেখাও— তুমি ক্ষত্রিয়ের সন্তান। বীরত্ব প্রদর্শন ন করিতে পারিলে তোমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যে পুত্রের শৌর্য্যবীর্য্য নাই তাহাকে পুত্র বলিতে লজ্জা হয়।" বিদুলার পুত্রানুশাসন-অধ্যায় পা করিলে নিতান্ত অলস কাপুরুষেরও কর্ম্মপ্রেরণা জাগিবে।[২৪]

গান্ধারী—গান্ধারীও অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিলেন। দুঃশাসন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কুরুসভায় লাঞ্ছিত করিলে গান্ধারী ক্ষোভে ও লজ্জা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। পরে একদিন তিনি ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপস্থিত হইয় বলিলেন, "রাজন্, তুমি নিজের দোষে নিমজ্জিত হইও না, অশিষ্ট পুত্রদে প্রত্যেক আচরণের অনুমোদন করা তোমাতে শোভা পায় না। তুমি যুধিষ্ঠিরাদির পরামর্শ অনুসারে চল। ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর তোমার মন্ত্রী, তাঁহা বাক্য পালন কর। কুলপাংসন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ কর। মনে হইতেছে তোমার পুত্রস্নেহই এই বংশের বিনাশের কারণ হইবে। আর ভুল করিও না এবার কর্ত্তব্য স্থির কর, পুত্রস্নেহের আকর্ষণে ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিও না।"[২৫]

উভয় পক্ষের শান্তির নিমিত্ত পাণ্ডবদের দূতরূপে মাত্র পাঁচখানি গ্রা প্রার্থনা করিতে শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ সক কথাই ব্যর্থ হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে রাজ সভায় লইয়া আসিলেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন "রাজ্যকামুক ধর্ম্মার্থলোপী অশিষ্ট পুত্রকে তুমিই ত এত বাড়াইয়া তুলিয়াছ সেই পাপবুদ্ধির সকল দুরভিসন্ধি তুমিই অনুমোদন করিয়া থাক, আমার কথা ত কখনও কান দিলে না?" পরে তিনি বিদুরের দ্বারা দুর্য্যোধনকে রাজসভা আনাইয়া অনেক উপদেশও দিয়াছেন।[২৬]

কুন্তী—বিদুলার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কুন্তীই যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণের নিকট বলিয়াছিলেন, "দারিদ্র্য এবং মরণ একই কথা। ক্ষত্রিয়সন্তান শক্তি-সামর্থ্য সত্ত্বেও নির্বীর্য্যের ন্যায় অভিভূত হইয়া

২৪ উ ১৩৩ তম অঃ।

২৫ ত্বন্নেত্রাঃ সন্তু তে পুত্রাঃ মা ত্বাং দীর্ণাঃ প্রহাসিষুঃ।
তস্মাদয়ং মদ্‌বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ। ইত্যাদি। সভা ৭৫।৮-১০

২৬ উ ১২৯ তম অঃ।

থাকিবে, ইহা পরম বিস্ময়ের বিষয়। কৃষ্ণ, তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলিবে, আমি তাহাকে বিদুলার উপদেশবাক্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি, ক্ষত্রিয়সন্তান যুদ্ধে যেন ভীত না হয়।' আমি ক্ষত্রিয়কন্যা এবং ক্ষত্রিয়পত্নী; ক্ষত্রিয়-জননী বলিয়াও যেন পরিচয় দিতে পারি।"[২৭]

দ্রৌপদী—দ্রৌপদীর চরিত্রে যথেষ্ট কঠোরতাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার উক্তি-প্রত্যুক্তিতে ক্ষত্রিয়-রমণী-সুলভ মহাশক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাই।[২৮] দুর্দ্দান্ত লম্পট কীচককেও তিনি ভয় করেন নাই, তাঁহার প্রচণ্ড ধাক্কায় সেই হতভাগাকেও ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইতে হইয়াছিল।[২৯] তিনি সব দিক দিয়া একজন পরিপূর্ণ রমণী ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখ বিকাশের ছবি সারা মহাভারতকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। যুধিষ্ঠির যখন পাশাখেলায় তাঁহাকেও পণে হারিলেন, তখন দুঃশাসনের হাতে লাঞ্ছিতা হইয়াও তিনি ধৈর্য্য হারান নাই। যুধিষ্ঠিরের প্রতি দুই চারিটি কটুভাষা প্রয়োগ করা হয়ত তখন স্বাভাবিক ছিল। তাঁহার পাতিব্রত্য ছাড়া আর কোনও প্রবৃত্তি সেই স্বাভাবিক ইচ্ছাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। এ-হেন চিত্তবিকারের সময়েও তিনি বিকৃত হন নাই। বনবাসকালে অম্লানবদনে প্রভূত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রের ন্যায় মৃদুকঠোর নারীচরিত্র মহাভারতে আর একটিও নাই।

দ্রৌপদীকে পাশাখেলাতে পণ রাখায় নারীত্বের মর্য্যাদা (?)—সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান খুব উচ্চে ছিল, এই কথার সমর্থক উদাহরণ যদিও সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, তথাপি মোটামুটি বলিতে পারা যায়, স্ত্রীলোকের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইত। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশাখেলায় পণ রাখিয়াছিলেন। যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনের অনুরোধে তাহা করিয়া থাকেন, তবে কিছুই বলিবার নাই, বরং তাহাতে যুধিষ্ঠিরের সহিত দ্রৌপদীরও মহত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যথা এই আচরণের তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন।

ভার্য্যার প্রশংসা—ভার্য্যার প্রশংসা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে—ভার্য্যাই মানুষের অর্দ্ধেক শরীর, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখা, ভার্য্যাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের

২৭ দারিদ্র্যমিতি যৎ প্রোক্তং পর্য্যায়মরণং হি তৎ। ইত্যাদি। উ ১৩৪।১৩-৪১

২৮ অবজ্ঞানং হি লোকেঽস্মিন্ মরণাদপি গর্হিতম্। ইত্যাদি। বন ২৮।১২-৩৬

২৯ পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ। বি ১৬।৮

মূল।[৩০] যাঁহার ভার্য্যা সাধ্বী এবং পতিব্রতা, তিনি ধন্য। ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম, এই ত্রিবর্গ ভার্য্যার অধীন। সমস্ত কার্য্যেই ভার্য্যা পুরুষের পরম সহায়। রোগে শোকে পীড়িত পুরুষের ভার্য্যার সমান ভেষজ আর কিছুই নাই। যাহার গৃহে সাধ্বী প্রিয়বাদিনী ভার্য্যার অভাব, তাহার পক্ষে গৃহ এবং অরণ্যে কোন প্রভেদ নাই।[৩১] পত্নীর সাধুতাতেই পুরুষের জীবন মধুময় হইয়া উঠে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, সন্তান, পিতৃতৃপ্তি প্রভৃতি পত্নীর অধীন। ভার্য্যার প্রতি সদ্‌ব্যবহার করা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য।[৩২]

পত্নী মাতৃবৎ সম্মাননীয়া—ভার্য্যা শ্রী হইতে অভিন্ন, তাঁহার সহিত যোগ জন্মজন্মান্তরের। পত্নী মাতৃবৎ সম্মাননীয়া। গৃহস্থের আনন্দ ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই পত্নীর অধীন। সুতরাং পত্নীর প্রতি অসদ্‌ব্যবহার করা সমীচীন নহে।[৩৩]

স্ত্রীজাতির পূজ্যতা—স্ত্রীজাতি সর্ব্বথা পূজনীয়া। যে পরিবারে স্ত্রীলোকের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শিত হয়, দেবতাগণ সেই পরিবারে আনন্দে বাস করেন। স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বাবস্থায়ই পরম পবিত্র। যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান নাই, সেখানে সমস্ত শুভ আয়োজনই ব্যর্থ। যে পরিবারে স্ত্রীলোকগণ মনোদুঃখে অভিসম্পাত করেন, সেখানে সমস্ত শুভ কর্ম্ম বিনষ্ট হয়।[৩৪]

পরিবারে নারীর সম্মান—প্রত্যেক পরিবারেই গৃহলক্ষ্মীগণ বিশেষভাবে

৩০ অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥ আদি ৭৪।৪১

৩১ শা ১৪৪ তম অঃ।

৩২ ধর্ম্মকামার্থকার্য্যাণি শুশ্রূষা কুলসন্ততিঃ।
দারেষধীনো ধর্ম্মশ্চ পিতৄণামাত্মনস্তথা॥ অশ্ব ৯০।৪৭

৩৩ ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়া যুতাঃ। আদি ৭৪।৪২
শ্রিয়ঃ এতাঃ স্ত্রিয়ো নাম সৎকার্য্যা ভূতিমিচ্ছতা॥ অনু ৪৬।১৫
এতস্মাৎ কারণাদ্ রাজন্ পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যামিহ লোকে পরত্র চ॥ আদি ৭৪।৪৭
তস্মাদ্ ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্॥ আদি ৭৪।৪৮
সুসংরব্ধোঽপি রামাণাং ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং নরঃ।
রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি॥ আদি ৭৪।৫১

৩৪ পূজ্যা লালয়িতব্যাশ্চ স্ত্রিয়ো নিত্যং জনাধিপ।
স্ত্রিয়ো যত্র চ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ॥ অনু ৪৬।৫

সম্মানিত হইতেন। দ্রৌপদী সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের একটি উক্তি হইতে বুঝা যায় ধর্ম্মপত্নীদের স্থান কত উচ্চে ছিল। তিনি বলিতেছেন—"এই দ্রৌপদী আমাদের প্রিয়া ভার্য্যা, প্রাণ হইতেও গরীয়সী, ইনি মাতার ন্যায় পরিপাল্যা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় পূজনীয়া।"[৩৫] মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী প্রত্যেক পরিবারেই শ্রেষ্ঠ সম্মানের ও ভক্তির পাত্রী। তাই দুইজনের সঙ্গেই পত্নীর উপমা দেওয়া হইয়াছে। নকুল ও সহদেব পথশ্রমে ক্লান্ত দ্রৌপদীর পাদসংবাহন করিয়াছেন।[৩৬]

নারীর স্বভাবজাত গুণ—মৃদুতা, তনুতা এবং বিক্লবতা নারীদের সহজাত গুণ, ইহা ঋষিদের অভিমত।[৩৭]

পতিব্রতার আচরণ—নারী মধুর-স্বভাবা হইবেন, সুবচনা সুখদর্শনা ও অনন্যচিত্তা হইয়া স্বামীর ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিবেন। যিনি সর্ব্বদা স্বামীকে দেবতার মত জ্ঞান করেন, তিনিই ধর্ম্মভাগিনী হন। যিনি সর্ব্বদা পুত্রমুখ দর্শনের মত পতিমুখ দর্শনেও আনন্দ পান, তিনিই সাধ্বী। স্বামী সময় সময় কঠোর কথা বলিলেও যিনি প্রসন্নমুখে ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ পতিব্রতা।[৩৮] সাধ্বী রমণীগণ পতি ব্যতীত অপর কাহারও

পূজনীয়া মহাভাগাঃ পুণ্যাশ্চ গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ো গৃহস্যোক্তাস্তস্মাদ্ রক্ষ্যা বিশেষতঃ॥ উ ৩৮।১১
অপূজিতাশ্চ যত্রৈতাঃ সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
তদা চৈতৎ কুলং নাস্তি যদা শোচন্তি জাময়ঃ॥ অনু ৪৬।৬
জামীশপ্তানি গেহানি নিকৃত্তানীব কৃত্যয়া।
নৈব ভান্তি ন বর্দ্ধন্তে শ্রিয়া হীনানি পার্থিব॥ অনু ৪৬।৭

৩৫ ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা॥ বি ৩।১৭

৩৬ তস্যা যমৌ রক্ততলৌ পাদৌ পূজিতলক্ষণৌ।
করাভ্যাং কিণজাতাভ্যাং শনকৈঃ সংববাহতুঃ॥ বন ১৪৪।২০

৩৭ মৃদুত্বঞ্চ তনুত্বঞ্চ বিক্লবত্বং তথৈব চ।
স্ত্রীগুণা ঋষিভিঃ প্রোক্তা ধর্ম্মতত্ত্বার্থনিশ্চয়ে॥ অনু ১২।১৪

৩৮ সুস্বভাবা সুবচনা সুবৃত্তা সুখদর্শনা।
অনন্যচিত্তা সুমুখী ভর্ত্তুঃ সা ধর্ম্মচারিণী॥ ইত্যাদি। অনু ১৪৬।৩৫,৩৬
দৈবতং পরমং পতিঃ। অশ্ব ৯০।৫১। শা ১৪৫ তম অঃ—১৪৮ তম অঃ
পুত্রবক্ত্রমিবাভীক্ষ্ণং ভর্ত্তুর্বদনমীক্ষতে।
যা সাধ্বী নিয়তাহারা সা ভবেদ্ধর্ম্মচারিণী॥ ইত্যাদি। অনু ১৪৬।৩৮-৪২

উচ্ছিষ্টভোজন পাদপ্রক্ষালন প্রভৃতি করিবেন না। দময়ন্তী চেদীরাজপুরীতে এবং দ্রৌপদী বিরাটপুরীতে অবস্থানকালে এইসকল নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। (বন ৬৫।৬৮, ২৬৫।৩, বি ৯।১২)

পুত্র অপেক্ষাও স্বামী প্রিয়তর—যিনি দরিদ্র, দীন, ব্যাধিত, পথশ্রমে ক্লান্ত পতিকে পুত্রের মত আদর-যত্ন করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী। যিনি অন্নপ্রদানে কুটুম্বগণকে পোষণ করেন, কামে, ভোগে, ঐশ্বর্য্যে বা সুখে কখনও পতি ভিন্ন অন্য কাহারও চিন্তা করেন না, তিনিই ধর্ম্মচারিণী। সাধ্বী মহিলা পুত্র অপেক্ষাও স্বামীকেই বেশী ভালবাসেন।[৩৯]

তপস্বিনী গৃহিণী—অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া যিনি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন, গোময় দ্বারা গৃহাদির শুদ্ধিবিধান করেন, অগ্নিকার্য্য (পাক প্রভৃতি) করিয়া থাকেন, দেবতা ও অতিথির সেবায় সহায়তা করেন, পরিবারের সকলের আহারের পর নিজে অন্নগ্রহণ করেন, শ্বশ্রূ-শ্বশুরাদি গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী হন, তিনিই প্রকৃত তপস্বিনী।[৪০]

যিনি সরলা সত্যস্বভাবা, দেবতা ও অতিথির পরিচর্য্যায় আনন্দিতা হন, যিনি কল্যাণশীলা পতিব্রতা, শ্রী স্বয়ং সেই সতীলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন।[৪১] ইহাই ছিল সতীসাধ্বীর লক্ষণ। যিনি ইহার বিপরীত

৩৯ দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমধ্বনা পরিকর্শিতম্।
পতিং পুত্রমিবোপাস্তে সা নারী ধর্ম্মচারিণী॥ ইত্যাদি। অনু ১৪৬।৪৪,৪৫
পুত্রলোকাং পতিলোকং বৃণ্বানা সত্যবাদিনী।
প্রিয়ান্ পুত্রান্ পরিত্যজ্য পাণ্ডবাননুরুধ্যতে॥ উ ৯০।৪৪
কামং স্বপিতু বালোঽয়ং ভূমৌ মৃত্যুবশং গতঃ।
লোহিতাক্ষো গুড়াকেশো বিজয়ঃ সাধু জীবতু। অশ্ব ৮০।১৩

৪০ কল্যোত্থানরতির্নিত্যং গৃহশুশ্রূষণে রতা।
সুসংমৃষ্টক্ষয়া চৈব গোশকৃৎকৃতলেপনা॥
অগ্নিকার্য্যপরা নিত্যং সদা পুষ্পবলিপ্রদা।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং নির্ব্বাপ্য পতিনা সহ॥
শেষান্নমুপভুঞ্জানা যথান্যায়ং যথাবিধি।
তুষ্টপুষ্টজনা নিত্যং নারী ধর্ম্মেণ যুজ্যতে॥
শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা।
মাতাপিতৃপরা নিত্যং যা নারী সা তপোধনা॥ অনু ১৪৬।৪৮-৫১

৪১ সত্যস্বভাবার্জ্জবসংযুতাসু বসামি দেবদ্বিজপূজিকাসু। ইত্যাদি। অনু ১১।১১-১৪

আচরণ করিবেন, তাঁহার স্থান অতি নিম্নে। সমাজের চক্ষুতে তিনি অতিশয় হেয়।

শ্বশ্রূর অপবাদ প্রচার-করা, শ্বশ্রূকে গৃহকর্ম্মে নিয়োগ করা এবং স্বামীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করা অত্যন্ত গর্হিত। শপথ-প্রকরণে এইসকল পাপের উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎকালে শপথে বলা হইত, "যে নারী অমুক গর্হিত কাজ করিয়াছেন, তিনি স্বামীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করুন।" অর্থাৎ তাহাতেই পাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। কোনও সাধ্বীর মুখে এরূপ শপথ-বাক্য শুনিলে মনে করা হইত, এতবড় পাপের নামে (স্বামীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার) যেহেতু শপথ করিতেছেন, সুতরাং ইনি নিশ্চয়ই সেই গর্হিত কাজটি করেন নাই।[৪২]

সাংসারিক কর্ম্মে স্ত্রীলোকের দায়িত্ব—পারিবারিক সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা স্ত্রীলোকেরই কাজ ছিল। দ্রৌপদীসত্যভামা-সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে, সংসারের সমস্ত কাজেই দ্রৌপদীর একটা বিশেষ স্থান ছিল। তাঁহার উপর ভার দিয়াই পাণ্ডবেরা নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব কাজ করিতে পারিতেন।[৪৩]

পুরুষের বিকাশে নারীর সহায়তা—যদি এইসকল উদাহরণকে সেই কালের সমাজচিত্র-রূপে ধরা যায়, তবে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে—পুরুষের সম্পূর্ণ বিকাশ যে নারীর কর্ম্মকুশলতার উপর নির্ভর করে, মহাভারতে এই বিষয়ে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পতির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিণতিতে পত্নীর গৃহকর্ম্ম অপরিহার্য্য সহায় ছিল।

ভোজনাদির তত্ত্বাবধান—বিশেষতঃ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সমস্ত বিষয়ে তত্ত্ব লওয়া একমাত্র তাঁহাদেরই কাজ ছিল। ক্রিয়াকর্ম্মে নিজে অভুক্ত থাকিয়া সকলের খোঁজখবর লইতে এবং সুশৃঙ্খলায় সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতে তাঁহারা খুবই পটু ছিলেন।[৪৪]

---

৪২ শ্বশ্র্বাপবাদং বদতু ভর্ত্তুর্ভবতু দুর্ম্মনাঃ। অনু ৯৪।৩৮
নিত্যং পরিভবেচ্ছ্বশ্রূং ভর্ত্তুর্ভবতুদুর্ম্মনাঃ
একা স্বাদু সমশ্নাতু বিসস্তৈন্যং করোতি যা॥ অনু ৯৩।১৩১
যদা শ্বশ্রূং স্নুষা বৃদ্ধাং পরিচারেণ যোক্ষ্যতে। শা ২২৭।১১৩

৪৩ ময়ি সর্ব্বং সমাসজ্য কুটুম্বং ভরতর্ষভাঃ।
উপাসনরতাঃ সর্ব্বে ঘটয়ন্তি বরাননে॥ বন ২৩২।৫৪

৪৪ অভুক্তং ভুক্তবদ্বাপি সর্ব্বমাকুব্জবামনম্।
অভুঞ্জানা যাজ্ঞসেনী প্রত্যবৈক্ষদ্ বিশাম্পতে॥ সভা ৫২।৪৮

পাতিব্রত্যের ফলশ্রুতি—একস্থানে বলা হইয়াছে, যে নারী পতিশুশ্রূষা-রূপ ধর্ম্মপথ অবলম্বন করেন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকেও পূজিতা হন।[৪৫] পতিব্রতা স্ত্রীলোকের মাহাত্ম্য নানাভাবে চিত্রিত হইয়াছে। দেবতারাও যে লোক দেখিতে পান না, পতিব্রতা নারীগণ তাহাও দেখিতে পান।[৪৬]

সতীত্ব এক প্রকার যোগ—মহাভারত-আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, সতীত্ব এক প্রকার 'যোগ'। যৌগিক প্রক্রিয়ায় ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়, ইহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, সতীধর্ম্মের যথাযথ প্রতিপালনেও নারী অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হন। এই তথ্যটি বুঝাইবার নিমিত্ত অনেকগুলি উপাখ্যানের উল্লেখ করা হইয়াছে।

পতিব্রতার উপাখ্যান—বনপর্ব্বের পতিব্রতার উপাখ্যান তন্মধ্যে সমধিক যোগৈশ্বর্য্যের কথা প্রকাশ করে। উপাখ্যানটি এই—কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। একদিন বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদ আবৃত্তি করিতেছেন, এমন সময় একটি বক উপর হইতে ব্রাহ্মণের শরীরে মল ত্যাগ করিবামাত্র ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অমনি ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রাণশূন্য বকের শরীর নীচে পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণের ইহাতে অনুশোচনা হইল। তারপর তিনি ভিক্ষা করিয়া গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেছেন, একদিন কোনও গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবার জন্য বলিয়া বাসনপত্র পরিষ্কার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত পতি বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহকর্ত্রী ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিতে গিয়া দেখেন, ব্রাহ্মণ রাগে থরথর করিতেছেন। গৃহকর্ত্রী ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন। ব্রাহ্মণ শান্ত না হইয়া দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন। পতিব্রতা বলিলেন, "আমি ত বক নই, ক্রুদ্ধ হইয়াই আর কি করিবেন?"

৪৫ ইমং ধর্ম্মপথং নারী পালয়ন্তী সমাহিতা।
অরুন্ধতীব নারীণাং স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ অনু ১২৩।২০

৪৬. সন্তি নানাবিধা লোকা যাংস্ত্বং শক্র ন পশ্যসি।
পশ্যামি যানহং লোকানেকপত্ন্যশ্চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ অনু ৭৩।২

ব্রাহ্মণ পতিব্রতার অলৌকিক প্রত্যক্ষের কথা জানিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নিজের তপস্যার অসম্পূর্ণতা বুঝিতে পারিলেন এবং ক্রোধ জয় করিতে উপদেশ পাইয়া পতিব্রতার নির্দ্দেশ অনুসারে শাস্ত্রতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত মিথিলায় মাতৃপিতৃভক্ত ব্যাধের নিকট যাত্রা করিলেন। এই উপাখ্যানে দেখা যায়, পতিশুশ্রূষাতেই সেই রমণী অসাধারণ যৌগিক ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।[৪৭]

গান্ধারীকর্ত্তৃক কৃষ্ণকে অভিসম্পাত—এরূপ অসাধারণ বিভূতি পতিব্রতাদের নিতান্ত সহজপ্রাপ্যরূপে মহাভারতে বর্ণিত। পুত্রশোকে অধীরা গান্ধারী কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে শ্রীকৃষ্ণকে অভিসম্পাত করিলেন—"হে কৃষ্ণ, পাণ্ডব ও আমার পুত্রগণ পরস্পর কলহ করিতেছিল, তুমি ত ইচ্ছা করিলে নিবৃত্ত করিতে পারিতে? সমর্থ হইয়াও তুমি উপেক্ষা করিয়াছ। আমি অভিশাপ দিতেছি, তোমার জ্ঞাতিরা পরস্পর কলহে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তুমিও কুৎসিতভাবে নিহত হইবে। পতিশুশ্রূষায় আমি যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছি, সেই পুণ্যের জোরেই তোমাকে অভিসম্পাত করিলাম।"[৪৮]

আদিপর্ব্বের বশিষ্ঠোপাখ্যানেও দেখিতে পাই, একজন পতিব্রতার অশ্রুবারি অগ্নিতে পরিণত হইল।[৪৯]

দময়ন্তীকর্ত্তৃক ব্যাধভস্ম—দুঃখিতা দময়ন্তীর ক্রোধে লম্পট ব্যাধ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়াছিল।[৫০] সতীর অসাধারণ মাহাত্ম্য প্রকাশ করাই এইসকল উদাহরণের সার্থকতা। পাতিব্রত্য ধর্ম্মকে খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হইত সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ স্বর্গাদি ফলশ্রুতিও নারীসমাজকে পাতিব্রত্যে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত।

সাবিত্রীর উপাখ্যান—সাবিত্রীর উপাখ্যান সর্ব্বজনবিদিত। সতীত্বের শক্তিতে সাবিত্রী অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করিয়াছিলেন।[৫১]

৪৭ বন ২০৪ তম অঃ।

৪৮ পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জ্জিতম্।
তেন ত্বাং দুরবাপেন শপ্স্যে চক্রগদাধর॥ স্ত্রী ২৫।৪২

৪৯ তস্যাঃ ক্রোধাভিভূতায়া বাষ্পশ্রূণ্যপতন্ ভুবি।
সোঽগ্নিঃ সমভবদ্দীপ্তস্তঞ্চ দেশং ব্যদীপয়ৎ॥ আদি ১৮২।১৬

৫০ উক্তমাত্রে তু বচনে স তথা মৃগজীবনঃ।
ব্যসুঃ পপাত মেদিন্যামগ্নিদগ্ধ ইব দ্রুমঃ॥ বন ৬৩।৩৯

৫১ বন ২৯৬ তম অঃ।

সমাজের আদর্শ পাতিব্রত্য—নারীকে পতিব্রতা উত্তম গৃহিণীরূপে তৈয়ার করাই সমাজের আদর্শ ছিল। সর্ব্বত্র পতিব্রতামাহাত্ম্য এরূপভাবে কীর্ত্তন করা হইয়াছে যে, মনে হয়, তখনকার সমাজে গৃহলক্ষ্মীরূপে নারীকে পাওয়াই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। আর নারীদের আদর্শ ছিলেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, এবং গ্রামের পতিব্রতা কুলবধূ। এইসকল উপাখ্যানও একমাত্র সতী-ধর্ম্মের উদাহরণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

কল্যাণীয়াকে যেভাবে আশীর্ব্বাদ করা হইত— গুরুজন কল্যাণীয়াকে যেভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেন, তাহার একটা নমুনা আদিপর্ব্বে দেখা যায়। নববধূ দ্রৌপদী শ্বশ্রূ কুন্তীদেবীকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন—"ইন্দ্রাণী যেরূপ ইন্দ্রের অনুগতা, স্বাহা যেমন অগ্নির, রোহিণী যেমন সোমের, দময়ন্তী যেরূপ নলের, ভদ্রা যেরূপ বৈশ্রবণের, অরুন্ধতী যেরূপ বশিষ্ঠের এবং লক্ষ্মী যেরূপ নারায়ণের, তুমিও সেইরূপ ভর্ত্তৃচিত্তের অনুগামিনী হও। তুমি বীর পুত্রের জননী হও, বহু সুখসৌভাগ্যে কাল যাপন কর, সুভগা, পতিব্রতা এবং যজ্ঞপত্নী হও। পতিগণের দ্বারা নির্জ্জিত পৃথিবীর ধনরত্ন অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে দান কর।"[৫২] সেই নববধূই যখন পঞ্চ পতি সহ বনে যাত্রা করেন, তখন আবার কুন্তীদেবীই উপদেশ দিলেন—"বৎসে, এই মহৎ ব্যসনেও শোক করিও না, তুমি শীল এবং আচারে উৎকৃষ্টা, বিশেষতঃ স্ত্রীধর্ম্মে অভিজ্ঞা, পতিগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না। তুমি সাধ্বী, তোমাদ্বারা পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল উভয় কুলই অলঙ্কৃত হইয়াছে।"[৫৩]

---

৫২ যথেন্দ্রাণী হরিহয়ে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে॥
যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্ত্তৃষু॥ আদি ১৯৯।৫,৬
জীবসূর্বীরসূর্ভদ্রে বহুসৌখ্যসমন্বিতা।
সুভগা ভোগসম্পন্না যজ্ঞপত্নী পতিব্রতা॥ আদি ১৯৯।৭
পতিভির্নির্জ্জিতামুর্ব্বীং বিক্রমেণ মহাবলৈঃ।
কুরু ব্রাহ্মণসাৎ সর্ব্বামশ্বমেধে মহাক্রতৌ॥ আদি ১৯৯।১০

৫৩ বৎসে শোকো ন তে কার্য্যঃ প্রাপ্যেদং ব্যসনং মহৎ।
স্ত্রীধর্ম্মাণামভিজ্ঞাসি শীলাচারবতী তথা॥
ন ত্বাং সন্দেষ্টুমর্হামি ভর্ত্তৄন্ প্রতি শুচিস্মিতে।
সাধ্বী গুণসমাপন্না ভূষিতং তে কুলদ্বয়ম্॥ সভা ৭৯।৪,৫

অনুশাসন-পর্ব্বে গঙ্গাদেবীর প্রশ্নের উত্তরে উমা যেভাবে স্ত্রীধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয়, পাতিব্রত্যই ছিল স্ত্রীলোকের চরম লক্ষ্য। পতির ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সহায়তা করা নারীজীবনের পরম সার্থকতা। স্বামীকে দেবতার মত জ্ঞান করা স্ত্রীলোকের অতি উচ্চ আদর্শ। প্রত্যেকটি কথার মধ্যে একই সুর দেখিতে পাইতেছি।

অগ্নিসম্মুখে সহধর্ম্মিণীত্ব—পিতা ভ্রাতা প্রমুখ বন্ধুগণ যখন কন্যাকে বিবাহ দেন, তখন অগ্নিসমীপে (যজ্ঞে) নারী পতির সহধর্ম্মিণীরূপে স্থিরীকৃত হন।[৫৪]

স্বতন্ত্রভাবে যজ্ঞাদিতে অনধিকার—স্বতন্ত্রভাবে (পতিকে বাদ দিয়া) যাগযজ্ঞ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। একমাত্র পতিশুশ্রূষায়ও তাঁহারা স্বর্গগমনের অধিকারিণী হন, ইহা মহাভারতের অভিপ্রায়। স্বামীর অনুমতি পাইলে ব্রতোপবাসাদিতে অধিকার জন্মে।[৫৫]

শাণ্ডিলীসুমনা-সংবাদ—শাণ্ডিলীসুমনা-সংবাদেও সাধ্বী স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। সেখানেও দেখিতে পাই, শাণ্ডিলী সুমনাকে সতীধর্ম্ম বিষয়ে যে উপদেশ দিতেছেন তাহা ঠিক উল্লিখিত অনুশাসন পর্ব্বের ১৪৬ তম অধ্যায়ের উক্তির সমান। একমাত্র পতির শুশ্রূষা করিয়াই শাণ্ডিলী দেবলোকে স্থান পাইয়াছিলেন।[৫৬]

প্রোষিতভর্ত্তৃকার ব্যবহার—স্বামী যাহা ভালবাসেন না, তেমন কোন ব্যবহার করিতে নাই। মঙ্গলসূত্র ধারণ (?) করিয়া তাম্বূলাদিবর্জ্জনপূর্ব্বক স্বামীর ধ্যানে কাল কাটাইতে হয়। অঞ্জন, রোচনা, সুগন্ধি তৈল, ভালরূপে স্নান, মাল্য, গন্ধাদি অনুলেপন এবং অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য প্রোষিতভর্ত্তৃকার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ হইতে দূরে থাকিয়া কেবল স্বামীর কল্যাণ-চিন্তাতে রত থাকিতে হইবে।[৫৭]

৫৪ স্ত্রীধর্ম্মঃ পূর্ব্ব এবায়ং বিবাহে বন্ধুভিঃ কৃতঃ।
সহধর্ম্মচরী ভর্ত্তুর্ভবত্যগ্নিসমীপতঃ॥ অনু ১৪৬।৩৪

৫৫ নাস্তি যজ্ঞক্রিয়া কাচিন্ন শ্রাদ্ধং নোপবাসকং।
ধর্ম্মঃ স্বভর্ত্তৃশুশ্রূষা তয়া স্বর্গং জয়ন্ত্যত॥ অনু ৪৬।১৩
যথা পত্যাশ্রয়ো ধর্ম্মঃ স্ত্রীণাং লোকে সনাতনঃ॥ অনু ৫৯।২৯

৫৬ অনু ১২৩ তম অঃ।

৫৭ প্রবাসং যদি মে যাতি ভর্ত্তা কার্য্যেণ কেনচিৎ।
মঙ্গলৈর্বহুভির্যুক্তা ভবামি নিয়তা তদা॥ ইত্যাদি। অনু ১২৩।১৬,১৭

নারীর যুদ্ধ (?)—মহাভারতে নারীকে কোথাও যোদ্ধবেশে দেখা যায় না। শিখণ্ডীকে যদি নারীরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে এই একটিমাত্র উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু শিখণ্ডী ত পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিবাহিতাদের অন্তঃপুরে বাস ও অবরোধপ্রথা—বিবাহিতা নারীগণ সাধারণতঃ অন্তঃপুরেই বাস করিতেন। ভদ্র গৃহস্থসমাজে অবরোধপ্রথা সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল।[৫৮]

অন্যত্র গমনে অনুমতি গ্রহণ—বিবাহিতা মহিলাগণ সাময়িকভাবে পিত্রালয়ে যাইতে হইলে পতিগৃহের গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ করিতেন।[৫৯]

উৎসবাদিতে বহির্গমন—বিশেষ বিশেষ উৎসবাদিতে নারীরাও যোগ দিতেন।[৬০]

সম্ভ্রান্তঘরের মহিলাগণ শিবিকায় যাতায়াত করিতেন—শিবিকার ব্যবহার যথেষ্টই ছিল। মানুষই শিবিকা বহন করিত। এই নিয়ম এখনও বহু স্থানে প্রচলিত। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পাল্‌কি ও শিবিকার (ডুলি) ব্যবহার এখনও চলিতেছে।[৬১]

পুরুষগণও সঙ্গে থাকিতেন—উৎসবাদিতে বা অন্য কোন কারণে মহিলাগণ যখন বাহিরে যাইতেন, তখন পুরুষরাও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতেন। ব্রাহ্মণাদি সকল জাতীয় লোকের মধ্যেই এই নিয়ম ছিল। ধনিপরিবারের

৫৮ নগরাদপি যাঃ কাশ্চিদ্‌গমিষ্যন্তি জনার্দ্দনম্।
দ্রষ্টুং কন্যাশ্চ কল্যাণ্যস্তাশ্চ যাস্যন্ত্যনাবৃতাঃ॥ উ ৮৬।১৬
যা নাপশ্যংশ্চন্দ্রমসম্। আশ্র ১৫।১৩

৫৯ যুধিষ্ঠিরস্যানুমতে জনার্দ্দনঃ। অশ্ব ৫২।৫৫

৬০ শাতকুম্ভময়ং দিব্যং প্রেক্ষাগারমুপাগমৎ।
গান্ধারী চ মহাভাগা কুন্তী চ জয়তাম্বর।
স্ত্রিয়শ্চ রাজ্ঞঃ সর্ব্বাস্তাঃ সপ্রেষ্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥ আদি ১৩৪।১৫

৬১ ততঃ কন্যাসহস্রেণ বৃতা শিবিকয়া তদা।
পিতুর্নিয়োগাত্বরিতা নিশ্চক্রাম পুরোত্তমাৎ॥ আদি ৮০।২১
প্রাস্থাপয়দ্ রাজমাতা শ্রীমতীং নরবাহিনা॥
যানেন ভরতশ্রেষ্ঠ স্বন্নপানপরিচ্ছদাম্॥ বন ৬৯।২৩
দ্রৌপদীপ্রমুখাশ্চাপি স্ত্রীসঙ্ঘাঃ শিবিকাযুতাঃ। ইত্যাদি। আশ্র ২৩।১২
প্রেষয়িষ্যে তবার্থায় বাহিনীং চতুরঙ্গিনীম্। আদি ৭৩।২১

মহিলাদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত সেই সময়ে একজন অধ্যক্ষও নিযুক্ত হইতেন।[৬২]

মুনিঋষিদের সস্ত্রীক পর্য্যটন—লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক মুনিঋষিগণ দেশবিদেশে পর্য্যটন করিতেন, উপযুক্ত জিজ্ঞাসু পাইলে উভয়েই উপদেশ দিতেন।[৬৩]

সভাসমিতিতে নারীদের আসন—সভাসমিতিতে নারীদের বসিবার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হইত। কুরুপাণ্ডবের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যে প্রেক্ষাগার নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতেও মহিলাদের বসিবার নিমিত্ত একপাশে উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। গান্ধারী, কুন্তী, প্রমুখ মহিলাগণ সেই মঞ্চেই বসিয়াছিলেন।[৬৪]

সোমরস-পান—কুন্তীর একটি কথা হইতে জানা যায়, স্বামীর সহিত সোমরস পান করিবার অধিকারও স্ত্রীলোকের ছিল।[৬৫]

বানপ্রস্থ অবলম্বন—পরিণত বয়সে পুত্রবধূর উপর সংসারের ভার দিয়া কোন কোন মহিলা বানপ্রস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। সত্যবতী, কুন্তী, গান্ধারী, সত্যভামা প্রমুখ মহিলাগণের প্রব্রজ্যাগ্রহণের বিষয় বর্ণিত আছে।[৬৬]

৬২ মুহূর্ত্তোদিত আদিত্যে সর্ব্বে বালপুরস্কৃতাঃ।
সদারাস্তাপসান্ দ্রষ্টুং নির্যযুঃ পুরবাসিনঃ॥
স্ত্রীসঙ্ঘাঃ ক্ষত্রসঙ্ঘাশ্চ যানসঙ্ঘসমাস্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ সহ নির্জগ্মু র্ব্রাহ্মণানাঞ্চ যোষিতঃ॥ আদি ১২৬।১২,১৩
স্ত্র্যধ্যক্ষগুপ্তাঃ প্রযযুঃ। আশ্র ২৩।১২

৬৩ সাধ্বী চৈবাপ্যরুন্ধতী। অনু ৯৩।২১

৬৪ মঞ্চাংশ্চ কারয়ামাসুস্তত্র জানপদা জনাঃ।
বিপুলানুচ্ছ্রয়োপেতান্ শিবিকাশ্চ মহাধনাঃ॥ আদি ১৩৪।১২

৬৫ পীতঃ সোমো যথাবিধি। আশ্র ১৭।১৭

৬৬ বনং যযৌ সত্যবতী স্নুষাভ্যাং সহ ভারত। আদি ১২৮।১২
শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ কৃত্বা শুশ্রূষাং বনবাসিনোঃ।
তপসা শোষয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির কলেবরম্॥ আশ্র ১৭।২০
গান্ধারীসহিতো ধীমানভ্যানন্দদ্ যথাবিধি॥ আশ্র ১৫।২
সত্যভামা তথৈবান্যা দেব্যঃ কৃষ্ণস্য সম্মতাঃ।
বনং প্রবিবিশূ রাজন্! তাপস্যে কৃতনিশ্চয়াঃ॥ মৌ ৭।৭৪

উদ্দেশ্যের সফলতার নিমিত্ত তপস্যা—সুলভা, শিবা প্রমুখ ব্রহ্মচারিণীদের তপস্যার উদ্দেশ্য মোক্ষপ্রাপ্তি। প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কাশীরাজকন্যা অম্বা তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। অম্বা কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা, তিনি মনে মনে শাল্বপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম তাহা না জানিয়া অপর দুই ভগিনীসহ বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত অম্বাকেও লইয়া আসেন, পরে অম্বার মুখে তাঁহার সঙ্কল্প শুনিয়া বৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ এবং ধাত্রীকে সঙ্গে দিয়া অম্বাকে শাল্বপতির সমীপে পাঠাইয়া দেন। শাল্বপতি অম্বাকে অন্যপূর্ব্বা মনে করিয়া গ্রহণ করেন নাই। অম্বা ভীষ্মকেই তাঁহার এই দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করিয়া ভীষ্মনিধনের সঙ্কল্প করেন এবং তপস্যায় নিরত হন। তিনি কঠোর তপস্যার পরে যমুনাতীরে স্বহস্তে চিতা রচনা করিয়া দেহকে আহুতি দেন এবং জন্মান্তরে দ্রুপদদুহিতা শিখণ্ডি-রূপে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। পরে মহাদেবের বরপ্রভাবে পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হন।[৬৭]

স্ত্রীলোকের নিন্দা—সাধারণতঃ নারী সম্বন্ধে অনেক উচ্চ আলোচনা থাকিলেও মাঝে মাঝে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। নারদপঞ্চচূড়া-সংবাদে নারদের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চচূড়া নারীর যে স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, নারী সর্ব্বদোষের আকর। তাহাদের পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। মানুষের চরিত্রে যতপ্রকার দোষ থাকিতে পারে, সকল দোষই নারীর চরিত্রে আছে।[৬৮] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন, জন্মান্তরীয় পাপের ফলেই জীব স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করে।[৬৯] মাঝে মাঝে আরও দুই চারিটি জঘন্য উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।[৭০]

৬৭ উ ১৮৮ তম—১৯০ তম অঃ।

৬৮ অনু ৩৮শ অঃ।

৬৯ মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ভী ৩৩।৩২

৭০ ন হি স্ত্রীভ্যঃ পরং পুত্র পাপীয়ঃ কিঞ্চিদস্তি বৈ। অনু ৪০।৪
নিরিন্দ্রিয়া হ্যশাস্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি শ্রুতিঃ॥ অনু ৪০।১২
ঈপ্সিতশ্চ গুণঃ স্ত্রীণামেকস্যা বহুভর্ত্তৃতা॥ আদি ২০২।৮
অসত্যবচনা নার্য্যঃ কস্তে শ্রদ্ধাস্যতে বচঃ॥ আদি ৭৪।৭৩
স্ত্রীষু রাজসু সর্পেষু স্বাধ্যায়প্রভুশত্রুষু।
ভোগেষ্বায়ুষি বিশ্বাসং কঃ প্রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি॥ উ ৩৭।৫৭

বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত নারীদের নিন্দা—পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে বুঝা যায়, বিষয়বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত স্ত্রীজাতির নিন্দা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামনা ত্যাগের দ্বারা সংযম প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেওয়াই এইগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য। অসৎস্বভাবা স্ত্রীলোকের অশুচি মায়ার গণ্ডী হইতে দূরে থাকিবার নিমিত্ত উন্নতিকাম পুরুষকে সাবধান করাও এইসকল নিন্দার উদ্দেশ্য হইতে পারে। যদি যথাশ্রুত অর্থই ধরিয়া লওয়া হয়, তবে অন্যান্য প্রশংসামুখর অধ্যায়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখা শক্ত হইয়া পড়ে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ কামিনীকাঞ্চনের খারাপ দিক্‌টারই চিন্তা করেন, ইহাতে তাঁহাদের বিষয়াসক্তি শিথিল হয়। এই কারণে দেখিতে পাই, সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের অনেকেই কামিনী ও কাঞ্চনকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া উভয়েরই হেয়তা খ্যাপন করিয়া থাকেন এবং মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের উপদেশও তাঁহারা দিয়া থাকেন। এই দ্বিবিধ মতবাদ পরস্পরবিরোধী নহে। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে সংসারের আকর্ষণ হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্তই নারীজাতির নিন্দা করা হইয়াছে।

বিবাহাদিতে যৌতুকাদিরূপে নারীপ্রদান—বিবাহে যৌতুকস্বরূপ,[৭১] শ্রাদ্ধে দানীয় দ্রব্যরূপে,[৭২] এবং বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনায় উপঢৌকনরূপে[৭৩] অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সালঙ্কৃতা স্ত্রীলোক দান করা হইত। এই বিষয়ে মহাভারতে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি, যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিতে সোনা প্রভৃতির সঙ্গে স্ত্রীলোকও

দরিদ্রস্যেব যোষিতা। দ্রো ২৮।৪২
ন হি কার্য্যমনুধ্যাতি নারী পুত্রবতী সতী॥ আদি ২৩৩।৩১

৭১ তথৈব দাসীশতমগ্রযৌবনম্। আদি। ১৯৮।১৬
দ্বিসহস্রেণ কন্যানাং তথা শর্ম্মিষ্ঠয়া সহ॥ আদি ৮১।৩৭
স্ত্রীণাং সহস্রং গৌরীণাং সুবেশানাং সবর্চ্চসাম্॥ আদি ২২১।৪৯

৭২ সালঙ্কারান্ গজানশ্বান্ কন্যাশ্চৈব বরস্ত্রিয়ঃ॥ আশ্র ১৪।৪

৭৩ দদাম্যলঙ্কৃতাঃ কন্যা বসূনি বিবিধানি চ। বি ৩৪।৫
দাসানামযুতঞ্চৈব সদারাণাং বিশাম্পতে॥ সভা ৫২।২৯
রত্নান্যনেকান্যাদায় স্ত্রিয়োঽশ্বানায়ুধানি চ॥ অশ্ব ৮৫।১৮
নারীং চাপি বয়োপেতাং ভর্ত্রা বিরহিতাং তথা॥ শা ১৬৮।৩৩

দিয়াছিলেন।[৭৪] অবশ্য এই প্রথা রাজা-মহারাজাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যের পক্ষে এতবড় দান সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু এই প্রথার শেষ পরিণতি যে কি হইত তাহা কোথাও বলা হয় নাই। সেইসকল প্রদত্তা নারী সমাজে কিরূপ স্থান পাইতেন, প্রতিগ্রহীতাদের দ্বারা তাহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মিত কি না, জন্মিলে তাহাদেরই বা স্থান সমাজের কোন স্তরে ছিল, এইসকল বিষয়ে পরিষ্কার কোন আলোচনা নাই। ('বিবাহ'-প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য ৪৭শ পৃষ্ঠা।)

নারীধর্ষণ—তখনকার সমাজও লম্পটদের উপদ্রব হইতে মুক্ত ছিল না। স্বেচ্ছাচারী ধর্ষকের কলুষ দৃষ্টি হইতে প্রাপ্তবয়স্কা যুবতীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। বৃষ্ণি ও অন্ধককুলের হতবান্ধবা বিধবাগণকে হস্তিনায় আনয়নের পথে পঞ্চনদ প্রদেশে ম্লেচ্ছ দস্যুগণ আক্রমণ করিয়াছিল। স্বয়ং অর্জ্জুন তাঁহাদের রক্ষক ছিলেন, তিনিও রক্ষা করিতে পারেন নাই। দস্যুগণ সুন্দরী বিধবাগণকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিল। মহাবীর অর্জ্জুনের বীর্য্যও তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়াছিল।[৭৫]

দুশ্চরিত্রা নারী—সেই সময়েই অনেক নারী স্বেচ্ছায় দস্যুদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। অর্জ্জুন তাঁহাদিগকেও রক্ষা করিতে পারেন নাই, অথবা রক্ষা করিবার চেষ্টাও করেন নাই। বৃষ্ণ্যন্ধককুলের বিধবাগণের এই দুর্ম্মতি পাঠকগণকে বড় দুঃখ দেয়। একান্তই যদি পুরুষান্তর গ্রহণের প্রবৃত্তি থাকে, তথাপি অজ্ঞাতকুলশীল দস্যুদের অনুসরণ করিবার কি সার্থকতা থাকিতে পারে?[৭৬]

ধর্ষিতা নারীর স্থান—যে-সকল নারী নরপশুদের বলাৎকারে নিপীড়িত হইতেন, তাঁহারা সমাজে কোন-প্রকার নিন্দনীয় হইতেন না। সেরূপ স্থলে পরিবারস্থ পুরুষরাই নিজেদের অক্ষমতার জন্য অপরাধী হইতেন। পুরুষের

৭৪ রুক্মস্য যোষিতাঞ্চৈব ধর্ম্মরাজঃ পৃথগ্ দদৌ॥ সভা ৩৩।৫২

৭৫ অহঙ্কৃতাবলিপ্তৈশ্চ প্রার্থ্যমানামিমাং স্ত্রিয়ম্।
অযুক্তৈস্তৈব সম্বন্ধে কথং শক্ষ্যামি রক্ষিতুম্॥ আদি ১৫৮।১১
প্রেক্ষতস্ত্বেব পার্থস্য বৃষ্ণ্যন্ধকবরস্ত্রিয়ঃ।
জগ্মুরাদায় তে ম্লেচ্ছাঃ সমন্তাজ্জনমেজয়॥ মৌ ৭।৬৩

৭৬ কামাচ্চান্যাঃ প্রবব্রজুঃ। মৌ ৭।৫৯

অক্ষমতাহেতু যে-সকল নারী ধর্ষিতা হইতেন, তাঁহাদের প্রতি সমাজের সদয় দৃষ্টি ছিল।[৭৭] কিন্তু যে-সকল নারী স্বেচ্ছায় কলঙ্কিতা হইতেন, তাহাদের কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। (দ্রষ্টব্য "বিবাহ (খ)" ৫০তম পৃষ্ঠা।)

সাধারণসমাজে বিধবাদের স্থান—অভিজাত ঘরের বিধবাগণ সুখে-সম্মানেই কাল কাটাইতেন। সত্যবতী, কুন্তী, উত্তরা ও দুর্য্যোধনাদির পত্নীগণ এই বিষয়ের উদাহরণ। কিন্তু সাধারণ দরিদ্রসমাজের বিধবাগণের বেলায় সেইরকম মনে হয় না। এক ব্রাহ্মণপত্নীর মুখে শুনিতে পাই, ভূপতিত আমিষখণ্ডে শকুনিদের যেরূপ লোলুপ দৃষ্টি, পতিহীনা নারীও সেইরূপ অনেকেরই অভিলষিত। এই একস্থান ব্যতীত অপর কোথাও এরূপ কোন উক্তি শোনা যায় না।[৭৮]

সহমরণ—স্বামীর মৃত্যু হইলে কোন কোন মহিলা সহগামিনী হইয়া স্বামীর চিতাগ্নিতেই আত্মাহুতি দিতেন। এই সহমরণ-প্রথা সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে ছিল না। পাণ্ডুর মৃত্যুতে মাদ্রী অনুমৃতা হইলেন, কিন্তু কুন্তী দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া পরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বসুদেবের পত্নী দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা এই চারিজন পতির সহগমন করেন। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরেও তাঁহার প্রধান কয়েকজন মহিষী অনুগমন করিয়াছিলেন, অন্যেরা করেন নাই।[৭৯]

সহমরণ-প্রশংসা—সহমরণ-প্রথার যদিও খুব প্রশংসা করা হইয়াছে,

৭৭ নাপরাধোঽস্তি নারীণাং নর এবাপরাধ্যতি।
সর্ব্বকার্য্যাপরাধ্যত্বান্নাপরাধ্যন্তি চাঙ্গনাঃ॥ শা ২৬৫।৪০ দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

৭৮ উৎসৃষ্টমামিষং ভূমৌ প্রার্থয়ন্তি যথা খগাঃ।
প্রার্থয়ন্তি জনাঃ সর্ব্বে পতিহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্॥ আদি ১৫৮।১২

৭৯ পূর্ব্বং মৃতঞ্চ ভর্ত্তারং পশ্চাৎ সাধ্ব্যনুগচ্ছতি॥ আদি ৭৪।৪৬
মদ্ররাজসুতা তূর্ণমন্বারোহদ্ যশস্বিনী। আদি ১২৫।৩১
তং দেবকী চ ভদ্রা চ রোহিণী মদিরা তথা।
অন্বারোহন্ত চ তদা ভর্ত্তারং যোষিতাং বরাঃ॥ মৌ ৭।১৮
তং চিতাগ্নিগতং বীরং শূরপুত্রং বরাঙ্গনাঃ।
ততোঽন্বারুরুহুঃ পত্ন্যশ্চতস্রঃ পতিলোকগাঃ॥ মৌ ৭।২৪
রুক্মিণী ত্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতী সতী।
দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্॥ মৌ ৭।৭৩

তথাপি এই প্রথা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। সত্যবতী, কুন্তী, সত্যভামা প্রমুখ বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্যপালন হইতেই তাহা বুঝা যায়। উল্লিখিত ব্রাহ্মণপত্নীর বাক্যও ইহাই সমর্থন করে।[৮০] সহমরণের পক্ষে এবং বিপক্ষে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মতবাদ চলিয়া আসিতেছিল। উপরি-উক্ত উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, সেই কালেও সমাজে দুই পক্ষেরই সমর্থন করা হইয়াছে।

পতিপুত্রবতীর মৃত্যু সৌভাগ্যের ফল—পতি ও পুত্র রাখিয়া যাহাতে লোকান্তরিত হইতে পারেন, সাধ্বী মহিলাগণ সেই আকাঙ্ক্ষাই করিতেন এবং সেইপ্রকার মৃত্যুকে সৌভাগ্যের ফলরূপে মনে করিতেন। নারীসমাজে সেই মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। এখনও সধবা পুত্রবতীর মৃত্যুকে হিন্দুগণ সৌভাগ্যের ফল বলিয়াই মনে করেন।[৮১]

(নারীর শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি বিষয় 'শিক্ষা' প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।)

চাতুর্ব্বর্ণ্য

বর্ণাশ্রমিসমাজ—মহাভারতের সমাজকে 'বর্ণাশ্রমিসমাজ' নামে উল্লে করিয়াছি। তখনও 'হিন্দু'শব্দের প্রচলন হয় নাই। যে সমাজে শাস্ত্রীয় বর্ণ জাতি এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহারই না 'বর্ণাশ্রমিসমাজ'। সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে প্রথমত বর্ণধর্ম্মেরই আলোচনা করিতে হয়। কারণ বর্ণভেদে অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি পার্থক্য সুপ্রচলিত ছিল।

বর্ণ ও জাতি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিটি 'বর্ণ' নাম অভিহিত। এই চারি বর্ণের মধ্যে সমান বর্ণের স্ত্রীপুরুষ হইতে উৎপন্ন সন্তান পিতামাতার বর্ণেই পরিচিত, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষের মিলনে যে-সকল সন্তান উৎপন্ন হইত, তাহারাই জাতিত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহাদের বর্ণের পরিচয়

৮০ যাপি চৈবংবিধা নারী ভর্ত্তারমনুবর্ত্ততে।
বিরাজতে হি সা ক্ষিপ্রং কপোতীব দিবি স্থিতা॥ শা ১৪৯।১৫

৮১ ব্যুষ্টিরেষা পরা স্ত্রীণাং পূর্ব্বং ভর্ত্তুঃ পরাং গতিম্।
গন্তুং ব্রহ্মন্ সপুত্রাণামিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥ আদি ১৫৮।২২

থাকিত না। মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতি, কিন্তু বর্ণ নহে। পরবর্ত্তী কালে ভাষাতে বর্ণ ও জাতিশব্দের এরূপ বিচারপূর্ব্বক প্রয়োগ বড় দেখা যায় না। এখন বর্ণ-অর্থেও জাতিশব্দের ব্যবহার চলিতেছে। বর্ণ এবং জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মহাভারত হইতে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়।

দেবতাদের জাতিভেদ—দেবতাদের মধ্যেও জাতিভেদ আছে।[১]

মানুষের মধ্যেও জন্মের দ্বারাই বর্ণ স্থির করা যাইত, ইহা মহাভারতীয় সিদ্ধান্ত। পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা বুঝা যাইবে। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, এইভাবে বর্ণ স্থির করাকেই জন্মগত বলা হয়। আর ক্ষত্রিয়ের পুত্র কার্য্যের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, অথবা ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এইরূপ জন্মগত বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটিলেই কর্ম্মগত বর্ণ স্থির করিতে হয়। এই দুইভাবেই বর্ণ-জাতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে।

বর্ণসৃষ্টি—প্রথমতঃ জন্মগত বর্ণ সম্বন্ধে আলোচনায় দেখিতে পাই, ভগবান্ নিজেই বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রকে সৃষ্টি করিলেন।[২] পুত্র সব সময় পিতারই মূর্ত্তিবিশেষ, ইহা শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। সুতরাং পিতার যে বর্ণ, পুত্রেরও সেই বর্ণ জন্ম হইতেই উৎপন্ন হয়।[৩]

জন্মগত বর্ণজাতি-বিষয়ে উক্তি—সকল প্রাণীরই জন্ম দ্বারা আপন আপন কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়।[৪] জন্মগত জাতিধর্ম্ম কোন অবস্থায়ই পরিত্যাজ্য নহে।[৫]

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই পূজিত হন।[৬]

---

১ ইন্দ্রো বৈ ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ঃ কর্ম্মণাভবৎ। শা ২২।১১
এবমেতে সমাম্নাতা বিশ্বেদেবাস্তথাশ্বিনৌ। ইত্যাদি। শা ২০৮।২৩,২৪

২ মুখতঃ সোঽসৃজদ্বিপ্রান্ বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা।
বৈশ্যাংশ্চাপ্যূরুতো রাজন্ শূদ্রান্ বৈ পাদতস্তথা॥ ভী ৬৭।১৯
ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট ঊরুভ্যাং বৈশ্য এব চ॥ ইত্যাদি। শা ৭২।৪। শা ২৯৬।৬

৩ যদেতজ্জায়তেঽপত্যং স এবায়মিতি শ্রুতিঃ॥ শা ২৯৬।২

৪ স্বযোনিতঃ কর্ম্ম সদা চরন্তি। বন ২৫।১৬

৫ কুলোচিতমিদং কর্ম্ম পিতৃপৈতামহং পরম্॥ বন ২০৬।২০
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। ভী ৪২।৪৮

৬ ব্রাহ্মণো নাম ভগবান্ জন্ম প্রভৃতি পূজ্যতে॥ শা ২৬৮।১২

সকল প্রাণীকে মিত্রভাবে দেখা, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরই কর্ম্ম। এই সব কর্ম্মে রাজাদের অধিকার নাই। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হয়, যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্মে সেই জাতকের অধিকারই থাকে না। সুতরাং জন্ম দ্বারাই জাতি স্থির হয়।[৭]

ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকে উপদেশ দিতেছেন—"প্রাণিগণ বহু জন্মের সুকৃতির ফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে। এমন দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণজন্ম হেলায় নষ্ট করা উচিত নহে, বৈষয়িক ভোগের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয় না। বেদাধ্যয়ন, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণসন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখানেও দে যাইতেছে, জন্ম দ্বারাই শুকদেব ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।[৮]

জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয় এইরূপ মনে ক হয় এবং স্ব-স্ব-বর্ণোচিত সংস্কারাদিও তদনুসারেই হইয়া থাকে।[৯] জন্ম হইতে ব্রাহ্মণ অন্যান্য বর্ণের গুরু।[১০] ব্রাহ্মণকুলে জাত দশবৎসরের শিশুও শতা ক্ষত্রিয়ের পিতৃতুল্য গুরু।[১১]

ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা উচিত নহে। বালক অথবা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিবে না।[১২] পশুপক্ষী প্রভৃতিরূপে বহু জন্ম ভোগ করিয়া, প্রা মানুষ-দেহে প্রথমতঃ চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ক্রমে ক্রমে সাধু কর্ম্মে

৭ মিত্রতা সর্ব্বভূতেষু দানমধ্যয়নং তপঃ।
ব্রাহ্মণস্যৈব ধর্ম্মঃ স্যান্ন রাজ্ঞো রাজসত্তম॥ শা ১৪।১৫

৮ সম্পতন্ দেহজালানি কদাচিদিহ মানুষে।
ব্রাহ্মণ্যং লভতে জন্তুস্তৎ পুত্র পরিপালয়॥ ইত্যাদি। শা ৩২১।২২-২৪

৯ যৎ কার্য্যং ব্রাহ্মণেনেহ জন্ম প্রভৃতি তচ্ছৃণু।
কৃতোপনয়নস্তাত ভবেদ্ বেদপরায়ণঃ॥ ইত্যাদি। শা ৩২৬।১৪-১৯

১০ জন্মনৈব মহাভাগ ব্রাহ্মণো নাম জায়তে।
নমস্যঃ সর্ব্বভূতানামতিথিঃ প্রসৃতাগ্রভুক্॥ অনু ৩৫।১
ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামনুজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোশস্য গুপ্তয়ে॥ শা ৭২।৬

১১ ক্ষত্রিয়ঃ শতবর্ষী চ দশবর্ষী দ্বিজোত্তমঃ।
পিতাপুত্রৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ তয়োর্হি ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥ অনু ৮।২১

১২ নহর্ত্তব্যং বিপ্রধনং ক্ষন্তব্যং তেষু নিত্যশঃ।
বালাশ্চ নাবমন্তব্যা দরিদ্রাঃ কৃপণা অপি॥ অনু ৯।১৮

ফলে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম হইয়া থাকে।[১৩] বৃদ্ধ এবং বালক সকল ব্রাহ্মণই সম্মানার্হ। ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ই হউন, আর মূর্খই হউন, সকল অবস্থায়ই পূজ্য। অগ্নি যেমন অসংস্কৃত থাকিলেও তাঁহার মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না, ব্রাহ্মণও যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তাঁহার জন্মগত বিশেষত্ব নষ্ট হয় না।[১৪]

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, জাতকর্ম্ম হইতেই তাঁহার সংস্কার আরম্ভ হয়। তাঁহার সংস্কার অন্য বর্ণের সংস্কার হইতে পৃথক্।[১৫]

অশ্বত্থামা ক্ষত্রিয়বৃত্তির (যুদ্ধাদির) অনুশীলনে নিরত ছিলেন, তথাপি তিনি ব্রাহ্মণ, এই জন্য ভীম তাঁহাকে বধ করেন নাই।[১৬]

দ্রোণাচার্য্যকে বধ করার হেতু সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন, "তুমি ব্রাহ্মণকে বধ করিয়াছ, তোমার মুখ দেখিলেই মানুষ অশুচি হইবে।" দ্রোণাচার্য্যও ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে জীবিকা পালন করেন নাই, পরন্তু অতিশয় রুদ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের মতই ছিলেন। তথাপি তাঁহাকে ব্রাহ্মণই বলা হইয়াছে।[১৭] ভীম বনবাসের সময় অসহনীয় দুঃখে অধীর হইয়া দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে শান্তভাবে অনেক বুঝাইয়া যুদ্ধে বাধা দেন। তখন ভীম কুপিত হইয়া বলিতেছেন, "আপনার যেরূপ দয়া তাহা ব্রাহ্মণেই সম্ভব ; কেন ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? ক্ষত্রিয়বংশে প্রায়ই ক্রূরবুদ্ধি পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।" যুধিষ্ঠিরের চরিত্র ব্রাহ্মণোচিত হইলেও তাঁহাকে ভীমসেন ব্রাহ্মণ বলেন নাই।[১৮] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও দেখা যায়, অর্জ্জুনকে ভগবান্ নানাভাবে বর্ণাশ্রমতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। "ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে শ্রেয়স্কর কিছুই হইতে পারে না, ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইলে

---

১৩ অনু ২৮ শ অঃ।

তির্য্যগ্‌যোন্যাঃ শূদ্রতামভ্যুপৈতি, শূদ্রো বৈশ্যং ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চ বৈশ্যঃ। ইত্যাদি। অনু ১১৮।২৪

১৪ যেষাং বৃদ্ধশ্চ বালশ্চ সর্ব্বঃ সম্মানমর্হতি। ইত্যাদি। অনু ১৫১।১৯-২৩

১৫ জাতকর্ম্ম প্রভৃত্যস্ত কর্ম্মণাং দক্ষিণাবতাম্। ইত্যাদি। শা ২৩৩।২

১৬ জিত্বা মুক্তো দ্রোণপুত্রো ব্রাহ্মণ্যাদ্গৌরবেণ চ॥ সৌ ১৬।৩২

১৭ ত্বাঞ্চ ব্রহ্মহণং দৃষ্ট্বা জনঃ সূর্য্যমবেক্ষতে।

ব্রহ্মহত্যা হি তে পাপং প্রায়শ্চিত্তার্থমাত্মনঃ॥ দ্রো ১৯৭।২১

১৮ ঘৃণী ব্রাহ্মণরূপোঽসি কথং ক্ষত্রেষু জায়থাঃ।

অস্যাং হি যোনৌ জায়ন্তে প্রায়শঃ ক্রূরবুদ্ধয়ঃ॥ বন ৩৫।২০

তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে, আর যদি জয়ী হও, তাহা হইলে পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে।" অর্জ্জুনের ব্রাহ্মণসুলভ দয়া দেখিয়া ভগবান্ তাহাতে অনুমোদন করেন নাই। গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ স্থির করিতে হইলে ভগবানের সেইসকল কথার কোন মূল্য থাকে না।[১৯]

শম দম প্রভৃতি গুণ না থাকিলে ব্রাহ্মণকুলে জাত ব্যক্তি অসাধু ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইতেন। এইভাবে ভীরু ক্ষত্রিয়, দক্ষতাহীন বৈশ্য এবং প্রতিকূল আচরণশীল শূদ্রও অসাধু বলিয়া গণ্য হইতেন। ইহাতে সপ্রমাণ হয়, যথাযথ গুণ না থাকিলেও এক বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেহ অন্য বর্ণে পরিণত হইতেন না।[২০]

ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করায় অশ্বত্থামা নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া শিষ্টদের অসম্মত ধর্ম্মের আচরণহেতু অনুশোচনা করিয়াছেন।[২১] যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যজ্ঞবেদীর নিকটে সকল বর্ণের লোককে যাইতে দেওয়া হয় নাই।[২২] বর্ণ বা জাতি জন্মগত না হইলে, প্রত্যেককে তাহার কর্ম্ম দ্বারা পরীক্ষা করা এবং তারপর যজ্ঞবেদীর নিকটে সে যাইতে পারে কি না, তাহা স্থির করা উচিত ছিল।

ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের মত কোমল, কিন্তু বাক্য তাঁহাদের ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধার। ক্ষত্রিয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদের বাক্য নবনীতের মত, আর হৃদয় ক্ষুরের মত।[২৩] জন্মগত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়কে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইয়াছে, প্রত্যেকের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া বলা

১৯ ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ভী ২৬।৩১
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। ভী ২৬।৩৭

২০ অদান্তো ব্রাহ্মণোঽসাধুর্নিস্তেজাঃ ক্ষত্রিয়োঽধমঃ।
অদক্ষো নিন্দ্যতে বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ প্রতিকূলবান্॥ সৌ ৩।২০

২১ সোঽস্মি জাতঃ কুলশ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণানাং সুপূজিতে।
মন্দভাগ্যতয়াস্ম্যেতং ক্ষত্রধর্ম্মমনুশ্রিতঃ॥ সৌ ৩।২১

২২ ন তস্যাং সন্নিধৌ শূদ্রঃ কশ্চিদাসীন্ন চাব্রতী।
অন্তর্বেদ্যাং তদা রাজন্! যুধিষ্ঠিরনিবেশনে॥ সভা ৩৬।৯

২৩ নবনীতং হৃদয়ং ব্রাহ্মণস্য বাচি ক্ষুরো নিশিতস্তীক্ষ্ণধারঃ।
তদুভয়মেতদ্ বিপরীতং ক্ষত্রিয়স্য বাঙ্ নবনীতং হৃদয়ং তীক্ষ্ণধারম্॥ আদি ৩।১২৩
অতিতীক্ষ্ণস্তু তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ॥ উ ২১।৪

হয় নাই। কর্ণের ক্ষতযন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা দেখিয়াই পরশুরাম তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। পৌরোহিত্য, মন্ত্রিত্ব, দৌত্য প্রভৃতি কাজের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য খাঁটি থাকে না। যে-সকল ব্রাহ্মণ এইসকল বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের সমান। যাঁহারা জন্মোচিত কর্ম্মে পরাঙ্মুখ, সেইসকল ব্রাহ্মণ শূদ্রের সমান।[২৪] এখানে "সম" শব্দটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। বর্ণ যদি কর্ম্মের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে "ক্ষত্রিয়ের সমান" বা "শূদ্রের সমান" না বলিয়া 'ক্ষত্রিয়' এবং 'শূদ্র' বলা হইত।

প্রত্যেক জাতিই স্ব-স্ব-জন্মোচিত কাজের দ্বারা নিজেদের সার্থকতা প্রাপ্ত হয়। যে বংশে জন্ম, সেই বংশের অনুরূপ কার্য্যে লিপ্ত থাকা উচিত, ইহাই মহাভারতের অভিপ্রায়।[২৫] বর্ণসঙ্করের ফলে যে-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, যিনি দুষ্কর্ম্মের দ্বারা পতিত, অথবা পতিতের সহিত যাহার সংস্রব আছে, শ্রাদ্ধকার্য্যে সেই ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিতে নাই। এখানেও দেখিতেছি, পতিত হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণই বলা হইতেছে।[২৬]

যে কর্ম্মে নিজের জন্মগত অধিকার, সেই কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি কোনও ব্রাহ্মণ শূদ্রের করণীয় কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তিনিও শূদ্রের মত হইয়া যান। তাহার অন্ন গ্রহণ করা অন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। এখানেও 'শূদ্রের মত' বলা হইয়াছে, 'শূদ্র' বলা হয় নাই।[২৭] যিনি সাধুকাজে বিপন্নকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি শূদ্রই হউন, অথবা অন্য যাহাই হউন, সর্ব্বথা সম্মানের পাত্র। জাতি যদি জন্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইত, তাহা হইলে 'শূদ্রই

২৪ ঋত্বিক্ পুরোহিতো মন্ত্রী দূতো বার্ত্তানুকর্ষকঃ।
এতে ক্ষত্রসমা রাজন্ ব্রাহ্মণানাং ভবন্ত্যত ॥ শা ৭৬।৭
জন্মকর্ম্মবিহীনা যে কদর্য্যা ব্রহ্মবন্ধবঃ।
এতে শূদ্রসমা রাজন্ ব্রাহ্মণানাং ভবন্ত্যত ॥ শা ৭৬।৪

২৫ দমেন শোভতে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিজয়েন তু।
ধনেন বৈশ্যঃ শূদ্রস্তু নিত্যং দাক্ষ্যেণ শোভতে ॥ শা ২৯৩।২১

২৬ সঙ্কীর্ণযোনির্বিপ্রশ্চ সম্বন্ধী পতিতশ্চ যঃ।
বর্জ্জনীয়া বুধৈরেতে নিবাপে সমুপস্থিতে ॥ অনু ৯১।৪৪

২৭ শূদ্রকর্ম্ম তু যঃ কুর্য্যাদবহায় স্বকর্ম্ম চ।
স বিজ্ঞেয়ো যথা শূদ্রো ন চ ভোজ্যঃ কদাচন ॥ অনু ১৩৫।১০

হউন, বা যাহাই হউন' এই উক্তি নিরর্থক হয়। এরূপ মহাত্মাকে ব্রাহ্মণ বলিলেই চলিত।[২৮]

শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাঁহার মন শুচি হইয়াছে, যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি শূদ্র হইলেও দ্বিজবৎ সম্মানার্হ। জাতি জন্মগতই থাকে, পরন্তু সাধু কর্ম্মের দ্বারা সম্মান লাভ করা যায়।[২৯] ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে মতঙ্গের জন্ম হয়। তিনি ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তির বর দেন নাই। বহু জন্মের তপস্যায় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হয়, ইহাই ইন্দ্রমতঙ্গসংবাদের সারমর্ম্ম।[৩০] এত বড় জ্ঞানী হইয়াও বিদুর আপনাকে 'শূদ্র' বলিয়া পরিচয় দিতেন। নিজেই সনৎ-সুজাতীয়ের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, "আমি শূদ্রা জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং অধ্যাত্মশাস্ত্র কথনে আমার অধিকার নাই।"[৩১]

কর্ম্ম দ্বারাই যদি জাতি স্থির হইত, তাহা হইলে বর্ণসঙ্কর-প্রকরণের সার্থকতা কোথায়? কারণ, যিনি যে জাতির করণীয় কর্ম্ম করিবেন, তিনি সেই জাতীয় বলিয়া গণ্য হইবেন। বর্ণসাঙ্কর্য্য ত কেবল জন্মের দ্বারাই স্থির হয়। সুতরাং জাতি জন্মগত।[৩২] ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ছাড়া কতকগুলি জাতিও স্বীকার করা হয়, তাহাদেরই নাম সঙ্কর। অতিরথ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কশ, নিষাদ, সূত, মাগধ, মদ্রনাভ, আহিণ্ডক, চর্ম্মকার, সৌপাক প্রভৃতি বহু জাতি বিভিন্ন বর্ণের ও জাতির পিতামাতা হইতে জন্মলাভ করে।[৩৩] উল্লিখিত প্রমাণ-সমূহকে জন্ম দ্বারা জাতি-নির্ণয়ের অনুকূলে উদ্ধৃত করা চলে।

কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ ও জাতি (?)—কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও জাতি স্থির করা হইত, এই বিষয়েও মহাভারতে প্রমাণাভাসের অভাব নাই।

যিনি ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম (যজন, যাজন, অধ্যাপনা, তপস্যা ইত্যাদি

২৮ অপারে যো ভবেৎ পারমপ্লবে যঃ প্লবো ভবেৎ।
শূদ্রো বা যদি বাপ্যন্যঃ সর্ব্বথা মানমর্হতি॥ শা ৭৮।৩৮

২৯ কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্॥ ইত্যাদি। অনু ১৪৩।৪৮, ৪৯

৩০ অনু ২৮ শ এবং ২৯ শ অঃ।

৩১ শূদ্রযোনাবহং জাতো নাতোঽন্যদ্বক্তুমুৎসহে। উ ৪১।৫

৩২ ততোঽন্যে ত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতাঃ॥ ইত্যাদি। শা ২৯৬।৭-৯

৩৩ শা ২৯৬ তম অঃ। অনু ৪৮ শ অঃ

করিতেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইত। যিনি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম (যুদ্ধ, রাজ্যশাসন প্রভৃতি) করিতেন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা হইত। এইভাবে বৈশ্য শূদ্র নির্ণয় করিবারও নিয়ম ছিল।

সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিতেছেন, "সত্য, অনিষ্ঠুরতা, দান, ক্ষমা, তপস্যা ও দয়া যে ব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ।" যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনিয়া নহুষ আবার প্রশ্ন করিলেন, "সত্য, দান, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ ত জন্মগত শূদ্রের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়?" উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "শূদ্রের জাতিগত গুণ (পরিচর্য্যা প্রভৃতি) যদি ব্রাহ্মণে দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করিব, আর ব্রাহ্মণের গুণ (শম, দম প্রভৃতি) যদি শূদ্রে দেখা যায়, তবে সেই শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলিব।"[৩৪] যিনি শূদ্রা মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ক্রমশঃ বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।[৩৫] যক্ষযুধিষ্ঠির-সংবাদে দেখা যায় —কিরূপে ব্রাহ্মণ্যলাভ হয়, যক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, কুল, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কিছুই দ্বিজত্বের কারণ নহে, একমাত্র বৃত্তই (চরিত্র) দ্বিজত্বের হেতু।[৩৬] উমামহেশ্বর-সংবাদে মহেশ্বরের মুখে শুনিতে পাই—যিনি সচ্চরিত্র, দয়ালু, অতিথিপরায়ণ, নিরহঙ্কার গৃহস্থ, তিনি নীচ জাতিতে জন্মিলেও দ্বিজত্ব লাভ করেন। আর যে ব্রাহ্মণ অসাধুচরিত্র, সর্ব্বভুক্, নিন্দিতকর্ম্মা তিনি শূদ্রত্ব লাভ করেন।[৩৭]

বর্ণের মধ্যে প্রথমতঃ কোন ভেদ ছিল না। সমস্ত মানুষ ব্রহ্মার সৃষ্ট বলিয়া ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন। তারপর যাঁহারা কামভোগপ্রিয়, ক্রোধন,

৩৪ বন ১৮০ তম অঃ।

৩৫ শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ॥ ইত্যাদি। বন ২১১।১১,১২

৩৬ শৃণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতং।
কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ॥ বন ৩১২।১০৮
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥ অনু ১৪৩।৫০,৫১

৩৭ এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥ অনু ১৪৩।৪৬,৪৭

সাহসী, রজোগুণ-প্রধান, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা রজঃ এবং তমঃ উভয় গুণযুক্ত এবং যাঁহারা গোপালন ও কৃষি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহারাই বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা লুব্ধ, মিথ্যাপ্রিয়, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, শৌচাশৌচবিচারহীন তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এইভাবে ব্রাহ্মণগণই কর্ম্ম দ্বারা বিভিন্ন বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।[৩৮]

ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে, যিনি জাত-কর্ম্মাদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত, বেদাধ্যয়নশীল, সন্ধ্যা স্নান জপ প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মে নিরত, তিনি ব্রাহ্মণ। যিনি যুদ্ধবিগ্রহতৎপর, প্রজাপালনে রত ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন তিনি ক্ষত্রিয়। যিনি বাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালনে রত এবং বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, তিনি বৈশ্য। যিনি সর্ব্বভক্ষ্যরতি, অশুচি, অনাচারী তিনিই শূদ্র। উল্লিখিত কর্ম্মই বর্ণবিভাগের কারণ। সকল সময়ে শৌচ ও সদাচার যাঁহারা রক্ষা করেন, সর্ব্বভূতে দয়া করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দ্বিজ।[৩৯] কর্ম্মের দ্বারা বর্ণ স্থির করিতে হয়, এই বিষয়ে উমামহেশ্বর-সংবাদের সমস্ত অধ্যায়ে বহু কথার পর পরিশেষে মহেশ্বর বলিতেছেন, "শূদ্রকুলে জন্মিয়াও কিরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করা যায়, আর ব্রাহ্মণও কিরূপে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তোমার নিকট সেই গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম।"[৪০]

কুরুপাণ্ডবের শস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার সময় কর্ণ সভাস্থলে উপস্থিত হইলে ভীম তাঁহাকে সূতপুত্র বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে দুর্য্যোধন ভীমকে বলেন "জল হইতে অগ্নির জন্ম ; দধীচির অস্থি হইতে বজ্রের উৎপত্তি ; ভগবান্ গুহ—অগ্নি, কৃত্তিকা, রুদ্র ও গঙ্গা এই চারিজন হইতে উৎপন্ন। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। আচার্য্য দ্রোণ কলস হইতে উৎপন্ন, গৌতম শরস্তম্ব হইতে জাত। সুতরাং মানুষকে তাঁহার কর্ম্ম দ্বারা বিচার করিতে হইবে, জন্মের দ্বারা নহে।"[৪১] বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ

৩৮ শা ১৮৮ তম অঃ

৩৯ শা ১৮৯ তম অঃ।

৪০ এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাদ্ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে ॥ অনু ১৪৩।৫৯

৪১ সলিলাদুত্থিতো বহ্নির্যেন ব্যাপ্তং চরাচরম্।
দধীচস্যাস্থিতো বজ্রং কৃতং দানবসূদনম্ ॥ ইত্যাদি। আদি ১৩৭।১২-১৭

করিয়াও কঠোর তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।[৪২] মহর্ষি ভৃগুর প্রসাদে ক্ষত্রিয় বীতহব্য ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন।[৪৩]

সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপি (ক্ষত্রিয়) সরস্বতীর উত্তর তীরে মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন।[৪৪]

উল্লিখিত প্রমাণগুলিতে দেখা যায়, মানুষ যে-কোন জাতির মাতাপিতার ঘরেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, আপন গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে তাহার বর্ণ বা জাতি স্থির হইত এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এইসকল বচন ও ব্যক্তিগত উদাহরণ জন্মগত জাতিনির্ণয়ের প্রতিকূলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

উভয় মতের সামঞ্জস্য বিধান—আলোচিত দুইটি অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত। উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে নিম্নের সম্ভাব্য বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(ক) কালভেদে উভয় প্রকার বর্ণ-বিভাগ। (খ) দেশভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা। (গ) জন্মগত জাতি এবং গুণকর্ম্মগত জাতিরূপে উভয়েরই সত্যতা।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম দুইটি বোধ হয় খুব সমীচীন নহে। কারণ, আলোচনায় বেদে ও মনুসংহিতায় বর্ণ ও জাতি- ভেদের যথেষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ঐ ভেদকে জন্মগত স্বীকার করা হইত। মহাভারত বেদকে স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। মনুর বচনেও মহাভারতকারের শ্রদ্ধা অপরিসীম। (দ্রষ্টব্য "বিবাহ (ক)" ১২শ পৃষ্ঠা।)

৪২ স গত্বা তপসা সিদ্ধিং লোকান্ বিষ্টভ্য তেজসা।
ততাপ সর্ব্বান্ দীপ্তৌজা ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্॥ আদি ১৭৫।৪৭
ক্ষত্রভাবাদপগতো ব্রাহ্মণত্বমুপাগতঃ। উ ১০৬।১৮
তপসা বৈ সুতপ্তেন ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্। শল্য ৪০।১১
স লব্ধ্বা তপসোগ্রেণ ব্রাহ্মণত্বং মহাযশাঃ॥ শল্য ৪০।২৯
ততো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ॥ অনু ৪।৪৮
তৎপ্রসাদান্ময়া প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং মহৎ॥ অনু ১৮।১৭

৪৩ এবং বিপ্রত্বমগমদ্ বীতহব্যো নরাধিপঃ।
ভৃগোঃ প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ॥ অনু ৩০।৬৬

৪৪ তস্মিন্নেব তদা তীর্থে সিন্ধুদ্বীপঃ প্রতাপবান্।
দেবাপিশ্চ মহারাজ ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্নতুর্মহৎ। শল্য ৪০।১০

দেশভেদে জাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল কি না, মহাভারতে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন উঠে, জন্মগত জাতিস্বীকারে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, এইভাবে যদি বিভাগ হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বপ্রথম যাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপে পরিচিত হইলেন, তাঁহাদের সেই জাতি কে স্থির করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ ভীষ্মপর্ব্বের ভগবদুক্তি উপস্থিত করা যাইতে পারে। ভগবান্ বলিতেছেন—"সত্ত্বাদি গুণের এবং যজন, যাজন শম, দম, যুদ্ধ, বাণিজ্য, পরিচর্য্যা প্রভৃতি কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা আমি চারি প্রকার বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।"[৪৫]

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম অনুসারে জীবের সত্ত্বাদি গুণের অল্পাধিক্য হয়, দেহধারণের পূর্ব্বক্ষণে যে জীবে যেরূপ গুণ থাকে, ঈশ্বর সেই জীবকে তদনুরূপ জাতিতে জন্ম দেন। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম অনুসারেই ব্রাহ্মণাদি কুলে জন্ম হয়, এই কথা উপনিষদেও দেখিতে পাই। 'রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে' ইত্যাদি। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫।১০।৭)। জন্মের পর জাতি অনুসারেই কর্ম্ম করিতে হয়। প্রথমে কখন এই ভাবে বর্ণের বিভাগ হয়, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। আদি সৃষ্টিতে ভগবান্ কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য, এইরূপে স্থির করাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্বদোষের আশঙ্কা হয়। সমস্ত সৃষ্টি বিষয়েই এই আশঙ্কা আছে। ইহার উত্তরে দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, সৃষ্টির একটি ধারা আছে, ইহা অনাদি। আস্তিক দর্শনসমূহে সৃষ্টিধারার অনাদিতা স্বীকার করা হইয়াছে। অন্যথা পক্ষপাতিত্বদোষ হইতে ভগবানকে রক্ষা করা যায় না। উল্লিখিত ভগবদুক্তির শেষাংশে বলা হইয়াছে, "আমি কর্ত্তা হইলেও বাস্তবিক পক্ষে আমাকে অকর্ত্তৃরূপে জানিবে।" এই উক্তিও সমস্ত সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিতা সমর্থন করে।[৪৬] ভগবান্ আরও বলিয়াছেন, স্বভাবজাত গুণ অনুসারে জীবের কর্ম্ম বিভাগ করা হইয়াছে।[৪৭]

এই রীতিতে বিচার করিলে সময়বিশেষে এক এক প্রকার জাতিভেদের ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত ছিল, ইহা বলা যায় না। তৃতীয় পক্ষ (গ) অবলম্বন

৪৫ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ॥ ভী ২৮।১৩

৪৬ তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ভী ২৮।১৩

৪৭ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ভী ৪২।৪১

করিলে উভয়েরই সত্যতা ছিল, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সম্ভবতঃ ইহাই মহাভারতের অভিপ্রায় এবং সমধিক যুক্তিযুক্ত। দুই চারিটি প্রমাণের সাহায্যে বিষয়টি উপস্থিত করিতেছি। চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রথা দুইভাবে বর্ত্তমান ছিল। প্রথমতঃ, ঔপাধিক অথবা রূঢ়, যাহাকে এতক্ষণ জন্মগত বলিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, স্বাভাবিক অথবা গুণগত।

দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য্য ছিলেন ঔপাধিক ব্রাহ্মণ এবং স্বাভাবিক ক্ষত্রিয়। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের ঔরসে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল, ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি তাঁহারা অবলম্বন করেন নাই, ক্ষত্রিয়-বৃত্তি যুদ্ধবিগ্রহাদির অনুশীলনেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এইরূপে বলা যাইতে পারে, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ঔপাধিক ক্ষত্রিয় ছিলেন। গুণগতভাবে তাঁহাদের মধ্যে বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব মিলিত হইয়াছিল। একাধিকবার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন। বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ, তুলাধার প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঔপাধিক শূদ্র এবং বৈশ্য, কিন্তু গুণ হিসাবে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যসম্পদের অধিকারী ছিলেন। স্বাভাবিক ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সত্ত্বাদি গুণের উপর নির্ভর করে। সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, সত্ত্বযুক্ত রজঃ-প্রধান পুরুষ ক্ষত্রিয়, তমোযুক্ত রজঃ-প্রধান পুরুষ বৈশ্য, রজোযুক্ত তমঃপ্রধান পুরুষ শূদ্র। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাঁহার চরিত্রে যে গুণের বিকাশ হইত, তাহার দ্বারা স্বাভাবিক জাতি স্থির করা হইত।

স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের স্বরূপ বর্ণনায় বলা হইয়াছে, যিনি ক্রোধ এবং মোহ ত্যাগ করিতে পারেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি সত্যবাদী দান্ত এবং ঋজুস্বভাব, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।[৪৮] যিনি কোন অবস্থায়ই সত্য হইতে বিচলিত হন না, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।[৪৯] ক্ষমাই ব্রাহ্মণের বল।[৫০] সমস্ত প্রাণীকে যিনি মিত্রভাবে দেখেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।[৫১]

---

৪৮. ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম।
যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ইত্যাদি। বন ২০৫।৩২-৩৯

৪৯ য এব সত্যান্নাপৈতি স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণস্ত্বয়া ॥ উ ৪৩।৪৯

৫০ ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্ ॥ আদি ১৭৫।২৯

৫১ সর্ব্বভূতেষু ধর্ম্মজ্ঞ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ আদি ২১৭।৫
কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ শা ৬০।১২। শা ২৩৭।১৩
ব্রাহ্মণে দারুণং নাস্তি মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ অনু ২৭।১২

সমস্ত প্রাণীকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই ক্ষত্রিয়।[৫২]

ব্রাহ্মণ কাহাকেও হিংসা করিবেন না, তাঁহার স্বভাব হইবে অতি সৌম্য।[৫৩] সর্ব্বত্র যাঁহার সমান দৃষ্টি, নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই প্রকৃত দ্বিজ।[৫৪]

যাঁহার জীবন কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত, যাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান ভগবানের উদ্দেশ্যে, কাল স্বয়ং যাঁহার নিকট পুণ্যের নিমিত্ত উপস্থিত হয়, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।[৫৫] সকল অবস্থায়ই যিনি সন্তুষ্ট, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।[৫৬] এইসকল বচন হইতে বুঝিতে পারা যায়, স্বভাবব্রাহ্মণ সাধারণ মানুষের তুলনায় অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। আরও বহুস্থানে এইপ্রকার ব্রাহ্মণের বিস্তর প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।[৫৭] এই প্রশংসা কেবল ব্রাহ্মণ-সন্তানের নহে। যাঁহারা উল্লিখিত গুণযুক্ত তাঁহারাই প্রশংসিত, তাঁহাদের প্রশংসাচ্ছলে অনেক উপাখ্যানও উদ্ধৃত হইয়াছে।

কুলোচিত কর্ম্মের প্রশংসা—যিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিতেন, সেই কুলের কর্ত্তব্য কর্ম্মে যাহাতে আসক্তি থাকে, তাঁহার হিতৈষিগণ সেই কামনাই করিতেন। যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন পূর্ণ হইলে, অর্জ্জুনের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, তীর-ধনু পরিত্যাগ করিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিবার নিমিত্ত বার-বার তাঁহার ক্ষত্রিয়তা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।[৫৮] পুত্র শুকদেবকে ব্রাহ্মণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত মহর্ষি বেদব্যাস অনেক উপদেশ দিয়াছেন।[৫৯]

৫২ কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যাদৈন্দ্রো রাজন্য উচ্যতে॥ শা ৬০।২০

৫৩ তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্ব্বান্ন হিংস্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ কচিৎ।
ব্রাহ্মণঃ সৌম্য এবেহ ভবতীতি পরা শ্রুতিঃ॥ আদি ১১।১৪

৫৪ ব্রাহ্মঃ স্বভাবঃ সুশ্রোণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥ অনু ১৪৩।৫২

৫৫ জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মো হর্য্যর্থমেব চ।
অহোরাত্রাশ্চ পুণ্যার্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ইত্যাদি। শা ২৪৪।২৩,২৪

৫৬ যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ। ইত্যাদি। শা ২৪৪।১২-১৪

৫৭ শা ৩৮।৩৫। শা ১৪২ তম অঃ। অনু ৯ম অঃ, ৩৩শ অঃ, ৩৪শ অঃ, ৫৪শ অঃ, ১৫১ তম অঃ

৫৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ভীষ্মপর্ব্ব)

৫৯ শা ৩২১ তম অঃ।

জন্মোচিত কর্ম্মকে "সহজ কর্ম্ম" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[৬০] য সৎব্যক্তি সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, তিনি যে-জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সাধু পুরুষরূপে সমাজে সম্মানিত হইতেন। ব্রাহ্মণ কৌশিক মিথিলার বাজারে মাংসবিক্রেতা ব্যাধকে বলিয়াছিলেন, "তাত, তোমার পক্ষে এই ঘোর কর্ম্ম (পশুবধ ও মাংস-বিক্রয়) অত্যন্ত বিসদৃশ, এই অশোভন কর্ম্ম দেখিয়া বড় অনুতপ্ত হইলাম।" উত্তরে ব্যাধ বলিলেন—"হে দ্বিজ, এই বৃত্তি আমার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত, সুতরাং ইহাই আমার ধর্ম্ম। আমি সশ্রদ্ধভাবে গুরুজনের সেবা করিয়া থাকি। দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ এবং ভৃত্যদের সেবার পর অবশিষ্ট নিজে ব্যবহার করি। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, অসূয়া, মিথ্যা প্রভৃতি আমাতে স্থান পায় না।"[৬১] এখানেও দেখা যাইতেছে, সমস্ত মানবজাতির অবশ্য অবলম্বনীয় সত্য, দয়া প্রভৃতি গুণের অনুশীলন করিয়া আপনার জন্মলব্ধ বৃত্তি দ্বারা জীবনযাপনকারী একজন ব্যাধ ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপদেষ্টা গুরুরূপে সম্মান পাইয়াছেন। বর্ণজাতি-নির্ব্বিশেষে গুণীর সম্মানের বহু দৃশ্য মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে শূদ্রগণও যথারীতি অভ্যর্থনা পাইয়াছেন।[৬২]

সাধু চরিত্রের গুণে সামাজিক সম্মান লাভ—ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে যদিও সমাজে ব্রাহ্মণের সম্মানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, তথাপি কদাচার ব্রাহ্মণ কোথাও সম্মানিত হন নাই। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণই সম্মানিত হইতেন। যে জাতিতেই জন্ম হউক না কেন, মনুষ্যচরিত্রের সাধারণ সদ্‌বৃত্তি যাঁহার চরিত্রে যতটা বিকশিত হইত, তিনিই ততটা সম্মানের অধিকারী হইতেন। সকল মনুষ্যসমাজই সাধু সচ্চরিত্র পুরুষকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত। বিদুর শূদ্রা জননীর সন্তান, নিজেও সর্ব্বত্র আপনাকে শূদ্র বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতের পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় দৃঢ়চেতাঃ আর কেহই নহেন। তিনি সর্ব্বত্র সেইরূপ

৬০ সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। ভী ৪২।৪৮

৬১ বন ২০৬ তম অঃ।

৬২ বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্ব্বানানয়তেতি চ॥ সভা ৩৩।৪১
জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পূজয়েৎ।
অপি শূদ্রঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং সদ্‌বৃত্তমভিপূজয়েৎ॥ অনু ৪৮।৪৮

সম্মানেরও অধিকারী হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বিদুরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি বিদুরের আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য লোকসমাজে আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। মহাভারতে বিদুরের বিশেষণ 'মহাত্মা'। যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণও তাঁহাকে পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছেন। প্রণাম করা সঙ্গত হইয়াছে কি না, সেই প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করিব না; কিন্তু ইহা দ্বারা বিদুরের শ্রদ্ধেয়তা প্রতিপন্ন হইতেছে।[৬৩]

ধর্ম্মব্যাধ, তুলাধার প্রমুখ পুরুষগণ অপেক্ষাকৃত নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। এইসকল উদাহরণ হইতে জানা যায়, যে-কোন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও সম্মানের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। জাতির সহিত চরিত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। জন্মগত জাতি-অনুসারে সামাজিক স্তর এবং কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইলেও সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে। দ্রোণাচার্য্য, কৃপ প্রমুখ যোদ্ধগণ জন্মতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতে পারেন নাই।[৬৪] ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য না করিলে তিনি শুধু নামধারক ব্রাহ্মণ বা 'ব্রাহ্মণব্রুব'। তাঁহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় শ্রদ্ধা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। চিরদিনই সমাজে এইরূপ মনোভাব চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও একই কথা। স্ব-স্ব-বর্ণোচিত কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সাধুভাবে যাঁহারা জীবন কাটাইতেন, তাঁহারাই বর্ণাশ্রমিসমাজে আদর্শস্থানীয়রূপে সম্মানিত হইতেন।

জাতি জন্মগত—আলোচনায় বুঝা যায়, জন্ম অনুসারে জাতি স্থির করা হইত, কিন্তু সামাজিক সম্মান বা প্রতিপত্তি কর্ম্মের উপর নির্ভর করিত। জন্ম এবং কর্ম্ম দুইই যাঁহার মধ্যে মিলিত হইত, তিনি সকলেরই অসাধারণ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন।[৬৬] ভীষ্ম, ভীম, অর্জ্জুন, অভিমন্যু প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণ ইহার

৬৩ নির্যায় চ মহাবাহুর্বাসুদেবো মহামনাঃ।
নিবেশায় যযৌ বেশ্ম বিদুরস্য মহাত্মনঃ॥ উ ৯১।৩৪
অন্যেষাঞ্চৈব বৃদ্ধানাং কৃপস্য বিদুরস্য চ। আদি ১৪৫।২
অজাতশত্রুর্ব্বিদুরং যথাবৎ। সভা ৫৮।৪। বন ২৫৬।৮

৬৪ বীভৎসো বিপ্রকর্ম্মাণি বিদিতানি মনীষিণাম্। ইত্যাদি। দ্রো ১৯৬।২৪,২৫

৬৫ তথা মায়াং প্রযুঞ্জানমসহং ব্রাহ্মণব্রুবম্। ইত্যাদি। দ্রো ১৯৬।২৭

৬৬ তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চাপ্যেতদ্‌ব্রাহ্মণ্যকারণম্।
ত্রিভির্গুণৈঃ সমুদিতস্ততো ভবতি বৈ দ্বিজঃ॥ অনু ১২১.৭

প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তুলাধার একজন মুদী ছিলেন। (শা ২৬০ তম অঃ) ধর্ম্মব্যাধ মাংসবিক্রেতা ছিলেন। (বন ২০৬ তম অঃ) কিন্তু তাঁহাদের সম্মান কি কম ছিল ?

কর্ম্মের দ্বারা জাতি স্বীকার করিলে অসঙ্গতি—কর্ম্মের দ্বারা জাতি স্থির করা হইত, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে কোন কোন বিষয়ে সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না।

(ক) জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার, ব্রাহ্মণ-সন্তানের যে নিয়মে করিবার বিধি, ক্ষত্রিয়-সন্তানের সেই নিয়মে নহে। এইভাবে বৈশ্য এবং শূদ্রেরও নিয়মের ভেদ আছে। প্রত্যেকেরই অন্য তিন বর্ণের সহিত প্রভেদ। কর্ম্মের দ্বারা বর্ণের বিভাগ হইলে সদ্যোজাত শিশুর বর্ণ স্থির করা যায় না, সুতরাং তাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের লোপ হয়।

(খ) উপনয়ন দ্বিজাতির প্রধান সংস্কার ; উপনয়নের কালও ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সমান নহে। উপনয়নের পূর্ব্বে কোন শিশুর গুণ ও কর্ম্ম দেখিয়া তাহার বর্ণ স্থির করা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্যাদিগুণসম্পন্ন শূদ্র-সন্তানের উপনয়নের কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না।

(গ) একই পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বর্ণের কর্ম্ম করিতে পারেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃষ্ণ, বিদুর, যুধিষ্ঠির প্রমুখ মহাভারতীয় পুরুষদেরও বিভিন্ন বর্ণোচিত কর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ম্মের দ্বারা জাতির পরিবর্ত্তন মানিয়া লইলে তাঁহাদেরও কোন জাতি স্থির করা চলে না। এইরূপ সিদ্ধান্তে কাহারও একমাত্র জাতি থাকিতে পারে না। একই ব্যক্তির কালবিশেষে জাতির মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তন হইতে থাকিবে। ইহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। এরূপও হইতে পারে যে, কোন ব্যক্তির গুণ ব্রাহ্মণোচিত, কিন্তু কর্ম্ম ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের ন্যায়। গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ স্থির করিতে হইলে সেই ব্যক্তির কি বর্ণ হইবে ? প্রকৃত গুণই বা কে নির্ণয় করিবে ?

বিশ্বামিত্রাদির জন্মগত জাতির পরিবর্ত্তন তপস্যার ফল বা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র—তপঃশক্তিতে অসম্ভবও সম্ভব হয়। যৌগিক প্রক্রিয়ায় শরীরের উপাদানকেও পরিবর্ত্তন করা যায়। তপঃসিদ্ধ ব্যক্তির প্রসাদেও অনেক কিছু হইতে পারে। বিশ্বামিত্রের জননীর মন্ত্রপূত চরু ভক্ষণের কথাও ভুলিলে চলিবে না। মন্ত্রশক্তি ও তপঃশক্তিতে মহাভারতকার কোথাও

সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই, বরং সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণজনক চরুর মাহাত্ম্য বহুবার বর্ণিত হইয়াছে।[৬৭] সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপির ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি স্থলে ব্রাহ্মণত্বের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়।

গোত্রকারক ঋষিদের তপস্যা—অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারিটিকে বলা হইয়াছে মূল গোত্র। গোত্রকারক ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা গোত্রের প্রবর্ত্তন করিতেন।[৬৮]

সঙ্কর জাতি—অতিরথ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কশ, নিষাদ, সূত, মাগধ, তক্ষা, সৈরন্ধ্র, আয়োগব, মদ্গুর, আহিণ্ডক প্রভৃতি অনেক সঙ্কর জাতির নাম এবং তাহাদের কর্ম্ম বর্ণসঙ্করাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। লোভ, কাম এবং বর্ণবিষয়ে অজ্ঞানতা, এই তিনটি কারণ হইতে প্রথমতঃ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।[৬৯]

চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা সমাজস্থিতির অনুকূল ছিল। এখনও সমাজে বর্ণব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কিন্তু সমাজের সকলেই যে এই ব্যবস্থাকে শ্রদ্ধা সহিত দেখিয়া থাকেন, তাহা বলা চলে না। একদল লোক জন্মগত বর্ণনির্ণয়ের প্রতিকূলে অভিমত পোষণ করেন। ভারতীয় আস্তিক শাস্ত্রসমূহে কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। জন্মান্তরবাদকে বাদ দিলে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জন্মান্তরীয় পুণ্যের ফলে উচ্চ বর্ণে শুদ্ধ বংশে জন্ম হয় এবং পাপের ফলে হীন বর্ণে নীচ বংশে জন্ম হয়। জন্ম সম্পূর্ণরূপে দৈবায়ত্ত। যে জাতিতে জন্ম হয়, সেই জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্মে শ্রদ্ধা স্থাপনপূর্ব্বক তাহাই করিয়া যাওয়া শুভ আদর্শ, এই জন্যে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। কারণ বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপস্বী জগতে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারতের বর্ণবিভাগ ও তাহার কারণ পর্য্যালোচনা করিলে জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলকেই প্রধানরূপে গ্রহণ করিতে হয়।

৬৭ বন ১১৫ তম অঃ। অনু ৪র্থ অঃ।

৬৮ মূলগোত্রাণি চত্বারি সমুৎপন্নানি পার্থিব।
অঙ্গিরাঃ কশ্যপশ্চৈব বশিষ্ঠো ভৃগুরেব চ। শা ২৯৬।১৭। দ্রঃ নীলকণ্ঠ

৬৯ শা ২৯৬ তম অঃ। অনু ৪৮ শ অঃ।

চতুরাশ্রম

বর্ণধর্ম্মের সহিত আশ্রমের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আশ্রমী ব্যতীত বর্ণধর্ম্ম কোথায় থাকিবে এবং কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে? এই কারণে চাতুর্ব্বর্ণ্যের আলোচনার পরেই চতুরাশ্রমের আলোচনা করা হয়।

আশ্রম চারিটি—শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষকেই কোন না কোন আশ্রমের ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। আশ্রম চারিটি: ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। জীবনের এক-এক স্তরে এক-এক আশ্রমের ধর্ম্ম পালন করিবার বিধান পাওয়া যাইতেছে। সমাজের স্থিতি ও ক্রমোন্নতির নিমিত্ত প্রাচীন ভারতে চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন সুগঠিত হইয়া যাহাতে মোক্ষের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ চতুরাশ্রমের উপদেশ। ভারতীয় সমাজধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপর এবং ব্যক্তিগত জীবনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা চতুরাশ্রমের উপর। এইজন্যই মহাভারতীয় সমাজধর্ম্মকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং সমাজকে বর্ণাশ্রমিসমাজ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

সংসারে আমাদের নানাবিধ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অর্থ এবং কামে আসক্তি মানুষের স্বভাবজাত। কেবল প্রবৃত্তির বশে চলিলে কর্ত্তব্যে অনেক ত্রুটি ঘটে, এই কারণে নিয়মিতরূপে অর্থ-কামের সেবা করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা ও সংযমরূপ ব্রত পালন করিয়া গার্হস্থ্যের প্রারম্ভে তাহার উদ্‌যাপন, গার্হস্থ্যে ধর্ম্মাবিরুদ্ধ অর্থ ও কামের উপভোগ এবং মনকে মোক্ষাভিমুখ করা, গার্হস্থ্যের অন্তে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্তভাবে অবস্থান, ইহাই বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস-আশ্রমে মুক্তির চেষ্টা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটির নাম পুরুষার্থ, অর্থাৎ জীবের অভিলষিত। এই পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সিদ্ধিতে জীব কৃতকৃত্য হয়। জীবের এই চরিতার্থতাই বোধ হয় আশ্রমধর্ম্মব্যবস্থার লক্ষ্য।

আশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা ঈশ্বরকৃত—মানুষের জীবনকে সার্থক করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ঈশ্বরই আশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন।[১]

চারি বর্ণের অধিকার—ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই আশ্রমধর্ম্ম পালনের

---

১ পূর্ব্বমেব ভগবতা ব্রহ্মণা—ইত্যাদি। শা ১৯১।৮

অধিকারী। শুধু সাধু শূদ্রেরই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যের নহে; কিন্তু সকল শূদ্রেরই বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। নিষেধ সত্ত্বেও বিদুরের বেদাধ্যয়নের কথা পাওয়া যায়।[২]

জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য্য—জীবনের প্রথম অংশে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। উপনয়নসংস্কারের পর ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করিবেন (শূদ্রের গুরুগৃহবাসের কোন চিত্র মহাভারতে পাই নাই।)

ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য—ব্রহ্মচারী গুরুর সেবা করিবেন, অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিবেন। গুরু নিদ্রিত হইলে নিদ্রা যাইবেন, গুরুর শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিবেন।[৩] শিষ্য এবং ভৃত্যের যে যে কর্মে অধিকার, গুরুর সেইসকল কর্ম্ম নির্ব্বিচারে তিনি সম্পাদন করিবেন। খুব শুচিভাবে অধ্যয়নের প্রারম্ভে গুরুর দক্ষিণ চরণ আপনার দক্ষিণ হস্তে, এবং তাঁহার বাম চরণ বাম হস্তে গ্রহণ করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিবেন "ভগবন্, আমাকে বিদ্যা দান করুন।" ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিকূল উগ্র গন্ধ উগ্র রস প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন না। ব্রত এবং উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে কষ্টসহ করিবেন। এইভাবে জীবনের প্রথম চতুর্থাংশ, সাধারণতঃ চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিবার নিয়ম।[৪]

ব্রহ্মচারী শুচি হইয়া প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে সূর্য্য ও অগ্নি দেবতার উপাসনা করিবেন, তাহার পর বেদাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন, গুরুগৃহে ভিক্ষালব্ধ হবিষ্য ভোজন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবেন। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অগ্নিতে হোম করিবেন এবং গুরুর আজ্ঞাবহ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত নিয়ম পালন করিবেন।[৫] ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক আচার্য্যের সেবা দ্বারা বেদের তত্ত্ব অবগত হইবেন।[৬] যথাযথ ব্রহ্মচর্য্য পালন করা দুষ্কর ব্যাপার

২ আশ্রমা বিহিতাঃ সর্ব্বে বর্জ্জয়িত্বা নিরাশিষম্। শা ৬৩।১৩
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বত্র কৃতনিশ্চয়াঃ। আদি ১০৯।২০

৩ আদি ৯১ তম অঃ। শা ২৪১ তম অঃ।

৪ শা ২৪১ তম অঃ।

৫ শা ১৯১ তম অঃ।
এবমেতেন মার্গেণ পূর্ব্বোক্তেন যথাবিধি।
অধীতবান্ যথাশক্তি তথৈব ব্রহ্মচর্য্যবান্॥ ইত্যাদি। অশ্ব ৪৬।১-৪

৬ ব্রহ্মচারী ব্রতী নিত্যং নিত্যং দীক্ষাপরো বশী। ইত্যাদি। শা ৬১।১৯-২১

কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী কঠোর তপস্যা করিবেন। সমস্ত প্রলোভন হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে হইবে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলা একেবারে নিষিদ্ধ। গুরুপত্নী সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। চিত্তে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ অবগাহনপূর্ব্বক কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্ত আচরণের বিধান। শরীর ও মনকে সমস্ত অপচয়ের হাত হইতে সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে, বিশেষতঃ শুক্ররক্ষণ ব্রহ্মচারীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য।[৭]

ব্রহ্মচর্য্যে অমৃতত্ব—ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তায় মানুষ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে।

ব্রহ্মচর্য্যের পাদ-চতুষ্টয়—ব্রহ্মচর্য্যের চারিটি পাদ। প্রথম পাদ, গুরু-শুশ্রূষা, বেদাধ্যয়ন, অভিমান এবং ক্রোধকে জয় করা। দ্বিতীয় পাদ, সর্ব্বতোভাবে আচার্য্যের প্রিয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান, আচার্য্যের পত্নী এবং পুত্রের যথোচিত সেবা। তৃতীয় পাদ, বিদ্যালাভের পর আচার্য্যের অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া চিরদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা। চতুর্থ পাদ, বিনীতভাবে নিরভিমান হইয়া গুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক দক্ষিণা দান।[৮]

ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য—ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পালনের উপকারিতা সম্বন্ধে সনৎ-সুজাতপর্ব্বে সনৎসুজাতের উপদেশে (উ ৪৪ শ অঃ) অনেক কথাই আলোচিত হইয়াছে। দেবতারাও ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতেই দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। ঋষিদের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ব্রহ্মচর্য্যেরই অধীন। যাঁহারা এই ব্রহ্মচর্য্যের তত্ত্ব অবগত আছেন, জগতে তাঁহাদের ভয়ের কোনও কারণ নাই। তাঁহারা নির্ভয়, আত্মতৃপ্ত, চিরপ্রফুল্ল। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সমস্ত জয় করা যায়।[৯]

ব্রহ্মচারী শব্দের অর্থ—যিনি কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মের সেবা করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ঈশ্বর এবং বেদ।[১০]

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের ফলকীর্ত্তন—আমরণ ব্রহ্মচর্য্য বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের বহুবিধ ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। নিষ্ঠা শব্দের অর্থ মৃত্যু। মৃত্যু পর্য্যন্ত যে ব্রহ্মচর্য্য

---

৭ সুদুষ্করং ব্রহ্মচর্য্যমুপায়ং তত্র মে শৃণু॥ ইত্যাদি। শা ২১৪।১১-১৫

৮ বিদ্যা হি সা ব্রহ্মচর্য্যেণ লভ্যা। ইত্যাদি। উ ৪৪।২-১৫

৯ ব্রহ্মচর্য্যেণ বৈ লোকান্ জয়ন্তি পরমর্ষয়ঃ। শা ২৪১।৬

১০ ব্রহ্মণ্যেব চারঃ কায়বাঙ্মনসাং প্রবৃত্তির্যেষাম্। শা ১৯২।২৪ (নীলকণ্ঠ)

পালিত হয়, তাহারই সংজ্ঞা 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য'। যিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করেন, তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সেই উর্দ্ধরেতাঃ মহাপুরুষ মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মচর্য্যের তেজে পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। তপস্বী ব্রহ্মচারিগণকে ইন্দ্রও ভয় করিয়া থাকেন। ঋষিদের যে-সকল অলৌকিক ক্ষমতা দেখা যায়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যেরই ফল। ব্রহ্মচর্য্য মানুষকে দীর্ঘ জীবন দান করে।[১১]

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পিতৃঋণ নাই—যাঁহারা আমরণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাঁহাদের পিতৃপুরুষের নিকট কোনও ঋণ থাকে না। সুতরাং গার্হস্থ্যধর্ম্ম অনুসারে বিবাহাদি না করিলেও তাঁহাদের পাপ হয় না।[১২] যাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন না, তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী বলা হইত। ভীষ্ম, সুলভা (শা ৩২০) শিবা (উ ১০৯) প্রমুখ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীগণ ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত

সমাবর্ত্তন—ব্রহ্মচারী গুরুর অনুমতিক্রমে তাঁহাকে যথাশক্তি দক্ষিণা দানের দ্বারা ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া গুরুর আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই প্রত্যাবর্ত্তনের নামই 'সমাবর্ত্তন'

স্নাতক—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরেই গার্হস্থ্য আশ্রম। যে-সকল ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিতেন, তাঁহাদের সংজ্ঞা 'উপকুর্ব্বাণ'। গার্হস্থ্যে প্রবেশোন্মুখ ব্রহ্মচারীর নাম 'স্নাতক'। সমাবর্ত্তনের পর বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারীকে স্নাতক বলা হইত। স্নাতক তিনপ্রকার—বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক। স্বল্প সময়ে শুধুই একটি বেদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া যাঁহারা গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিতেন, তাঁহারা বিদ্যাস্নাতক। যাঁহারা গুরুগৃহে থাকিয়া বার বৎসর শুধুই ব্রত পালন করিতেন, তাঁহারা ব্রতস্নাতক। আর যাঁহারা বিদ্যা ও ব্রত উভয়েরই শেষ সীমায় যাইতেন, তাঁহারা বিদ্যাব্রত-স্নাতক।[১৪]

১১ ব্রহ্মচর্য্যাস্ত চ গুণং শৃণু ত্বং বসুধাধিপ। ইত্যাদি। অনু ৭৫।৩৫-৪০
ব্রহ্মচর্য্যেণ জীবিতম্। অনু ৭।১৪। অনু ৫৭।১০

১২ অষ্টাবক্রদিক্‌সংবাদঃ। অনু ১৮শ—২০শ অঃ।

১৩ গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবর্ত্তেদ্ যথাবিধি। শা ২৪১।২৯। শা ১৯১।১০। শা ২৩৩।৩

১৪ বেদব্রতোপবাসেন চতুর্থে চায়ুষো গতে। শা ২৪১।২৯

বহুকাল হইতেই ভারতের গুরুগৃহ আর নাই। কতকগুলি চতুষ্পাঠী এবং কয়েকটি বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সফলতা খুব কমই হইয়া থাকে। আজকাল গুরুগৃহবাসও নাই, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমও নাই। বিজাতীয় শিক্ষার প্রসার, জীবনযাত্রাপ্রণালীর কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রতিযোগিতা এবং পরীক্ষা-উত্তরণের কৌশল, এইসকল কারণে চতুষ্পাঠীর স্বল্লাবশেষ আদর্শও এখন লুপ্তপ্রায়। আজকাল সকল বিদ্যার্থীই বিদ্যাস্নাতক, সাধ্যমত পড়াশোনার পরে তাঁহারা গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন।

জীবনের দ্বিতীয় ভাগে গার্হস্থ্য—জীবনের দ্বিতীয় ভাগ গৃহস্থরূপে যাপন করিবার বিধি।[১৫]

গার্হস্থ্যে পত্নীগ্রহণ—গুরুগৃহ পরিত্যাগের পর ব্রহ্মচারী শুভলক্ষণা পত্নী গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিবেন।

চারিপ্রকার জীবিকা—গৃহস্থের জীবিকা চারিপ্রকার: (ক) কুশূলধান্য, (খ) কুম্ভধান্য, (গ) অশ্বস্তন, (ঘ) কাপোতী বৃত্তি। কুশূলধান্য শব্দের অর্থ—প্রচুর ধনের সঞ্চয়, কুম্ভধান্য অল্প সঞ্চয়, অশ্বস্তন শব্দের অর্থ আগামী দিনের উপযোগী খাদ্যাদিও সঞ্চয় না করা। আর কাপোতী বৃত্তি শব্দের অর্থ কপোতের মত ক্ষেত্র হইতে শস্যকণা কুড়াইয়া তাহার দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করা; ইহাকে উঞ্ছবৃত্তিও বলা হইত। উল্লিখিত বৃত্তিগুলির মধ্যে ক্রমশঃ পর পর বৃত্তি প্রশস্ত।[১৬]

গৃহস্থের কর্ত্তব্য—গৃহস্থের সমস্ত কর্ত্তব্যকেই ব্রত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই ব্রত অতি মহৎ। কেবল আপনার উদ্দেশ্যে খাদ্যসংগ্রহ করিতে নাই। যজ্ঞ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে প্রাণিহিংসা বর্জ্জনীয়। দিনে, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে এবং রাত্রির শেষভাগে নিদ্রিত থাকিতে নাই। দিনে একবার এবং রাত্রিতে একবারমাত্র ভোজনের ব্যবস্থা। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রীসম্ভোগ নিন্দিত। অভ্যাগত ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করা,

---

১৫ ধর্ম্মলব্ধৈর্যুক্তো দারৈরগ্নীনুৎপাদ্য যত্নতঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং গৃহমেধী ভবেদ্ ব্রতী॥ শা ২৪১।৩০। শা ২৪২।১

১৬ গৃহস্থবৃত্তয়শ্চৈব চতস্রঃ কবিভিঃ স্মৃতাঃ।
কুশূলধান্যঃ প্রথমঃ কুম্ভধান্যস্ত্বনন্তরম্। ইত্যাদি। শা ২৪২।২,৩
শা ৩৬২ তম অঃ—৩৬৫ তম অঃ (উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যান)।

তাঁহার পূজা করা, গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার কুলোচিত ধর্ম্মে আস্থা রাখিয়া তাহাকেই জীবিকার উপায়রূপে অবলম্বন করা; মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, ভৃত্য ও অতিথিবর্গের ভোজনের পর ভোজন করা; পরিবার-পরিজনের সহিত আনন্দে বাস করা, এইগুলি গৃহস্থের ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।[১৭] সাধু উপায়ে ধন উপার্জ্জন করিয়া তাহা-দ্বারা দেবতা, অতিথি ও পোষ্যবর্গের সেবা করা এবং কাহারও ধনে লোভ না করা, এই দুইটি নিয়ম গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপাল্য।[১৮]

পঞ্চযজ্ঞ—গৃহস্থের প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার বিধান। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোম দৈবযজ্ঞ, বলি অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গের নাম ভূতযজ্ঞ, আর অতিথিসৎকারের নাম নৃযজ্ঞ। প্রত্যেক গৃহস্থকেই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আদেশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যে গৃহাশ্রমী মোহবশতঃ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন না, তিনি ধর্ম্মতঃ ইহলোক ও পরলোকের সমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইবেন। অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না, তিনি অশেষবিধ অকল্যাণে নিমজ্জিত হইবেন।

ব্রহ্মযজ্ঞ—ঋষিগণই সর্ব্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারক, তাঁহারাই সত্যদ্রষ্টা। প্রত্যহ ঋষিদের সহিত যোগস্থাপন করিয়া তাঁহাদের পবিত্র দানের কথা চিন্ত করিতে হইবে। নিজের মধ্যে তাঁহাদের জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার চেষ্ট করিতে হইবে এবং অন্যকেও এই জ্ঞান বিতরণ করিতে হইবে। অধ্যয়ন অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ; ব্রহ্মযজ্ঞের দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ হয়, ঋষিদে জ্ঞানসাধনা গৃহস্থের ব্রহ্মযজ্ঞেই সার্থকতা প্রাপ্ত হয়।

পিতৃযজ্ঞ—যাঁহাদের বংশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের সর্ব্ববি সাধনার ফল আংশিকভাবে আমরাও ভোগ করিতেছি। তাঁহারা যদি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে পরলোকে বাস করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদে তৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রত্যহ একটি শাস্ত্রীয় বিধি পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য বর্ণাশ্রমিসমাজ বিশ্বাস করেন যে, শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পিতৃলোকে

১৭ শা ৬১ তম অঃ, ১৯১ তম অঃ, ২২১ তম অঃ।

১৮ ধর্ম্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজেত দদ্যাৎ সদৈবাতিথীন্ ভোজয়েচ্চ।
অনাদদানশ্চ পরৈরদত্তং সৈষা গৃহস্থোপনিষৎ পুরাণী। আদি ৯১।৩

তৃপ্তি হয়; অনুষ্ঠাতাও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। পিতৃতর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম হইতে তৃণগুচ্ছ (আব্রহ্ম-স্তম্ব) পর্য্যন্ত সকলের উদ্দেশেই শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

দেবযজ্ঞ—পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহারই শক্তিসমূহ নানারূপে জগতের কল্যাণ করিতেছেন। সেই শক্তিরূপী দেবতাগণকে হোমের দ্বারা পরিতুষ্ট করাই দেবযজ্ঞের উদ্দেশ্য।

ভূতযজ্ঞ—কীটপতঙ্গাদি প্রাণিগণের সহিতও গৃহস্থের যোগ রাখিতে হইবে। তাহাদিগকেও যথাসাধ্য খাদ্য দিতে হইবে। আপনার খাদ্যের অগ্রভাগ তাহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করাই ভূতযজ্ঞ।

নৃযজ্ঞ—অতিথিসেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ। বৈশ্বদেব-বলির (দেবতাদের উদ্দেশে অন্ননিবেদন) পরে গৃহী কিছুসময় অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিবেন। ভিন্ন গ্রামাদি হইতে আগত, পরিশ্রান্ত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তিই অতিথি। শুধু একবেলা অবস্থান করিলেই তাঁহাকে অতিথি বলা হয়। অতিথি সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার। তাঁহার সেবা করিতেই হইবে।[১৯] (প্রবন্ধান্তরে অতিথিসেবা বিষয়ে আলোচিত হইবে।)

ঐশ্বর্য্য লাভের উপায়—শ্রী-বাসব-সংবাদে ঐশ্বর্য্য লাভের উপায়রূপে গৃহীর আচরণীয় কতকগুলি সাধু কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান, ধৈর্য্যশীলতা, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দেবতা ও পিতৃলোকের পূজা, গুরু ও অতিথির সৎকার, হোম, সত্যবাদিতা, শ্রদ্ধা, অনসূয়া, অনীর্ষা, সরলতা, প্রফুল্লতা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, পত্নী পুত্র ভৃত্য ও অমাত্যের ভরণ-পোষণ, পরিচ্ছন্নতা, উপবাস, তপঃশীলতা, প্রাতরুত্থান, দিবানিদ্রাবর্জ্জন, অহিংসা, পরস্ত্রীবর্জ্জন, ঋত্বভিগমন, উৎসাহ, অনহঙ্কার, কারুণ্য, প্রিয়বাদিতা, অভক্ষ্যবর্জ্জন, বৃদ্ধসেবন ইত্যাদি।[২০]

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম গৃহস্থের পালনীয় কতকগুলি সদাচারের বর্ণনা করিয়াছেন। রাজপথে, গোষ্ঠে অথবা ধান্যক্ষেত্রে মলমূত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। শৌচ ও আচমন একান্ত আবশ্যক। দেবার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণ

[১৯] পঞ্চযজ্ঞাংস্তু যো মোহান্ন করোতি গৃহাশ্রমী।
তস্য নায়ং ন চ পরো লোকো ভবতি ধর্ম্মতঃ॥ শা ১৪৬।৭

[২০] স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠৎসু ধৈর্য্যাদচলিতেষু চ।
স্বর্গমার্গাভিরামেষু সত্ত্বেষু নিরতা হ্যহম্॥ ইত্যাদি। শা ২২৮।২৯-৪৯

নিত্যকর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ বিধেয়। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সাবিত্রীজপ (উপাসনা) করা উচিত। হস্ত পদ ও মুখ উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক ভোজন করার বিধান। আর্দ্রপাদ অবস্থায় শয়ন করিতে নাই। যজ্ঞশালা, দেবালয়, বৃষ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করা উচিত। অতিথি, কুটুম্ব ও প্রেষ্যবর্গের সহিত একরকমের খাদ্য গ্রহণ করা এবং দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার মাত্র আহার করা বিধেয়। বৃথামাংস (যজ্ঞাদিতে অনিবেদিত) এবং অন্যান্য অখাদ্য বস্তু আহার্য্যরূপে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। গুরুজনকে অভিবাদন করিতে হইবে, নবোদিত সূর্য্যকে দর্শন করিবে না, সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। পত্নীর সহিত এক শয্যায় শয়ন এবং একপাত্রে ভোজন বর্জ্জনীয়।[২১]

উমামহেশ্বর-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, অহিংসা, সত্যবচন, সর্ব্বভূতে দয়া, অদত্তবস্তু গ্রহণ না করা, মদ্য ও মাংস বর্জ্জন উত্তম গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।[২২]

লক্ষ্মীছাড়ার আচার—শ্রী-বাসব-সংবাদে কতকগুলি অসাধু আচারের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলির আচরণে গৃহস্থ শ্রীভ্রষ্ট (লক্ষ্মীছাড়া) হন। যথা—বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধদের কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শন, অভ্যাগত ও গুরুজনের অভ্যর্থনা না করা, শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্যের উল্লঙ্ঘন, পিতা, মাতা, আচার্য্য ও অপর গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা, অনাবৃত ভক্ষ্য-পেয়-ব্যবহার, শৌচাশৌচ বিষয়ে অবিচার, বদ্ধ পশুকে খাদ্য না দেওয়া, একাকী পায়স, খিচুড়ী, পিঠা প্রভৃতি স্বাদু দ্রব্য ভোজন, শিশুদিগকে যথোচিত খাদ্য না দেওয়া, যজ্ঞাদিতে অনিবেদিত মাংস ভক্ষণ, আশ্রমধর্ম্মের পালন না করা, সর্ব্বদা পরিবারপরিজনের সহিত কলহ করা, পরশ্রীকাতরতা, কৃতঘ্নতা, নাস্তিকতা, অভক্ষ্যভক্ষণ, গুরুপত্নীগমন ইত্যাদি। দানবগণ যখন এইসকল অসাধু আচরণে মনোনিবেশ করিল, লক্ষ্মীদেবী তখনই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন।[২৩]

মানুষের ঋণচতুষ্টয়—জন্ম হইতেই মানুষ চারিটি ঋণে আবদ্ধ থাকে-দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও মনুষ্যঋণ। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, অতিথিঋণও

২১ শা ১৯৩ তম অঃ।

২২ অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতানুকম্পনম্।
শমো দানং যথাশক্তি গার্হস্থ্যো ধর্ম্ম উত্তমঃ॥ ইত্যাদি। অনু ১৪১।২৫-২৭

২৩ শা ২২৮।৫০-৮১

একপ্রকার ঋণের মধ্যে গণ্য। অতিথির সেবা করিয়া ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।[২৪]

ঋণ পরিশোধের উপায়—যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবগণের, বেদাধ্যয়ন ও ও তপস্যা দ্বারা মুনিগণের, পুত্রোৎপাদন এবং শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের এবং দয়া দ্বারা মনুষ্যগণের ঋণ পরিশোধ করিবার বিধান।[২৫]

গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা—আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সংসার ও সমাজস্থিতির পক্ষে মনুষ্যজীবনের সকল কর্ত্তব্যই গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিপালিত হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শুধু তদনুকূল শিক্ষা লাভ করা যায়। ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক ও ভিক্ষু গৃহস্থকেই আশ্রয় করেন এবং অপরাপর জীবজন্তুও গৃহস্থের দ্বারাই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই দুইটি আশ্রমে আশ্রমী মুখ্যতঃ নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণই কামনা করেন, জগতের কল্যাণচিন্তা গৌণ, কিন্তু গৃহস্থের দায়িত্ব অনেক বেশী। চাতুর্ব্বর্ণ্য-ধর্ম্মের প্রধান অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র গার্হস্থ্য আশ্রম।[২৬]

গৃহস্থের দায়িত্ব—গৃহস্থ-সাজা মুখের কথা নয়, অসংযত মানব গৃহস্থ হইবার অনুপযুক্ত। গৃহস্থকে অলস হইলে চলিবে না, নিখিল প্রাণিজগৎ তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে। সাগর যেরূপ সমস্ত নদনদীর শেষ আশ্রয়, গৃহস্থও সেইরূপ অপর আশ্রমিগণের আশ্রয়স্থল। গৃহস্থকে বাদ দিলে সমাজ অচল। যে সমাজে সাধু গৃহস্থের অভাব, সেই সমাজ নিতান্ত হতভাগ্য।[২৭]

২৪ ঋণৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা জায়ন্তে মানবা ভুবি। ইত্যাদি। আদি ১২০।১৭-২২।
ঋণমুন্মুচ্য দেবানামৃষীণাঞ্চ তথৈব চ। আদি ২২৯।১১-১৪
পিতৄণামথ বিপ্রাণামতিথীনাঞ্চ পঞ্চমম্॥ ইত্যাদি। অনু ৩৭।১৭,১৮

২৫ যজ্ঞৈস্তু দেবান্ প্রীণাতি স্বাধ্যায়তপসা মুনীন্। ইত্যাদি। আদি ১২০।১৯,২০। শা ১৯১।১৩

২৬ তদ্ধি সর্ব্বাশ্রমাণাং মূলমুদাহরন্তি। ইত্যাদি। শা ১৯১।১০
তস্মাদ্ গার্হস্থ্যমুদ্বোঢ়ুং দুষ্করং প্রব্রবীমি বঃ। শা ১১।১৯
যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
এবং গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য বর্ত্তন্ত ইতরাশ্রমাঃ॥ শা ২৬৮।৬। শা ১২।১২। শা ২৩।৪,৫। শা ২৩।৬

২৭ তং চরাস্ব বিধিং পার্থ দুশ্চরং দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ। শা ২৩।২৬
যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।

সাধু গৃহস্থগণের মুক্তি—সাধু গৃহস্থগণ যথারীতি কর্ত্তব্যপালনের দ্বারা মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থলাভে সমর্থ হন। গার্হস্থ্যই তাঁহাদের সমস্ত অভিলষিত প্রাপ্তির উপায় হইয়া দাঁড়ায়। মুক্তির নিমিত্ত বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণের দরকার হয় না। রাজর্ষি জনক এই বিষয়ে মহাভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের যথাযথ আচরণ মুক্তির পক্ষে অতি প্রশস্ত উপায়।

আশ্রমান্তর গ্রহণেই মুক্তি হয় না—যিনি গার্হস্থ্য আশ্রমকে দোষের হেতু মনে করিয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহারও আসক্তি সহজে শিথিল হয় না। রাজাদের মত ভিক্ষুদেরও বিষয়াসক্তি যথেষ্টই থাকিতে পারে। আপন আপন বিষয়ে আসক্তি কাহারও কিছু কম নয়। অকিঞ্চনতাই যে মুক্তির একমাত্র কারণ, তাহা বলা যায় না।[২৮]

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে, সাধু গৃহস্থগণ সকল আশ্রমিগণের অবলম্বন। তাঁহাদের উপযোগিতাই সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহাই মহাভারতের অভিপ্রায়।

বানপ্রস্থের কাল—গৃহী যখন পুত্রপৌত্রপরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তখনই তাঁহাকে সংসারে নিঃস্পৃহ হইতে হইবে। জীবনের তৃতীয় ভাগে (পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর) বানপ্রস্থ আশ্রমের কার্য্য-কলাপ অনুষ্ঠেয়। দেহে বার্দ্ধক্যের সূচনা হইলেই গৃহী সংসারসম্পত্তি পুত্রাদির হাতে সমর্পণ করিয়া সংসারের সহিত সম্পর্কশূন্য জীবনযাপন করিবেন। ঈশ্বরচিন্তায় কাল কাটাইবার নিমিত্ত গৃহী অরণ্য আশ্রয় করিবেন। গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে হয়, এই কারণে আশ্রমের সংজ্ঞা বানপ্রস্থ।[২৯]

সপত্নীক বানপ্রস্থ—পত্নীও যদি পতির সহিত বনগমনে ইচ্ছুক হন, তবে পত্নীকে সঙ্গে লইয়া গৃহী বনে প্রস্থান করিবেন, তাহা না হইলে পত্নীকে পুত্রাদির নিকটেই রাখিয়া যাইবেন।[৩০]

এবমাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্। শা ২৯৫।৩৯
শা ৬১।১৫। শা ৬৬।৩৫। আদি ৩।৩৯০। শা ১২।১২। শা ৩৩৪,২৬।
অশ্ব ৪৫।১৩

২৮ শা ৩২০ তম অঃ। শা ৬১।১০

২৯ তৃতীয়মায়ুষো ভাগং বানপ্রস্থাশ্রমে বসেৎ। শা ২৪৩।৫। উ ৩৭।৩৯। শা ২৩৩।৭

৩০ সদারো বাপ্যদারো বা আত্মবান্ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। ইত্যাদি। শা ৬১।৪

বানপ্রস্থগণের কৃত্য—বানপ্রস্থ অবলম্বনের পর উপনিষৎ প্রভৃতি আরণ্যক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিয়ম ছিল।[৩১]

বানপ্রস্থগণ তীর্থক্ষেত্রাদিতে অথবা নদীপ্রস্রবণাদিবহুল অরণ্যে তপশ্চর্য্যায় কালযাপন করিতেন। সাধারণ জনসমাজের সহিত চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহাদের মিল ছিল না। গৃহস্থোচিত বসনভূষণ ও খাদ্য তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বন্য ওষধি, অযত্নলভ্য ফলমূল আর শুষ্কপত্র তাঁহাদের ক্ষুধা নিবারণ করিত। তাঁহারা নদী ও ঝরনার জল ব্যবহার করিতেন। ভূমি, শিলাতল, বালুকা এবং ভস্মরাশি তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ শয্যা। কাশ, কুশ, চর্ম্ম এবং বল্কল তাঁহাদের পরিধেয়। ক্ষৌরকর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। একমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের শরীরধারণ। সর্ব্বভূতে মৈত্রীপ্রতিষ্ঠা বৈখানসধর্ম্মের সারমর্ম্ম। যথাকালে স্নানাদি সমাপনান্তে পবিত্র হইয়া হোমের অনুষ্ঠান করা, সমিৎ, কুশ, পুষ্প প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক দ্রব্যের আহরণ এবং পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অনুকূল চিন্তাতে কালযাপন করাই বৈখানসধর্ম্ম। যিনি এইভাবে তৃতীয় আশ্রমের কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি সমস্ত কলুষতার হাত হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন।[৩২] সমস্ত কলুষ হইতে মুক্ত, স্বাবলম্বী, দাতা, পরোপকারী, সর্ব্বভূতহিতে রত, আহারবিহারাদিতে সংযমী আরণ্যক ঋষি উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। অগ্নিহোত্রী গৃহস্থ অগ্নিসহ অরণ্যে গমন করিবেন, আহারবিহার প্রভৃতিতে সংযত হইয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগে শরীরধারণের উপযোগী ফলমূলাদি গ্রহণ করিবেন। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস যাগ, চাতুর্মাস্য প্রভৃতিতে যে হবিঃ (আহুতির প্রধান উপকরণ) ব্যবহার করিবেন, তাহা অনায়াসলভ্য এবং অরণ্যজাত হইবে।[৩৩]

চারিপ্রকারের বানপ্রস্থ—বানপ্রস্থাশ্রমেও চারিপ্রকারের বৃত্তির উল্লেখ আছে—সদ্যঃ-(প্রাত্যহিক) সঞ্চয়, মাসিকসঞ্চয়, বার্ষিকসঞ্চয় এবং দ্বাদশ-

৩১ তত্রারণ্যকশাস্ত্রাণি সমধীত্য স ধর্ম্মবিৎ।
ঊর্দ্ধরেতাঃ প্রব্রজিত্বা গচ্ছত্যক্ষরসাত্মতাম্॥ শা ৬১।৫। শা ২৪২।২৯

৩২ শা ১৯২।১,২। অনু ১৪২।১-১৯

৩৩ তানেবাগ্নীন্ পরিচরেদ্ যজমানো দিবৌকসঃ। ইত্যাদি। শা ১৪৩।৫-৭। আদি ৯১।৪

বার্ষিক-সঞ্চয়। একবৎসর বা বার বৎসরের উপযোগী খাদ্য যাঁহারা সংগ্রহ করিতেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইত অতিথিসেবা এবং যজ্ঞানুষ্ঠান।[৩৪]

বৈখানসধর্ম্মের উদ্দেশ্য—অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন বৈখানসধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। পরমাত্মদর্শনের নিমিত্ত আপনাকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যেই গৃহীকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হয়।[৩৫]

ধৃতরাষ্ট্রাদির বানপ্রস্থ-গ্রহণ—ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়ের বানপ্রস্থগ্রহণের চিত্র আশ্রমবাসিকপর্ব্বে চিত্রিত হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র বল্কল এবং অজিন পরিধানপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র-হোমের সংস্কৃত অগ্নি সঙ্গে লইয়া গান্ধারী-সহ বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ভাগীরথীতীরস্থ অরণ্যে তপস্বিপরিবৃত ধৃতরাষ্ট্র-প্রমুখ বৈখানসধর্ম্মাবলম্বিগণ কুশশয্যায় শয়ন করিতেন।[৩৬]

কেকয়রাজ শতযূপ—অরণ্যে আরও অনেক বানপ্রস্থ তাঁহাদেরই মত আরণ্যক ধর্ম্মাচরণে কাল কাটাইতেন। কেকয়রাজ শতযূপ কুরুক্ষেত্রের কোন এক আশ্রমে থাকিয়া বৈখানসধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন, তাঁহার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের দেখা হইয়াছিল।[৩৭]

যযাতি—গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রচুর বিষয়-উপভোগের পর যযাতি বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলমূলের দ্বারা শরীর ধারণ করিয়া যথাশাস্ত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে তিনি স্বর্গে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[৩৮]

পাণ্ডুর অবৈধ বানপ্রস্থ—মহারাজ পাণ্ডুর বানপ্রস্থের উল্লেখ আছে। তিনি সস্ত্রীক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃগরূপধারী কিন্দম-মুনিকে হত্যা করার পর তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, সাময়িক নির্ব্বেদই তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ। শাস্ত্রীয় সময় অনুসারে তিনি বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন নাই।[৩৯]

৩৪ বানপ্রস্থাশ্রমেঽপ্যেতাশ্চতস্রো বৃত্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
সদ্যঃ-প্রক্ষালকাঃ কেচিৎ কেচিন্মাসিকসঞ্চয়াঃ॥ ইত্যাদি। শা ২৪৩।৮-১৪

৩৫ সর্ব্বেষেবর্ষিধর্ম্মেষু জ্যেয়োঽঽত্মা সংযতেন্দ্রিয়ৈঃ। অনু ১৪১।১০৮

৩৬ আশ্র ১৫শ ও ১৮শ অঃ।

৩৭ আসসাদাথ রাজর্ষিং শতযূপং মনীষিণম্॥ ইত্যাদি। আশ্র ১৯।৯,১০

৩৮ আদি ৮৬ তম অঃ।

৩৯ আদি ১১৯ তম অঃ।

রাজর্ষিগণের নিয়ম—শেষ জীবনে বনে বাস করা রাজর্ষিদের অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল।[৪০]

সন্ন্যাস—জীবনের শেষ ভাগে বানপ্রস্থাশ্রম যাপন করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের বিধান ছিল। শরীর যখন নিতান্ত জরাগ্রস্ত, নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত, তখন প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত ত্যাগ করিবার বিধান করা হইয়াছে। শাস্ত্রীয় বিধানে বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করাই সন্ন্যাস। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে ইচ্ছা করিলে নিজের শ্রাদ্ধাদি নিজেই সম্পন্ন করিতে পারা যায়।

সন্ন্যাসীর কৃত্য—সন্ন্যাসাশ্রমে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কাহাকেও সঙ্গে রাখিতে নাই। কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডন করাই নিয়ম।[৪১]

গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ এই উভয় আশ্রমের সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আপনাকে সন্ন্যাসের উপযুক্ত করিয়া তোলা এক বিশেষ সাধনা। যথার্থ আশ্রমকর্ম্মের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি জন্মে, চিত্তশুদ্ধিই পরম তত্ত্ব সাক্ষাৎকারে প্রধান সহায়। ভিক্ষুর ধর্ম্মাচরণে অন্যের সহায়তার আবশ্যক হয় না। বিধিপূর্ব্বক অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্যাগী যোগী যৎকিঞ্চিৎ উদরান্নের নিমিত্ত গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। ভিক্ষাপাত্র ও গৈরিক বসন তাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই। মান-অপমান সকলই তাঁহাদের পক্ষে সমান। একমাত্র ঈশ্বরচিন্তা ভিন্ন সমস্ত বিষয়ে উদাসীনতাই ভিক্ষুর যথার্থ লক্ষণ।[৪২] সর্ব্বভূতে সমভাব ও মৈত্রী সন্ন্যাসীর হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। আত্মচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী সর্ব্বভূতের কল্যাণচিন্তা করিবেন। হৃদয় অশুচি থাকিলে দণ্ডধারণ, মুণ্ডন, উপবাস, অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মচর্য্য, বনবাস প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়[৪৩]

৪০ রাজর্ষীণাং হি সর্ব্বেষামন্তে বনমুপাশ্রয়ঃ॥ আশ্র ৪।৫

৪১ জরয়া চ পরিদ্যূনো ব্যাধিনা চ প্রপীড়িতঃ।
চতুর্থে চায়ুষঃ শেষে বানপ্রস্থাশ্রমং ত্যজেৎ॥ ইত্যাদি। শা ২৪৩।২২-৩০

৪২ শা ২৪৪ তম অঃ।
নিস্তুতির্নির্নমস্কারঃ পরিত্যজ্য শুভাশুভে।
অরণ্যে বিচরৈকাকী যেন কেনচিদাশিতঃ॥ শা ২৪১।৯। অনু ১৪১।৮০-৮৮

৪৩ সর্ব্বাণ্যেতানি মিথ্যা স্যুর্যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ। বন ১৯৯।৯৭। শা ২৪৪ তম অঃ।

চারিপ্রকারের সন্ন্যাসী—ভিক্ষুগণকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে (ক) কুটীচক, (খ) বহূদক, (গ) হংস, (ঘ) পরমহংস। (ক) কুটীচক সন্ন্যাসিগণ একস্থানে বসিয়াই ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকেন। আপন স্ত্রীপুত্রাদি হইতেও ভিক্ষাগ্রহণ করিতে ইঁহাদের কোন বাধা নাই। (খ) বহূদক সন্ন্যাসিগণ সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, দণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, যজ্ঞোপবীত, কাষায় বস্ত্র প্রভৃতি ত্যাগ করেন না। ইঁহারা তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া সাধনা করেন। কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসিগণ ত্রিদণ্ড ধারণ করেন। (গ) হংস সন্ন্যাসিগণও শিখাদি রাখেন বটে, কিন্তু কোথাও এক রাত্রির অধিক কাল বাস করেন না। ইঁহারা একটি মাত্র দণ্ড ধারণ করেন। (ঘ) পরমহংস সমস্ত বিধিনিষেধের ঊর্দ্ধে। ইঁহাদের শৌচাশৌচ বিচার না থাকিলেও কোন বাধা নাই, ইঁহারাও একদণ্ডধারী। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ ইঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, ইঁহারা নিস্ত্রৈগুণ্য।[৪৪]

সন্ন্যাসাশ্রমের ফল—শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসাশ্রমের ধর্ম্ম পালনের ফল ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি।[৪৫]

সন্ন্যাসিগণের পরহিতৈষণা—বহূদক সন্ন্যাসিগণ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সমাজের নানারূপ কল্যাণ সাধন করিতেন। কাম্যক-বনে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের সহিত দেখা হইলে ঋষি মৈত্রেয় কৌরবদের কল্যাণের নিমিত্ত কুরুসভায় আসিয়া পাণ্ডবদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।[৪৬] বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়, বৃহদশ্ব, লোমশ প্রমুখ ঋষিগণের পরহিতৈষণা স্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছে।

যোগজ বিভূতি অপ্রকাশ্য—ভিক্ষুগণ উদরান্নের জন্য সাধু গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হইবেন; কিন্তু কোন প্রকারের পাণ্ডিত্য বা যোগবিভূতি প্রকাশ করিয়া ভিক্ষা আদায় করা অতীব গর্হিত।[৪৭]

৪৪ চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচকবহূদকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥ অনু ১৪১।৮৯। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

৪৫ নিরাশী স্যাৎ সর্ব্বসমো নির্ভোগো নির্ব্বিকারবান্।
বিপ্রঃ ক্ষেমাশ্রমং প্রাপ্তো গচ্ছত্যক্ষরসাম্যতাম্। শা ৬১।৯। শা ২৪১।৮। শা ১৯২।৩

৪৬ বন ১০ম অঃ।

৪৭ এবস্তে বান্তমশ্নাতি স্ববীর্য্যস্তোপসেবনাৎ॥ উ ৪২।৩৩

আশ্রম-ধর্ম্ম পালনের পরিণতি—আশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মনুষ্যের জীবন একটি নিয়ন্ত্রিত পথ ধরিয়া চলিতে পারিত, সন্দেহ নাই। কর্ম্মপটু গৃহস্থ সাজিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগিতা কত বেশী, তাহা সেই সময়কার সমাজের পরিচালকগণ উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে গার্হস্থ্যাশ্রমকে যে সর্ব্বাপেক্ষা মধুময় করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহাও মহাভারতে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়াছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অথবা সন্ন্যাসের প্রতি অত্যধিক প্রেরণা যে মহাভারতের উদ্দেশ্য নহে, গার্হস্থ্যের শতমুখী প্রশংসা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত আশ্রমের মধ্যে এরূপ একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যে সূত্রটি কোথাও ছিন্ন হইলে জীবনের মূল সুর যথাযথভাবে ঝঙ্কৃত হইবে না, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। জীবনের এক-একটি স্তরকে এক-একটি আশ্রমের নিয়মানুগ করায় সেই যুগের সমাজস্থিতির একটি মহতী পরিণতির কল্পনা আমরা করিতে পারি। আশ্রম-ধর্ম্ম যে খুব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া পরিচালিত হইত, সেই বিষয়ে সম্ভবতঃ কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই। মহাভারতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, সকলের জীবনে যথাশাস্ত্র আশ্রম-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই। দ্রোণাচার্য্য বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত (৮০ বৎসর) গৃহস্থই ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃষ্ণ, ইঁহাদের কেহই যথাসময়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন নাই। ভীষ্মের কথা আমাদের আলোচ্য নহে, তিনি ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। এইসকল ব্যতিক্রম দেখিয়া মহাভারতের সময়ে আশ্রমধর্ম্ম শিথিল হইয়া গিয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। ইঁহারা প্রত্যেকেই বিশেষ ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া, ঠিক সময়ে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন নাই, অথবা আশ্রমান্তর গ্রহণ অপেক্ষা সেই সময়কার মহাযুদ্ধে যোগ দেওয়াই তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। আশ্রম-ধর্ম্মের ফলকীর্ত্তনে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী যদি নিষ্ঠার সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরম গতি (মুক্তি) প্রাপ্ত হন।[৪৮]

৪৮ ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
যথোক্তচারিণঃ সর্ব্বে গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্॥ শা ২৪২।১৩

শিক্ষা

'চতুরাশ্রম'-প্রবন্ধে ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ব্রহ্মচারীকে বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। শাস্ত্রবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে। কারণ এই দুইপ্রকার বিদ্যার শিক্ষাপদ্ধতিই মহাভারতে প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যান্য শিক্ষা আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত—প্রত্যেক বিদ্যার্থীকেই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ হইতে আমরা বুঝিতে পারি, মনেপ্রাণে উচ্চভাব পোষণ করা, যাবতীয় ক্ষুদ্রতার বাহিরে থাকিয়া মহান্ আদর্শের অনুসরণ করা, উন্নত চিন্তার সহিত শরীর ও মনকে ক্রমশঃ উন্নততর করা, সমস্ত-রকম অপচয়ের গ্রাস হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া উপচয়ের চেষ্টা করা, ইহাই ব্রহ্মচর্য্য। মনের স্থির সঙ্কল্পকে ব্রত বলা হয়। ব্রহ্মচর্য্যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বিদ্যার্থীকে সাধনা করিতে হইত। খুব কষ্টের মধ্য দিয়া কঠোর সংযমের সহিত শরীর ও মনকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা ছিল।

গুরুগৃহে বাস ও স্বগৃহে গুরুকে রাখা—শিক্ষার দুই রকম নিয়ম ছিল। কেহ কেহ গুরুগৃহে যাইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতেন; আবার কোন কোন পরিবারে গৃহ-শিক্ষক রাখার ব্যবস্থাও ছিল। শেষের ব্যবস্থাটি সম্ভবতঃ ধনিপরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহাও আবার সকল ধনিপরিবারে নহে। পরে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

শিক্ষা আরম্ভের বয়স—বিদ্যার্থী বাল্যকালেই অধ্যয়ন আরম্ভ করিতেন। যযাতি গার্হস্থ্য অবলম্বনের পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে আমি সমগ্র বেদই অধ্যয়ন করিয়াছি। ভীষ্ম শৈশবেই বশিষ্ঠের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। উপনয়ন-সংস্কারের পরেই ধৃতরাষ্ট্রাদির বেদাধ্যয়ন আরম্ভ হয়। ইহা-দ্বারা অনুমান করা যায়, ব্রাহ্মণবালকের পাঁচ হইতে আট বৎসরের মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের দশ হইতে এগার বৎসরের মধ্যে এবং বৈশ্যের এগার হইতে বার বৎসরের মধ্যে গুরুগৃহে যাত্রার সময়। এই সময়েই ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন-সংস্কার হইয়া থাকে। শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কার নাই, কিন্তু বার তের বৎসর বয়সে সম্ভবতঃ শূদ্রসন্তানেরও বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হইত।[১]

---

১ আদি ৮১।১৪। আদি ১০০।৩৫। আদি ১০৯।১৮

জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে শিক্ষা—ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের শিক্ষার কথা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। শূদ্রাগর্ভজাত মহামতি বিদুরের জ্ঞানবিজ্ঞানের তুলনা নাই। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সূতজাতীয় লোমহর্ষণ, সঞ্জয় এবং সৌতির জ্ঞানও কম নহে। সৌতি মহাভারতের প্রচারক। ইঁহারা সকল শাস্ত্রেই অভিজ্ঞ, বেদপাঠ না করিলেও পুরাণাদির সাহায্যে বেদাদির মর্ম্মার্থ অবগত ছিলেন। যুধিষ্ঠির যুযুৎসুকে হস্তিনাপুরী-রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই অজ্ঞানীর স্কন্ধে এতবড় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে যখন নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত দূত পাঠান হয়, তখন বলা হইয়াছে 'মান্য শূদ্রগণকেও নিমন্ত্রণ করিবে'। বিচক্ষণ না হইলে বোধ করি 'মান্য' বলা হইত না। রাজারা যে-সকল অমাত্যকে নিয়োগ করিতেন, তন্মধ্যে তিনজন শূদ্রকেও নিয়োগ করিতে হইত। যেমন-তেমন ব্যক্তিকে অমাত্যরূপে নিয়োগ করা চলে না।[২]

শিক্ষণীয় বিষয়—বেদ, আন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), বার্ত্তা (কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি) ও দণ্ডনীতি শিক্ষণীয় বিষয়রূপে পরিগণিত হইত। সকল বিদ্যার্থীই যে সকল বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন, তাহা নহে। কেহ কেহ একটি বিদ্যা, কেহ কেহ বা একাধিক বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। যুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গান্ধর্ব্বশাস্ত্র (নৃত্যগীতাদি), পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যান এবং কলাবিদ্যাও শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য হইত।[৩]

রাজাদের অবশ্য শিক্ষণীয়—হস্তিসূত্র, অশ্বসূত্র, রথসূত্র, ধনুর্ব্বেদ, যন্ত্রসূত্র (আগ্নেয় ঔষধের সাহায্যে সীসক, কাংস্য ও পাথরের নির্ম্মিত গোলকের প্রক্ষেপক লোহার নালকে নীলকণ্ঠ 'যন্ত্র' বলিয়াছেন। যন্ত্র ব্যবহারের সূত্র বা নিয়মপ্রণালী যে গ্রন্থে লিখিত, তাহাই যন্ত্রসূত্র। নীলকণ্ঠের লিপিভঙ্গিতে বুঝা যায়, যন্ত্রশব্দে তিনি বন্দুককে বুঝাইতে চাহেন; তাহা ঠিক কি না ভাবিবার

২ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ। ইত্যাদি। সভা ৩৩।৪১। শল্য ২৯।৯১
ত্রীংশ্চ শূদ্রান্ বিনীতাংশ্চ শুচীন্ কর্ম্মণি পূর্ব্বকে। শা ৮৫।৮

৩ ত্রয়ী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্ত্তা চ ভরতর্ষভ।
দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ ॥ শা ৫৯।৩৩
যুক্তিশাস্ত্রঞ্চ তে জ্ঞেয়ং শব্দশাস্ত্রঞ্চ ভারত। ইত্যাদি। অনু ১০৪।১৪৯

বিষয়।) এবং নাগরশাস্ত্র (নগরের হিতকার্য্যের জ্ঞানজনক বিদ্যা) রাজাদের বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।[৪]

ম্লেচ্ছ ভাষা—কেহ কেহ অপভ্রংশ-ভাষায়ও পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন। সম্ভবতঃ ভিন্নদেশীয় লোকজনের সংস্পর্শে আসায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেন। পাণ্ডবগণ যখন কুন্তীদেবী সহ বারণাবতে যাত্রা করেন, তখন বিদুর যুধিষ্ঠিরকে ভবিষ্যৎ বিপদের বিষয়ে সাবধান করিয়া কৌশলে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির ব্যতীত অপর কেহ সেই ভাষা বুঝিতে পারেন নাই। বিদুর কি বলিলেন, কুন্তী পরে তাহা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।[৫]

বিভিন্ন ভাষাবিৎ পণ্ডিত—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় গুণিগণের খুব সমাদর ছিল। বিভিন্ন ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণও রাজসভায় সম্মানিত হইতেন এবং রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া রাজসভার শ্রীবৃদ্ধি করিতেন।[৬]

বেদচর্চ্চা—তখনকার সমাজে বেদচর্চ্চার আধিক্য ছিল। সকল দ্বিজাতিকেই বেদপাঠ করিতে হইত। স্বাধ্যায় বা বেদপাঠের নিত্যতা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ দ্বিজাতিকে প্রত্যহই বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে, না করিলে পাপ হইবে। বেদ-বেদান্তের আলোচনার ব্যাপকতা বর্ণনা করিতে মহর্ষি দুইটি অস্বাভাবিক বর্ণনা করিয়াছেন। একটি, শক্তি-পুত্রের বেদাবৃত্তি এবং অপরটি, পিতার শাস্ত্রব্যাখ্যায় কহোড়-পুত্র অষ্টাবক্রের দোষারোপ। উভয় বেদজ্ঞই তখনও মাতৃগর্ভে। এই বর্ণনার সত্যতা বিশ্বাস করা যায় না। রূপকের সাহায্যে শুধু শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যাপকতা প্রদর্শিত হইয়াছে বোধ করি।[৭]

গুরুগৃহবাসের কাল—শিষ্যগণ কতকাল গুরুগৃহে থাকিবেন, তাহার কোন নিয়ম ছিল না। ('চতুরাশ্রম' প্রবন্ধ দ্রঃ ১০২তম পৃঃ) শৈশবেই শিক্ষা

৪ হস্তিসূত্রাশ্বসূত্রাণি রথসূত্রাণি বা বিভো। ইত্যাদি। সভা ৫।১২০,১২১
আদি ১০৯।১৯,২০। আদি ১২৬।২৯। স্ত্রী ১৩।২

৫ প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞপ্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞমিদং বচঃ।
প্রাজ্ঞং প্রাজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞং বচোঽব্রবীৎ। আদি ১৪৫।২০

৬ নিবাসং রোচয়ন্তি স্ম সর্ব্বভাষাবিদস্তথা। আদি ২০৭।৩৯

৭ আদি ১৭৭।১৫। বন ১৩২।২১

আরম্ভ হইত, কিন্তু কেহ কেহ সুদীর্ঘকাল গুরুগৃহেই বাস করিতেন। গুরুগৃহে থাকিতেই উত্তঙ্কের কেশ সাদা হইয়া গিয়াছিল। পরে তিনি বিবাহ করিয়াছেন।[৮]

শিষ্যসংখ্যা—গুরুগৃহের যে দুই চারিটি চিত্রের সহিত পরিচয় হয়, সেইগুলিতে শিষ্যের সংখ্যা বড় অস্পষ্ট। মহর্ষি বেদব্যাস জনমানববিহীন পর্ব্বততটে গুরুর আসনে উপবিষ্ট, পদপ্রান্তে বিদ্যার্থী মাত্র চারিজন ; সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈল।[৯] উদ্দালক-নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে একজনের নাম ছিল কহোড়। কহোড় যখন পণ্ডিত হইয়া সমাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহারও কয়েকজন অন্তেবাসী উপস্থিত হইলেন। এক স্থানে লিখিত আছে, একদা তিনি শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনা করিতেছিলেন, তাঁহার পত্নীগর্ভস্থ পুত্র অষ্টাবক্র পিতার ব্যাখ্যায় দোষ ধরিলেন। পুত্রের আচরণে শিষ্যগণের মধ্যে মহর্ষি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন।[১০] এই উক্তিতে আমরা বুঝিতে পারি, কহোড়ের নিশ্চয়ই একাধিক শিষ্য ছিলেন। আচার্য্য ধৌম্যের উপমন্যু, আরুণি ও বেদ-নামে তিনজন শিষ্য ছিলেন।[১১] কণ্ব-মুনির মনোহর আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই রাজা দুষ্মন্ত বহ্বৃচমুখ্যের পদক্রমযুক্ত বেদধ্বনি, নিয়তব্রত ঋষিগণের সুমধুর সামগীতি, সংহিতা প্রভৃতির আবৃত্তি শুনিতে পাইয়াছিলেন। সেখানেও অন্তেবাসীর সংখ্যা ঠিক করা যায় না। তবে একসঙ্গে নানারূপ আবৃত্তি চলিতেছিল বলিয়া মনে হয়, সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না।[১২]

গুরুগৃহে বাসের চিত্র—কৃষিকর্ম্মে সহায়তা, গোপালন, হোমের নিমিত্ত কাষ্ঠ আহরণ প্রভৃতিও অন্তেবাসীদের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

ধৌম্য ও আরুণি—আচার্য্য ধৌম্য তাঁহার শিষ্য আরুণিকে ক্ষেত্রের আইল বাঁধিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। আরুণি যখন কোনও উপায়ে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজেই আইলের উপরে শুইয়া জল রুদ্ধ করিলেন।

---

৮ তস্য কাষ্ঠে বিলগ্নাভূজ্জটা রূপসমপ্রভা। অশ্ব ৫৬।১১

৯ বিবিক্তে পর্ব্বততটে পারাশর্য্যো মহাতপাঃ। ইত্যাদি। শা ৩২৭।২৬,২৭

১০ উপালব্ধঃ শিষ্যমধ্যে মহর্ষিঃ। বন ১৩২।১১

১১ আদি ৩।২১

১২ ঋচো বহ্বৃচমুখ্যৈশ্চ প্রের্য্যমাণাঃ পদক্রমৈঃ। ইত্যাদি। আদি ৭০।৩৭,৩৮

দিনান্তে অধ্যাপক আরুণিকে দেখিতে না পাইয়া অন্যান্য শিষ্যগণ সহ সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং আরুণিকে ডাকিতে লাগিলেন। শিষ্য উপাধ্যায়ের আহ্বানে উঠিয়া আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। গুরু অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তোমার অসাধারণ গুরুভক্তিতে আনন্দিত হইয়াছি। সমস্ত বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার অধিগত হইবে।" শিষ্য উপাধ্যায়কে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

উপমন্যুর গুরুভক্তি—উপমন্যু-নামে অন্য এক শিষ্য গুরু ধৌম্যের আদেশে গো-পালনে নিযুক্ত হইলেন। গুরু তাঁহাকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমাকে বেশ পুষ্ট দেখিতেছি, কি খাও?" শিষ্য উত্তরে কহিলেন, "প্রভো, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যই আমার আহার্য্য।" উপাধ্যায় বলিলেন, "গুরুকে নিবেদন না করিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গ্রহণ করা ত শিষ্যের উচিত নহে।" আবার কিছুদিন পরে গুরু সেই প্রশ্ন করিলেন। এবার শিষ্য উত্তরে বলিলেন, "প্রভো, আমি প্রথম বারের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আপনাকে নিবেদন করি, তার পর ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই, তাহাই খাইয়া থাকি।" গুরু বলিলেন "তাহাও উচিত নহে, ইহাতে অন্য ভিক্ষুকের বৃত্তি নষ্ট করা হয়, বিশেষত তোমারও লোভ বৃদ্ধি হইতেছে।" আবার কিছুদিন পরে গুরুর সেই প্রশ্নের উত্তরে উপমন্যু বলিলেন, "আমি এইসকল গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করি।" উপাধ্যায় তাহাও নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "আমি ত তোমাকে এই বিষয়ে অনুমতি দিই নাই, সুতরাং এবার দুগ্ধপানও চলিবে না।" আবার কিছুদিন পরে গুরুর সেই প্রশ্ন। উত্তরে শিষ্য বলিলেন, বাছুরগুলির মুখে যে ফেন লাগিয়া থাকে তাহাই তিনি পান করেন। গুরু বলিলেন, "বাছুরগুলি হয়ত তোমার প্রতি কৃপা করিয়া বেশী ফেন উদ্গীরণ করে, সুতরাং তাহাদের বৃত্তি নাশ করিতেছ।" উপমন্যু পূর্ব্বের মত সন্তুষ্ট চিত্তেই গরু চরাইতে লাগিলেন। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কয়েকটি আকন্দপাতা উদরস্থ করিলেন। আকন্দপাতা খাওয়ায় অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে যথাসময়ে আশ্রমে না দেখিয়া শিষ্যগণ সহ বনে গেলেন এবং ডাকিতে লাগিলেন। উপমন্যু কূপ হইতেই উত্তর করিয়া সমস্ত ঘটনা গুরুকে নিবেদন করিলেন। অতঃপর গুরুর উপদেশে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের আরাধনায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন। সুস্থ হইয়া উপমন্যু গুরুকে প্রণাম করিতেই

গুরু আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, সমস্ত বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র তোমাতে প্রতিভাত হইবে।"*

উপাধ্যায় ধৌম্যের আরও একজন অন্তেবাসীর নাম ছিল বেদ। তিনিও এইভাবে দীর্ঘকাল গুরুশুশ্রূষার ফলে সমস্ত বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন।[১৩]

আচার্য্য বেদের শিষ্যবাৎসল্য—উতঙ্ক বেদের শিষ্য ছিলেন। তিনিও দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হন। আচার্য্য বেদ গুরু-গৃহবাসের দুঃখকষ্ট সম্যক্ অনুভব করিতেন, কষ্টসাধ্য কর্ম্ম করা তাঁহার ভাল লাগিত না। এইকারণে তিনি আচার্য্য হইয়া যে-সকল অন্তেবাসীকে স্বগৃহে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সেরূপ কর্ম্মে নিয়োগ করিতেন না।[১৪] বেদের চরিত্র হইতে বুঝা যায়, কোন কোন গুরুর কঠোর আদেশ সকল শিষ্যের সহ্য হইত না।

শুক্রাচার্য্য ও কচ—বিদ্যালাভ সাধনাসাপেক্ষ। বৃহস্পতিনন্দন কচ যখন সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিখিবার উদ্দেশ্যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তখন আচার্য্য তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনের উপদেশ দিলেন। শিষ্যও আচার্য্যের আদেশ পালনে আত্মনিয়োগ করিলেন। সমিৎ, কুশ, কাষ্ঠ প্রভৃতি আহরণ করা, গরু চরান, গুরু ও গুরুকন্যার আদেশ পালন, ইহাই তাঁহার প্রাত্যহিক কর্ম্ম। এইরূপে দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া কচ অভিলষিত বিদ্যা লাভ করেন।[১৫]

দ্রোণাচার্য্যের শিক্ষা—দ্রোণাচার্য্য যখন পিতামহ ভীষ্মের নিকট প্রথম উপস্থিত হন, তখন নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন, "আমি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি অগ্নিবেশকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলাম। বহু বৎসর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া গুরুর শুশ্রূষায় রত ছিলাম।"[১৬]

* রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৪ সনের চৈত্রমাসে এই প্রবন্ধটি দেখিয়া এই স্থলে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন—"এরূপ প্রাণান্তকর নিষ্ঠুর পরীক্ষা গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের শোভন দৃষ্টান্ত নয়, জ্ঞানশিক্ষার পক্ষে ইহার একান্ত প্রয়োজনও বুঝিতে পারিনে—এরূপ ব্যবহার অস্বাভাবিক, ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই।"

১৩ আদি ৩য় অঃ।

১৪ দুঃখাভিজ্ঞো হি গুরুকুলবাসস্য শিষ্যান্ পরিক্লেশেন যোজয়িতুং নেয়েষ। আদি ৩।৮১

১৫ কস্মাচ্চিরায়িতোঽসীতি পৃষ্টস্তামাহ ভার্গবীম্।
সমিধশ্চ কুশাদীনি কাষ্ঠভারঞ্চ ভাবিনি। ইত্যাদি। আদি ৭৬।৩৫,৩৬

১৬ মহর্ষেরগ্নিবেশস্য সকাশমহমচ্যুত। ইত্যাদি। আদি ১৩১।৪০,৪১

অর্জ্জুনের তপস্যা—মহাদেব ও ইন্দ্রের নিকট হইতে অস্ত্র লাভ করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের কঠোর তপস্যা বর্ণিত হইয়াছে। এইসকল অমানুষিক বিষয়ে যদিও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে, তথাপি বিদ্যালাভে তপস্যার উপযোগিতা প্রদর্শনই সম্ভবতঃ এইগুলির উদ্দেশ্য।[১৭]

শুকদেবের গুরু বৃহস্পতি—ব্যাসপুত্র শুকদেব বৃহস্পতিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া বেদ, ইতিহাস, রাজধর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিদ্যা-প্রাপ্তির নিমিত্ত শুকদেবের তপস্যাও বর্ণিত হইয়াছে।[১৮]

শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারে বিদ্যাদান—শিষ্যের যোগ্যতা না বুঝিয়া কোন আচার্য্য উপদেশ দিতেন না ; সর্ব্বাগ্রে অধিকারী স্থির করিতে হইবে, কাহার কতটুকু গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, বিশেষরূপে তাহা পরীক্ষা না করিয়া আচার্য্যগণ কিছুই বলিতেন না।[১৯]

অধ্যাত্মবিদ্যায় অধিকারী—তপস্যায় শরীর ও মন প্রস্তুত না হইলে আচার্য্যগণ হইতে কিছুই আদায় করা যাইত না। অধ্যাত্মশাস্ত্র-শ্রবণের অধিকারবিষয়ে খুব কড়াকড়ি দেখা যায়। শুদ্ধ, শান্ত, শ্রদ্ধাবান্, আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন, গুরুভক্ত মুমুক্ষুকেই আচার্য্যগণ ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।[২০]

শিষ্যের কুল ও গুণ-পরীক্ষা—সোনাকে যেরূপ আগুনে তাপ দিয়া, কাটিয়া এবং নিকষপাথরে ঘষিয়া খাঁটি কি না পরীক্ষা করা হয়, সেইরূপ শিষ্যকেও নানা উপায়ে তাহার কুল এবং গুণ পরীক্ষা করিয়া উপদেশ দিবার নিয়ম ছিল।[২১]

বেদে শূদ্রের অনধিকার—শিষ্যের কুল পরীক্ষা করিবার একটি কারণও আছে। সকল বর্ণের সকল বিদ্যায় অধিকার নাই। বেদে শূদ্রের অধিকার নাই। সম্ভবতঃ শূদ্রগণ বৈদিক অনুষ্ঠানাদিকে ততটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন না, আচার্য্যেরাও তাঁহাদিগকে বেদের উপদেশ দিতেন না।

১৭ বন ৩৮।২৩—২৯

১৮ শা ৩২৪।২৩—২৫

১৯ অহমেব চ ত্বং কালং বেৎস্যামি কুরুনন্দন। আদি ২৩৪।১১

২০ তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। ভী ২৮।৩৪
গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা। অনু ৫৭।১২। অনু ১৩০।৬। অনু ১৩৩।২। অনু ১৩৪।১৭

২১ নাপরীক্ষিতচারিত্রে বিদ্যা দেয়া কথঞ্চন। ইত্যাদি। শা ৩২৭।৪৬,৪৭

ারা শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, আচার্য্যগণ
াদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের জাতিবর্ণ না
নিয়া উপদেশ দিতেন না।[২২]

শস্ত্রবিদ্যায় সম্ভবতঃ জাতিবিচার ছিল না, (দ্রোণ ও কর্ণ)—কর্ণ
দিন সরহস্য ব্রহ্মাস্ত্র-বিদ্যা গ্রহণের নিমিত্ত নির্জ্জনে দ্রোণের নিকট উপস্থিত
ল আচার্য্য তাঁহাকে প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে জাতির দোহাই দিয়া
লেন, "একমাত্র ব্রাহ্মণই ব্রহ্মাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং তোমাকে এই
। দান করিতে পারিব না।[২৩] একমাত্র ব্রাহ্মণই যদি অধিকারী হন, তবে
ুন কিরূপে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিলেন, কর্ণের এই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।
চার্য্য যেন এই সন্দেহের কথা ভাবিয়াই তাহা নিরাসের নিমিত্ত কর্ণকে
লেন, "যে ক্ষত্রিয় যথারীতি তপস্যা করিয়াছেন, তিনিও ব্রহ্মাস্ত্রে
কারী।"[২৪] আচার্য্যের এই উক্তি যথার্থ নহে। কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করাই
তাঁহার উদ্দেশ্য, পূর্ব্ব শ্লোকের দ্বারা তাহা বেশ বুঝা যায়। কর্ণ প্রার্থনা
াইতেই আচার্য্য অর্জ্জুনের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ এবং কর্ণের
রাত্ম্য স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উদ্দেশ্যে জাতির কথা
নয়াছিলেন।[২৫] কর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন, সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্রলাভে তাঁহার অধিকার
ই, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অর্জ্জুনের প্রতি পক্ষপাত এবং কর্ণের
রাত্ম্য স্মরণ, এই দুইটি কথার কোন সার্থকতা থাকে না।

দ্রোণ ও একলব্য—মহাবীর একলব্যের ইতিবৃত্তে আমরা একই কথা
ই। নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য ধনুর্ব্বিদ্যা-গ্রহণের উদ্দেশ্যে
চার্য্য দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইলে আচার্য্য তাঁহাকে শিষ্যরূপে
ণ করিলেন না। কারণ দুইটি; প্রথমতঃ, একলব্য জাতিতে নিষাদ,
তীয়তঃ, ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলে যদি অর্জ্জুনাদি শিষ্য
পেক্ষা অধিকতর বীর্য্যবান্ হইয়া উঠেন। যদি একমাত্র নিষাদবংশে জন্মই

[২২] ন চ তাং প্রাপ্তবান্ মূঢ়ঃ শূদ্রো বেদশ্রুতিমিব। সভা ৪৫।১৫। বন ৩১।৮

[২৩] ব্রহ্মাস্ত্রং ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ। শা ২।১৩

[২৪] ক্ষত্রিয়ো বা তপস্বী বা নান্যো বিদ্যাৎ কথঞ্চন। শা ২।১৩

[২৫] দ্রোণস্তথোক্তঃ কর্ণেন সাপেক্ষঃ ফাল্গুনং প্রতি।
দৌরাত্ম্যঞ্চৈব কর্ণস্য বিদিত্বা তমুবাচ হ॥ শা ২।১২

একলব্যের অনধিকারের কারণ হইত, তাহা হইলে আচার্য্যের অন্য চিন্তা অবকাশ কোথায়? একলব্যের আকৃতি খুব বীরত্বব্যঞ্জক ছিল, আ আচার্য্য সম্ভবতঃ তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, এই বীর ধনুর্ব্বিদ্যায় উ শিক্ষা লাভ করিলে অর্জ্জুন-প্রমুখ শিষ্যের গৌরব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশ আছে।[২৬] এখানে আরও একটি প্রশ্ন উঠে। যদি একমাত্র অর্জ্জুনা শিষ্যগণের উন্নতি-কামনায়ই আচার্য্য একলব্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে তবে "নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্" এই কথার কোন সঙ্গতি হয় না। সামঞ্জস্যে অনুরোধে বলিতে হয়, নিষাদেরা অনেক সময় অনাবশ্যক প্রাণিহত্যা করে হত্যা করা যেন তাহাদের আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় যদিও একলব্য রাজার পুত্র, তথাপি জন্মগত স্বভাবসিদ্ধ ক্রূরতা হইতে হয় মুক্ত নহেন। সুতরাং তিনি যদি ধনুর্ব্বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শিতা লা করেন, তাহাতে জগতের অকল্যাণের আশঙ্কাই বেশী। ইহাই হয় আচার্য্য দ্রোণের চিন্তার কারণ ছিল। তাহা না হইলে দুইটি হেতু সামঞ্জস্য রক্ষা করা শক্ত। দ্রোণের বাক্য হইতেই অনুমিত হয়, শস্ত্রবিদ্যা গ্রহণে সম্ভবতঃ কাহারও জাতি অন্তরায় হইত না।

শূদ্রের শাস্ত্রজ্ঞান—বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ-প্রমুখ মহাজ্ঞানিগণের অসাধার পাণ্ডিত্য হইতে অনুমিত হয়, তাঁহারা অধ্যাত্মশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিদুর ব্রাহ্মণের ঔরসজাত, সুতরাং জননী শূ হইলেও তিনি ব্রাহ্মণই ছিলেন, তাই বেদবেদান্ত অধ্যয়নে তাঁহার কোন বা ছিল না। এই মত খুব দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রজাগরপর্ব্বে দেখি পাই, মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে নানাবিধ নীতিবাক্য শুনাইতেছেন, ধৃতরাষ্ট্র তন্ময় হইয়া শুনিতেছেন। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "বিদুর, অতি বিচি কথা শুনাইলে, আর যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহাও বল।"[২৭] বিদু বলিলেন, "রাজন্, সনৎকুমার বলিয়াছেন, মৃত্যু-নামে কিছুই নাই তিনিই আপনাকে সমস্ত গুহ্য ও প্রকাশ্য তত্ত্ব উপদেশ দিবেন।" ধৃতরা

---

২৬ ন স তং প্রতিজগ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্।
শিষ্যং ধনুষি ধর্ম্মজ্ঞস্তেষামেবান্ববেক্ষয়া॥ আদি ১৩২।৩২

২৭ অনুক্তং যদি তে কিঞ্চিদ্বাচা বিদুর বিদ্যতে।
তন্মে শুশ্রূষতো ব্রূহি বিচিত্রাণি হি ভাষসে॥ উ ৪১।১

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তিনি যাহা বলিবেন, তুমি কি তাহা জান না? যদি জান, তবে তুমিই বল।" বিদুর উত্তর করিলেন, "আমি শূদ্রার গর্ভে জন্মিয়াছি, সুতরাং বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কুমার সনৎসুজাতের জ্ঞান যে শাশ্বত, তাহা আমি জানি। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সুগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিলেও দেবতাদের নিন্দনীয় হইতে হয় না।"[২৮] এইখানে দেখিতেছি, বিদুর আপনাকে শূদ্র বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন এবং সেইজন্য নিজে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। ইহা বিদুরের সুবিবেচনা সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সবই জানিতেন।

শাস্ত্রীয় উপদেশ-শ্রবণে সকলেরই অধিকার—শূদ্র-মুনি-সংবাদে উক্ত হইয়াছে, নিকৃষ্ট বর্ণকে, অর্থাৎ শূদ্রকে কোন উপদেশ দিতে নাই। একটু পরেই বলা হইয়াছে, কেহ প্রশ্ন না করিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন উপদেশ দিতে নাই, শ্রদ্ধাবনত জিজ্ঞাসুকে যথার্থ উত্তর দিতে হইবে। যেরূপ উপদেশ দিলে জিজ্ঞাসুর ধর্ম্মলাভ হয়, সেইরূপ উপদেশই দিতে হইবে। এই অধ্যায়ে আরও দেখা যায়, শূদ্রকে পিতৃকার্য্যে উপদেশ দেওয়ায় এক মুনি পরজন্মে পুরোহিতরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পৌরোহিত্যের নিন্দা করাই এই উপাখ্যানের উদ্দেশ্য। উপদেশশ্রবণে শূদ্রের অনধিকার-প্রদর্শন উদ্দেশ্য নহে।[২৯]

জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অধ্যাপকতা—একমাত্র ব্রাহ্মণগণই যে উপদেশ দানের অধিকারী, এই মতের বিরুদ্ধ উদাহরণ মহাভারতে দুর্লভ নহে। মিথিলানিবাসী একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যাধ, তপস্বী ব্রাহ্মণ কৌশিককে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন।[৩০] অন্যত্র দেখা যায়, একজন মুদী উপদেষ্টা এবং একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ শ্রোতা।[৩১] রাজর্ষি জনক মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবকে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। (উপনিষদাদিতেও দেখা যায়, অনেক গুহ্য তত্ত্ব ক্ষত্রিয়দেরই জানা ছিল, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার

২৮ শূদ্রযোনাবহং জাতো নাতোঽন্যদ্বক্তুমুৎসহে।
কুমারস্য তু যা বুদ্ধির্বেদ তাং শাশ্বতীমহম্॥ ইত্যাদি। উ ৪১।৫,৬

২৯ ন চ বক্তব্যমিহ হি কিঞ্চিদ্ বর্ণাবরে জনে। অনু ১০।৬৮। অনু ১০।৫৫, ৫৬

৩০ বন ২০৬ তম অঃ।

৩১ শা ২৬০ তম অঃ।

করিয়া সেইসকল তত্ত্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।) রাজর্ষি জনকের অধ্যাত্ম বিদ্যার খ্যাতি খুব বেশী ছিল। শুকদেব তাঁহার পিতার আদেশ-অনুসারে রাজর্ষিসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। রাজর্ষি কোন দ্বিধাবোধ না করিয়া নিঃসঙ্কোচে ব্রাহ্মণতনয়কে উপদেশ দিতে লাগিলেন।[৩২] মহাভারতের কথক ত সূতজাতীয় ছিলেন। ঋষিগণ তাঁহার মুখ হইতে মহাভারত শ্রবণ করিয়াছেন। একমাত্র ব্রাহ্মণগণই যদি উপদেষ্টা হইতেন, তবে এইসকল বর্ণনার সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না।

হীনবর্ণ হইতে বিদ্যাগ্রহণ—নিজ অপেক্ষা হীন বর্ণের অধ্যাপক হইতে বিদ্যাগ্রহণ করিবে, এইরূপ বিধানও পাওয়া যায়। নীচ এবং শূদ্র হইতে জ্ঞান আহরণ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।[৩৩]

সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরই অধ্যাপকতা—জ্ঞানালোচনায় ব্যাপৃত থাকা ব্রাহ্মণদেরই কর্ম্ম, তাঁহারাই গুরুর আসন অধিকার করিতেন। অধ্যাপনা তাঁহাদের জীবিকা। এইকারণে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেশী প্রসার লাভ করিয়াছিল। ('বৃত্তিব্যবস্থা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)[৩৪]

গুরুপরম্পরায় বিদ্যাবিস্তৃতি—সেই যুগে সমস্ত বিদ্যাই গুরুপরম্পরায় বিস্তৃতি লাভ করিত। মুখে-মুখেই আচার্য্যগণ উপদেশ দিতেন, আর শিষ্যেরা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিতেন, পুনঃ পুনঃ মনন করিয়া শ্রুত বিষয়কে আয়ত্ত করিতেন, লেখাপড়ার ব্যবহারও ছিল। গুরু হইতে উপদেশ-গ্রহণ ব্যতীত বিদ্যালোচনা সেই কালে নিষিদ্ধ ছিল।[৩৫] দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে শিষ্যরূপে গ্রহণ না করিলেও একলব্য নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে ধনুর্বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি, তিনি মাটী দিয়া দ্রোণের একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইলেন। তারপর সেই মূর্ত্তির পদমূলে বসিয়া ধনুর্ব্বেদে তপস্যা করিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ তপস্যাই তাঁহাকে সিদ্ধির সন্ধান দিয়াছিল।

৩২ শা ৩২৬ তম অঃ।

৩৩ শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যাং হীনাদপি সমাপ্নুয়াৎ। শা ১৬৫।৩১। শা ৩১৮।৮৮

৩৪ ভূমিরেতৌ নিগিরতি সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাপ্যযোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্॥ ইত্যাদি। উ ৩৩।৫৭। অনু ৩৬।১৬ শা ৭৮।৪৫

৩৫ ন বিনা গুরুসম্বন্ধং জ্ঞানস্যাধিগমঃ স্মৃতঃ। শা ৩২৬।২২। অনু ৯৩।১২৩

গ্রন্থাদির অস্তিত্ব—গুরু হইতে বিদ্যাগ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায়ে আলোচনার নিষেধ থাকায় মনে হয়, আরও কোন পথ ছিল। অন্য কোন উপায়ই যদি না থাকিত, তবে অলীক অপ্রসিদ্ধ বস্তুর নিষেধ করা চলে না। কোনও পথ ছিল, এই সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তবে পুঁথি ছাড়া সেই পথ আর কি হইতে পারে? বিদ্যার্থিসমাজে কালি-কলম একত্র করার যদিও কোন উল্লেখ নাই, তথাপি মহাভারতের রচনার আলোচনায় মনে হয়, তখনকার সমাজ লিপিবিদ্যার সহিত পরিচিত। ব্যাসদেবের প্রার্থনায় গণেশ মহাভারত লিখিয়াছিলেন। বক্তা ব্যাসদেব এবং লেখক গণেশ।[৩৬]

ঐতিহাসিক-দৃষ্টিতে এই উপাখ্যানের মূল্য না থাকিলেও লেখনী ব্যবহারের সমর্থক-রূপে ইহার উপযোগিতা আছে। এই উপাখ্যান পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ব্যাস বৈশম্পায়ন-প্রমুখ শিষ্যগণকে মুখে-মুখে ভারতকথা শুনাইয়াছিলেন, সেখানে পুঁথির কোন উল্লেখ নাই। বৈশম্পায়ন যখন জনমেজয়কে শোনান, তখনও মুখে-মুখেই। লোমহর্ষণপুত্র সৌতিকে যখন মহাভারতের বক্তৃরূপে দেখি, তখনও পুঁথির কোন কথা নাই। অথচ গণেশের লিখনকাহিনী গোড়াতেই সংযোজিত হইয়াছে। মহাভারতের সমাপ্তিতে বলা হইয়াছে, "মহাভারত-গ্রন্থ যাঁহার ঘরে থাকিবে, জয় তাঁহার হস্তগত"। এই উক্তি যদি ব্যাসদেবেরই হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তখনই মহাভারত গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকৃতি বা অন্য বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।[৩৭] অক্ষরের আকৃতি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকিলেও অক্ষরের অস্তিত্বজ্ঞাপক অনেক কথাই পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম, অর্জ্জুন, কর্ণ-প্রমুখ বীরগণ যে-সকল বাণ ব্যবহার করিতেন, তাহাতে আপন আপন নাম লিখিত থাকিত।[৩৮] নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তোমার আয়ব্যয়-বিষয়ে নিযুক্ত গণক লেখকগণ পূর্ব্বাহ্ণেই আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র ঠিক করিয়া রাখেন ত?"[৩৯] এই উক্তি হইতেও লিপিবিদ্যার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে। কিন্তু কোন্ বস্তুতে কি প্রকারের কালি

---

৩৬ ওঁমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ। আদি ১।৭৯

৩৭ ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ। স্বর্গা ৬।৮৯

৩৮ দ্রো ৯৭।৭। দ্রো ১২৩।৪৭। দ্রো ১৩৬।৫। দ্রো ১৫৭।৩৭। শল্য ২৪।৫৬

৩৯ সভা ৫।৭২

দিয়া কিরূপ কলমে লেখা হইত, তাহা জানিবার কোন উপায় মহাভারতে নাই। লিখননিরত কোন গুরু বা বিদ্যার্থীর সহিত মহাভারতে দেখা হয় না।

শস্ত্রবিদ্যায় গুরুপরম্পরা—শাস্ত্রবিদ্যার মত শস্ত্রবিদ্যাও গুরুপরম্পরায় চলিত। অর্জ্জুনের আগ্নেয়াস্ত্র-প্রাপ্তির ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই, বৃহস্পতি হইতে ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ হইতে অগ্নিবেশ্য, তাঁহার নিকট হইতে দ্রোণাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য হইতে অর্জ্জুন ঐ অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেন।[৪০] আরও দেখা যায়, ভীষ্ম, জামদগ্ন্য-পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন। দ্রুপদ, দ্রোণ ও কর্ণ ভীষ্মেরই সতীর্থ। যুধিষ্ঠিরাদি পাচ ভাই ও কৌরবগণ প্রথমতঃ কৃপাচার্য্যের নিকট হইতে, পরে আচার্য্য দ্রোণের নিকট হইতে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ভীমসেন ও দুর্য্যোধন বলরামের নিকট হইতে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণও দ্রোণাচার্য্য হইতে ধনুর্ব্বিদ্যা প্রাপ্ত হন। প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি ও অভিমন্যু অর্জ্জুন হইতে, দ্রৌপদেয়গণ প্রদ্যুম্ন এবং অভিমন্যু হইতে, এইভাবে সকলেই কোন-না-কোন গুরু হইতে বিদ্যালাভ করিতেন।

একাধিক গুরুকরণ—শাস্ত্রবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যায় পর পর অনেককে গুরুত্বে বরণ করিবার নিয়মও ছিল। উল্লিখিত উদাহরণ হইতেই তাহা জানা যাইতেছে। সকল আচার্য্যই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং শিষ্য প্রয়োজনবোধে বিদ্যালাভের নিমিত্ত একাধিক গুরুকে বরণ করিতে বাধ্য হইতেন।

স্বগৃহে গুরুকে রাখা—বিদ্যার্থী গুরুগৃহে যাইয়া শিক্ষা করিতেন, ইহাই সাধারণতঃ নিয়ম ছিল। কোন কোন ধনী ব্যক্তি পুত্রকন্যাদের শিক্ষার নিমিত্ত স্বগৃহেই আচার্য্যকে স্থান দিতেন। দ্রুপদরাজা তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে এইভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন।[৪১] কৃপাচার্য্য এবং আচার্য্য দ্রোণ ভীষ্মের দ্বারাই স্থাপিত এবং প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাঁহারা রাজগৃহে অবস্থান করিয়াই কুরুপাণ্ডবকে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতেন।[৪২] রাজর্ষি জনক আচার্য্য পঞ্চশিখকে চারি বৎসরেরও অধিক কাল স্বগৃহে রাখিয়াই সাংখ্যবিদ্যা অধ্যয়ন

---

৪০ পুরাগ্রমিদমাগ্নেয়ং প্রাদাৎ কিল বৃহস্পতিঃ। ইত্যাদি। আদি ১৭০।২৯,৩০

৪১ ব্রাহ্মণং মে পিতা পূর্ব্বং বাসয়ামাস পণ্ডিতম্। ইত্যাদি। বন ৩২।৬০-৬২

৪২ আদি ১৩২ তম অঃ।

করেন।[৪৩] আচার্য্যকে স্বগৃহে পোষণ করার যে তিনটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেই তিনটিই ধনিপরিবারের। সমাজের অন্য স্তরে সম্ভবতঃ এই নিয়ম প্রচলিত ছিল না।

গুরু-শিষ্যের সম্প্রদায়—সেইকালেও গুরুশিষ্যদের মধ্যে পরম্পরাগত সম্প্রদায় গঠিত হইত। গুরুর গুরুকেও সম্মান করিতে প্রশিষ্যগণ বাধ্য ছিলেন এবং স্বভাবতই গুরুর ঊর্দ্ধতন সম্প্রদায়কে সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দ্রোণাচার্য্যের বধের পর অর্জ্জুন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে বাক্যযুদ্ধ হয়। সাত্যকি অর্জ্জুনের শিষ্য। তিনি অর্জ্জুনের এবং দ্রোণের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে খুব তিরস্কার করিলেন। তিরস্কারের কারণ গুরুনিন্দা, বিশেষতঃ গুরুর গুরুর নিন্দা।[৪৪]

অধ্যয়নের নিয়মপ্রণালী—আচার্য্যের দক্ষিণ পদ দক্ষিণ হস্তে এবং বাম পদ বাম হস্তে ধারণপূর্ব্বক বিদ্যাপ্রার্থনা এবং অন্যান্য নিয়মপ্রণালী পালন সম্বন্ধে 'চতুরাশ্রম' প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। (দ্রঃ ১০২তম পৃঃ।)

বিদ্যালাভের তিনটি শত্রু—মহাত্মা বিদুর বলিয়াছেন, গুরুর উপদেশ শ্রবণে অনিচ্ছা, শিক্ষণীয় বিষয় অল্প সময়ে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা, শিক্ষিত হইয়াছি' মনে করিয়া অহঙ্কার পোষণ করা, এই তিনটি বিদ্যালাভের প্রধান অন্তরায়।[৪৫]

বিদ্যার্থীর পরিত্যাজ্য—বিদুর আরও বলিয়াছেন—আলস্য, অহঙ্কার, মোহ, চপলতা, অনেকের সহিত একত্র অবস্থান, ঔদ্ধত্য, অভিমান ও লোভ—এইগুলিও বিদ্যার্থীর পরিত্যাজ্য।[৪৬] বিদ্যালাভ করিতে হইলে সুখের আশা ত্যাগ করিবে। যদি সুখে অত্যধিক আসক্তি থাকে, তবে বিদ্যালাভ সুদূরপরাহত।[৪৭] গুরুগৃহে অবস্থান সকল বিদ্যার্থীর সুখকর হইত না, তাহা আচার্য্য বেদের চরিত্র (১২১তম পৃঃ) হইতে জানিতে পারা যায়। প্রকৃত বিদ্যার্থী সুখের আশা না করিয়াই বিদ্যার্জ্জনে মনোনিবেশ করিবেন।

---

৪৩ বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ পুরা ময়ি সুখোষিতঃ। শা ৩২০।২৬

৪৪ গুরোর্গুরুঞ্চ ভূয়োঽপি ক্ষিপন্নেব হি লজ্জসে। দ্রো ১৯৭।২২

৪৫ অশুশ্রূষা ত্বরা শ্লাঘা বিদ্যায়াঃ শত্রবস্ত্রয়ঃ॥ উ ৪০।৪

৪৬ আলস্যং মদমোহৌ চ চাপলং গোষ্ঠিরেব চ। ইত্যাদি। উ ৪০।৫,৬

৪৭ সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা নাস্তি বিদ্যার্থিনঃ সুখম্। উ ৪০।৬

বিদ্যার্থীর পরিচ্ছদ—বিদ্যার্থীর পোশাকপরিচ্ছদ বিষয়ে বিস্তৃত কো বর্ণনা নাই। অর্জ্জুনের নিকট যে-সকল ক্ষত্রিয় ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন তাঁহাদের পরিধেয় ছিল মৃগচর্ম্ম।[৪৮] যুযুধান, সাত্যকি, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি রাজকুমারগণও যখন মৃগচর্ম্ম পরিতেন, তখন অন্যান্য বিদ্যার্থীদের সম্বন্ধে ইহাই নিয়ম ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি। একলব্যের পরিধানে কৃষ্ণাজিনই দেখিতে পাই।[৪৯] শিক্ষার্থীর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবশ্যই প্রতিপাল্য ছিল, সুতরাং তাঁহাদের চালচলন যে সাদাসিধা ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। বিশেষতঃ পরিধেয় মৃগচর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অন্যান্য পরিচ্ছদও সেইরূপই হইবে। মহর্ষি গৌতমের শিষ্য উতঙ্কের মাথায় জটা দেখিয়া মনে হয়, ব্রহ্মচারিগণ ক্ষৌরকর্ম্ম করিতেন না। তৈলাদি স্নেহপদার্থ ব্যবহার করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল।[৫০]

বিদ্যার্থীর অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা—বিদ্যার্থীরা ভিক্ষা করিয়া গুরুকে নিবেদন করিতেন এবং গুরুই তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতেন। সকল গৃহস্থই বিদ্যার্থীকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য ছিলেন। পরে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে।

দিনের কোন্ সময়ে আচার্য্যগণ অধ্যাপনা করিতেন, তাহার কোনও বর্ণনা মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনধ্যায়—কোন কোন কারণে মধ্যে মধ্যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বন্ধ থাকিত। অনধ্যায়-দিনে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা পাপজনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।[৫১] যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে বিদ্যাচর্চ্চা স্থগিত থাকিত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের পর কৃষ্ণ দ্বারকায় গিয়া দেখিতে পাইলেন, সেখানে স্বাধ্যায়, যাগযজ্ঞ, হোম, সবই বন্ধ, পুরনারীগণ অলঙ্কার প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়াছেন। খবর লইয়া জানিলেন যে, শাল্বরাজ দ্বারকা-নগরী অবরোধ করিয়াছিলেন।[৫২]

৪৮ অর্জ্জুনং যে চ সংশ্রিত্য রাজপুত্রা মহাবলাঃ।
অশিক্ষন্ত ধনুর্ব্বেদং রৌরবাজিনবাসসঃ॥ সভা ৪।৩৩

৪৯ স কৃষ্ণমলদিগ্ধাঙ্গং কৃষ্ণাজিনজটাধরম্। ইত্যাদি। আদি ১৩২।৩৯

৫০ অশ্ব ৫৬।৯। শা ২৪২।২৫

৫১ অনধ্যায়েষ্বধীয়ীত। অনু ৯৩।১১৭। অনু ৯৪।২৫। অনু ১০৪।৭৩

৫২ বন ২০।২

প্রবল ঝড়, ভূমিকম্প এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনধ্যায় মানা হইত।[৫৩]

পরীক্ষা—ধনুর্ব্বিদ্যায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের শস্ত্রশিক্ষা শেষ হইলে আচার্য্য দ্রোণ তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

একদিন শিষ্যগণকে না জানাইয়া এক শিল্পীর দ্বারা একটি কৃত্রিম পাখী তৈয়ার করাইয়া কোন গাছের আগায় রাখাইয়া দেন। শিষ্যগণকে বলেন, "ঐ পাখীটির মাথা লক্ষ্য করিয়া বাণ ছাড়িতে হইবে"। লক্ষ্য স্থির আছে কি না, বুঝিবার নিমিত্ত আচার্য্য এক-একজন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কি দেখিতেছ?" অর্জ্জুন ব্যতীত সকলেই উত্তর করিলেন, "আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে এবং সম্মুখস্থ সকল বস্তুকেই দেখিতে পাইতেছি"। লক্ষ্যে তাঁহাদের দৃষ্টি স্থির নাই বুঝিতে পারিয়া আচার্য্য সকলকেই ভৎর্সনা করিলেন। পরে প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকেও সেইরূপ প্রশ্ন করিলে অর্জ্জুন উত্তর দিলেন, "আমি একমাত্র পাখীটির মস্তকই দেখিতেছি"। গুরু আহ্লাদিত হইয়া পাখীর মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞামাত্র অর্জ্জুন পক্ষীটির মস্তক ছেদন করিলেন। ইহাই হইল প্রাথমিক পরীক্ষা।[৫৪] অন্য একদিন আচার্য্য, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন যে, কুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। মহারাজের অনুমতি হইলে তাঁহারা নিজেদের শিক্ষাকৌশল একদিন সর্ব্বসমক্ষে দেখাইবেন। ধৃতরাষ্ট্র সানন্দে আচার্য্যের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে বদ্ধাঙ্গুলিত্রাণ, বদ্ধকক্ষ, বদ্ধতূণ, ধনুর্দ্ধারী বীর কুমারগণ অগণ্যজনসঙ্কুল সভায় প্রবেশ করিয়া আপন আপন কৌশল প্রদর্শন করিলেন। কুমারদের পটুতা-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন।[৫৫]

গুরুদক্ষিণা—বিদ্যাগ্রহণ সমাপ্ত হইলে আচার্য্যকে দক্ষিণা দিতে হইত। গুরুর সন্তুষ্টিই শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা।[৫৬]

উতঙ্কের—উতঙ্ক আচার্য্য বেদের ছাত্ররূপে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে গুরুকে দক্ষিণা দান করিবার নিমিত্ত গুরুর আদেশ প্রার্থনা

৫৩ শা ৩২৮।৫৫,৫৬

৫৪ আদি ১৩২ তম ও ১৩৩ তম অঃ।

৫৫ আদি ১৩৪ তম অঃ।

৫৬ দক্ষিণা পরিতোষো বৈ গুরূণাং সদ্ভিরুচ্যতে। অশ্ব ৫৬।২১। শা ১২২।১৩

করিলেন। গুরু বলিলেন, "তোমার উপাধ্যায়িনী যাহা বলেন, তাহাই কর"। উতঙ্ক উপাধ্যায়িনীকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি আদেশ করিলেন, "আগামী চতুর্থ দিনে পুণ্যক-ব্রত। পৌষ্যরাজার ক্ষত্রিয়া পত্নী যে কুণ্ডল ব্যবহার করেন, আমি সেই কুণ্ডল পরিধান করিয়া সেই দিন ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিতে চাই। সুতরাং তুমি সেই কুণ্ডল দুইটি ভিক্ষা করিয়া লইয়া আস"। উতঙ্ক কিরূপ কষ্টে উপাধ্যায়িনীর আদেশ পালন করিয়াছিলেন, তাহা বিশদরূপে বর্ণিত আছে।[৫৭]

বিপুলের—আচার্য্য দেবশর্ম্মার শিষ্য বিপুল গুরুপত্নীর আদেশে অতি কষ্টে স্বর্গীয় পুষ্প আহরণ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন।[৫৮]

গুরুর প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত শিষ্যের কঠোর সাধনা বহু স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। শিষ্যগণ গুরুর আশীর্ব্বাদেও সর্ব্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত হইতেন। ব্রহ্মচর্য্যের তেজ ও গুরুভক্তিই তাঁহাদের শক্তিবৃদ্ধির প্রধান কারণ।

কুরুপাণ্ডবের—শস্ত্রবিদ্যাগ্রহণের পর কুরুপাণ্ডবগণ আচার্য্য দ্রোণকে দক্ষিণা দান করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলে আচার্য্য বলিলেন, "পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দিরূপে আমার সমীপে আনয়ন কর, তোমাদের কল্যাণ হউক, তাহাই আমার অভিলষিত শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা হইবে"। আচার্য্যের আজ্ঞামাত্র শিষ্যগণ যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, আচার্য্যের বাসনা পূর্ণ হইল। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন পাঞ্চালরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিলেন। নিঃস্ব দ্রোণাচার্য্যের বিপদের দিনে সতীর্থ দ্রুপদ আচার্য্যের বন্ধুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত রাজার বন্ধুত্ব হইতে পারে না। তিনি দ্রোণকে উপহাস করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আচার্য্য শিষ্যগণের নিকট এরূপ দক্ষিণার অভিপ্রায় জানান। বন্দী পাঞ্চালরাজকে দ্রোণের সমীপে উপস্থিত করিলে দ্রোণ পাঞ্চালরাজকে ক্ষমা করিলেন এবং শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক বিজিত রাজ্যের অর্দ্ধেক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। ভাগীরথীর উত্তরতীরে অহিচ্ছত্রা-পুরীতে দ্রোণাচার্য্যের রাজধানী স্থাপিত হইল।[৫৯]

---

৫৭ আদি ৩য় অঃ।

৫৮ অনু ৪২শ অঃ।

৫৯ আদি ১৩৮ তম অঃ।

অর্জ্জুনের—কুরুপাণ্ডবের মিলিত গুরুদক্ষিণা-দানের মধ্যে যদিও অর্জ্জুনের কৃতিত্বই বেশী, তথাপি আচার্য্য পুনরায় অর্জ্জুনের নিকট দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুনকে ব্রহ্মশির-অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তোমাকে প্রহার করিলে তুমিও প্রতিযুদ্ধ করিবে, ইহাই আমার দক্ষিণা"। অর্জ্জুন আচার্য্যের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।[৬০]

গালবের—বিশ্বামিত্রের শিষ্য তপস্বী গালব গুরুর আদেশে আটশত ঘোড়া গুরুকে দক্ষিণারূপে প্রদান করেন। ঘোড়াগুলির বর্ণ সাদা এবং কানের বাহিরের অংশ কাল। গালব যে কিরূপ কষ্টে দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতে তেরটি অধ্যায় ব্যাপিয়া বর্ণিত আছে।[৬১]

একলব্যের—একলব্যের গুরুদক্ষিণা অপূর্ব্ব। এরূপ দক্ষিণা কখনও আর কেহ দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে শিষ্যরূপে গ্রহণ না করিলেও তিনি দ্রোণের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া নির্জ্জনে সাধনা করিতেছিলেন; একাগ্রতার প্রভাবে সাধক একলব্য ধনুর্ব্বেদে সিদ্ধিলাভ করেন। বাণের বিমোক্ষণ, আদান, সন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠেন।

একদা কুরুপাণ্ডবগণ দ্রোণের অনুমতি-ক্রমে রথারোহণে মৃগয়ায় গিয়াছেন, তাঁহাদের একজন অনুচর আছে, তাহার সঙ্গে একটি কুকুর। কুমারগণ যথাসুখে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় সেই কুকুরটি হঠাৎ একলব্যকে দেখিতে পাইল। একলব্যের শরীর ধূলিধূসরিত, মাথায় জটা, পরিধানে কৃষ্ণাজিন। দেখিবামাত্র কুকুরটি চীৎকার করিয়া উঠিল। একলব্যও মুহূর্ত্তমধ্যে কুকুরটির মুখে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কুকুরটি সেই অবস্থায় পাণ্ডবদের নিকটে আসিতেই তাঁহারা বাণপ্রক্ষেপকারীর শব্দবেধের সামর্থ্য ও প্রক্ষেপের লঘুহস্ততা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে অন্বেষণে বাহির হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা নিরন্তর-শরক্ষেপণশীল এক বিকৃতদর্শন বীর পুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বীর পুরুষ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তিনি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র এবং আচার্য্য দ্রোণের শিষ্য। পাণ্ডবগণ আচার্য্যকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। অর্জ্জুন গোপনে আচার্য্যকে বলিলেন, "আপনি তখন

৬০ যুদ্ধেঽহং প্রতিযোদ্ধব্যো যুধ্যমানস্ত্বয়ানঘ। আদি ১৩৯।১৪

৬১ উ ১০৬ তম অঃ—১১৮ তম অঃ।

আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, আমার চেয়ে আপনার কোনও শিষ্য অধিকতর বীর হইবেন না, এখন দেখিতেছি—এই নিষাদ আমা-অপেক্ষা কৌশলজ্ঞ"। আচার্য্য, অর্জ্জুনের সহিত একলব্যের সমীপে উপস্থিত হইলে বীর একলব্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আচার্য্য বলিলেন, "তুমি যদি আমার শিষ্য হও, তবে আদেশ করিতেছি, এখনই গুরুদক্ষিণা দাও"। শিষ্য গুরুর আজ্ঞায় আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়া গুরুর নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহে অন্ধ আচার্য্য শিষ্যের ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠটিকে দক্ষিণা দিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে গুরুর আদেশ পালন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। এই উপাখ্যানে একলব্যের অতিমানুষতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দ্রোণের চরিত্রের দুর্ব্বলতা বা কলঙ্কসমূহের মধ্যে এই কলঙ্ক দুরপনেয়। অর্জ্জুনের ন্যায় বীর পুরুষের এই ঈর্ষ্যাও সমর্থনযোগ্য নহে।[৬২]

সমাবর্ত্তনের পর কোন কোন শিষ্যকে গুরুর কন্যাদান—আচার্য্যগণ শিষ্যদের শ্রদ্ধা-ভক্তিতে এতটা আকৃষ্ট হইতেন যে, কেহ কেহ সমাবর্ত্তনের পরে শিষ্যের হাতে কন্যা-সমর্পণ করিয়া গুরুশিষ্যের সম্বন্ধকে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন। আচার্য্য উদ্দালক শিষ্য কহোড়কে এবং আচার্য্য গৌতম শিষ্য উতঙ্ককে কন্যাদান করিয়াছিলেন। (দ্রঃ 'বিবাহ (ক)' ১৪শ পৃঃ) *

৬২ আদি ১৩২ তম অঃ।

* রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের এইস্থলে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন—"গুরুকন্যা বিবাহ কি নিষিদ্ধ নয়?" আমার মনে হয়, বাঙ্গালীসমাজে গুরুকন্যা-বিবাহকে নিষিদ্ধ বলিয়াই অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথও তাহাই মনে করিতেন। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বে "গুরুপুত্রীতি কৃত্বাহং প্রত্যাচক্ষে ন দোষতঃ" (আদি ৭৭।১৭) এই মহাভারতবচনের 'দোষতঃ' পদের 'দৃষ্টদোষতঃ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ "তুমি গুরুকন্যা, এইকারণেই তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি, তোমাকে বিবাহ করিলে দৃষ্টতঃ কোন দোষ না হইলেও পাপ হইবে," ইহাই রঘুনন্দনমতে কচের উক্তির তাৎপর্য্য। রঘুনন্দন পরেও "ব্রহ্মদাতুর্গুরোশ্চৈব সন্ততিঃ প্রতিষিধ্যতে", মৎস্যসূক্তের এই বচন উদ্ধৃত করিয়া গুরুকন্যা বিবাহের নিষিদ্ধতা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের বচনের দ্বারা রঘুনন্দনের মত সমর্থিত হয় না। শুক্রাচার্য্য যদি কচকে অনুরোধ করিতেন, তবে কচও দেবযানীর পাণিগ্রহণে আপত্তি করিতেন না; কচের "গুরুণা চাননুজ্ঞাতঃ" (আদি ৭৭।১৭) এই উক্তি হইতেই সেই আভাস পাওয়া যায়। বাঙ্গালীসমাজে অনেক প্রসিদ্ধ বংশেও গুরুকন্যা বিবাহের উদাহরণ আছে। ঢাকা জিলার মিত্রা-গ্রামের অর্দ্ধকালী -বংশের পূর্ব্বপুরুষ রাঘবরাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার গুরুকন্যা অর্দ্ধকালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকের শিক্ষা—মহাভারতে অনেক বিদুষী রমণীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় কিন্তু মহর্ষি একমাত্র দ্রৌপদী ও উত্তরা ভিন্ন অন্য কাহারও শিক্ষাপ্রণালীর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিতে দেন নাই।

গৃহশিক্ষক—যদি এই দুইটিকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হইবে, কন্যার অভিভাবকগণ স্বগৃহে শিক্ষক রাখিয়া কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন।

অভিভাবকের শিক্ষকতা—যাঁহাদের বৃত্তি ছিল অধ্যাপনা, তাঁহারা নিজেই আপন আপন কন্যাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেন; এই বিষয়েও একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আচার্য্য গৌতম শিষ্য উতঙ্কের সমাবর্ত্তনকালে বলিতেছেন, "আমার এই কন্যা ব্যতীত অপর কোন কুমারী তোমার পত্নী হইবার যোগ্যা নহে"। উতঙ্ক দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছেন, সুতরাং আচার্য্য বোধ হয়, কন্যাকেও পূর্ব্ব হইতেই শিষ্যের উপযুক্ত পত্নী হইবার মত গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তাঁহার উক্তিতে এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৬৩]

শকুন্তলা—তাপসীবেষধারিণী কুমারী শকুন্তলা পিতার আদেশে অতিথি-সংকারের ভার গ্রহণ করেন। সমাগত অতিথি দুষ্মন্তকে পাদ্যাদি প্রদান করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কণ্ব তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে ধর্ম্মে চিত্তের স্থিরতা এবং পতিবংশের কল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছেন। হস্তিনাপুরীর রাজসভায় দুষ্মন্তের সহিত তাঁহার যে-সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহাও বিশেষ পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিলে বুঝা যায়, তিনিও উন্নতধরণের শিক্ষাদীক্ষাই পাইয়াছিলেন।[৬৪]

সাবিত্রী—মনে মনে পতিকে বরণ করার পর নারদের মুখে পতির আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনিয়াও সাবিত্রী বিচলিত হন নাই। নারদ ও পিতা অশ্বপতিকর্ত্তৃক বার-বার অনুরুদ্ধ হইয়াও অন্যকে পতিত্বে বরণ করেন নাই। সেই সময়ে তিনি যে-সকল যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রানুমোদিত কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মরাজের সহিত অচির-বিবাহিতা সাবিত্রীর কথোপকথনেও বিশেষ পাণ্ডিত্য ফুটিয়া

---

৬৩ এতামৃতেঽঙ্গনা নান্যা ত্বত্তোঽর্হতি সেবিতুম্। অশ্ব ৫৬।২৩

৬৪ আদি ৭১ তম—৭৪ তম অঃ।

উঠিয়াছে।[৬৫] তাঁহার পিতাও তাঁহাকে গুণবতী ও শিক্ষিতা বলিয়াই জানিতেন।[৬৬]

শিবা—বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়েও কোন কোন মহিলার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। শিবা-নামে একজন মহিলা বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তপস্যায় অক্ষয়ত্ব লাভ করেন।[৬৭]

বিদুলা, সুলভা ও প্রভাসভার্য্যা—বিদুলার তেজস্বিতা, সুলভা এবং প্রভাসভার্য্যার যোগপাণ্ডিত্য পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। (দ্রঃ ৬৪তম, ৬৫তম, ৬৭তম পৃঃ।)

ব্রহ্মজ্ঞা গৌতমী—গৌতমী-নামে এক মহিলা অসাধারণ পণ্ডিতা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সর্পদংশনে মারা গেলে তিনি মৃত্যুতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সুগভীর পাণ্ডিত্য ও তপস্যার পরিচায়ক।[৬৮]

আচার্য্যা অরুন্ধতী—মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী বশিষ্ঠের সমানশীলা এবং পরম বিদুষী ছিলেন।[৬৯] কথিত হইয়াছে যে, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার নিকট হইতে শাস্ত্রতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। সমাগত জিজ্ঞাসুগণের শ্রদ্ধা ও জ্ঞানপিপাসা বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া তিনি কোন উপদেশ দিতেন না। সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।[৭০]

পতিব্রতা শাণ্ডিলী—পাতিব্রত্য-ধর্ম্মবিষয়ে শাণ্ডিলী পরম পণ্ডিতা ছিলেন। কৈকয়ী সুমনার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে-সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।[৭১]

দময়ন্তী—নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে দময়ন্তীর যেরূপ ধৈর্য্য, বুদ্ধিমত্তা ও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার উচ্চ শিক্ষার অনুমান করা যাইতে পারে।[৭২]

---

৬৫ বন ২৯২ তম—২৯৬ তম অঃ।

৬৬ স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ। বন ২৯২।৩২

৬৭ উ ১০৯।১৯

৬৮ অনু ১ম অঃ।

৬৯ সমানশীলা বীর্য্যেণ বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ। অনু ১৩০।২

৭০ অনু ১৩০ তম অঃ।

৭১ অনু ১২৩ তম অঃ।

৭২ বন ৫৭শ— ৭৭ তম অঃ।

একজন ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণ-গীতায় দেখা যায়, এক ব্রাহ্মণদম্পতি অধ্যাত্ম-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। পত্নী প্রশ্ন করিতেছেন এবং স্বামী উত্তর দিতেছেন। এই দম্পতির শাস্ত্রচর্চ্চা হইতে বুঝা যায়, পণ্ডিত স্বামী হইতেও মহিলাগণ অনেক কিছু শিক্ষা করিতেন। যদিও মন ও বুদ্ধির রূপকচ্ছলে ব্রাহ্মণদম্পতির কল্পনা করা হইয়াছে, তথাপি সমাজে সেইরূপ ব্যবহার না থাকিলে কল্পনা করাও সম্ভবপর হইত না।[৭৩]

শিখণ্ডী—শিখণ্ডীর উপাখ্যান অতি অদ্ভুত। তিনি কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, পরে মহাদেবের বরপ্রভাবে পুরুষত্ব-প্রাপ্ত হন। কন্যা অবস্থায়ই তিনি ধনুর্ব্বিদ্যা ও শিল্পাদিবিদ্যা শিক্ষা করেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গুরু।[৭৪] তিনি দ্রোণের গৃহে যাইয়া শিক্ষা করিয়াছেন, অথবা দ্রোণকে স্বগৃহে রাখিয়া শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। তিনি পুরুষের ন্যায় পোশাকপরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন এবং পুরুষরূপে আপনার পরিচয় দিতেন। সুতরাং মনে হয়, গুরুগৃহে যাইয়াই ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এইসকল উপাখ্যান হইতে স্ত্রীলোকের শিক্ষা-বিষয়ে অনেকটা জানিতে পারা যায়। কুরুরাজের অন্তঃপুরে যে কয়েকজন রমণীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ধর্ম্ম ও রাজনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন।

গঙ্গা—শান্তনুপত্নী গঙ্গা দেবব্রত ভীষ্মের জননী। তিনি স্ত্রীলোকের সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিতা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন।[৭৫]

সত্যবতী—বিচিত্রবীর্য্যের অকালমৃত্যুর পর সত্যবতীর বুদ্ধিবলেই নষ্টপ্রায় কুরুবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের রহস্য অবগত ছিলেন।[৭৬] কোথায় কিরূপে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না।

গান্ধারী—কুমারী অবস্থাতেই গান্ধারী প্রত্যহ শিবের উপাসনা করিতেন। পতির অন্ধত্বের বিষয় অবগত হইয়া বিবাহের সময় নিজেও চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া অন্ধ সাজিয়াছিলেন। পতিগৃহে অনেক কাজেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির

৭৩ অশ্ব ২০শ অঃ—৩৪শ অঃ।

৭৪ উ ১৯১ তম অঃ—১৯৪ তম অঃ।

৭৫ আদি ৯৮ তম অঃ।

৭৬ বেত্থ ধর্ম্মং সত্যবতি পরঞ্চাপরমেব চ। আদি ১০৫।৩৯

পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাসদেব বলিয়াছেন, গান্ধারী মহাপ্রজ্ঞা, বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মার্থদর্শিনী এবং ভালমন্দ-বিবেচনায় নিপুণা।[৭৭] ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর-প্রমুখ ব্যক্তিগণও গান্ধারীকে 'দীর্ঘদর্শিনী' বলিয়াই জানিতেন। তাঁহার অসাধারণ তেজস্বিতা নানা বিষয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। (দ্রঃ 'নারী' প্রবন্ধ ৬৮তম পৃঃ।)

কুন্তী—কুন্তীর শিক্ষা সম্বন্ধে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ ও অতিথি-সৎকারের ভার তাঁহার কুমারী অবস্থাতেই কুন্তিভোজ তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন।[৭৮] জতুগৃহ দাহের পর তিনি একচক্রায় যখন এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতেছিলেন, তখন আপন-পুত্র ভীমকে রাক্ষসের নিকট পাঠাইয়া ব্রাহ্মণপরিবারকে ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা করেন। চরিত্র সমালোচনা করিলে মনে হয়, তিনিও অশিক্ষিতা ছিলেন না।

দ্রৌপদী—দ্রৌপদী এক গৃহশিক্ষক পণ্ডিতের নিকট হইতে বার্হস্পত্য-রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (দ্রঃ 'নারী' প্রবন্ধ ৬৯তম পৃঃ)। পণ্ডিতা, পতিব্রতা, ধর্ম্মজ্ঞা, ধর্ম্মদর্শিনী প্রভৃতি বিশেষণ হইতেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিষয় জানা যায়।[৭৯] দ্বৈতবনে (বন ২৮শ অঃ) যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার কথোপকথনে দেখা যায়, তিনি পৌরাণিক অনেক উপাখ্যান এবং রাজধর্ম্ম ভালভাবেই জানিতেন। দূতরূপে কুরুসভায় যাত্রার পূর্ব্বে কৃষ্ণকে তিনি যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। (উ ৮২তম অঃ)। সত্যভামার সহিত বিশ্রম্ভালাপের সময়েও (বন ২৩২তম অঃ) তাঁহার পাতিব্রত্যধর্ম্মের অভিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অতিথির অভ্যর্থনা কিরূপে করিতে হয়, তাহাও তিনি বেশ জানিতেন। (বন ২৬৫তম অঃ তাঁহার প্রাত্যহিক কর্ম্ম সম্বন্ধে নিজের মুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, প্রত্যহ হাজার হাজার লোকের খাওয়াদাওয়ার তত্ত্বাবধান

৭৭ মহাপ্রজ্ঞা বুদ্ধিমতী দেবী ধর্ম্মার্থদর্শিনী।
আগমাপায়তত্ত্বজ্ঞা কচ্চিদেষা ন শোচতি ॥ আশ্র ২৮।৫। আদি ১১০ তম অঃ

৭৮ নিযুক্তা সা পিতুর্গেহে ব্রাহ্মণাতিথিপূজনে। আদি ১১১।৪

৭৯ প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা। বন ২৭।২
লালিতা সততং রাজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মদর্শিনী। শা ১৪।৪
ব্রাহ্মণং মে পিতা পূর্ব্বং বাসয়ামাস পণ্ডিতম্। ইত্যাদি। বন ৩২।৬০-৬২

তাঁহাকেই করিতে হইত। শত শত দাসদাসীর কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করা, যথাকালে তাহাদিগকে বেতন দেওয়া, তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অন্তঃপুরের সর্ব্বপ্রকারের তত্ত্বাবধান করা, তাঁহারই কার্য্য ছিল। রাজকোষের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবার দায়িত্বও তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। তিনি একাই হিসাবপত্র রাখিতেন।[৮০] এরূপ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য মহাভারতে অপর কোনও গৃহিণীর মধ্যে দেখা যায় না।

উত্তরা—বিরাটরাজার কন্যা উত্তরা এবং তাঁহার সহচরীগণ বৃহন্নলা (অর্জ্জুন) হইতে গীত, নৃত্য এবং বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জ্জুন বিরাটরাজার পুরীতে আপনাকে সঙ্গীতশিক্ষক বলিয়া পরিচয় দেন এবং তাঁহার অন্তঃপুরে বালিকাদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন।[৮১]

মাধবী—যযাতিরাজার কন্যা মাধবী সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞা ছিলেন।[৮২] তিনি কি উপায়ে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না।

যে কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া গেল, সেইগুলির প্রায় সবকয়টিই ধনী এবং সম্ভ্রান্ত-পরিবারের কন্যাদের সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে। সাধারণ-সমাজে কন্যারা কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিতেন, তাহার কোন বর্ণনা নাই।

শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অধিকার—স্ত্রীলোকের শাস্ত্রালোচনার প্রতিকূলে একটি-মাত্র উক্তি পাওয়া যায়।[৮৩] কিন্তু উদাহরণরূপে অনেক পণ্ডিতা দীর্ঘদর্শিনীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মনে হয়, বেদে স্ত্রীলোকের অধিকার তখনই লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই কারণে কেহ কেহ শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অনধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন।

বেদাভ্যাস দ্বিজাতির নিত্যকর্ম্ম—প্রত্যহ বেদপাঠ দ্বিজাতির নিত্য-কর্ম্মের অন্তর্গত। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে পাপ হয়। পুনঃ পুনঃ অধীত বিষয়ের আলোচনায় দৃঢ়তর সংস্কার জন্মে। বিশেষতঃ সেই সময়ে শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যার বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব মৌখিক আলোচনার উপরেই নির্ভর করিত। সেই কারণেই সম্ভবতঃ স্বাধ্যায়ের নিত্যতা বিহিত হইয়াছে।

---

[৮০] বন ২৩২ তম অঃ।

[৮১] স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতম্। ইত্যাদি। বি ১১।১২,১৩

[৮২] বহুগন্ধর্ব্বদর্শনা। উ ১১৬।৩

[৮৩] নিরিন্দ্রিয়া হ্যশাস্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি শ্রুতিঃ। অনু ৪০।১২

বেদপাঠের প্রাসঙ্গিক ফল ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। স্বাধ্যায়ের ফলকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাদানের ফলও কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি উপযুক্ত শিষ্যকে উপদেশ দেন, তিনি পৃথিবী ও গোদান করিলে যে পুণ্য, সেইরূপ পুণ্য লাভ করেন।[৮৪]

সর্ব্বাবস্থায় অপরিত্যাজ্য—দ্বিজাতি যে-কোন অবস্থায়ই থাকুন না কেন, বেদাভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। রাজা দুষ্মন্ত কণ্বমুনির আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই বেদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।[৮৫] বিপদের দিনেও গৃহহীন পাণ্ডবগণ বেদাভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। বক-রাক্ষস নিধনের পর ব্রাহ্মণগৃহে যখন বাস করিতেছিলেন, তখনও দৈনিক স্বাধ্যায় রীতিমত চলিতেছিল।[৮৬] কর্ণ আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানিতেন। কর্ণকুন্তী-সংবাদে দেখিতে পাই, কুন্তী ভাগীরথীর দিকে চলিয়াছেন; পুত্রের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার বেদাধ্যয়নের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।[৮৭] স্বাধ্যায়ের নিত্যত্ববিধান শাস্ত্রসমূহকে রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রত্যহ বেদপাঠ না করিলে পাপ হইবে, এই বুদ্ধিতে প্রত্যেক দ্বিজাতিই কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতেন।

নিঃস্বার্থ অধ্যাপনা—ভৃতকাধ্যাপনা (বিদ্যার্থী হইতে অর্থগ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা) অত্যন্ত ঘৃণ্য ছিল। এই বিষয়েও অধ্যাপকগণকে নিষেধ করা হইয়াছে।[৮৮] নিঃস্বার্থ অধ্যাপনার আদর্শ সেই কালে অধ্যাপকসমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইত। এই কারণে দরিদ্রের পক্ষেও উচ্চশিক্ষা দুষ্প্রাপ্য ছিল না। আশ্রমের শিক্ষা বা তপোবনের শিক্ষা সকল বিদ্যার্থীর পক্ষে তেমন সুপ্রাপ্য না হইলেও পণ্ডিতগণের মুখে-মুখে গল্পচ্ছলে শিক্ষা বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিত। বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়, বৃহদশ্ব, লোমশ-প্রমুখ মুনিঋষিগণের নানাবিধ উপদেশও সম্ভবতঃ আমাদের অনুমানের সমর্থক হইবে।

৮৪ ইহলোকে চ বা নিত্যং ব্রহ্মলোকে চ মোদতে। অনু ৭৫।১০
যো ব্রূয়াচ্চাপি শিষ্যায় ধর্ম্ম্যাং ব্রাহ্মীং সরস্বতীম্। ইত্যাদি। অনু ৬৯।৫

৮৫ আদি ৭০ তম অঃ।

৮৬ তত্রৈব ন্যবসন্ রাজন্ নিহত্য বকরাক্ষসম্।
অধীয়ানাঃ পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে॥ আদি ১৬৫।২

৮৭ গঙ্গাতীরে পৃথাশ্রৌষীদ্বেদাধ্যয়ননিস্বনম্॥ উ ১৪৪।২৭

৮৮ সত্যানৃতেন হি কৃত উপদেশো হিনস্তি হি॥ অনু ১০।৭৪

পর্য্যটক মুনিঋষিগণ—একশ্রেণীর পর্য্যটক অধ্যাপক ভ্রমণপ্রসঙ্গে উপদেশ দান করিতেন। তাঁহাদের বর্ণিত উপাখ্যানগুলি তৎকালে লোকশিক্ষার প্রধান সহায়ক ছিল। গল্পচ্ছলে বেদ-বেদান্তের গূঢ় রহস্য অতি সরল ভাষায় তাঁহারা প্রচার করিতেন। এই শ্রেণীর অধ্যাপকগণ একান্ত নির্লোভ ছিলেন। তাঁহাদের বেশী কিছু প্রয়োজনও হইত না। আরণ্য ফলমূলেই তাঁহাদের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ হইত। বনপর্ব্বে মুনিঋষিগণের তীর্থযাত্রার বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন চলন্ত বিদ্যালয়ের মত তাঁহারা উপদেশ দিয়া বেড়াইতেছেন।

জ্ঞানবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা—শান্তি ও অনুশাসনপর্ব্বে অনেকগুলি অধ্যায়ের শেষে দেখিতে পাওয়া যায়, জনসমাজে উপাখ্যান ও অপরাপর তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মহর্ষির কত আগ্রহ। যিনি প্রকাশ করিবেন, তাঁহার কতরকমের পুণ্যফলই না কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকাশে অন্য পুণ্য হউক আর না হউক, সর্ব্বসাধারণ যে লাভবান্ হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋষি-কবির আন্তরিক এই প্রকাশের বাসনা হইতেও সেই সময়ের জনশিক্ষা-প্রণালীর একটি ধারার সহিত আমাদের পরিচয় হয়।

গল্পচ্ছলে শিক্ষার বিস্তৃতি—মুখে-মুখে গল্পচ্ছলে শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যকতা তাঁহারা ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন, তাই এত আগ্রহ। জনশিক্ষার পক্ষে গল্পচ্ছলে উপাখ্যান শোনান যে কিরূপ উপাদেয় ছিল, আজকাল আমরা সেই কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। পুরাণপাঠ এবং সুকণ্ঠ কথকের কথকতার সাহায্যে সমাজের সকল শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের নিকটই কতকগুলি ভাল কথা পৌঁছিতে পারিত।

পুরাণ-ইতিহাসাদির প্রচারব্যবস্থা—যাঁহারা পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের তত্ত্ব শ্রদ্ধালু জনসমাজে প্রচার করিতেন, তাঁহারা 'পঙ্‌ক্তিপাবন' নামে প্রশংসিত হইতেন।[৮৯]

শিক্ষার ব্যাপকতা—জনসমাজে মুখে-মুখেই শিক্ষার বিস্তার হইত। পুরাণপাঠক, কথক ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গের উপদেষ্টা একশ্রেণীর পণ্ডিত রাজসভায় বিশেষ সম্মানিত হইতেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবহুলতার

৮৯। যতয়ো মোক্ষধর্ম্মজ্ঞা যোগাঃ সুচরিতব্রতাঃ।
যে চেতিহাসং প্রযতাঃ শ্রাবয়ন্তি দ্বিজোত্তমান্॥ ইত্যাদি। অনু ৯০।৩৩,৩৪

কোন উল্লেখ না থাকিলেও সাধারণ্যে যেরূপ প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বিদ্যার বা পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। হাটে-ঘাটে, কসাইখানায় ও মুদীর দোকানে উপনিষৎ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় ব্যাপৃত স্বকর্ম্মনিরত মহাপণ্ডিতগণের সহিতও মহাভারতপাঠকের সাক্ষাৎ হয়। সুতরাং সেই যুগে বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাব যে কত অধিক ছিল, তাহা অনুমেয়। বিশেষতঃ বিদ্যাশিক্ষার আশ্রমগুলি সহজ ও অনাড়ম্বর ছিল, কোন-প্রকারের আর্থিক প্রশ্নই উঠিত না। অধ্যাপক বিদ্যার্থী হইতে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না, অধিকন্তু বিদ্যার্থীর অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও তাঁহাকেই করিতে হইত। পূর্ব্বে যে কয়েকটি গুরুগৃহের দৃশ্য দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থা।

অধ্যাপনায় শাস্ত্রীয় প্ররোচনা—'অধ্যাপকগণ দুঃখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিবেন না, তাঁহারা স্বর্গলোকের অধিকারী'।[২০] এইসকল ফলশ্রুতি বা প্ররোচক শাস্ত্রও বিদ্যাবিস্তারে সহায়তা করিত বলিয়া মনে হয়। পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক প্রভৃতিতে বিশ্বাসী আস্তিক অধ্যাপকগণ এই-সকল বাক্যেও সম্ভবতঃ উৎসাহিত হইতেন।

সশিষ্য গুরুর দেশভ্রমণ—অনেক অধ্যাপক শিষ্যগণ সহ দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেন। সশিষ্য দুর্ব্বাসার ভ্রমণ হইতে মনে হয়, দেশে দেশে ভ্রমণ-প্রসঙ্গে নূতন নূতন জ্ঞানের সন্ধান, অনেক অজানা প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, এইগুলিও তৎকালে শিক্ষারই অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানবিশেষে শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল না; তাহাতেই সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্তবৃত্তি-বিকাশের অন্তরায়সমূহ জন্মিবারও সুযোগ পাইত না। এই আরণ্য শিক্ষা, প্রাকৃতিক শিক্ষা ও পথের শিক্ষাকে সেই যুগের এক-একটি বিশেষ পদ্ধতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।[২১]

শিক্ষাবিস্তারে তীর্থের দান—শিক্ষার উপায় এবং বিস্তৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আরও দুই-একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। বনপর্ব্ব ও শল্য-পর্ব্বের তীর্থবর্ণনায় ভৌগোলিক অখণ্ড ভারতের চিন্তা বা পরিচয় ছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। কাশী, গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার), অযোধ্যা,

---

২০ অধ্যাপকঃ পরিক্লেশাদক্ষয়ং ফলমশ্নুতে। অনু ৭৫।১৮

২১ বন ২৬২ তম অঃ।

মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে সাধু, মহাত্মা, ব্রহ্মর্ষি, পণ্ডিত, অপণ্ডিত প্রমুখ সকলেই পুণ্যলাভের বাসনায় বা মুক্তিকামনায় মিলিত হইবার সুযোগ পাইতেন। তীর্থগুলিতে মহাপুরুষগণের নানাবিধ উপদেশ, বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ ও ইতিহাসাদির আলোচনায় সম্ভবতঃ সকলেই উপকৃত হইতেন। অদ্যাপি তীর্থরাজ কাশী ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। মহাপুরুষসমাগমে পরা ও অপরা বিদ্যার কিরূপ আলোচনা হয়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 'কুম্ভমেলা'। বুদ্ধদেবও কাশীধামেই প্রথমতঃ ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান। সুতরাং তীর্থভ্রমণেও বিদ্যাশিক্ষার প্রচুর সহায়তা হইত, তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ তীর্থভ্রমণের প্ররোচনা এবং পুণ্যকীর্ত্তনের মধ্যে এইরূপ গূঢ় উদ্দেশ্যেও ছিল। তীর্থভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষাতে পর্য্যবসিত কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়।

বিদ্বান্‌দের বসতিতে বাসের উপদেশ—যে দেশে বিদ্বান্ ব্যক্তির বসতি নাই, সেই দেশ বাসের অনুপযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রকারদের অভিমত।[২২] শিক্ষাবিস্তারের উপায়নিরূপণে এই-সকল উপদেশও উপেক্ষণীয় নহে।

যজ্ঞমণ্ডপগুলি শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্র—আরও একটি শিক্ষাবিস্তারের উপায় ছিল। প্রাচীন ভারতের যজ্ঞমণ্ডপে যজ্ঞদর্শক ব্যক্তিগণ পবিত্র হোমধূম-সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্রীয় আলোচনাও শুনিতে পাইতেন। নানা দেশ হইতে সমাগত যাজ্ঞিকদের বেদবিচারে যজ্ঞভূমি মুখরিত থাকিত। অধিকাংশ পুরাণ ও ইতিবৃত্ত যজ্ঞভূমির মধ্য দিয়া সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মহাভারতের প্রথম প্রচার—তক্ষশিলায় (রাওয়ালপিণ্ডি) জনমেজয়ের সর্পসত্রের মণ্ডপে। দ্বিতীয় আবৃত্তি—নৈমিষ্যারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক সত্রে। সুতরাং এই অনুমান সম্ভবতঃ নির্ভুল যে, যজ্ঞমণ্ডপগুলিও এক-একটি বিরাট শিক্ষায়তনের কাজ করিত। যজ্ঞও সেই যুগে বিরল ছিল না। প্রত্যেক জনপদেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিশেষতঃ সেই যুগে সায়ং ও প্রাতঃকালের অগ্নিহোত্র নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল।

শিক্ষার বলিষ্ঠতা—যদিও নৃপতির আনুকূল্যই শিক্ষার প্রধান উপায়রূপে বিবেচিত হইত, তথাপি সেই-সকল উপায়েও শিক্ষা বিস্তার লাভ করিত। যদিও শিক্ষা রাজতন্ত্রের অন্তর্গত ছিল, যদিও রাষ্ট্রপ্রকৃতির সহিত অচ্ছেদ্য

২২ অনু ১৬৩ তম অঃ।

সম্বন্ধে শিক্ষাকে জড়িত থাকিতে হইত, তথাপি নৃপতিবর্গের ধর্ম্মপ্রবণতা এবং সমস্ত সমাজের অনুকূলতায় শিক্ষাব্যবস্থা আপনার অপ্রতিহত গতিতে কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় নাই।

রাজসভায় জ্ঞানিগণ—সেই সময়ে ভারতে ছোট-বড় অনেকগুলি রাজ্য ছিল। সভাপর্ব্বের দিগ্বিজয়বর্ণনে সেইগুলির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। হস্তিনা বা দ্বারকা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও সভ্যতা এবং চালচলনে সেই-সকল রাজ্যও একই রকমের ছিল। হস্তিনা, ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারকাপুরীতে পণ্ডিতগণ রাজসভায় যথেষ্ট সমাদর পাইতেন।[৯৩] হস্তিনায় নারদ, ব্যাস-প্রমুখ ঋষিগণ প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। পণ্ডিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের পুরোহিত ছিলেন। অন্যান্য রাজসভায় পণ্ডিতদের বিষয়ে স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও গুণিগণের আদর নিশ্চয়ই ছিল। গুণী এবং পণ্ডিতগণকে রাজসভায় সম্মানের আসন দেওয়া রাজধর্ম্মের অন্তর্গত। কবি এবং গুণিগণ সর্ব্বত্র রাজাদের সাহায্যেই আপন আপন প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও শিক্ষাবিষয়ে ধনী এবং জমিদারের দান উল্লেখযোগ্য। বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিগণকে অন্ন দান করা এখনও প্রাচীনপন্থী ধনিসমাজে আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

মিথিলার বিদ্যাপীঠ—সেই-সকল নির্লোভ পণ্ডিতগণ রাজসভায় থাকিয়া নানা শাস্ত্রের উপদেশ দিতেন; তাহাতেও শিক্ষার সহায়তা হইত। মিথিলা-নগরী তৎকালে ভারতে বিদ্যাচর্চ্চার বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল বলিয়া মনে হয়। বনপর্ব্বে দেখিতে পাই, মিথিলার বাজারে বসিয়া মাংস বিক্রয় করেন, এরূপ একজন ব্যাধও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।[৯৪] আচার্য্য পঞ্চশিখ মিথিলার রাজপরিবারে চারিবৎসরেরও অধিক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। রাজর্ষি জনক সেই সময়ে আচার্য্যের নিকট সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করেন।[৯৫] ব্রহ্মচারিণী সুলভা শাস্ত্রচর্চ্চায় মিথিলার সুনাম শুনিয়াই রাজর্ষির সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন।[৯৬]

---

৯৩ তত্রাগচ্ছন্ দ্বিজা রাজন্ সর্ব্ববেদবিদাং বরাঃ। আদি ২০৭।৩৮
ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তত্র পরিবার্য্যোপতস্থিরে। মৌ ৭।৮

৯৪ বন ২০৫ তম অঃ।

৯৫ স যথা শাস্ত্রদৃষ্টেন মার্গেণেহ পরিভ্রমন্।
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ পুরা ময়ি সুখোষিতঃ॥ শা ৩২০।২৬

৯৬ তব মোক্ষস্য চাপ্যস্য জিজ্ঞাসার্থমিহাগতা॥ শা ৩২০।১৮৬

প্রসিদ্ধ প্রায় সকল আচার্য্যকেই অন্ততঃ একবার মিথিলায় যাইতে হইত। মাণ্ডব্য, পরাশর, বশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র-প্রমুখ ঋষিগণকে মিথিলায় রাজর্ষি জনকের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় ব্যাপৃত দেখা যায়।[৯৭]

ধনিগৃহে দ্বারপণ্ডিত—রাজর্ষির সভায় বন্দী-নামে খুব বড় একজন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারের উদ্দেশ্যে নানা দেশ হইতে পণ্ডিতগণ সমবেত হইতেন। বর্ণিত আছে, মহর্ষি অষ্টাবক্র বার বৎসর বয়সে মাতুল শ্বেতকেতু-সহ জনকের সভায় শাস্ত্রবিচার করিতে গমন করেন। পথে দ্বাররক্ষকের সহিতই কিছুটা বিচার করিতে হইল, পরে তাঁহারা সভায় প্রবেশ করিলেন। অষ্টাবক্রের সহিত পণ্ডিত বন্দীর বিচার হইল। বিচার্য্য বিষয় 'আত্মতত্ত্ব'। বালক মহর্ষির সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত বন্দী পরাজিত হইলেন।[৯৮] মিথিলায় ব্রহ্মবিদ্যা-আলোচনার যে প্রশস্ত ক্ষেত্র দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয়, মিথিলা-নগরী বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান একটি কেন্দ্র ছিল; বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রের এরূপ আলোচনা আর কোথাও হইত না।

বদরিকাশ্রমের বিদ্যাপীঠ—পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহর্ষি দ্বৈপায়ন এক পর্ব্বততটে অধ্যাপনা করিতেন। সম্ভবতঃ বদরিকাশ্রমই তাঁহার অধ্যাপনার কেন্দ্র ছিল। কারণ, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদিতে দেখা যায়, ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল বদরীতে। (বর্ত্তমান বদরিকাশ্রম কি?) তাঁহার আশ্রমেও একসঙ্গে চারিজন শিষ্যকে দেখিতে পাই। দেবর্ষি নারদও বদরীর আশ্রমে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছেন। মনে হয়, ঐ আশ্রমও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[৯৯]

নৈমিষারণ্যে মহাবিদ্যালয়—মহাভারতের প্রারম্ভেই আমরা একটি আশ্রমের সহিত পরিচিত হই, তাহার নাম নৈমিষারণ্য। সেখানে শৌনক-নামে এক কুলপতি দ্বাদশ বর্ষ কাল ব্যাপিয়া এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন।[১০০] কুলপতি শব্দের সাধারণ অর্থ "কুলের মধ্যে যিনি প্রধান"। কিন্তু শব্দশাস্ত্রের

---

[৯৭] শা ২৭৫ তম অঃ, ২৯০ তম অঃ, ৩০২ তম অঃ।

[৯৮] বন ১৩৩ তম ও ১৩৪ তম অঃ।

[৯৯] শা ৩৪৪ তম—৩৪৬ তম অঃ।

[১০০] নৈমিষারণ্যে শৌনকস্য কুলপতের্দ্বাদশবার্ষিকে সত্রে। আদি ১।১

নিয়ম আছে, শব্দের যদি অন্য কোনও সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ (রূঢ়) অর্থ থাকে, তাহ হইলে সাধারণ (যৌগিক) অর্থটি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।[১০১] যিনি দশহাজার শিষ্যকে অন্নদানের সহিত বিদ্যাদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে 'কুলপতি' বলে এই অর্থটি রূঢ়।[১০২] টীকাকার নীলকণ্ঠ রূঢ় অর্থেরই আদর করিয়াছেন। রূঢ় অর্থ গ্রহণের পক্ষে আরও একটি যুক্তি এই যে, শিষ্যসম্পদ্ খুব বেশী না থাকিলে বার বৎসর কাল ব্যাপিয়া একটি মহাযজ্ঞ পরিচালনা করা সম্ভবপর হইত না। মহর্ষি দুর্ব্বাসার অযুত শিষ্যসংখ্যাও দেখা গিয়াছে।[১০৩] 'বহু'-অর্থেও শাস্ত্রে সহস্র, অযুত প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়।[১০৪] যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে বুঝা যাইতেছে, মহর্ষি শৌনক বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীকে অন্নদানের সহিত বিদ্যাদান করিতেন। রাজসভায় সভাপণ্ডিত বা দ্বারপণ্ডিতরূপে যাঁহারা আসন পাইতেন, তাঁহারাও বিদ্যার্থিগণের নিকট হইতে অধ্যাপনার পারিশ্রমিকরূপে কোন-প্রকার দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না। ভৃতকাধ্যাপনার নিন্দার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

আচার্য্যগণের বৃত্তি—বিদ্যার্থীরা ভিক্ষা করিতেন এবং ভিক্ষালব্ধ খাদ্য-সামগ্রী গুরুকে নিবেদন করিতেন, উপমন্যুর উপাখ্যান হইতে তাহা জানা যায়। গুরু সকল বিদ্যার্থীকেই আপন পরিবারভুক্ত করিয়া লইতেন। শিষ্যের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই আচার্য্যেরা দিতেন। যে কয়েকটি গুরুগৃহের দৃশ্য দেখি, সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থা। খাদ্য বা পরিধেয়-সংগ্রহে শিষ্যদের কোন চেষ্টাই লক্ষিত হয় না। কর্ত্তব্যবোধেই যেন গুরুর উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করার নিয়ম ছিল। যে-সকল দরিদ্র আচার্য্য স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহারা রাজসরকার হইতেও কিছু দক্ষিণা পাইতেন। নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তুমি কি উপযুক্ত গুণী ব্যক্তিগণকে যথোচিত দান করিয়া থাক ?"[১০৫]

রাজকীয় সাহায্যদান—যাঁহারা যাজন, অধ্যাপনা ও বিশুদ্ধপ্রতিগ্রহরূপ ব্রাহ্মণবৃত্তিদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে কর আদায়

---

১০১ লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্‌যোগাপহারিণী। (তন্ত্রবার্ত্তিক)

১০২ একো দশসহস্রাণি যোঽন্নদানাদিনা ভরেৎ।
. স বৈ কুলপতিঃ—। নীলকণ্ঠ টীকা আদি ১।১

১০৩ অভ্যগচ্ছৎ পরিবৃতঃ শিষ্যৈরযুতসম্মিতৈঃ। বন ২৬২।২

১০৪ মীমাংসাদর্শন ৬।৭।৩১

১০৫ যথার্হং গুণতশ্চৈব দানেনাভ্যুপপদ্যসে ? সভা ৫।৫৩

করা নৃপতিদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল।[১০৬] যে সমাজে রাজধর্ম্মের সহিত সকল শুভ অনুষ্ঠানই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেই সমাজে অধ্যাপকগণের অন্নকষ্টের আশঙ্কা করা চলে না। (মনে রাখিতে হইবে যে, রাজনীতি আর রাজধর্ম্ম এক নহে। যে রাজনীতিকে ধর্ম্মের অঙ্গরূপে স্বীকার করা হইত, তাহাই ছিল রাজধর্ম্ম।)

সাধারণ-সমাজের দান—গৃহী আচার্য্যগণ সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সেই কারণে যাগযজ্ঞেও তাঁহাদের নিমন্ত্রণ হইত। সেই-সকল দক্ষিণার আয়ও সম্ভবতঃ আচার্য্যগণের বৃহৎ পরিবার-প্রতিপালনে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিত। আচার্য্য দেবশর্ম্মা এবং আচার্য্য বেদ এইভাবে দক্ষিণা পাইয়াছেন, তাহা বর্ণিত আছে।[১০৭] এখনও হিন্দুসমাজে বড় বড় ক্রিয়াকাণ্ডে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বিদায়ের নিয়ম আছে। সমর্থ হইলে সকলেই তাহা বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপকপোষণের সেই সুপ্রাচীন প্রথাটি এখনও নিমন্ত্রণ এবং ব্রাহ্মণভোজনের মধ্য দিয়াই চলিয়া আসিতেছে।

বিদ্যার্থিগণ সমাজের পোষ্য—বিদ্যার্থিসম্প্রদায় সমস্ত সমাজের পোষ্য-বর্গের মধ্যে গণ্য। যাঁহার দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া বিদ্যার্থী উপস্থিত হইতেন, তিনিই দান করিতে বাধ্য ছিলেন। বিদ্যার্থিগণ স্বল্পসন্তুষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার বিলাসব্যসন হইতে মুক্ত। এই-সকল কারণে তাঁহাদের বিশেষ কিছু প্রয়োজনও হইত না।

বর্ণগত বৃত্তিব্যবস্থায় শিক্ষার গভীরতা—কেবল শিক্ষার ব্যাপকতার জন্য নহে, গভীরতার জন্যও সেই কালের সমাজের মনীষিগণ কম চিন্তা করেন নাই। বর্ণগত কর্ম্ম ও জীবিকার নির্দ্দেশ থাকায় একশ্রেণীর জ্ঞানতপস্বী পুরুষানুক্রমে বিদ্যাচর্চ্চার সুযোগ পাইতেন। এক-একটি অধ্যাপকপরিবারে পুরুষানুক্রমে অধ্যাপকেরই সৃষ্টি হইত। সেই-সকল অধ্যাপকগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে ধর্ম্মের অঙ্গ এবং জীবিকার উপায়রূপে গ্রহণ করিতেন। সেই কারণেই বোধ হয়, নানাবিধ বিদ্যার প্রসার ও গভীরতা সম্ভবপর হইয়াছিল।

[১০৬] এতেভ্যো বলিমাদদ্যাদ্ধীনকোশো মহীপতিঃ।
ঋতে ব্রহ্মসমেভ্যশ্চ দেবকল্পেভ্য এব চ॥ শা ৭৬।৯

[১০৭] যজ্ঞকারো গমিষ্যামি। ইত্যাদি। অনু ৪০।২৩
অথ কস্মিংশ্চিৎ কালে বেদং ব্রাহ্মণম্। ইত্যাদি। আদি ৩।৮২

কেবল ব্যাপকতার দ্বারা বিদ্যাকে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। গভীরতা না থাকিলে পল্লবগ্রাহিতায় অধ্যাপনা করা চলে না। এইসকল উদ্দেশ্যেই অধ্যাপনা এক শ্রেণীর লোকের জীবিকারূপে গণ্য হইয়াছিল। বিদ্যার বিশেষ গভীরতা না থাকিলে মহাভারতের মত গ্রন্থই রচিত হইত না।

শিক্ষার সহিত বাস্তবতার যোগ—শিক্ষার সঙ্গে জীবনের বিশেষ যোগ ছিল। কিরূপে স্বাবলম্বী হইতে হয়, কেমন করিয়া কষ্টসহিষ্ণু হইতে হয়, এইসকল বিষয় হাতেকলমে শিখিবার সুযোগ তখন মিলিত। গুরুগৃহই ছিল তাহার কেন্দ্র। প্রকৃত তপস্যাতে বিদ্যার্থীর চরিত্র উন্নত হইত। খাঁটি মানুষ সৃষ্টির পক্ষে যে আদর্শের সহায়তা প্রয়োজন, নির্লোভ নিরভিমান আচার্য্যকুলে সেই আদর্শ অখণ্ডভাবে বিরাজ করিত। সমস্ত মহাভারতে শিক্ষার যে ঐশ্বর্য্যের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, সেই ঐশ্বর্য্য উন্নত প্রাসাদে আত্মপ্রকাশ না করিয়া অরণ্যে এবং পর্ব্বততটে করিলেও তাহাতে একটা মহত্ত্বের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়।

জীবনব্যাপী শিক্ষার কাল—উক্ত হইয়াছে যে, গুরুশুশ্রূষায় এক পাদ, পরস্পরের মধ্যে শাস্ত্রীয় আলাপ-আলোচনার দ্বারা এক পাদ, উৎসাহের দ্বারা এক পাদ এবং বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আরও এক পাদ বিদ্যা লাভ করা যায়।[১০৮] এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে, মনীষিগণ সমস্ত জীবনকেই বিদ্যাশিক্ষার কালরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাবর্ত্তন হইলেই শিক্ষা শেষ হইল, এরূপ অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল না।

বিদ্যার সার্থকতা চরিত্রগঠনে এবং পুণ্য কর্ম্মে—মানুষের চরিত্র এবং কর্ম্ম দেখিয়া তাহার শিক্ষাদীক্ষার অনুমান করা যায়। একমাত্র চরিত্রগঠনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। দুই স্থানে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যার সার্থকতা চরিত্রগঠনে এবং পুণ্য কর্ম্মে।[১০৯]

চরিত্রহীন ব্যক্তির বিদ্যা নিষ্ফল। কুকুরের চামড়া-দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রে ঘৃত রাখিলে, সেই ঘৃত যেরূপ যজ্ঞাদিতে দেওয়া চলে না, চরিত্রহীনের বি দ্বারাও তাহার নিজের বা সমাজের কোন উপকার হয় না।[১১০]

---

১০৮ কালেন পাদং লভতে তথার্থম্। ইত্যাদি। উ ৪৪।১৬

১০৯ শীলবৃত্তফলং শ্রুতম্। সভা ৫।১১২। উ ৩৯।৬৬

১১০ কপালে যদ্বদাপঃ স্যুঃ শ্বদৃতৌ চ যথা পয়ঃ। ইত্যাদি। শা ৩৬।৪২

বৃত্তিব্যবস্থা

সমাজ-পরিচালনের সুব্যবস্থার নিমিত্ত বিভিন্ন বর্ণ এবং জাতির বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তি বা জীবিকার বিধান করা হইয়াছিল।

বৃত্তিব্যবস্থার প্রাচীনতা—মহাভারতকার বলেন, এই বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ মনুষ্য-কৃত নহে। প্রজাবর্গের সৃষ্টির পূর্ব্বেই প্রজাপতি তাহাদের জীবিকার উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। মানুষের জন্মের পূর্ব্বেই তাহার বৃত্তি স্থির হইয়া থাকে। এই বৃত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।[১]

জাতিবর্ণভেদে জীবিকাভেদ—জাতিবর্ণ-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের ব্যবস্থা থাকায় সমাজে জীবিকার কোন সমস্যা দেখা দেয় নাই। এক বর্ণের সামাজিক অধিকারের মধ্যে অপরের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। নিতান্ত আপৎকালে যদিও জীবন-ধারণের নিমিত্ত একটু-আধটু ব্যতিক্রমকে অনুমোদন করা হইয়াছে, তাহাও খুব সাবধানেই। সমস্ত মানবসমাজকে বিধাতৃপুরুষের শরীররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ মস্তকস্থানীয়, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র পদ। কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া সমাজ চলিতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য সমাজদেহের পরিপুষ্টি। বৃত্তিব্যবস্থার মধ্যে এই লক্ষ্যটি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নিষ্ঠার সহিত আপন আপন কার্য্যের দ্বারা সমাজের এক এক দিকের কল্যাণ সাধন করা, এবং সমাজকে পরিপূর্ণ আদর্শ মানব-সমাজরূপে গঠন করাই সম্ভবতঃ বৃত্তিব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল।

জীবিকাভেদের ফল—আলোচনায় মনে হয়, পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ ও জাতির উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তির যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, সমাজের সুশৃঙ্খল সামঞ্জস্য রক্ষা করা। বৃত্তির নিয়ম না থাকিলে কাজ লইয়া পরস্পরের মধ্যে কাড়াকাড়ির ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কাহারও কোন অনিষ্ট না করিয়া নিজের পরিবার-প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে মহাভারতে স্বীকার করা হইয়াছে। কাহারও সহিত দ্রোহ না করিয়া শান্তভাবে আপন কাজ করিয়া যাওয়াই বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল। 'কাহারও জীবিকার উপায়ের সহিত আমার জীবিকার উপায়ের যেন

---

১ অসৃজদ্বৃত্তিমেবাগ্রে প্রজানাং হিতকাম্যয়া। অনু ৭৩।১১

পূর্ব্বং হি বিহিতং কর্ম্ম দেহিনং ন বিমুঞ্চতি। বন ২০৭।১৯। বি ৫০।৪

সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়'—এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত কুলোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা মহাভারতের বৃত্তিব্যবস্থার সারমর্ম্ম।[২]

কুলোচিত বৃত্তি সর্ব্বথা অপরিত্যাজ্য—উত্তরাধিকারসূত্রে যে বংশোচিত কর্ম্মে মানুষের অধিকার, আপাতদৃষ্টিতে যদি তাহা অসাধু বলিয়াও মনে হয়, তথাপি সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করা অনুচিত। নিজের জন্মগত কর্ম্মের আচরণে যদি মৃত্যু হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু অপরের আচরণীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান একান্ত ভয়াবহ; তাহার পরিণাম সুখকর নহে।[৩] যে-সকল কুলোচিত কর্ম্ম পিতৃপিতামহক্রমে চলিয়া আসিতেছে, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সেইসকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানই প্রকৃত ধর্ম্ম। কোন অবস্থাতেই তাহা পরিত্যাজ্য নহে।[৪]

স্বধর্ম্মপালনের ফল এবং উপেক্ষায় ক্ষতি—জন্মগত অধিকারের বলে যে-সকল কর্ম্ম মানুষের কর্ত্তব্য, তাহা উপেক্ষা করিলে অকীর্ত্তি এবং পাপ হইয়া থাকে। আপন আপন জাতিগত কর্ম্মে যাঁহারা রত থাকেন, তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন। অপরের কর্ম্ম নিখুঁতভাবে আচরণ করা অপেক্ষা স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি অঙ্গহানিও হয়, তাহাও ভাল। জাতিগত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্খলনের ভয় নাই।[৫] ভগবদ্গীতার আলোচনায় বেশ বুঝা যায়, তাহার মর্ম্মকথা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান। যদি তাহা অস্বীকার করি, তবে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনেক উপদেশের কোন অর্থই হয় না। যখন অর্জ্জুনের ব্রাহ্মণসুলভ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপের কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া আর কিছু না বলিলেই ত চলিত, কেন শ্রীকৃষ্ণ বার-বার অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করাইলেন, কেন অধ্যায়ের পর অধ্যায় কেবল অর্জ্জুনকে ক্ষাত্রবীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার এত প্রচেষ্টা?

২ অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিঃ স পরো ধর্ম্মস্তেন জীবামি জাজলে। শা ২৬১।৬

৩ সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। ভী ৪২।৪৮
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ভী ২৭।৩৫

৪ কুলোচিতমিদং কর্ম্ম পিতৃপৈতামহং পরম্। বন ২০৬।২০

৫ ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি। ভী ২৬।৩৩
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। ভী ৪২।৪৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। ভী ৪২।৪৭

কুলধর্ম্ম কখনও পরিত্যাজ্য নহে—বনপর্ব্বের দ্বিজ-ব্যাধ-সংবাদে ও শান্তিপর্ব্বের তুলাধার-জাজলি-সংবাদে এই কথাটি খুব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে; বিশেষতঃ শুধু উপদেশচ্ছলে না বলিয়া উপাখ্যানের মধ্য দিয়া বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করায় অধিকতর স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়। (দ্রঃ ৯৭ তম ও ৯৮ তম পৃঃ।) উল্লিখিত দুইটি উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়, পিতৃ-পিতামহ-পরম্পরায় প্রাপ্ত সামাজিক যে অধিকার, তাহার ব্যতিক্রম করা সেই যুগে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাহার যথোচিত অনুষ্ঠানেই সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। একমাত্র বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং তাহার আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মহাভারতের বৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। নিখিল মানবসমাজের সাধারণ-আচরণীয় কর্ম্ম সম্বন্ধে মহাভারতে অনেক-কিছু আছে বটে, কিন্তু এই প্রবন্ধে তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।

মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম—অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, আতিথেয়তা, সত্য, অক্রোধ, তিতিক্ষা এইসকল গুণ নিখিল মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ। এইগুলির অভাবে মানুষকে মানুষ বলা যায় না।[৬]

ব্রাহ্মণের বৃত্তি—ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, এইরূপে বর্ণ স্থির করিয়াই বৃত্তির বিধান করা হইয়াছে। তাহা না হইলে কতকগুলি অসঙ্গত বিরোধের সম্ভাবনা থাকে। 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইয়াছে। (দ্রঃ ৯৭ তম পৃঃ।) যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তিন বর্ণেরই কর্ত্তব্য। যাজন, অধ্যাপনা এবং শুচি ও স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা এবং সত্য, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরূপে প্রতিপাল্য।[৭] অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। তন্মধ্যে অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহই তাঁহার জীবিকা। ভিক্ষাবৃত্তিও ব্রাহ্মণের পক্ষে গৌরবেরই ছিল।[৮]

৬ আনৃশংস্যমহিংসা চাপ্রমাদঃ সংবিভাগিতা। ইত্যাদি। শা ২৯৬।২৩,২৪

৭ যজ্ঞাধ্যয়নদানানি ত্রয়ঃ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ। বন ১৫১।৩৪
যাজনাধ্যাপনং বিপ্রে ধর্ম্মশ্চৈব প্রতিগ্রহঃ। বন ১৫১।৩৫। বন ২০৬।২৫

৮ অধীয়ীত ব্রাহ্মণো বৈ যজেত। ইত্যাদি। উ ২৯।২৩। অশ্ব ৪৫।২১
কপালং ব্রাহ্মণৈর্বৃতম্। ইত্যাদি। উ ৭২।৪৭। উ।১৩২।৩০। শা ২৩৪ তম অঃ।
অনু ১৪১।৬৭-৬৯

কাহাকেও কষ্ট দিতে নাই—ব্রাহ্মণ এরূপভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবেন, যাহাতে কাহারও কষ্ট না হয়। কাহারও বৃত্তির সহিত কোন-প্রকারের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত না হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মণের স্বল্পসন্তুষ্টিও তাঁহার জীবিকার হেতু। প্রয়োজনবোধ বেশী না থাকিলে অল্পেই জীবিকা চলিয়া যায়।[৯]

অর্থসঞ্চয় নিষিদ্ধ—ব্রাহ্মণের সঞ্চয়বুদ্ধি থাকিবে না। যজমান-শিষ্যাদি হইতে প্রতিগ্রহের দ্বারা ব্রাহ্মণ যাহা পাইবেন, তাহাও কেবল উদরান্নের নিমিত্ত ব্যয় করিবার অধিকার তাঁহার নাই। সেই অর্থের দ্বারা যজ্ঞ ও দান, এই দুইটি কর্ম্ম চালাইতে হইবে। পোষ্যবর্গভরণ ব্যতীত সামাজিক অন্য কোন দায়িত্ব ব্রাহ্মণের ছিল না। অন্য সকল দায়িত্বই রাজধর্ম্মের অন্তর্গত।[১০]

প্রতিগ্রহ নিন্দনীয়—ব্রাহ্মণের বৃত্তিরূপে স্থান পাইলেও তৎকালে প্রতিগ্রহ অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা নিন্দনীয় ছিল। বিশেষতঃ নৃপতি হইতে প্রতিগ্রহ সমধিক নিন্দিত। প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণের তেজস্বিতা নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অনেক তেজস্বী ব্রাহ্মণই সেই যুগে প্রতিগ্রহকে বিষের মত পরিত্যাজ্য মনে করিতেন।[১১]

উপযাজের অপ্রতিগ্রহ—রাজা দ্রুপদ কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ উপযাজকে পুত্রেষ্টিযাগে ঋত্বিকের পদে বৃত করিবার নিমিত্ত অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াছেন। কিন্তু তেজস্বী ব্রাহ্মণ উপযাজ কিছুতেই নৃপতির যজ্ঞে বৃত হন নাই। রাজা তাঁহার পায়ে ধরিয়া এবং পরিশেষে প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইয়াও বিফল-মনোরথ হইয়াছেন।[১২]

পতিত হইতে প্রতিগ্রহ ও অযাজ্যযাজন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ—শুচি বিশুদ্ধ পুরুষের দান গ্রহণ করাই যখন সমাজে নিন্দনীয় ছিল, তখন অশুচি পতিতের দান যে একেবারেই অগ্রাহ্য, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অযাজ্য পুরুষকে যাজন এবং অশুচি হইতে প্রতিগ্রহ, দুইটিই

৯ বন ২০৮।৪৪। শা ২৩৪।৪

১০ যজ্ঞেদদ্যান্নৈকোঽশ্নীয়াৎ কথঞ্চন। শা ২৩৩।১২। শা ৬০।১১

১১ প্রতিগ্রহেণ তেজো হি বিপ্রাণাং শাম্যতেঽনঘ। অনু ৩৫।২৩। অনু ৯৩।৩৪, ৩৬, ৪০-৪২

১২ আদি ১৬৭ তম অঃ।

ব্রাহ্মণের পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ।[১৩] বনপর্ব্বের অন্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণের প্রশংসাচ্ছলে বলা হইয়াছে—প্রতিগ্রহ, যাজন, অধ্যাপনা প্রভৃতি কিছুতেই ব্রাহ্মণের দোষ হয় না; ব্রাহ্মণ প্রজ্বলিত অগ্নির সমান।[১৪] এই উক্তিটির উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মণের প্রশংসা করা। অযাজ্যযাজন বা পতিত হইতে প্রতিগ্রহ করিলেও পাপ হইবে না, ইহা বচনের তাৎপর্য্য নহে।

কোন কোন ব্রাহ্মণের অসাধু আচরণ—উৎসবাদিতে অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ছাড়াও রাজবাড়ীতে যাইতেন, প্রতিগ্রহ করিতেও তাঁহাদের কোন আপত্তি ছিল না, বরং আনন্দিত হইতেন।[১৫]

ব্রাহ্মণের আপদ্ধর্ম্ম—শাস্ত্রবিহিত বৃত্তির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে একান্ত অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য-প্রকারের ব্যবস্থাও ছিল। নিতান্ত আপদে পড়িয়া সময় সময় অন্যের বৃত্তি গ্রহণ করা হইত বলিয়া সেই বৃত্তির নাম 'আপদ্ধর্ম্ম'। আপন বৃত্তির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে যে ব্রাহ্মণ অশক্ত, তিনি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি বা বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করিবেন। কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যকর্ম্ম নিতান্ত বিপদের সময় অবলম্বনীয়।[১৬] যে ব্রাহ্মণের পরিবারে পোষ্যসংখ্যা বেশী, তিনি নিরুপায় হইলে কৃষি, বাণিজ্য, কুসীদ (সুদগ্রহণ), ভিক্ষা প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। যাঁহার পরিবারে লোকসংখ্যা কম, তিনি যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ দ্বারা পরিবার পোষণ করিবেন। উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানে (শা ৩৫২তম—৩৬৫ অঃ) ঐ বৃত্তিকে বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। ভূপতিত ধান্যাদি শস্যের কণা সংগ্রহ করিয়া জীবন-ধারণ করার নাম 'উঞ্ছবৃত্তি'। শস্যের শিষ্ বা ছড়া একটি একটি করিয়া সংগ্রহ করার নাম 'শিলবৃত্তি'। উঞ্ছ এবং শিলবৃত্তি 'ঋত', অর্থাৎ নিষ্কলুষ। তাহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট হয় না। অযাচিতভাবে যাহা কিছু আসিয়া

১৩ পতিতাৎ প্রতিগৃহ্যাথ খরযোনৌ প্রজায়তে। অনু ১১১।৪৬
অযাজ্যস্য ভবেদৃত্বিক্। ইত্যাদি। অনু ৯৩।১৩০। অনু ৯৪।৩৩

১৪ নাধ্যাপনাদ্ যাজনাদ্বা অন্যস্মাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলিতাগ্নিসমা দ্বিজাঃ॥ বন ১৯৯।৮৭

১৫ এবং কৌতূহলং কৃত্বা দৃষ্ট্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
সহাস্মাভির্মহাত্মানঃ পুনঃ প্রতিনির্ব্বৎস্যথ॥ আদি ১৮৪।১৭

১৬ অশক্তঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ বৈশ্যধর্ম্মেণ বর্ত্তয়েৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় ব্যসনে বৃত্তিসংক্ষয়ে॥ শা ৭৮।২

উপস্থিত হয়, তাহার সংজ্ঞা 'অমৃত'। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই ঋত ও অমৃতবৃত্তি গ্রহণ করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। সমাজে তাহাই বিশেষ গৌরবের ছিল। বৃত্তিরূপে যদিও ভিক্ষাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মনুর মতে তাহা অতিশয় গ্লানিজনক। এই কারণে তাহার সংজ্ঞা 'মৃতবৃত্তি'। আপৎকালে গ্রহণীয় কৃষিবৃত্তিকেও মনু 'প্রমৃত' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। ভূমিস্থ বহু প্রাণীর জীবন নাশ হয় বলিয়া তাহাও সমদর্শী ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত। বাণিজ্যে সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত থাকায় তাহার অপর সংজ্ঞা 'সত্যানৃত'। এইসকল সংজ্ঞা হইতেই বৃত্তিগুলির আপেক্ষিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বুঝিতে পারা যায়।[১৭] মহাভারতে এইসকল সংজ্ঞার উল্লেখ না থাকিলেও গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রকারান্তরে তাহা বলা হইয়াছে। (দ্রঃ 'চতুরাশ্রম' ১০৫তম পৃঃ।) যুদ্ধ-বিগ্রহাদি যদিও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়, তথাপি আপৎকালে ব্রাহ্মণের শস্ত্রগ্রহণ মহাভারতের অনুমোদিত। আত্মরক্ষা, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষা এবং দুর্দ্দান্ত দস্যু প্রভৃতিকে শাস্তি দেওয়ার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের শস্ত্রগ্রহণ দূষণীয় নহে। অগস্ত্য-ঋষি মৃগয়া করিতেন বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়। মৃগয়াও ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের নহে।[১৮]

আপৎকালেও ব্রাহ্মণের অবিক্রেয়—আপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও ব্রাহ্মণ সুরা, লবণ, তিল, পশু, মধু, মাংস এবং অন্ন বিক্রয় করিতে পারিবেন না।[১৯]

শূদ্রবৃত্তি বর্জ্জনীয়—ব্রাহ্মণ যতই বিপদে পড়ুন না কেন, কোন অবস্থায় শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পরিচর্য্যা-রূপ শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণের পাতিত্য জন্মে।[২০]

আপৎকালেও বর্জ্জনীয়—কতকগুলি কার্য্য সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের বর্জ্জনীয়। ব্রাহ্মণ জীবিকার হেতুরূপে চিকিৎসা, পুরাধ্যক্ষতা এবং সামুদ্রিক

১৭ ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্। মনু ৪।৫

১৮ আত্মত্রাণে বর্ণদোষে দুর্দ্দম্যনিয়মেষু চ। ইত্যাদি। শা ৭৮।৩৪,২৯
অগস্ত্যঃ সত্রমাসীনশ্চকার মৃগয়ামৃষিঃ। আদি ১১৮।১৪

১৯ সুরা লবণমিত্যেব তিলান্ কেশরিণঃ পশূন্। ইত্যাদি। শা ৭৮।৪-৬

২০ শূদ্রধর্ম্মা যদা তু স্যাত্তদা পততি বৈ দ্বিজঃ। শা ২৯৪।৩

(হস্তরেখা-বিচার প্রভৃতি) বিদ্যাকে কখনও গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজার পৌরোহিত্যও অতিশয় নিন্দিত। সম্পত্তির লোভে বৃষলীর (শূদ্রা এবং পুনর্ভূ) পতিত্ব স্বীকার করাও একান্ত নিষিদ্ধ। জীবিকার নিমিত্ত কখনও ধনশালীর তোষামোদ করিতে নাই।[২১]

ব্রাহ্মণের সন্তুষ্টি—উল্লিখিত আলোচনায় দেখা যায়, বৃত্তির সঙ্কোচ এবং দারিদ্র্যে কখনও ব্রাহ্মণ আপন তেজস্বিতা হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন না। কৃচ্ছ্রবৃত্তিতাই ব্রাহ্মণের ভূষণ।

পুরোহিত-নিয়োগ ও তাঁহার কর্ত্তব্য—পৌরোহিত্যে কোনও শিক্ষিত আচারবান্ ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করা রাজাদের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হইত। রাজার কল্যাণ নির্ভর করিত প্রধানভাবে পুরোহিতের উপর। পুরোহিতগণ রাজাদের ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন, সম্মানিত অতিথির আগমনে তাঁহাকে মধুপর্কাদি প্রদান করিতেন।[২২] সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, সেই সময়ে রাজসভায় পুরোহিতেরও যথেষ্ট উপযোগিতা ছিল। পুরোহিতগণ রাজাদের অন্যান্য অমাত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসনই পাইতেন। পুরোহিত ধৌম্যকে যুধিষ্ঠির পিতৃবৎ সম্মান করিতেন, ইহা মহাভারতের আলোচনায় ভালরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে।

পৌরোহিত্য-বৃত্তির নিন্দার কারণ—পৌরোহিত্যকে এতটা নিন্দা করার কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রথমতঃ মনে হয়, পৌরোহিত্যও একপ্রকার রাজসেবার মধ্যে গণ্য। যেখানে সেব্যসেবক-ভাব থাকে, সেইখানেই প্রভুর মন রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের বিবেকবুদ্ধির প্রতিকূলে চলিতে হয়। এই ভাবের দাস্যবৃত্তিতে স্বাতন্ত্র্য বা তেজস্বিতা রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না।

যজমানগণ ঋত্বিকের উপরও বেশ আধিপত্য চালাইতেন। কোন কোন যজমানের এই-জাতীয় মনোবৃত্তি মহাভারতের পূর্ব্বকালেও ছিল। অশ্বমেধ-

---

২১ চিকিৎসকঃ কাণ্ডপৃষ্ঠঃ পুরাধ্যক্ষঃ পুরোহিতঃ। ইত্যাদি। অনু ১৩৫।১১
বন ১২৪।৯। উ ৩৮।৪। অনু ৯৪।২২, ৩৩। অনু ৯৩।১২৭, ১৩০

২২ য এব তু সতো রক্ষেদসতশ্চ নিবর্ত্তয়েৎ।
স এব রাজ্ঞা কর্ত্তব্যো রাজন্ রাজপুরোহিতঃ॥ শা ৭২।১। শা ৭৪।১। শা ৯২।১৮
আদি ১৭৪।১৩। আদি ১৮৩।৬। উ ৩৩।৮৩। উ ৮৯।১৯

পর্ব্বের সংবর্ত্তমরুত্তীয়-প্রকরণে ইন্দ্রবৃহস্পতি-সংবাদে ইন্দ্রের একটি সদম্ভ উক্তিতে প্রভুসুলভ মনোভাব সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। নৃপতি মরুত্ত দেবগুরু বৃহস্পতিকে যজ্ঞে ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিতে চান, বৃহস্পতি দেবরাজের অনুমতি চাহিলে দেবরাজ বলিলেন, "মরুত্তের যজ্ঞে বৃত হইলে আর আমার কার্য্য করিতে পারিবেন না"।[২৩]

অপরের স্তুতি করা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের পক্ষে সহজ ছিল না। ব্রাহ্মণের মন ছিল সরল, আর বাক্য ছিল কঠোর। সর্ব্বসাধারণের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মণগণ কড়া ভাষা প্রয়োগ করেন।[২৪] পৌরোহিত্যে অপরের মন রক্ষা করিয়া চলিতে হইত, তাই বোধ করি, ব্রাহ্মণের পক্ষে ঐ বৃত্তিটি প্রতিকূল বলিয়া সমাজে প্রশংসিত হয় নাই। দেবযানীর প্রতি শর্ম্মিষ্ঠার একটি সগর্ব্ব উক্তি হইতে অনুমিত হয়, অতি প্রভাবশালী পুরোহিতকেও প্রভুর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তোষামোদ করিতে হইত। শর্ম্মিষ্ঠা বলিতেছেন, "তোমার পিতা (আচার্য্য শুক্র) বিনীতভাবে স্তাবকের মত সর্ব্বদাই আমার পিতার স্তুতি করিয়া থাকেন"।[২৫] সাধারণ লোক পৌরোহিত্যকে অসম্মানের কার্য্যরূপে মনে করিত। জন্মান্তরীয় দুষ্কৃতির ফলে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য-বৃত্তির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন, ইহাই ছিল সাধারণ সমাজের ধারণা। তাই যাজনকে যদিও জীবিকার মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তথাপি তাহার প্রশস্ততা মহাভারতে কোথাও স্বীকৃত হয় নাই।[২৬] বিশেষ তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্যবৃত্তি গ্রহণ করিতেন না। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণেও বশিষ্ঠের একটি উক্তিতে পৌরোহিত্যের নিন্দা শুনিতে পাই। রঘুকুলগুরু বশিষ্ঠ ভগবান্ রামচন্দ্রকে বলিতেছেন, "পৌরোহিত্য যে গর্হিত এবং দূষ্য জীবিকা, তাহা বেশ জানি, কিন্তু তোমার আচার্য্য হইতে পারিব, এই আশায়ই গর্হিত কার্য্যও স্বীকার করিয়াছি"।[২৭]

২৩ মাং বা বৃণীষ ভদ্রং তে মরুত্তং বা মহীপতিম্।
পরিত্যজ্য মরুত্তং বা যথাজোষং ভজস্ব মাম্॥ অশ্ব ৫।২১

২৪ অতিতীক্ষ্ণন্তু তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ॥ উ ২১।৪। আদি ৩।১২৩

২৫ আসীনঞ্চ শয়ানঞ্চ পিতা তে পিতরং মম।
স্তৌতি বন্দীব চাভীক্ষ্ণং নীচৈঃ স্থিত্বা বিনীতবৎ। ইত্যাদি। আদি ৭৮।৯,১০

২৬ এতেন কর্ম্মদোষেণ পুরোধাস্ত্বমজায়থাঃ॥ অনু ১০।৫৬

২৭ পৌরোহিত্যমহং জানে বিগর্হ্যং দূষ্যজীবনম্। ইত্যাদি। অযোধ্যা কা ২।২৮

অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা রাজধর্ম্ম—ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার ভার প্রধানভাবে ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। যে-সকল ব্রাহ্মণ যাজন এবং প্রতিগ্রহ না করিয়া শাস্ত্রচিন্তায় রত থাকিতেন, নৃপতি তাঁহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিতেন। যাঁহারা প্রতিগ্রহ করিতেন, তাঁহাদেরও অভাব-অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা নৃপতির কর্ত্তব্য।[২৮]

অধ্যাপকগণ রাজকোষ হইতে কিরূপ সাহায্য পাইতেন, তাহা 'শিক্ষা' প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। একশ্রেণীর ব্রাহ্মণের তাহাই জীবিকা ছিল।

ব্রহ্মত্র ভূমি—নৃপতিগণ ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্কর ভূমি দান করিতেন, সেই দান প্রতিগ্রহ করিয়াও অনেক ব্রাহ্মণপরিবার পুরুষানুক্রমে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতেন।[২৯]

ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে কৃপণ বৈশ্য হইতে রাজাদের ধনগ্রহণ—ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃপণ বৈশ্য হইতে বলপূর্ব্বক ধন হরণ করিবার অধিকার রাজাদের ছিল। তাহাতে কোন পাপের আশঙ্কা ছিল না; পরন্তু ঐরূপ হরণ করা ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল।[৩০] ব্রাহ্মণের কোন-প্রকার অভাব-অভিযোগ ঘটিলে ক্ষত্রিয়েরাই দায়ী হইতেন। ব্রাহ্মণের ধন হরণ করা অত্যন্ত দূষণীয় ছিল। ব্রাহ্মণ যাহাতে বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, সমস্ত সমাজই সেই বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকিত। ব্রাহ্মণগণও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে সমাজকে উপকৃত করিতেন।[৩১]

ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি—ক্ষত্রিয় বাহুবলে সমাজের শাসন করিবেন। অন্য কাহারও জীবিকার উপায় যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, যুদ্ধে পরাক্রম-প্রদর্শন, দক্ষতা, প্রভৃতি তাঁহার স্বভাবজ ধর্ম্ম। আপন ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রজা

২৮ প্রতিগ্রহং যে নেচ্ছেয়ুস্তেভ্যো রক্ষ্যং ত্বয়া নৃপ। অনু ৩৫।২৩। অনু ৮।২৮

২৯ কচ্চিদ্দায়ান্ মামকান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রো দ্বিজাতীনাং সঞ্জয় নোপহন্তি। উ ২৩।১৫ সভা ৫।১১৭। শা ৮৯।৩। শা ৫৯।১২৬

৩০ অদাতৃভ্যো হরেদ্বিত্তং বিখ্যাপ্য নৃপতিঃ সদা।
তথৈবাচরতো ধর্ম্মো নৃপতেঃ স্যাদথাখিলঃ॥ শা ১৬৫।১০

৩১ ব্রাহ্মণস্বং ন হর্ত্তব্যং পুরুষেণ বিজানতা।
ব্রাহ্মণস্বং হৃতং হন্তি নৃগং ব্রাহ্মণগৌরিব॥ অনু ৭০।৩১

হইতে যে কর গ্রহণ করিবেন, তাহাদ্বারা প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া নিজের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।[৩২] প্রতিগ্রহ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সর্ব্বথা অনুচিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়কে আপন আপন ধর্ম্মে নিযুক্ত করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত।[৩৩]

সমাজের সেবা করিয়া করগ্রহণ—প্রজাদের নিকট হইতে ভূমির উপস্বত্বের ষষ্ঠাংশ কররূপে গ্রহণ করা হইত। তাহাই ক্ষত্রিয়দের জীবিকার অবলম্বন ছিল। এইপ্রকার করগ্রহণের দায়িত্ব কম নহে। প্রজাদের সুখদুঃখ রাজকার্য্যের পরিচালনার উপর প্রধানভাবে নির্ভর করিত। সুতরাং স্বধর্ম্মে থাকিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে ক্ষত্রিয়গণকেও অক্লান্তভাবে সমাজের সেবা করিতে হইত। সমাজসেবা বা রাজ্যশাসন করিতে প্রয়োজন হইলে দণ্ডনীতির প্রয়োগে একমাত্র রাজাদেরই অধিকার ছিল। রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় বুঝা যায়, রাষ্ট্রের পালনের পারিশ্রমিকস্বরূপ যে কর আদায় করা হইত, তাহাই ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি বা জীবিকানির্ব্বাহের নির্দ্দিষ্ট উপায়রূপে গণ্য ছিল।[৩৪]

মৃগয়া—মৃগয়ায় পশুবধ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দূষণীয় নহে, বরং প্রশংসনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।[৩৫]

যুদ্ধ, বৃত্তি নহে—যুদ্ধ যদিও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত, তথাপি তাঁহার বৃত্তি নহে। একমাত্র অশিষ্টের দমনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করাই তাহার ধর্ম্ম।[৩৬]

ক্ষত্রিয়ের কষ্টসহিষ্ণুতা—ক্ষত্রিয়ের কষ্টসহিষ্ণুতা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। কর্ণ ও পরশুরামের উপাখ্যান হইতে তাহা অনুমিত হয়। ভীষণ কীটদংশন সহ্য করিবার ক্ষমতা দেখিয়াই পরশুরাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে

৩২ পালনং ক্ষত্রিয়াণাং বৈ। বন ৫০।৩৫। উ ১৩২।৩০। শা ৬০।১৩-২০

৩৩ ন হি ধর্ম্মঃ স্মৃতো রাজন্ ক্ষত্রিয়স্য প্রতিগ্রহঃ। শল্য ৩১।৫৫
চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্থাপয়িত্বা স্বধর্ম্মে পূতাত্মা বৈ মোদতে দেবলোকে। শা ২৫।৩৬

৩৪ ক্ষত্রিয়স্য স্মৃতো ধর্ম্মঃ প্রজাপালনমাদিতঃ। ইত্যাদি। অনু ১৪১।৪৭-৫৩। শা ৯১

৩৫ আরণ্যাঃ সর্ব্বদৈবত্যাঃ সর্ব্বশঃ প্রোক্ষিতা মৃগাঃ
অগস্ত্যেন পুরা রাজন্ মৃগয়া যেন পূজ্যতে। অনু ১১৬।১৬

৩৬ যুধ্যস্ব নিরহঙ্কারো বলবীর্য্যব্যপাশ্রয়ঃ। ভী ১২২।৩৭

কর্ণ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নহেন, তিনি ক্ষত্রিয়।[৩৭] এই কারণেই বোধ করি, শারীরিক কষ্টসাধ্য কঠোর কাজগুলি ক্ষত্রিয়ের আয়ত্তাধীন ছিল। জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেও তাঁহাকে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে হইত।

আপৎকালে অন্য বৃত্তি-গ্রহণ—আপৎকালে ক্ষত্রিয়গণও স্ববৃত্তি ত্যাগ করিতেন। কথিত আছে—পরশুরামের ভয়ে দ্রবিড়, আভীর, পুণ্ড্র, শবর-প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ স্বেচ্ছায় শূদ্রত্ব বরণ করিয়াছিলেন।[৩৮]

ক্ষত্রিয়ের আপৎকালে অন্য বর্ণের রাজ্যশাসন—ক্ষত্রিয় আপদ্‌গ্রস্ত হইলে অন্য বর্ণের ব্যক্তিও অগত্যা রাজ্যশাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেরই এই বিষয়ে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।[৩৯]

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর মিলন—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়কে পরস্পর মিলিতভাবে কাজ করিবার নিমিত্ত অনেক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। জীবিকা বিষয়ে তাহার বিশেষ উপযোগিতা না থাকিলেও রাষ্ট্রীয় সুখশান্তি এবং সামাজিক দিক্ হইতে লক্ষ্য করিলে তাহার উপযোগিতা অত্যন্ত বেশী। শাসনকার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন, ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করা তাঁহাদের সকলের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং মন্ত্রণার নিমিত্ত বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিত্বে বরণ করা হইত।[৪০]

বৈশ্যের বৃত্তি—বৈশ্যের বৃত্তি-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন এবং বাণিজ্যই তাঁহার প্রধান অবলম্বন। পশুদিগকে বৈশ্য সস্নেহে পালন করিবেন, তাহাদের প্রতি কখনও নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন না।[৪১]

পশুরক্ষণে লভ্যাংশ—অন্য কোন ব্যক্তির গরু পালন করিলে প্রত্যেক ছয়টি দুগ্ধবতী গাভীর পালনের বেতনস্বরূপ একটির দুগ্ধ পালক গ্রহণ করিবেন।

---

৩৭ অতিদুঃখমিদং মূঢ় ন জাতু ব্রাহ্মণঃ সহেৎ।
ক্ষত্রিয়স্ত্বেব তে ধৈর্য্যং কাময়া সত্যমুচ্যতাম্॥ শা ৩।২৫

৩৮ এবং তে দ্রবিডাভীরাঃ পুণ্ড্রাশ্চ শবরৈঃ সহ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্যুত্থানাৎ ক্ষত্রধর্ম্মিণঃ॥ অশ্ব ২৯।১৬

৩৯ ব্রাহ্মণো যদি বা বৈশ্যঃ শূদ্রো বা রাজসত্তম। ইত্যাদি। শা ৭৮।৩৬

৪০ ব্রহ্ম বর্দ্ধয়তি ক্ষত্রং ক্ষত্রতো ব্রহ্ম বর্দ্ধতে। শা ৭৩।৩২। শা ৭৮।২১। বন ২৬।১৪-১৬

৪১ বৈশ্যস্যাপি হি যো ধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি শাশ্বতম্। ইত্যাদি। শা ৬০।২১-২৩
শা ৯১।৪। অনু ১৪১।৫৪-৫৬।

একশত গরুর রাখাল হইলে বার্ষিক বেতনস্বরূপ একটি গাভী ও একটি বৃষ তাঁহার প্রাপ্য।[৪২]

ব্যবসাতে লভ্যাংশ—বৈশ্য যাঁহার মূলধনে বাণিজ্য করিবেন, তাঁহার নিকট হইতে লাভের সপ্তমাংশ আপনার পারিশ্রমিকস্বরূপ গ্রহণ করিবেন।[৪৩] যদি গবয় প্রভৃতি পশুর শৃঙ্গের ব্যবসা করেন, তবে মূল ধনিককে সমস্ত দিয়া লাভের সপ্তমাংশ গ্রহণ করিবেন, আর কোন কোন পশুর মূল্যবান্ খুরের ব্যবসা করিলে পারিশ্রমিকস্বরূপ লাভের ষোড়শাংশ নিজে পাইবেন। যিনি মূলধন দিবেন, তিনিই অবশিষ্ট পনর অংশ পাইবেন।[৪৪] কৃষিকর্ম্মেও ভূমির মালিক হইতে এক বৎসরের পারিশ্রমিক-স্বরূপ উৎপন্ন ফসলের সপ্তমাংশ পাইবার নিয়ম।[৪৫] এইভাবে পরিশ্রমলব্ধ ধনের দ্বারাই বৈশ্যের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল। স্বাধীনভাবে কৃষিবাণিজ্য-প্রভৃতি কর্ম্মেও একমাত্র বৈশ্যেরই বর্ণগত অধিকার।

গো-পালনে বিশেষ অধিকার—বৈশ্য কখনও গো-পালনে আপত্তি করিবেন না এবং বৈশ্যজাতীয় রাখাল যদি গরু রাখিতে চান, তবে অন্য কেহ তাঁহার কাজে বাধা দিতে পারিবেন না, ইহাই ছিল বিধান।[৪৬] অগ্নিহোত্র, দান, অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে বৈশ্যেরও অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, পরন্তু ঐগুলির মধ্যে কোনটিকে তিনি জীবিকারূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।[৪৭]

বাণিজ্যে অবিক্রেয় বস্তু—বাণিজ্যের বেলায়ও দুই-চারিটি বিধিনিষেধ দেখিতে পাই। কোন কোন বস্তু বিক্রয় করা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—তিল, গন্ধদ্রব্য, লবণ, পক্বান্ন, দধি, দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, মাংস, ফলমূল, শাক, লাল রংএর কাপড়, গুড় ইত্যাদি।[৪৮] এইসকল বস্তু বিক্রয় করা কি কারণে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, বলা শক্ত। বাণিজ্য-ব্যবসাতে শুধু বৈশ্যেরই অধিকার

---

৪২ তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি যচ্চ তস্যোপজীবনং।
ষণ্ণামেকাং পিবেদ্ধেনুং শতাচ্চ মিথুনং হরেৎ। শা ৬০।২৪

৪৩ লব্ধাচ্চ সপ্তমং ভাগম্। শা ৬০।২৫

৪৪ লব্ধাচ্চ সপ্তমং ভাগং তথা শৃঙ্গে কলা খুরে। শা ৬০।২৫

৪৫ শস্যানাং সর্ব্ববীজানামেষা সাংবৎসরী ভৃতিঃ। শা ৬০।২৬

৪৬ ন চ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি। ইত্যাদি। শা ৬০।২৬

৪৭ বৈশ্যোঽধীত্য কৃষিগোরক্ষপণ্যৈঃ। ইত্যাদি। উ ২৯।২৫। অনু ১৪১।৫৪

৪৮ তিলান্ গন্ধান্ রসাংশ্চৈব বিক্রীণীয়ান্ন চৈব হি। অনু ১৪১।৫৬। উ ৩৮।৫

াকায় দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, মাংস প্রভৃতিতে ভেজাল মিশাইয়া চালান অসম্ভব নহে,
াই বোধ করি, ঐগুলি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অন্যান্য নিষিদ্ধ
স্তু সম্বন্ধেও কারণ অনুমান করা যায় না। বনপর্ব্বের দ্বিজব্যাধ-সংবাদ হইতে
নুমিত হয়, ব্যাধজাতীয় লোকেরা মাংস বিক্রয় করিত।

শূদ্রবৃত্তি—শূদ্র ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার
বিকানির্ব্বাহের উপায়।[৪৯] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিন বর্ণই
দ্রকে রক্ষা করিতে বাধ্য। শূদ্র আপনার ভরণপোষণের নিমিত্ত চিন্তা
রিবেন না। তিনি নিরলস সেবাদ্বারা তিন বর্ণের শুশ্রূষা করিবেন। তাঁহার
সারনির্ব্বাহের ভার প্রভুর উপর ন্যস্ত। ছাতি, পাখা, কাপড়-চোপড়
ভৃতি কিছুদিন ব্যবহারের পর পুরান হইলে পরিচারককে দিয়া দেওয়া হইত।
ইগুলিই ছিল শূদ্রের ধর্ম্মধন। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার পরিচারকের
রিবারিক সমস্ত ব্যয় চালাইতে বাধ্য থাকিতেন এবং আনন্দের সহিত
পন কর্ত্তব্য পালন করিতেন। সুতরাং শূদ্র তাঁহার জীবিকাসংস্থানের নিমিত্ত
কটুও চিন্তা করিতেন না। প্রভুর সেবা করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য
লিয়া বিবেচিত হইত।[৫০] শুশ্রূষা ব্যতীত শূদ্রের জীবিকার আরও কোন
ায় ছিল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু কি ছিল, তাহা কোথাও উক্ত হয় নাই।
াশরগীতায় বলা হইয়াছে, শূদ্রের যদি পৈতৃক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি না থাকে,
হা হইলে অন্যের কোন বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া শুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত
বেন।[৫১] এই উক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়, অন্যপ্রকার বৃত্তিও শূদ্রের ছিল;
ন্তু সেবাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি।[৫২]

সঙ্কর জাতির বৃত্তি—'চাতুর্ব্বর্ণ্য' প্রবন্ধে (১০০ তম পৃঃ) কতকগুলি
র-জাতির নাম বলা হইয়াছে। সমাজে ইহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন
নিয়মিত ছিল। সকলের বৃত্তির কথা মহাভারতে আলোচিত হয়
। দুই-চারিটি সঙ্কর জাতির বৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। ধনী বিলাসী

[৪৯] তস্মাচ্ছূদ্রস্য বর্ণানাং পরিচর্য্যা বিধীয়তে। ইত্যাদি। শা ৬০।২৮,২৯। অনু ১৪১।৭৫

[৫০] অবশ্যং ভরণীয়ো হি বর্ণানাং শূদ্র উচ্যতে। ইত্যাদি। শা ৬০।৩২-৩৫

[৫১] বৃত্তিশ্চেন্নাস্তি শূদ্রস্য পিতৃপৈতামহী ধ্রুবা।
ন বৃত্তিং পরতো মার্গেচ্ছুশ্রূষান্তু প্রযোজয়েৎ। শা ২৯৩।২

[৫২] শূদ্রস্ত নিত্যং দাক্ষ্যেণ শোভতে। শা ২৯৩।২১। অনু ১৪১।৫৭

পুরুষদিগকে পোশাক-পরিচ্ছদে সাজাইয়া দেওয়া সৈরন্ধ্রজাতির জীবিকার উপায়, সৈরন্ধ্রীগণ সেইসকল বিলাসীদের অন্তঃপুরে মহিলাদের অলঙ্করণে নিযুক্ত হইতেন। সূতজাতীয় ব্যক্তিগণের বৃত্তি ছিল সারথ্য, তাঁহারা রাজাদের স্তুতিগানও করিতেন। অন্তঃপুরের পাহারা দেওয়া এবং অন্তঃপু যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা বৈদেহকের কাজ। রাজদণ্ডে বধ্য ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করা চণ্ডালের জীবিকা। রাজার সভায় উপস্থিত থাকিয়া উপযুক্ত সময়ে যথোচিত কথা বলা বন্দীর বৃত্তি। বস্ত্র পরিষ্কার করা রজকজাতির জীবিকা। নিষাদজাতির কাজ ছিল মাছধরা। জালবোনা আয়োগব-জাতির জীবিকা। মদ্য প্রস্তুত করা মৈরেয়কজাতির বৃত্তি। দাশ-(স ?) জাতীয়গণ নৌকা চালাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক সঙ্কর জাতির কাজ সমাজে নির্দ্দিষ্ট ছিল।[৫৩]

বৃত্তিব্যবস্থার সুফল—বৃত্তিবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, সমাজে প্রত্যেকের বর্ণ বা জাতি হিসাবে বিভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকায় পরিবার-প্রতিপালনে কাহাকেও চিন্তা করিতে হইত না। এক সম্প্রদায়ের জীবিকার উপায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের উপায়ের বিরোধ হইত না। আপন আপন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকলেই জাতিগত বিদ্যার অনুশীলনে সেই বিদ্যার এবং সঙ্গে সঙ্গে নিখিল সমাজের উন্নতি সাধন করিতেন। প্রত্যেকের বৃত্তিরই সমাজে একটা স্থান ছিল। কাহারও বৃত্তিকে 'ন স্যাৎ' করিবার উপায় ছিল না। কেহ কখনও অপরের বৃত্তি অপেক্ষা আপনার বৃত্তিকে ঘৃণ্য বলিয়া মনে করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত মহাভারতে নাই। ব স্ব-স্ব-জাতিবর্ণোচিত কর্ম্মের প্রশংসাই সর্ব্বত্র শুনিতে পাই। 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' প্রবন্ধে এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। সমাজে জীবি বিষয়ে সঙ্ঘর্ষ এড়াইবার শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল জন্মগত বৃত্তিব্যবস্থা, ইহা বো করি সর্ব্ববাদিসম্মত। এই বৃত্তিব্যবস্থা রাজশক্তির সুতীক্ষ্ণ নিয়ন্ত্রণে রক্ষি হইত। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বকর্ম্মের দ্বারা পরিবার চালাইতে পারে সেই বিষয়ে রাজার দৃষ্টি ছিল।

৫৩ অনু ৪৮শ অঃ। শা ৯১।২

কৃষি, পশুপালন ও গো-সেবা

অধ্যাপনা, যাজন, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের বৃত্তি। ব্রাহ্মণের বৃত্তি ষন্ধে 'শিক্ষা' ও 'বৃত্তিব্যবস্থা' প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি বষয়ে 'রাজধর্ম্ম' প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। শূদ্রের পরিচর্য্যা-ত্তি বিষয়েও 'বৃত্তিব্যবস্থা' প্রবন্ধেই আলোচিত হইয়াছে। কৃষি, পশুপালন প্রভৃতিতে বৈশ্যের জন্মগত অধিকার, ইহাই তাঁহার বৃত্তি। সম্প্রতি বৈশ্যবৃত্তি বষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

কৃষিদ্বারা সমৃদ্ধিলাভ—জগতে সমৃদ্ধি লাভের যে কয়েকটি উপায় াছে, কৃষি সেইগুলির মধ্যে অন্যতম। স্বয়ং শ্রীদেবী বলিতেছেন, "কৃষিনিরত বশ্যের শরীরে আমি বাস করি"।[১]

নৃপতির লক্ষ্য—কৃষিকার্য্যে যাহাতে বৈশ্য উন্নতি লাভ করিতে পারেন, নই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নৃপতির কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। নৃপতির নবধানতায় যদি চোর, রাজকর্ম্মচারী অথবা রাজকীয় বিধিব্যবস্থা হইতে ষকের ভয় বা সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই অবাঞ্ছনীয় ও ক্ষতিকর বস্থার জন্য নৃপতিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইতেন।[২]

কৃষকদের সন্তুষ্টি-বিধান— যে-সকল উপায়ে কৃষির উন্নতিবিধান সম্ভবপর য়, রাজাকে সমস্তই করিতে হইত। কৃষকদিগকে সন্তুষ্ট রাখা এবং তাঁহাদের :খদুর্গতি মোচন করা রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য।[৩]

কৃষির নিমিত্ত জলাশয়-খনন—যে-সকল স্থান দেবমাতৃক নহে, অর্থাৎ াভাবিক বৃষ্টির জলে যে-সকল স্থানে শস্য উৎপন্ন হয় না, সেই-সকল স্থানে জা প্রয়োজনমত জলাশয় খনন করাইবেন।[৪]

দরিদ্র কৃষকগণকে বীজ প্রভৃতি দান—যে-সকল কৃষক দরিদ্র, রাজা াহাদের অন্নসংস্থান ত করিবেনই, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে কৃষির উপযোগী জও রাজাকেই দিতে হইবে।[৫]

---

১ বৈশ্যে চ কৃষ্যাভিরতে বসামি। অনু ১১।১৯। উ ৩৬।৩১

২ নরশ্চেৎ কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যঞ্চাপ্যনুষ্ঠিতঃ। ইত্যাদি। শা ৮৮।২৮

৩ তথা সন্ধায় কর্ম্মাণি অষ্টৌ ভারত সেবসে। সভা ৫।২২, ৭৬

৪ কচ্চিদ্রাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণানি চ বৃহন্তি চ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষির্দ্দেবমাতৃকা॥ সভা ৫।৭৭

৫ কচ্চিন্ন ভক্তং বীজঞ্চ কর্ষকস্যাবসীদতি। সভা ৫।৭৮

বার্ত্তাকর্ম্মে সাধু লোকের নিয়োগ—বার্ত্তাকর্ম্মে (কৃষি, বাণিজ্য, পশু- পালন এবং কুসীদ) সাধু লোকদিগকে নিয়োগ করা এবং তাঁহাদের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখা রাজার কাজ। কারণ বার্ত্তার সমৃদ্ধিতেই লোকস্থিতি নির্ভর করে।[৬]

কৃষক-প্রতিপালন—কৃষক এবং বণিক্‌রাই রাষ্ট্রকে সম্পৎশালী করি থাকেন। ফলতঃ তাঁহারাই রাজাকে এবং সমস্ত প্রজামণ্ডলীকে রক্ষা করেন তাঁহারা যাহাতে করভারে অথবা অন্য কারণে পীড়িত না হন, রাজা সেই বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। দেবতা, পিতৃগণ, মানুষ, রাক্ষস, সরীসৃপ পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলকেই কৃষক ও বণিকের শ্রমের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই কারণে সহৃদয়তার সহিত তাঁহাদের যাবতীয় অভাব-অভিযোগ পূ করিবার নিমিত্ত রাজাকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা হইয়াছে।[৭]

কররূপে ষষ্ঠাংশ-গ্রহণ—প্রজাদের রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের আয়ের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিবার নিয়ম। রাজা তাহা ছাড়া বেশী কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন না।[৮]

মাসিক শতকরা এক টাকা সুদে কৃষিঋণ-প্রদান—কৃষকগণের ঋণ গ্রহণের আবশ্যক হইলে রাজকোষ হইতে তাঁহাদিগকে ঋণ দিবার ব্যবস্থা ছিল। শতকরা মাসিক এক টাকা সুদে রাজকোষ হইতে ঋণ দেওয়া হইত। তৎকালে আধুনিক টাকা-পয়সা প্রভৃতির মত মুদ্রার প্রচলন অবশ্যই ছিল না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যে-জাতীয় মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহারই একশ ভাগের এক ভাগ মাসিক সুদরূপে ধরা হইত।

অনুগ্রহ-ঋণ—সাধারণ কুসীদব্যবসায়ী মহাজন হইতে বোধ করি, এ অল্প সুদে কর্জ্জ পাওয়া যাইত না। সেইজন্য রাজকোষ হইতে প্রদত্ত ঋণকে "অনুগ্রহ-ঋণ" বলা হইয়াছে।[৯]

দরিদ্র কৃষকগণকে চিরতরে দান—দরিদ্র কৃষক, গো-রক্ষক বা বণি

---

৬ বার্ত্তায়াং সংশ্রিতস্তাত লোকোঽয়ং সুখমেধতে। সভা ৫।৭৯

৭ কচ্চিৎ কৃষিকরা রাষ্ট্রং ন জহত্যতিপীড়িতাঃ। ইত্যাদি। শা ৮৯।২৪-২৬

৮ আদদীত বলিঞ্চাপি প্রজাভ্যঃ কুরুনন্দন
স ষড়্‌ভাগমপি প্রাজ্ঞস্তাসামেবাভিগুপ্তয়ে। শা ৬৯।২৫। শা ৭১।১০

৯ প্রত্যেকঞ্চ শতং বৃদ্ধ্যা দদাস্যৃণমনুগ্রহম্। সভা ৫।৭৮

য় ঋণ গ্রহণ করিয়া আপনার আয়ের দ্বারা তাহা পরিশোধ করিতে পারিতেন না, সহৃদয় নৃপতিগণ তাঁহাদিগকে সেই ঋণ হইতে মুক্তি দিতেন।[১০]

কর-আদায়ে কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নিয়োগ—প্রজা হইতে কর আদায়ের নিমিত্ত শূর এবং বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে নিয়োগ করিবার বিধান। সুতরাং কোথাও অন্যায় উৎপীড়নের আশঙ্কা থাকিত না।[১১]

নদীমাতৃকাদি দেশভেদে কৃষিকর্ম্মের বিভিন্ন ব্যবস্থা—দেশভেদে কৃষিকর্ম্মেরও প্রভেদ ছিল। কোন কোন দেশ ছিল দেবমাতৃক, পরিমিত বর্ষণের জলে ফসল উৎপন্ন হইত। কতকগুলি দেশ ছিল নদীমাতৃক। ক্ষেত্রে নদীর জল সেচন করিয়া সেইসকল দেশে ফসল ফলান হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইত। সমুদ্রের তটস্থ ক্ষেত্রে বিনা পরিশ্রমেই ফসল উৎপন্ন হইত; সেইসকল দেশকে 'প্রকৃতিমাতৃক' নাম দেওয়া যাইতে পারে।[১২]

ওষধি প্রভৃতি সূর্য্যেরই পরিণতি—দেবমাতৃক কৃষিসম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সূর্য্য উত্তরায়ণে ভূমির রস আকর্ষণ করেন ও আপন তেজের দ্বারা ভূমিকে উর্ব্বর করেন। পুনরায় দক্ষিণায়নে চন্দ্রের মধ্যস্থতায় অন্তরীক্ষগত মেঘরূপে পরিণত তেজের (বস্তুতঃ যাহা পূর্ব্বসংগৃহীত রস) বর্ষণের দ্বারা ওষধির উপকার সাধন করিয়া থাকেন। সূর্য্যই শস্যের জনক। প্রাণীদের বাঁচিয়া থাকিবার নিমিত্ত যে-সকল খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তাহা সূর্য্যতেজের পরিণতি। গীতাতেও বলা হইয়াছে, মেঘ হইতেই অন্নের উৎপত্তি।[১৩]

প্রাকৃতিক অবস্থা-পরিজ্ঞান—যে কৃষক প্রাকৃতিক অবস্থা না বুঝিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করে এবং প্রচুর পরিশ্রম করে না, সে কৃষির ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।[১৪]

বলীবর্দ্দদ্বারা ভূমিকর্ষণ—কেবল বলদের দ্বারা চাষের কথাই পাওয়া যায়। অন্য কোন উপায়ে চাষ করা হইত কি না, তাহা জানা যায় না।[১৫]

---

১০ অনুকর্ষঞ্চ নিষ্কর্ষং। ইত্যাদি। সভা ১৩।১৩

১১ কচ্চিচ্ছূরাঃ কৃতপ্রজ্ঞাঃ পঞ্চ পঞ্চস্বনুষ্ঠিতাঃ। সভা ৫।৮০

১২ ইন্দ্রকৃষ্টৈর্বর্ত্তয়ন্তি ধান্যৈর্যে চ নদীমুখৈঃ। সভা ৫১।১১। সভা ৫।৭৭

১৩ পুরা সৃষ্টানি ভূতানি পীড্যন্তে ক্ষুধয়া ভৃশম্। ইত্যাদি। বন ৩।৫-৯। ভী ২৭।১৪

১৪ যস্তু বর্ষমবিজ্ঞায় ক্ষেত্রং কর্ষতি মানবঃ। ইত্যাদি। শা ১৩৯।৭৯। বন ২৫৮।১৬

১৫ এতাসাং তনয়াশ্চাপি কৃষিযোগমুপাসতে। অনু ৮৩।১৮

লাঙ্গল—ভূমিকর্ষণে কি কি উপকরণের আবশ্যক হইত, তাহার কোন উল্লেখ নাই। বৈষ্ণব-যজ্ঞে সোনার লাঙ্গল দিয়া যজ্ঞবাট কর্ষণের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, লাঙ্গল দিয়াই কর্ষণের নিয়ম তখন প্রবর্ত্তিত ছিল। এক স্থানে লৌহমুখ কাষ্ঠের কথা বলা হইয়াছে; তাহাও লাঙ্গল বলিয়াই মনে হয়।[১৬]

ধান, যব প্রভৃতি শস্য—নানাপ্রসঙ্গে ধান, যব, সর্ষপ, কোদ্রব, পুলক, তিল, মাষ, মুগ, প্রভৃতির নাম গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে মনে হয়, এইসকল শস্যই তখন উৎপন্ন হইত।[১৭]

কৃষিকর্ম্মের নিন্দা—কোন কোন স্থানে কৃষিকর্ম্মের নিন্দাও করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, পাপের ফলে মানুষ কৃষক হইয়া থাকে। তুলাধারজাজলি-সংবাদে তুলাধার বলিতেছেন, "পশুরা স্বভাবতঃ সুখেই বাস করে, নির্দ্দয় মানুষ তাহাদিগকে নানাপ্রকার কষ্ট দিয়া থাকে, এইভাবে নিরীহ পশুদিগকে যন্ত্রণা দেওয়া অপেক্ষা ভ্রূণহত্যাও বোধ করি বেশী পাপজনক নহে। কেহ কেহ কৃষিকর্ম্মের সাধুতা খ্যাপন করিয়া থাকেন। কৃষকেরা ক্ষেত্রস্থিত কীট-পতঙ্গাদিকে লৌহমুখ কাষ্ঠের (লাঙ্গলের) দ্বারা নিষ্পেষিত করে, বিশেষতঃ গরুর দুর্গতিতে তাহারা একটুও ভ্রূক্ষেপ করে না। এইপ্রকার নৃশংসেরা ব্রহ্মহত্যার পাতকীর সমান"।[১৮] বিদুরের মুখেও কৃষির নিন্দা কীর্ত্তিত হইয়াছে।[১৯] যে-সকল কৃষক গরুকে বেশী কষ্ট দেয়, নিন্দাসূচক বাক্যগুলি সম্ভবতঃ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। কৃষির নিন্দাপ্রচারই যদি সেইসকল বাক্যের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কৃষির প্রশংসাসূচক উক্তিসমূহের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না। অথবা সেইসময়ে বৈশ্য ভিন্ন অপর জাতির পক্ষে কৃষিকর্ম্ম গর্হিত ছিল, তাহা প্রকাশ করাই এইসকল নিন্দার তাৎপর্য্য।

নিজে দেখাশোনা করা—ভৃত্যাদি-দ্বারা কৃষিকর্ম্মের পরিচালনা ভাল হয় না। নিজেই কৃষির তত্ত্বাবধান করিতে হয়। সামান্য অনবধানতা

১৬ তেন তে ক্রিয়তামদ্য লাঙ্গলং নৃপসত্তম। বন ২৫৪। ৭
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্। শা ২৬১।৪৬

১৭ অনু ১১১।৭১

১৮ কর্ষকো মৎসরী চাস্তু। অনু ৯৩।১২৯
অদংশমশকে দেশে সুখসংবর্দ্ধিতান্ পশূন্। ইত্যাদি। শা ২৬১।৪৩-৪৮

১৯ যশ্চ নো নির্বপেৎ কৃষিম্। উ ৩৬।৩৩

ঘটিলেই কৃষির প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে। সুতরাং সুগৃহস্থ কৃষির দেখাশোনা স্বয়ং করিবেন।[২০]

পশুর উন্নতিকল্পে রাজার কর্ত্তব্য—পশুপালনের ভারও বৈশ্যবর্ণের উপরেই ন্যস্ত, কিন্তু রাজাকে এই বিষয়ে অবহিত থাকিতে হইত। রাজা পশুপালনের নিমিত্ত নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিতেন।[২১]

গরু—তৎকালে প্রায় প্রত্যেকেই গাভী পালন করিতেন। বশিষ্ঠের হোমধেনুর মাহাত্ম্য মহাভারতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য পশু অপেক্ষা গরু তখনও মানবসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী ছিল। সেইজন্য মহাভারতে নানা স্থানে গরুর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অন্যান্য গৃহপালিত পশু—হাতী, ঘোড়া, গাধা, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর উল্লেখও নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

পশুচিকিৎসা—গৃহপালিত পশুর অসুখ-বিসুখ হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। হস্তিসূত্র, অশ্বসূত্র প্রভৃতির জ্ঞানলাভ রাজাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। সুতরাং মনে হয়, সমাজের অনেকেই পশুপালনের নিয়মাবলী ভালরূপেই জানিতেন।[২২]

অশ্ববিদ্যা—নলরাজা অশ্ববিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। অশ্বের লক্ষণ, চালনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অসামান্য পটুতা ছিল। হয়জ্ঞানের বিনিময়ে তিনি রাজা ঋতুপর্ণ হইতে "অক্ষহৃদয়-বিদ্যা" লাভ করেন।[২৩] নকুলও অশ্ববিদ্যায় খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময়ে বিরাটপুরীতে পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলাম। অশ্বের প্রকৃতি, শিক্ষা, দোষ-নিরাকরণের উপায়, দুষ্ট অশ্বকে শান্ত করা এবং তাহাদের চিকিৎসাশাস্ত্র ভালরূপেই জানি"।

গো-বিদ্যা—সহদেব গো-বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। বিরাটপুরীতে

২০ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ। উ ৩৮।১২
যড়িমানি বিনশ্যন্তি মুহূর্ত্তমনবেক্ষণাৎ।
গাবঃ সেবা কৃষির্ভার্য্যা বিদ্যা বৃষলসঙ্গতিঃ। ইত্যাদি। উ ৩৩।৯০

২১ কচ্চিৎ স্বনুষ্ঠিতা তাত বার্ত্তা তে সাধুভির্জ্জনৈঃ। সভা ৫।৭৯

২২ হস্তিসূত্রাশ্বসূত্রাণি রথসূত্রাণি বা বিভো। সভা ৫।১২০

২৩ হয়জ্ঞানস্ত লোভাচ্চ। ইত্যাদি। বন ৭২।২৮। বি ১২।৬,৭

প্রবেশ করিয়া তিনিও আপনাকে গো-বিদ্যা-বিশারদরূপে প্রচার করিয়াছেন।[২৪]

স্বয়ং গরুর তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য—গরুর তত্ত্বাবধান নিজে করিবার জন্য গৃহস্থকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কেবল রাখাল বা চাকরের উপর নির্ভর করিয়া গো-পালন চলে না।[২৫]

গরুর মহিমা—সমাজে গো-পালনকে অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করা হইত। গৃহস্থেরা দেবতাজ্ঞানে গরুর সেবা করিতেন। অনুশাসনপর্ব্বের কয়েকটি অধ্যায়েই নানাভাবে গো-জাতির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। সেইগুলির আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, গরুকে সেই যুগে কি দৃষ্টিতে দেখা হইত। দেবতা হইতেও গরুকে উচ্চে স্থান দেওয়া হইত। বর্ণিত আছে, একদিন দেবরাজ ইন্দ্র পিতামহকে প্রশ্ন করিলেন, "ভগবন্, দেবলোক হইতেও গো-লোক শ্রেষ্ঠ কেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন"। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, "গো-জাতিই যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ, গো ব্যতীত যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। দুগ্ধ ও ঘৃত মানুষের প্রধান খাদ্য এবং গরুর দ্বারা কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। সকল হব্যকব্যের মূলেই গো-জাতি। সুতরাং তাহারাই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গাভী সকল মানবের জননীর সমান। উন্নতিকাম পুরুষ সর্ব্বতোভাবে গরুর সেবায় নিয়োজিত হইবেন"। গরুকে কখনও অবজ্ঞা করিতে নাই, তাহাদের শরীর পায়ের দ্বারা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।[২৬] পালিত গরুর রীতিমত সেবা না করিলে গৃহস্বামীর সমূহ অকল্যাণ হয়, ইহাই সেই যুগে ধারণা ছিল। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গরুকে নমস্কার করিবার বিধান ছিল। গো-দর্শনেও পাপক্ষয় হয় বলিয়া তৎকালে সকলে বিশ্বাস করিতেন।[২৭]

২৪ বি ১০।১১-১৫

২৫ গাবঃ সেবা কৃষিঃ। ইত্যাদি। উ ৩৩।৯০

২৬ যজ্ঞাঙ্গং কথিতা গাবো যজ্ঞ এব চ বাসব।
এতাভিশ্চ বিনা যজ্ঞো ন বর্ত্তেত কথঞ্চন॥ ইত্যাদি। অনু ৮৩।১৭-২২
মাতরঃ সর্ব্বভূতানাং গাবঃ সর্ব্বসুখপ্রদাঃ। ইত্যাদি। অনু ৬৯।৭,৮। অনু ১২৬।২৯
অনু ৯৩।১১৭। অনু ৯৪।৩২

২৭ অগ্নিহোত্রমনড্বাংশ্চ জ্ঞাতয়োঽতিথিবান্ধবাঃ।
পুত্রা দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চ নির্দ্দহেয়ুরপূজিতাঃ॥ বন ২।৫৭
সায়ং প্রাতর্নমস্যেচ্চ গাস্ততঃ পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ॥ অনু ৭৮।১৬

অনুশাসনপর্ব্বে ৫১শ অধ্যায়ে গো-জাতির যেরূপ মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, সেই যুগে বিশেষভাবে গো-জাতির যত্ন করা হইত। অনুশাসনপর্ব্বের ৮০তম অধ্যায়ও গো-মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। তৎকালে গৃহস্থগণ কিরূপ ভক্তিভাবে গো-সেবা করিতেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ঘৃত এবং দুগ্ধের উপযোগিতা তাঁহারা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, গো-মাহাত্ম্যের বর্ণনে তাহাও স্পষ্টরূপে জানিতে পারি।[২৮]

গবাহ্নিক দান—নিজের মত যত্ন করিয়া গরুকে খাওয়াইবে। গরুর সেবা করিয়া যাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, সেইভাবে সেবা কর্ত্তব্য।[২৯] সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপনান্তে গরুকে কিছু খাদ্য দেওয়া সকল গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য ছিল। ঐ কাজকে "গবাহ্নিক-দান" বলা হইত। অনুশাসনপর্ব্বের ১৩৩তম অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কপিলার শ্রেষ্ঠত্ব—গো-জাতির মধ্যে কপিলার স্থান সকলের উপরে।[৩০]

গো-দানের প্রশস্ততা—দান-প্রকরণে গো-দানের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সমস্ত দানের মধ্যে গো-দানই শ্রেষ্ঠ। অনুশাসন-পর্ব্বের ৭১তম হইতে ৭৪তম অধ্যায় পর্য্যন্ত গো-প্রদানের প্রশংসায় মুখরিত।

গোময় ও গোমূত্রের পবিত্রতা—গোময় ও গোমূত্রকে খুব পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত। গৃহে গোময় লেপন করিলে ভূমি শুদ্ধ হয়, এইরূপ ধারণা সমাজের মধ্যে ছিল। পবিত্রতার নিমিত্ত শরীরে গোময় লেপন করিয়া স্নান করারও নিয়ম ছিল। গোমূত্র পান করা শুচিতার হেতুরূপে পরিগণিত হইত।[৩১] গোময় ও গোমূত্রের পবিত্রতা এখনও সকল হিন্দুসমাজই স্বীকার

---

২৮ অমৃতং ব্রাহ্মণা গাব ইত্যেতত্ত্রয়মেকতঃ।
তস্মাদ্ গোব্রাহ্মণং নিত্যমর্চ্চয়েত যথাবিধি। অনু ১৬২।৪২

২৯ গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ। উ ৩৮।১২

৩০ অনু ৭৩।৪২। অনু ৭১।৫১

৩১ পিতৃসদ্মানি সততং দেবতায়তনানি চ।
পূয়ন্তে শকৃতা যাসাং পূতং কিমধিকং ততঃ॥ অনু ৬৯।১১। অনু ১৪৬।৪৮
অস্মৎপুরীষস্নানেন জনঃ পূয়েত সর্ব্বদা।
শকৃতা চ পবিত্রার্থং কুর্ব্বীরন্ দেবমানুষাঃ॥ অনু ৭৯।৩। অনু ৭৮।১৯
ত্র্যাহমুষ্ণং পিবেন্মূত্রং ত্র্যাহমুষ্ণং পিবেৎ পয়ঃ॥ অনু ৮১।৩৫। অনু ১২৮।৯

করেন। পঞ্চগব্যে গোময় ও গোমূত্র পান করার বিধানও হিন্দুগণ মানিয়া থাকেন।

শ্রী-গো-সংবাদ—অনুশাসন-পর্ব্বে ৮২ তম অধ্যায়ে একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। তৎকালে সমাজে গোময় ও গোমুত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, ঐ আখ্যায়িকাতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। একদা শ্রী (লক্ষ্মীদেবী) সুন্দর বেশভূষাধারণ করিয়া গো-জাতির সমীপে উপস্থিত হইলে তাহারা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তরে বলিলেন, "ইন্দ্র, বিষ্ণু-প্রমুখ দেবগণ আমারই অনুগ্রহে এত সম্পৎশালী। আমি আশা করি, তোমরা আমাকে পাইয়া অবশ্যই ঐশ্বর্য্যশালী হইবে"। গরুরা বলিল, "আমরা তোমাকে চাই না, আমরা স্বভাবতই ভাল আছি"। লক্ষ্মীদেবী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের মত বলিলেন, "দেখ—তোমাদের প্রত্যাখ্যানে সমস্ত জগতে আমার একটা কলঙ্ক থাকিবে, সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি অগত্যা তোমাদের কুৎসিত অঙ্গেই বাস করিব। তোমাদের শরীরে কিছুই ঘৃণ্য বা কুৎসিত থাকিবে না"। গো-কুল পরস্পর পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে জানাইল, "আমাদের মূত্র এবং পুরীষ খুব পবিত্র, তুমি তাহাতেই অধিষ্ঠিত হও"। শ্রী এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অন্তর্হিতা হইলেন। সেই অবধি গোমূত্র ও গোময় লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানরূপে কথিত হয়। গোময় ও গোমূত্রে উত্তম সার হয়, এই কারণেও লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানরূপে বর্ণিত হইতে পারে।

পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের সমধিক পবিত্রতা—গরুর পিঠ ও লেজকে সমধিক পবিত্র মনে করা হইত। সেইগুলির স্পর্শ খুব পুণ্যজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।[৩২]

গো-সমৃদ্ধিকর ব্রত—গোজাতির উন্নতির নিমিত্ত একপ্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করা হইত, তাহার নাম ছিল 'গো-পুষ্টি'। ব্রতীকে গোময়ে স্নান করিতে হইত। আর্দ্র গো-চর্ম্মে উপবেশনপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ভূমিতে ঘৃত ঢালিয়া মৌনভাবে তাহা পান করিতে হইত। ঘৃতের দ্বারা আহুতি দেওয়া, স্বস্তিবাচন করা এবং ঘৃতদান করা ঐ ব্রতের অঙ্গ।[৩৩]

গোমতী-বিদ্যা বা গো-উপনিষৎ—গোমতীবিদ্যা বা গো-উপনিষৎ-

৩২ স্পৃশতে যো গবাং পৃষ্ঠং বালধিং চ নমস্থতি। অনু ১২৫।৫০। শা ১৯৩।১৮

৩৩ গোময়েন সদা স্নায়াৎ করীষে চাপি সংবিশেৎ। ইত্যাদি। অনু ৭৮।১৯-২১

নামে কতকগুলি গো-স্তুতি বর্ণিত আছে, যাহা পাঠ করারও নানারূপ ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। গরুর গন্ধ সুরভি, গরু সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্থল, গরু পরম স্বস্তির হেতু ইত্যাদি।[৩৪] এইসকল প্রকরণের আলোচনা করিলে বুঝা যায়, গোজাতির প্রতি তৎকালে শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল।

গো-হিংসা অত্যন্ত প্রতিষিদ্ধ—গো-হিংসা ও গোমাংস-ভোজন অত্যন্ত প্রতিষিদ্ধ ছিল।[৩৫]

উপায়নরূপে গো-দান—মহাভারতের বহু স্থানেই দেখা যায়, অতিথিকে গো উপঢৌকন দিয়া সম্মান প্রদর্শন করা হইত। দাতৃগণ গো-জাতিকে বিশেষ মূল্যবান্ ও পবিত্র মনে করিতেন বলিয়াই অভ্যর্থনার শ্রেষ্ঠ উপায়নরূপে ব্যবহার করিতেন। এখনও হিন্দুসমাজে গো-দান বিশেষ পুণ্যের হেতুরূপে বিবেচিত হয়।

গোধন ও গো-পরিচর্য্যা—সকলকেই তখন গো-পালন করিতে হইত। মহারাজ বিরাট এবং দুর্য্যোধনের অনেক গরু ছিল। বিরাটরাজার পুরীতে অর্জ্জুনের সঙ্গে দুর্য্যোধন-পক্ষীয় বীরগণের যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার মূলে গো-হরণ। বনপর্ব্বে দুর্য্যোধনাদির ঘোষযাত্রায়ও বুঝা যায়, তাঁহারা প্রচুর গোধনের অধিকারী ছিলেন। অজ্ঞাতবাসের প্রারম্ভে বিরাটের রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া সহদেব আপনাকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গোধনের তত্ত্বাবধায়করূপে পরিচয় দিয়াছেন। গরুর সংখ্যা সম্বন্ধেও তিনি খুব বড় সংখ্যারই উল্লেখ করিয়াছেন। মৎস্যরাজ তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করেন নাই। তৎকালে গরু একটি বিশেষ সম্পদের মধ্যে গণ্য ছিল। সহদেব গো-পরিচর্য্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার উক্তি হইতেই জানা যায়। ইহাতে মনে হয়, গরুর সেবাশুশ্রূষা-বিষয়ে অভিজ্ঞতা-অর্জ্জন সেই সময়ে প্রশস্ত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সহদেব মৎস্যরাজকে বলিয়াছেন যে, যে-সকল বৃষের সংযোগে বন্ধ্যা গরুও গর্ভিণী হইতে পারে,

৩৪ গাবঃ সুরভিগন্ধিন্যস্তথা গুগ্‌গুলুগন্ধয়ঃ।
গাবঃ প্রতিষ্ঠা ভূতানাং গাবঃ স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ ইত্যাদি। অনু ৭৮।৫-৮

৩৫ ন চাসাং মাংসমশ্নীয়াদ্ গবাং পুষ্টিং তথাপ্নুয়াৎ ॥ অনু ৭৮।১৭
ঘাতকঃ খাদকো বাপি তথা যশ্চানুমন্যতে।
যাবন্তি তস্যা রোমাণি তাবদ্বর্ষাণি মজ্জতি ॥ অনু ৭৪।৪

বৃষের মূত্রের ঘ্রাণ লইয়াই তিনি সেই-সকল বৃষকে চিনিতে পারেন। ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা নহে।[৩৬]

আচার্য্যগণেরও অনেক গরু থাকিত, তাঁহাদের অন্তেবাসিগণই পালনের ভার গ্রহণ করিতেন। (দ্রঃ ১২০তম পৃঃ।)

মহর্ষি বশিষ্ঠের কামধেনু—মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের মধ্যে বিবাদের মূলে বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীই একমাত্র হেতু। সেই ধেনু ছিল কামদুঘা; মহর্ষি তাহার নিকট যে যে বস্তু প্রার্থনা করিতেন, তাহাই পাইতেন। নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী দ্বারা আমাদের পরিপুষ্টি সাধন করে বলিয়াই বোধ করি, গো-জাতিকে কামদুঘা বলা হইত।[৩৭]

যদিও সেইযুগে গো-পালন প্রধানতঃ বৈশ্যদেরই কাজ ছিল, তথাপি হোম প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মের অনুরোধে সকলেই গো-পালন করিতেন। গো-ধনের বৃদ্ধি বৈশ্যদের পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করিত। তাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বর্ণগত জীবিকার উপায়রূপে তাঁহাদিগকে গো-পালন করিতে হইত।[৩৮]

বাণিজ্য

বৈশ্যের বর্ণগত অধিকার—বাণিজ্যে একমাত্র বৈশ্যেরই বর্ণগত অধিকার; ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা আপদ্‌বৃত্তি। বাণিজ্যে দুধ, মাংস, তৈল প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুর বিক্রয় নিষেধ করা হইয়াছে। (দ্রঃ ১৬০তম পৃঃ) এইগুলি বিক্রয় করিলে তৎকালে সমাজে পাতিত্য জন্মিত।

বাণিজ্য বিষয়ে নৃপতির কর্ত্তব্য—ব্যবসায়ীদের সর্ব্ববিধ সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া নৃপতির কার্য্য। বাণিজ্যের উন্নতি নৃপতির সুব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। যদি রাষ্ট্রের কোন অপব্যবস্থায় বণিকের উন্নতি

৩৬ গোসংখ্য আসম্ কুরুপুঙ্গবানাম্। বি ১০।৫
ঋষভানপি জানামি রাজন্ পূজিতলক্ষণান্।
যেষাং মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে। বি ১০।১৪

৩৭ আদি ১৭৫ তম অঃ।

৩৮ কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্। ভী ৪২।৪৪

প্রতিহত হইত, তবে রাজাই দায়ী হইতেন। এমন কি, বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে যদি দক্ষ বণিকের মনে কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে, বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় আইন-কানুনে নৃপতির কোন ক্রটি আছে। রাজা এরূপভাবে আইন করিবেন, যাহাতে বণিকের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে।[১]

বৈদেশিক বণিক্‌দের প্রতি রাজার লক্ষ্য—বৈদেশিক বণিক্‌গণ যত প্রকারের সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারেন, রাজা সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখিবেন। কোন ধূর্ত্ত যাহাতে তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে না পারে, তাঁহারা নগরে ও গ্রামে সর্ব্বত্র নিরুদ্বেগে সসম্মানে যাহাতে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন, এই বিষয়ে অবহিত হইবার নিমিত্ত রাজধর্ম্মে নানা স্থানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উপদেশ এই বিষয়ে অতি স্পষ্ট।[২]

যদিও একমাত্র যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়াই নারদ, ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্র রাজধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছেন, তথাপি তৎকালে এইসকল রীতি সর্ব্বত্রই একরূপ ছিল বোধ করি। কারণ, বিপরীত কোনও উদাহরণ মহাভারতে দেখা যায় না। যুধিষ্ঠির সর্ব্বত্র বলিয়াছেন, "আমি এইসকল নিয়ম যথাশক্তি পালন করিয়া থাকি"।

রাজসভায় বণিক্‌দের আদর এবং সমৃদ্ধ নগরে বৈদেশিকের আগমন—রাজসভায় বণিক্‌দেরও যথেষ্ট সম্মান ছিল। রাজপুরীতে বণিক্‌দের ব্যবসার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইত। সমৃদ্ধ নগরসমূহে নানা দেশ হইতে বণিক্‌গণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসিতেন এবং সেই দেশের রাজার যথোচিত ব্যবস্থায় ও ব্যবহারে নিরুদ্বেগে আপন আপন ব্যবসায়কে উন্নত কিরতে পারিতেন।[৩]

বৈদেশিক বণিক্‌দের আয়-অনুসারে রাজকর—দূর দেশ হইতে যে-সকল বণিক্ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসিতেন, তাঁহাদিগকে আয়-অনুসারে

১ তথা সন্ধায় কর্ম্মাণি অষ্টৌ ভারত সেবসে। সভা ৫।২২ দ্রষ্টব্য নীলকণ্ঠ।
বণিজঃ শিল্পিনঃ শ্রিতান্। সভা ৫।৭১। শা ৮৮।২৮

২ কচ্চিত্তে পুরুষা রাজন্ পুরে রাষ্ট্রে চ মানিতাঃ। ইত্যাদি। সভা ৫।১১৫

৩ বণিজশ্চাযযুস্তত্র নানাদিগ্‌ভ্যো ধনার্থিনঃ। আদি ২০৭।৪০
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং বণিগ্‌ভিরুপশোভিতম্। আদি ২২১।৭৫

নির্দ্দিষ্ট রাজকর দিতে হইত। কত আয়ের উপর কিরূপ কর ধার্য্য হইত, সেই বিষয়ে স্পষ্টতঃ কোন নির্দ্দেশ না থাকিলেও বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার বা অতিরিক্ত কর আদায়ের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করা হইত না।[৪]

ক্রয়বিক্রয়াদির অবস্থা-বিবেচনায় কর ধার্য্য কর—উক্ত হইয়াছে যে, ক্রয়বিক্রয়ের অবস্থা (মূল্যাদি এবং লাভের পরিমাণ), গ্রাসাচ্ছাদন, সামর্থ্য এবং মূলধনের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া রাজা বণিক্‌দের উপর কর ধার্য্য করিবেন। এইভাবে বিবেচনার সহিত কর আদায় করিলে বাণিজ্যেরও ক্ষতি হইবে না, অথচ রাজকোষেও কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইবে। সব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, বাণিজ্যের যাহাতে ক্ষতি না হয়।[৫]

বেতনস্বরূপ করগ্রহণ—বণিক্‌দের নিকট হইতে রাজা যে কর গ্রহণ করিতেন, তাহা রাজার তত্ত্বাবধানের বেতনস্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পথে এবং নগরে বণিক্‌গণ যাহাতে নিরাপদে চলিতে পারেন, সেই বিষয়ে সমস্ত দায়িত্ব রাজারই। সেই দায়িত্ব-বহনের পারিশ্রমিক-স্বরূপ কর আদায় করা হইত।[৬]

ভারতের সর্ব্বত্র পণ্য দ্রব্যের পরস্পর আমদানি ও রপ্তানি—যে-যুগে কৃষি, গো-পালন এবং বাণিজ্যের দ্বারা একটি সম্প্রদায় আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং দেশকে ধনধান্যে সম্পন্ন করিয়া তুলিত, সেই যুগে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে, অন্ততঃ মহাভারতে উল্লিখিত ভৌগোলিক প্রদেশে (মহাভারতে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।) পরস্পরের মধ্যে পণ্য দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ছিল, এই অনুমান সম্ভবতঃ অমূলক নহে। ভীম, অর্জ্জুন প্রমুখ বীরগণের দিগ্বিজয়ে দেখিতে পাই, ভারতের সর্ব্বত্র অবাধে চলাফেরা করিবার ব্যবস্থা তখনও ছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, আবার দ্বারকা হইতে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) পর্য্যন্ত যাতায়াতের বহু দৃশ্য দেখা যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে এবং কুরুক্ষেত্রের

৪ কচ্চিদভ্যাগতা দূরাদ্ বণিজো লাভকারণাৎ। ইত্যাদি। সভা ৫।১১৪
কচ্চিত্তে বণিজো রাষ্ট্রে নোদ্বিজন্তি করার্দ্দিতাঃ ॥ শা ৮৯।২৩

৫ বিক্রয়ং ক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিচ্ছদম্। ইত্যাদি। শা ৮৭।১৩-১৪

৬ শাস্ত্রনীতেন লিপ্সেথা বেতনেন ধনাগমম্। শা ৭১।১০

যুদ্ধে ভারতের প্রায় সমস্ত দেশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা যোগ দিয়াছিলেন। রাজসূয়যজ্ঞে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানারকমের উপঢৌকন যুধিষ্ঠিরকে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং অনুমান করিতে পারি, যে-দেশে যে-দ্রব্যের উৎপাদন বেশী হইত, সেই দ্রব্য অন্য প্রদেশে রপ্তানি হইত। এইভাবে ভারতের সর্ব্বত্রই বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল।

ভারতের বাহিরেও ভারতের বাণিজ্যের যোগাযোগ—ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের যোগ ছিল না, ইহাও বলা যায় না। কারণ রাজসূয়যজ্ঞেই দেখিতে পাই, চীনদেশ এবং সিংহল হইতে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে নানারকমের উপায়ন আমদানি হইয়াছিল। সেইসকল দেশের সহিত কোন পরিচয় না থাকিলে তাঁহারা কেন উপঢৌকন দিতে যাইবেন? যাতায়াত, বাণিজ্য এবং দেশবিজয় ছাড়া অন্য উপায়ে পরিচয়ের সম্ভাবনা অল্প।

সমুদ্র-যান—গৌতম-নামে মধ্যদেশীয় এক কদাচার ব্রাহ্মণ সামুদ্রিক বণিক্‌গণের সহিত সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।[৭] সমুদ্রপোত আরোহণ করিয়া ভারতের বাহিরেও নানাস্থানে যাতায়াত চলিত। বহু স্থানে সমুদ্র-যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[৮] অর্জ্জুন দক্ষিণ এবং পশ্চিম সমুদ্রের অনেক তীর্থে গিয়াছিলেন। সামুদ্রিক কোন যানের সহায়তা ব্যতীত কিরূপে সমুদ্রে যাওয়া সম্ভবপর হইতে পারে?[৯]

মহাভারত-রচনার বহু পূর্ব্বকালে ভারতীয় নৃপতি পুরূরবা স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্র, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দরহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল, লঙ্কা, রোমকপত্তন, সিদ্ধপুর, যমকোটি, জম্বুদ্বীপ এবং প্লক্ষাদিদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। সেইসকল দ্বীপে যাতায়াতের উপায় না থাকিলে কিরূপে জম্বুদ্বীপের (ভারতবর্ষের) নৃপতি সেইসকল স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন?[১০] সভাপর্ব্বে দিগ্বিজয়-

৭ সামুদ্রিকান্ স বণিজস্ততোঽপশ্যৎ স্থিতান্ পথি। শা ১৬৯।২

৮ বিস্তীর্ণং লবণজলং যথা প্লবেন। আদি ২।৩৯৬
তাং নাবমিব পর্য্যস্তাং বাতভ্রান্তাং মহার্ণবে। শল্য ৪।২৯। শল্য ১৯।২

৯ ততঃ সমুদ্রে তীর্থানি দক্ষিণে ভরতর্ষভঃ। আদি ২১৬।১
সমুদ্রে পশ্চিমে যানি তীর্থান্যায়তনানি চ। আদি ২১৮।২

১০ ত্রয়োদশ সমুদ্রস্য দ্বীপানশ্নন্ পুরূরবাঃ। আদি ৭৫।১৯। দ্রষ্টব্য নীলকণ্ঠ

প্রসঙ্গেও দেখিতে পাই, অর্জ্জুন শাকলাদি সপ্তদ্বীপের অধিপতিগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।[১১] দক্ষিণভারত-বিজয়ী পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব সাগর-দ্বীপবাসী ম্লেচ্ছ নৃপতিগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন।[১২]

পশ্চিমভারত-বিজয়ের পর নকুল পশ্চিম-সমুদ্রবাসী সাগরকুক্ষিস্থ পরম-দারুণ ম্লেচ্ছ নৃপতিগণকে জয় করিয়াছিলেন।[১৩] পাণ্ডবশ্রীকাতর দুর্য্যোধনের উক্তি হইতেও জানা যায়, পাণ্ডবেরা সমুদ্রবাসী রাজন্যগণকে পরাজিত করিয়া প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন।[১৪] দক্ষিণ সমুদ্রে অবস্থিত গোকর্ণ-তীর্থে যাতায়াতের কথা তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে।[১৫]

যুধিষ্ঠির তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে সমুদ্রস্থ অনেক তীর্থেই গিয়াছিলেন।[১৬] উল্লিখিত বর্ণনা-সমূহ হইতে অনুমিত হয়, সমুদ্রপোতের সহিত তৎকালে বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। কোন কোন স্থানে স্পষ্টভাষায় সমুদ্রপোতের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইসকল উক্তির মধ্যে বাণিজ্যেরও উল্লেখ আছে। "বণিক্ যেরূপ মূলধন অনুসারে সমুদ্রবাণিজ্যে ধনলাভ করেন, সেইরূপ মর্ত্ত্যসমুদ্রে কর্ম্মবিজ্ঞানানুসারে জন্তু বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।"[১৭] "বিপন্ন পোতবণিক্‌গণ সাগরে নিমজ্জিত হইলে, অন্য নাবিকেরা তাঁহাদিগকে যেরূপ উদ্ধার করেন, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ কর্ণরূপ সাগরে নিমজ্জিত আপন মাতুলগণকে রথের দ্বারা উদ্ধার করিলেন।"[১৮]

অর্জ্জুন সমুদ্রকুক্ষিস্থিত নিবাতকবচগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রে গিয়া সংহত পর্ব্বতোপম ভীষণ উর্ম্মিমালার মধ্যে অসংখ্য রত্নপূর্ণ নৌকা (সমুদ্রপোত) দেখিতে পাইয়াছিলেন।[১৯] সমুদ্রে অসংখ্য রত্নগর্ভ নৌকা

১১ শাকলদ্বীপবাসাশ্চ সপ্তদ্বীপেষু যে নৃপাঃ। ইত্যাদি। সভা ২৬।৬

১২ সাগরদ্বীপবাসাংশ্চ নৃপতীন ম্লেচ্ছযোনিজান্। সভা ৩১।৬৬

১৩ ততঃ সাগরকুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরমদারুণান্। সভা ৩২।১৬

১৪ গচ্ছন্তি পূর্ব্বাদপরং সমুদ্রং চাপি দক্ষিণম্। ইত্যাদি। সভা ৫৩।১৬,১৭

১৫ সমুদ্রমধ্যে রাজেন্দ্র সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্। বন ৮৫।২৪

১৬ বন ১১৮ তম অঃ।

১৭ বণিগ্ যথা সমুদ্রাদ্বৈ যথার্থং লভতে ধনম্। ইত্যাদি। শা ২৯৮।২৮

১৮ নিমজ্জতস্তানথ কর্ণসাগরে বিপন্ননাবো বণিজো যথার্ণবে। ইত্যাদি। কর্ণ ৮২।২৩

১৯ ফেনবত্যঃ প্রকীর্ণাশ্চ। ইত্যাদি। বন ১৬৯।২.৩

বণিজো নাবি ভগ্নায়ামগাধে বিপ্লবা ইব। শল্য ৩।৫

নিশ্চয়ই বণিক্‌দের ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অন্য কাহারও পক্ষে কতকগুলি নৌকা নানাবিধ মণিরত্নে পূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়ার কোন কারণ নাই। সঙ্কলিত বর্ণনাগুলি হইতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি, তৎকালে ভারতের সহিত বাহিরের অনেক দেশেরই বাণিজ্য-সম্বন্ধ খুব নিবিড় ছিল। দিগ্বিজয় এবং পুরূরবার রাজ্যবিস্তারে কবির অতিশয়োক্তির আশঙ্কা করিলেও ভারতের বাহিরে দিগ্বিজয় এবং বাণিজ্যপ্রসঙ্গে ভারতীয়েরা যে যাতায়াত করিতেন, তাহা সত্য। অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য উভয়ের মধ্য দিয়া এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের এবং এক দেশের সহিত অন্য দেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হইত।

শিল্প

মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি—সেই সময়েও মণি, মুক্তা, প্রবাল, সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান্ ধনরত্নের মধ্যে গণ্য ছিল।[১]

সোনার ব্যবহারই বেশী—এইগুলির মধ্যে সোনার ব্যবহার ছিল সবচেয়ে বেশী। ধনসম্পত্তি বিষয়ে কোন বর্ণনা করিতে সোনার নামই প্রথম গৃহীত হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ অসংখ্য। রত্নরাজির মধ্যে সোনার স্থান সকলের উপরে। সোনা খুব পবিত্র বস্তুরূপে গণ্য হইত।[২]

সোনার মাহাত্ম্য—মাহাত্ম্য বাড়াইবার নিমিত্ত সোনাকে অগ্নিতে পতিত মহাদেবের শুক্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই জন্য অগ্নির অন্য এক নাম—হিরণ্যরেতাঃ। জাতবেদাঃ (অগ্নি) হইতে উৎপন্ন বলিয়া সোনাকে জাতরূপ বলা হইয়া থাকে। সোনা তৈজস পদার্থের মধ্যে গণ্য।[৩]

শৈলোদা-নদীতে পিপীলিক-সোনা (?)—যে যে স্থানে সোনা বা অন্যান্য রত্ন পাওয়া যাইত, তাহার একটা আভাসও মহাভারত হইতে পাওয়া যায়। মেরু এবং মন্দর পর্ব্বতের মধ্যে শৈলোদানামক নদীর বালুকা হইতে

১ মণিমুক্তাপ্রবালঞ্চ সুবর্ণং রজতং বহু। আদি ১১৩।৩৪

২ জগৎ সর্ব্বঞ্চ নির্ম্মথ্য তেজোরাশিঃ সমুত্থিতঃ।
সুবর্ণমেভ্যো বিপ্রর্ষে রত্নং পরমমুত্তমম্॥ ইত্যাদি। অনু ৮৪।৪৯, ৫২

৩ অনু ৮৪ তম ও ৮৫ তম অঃ।

প্রচুর পরিমাণে একপ্রকার সোনা সংগ্রহ করা হইত। পিপীলিকা কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইত বলিয়া সেই সোনার নাম ছিল 'পিপীলিক'। পিপীলিকারা কি কারণে সেইগুলি সংগ্রহ করিত, তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করা কঠিন। এইসকল বর্ণনার বাস্তবতায় সন্দেহের অবকাশ আছে।[৪]

বিন্দুসরোবরে রত্নরাজি—বিন্দুসরোবরে নানা বর্ণের প্রচুর রত্ন পাওয়া যাইত। বিন্দুসরোবর হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান হরিদ্বারের নিকটে বলিয়া অনুমিত হয় (দ্রঃ মৎস্যপুরাণ ১২১তম অঃ)। শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময় নানাবর্ণের রত্ন দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সভামণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মণ্ডপের অধিকাংশ রত্নই বিন্দুসরোবর হইতে আনীত। সেইসব রত্নের দ্বারা নির্ম্মিত সভামণ্ডপেই দুর্য্যোধনের জলকে স্থল এবং স্থলকে জল বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।[৫]

ধাতুশিল্প (অলঙ্কার)—সোনা দিয়া কেয়ূর, অঙ্গদ, হার প্রভৃতি নানা-রকম অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। ('পরিচ্ছদ ও প্রসাধন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।[৬]

আসন—রাজাদের সভাগৃহে সোনার নির্ম্মিত নানাপ্রকার কারুকার্য্য-খচিত আসন থাকিত। সম্ভ্রান্ত পুরুষদের উপস্থিতিতে সেইসকল আসনের সদ্ব্যবহার করা হইত।[৭]

সুবর্ণ-বৃক্ষ—সোনার নির্ম্মিত কৃত্রিম তরুরাজি রাজসভামণ্ডপের শোভা বৃদ্ধি করিত। রাজসভার অন্যান্য বহু আসবাবপত্র সোনা দ্বারা নির্ম্মিত হইত।[৮]

যজ্ঞিয় উপকরণ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে যজ্ঞিয় অনেক বস্তু সোনার দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। স্ফ্য (খড়্গাকৃতি যজ্ঞিয় উপকরণ বিশেষ), কূর্চ্চ (উপবেশনের নিমিত্ত নির্ম্মিত কুশমুষ্টি) প্রভৃতি সোনার দ্বারা করা হয়।[৯]

৪ তদ্বৈ পিপীলিকং নাম উদ্ধৃতং যৎ পিপীলিকৈঃ।
জাতরূপং দ্রোণমেয়মহার্ষুঃ পুঞ্জশো নৃপাঃ॥ সভা ৫২।৪

৫ কৃতাং বিন্দুসরোরত্নৈর্ম্ময়েন স্ফটিকচ্ছদাম্।
অপশ্যং নলিনীং পূর্ণামুদকস্যেব ভারত॥ সভা ৫০।২৫

৬ মালাঞ্চ সমুপাদায় কাঞ্চনীং সমলঙ্কৃতাম্। আদি ১৮৫।৩০; আদি ৭৩।২,৩। অনু ৮৭।৫১

৭ সুবর্ণচিত্রেষু বরাসনেষু। উ ১।৬। আদি ১৯৬।২। সভা ৫৬।২০। উ ৮৯।৮। অনু ২৭০।১৪

৮ সভা চ সা মহারাজ শাতকুম্ভময়দ্রুমা। সভা ৩।২১। উ ১।২

৯ স্ফ্যশ্চ কূর্চ্চশ্চ সৌবর্ণো যচ্চান্যদপি কৌরব। ইত্যাদি। অশ্ব ৭২।১০,১১

যজ্ঞমণ্ডপের তোরণাদি—যজ্ঞমণ্ডপের তোরণ, ঘট, পাত্র, কটাহ, কলস প্রভৃতি বস্তুও সোনার ছিল।[১০]

সোনার থালা, কলস প্রভৃতি—সোনার থালা, কলস, কমণ্ডলু প্রভৃতি আঢ্য-পরিবারে ব্যবহার করা হইত।[১১]

সুবর্ণমুদ্রা বা নিষ্ক—তৎকালে যে মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহাও সোনার নির্ম্মিত একপ্রকার মোহরের মত। মহাভারতে কোথাও মুদ্রার আকৃতি গুরুত্ব বা পরিমাণের কথা বলা হয় নাই। সেই মুদ্রার নাম ছিল 'নিষ্ক'।[১২] নিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিলে একটি সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেইগুলি হয়ত সব সময়ে বিশুদ্ধ সোনা দিয়া প্রস্তুত হইত না; অন্য ধাতুমিশ্রিত মেকী সোনা দিয়া প্রস্তুত হইত, কিংবা কেবল রূপা অথবা অন্য-কিছুদ্বারা প্রস্তুত হইত। দুইচারিটি উক্তিতে কেবল নিষ্ক শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'কাঞ্চনং নিষ্কং'[১৩] 'হিরণ্যনিষ্কান্'[১৪] 'শাতকুম্ভস্য শুদ্ধস্য শতং নিষ্কান্'[১৫] এইভাবে নিষ্ক শব্দকে বিশেষণযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদি মনে করা যায় যে, নিষ্ক শব্দে সব সময়ই সোনার মোহরবিশেষকে বুঝাইত, তাহা হইলে এইসকল বিশেষণের ারা "সোনার নিষ্ক" এইরূপে প্রকাশ করিবার কোন সার্থকতা থাকে না। াটি সোনাদ্বারা নির্ম্মিত—এই অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সুবর্ণ, কাঞ্চন প্রভৃতি শব্দকে বিশেষণরূপে যদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে লিতে হইবে, উল্লিখিত সন্দেহ অমূলক নহে; খাদমিশ্রিত সোনার নিষ্কও ৎকালে প্রচলিত ছিল। আর বিশেষণ শব্দগুলিকে কেবল ব্যাবর্ত্তকরূপে গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে, অন্য ধাতুর দ্বারাও নিষ্ক তৈয়ার করা হইত। কিন্তু তাহা যেন সঙ্গত মনে হয় না। কারণ, বহু স্থলে বিশেষণ প্রয়োগ না করিয়া কেবল 'নিষ্ক' শব্দের প্রয়োগই করা হইয়াছে।

---

১০ দদৃশুস্তোরণাণ্যত্র শাতকুম্ভময়ানি তে। ইত্যাদি। অশ্ব ৮৫।২৯,৩০

১১ কলসান্ কাঞ্চনান্ রাজন্। আশ্র ২৭।১২। সভা ৪৯।১৮। সভা ৫১।৭। সভা ৫২।৪৭। বন ২৩২।৪২,৪৪

১২ আদি ২২১।৬৯। বন ৩৭।১৯। বন ২৩।২। বি ৩৮।৪৩। দ্রো ১৬।২৬। দ্রো ৮০।১৭। শা ৪৫।৫। অশ্ব ৮৯।৮ (আরও বহুস্থানে নিষ্ক শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।)

১৩ দ্রো ৮০।১৭

১৪ বন ২৩।২

১৫ বি ৩৮।৪৩

রূপার থালা—রূপার নির্ম্মিত বস্তুর মধ্যে একমাত্র থালার উল্লেখ দেখিতে পাই।[১৬]

তামার পাত্র—প্রয়োজনীয় নানা বাসনপত্র তামা দিয়াও প্রস্তুত করা হইত।[১৭]

কাঁসার বাসন—কাঁসার বাসনের বিষয় দুই তিন জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে। গো-দোহনের পাত্র এবং ভোজনপাত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৮]

লৌহশিল্প—লোহার ব্যবহার খুব ব্যাপকভাবে ছিল। যুদ্ধে যে-সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রায় সবই লোহার দ্বারা প্রস্তুত। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহেও দা, কুড়াল, কোদাল, বাসী প্রভৃতির প্রচলন বেশ ভালরূপেই ছিল।[১৯] লোহা দিয়া বড়শি তৈয়ার করা হইত। বড়শি দ্বারা মৎস্যশিকার তখনও পরিজ্ঞাত ছিল।[২০]

মণিমুক্তাদির ব্যবহার—অলঙ্কার ছাড়াও রাজসভায় যে-সকল আস্‌বাব-পত্র থাকিত, সেইগুলি বহুমূল্য মণিমুক্তায় খচিত হইত। নৃপতিদের পাশা-খেলার ঘুঁটিও বৈদূর্য্যনির্ম্মিত। যুদ্ধে ব্যবহার্য্য খড়্গের বাঁটও কেহ কেহ মণি দ্বারা প্রস্তুত করিতেন।[২১]

দন্তশিল্প—হাতীর দাঁত দিয়া নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হইত। খড়্গের বাঁট, যোদ্ধাদের শরীরের আবরক বিচিত্র কবচ, পাশাখেলার ঘুঁটি, শয়নের খাট, বসিবার আসন, এবং একপ্রকার খেলার পুতুলের উল্লেখ দেখিতে

১৬ উচ্চাবচং পার্থিবভোজনীয়ং পাত্রীষু জাম্বূনদরাজতীষু ॥ আদি ১৯৪।১৩

১৭ পাত্রমৌদুম্বরং গৃহ্য মধুমিশ্রং তপোধন। অনু ১২৫।৮২। বন ৩।৭২। অনু ১২৬।২০। আশ্র ২৭।১২

১৮ দক্ষিণার্থং সমানীতা রাজভিঃ কাংস্যদোহনাঃ। সভা ৫৩।৩। শা ২২৮।৬০ অনু ৫৭।৩০। অনু ৭১।৩৩। অনু ১০৪।৬৬

১৯ কুদ্দালং দাত্রপিটকম্। শা ২২৮।৬০। বন ১০৭।২৩
তথৈব পরশূন্ শিতান্। সভা ৫১।২৮
বাশ্যৈকং তক্ষতো বাহুম্। আদি ১১৯।১৫

২০ মৎস্যো বড়িশমায়সম্। উ ৩৪।১৩। বন ১৫৭।৪৫

২১ মণিপ্রবেকোত্তমরত্নচিত্রা। উ ১।২। বি ১।২৫
খড়্গাং মণিময়ংসরুম্। দ্রো ৪৭।৩৭

পাই। ধনিসমাজেই এইসকল শিল্পের আদর ছিল।[২২] নাগরাজ বাসুকি পাতালপুরীতে ভীমসেনকে দিব্য নাগদন্তে শয়ন করিতে দিয়াছিলেন।[২৩] ধনিগণ দন্ত দ্বারা ছাতার শলাকা প্রস্তুত করাইতেন। সম্ভবতঃ হস্তিদন্তই এইসকল শিল্পে ব্যবহৃত হইত।[২৪]

অস্থি ও চর্ম্ম-শিল্প—বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকমের আবশ্যকীয় দ্রব্য নির্ম্মিত হইত। গাণ্ডীর (গণ্ডারের) পৃষ্ঠবংশ দিয়া প্রস্তুত বলিয়া অর্জ্জুনের ধনুর নাম 'গাণ্ডীব'।[২৫] গরুর অস্থি, চর্ম্ম, লোম প্রভৃতির দ্বারা নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইত। কিন্তু কি-প্রকারে কোন বস্তু প্রস্তুত হইত, তাহার কোন বর্ণনা পাই না। উল্লিখিত হইয়াছে, চামড়া, অস্থি, শিং এবং লোমের দ্বারাও গরু আমাদের বহু উপকার করিয়া থাকে।[২৬] অসির সঙ্গে চর্ম্ম নামে একপ্রকার শস্ত্রের উল্লেখ প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, তাহা ঢাল (গণ্ডারের চামড়ায় নির্ম্মিত শস্ত্রবিশেষ) বলিয়াই মনে হয়। বাঘের চামড়া দিয়া গজকম্বলের (কুথ, হাতীর উপরে বসিবার গদি) আচ্ছাদন দেওয়া হইত।[২৭] চর্ম্মপাদুকার বহুল প্রচলন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ প্রাণীর চর্ম্ম দিয়া তাহা প্রস্তুত হইত, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।[২৮]

ছত্র এবং চর্ম্মপাদুকার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুশাসনপর্ব্বে ৯৫তম ও ৯৬তম অধ্যায়ে একটি উপাখ্যান আছে। মহর্ষি জমদগ্নি ধনুর্ব্বিদ্যার অনুশীলন করিতেছেন। তাঁহার পত্নী রেণুকা নিক্ষিপ্ত বাণগুলি কুড়াইয়া পতির হাতে তুলিয়া দিতেছেন। বেলা দুইপ্রহর। রেণুকা পায়ের নীচের উত্তপ্ত বালুকা আর মাথার উপর প্রখর রৌদ্রের তাপ সহ্য করিতে পারিলেন না;

---

২২ শুদ্ধদন্তৎসরুনসীন্। সভা ৫১।১৬, ৩২। ভী ৯৬।৫০। বি ১।২৫। শা ৪০।৪। উ ৪৭।৫। বি ৩৭।২৯

২৩ ততস্তু শয়নে দিব্যে নাগদন্তে মহাভুজঃ। আদি ১২৮।৭২

২৪ সমুচ্ছ্রিতং দন্তশলাকমস্য সুপাণ্ডুরং ছত্রমতীব ভাতি। ভী ২২।৬

২৫ এষ গাণ্ডীময়শ্চাপঃ। উ ৯৮।১৯। দ্রষ্টব্য নীলকণ্ঠ।

২৬ পয়সা হবিষা দধ্না শকৃতা চাথ চর্ম্মণা।
অস্থিভিশ্চোপকুর্ব্বন্তি শৃঙ্গৈর্ব্বালৈশ্চ ভারত। অনু ৬৬।৩৯

২৭ বৈয়াঘ্রপরিবারিতান্। বিচিত্রাংশ্চ পরিস্তোমান্। সভা ৫১।৩৪

২৮ দহ্যমানায় বিপ্রায় যঃ প্রযচ্ছত্যুপানহৌ। ইত্যাদি। অনু ৯৬।২০

এক গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করিয়া বাণ আনিয়া দিলে স্বামী বিলম্বের কারণ জানিতে চাহিলেন। রেণুকা সূর্য্যদেবের অত্যাচারের কথা বলিলেন ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্যকে সমুচিত শাস্তি দিবার নিমিত্ত ধনুতে বাণসন্ধান করিলেন। সূর্য্য তখন ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া করজোড়ে বলিলেন, "ঋষিবর, জগতের উপকারের নিমিত্ত আমাকে এইরূপ করিতে হয়।" অতঃপর ঋষিকে শিরস্ত্রাণস্বরূপ ছত্র এবং পাদত্রাণরূপ চর্ম্মপাদুকা উপহার দিয়া সূর্য্য অব্যাহতি লাভ করিলেন। ছত্র এবং চর্ম্মপাদুকার অতি প্রাচীনত্ব ও পবিত্রতাখ্যাপনের উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ এই উপাখ্যানটি রচিত হইয়া থাকিবে।

চামড়া দিয়া এক-প্রকারের জলপাত্রও প্রস্তুত করা হইত।[২৯] হরিণ এবং মেষের চামড়া দিয়া উৎকৃষ্ট আসন হইত। চীনদেশে উৎকৃষ্ট অজিন পাওয়া যাইত। এতদ্দেশে কাম্বোজের (আফগানিস্থানের উত্তর পূর্ব্বাংশ) কদলীমৃগ-চর্ম্মের বিচিত্রবর্ণ-রঞ্জিত অজিন খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[৩০]

ছত্র ও ব্যজন—ছত্রের ব্যবহারও তখনকার দিনে বিলক্ষণ জানা ছিল। কিন্তু ছত্র কাপড় দিয়া বা কোন প্রকারের পাতা অথবা অন্য কিছু দিয়া প্রস্তুত করা হইত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। ধনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সকল ছত্র ব্যবহৃত হইত, সেইগুলির বেশ জাঁকজমক ছিল। সাধারণতঃ সাদা রংএর ছাতাই তৎকালে নির্ম্মিত হইত। যে কয়েকটি উদাহরণ আছে, সবই সাদা রংএর। একশত (অসংখ্য অর্থেও শত-সহস্রাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয়) শলাকা দিয়া ছাতার কাঠামো তৈয়ার করা হইত। কোন কোন স্থলে শলাকাগুলি দন্তনির্ম্মিত। সম্ভবতঃ এইপ্রকার বাহুল্যও আভিজাত্যের অঙ্গরূপে সম্প্রদায়বিশেষেই সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের ব্যবহার্য্য ছত্র সম্বন্ধে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।[৩১] যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই, সকল

---

২৯ দৃতেঃ পাদাদিবোদকম্। উ ৩৩।৮১

৩০ শূদ্রা বিপ্রোত্তমার্হাণি রাঙ্কবাণ্যজিনানি চ। সভা ৫১।৯,২৭
অজিনানাং সহস্রাণি চীনদেশোদ্ভবানি চ। উ ৮৬।১০
কদলীমৃগমোকানি কৃষ্ণশ্যামারুণানি চ।
কাম্বোজঃ প্রাহিণোত্তস্মৈ…। সভা ৪৯।১৯। সভা ৫১।৩

৩১ পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি। ভী ১।১৪। অশ্ব ৬৪।৩। আশ্র ২৩।৮
সমুচ্ছ্রিতং দন্তশলাকমস্য সুপাণ্ডুরং ছত্রমতীব ভাতি॥ ভী ২২।৬। বন ২৫১।৪৭।
অনু ৯৬।১৮

বীরের মাথার উপরেই সাদা রংএর এক-একটি ছাতা। হাতী এবং রথের উপরে শ্বেতচ্ছত্র শোভা পাইত।[৩২] তালবৃন্তের (হাতপাখা) উল্লেখ নানাস্থানেই পাওয়া যায়।[৩৩]

চামর ও পতাকা—রাজামহারাজাদিগকে চামরের দ্বারা ব্যজন করা হইত। সাদা, লাল, কাল প্রভৃতি নানাবর্ণের চামরের কথা পাওয়া যায়। সভামণ্ডপ, রথ প্রভৃতিকে সুসজ্জিত করিতে নানাবর্ণের পতাকা ব্যবহার করা হইত। বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রাদিতেও চামর, পতাকা প্রভৃতির আড়ম্বর কম ছিল না। পতাকাগুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত এবং জীবজন্তু, বৃক্ষলতা প্রভৃতির চিত্রদ্বারা সুশোভিত।[৩৪]

কুশাসন—মুনিঋষিগণ সাধারণতঃ কুশাসনে উপবেশন করিতেন। কুশ-নির্ম্মিত বৃষী (আসন) দ্বারা অতিথিকে অভ্যর্থনা করা হইত। কোন কোন স্থলে কৃষ্ণসারচর্ম্মে কুশাসনকে আচ্ছাদিত করা হইত।[৩৫]

উশীরচ্ছদ—গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে চাদরের ন্যায় একপ্রকার আচ্ছাদন বীরণমূল দ্বারা প্রস্তুত করা হইত। এই শিল্পটি যে কিরূপ আকৃতির ছিল, ঠিক বুঝা যায় না।[৩৬]

শিবিকা—অভিজাত-ঘরের মহিলাগণ দূরে কোথাও যাইতে হইলে শিবিকায় চড়িয়া যাইতেন। শব প্রভৃতি বহনেও শিবিকা ব্যবহৃত হইত। কি কি উপাদানে শিবিকা প্রস্তুত করা হইত, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ কাঠ এবং বাঁশই ছিল প্রধান উপকরণ। মানুষই শিবিকা বহন করিত, সুতরাং বেশী ভারী কোন ধাতুদ্রব্য দ্বারা নিশ্চয়ই প্রস্তুত হইত না, ইহা অনুমান করা যায়।[৩৭]

রথ—প্রায় সমস্ত রথের বর্ণনাতেই দেখিতে পাই, ঘোড়া রথ টানিত, আর

৩২ শ্বেতচ্ছত্রাণ্যশোভন্ত বারণেষু রথেষু চ। ভী ৫০।৫৮

৩৩ তালবৃন্তান্যুপাদায় পর্য্যবীজন্ত সর্ব্বশঃ। অনু ১৬৮।১৫। শা ৩৭।৩৬। শা ৬০।৩২

৩৪ শ্বেতচ্ছত্রৈঃ পতাকাভিশ্চামরৈশ্চ সুপাণ্ডুরৈঃ। বন ২৫১।৪৭। সভা ৫২।৫। সভা ৫৩।১৩,১৪। দ্রো: ১০৩ তম অঃ। শা ৩৭।৩৬। শা ১০০।৮

৩৫ কৌশ্যাং বৃষ্যামাসস্ব যথোপজুষম্। ইত্যাদি। বন ১১১।১০। বন ২৯৪।৪। শা ৩৪৩।৪২

৩৬ ছত্রং বেষ্টনমৌশীরমুপানদ্ব্যজনানি চ। শা ৬০।৩২

৩৭ ততঃ কন্যাসহস্রেণ বৃতা শিবিকয়া তদা। আদি ৮০।২১। আদি ১২৭।৭। আদি ১৩৪।১২। বন ৬৯।২৩

একজন সারথি ঘোড়াগুলিকে চালাইতেন। কোন কোন রথ বায়ুবেগে চালিত হইত। রথের নীচে চাকা থাকিত। নির্ম্মাণপ্রণালী সম্বন্ধে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কোন কোন রথের বাহক চারিটি ঘোড়া। রথগুলি বিচিত্র চিত্র, পতাকা, ধ্বজ প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত হইত।[৩৮] কোন কোন রথের ধ্বজচিহ্ন দেখিয়া দূর হইতেই আরোহী পুরুষের পরিচয় পাওয়া যাইত। অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, দুর্য্যোধন প্রমুখ প্রসিদ্ধ বীর পুরুষদের রথে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এক-একটা চিহ্ন ছিল।[৩৯] উট, অশ্বতর (খচ্চর) এবং গাধা দ্বারাও রথ চালান হইত।[৪০] গরু দ্বারা গাড়ী চালান হইত। কিন্তু সেই গাড়ীর আকৃতি আধুনিক গরুর গাড়ীর মত ছিল কি না, বলিবার উপায় নাই। যুধিষ্ঠির প্রথম বলীবর্দ্দ-বাহিত রথে নগরে প্রবেশ করেন।[৪১]

স্থাপত্য-শিল্প—নূতন বাড়ীঘর প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে বাস্তু মাপিবার নিয়ম ছিল। শাস্ত্রীয় বিধানঅনুসারে বাস্তুভিটা মাপিবার ব্যবস্থা করা হইত। কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি বাস্তুর পরিমাপ করিতেন। নূতন কোন নগরের পত্তন করিতেও মাপের নিয়ম ছিল। প্রথমতঃ শান্তিপাঠ করিয়া কাজ আরম্ভ করা হইত।[৪২]

যে কয়েকটি প্রাসাদ এবং গৃহ-নির্ম্মাণের বর্ণনা পাই, তাহার সবগুলিই রাজা-মহারাজাদের। সেইগুলির কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্য পাঠকদিগকে বিমুগ্ধ করে। গৃহপ্রস্তুতপ্রণালী সেই যুগে বেশ উন্নত ধরণের ছিল। আদি পর্ব্বের ১৩৬ তম অধ্যায়ে হস্তিনাপুরীতে পরীক্ষা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত প্রেক্ষাগারের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। মণি, মুক্তা, বৈদূর্য্য প্রভৃতি রত্নরাজিখচিত, দিব্য শাতকুম্ভময় বিশাল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৪৪ তম অধ্যায়ে জতুগৃহের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শণ, সর্জ্জরস, ঘৃত, জতু প্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্যসম্ভারে গৃহখানি প্রস্তুত। ঘৃত, তৈল, বসা প্রভৃতির সঙ্গে মৃত্তিকা মিশাইয়া দেয়ালগুলিতে

৩৮ যানৈর্হাটকচিত্রৈশ্চ। আদি ২১৯।৫। সভা ২৪।২১

৩৯ বি ৫৫শ অঃ।

৪০ উষ্ট্রাশ্বতরযুক্তানি যানানি চ বহন্তি মাম্। অনু ১১৮।১৪। আদি ১৪৪।৭

৪১ শ্বসতাঞ্চ শৃণোম্যেনং গোপুত্রাণাং প্রতোদজাম্। অনু ১১৭।১১
যুক্তং ষোড়শভির্গোভিঃ পাণ্ডুরৈঃ শুভলক্ষণৈঃ। শা ৩৭।৩১

৪২ ততঃ পুণ্যে শিবে দেশে শান্তিং কৃত্বা মহারথাঃ।
নগরং মাপয়ামাসুর্দ্বৈপায়নপুরোগমাঃ। আদি ২০৭.২৯। আদি ১৩৪।৮ অশ্ব ৮৪।১২

প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল। গৃহখানি চতুঃশাল এবং অত্যন্ত মনোরম। শিল্পী পুরোচন দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অশিব গৃহখানির নাম ছিল—'শিব।'[৪৩] যুধিষ্ঠিরাদির মঙ্গলের নিমিত্ত বিদুরের প্রেরিত একজন খনক গৃহখানির মেঝেতে কপাটযুক্ত একটি অনতিবৃহৎ গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন।[৪৪]

আদিপর্ব্বের ১৮৪ তম অধ্যায়ে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভা বর্ণিত হইয়াছে। নগরের ঈশানকোণে সমভূমির উপর চতুর্দ্দিকে প্রাসাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত সভাগৃহ। প্রাকার এবং পরিখাযুক্ত, দ্বার, তোরণ প্রভৃতির দ্বারা মণ্ডিত, নানাবিধ মণিকুট্টিমভূষিত, স্বর্ণজালসংবীত, পুষ্পমালাভূষিত, শতদ্বারবিশিষ্ট সভাগৃহখানি সুসজ্জিত, অগুরুধূপিত, চন্দনসিক্ত, বহুধাতুবিচ্ছুরিত হিমালয়শৃঙ্গের মত শোভা পাইতেছিল। দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাণ্ডবগণ যখন ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে হস্তিনাপুরীতে গেলেন, তখন পুনরায় যাহাতে দুর্য্যোধনাদির সহিত বিবাদ না হয়, সেই শুভ উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্র খাণ্ডবপ্রস্থে নূতন নগর স্থাপন করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে আদেশ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে কৃষ্ণ সহ খাণ্ডববনে উপস্থিত হইয়া বনকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছিলেন।[৪৫] শুভ লগ্নে, পুণ্য প্রদেশে শান্তিবাচনের পর মহর্ষি দ্বৈপায়ন-প্রমুখ পুরুষগণ নগরের পরিমাপকার্য্য সম্পন্ন করিলে প্রসিদ্ধ শিল্পীরা কাজ আরম্ভ করিলেন। চারিদিকে সাগরসদৃশ পরিখা এবং আকাশচুম্বী প্রাকার প্রস্তুত হইয়াছিল। সাদা বৃহৎ মেঘখণ্ডের মত, অথবা নির্ম্মল জ্যোৎস্নার মত নগরের চিত্তবিমোহন শোভা। মন্দরোপম গোপুরের দ্বারা সুরক্ষিত সৌধমালার সৌন্দর্য্য যেন পাতালপুরীর 'ভোগবতী' অপেক্ষাও অধিকতর। বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সুসংবৃত পাণ্ডুর গৃহশ্রেণী স্বর্গপুরীর মত বিরাজিত।[৪৬] নগরের চারিদিকে বিবিধ বৃক্ষলতা-পরিশোভিত রম্য উদ্যান প্রভৃতির চিত্রও আমরা ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ণনাতে দেখিতে পাই। আম্র, আম্রাতক, কদম্ব, অশোক,

৪৩ নিবেদয়ামাস গৃহং শিবাখ্যমশিবং তদা। আদি ১৪৬।১১

৪৪ কপাটযুক্তমজ্ঞাতং সমং ভূম্যাশ্চ ভারত। আদি ১৪৭।১৭

৪৫ ততস্তে পাণ্ডবাস্তত্র গত্বা কৃষ্ণপুরোগমাঃ।
মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে তদ্ বৈ পরং স্বর্গবদচ্যুতাঃ॥ আদি ২০৭।২৮

৪৬ আদি ২০৭।২৯-৩৬

চম্পক, পুন্নাগ, নাগপুষ্প, লকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, আমলক, লোধ্র, অঙ্কোল, জম্বু, পাটলা, কুঞ্জক, অতিমুক্তক, করবীর, পারিজাত এবং আরও নানাপ্রকার বৃক্ষের ফলপুষ্পগন্ধে নগরখানি ভরপুর; যেন নিত্যই বসন্তোৎসব চলিতেছে। মত্ত কোকিলকুলের কূজনে ও ময়ূরের কেকারবে সদা মুখরিত। লতাগৃহ, চিত্রগৃহ প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত মনোমুগ্ধকর উদ্যানগুলি পদ্মোৎপলসুগন্ধি নির্ম্মল বারিপূর্ণ জলাশয়, হ্রদ, ব প্রভৃতির দ্বারা সমধিক শোভিত হইতেছিল। অরণ্যের ভিতরে লতাপ্রতানবেষ্টিত পুষ্করিণীগুলি হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের লীলানিকেতন। মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম লীলাপর্ব্বতসমূহ নগরের সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছিল।[৪৭]

যুধিষ্ঠিরের সভামণ্ডপের বর্ণনা অতিশয় মনোমুগ্ধকর। সভাখানি শিল্প-নৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অর্জ্জুনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ দানবশিল্পী শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। মণ্ডপখানির আকৃতি ছিল বিমানের মত। ইচ্ছা করিলে স্থানান্তরিত করা চলিত। সরাইতে হইলে আট হাজার শক্তিশালী পুরুষের প্রয়োজন হইত।[৪৮] পুণ্য দিবসে, শুভ লগ্নে কৃতকৌতুকমঙ্গল শিল্পিশ্রেষ্ঠ পায়সের দ্বারা সহস্র ব্রাহ্মণকে পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে নানাবিধ ধন দান করিয়া সভার স্থান মাপিতে আরম্ভ করেন। চতুরস্র দশ হাজার হাত ভূমি জুড়িয়া সেই সুদৃশ্য বৃহৎ মণ্ডপটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।[৪৯]

কৈলাসপর্ব্বতে দানবরাজ বৃষপর্ব্বার যে মণিময় যজ্ঞমণ্ডপ ময়-দানব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার উপাদান বিন্দুসরোবর হইতে গৃহীত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণের প্রারম্ভেই শিল্পিবর অর্জ্জুনের নিকট হইতে কয়েক দিনের ছুটি লইয়া বিচিত্র রত্নাবলী আহরণের নিমিত্ত বিন্দুসরোবরের তীরে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে বৃষপর্ব্বার সভামণ্ডপের স্ফাটিক উপকরণ, সুবর্ণবিন্দুচিত্রিত গদা (ভীমসেনের নিমিত্ত) এবং দেবদত্ত-নামক বারুণ শঙ্খ (অর্জ্জুনের নিমিত্ত) আনয়ন করিলেন। উপকরণ আহরণান্তে দিব্য মণিময় সোনার স্তম্ভযুক্ত

৪৭ আদি ২০৭।৪১-৪৮

৪৮ বিমানপ্রতিমাং চক্রে পাণ্ডবস্য শুভাং সভাম্। সভা ১।১৩। সভা ৩।২৮

৪৯ পুণ্যেঽহনি মহাতেজাঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ। ইত্যাদি। সভা ১।১৮-২০। সভা ৩।২৩

আকাশচুম্বী বিচিত্র মণ্ডপ প্রস্তুত হইল।[৫০] মণ্ডপের প্রাকার, তোরণ প্রভৃতি সবই ছিল রত্নময়। সভার ভিতরেই শিল্পী ময় নানাবিধ মণিরত্ন দিয়া কৃত্রিম জলাশয় প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে প্রস্ফুটিত পদ্মগুলির পাপ্‌ড়ি বৈদূর্য্যময় এবং নল মণিময়। নানাজাতীয় পক্ষী, কূর্ম্ম, মৎস্য প্রভৃতিও প্রস্তুত হইল। সবই মণিমুক্তা এবং সোনা দিয়া নির্ম্মিত। জলাশয়ে স্ফটিকের সোপান। মধ্যে মধ্যে সত্য সত্যই দুই-চারিটি জলাশয় খনন করিয়া তাহাতেও পদ্ম, উৎপল প্রভৃতি সুগন্ধি জলজ কুসুমের চারা লাগান হইল। হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক প্রভৃতি পাখীদেরও থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল। শিল্পীর নিপুণতায় আসল এবং নকল স্থির করিয়া উঠা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়াছিল।[৫১] স্বয়ং কুরুপতি দুর্য্যোধন রত্নময় স্ফটিকচ্ছদ কৃত্রিম জলাশয়কে বাস্তব মনে করিয়া কাপড়-চোপড় গুছাইতে ছিলেন, তখন ভীমের স্মিতহাস্য তাঁহাকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত করিয়াছিল। অতঃপর একবার ঠকিয়া পরে আসল জলাশয়কেও কৃত্রিম মনে করায় অর্জ্জুন কৃষ্ণ, দ্রৌপদী এবং অন্যান্য মহিলাগণের উচ্চহাস্যের মধ্যে ভিজা কাপড়-চোপড় ত্যাগ করার সময় পূর্ব্বব্যথা যেন শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। নির্ম্মল শিলা এবং স্ফটিকের ভিত্তির স্বচ্ছতায় সেইগুলিকে বহির্গমনের দ্বার মনে করিয়াও দুর্য্যোধন, সহদেব ও ভীমসেনের নিকট উপহসিত হইয়াছিলেন; নিজের মাথাতেও কম আঘাত পান নাই। স্বয়ং কুরুপতির যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণের যে ভ্রান্তি ঘটিবে, তাহা খুবই সম্ভবপর।[৫২] সেই সভা নির্ম্মাণ করিতে চৌদ্দ মাসেরও কিছু বেশী সময় লাগিয়াছিল।[৫৩] স্তম্ভ ছাড়াও প্রাসাদনির্ম্মাণের কৌশল শিল্পিসমাজে পরিজ্ঞাত ছিল।[৫৪] যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সমাগত রাজন্যগণ যে-সকল প্রাসাদে স্থান পাইয়াছিলেন, সেইসকল প্রাসাদের শোভাও অতুলনীয়। অত্যুচ্চ শ্বেত প্রাকারের দ্বারা প্রত্যেক ভবন পরিবেষ্টিত, ভবনগুলি

৫০ তত্র গত্বা স জগ্রাহ গদাং শঙ্খঞ্চ ভারত।
স্ফাটিকঞ্চ সভাদ্রব্যং যদাসীদ্বৃষপর্ব্বণঃ॥ ইত্যাদি। সভা ৩।১৮-২০

৫১ সভা ৩য় অঃ।

৫২ সভা ৫০।২৫-৩৬। সভা ৪৭।৩-১৩

৫৩ ঈদৃশীং তাং সভাং কৃত্বা মাসৈঃ পরিচতুর্দ্দশৈঃ। সভা ৩।৩৭

৫৪ স্তম্ভৈর্ন চ ধৃতা সা তু শাশ্বতী ন চ সা ক্ষরা। সভা ১১।১৪

অগুরুগন্ধী, মাল্যভূষিত এবং মহার্ঘরত্নখচিত, দেখিতে হিমালয়-শিখরের মত।[৫৫]

যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহের কারুকার্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে হস্তিনাপুরীতে এক সভাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নানা দেশের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পিগণকে আহ্বান করিয়া শতদ্বার, সহস্রস্তম্ভ, রত্নখচিত বিচিত্র সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে এক ক্রোশ দীর্ঘ এবং এক ক্রোশ প্রস্থ একটি স্থানে হাজার হাজার শিল্পীর দ্বারা নানাবিধ মহার্ঘ উপকরণে সভাগৃহ এবং উদ্যানাদি প্রস্তুত হইয়াছিল।[৫৬] দ্বারকাপুরীর যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাও অতি মনোরম। পুরীর চারিদিকে নানাবর্ণে রঞ্জিত পতাকা উড্ডীয়মান, হিমালয়-শিখরোপম শ্বেত প্রাসাদসমূহে পুরীখানি সুশোভিত। (অন্যান্য বর্ণনা ইন্দ্রপ্রস্থের মত।)[৫৭]

পাতালপুরীর একটিমাত্র বর্ণনাতেই অলোকসামান্য ঐশ্বর্য্য এবং শিল্প-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানাবিধ প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, বলভী, পট্টশালা প্রভৃতিতে পাতালপুরী সুসজ্জিত।[৫৮]

কালকেয়-দৈত্যগণ হিরণ্যপুর-নামে একটি পুরীতে বাস করিত। আকাশে অবস্থিত বলিয়া তাহার অপর নাম ছিল 'খপুর'। সম্ভবতঃ খুব উচ্চে কোনও পর্ব্বতের উপর পুরীটি অবস্থিত ছিল। একস্থানে বলা হইয়াছে যে, তিন কোটি দৈত্য সমুদ্রে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত; তাহাদের নাম ছিল 'নিবাতকবচ'। অর্জ্জুন সেই প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে যুদ্ধে বধ করেন।[৫৯]

মৎস্যরাজের সভার দৃশ্যও চমৎকার। মণিরত্নচিত্রিত বিচিত্র সভায় সুবর্ণ-খচিত বরাসন-সমূহ শোভা পাইতেছিল।[৬০] মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহের

৫৫ দদৃশুস্তেষামাবসথান্ ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ। ইত্যাদি। সভা ৩৪।১৮-২৪

৫৬ সভা ৪৯।৪৭-৪৯। সভা ৫৬।১৮-২২

৫৭ পুরী সমন্তাদ্বিহিতা সপতাকা সতোরণা। ইত্যাদি। বন ১৫।৫-১১

৫৮ আদি। ৩।১৩৩

৫৯ বন ১৭৩ তম অঃ।

নিবাতকবচা নাম দানবা দেবশত্রবঃ।

সমুদ্রকুক্ষিমাশ্রিত্য দুর্গে প্রতিবসন্ত্যুত। বন ১৬৮।৭২

৬০ সভা তু সা মৎস্যপতেঃ সমৃদ্ধা মণিপ্রবেকোত্তমরত্নচিত্রা। ইত্যাদি। উ ১।২

বর্ণনায় দেখা যায়, পাণ্ডুর-প্রাসাদশ্রেণীপরিবেষ্টিত বিচিত্র গৃহখানি বহু কক্ষ্যায় বিভক্ত। ধৃতরাষ্ট্র চতুর্থ কক্ষ্যায় বাস করিতেন।[৬১] দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ রাজপুত্রগণের গৃহোপকরণেও মণি, মুক্তা, সোনা প্রভৃতিই বেশী ছিল। প্রত্যেকখানি গৃহ যেন কুবেরভবনের মত।[৬২]

যুদ্ধের প্রারম্ভে দুর্য্যোধন যে শিবির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা দেখিতে ঠিক হস্তিনাপুরের মতই ছিল। শত শত দুর্গ উৎকৃষ্ট শিল্পকলার নিদর্শনরূপে শোভিত হইতেছিল। অতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলেও শিবিরের সহিত হস্তিনাপুরের পার্থক্য স্থির করা কঠিন হইত।[৬৩] পাণ্ডবপক্ষেও কৃষ্ণের অধিনায়কতায় কুরুক্ষেত্রে শিবির, পরিখা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিবিরকে প্রভূততর কাষ্ঠ দ্বারা দুরাধর্ষ করা হইল। প্রত্যেকটি শিবিরকে মহার্হ এক-একখানি বিমানের মত দেখাইতেছিল। শত শত শিল্পী যথাযোগ্য বেতন পাইয়া কাজ করিতেছিলেন।[৬৪]

সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতের আগমন-উপলক্ষ্যে পথিমধ্যে সভাগৃহ নির্ম্মাণ করা হইত। কৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত উপপ্লব্য হইতে হস্তিনাপুরে যান, তখন ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পথিমধ্যে রমণীয় দেশে অনেকগুলি সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। বিচিত্র মণিমুক্তাখচিত মণ্ডপসমূহে বিচিত্র আসন, বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি বহু দ্রব্য সুসজ্জিতভাবে বিন্যস্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ 'বৃকস্থল' গ্রামের সভামণ্ডপটি নানাবিধ রত্নদ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় সকলেরই মন হরণ করিতেছিল। শল্যকে স্বপক্ষে পাইবার উদ্দেশ্যে দুর্য্যোধনও পথিমধ্যে ঠিক সেইরূপ সভামণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।[৬৫]

যুদ্ধাদিতে জয়লাভ করিয়া বীরগণ যখন নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখন খুব জাঁকজমকের সহিত নগরের সাজসজ্জা করা হইত। বিশিষ্ট অভ্যাগতের শুভাগমন-উপলক্ষ্যেও তাঁহার অভ্যর্থনাস্বরূপ নগর, রাজপথ প্রভৃতি শুভ্র মাল্য ও পতাকাদ্বারা অলঙ্কৃত করা হইত। সংস্কৃত রাজমার্গ

---

৬১ পাণ্ডুরং পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্। ইত্যাদি। উ ৮৯।১১,১২

৬২ শা ৪৪ শ অঃ।

৬৩ ন বিশেষং বিজানন্তি পুরস্য শিবিরস্য বা। ইত্যাদি। উ ১৯৭।১৩,১৪

৬৪ খানয়ামাস পরিখাং কেশবস্তত্র ভারত। ইত্যাদি। উ ১৫১।৭৯-৮৩

৬৫ ততো দেশেষু দেশেষু রমণীয়েষু ভাগশঃ।
সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণাঃ সভাশ্চক্রুরনেকশঃ। উ ৮৫।১৩-১৭। উ ৮।৯-১১

ধূপের সুগন্ধে আমোদিত থাকিত। প্রাসাদগুলি সুগন্ধিচূর্ণ, নানাবিধ পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু ও মাল্যসমূহ দ্বারা ভূষিত হইত। নগরের দ্বারে, চূর্ণাদি দ্বারা শুক্লীকৃত, পুষ্পাদিবিভূষিত পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইত। চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা-সজ্জিত নগর অভ্যাগতের স্বাগত অভ্যর্থনার সূচনা করিত। জলসেচন করিয়া পথকে সুখগম্য করা হইত। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী প্রবেশের সময় রৈবতকপর্ব্বতে উৎসব চলিতেছিল। তদুপলক্ষ্যে যে পর্ব্বত-সজ্জা দেখা যায়, তাহা উৎকৃষ্ট শিল্পরুচির নিদর্শন।[৬৬] নানাপ্রকার রত্ন দ্বারা সুশোভিত গিরিকে যেন রত্নময় কোশের দ্বারা সংবৃত দেখাইতেছিল। সুবর্ণমাল্য এবং পুষ্পমাল্যে বিভূষিত, বিচিত্রবস্ত্রশোভিত, দিকে দিকে সৌবর্ণদীপ-বৃক্ষসুসজ্জিত গিরির গুহানির্ঝর-প্রদেশসমূহও দিনের মত প্রতিভাত। ঘণ্টাযুক্ত পতাকাগুলি চতুর্দ্দিকে নারী এবং পুরুষদের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া বিশেষ একটি সুরের সূচনা করিতেছিল। হৃষ্ট পুরুষ ও মহিলাগণের গানে, শব্দে, সুরা, মৈরেয়, সন্দেশ প্রভৃতি ভক্ষ্যপেয়ের প্রাচুর্য্যে, রৈবতক সেই দিন দেবলোকের অপরূপ ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত।[৬৭]

পটগৃহ (তাঁবু)—দুর্য্যোধন জলক্রীড়া করিবার নিমিত্ত গঙ্গার ধারে পটগৃহ তৈয়ার করাইয়াছিলেন। একই তাঁবুর ভিতরে বহু প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।[৬৮]

উড়ুপ (ভেলা)—অতি প্রাচীন যুগে দীর্ঘতমাঋষিকে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাদের জননীর আদেশে এক ভেলার সহিত বাঁধিয়া গঙ্গাতে ভাসাইয়া দেন। সুতরাং ভেলার ব্যবহার খুব প্রাচীন কাল হইতেই ছিল। কি কি উপকরণে ভেলা প্রস্তুত হইত, তাহার কোন উল্লেখ নাই।[৬৯]

মঞ্জুষা (পেটিকা)—কর্ণ জন্মিবামাত্র কুন্তীদেবী মোম্‌দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত একটি মঞ্জুষার মধ্যে সদ্যোজাত শিশুকে রাখিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেন।[৭০]

---

৬৬ অভিযানে তু পার্থস্য নরৈর্নগরবাসিভিঃ।
নগরং রাজমার্গাশ্চ যথাবৎ সমলঙ্কৃতাঃ॥ শা ৩৭।৪৫-৪৯। উ ৮৬।১৮। বি ৬৮।১-২৬

৬৭ অলঙ্কৃতস্তু স গিরির্নানারূপৈর্বিচিত্রিতৈঃ। ইত্যাদি। অশ্ব ৫৯।৫-১৫

৬৮ ততো জল-বিহারার্থং কারয়ামাস ভারত।
চৈলকম্বলবেশ্মানি বিচিত্রাণি মহান্তি চ॥ ইত্যাদি। আদি ১২৮।৩১,৩২

৬৯ বদ্ধোড়ুপে পরিক্ষিপ্য গঙ্গায়াং সমবাসৃজন্॥ আদি ১০৪।৩৯

৭০ মঞ্জুষায়াং সমাধায় স্বাস্তীর্ণায়াং সমন্ততঃ। ইত্যাদি। বন ৩০৭।৬,৭

নৌকা—নৌ-শিল্পের দুই-চারিটি উল্লেখ মহাভারতে আছে। সত্যবতী যমুনানদীতে খেয়ানীর কাজ করিতেন।[৭১] জতুগৃহে আগুন লাগার পর মাতৃক পাণ্ডবগণ কৃত্রিম সুরঙ্গের ভিতর দিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তারপর মহামতি বিদুরের প্রেরিত বিশাল নৌকায় চড়িয়া গঙ্গার অপর পারে উপস্থিত হন। সেই নৌকাখানি ছিল—বাতসহ, যন্ত্র এবং পতাকাযুক্ত, উর্মিক্ষম ও সুদৃঢ়। প্রবল ঝড়ের মধ্যেও নৌকাখানি ডুবিবার আশঙ্কা ছিল না। যন্ত্র শব্দের দ্বারা কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা শক্ত। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, ইহা খুব ঝড়ের সময় নৌকাস্তম্ভক লৌহলাঙ্গলময় সামুদ্রক প্রসিদ্ধ একপ্রকার বস্তু। (নঙ্গর কি ?) পতাকা বোধ করি, বাদাম। টীকাকার বলিয়াছেন, পতাকাযুক্ত নৌকা বায়ুবেগে চলিলেও ঢেউ নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। মোটকথা, সেইকালে নৌকা-নির্ম্মাণ এবং চালনার সকল ব্যবস্থাই লোকের পরিজ্ঞাত ছিল।[৭২] অর্জ্জুন নিবাতকবচদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রে যান। সেখানে তিনি পর্ব্বতোপম বিরাট উর্ম্মিমালার মধ্যে অসংখ্য রত্নপূর্ণ নৌকা দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাতে অনুমিত হয়, সেই নৌকাগুলি ভীষণ বারিধিবক্ষে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার মত উপকরণে প্রস্তুত হইত। সেইগুলিকে সামুদ্রিক বাণিজ্যপোতের একই পর্য্যায়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে।[৭৩]

হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বে বৃষ্ণিবংশীয়গণের নানাপ্রকার নৌকার বর্ণনা করা হইয়াছে। ক্রৌঞ্চের ন্যায়, শুকের ন্যায়, গজের ন্যায় বিচিত্ররকমের নৌকা তাঁহাদের ছিল। নৌকার মধ্যেই প্রাসাদোপম গৃহ নির্ম্মিত হইত। নৌকাগুলির বর্ণ সোনার ন্যায় উজ্জ্বল। বৃষ্ণিগণ সেইসকল নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে বিহার করিতেন।[৭৪]

৭১ শুশ্রূষার্থং পিতুর্নাবং বাহয়ন্তীং জলে চ তাম্। আদি ৬৩।৬৯। আদি ১০৫।৮

৭২ ততো বাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
উর্ম্মিক্ষমাং দৃঢ়াং কৃত্বা কুন্তীমিদমুবাচ হ॥ আদি ১৪১।৫। আদি ১৪৯।৫। সভা ৬৫।২১

৭৩ নাবঃ সহস্রশস্তত্র রত্নপূর্ণাঃ সমন্ততঃ। বন ১৬৯।৩

৭৪ ক্রৌঞ্চচ্ছন্দাঃ শুকচ্ছন্দা গজচ্ছন্দাস্তথাপরে।
কর্ণধারৈর্গৃহীতাস্তা নাবঃ কার্ত্তস্বরোজ্জ্বলাঃ। ইত্যাদি। বিষ্ণুপ ১৪৭ তম অঃ।

পূর্ত্তশিল্প—বাপী, কূপ, তড়াগ, জলাশয় প্রভৃতি খনন করা ধর্ম্মকৃত্যের অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। শ্রাদ্ধাদি-উপলক্ষ্যে প্রিয়জনের সদ্‌গতিকামনায়ও এইসকল কাজ করা হইত। বিশেষতঃ এইসকল কাজে বিশেষ লক্ষ্য রাখা ধনিসম্প্রদায়ের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বহু উদাহরণ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন জলাশয়াদির পুনঃসংস্কার বা পঙ্কোদ্ধার ধনিসম্প্রদায়ের অন্যতম কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল।[৭৫]

জলযন্ত্র—হস্তিনাপুরে উদ্যানের বর্ণনায় একটি যন্ত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, সেই যন্ত্রটি শতধার জলযন্ত্র; যাহা হইতে যুগপৎ অসংখ্য ধারা উৎসারিত হইয়া তুষারের মত সমস্ত গৃহখানিকে আর্দ্র করিয়া দেয়। সেই যন্ত্রকে ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যাইত। তাই বলা হইয়াছে, যন্ত্রটি 'সাঙ্কারিক', অর্থাৎ সঙ্কারযোগ্য।[৭৬]

কাষ্ঠশিল্প—জতুগৃহনির্ম্মাণে দারুর উল্লেখ আছে।[৭৭] কাঠ, তৃণ প্রভৃতি উপকরণে গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থা তখনও ছিল।[৭৮] বসিবার নিমিত্ত কাষ্ঠাসনও ব্যবহার করা হইত।[৭৯]

বস্ত্রশিল্প—বস্ত্রশিল্পের আলোচনায় দেখিতে পাই, তৎকালে নানারকমের উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। দেশের কোন কোন স্থানে ঐ শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে কাম্বোজের (পূর্ব্বোত্তর আফগানিস্থান) রাজা যে বস্ত্র উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি। মেষের লোমে প্রস্তুত (ঔর্ণ), মূষিকাদির রোমদ্বারা প্রস্তুত (বৈল) এবং বিড়ালের লোমে প্রস্তুত (বার্ষদংশ) বহুমূল্য অনেকগুলি বস্ত্র তিনি উপঢৌকন দেন।[৮০] বস্ত্রের তন্তুর মধ্যে মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম সুবর্ণতন্তুও

---

৭৫ কূপারামসভাবাপ্যো ব্রাহ্মণাবসথাস্তথা। ইত্যাদি। আদি ১০৯।১২। আদি ১২৮।৩১
উদ্দিশ্যোদ্দিশ্য তেষাঞ্চ চক্রে রাজৌর্দ্ধদেহিকম্।
সভাঃ প্রপাশ্চ বিবিধাস্তটাকানি চ পাণ্ডবঃ। শা ৪২।৭। শা ৬৯।৪৬,৫৩

৭৬ জালৈর্যন্ত্রৈঃ সাঙ্কারিকৈরপি। আদি ১২৮।৪০

৭৭ দারুণি চৈব হি। আদি ১৪৪।১১

৭৮ তৃণচ্ছন্নানি বেশ্মানি পঙ্কেনাথ প্রলেপয়েৎ। শা ৬৯।৪৭

৭৯ কুচিরৈরাসনৈস্তীর্ণাং কাঞ্চনৈর্দারবৈরপি। উ ৪৭।৫

৮০ ঔর্ণান্ বৈলান্ বার্ষদংশান্ জাতরূপপরিষ্কৃতান্।
প্রাবারাজিনমুখ্যাংশ্চ কাম্বোজঃ প্রদদৌ বহূন্। সভা ৫১।৩

ছিল, অথবা সুবর্ণবিন্দু দ্বারা বস্ত্রগুলি খচিত ছিল। বাহ্লী-দেশে (সিন্ধুনদ এবং শতদ্রু প্রভৃতি নদী যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেই দেশের নাম ছিল বাহ্লীক। উ ৩৯।৮০ নীলকণ্ঠ টীকা।) এবং ভারতের বাহিরে চীনদেশে তৎকালে নানাপ্রকার পশমী, রেশমী ও পট্টবস্ত্র উৎপন্ন হইত। মেষের লোম এবং হরিণের লোম দিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। বিশেষতঃ সেইগুলিতে নানারূপ চিত্রগুচ্ছাদি চিত্রিত হইত। পাটের এবং কীটজ রেশমের পদ্মবর্ণ হাজার হাজার বস্ত্র যুধিষ্ঠির উপহার পাইয়াছিলেন। বস্ত্রগুলি অত্যন্ত মসৃণ ছিল।[৮১] কাম্বোজের কম্বলও খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[৮২] বৈরাম, পারদ, আভীর প্রমুখ অভ্যাগতগণও অন্যান্য উপহারের সহিত বিবিধ কম্বল উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সিংহলবাসী আগন্তুকগণ যুধিষ্ঠিরকে বহু কুথ (করিকম্বল) উপহার দিয়াছিলেন।[৮৩] উল্লিখিত কয়েকটি উদাহরণে যদিও কার্পাসবস্ত্রের উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি তৎকালে তাহা ছিল না, এই কথা বলা চলে না। মহারাজকে উপঢৌকন দেওয়া হইতেছে, সুতরাং দাতৃগণ আপন আপন দেশের উৎকৃষ্ট বস্তুই দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক স্থানে বলা হইয়াছে, 'কার্পাসের নহে, এরূপ'[৮৪] নানা রকমের মসৃণ কাপড় দেওয়া হইয়াছিল। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, কার্পাসের কাপড় ছিল নিত্য ব্যবহারের উপযোগী, এই কারণে বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। রুচিভেদে সাদা, লাল, নীল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র ব্যবহার করা হইত। ('পরিচ্ছদ ও প্রসাধন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সিংহল হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিল মণিযুক্ত।[৮৫] হাতীর দাঁত ও কাপড় দিয়া একরকম পুতুল (খেলনা) তৈয়ার করা হইত, শুধু একস্থানে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮৬]

---

৮১ ...বাহ্লীচীনসমুদ্ভবম্।
ঔর্ণং রাঙ্কবঞ্চৈব পট্টজং কীটজং তথা॥ ইত্যাদি। সভা ৫১।২৬,২৭
বাসো রক্তমিবাবিকম্। শা ১৬৮।২১

৮২ কাম্বোজঃ প্রাহিণোত্তস্মৈ পরার্দ্ধ্যানপি কম্বলান্। সভা ৪৯।১৯

৮৩ শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্। সভা ৫২।৩৬
কম্বলান্ বিবিধাংশ্চৈব। সভা ৫১।১৩

৮৪ শ্লক্ষ্ণং বস্ত্রমকার্পাসম্। সভা ৫১।২৭

৮৫ সংবৃতা মণিচীরৈস্তু। ইত্যাদি। সভা ৫২।৩৬

৮৬ পাঞ্চালিকা। বি ৩৭।২৯। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

ভীমসেনের পূর্ব্বদিক্ বিজয়ের বর্ণনায় দেখিতে পাই, তিনি বাঙ্গালাদেশের পুণ্ড্র (উত্তর বঙ্গ), তাম্রলিপ্ত (তমলুক), কর্ব্বট, সুহ্ম (দক্ষিণরাঢ়) প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া লৌহিত্যে (ব্রহ্মপুত্র নদ) গমন করেন। সেখানে ম্লেচ্ছ রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নানাপ্রকার কর আদায় করেন। পূর্ব্বদেশ হইতে তিনি চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, মণি, মুক্তা, কম্বল প্রভৃতি অসংখ্য বস্তু প্রভূত পরিমাণে উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। ইহাতে অনুমিত হয়, ধনসম্পদে এবং বস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি শিল্পে পূর্ব্বদেশও (বাঙ্গালা ও আসাম) কম ছিল না।[৮৭] উত্তরকুরু জয় করিয়া ধনঞ্জয় প্রভূত করপণ্য আদায় করিয়াছিলেন। তাহাতেও দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, ক্ষৌম, অজিন প্রভৃতি ছিল।[৮৮]

সহদেব দক্ষিণদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনিও পাণ্ড্য, কেরল, অন্ধ্র, কলিঙ্গ, উষ্ট্রকর্ণিক প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া উপঢৌকনস্বরূপ প্রচুর চন্দন, অগুরুকাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, মহার্হ বস্ত্র, মণি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মলয় ও দর্দ্দুর-দেশবাসিগণ সুগন্ধি বহু উপায়নের সহিত নানাজাতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন।[৮৯]

নকুল পশ্চিমভারতে পঞ্চনদ, অমরপর্ব্বত, উত্তরজ্যোতিষ, দিব্যকট প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া বিস্তর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। নকুলের প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে বস্ত্রের উল্লেখ নাই। কাম্বোজের বস্ত্র, কম্বল প্রভৃতির প্রকর্ষতা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এইসকল বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, ভারতের সকল প্রদেশেই নানাপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কোন কোন স্থান এই বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাজসূয়ে সিংহল, চীন প্রভৃতি দেশের উপঢৌকনের বাহুল্যে মনে হয়, প্রত্যেক দেশেই প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি শিল্পদ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

৮৭ সভা ৩০শ অ।

৮৮ ততো দিব্যানি বস্ত্রাণি দিব্যান্যাভরণানি চ।
ক্ষৌমাজিনানি দিব্যানি তস্য তে প্রদদুঃ করম্‌॥ সভা ২৮।১৬

৮৯ মলয়াদ্দর্দ্দুরাচ্চৈব চন্দনাগুরুসঞ্চয়ান্‌।
মণিরত্নানি ভাস্বন্তি কাঞ্চনং সূক্ষ্মবস্ত্রকম্‌॥ সভা ৫২।৩৪

ধর্ম্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে দেশজ বস্ত্রাদি—পাণ্ডুর শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়ার পর তাহাকে স্নান করাইয়া নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপনপূর্ব্বক শুক্ল বস্ত্রের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদন করা হইয়াছিল। এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে বস্ত্রের আরও একটা বিশেষণ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। শব্দটি 'দেশজ।'[২০] দেশজাত শুক্ল বস্ত্রের দ্বারা শবকে আচ্ছাদিত করা হয়। এখানে 'দেশজ' শব্দটি প্রণিধানযোগ্য। যে-সব প্রদেশে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত, 'দেশ' শব্দে সেই সব দেশকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু শব্দের মুখ্য ক্ষমতা অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি হইতে সেই অর্থ পাওয়া যায় না। চীন, সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতেও নানাজাতীয় পণ্যদ্রব্য ভারতে আসিত, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে প্রাপ্ত উপঢৌকনের আলোচনা করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যেও প্রত্যেক প্রদেশেই বস্ত্রাদি শিল্পের প্রসার ছিল, তাহা আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইলেও রাজপরিবারে সকল দেশের উৎকৃষ্ট বস্ত্র সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না, এই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু পারলৌকিক কৃত্য প্রভৃতি ধর্ম্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে স্বদেশজাত বস্ত্রাদিকে পবিত্রতর মনে করা হইত কি না, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। 'দেশজ' এই বিশেষণ পদটির সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেই অর্থই আমাদের মনে জাগে। মসৃণ, চিক্কণ এবং চিত্রবিচিত্রের দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কাম্বোজের বস্ত্র সেই সময়ে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তথাপি ইন্দ্রপ্রস্থ এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রস্তুত বস্ত্রকে বুঝাইতেই 'দেশজ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে বোধ করি।

শিকা—শিকাশিল্পেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু নির্ম্মাণপ্রণালী সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।[২১]

মধু (ফলজ, বৃক্ষজ ও পুষ্পজ)—বৈরাম, পারদ, আভীর, কিতব প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতীয় অভ্যাগতগণ রাজসূয়যজ্ঞে উপায়নস্বরূপ যে-সকল দ্রব্য আনিয়াছিলেন, সেইগুলির মধ্যে ফলজাত মধুই প্রধান ছিল। ফলের নাম এবং প্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বৃক্ষের রস হইতে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত করা হইত, তাহার নাম 'মৈরেয়'। বৃক্ষের নাম ও প্রস্তুতপ্রণালীর

---

২০ অথৈনং দেশজৈঃ শুক্লৈর্ব্বাসোভিঃ সমযোজয়ন্। আদি ১২৭।২০

২১ শৈক্যং কাঞ্চনভূষণম্। সভা ৫৩।৯

উল্লেখ করা হয় নাই। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সমাগত পার্ব্বত্যগণ স্বাদু পুষ্পমধু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। (আজকালও আসামের খাসিয়া-পাহাড়ে উৎকৃষ্ট কমলামধু পাওয়া যায়।)[৯২]

শিল্পরক্ষায় রাজাদের কর্ত্তব্য—স্পষ্টতঃ যে-সকল শিল্পের নাম পাওয়া যায়, সেইগুলির বর্ণনা করা হইয়াছে। যুদ্ধে ব্যবহার্য্য শস্ত্রাদির বিষয় প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে। দেশে শিল্পের যাহাতে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়, সেই দিকে রাজাদের দৃষ্টি ছিল। রাজধর্ম্মের বর্ণনায় বলা হইয়াছে, শিল্পিগণকে উপযুক্ত বৃত্তি দিয়া পোষণ করা রাজাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য।[৯৩] রাজসভায় শিল্পিগণের যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাঁহারা ধনাঢ্যদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া আপন আপন কার্য্যের উৎকর্ষ-সাধনে মনোযোগী হইতেন। দরিদ্র শিল্পিগণ যাহাতে অর্থাভাবে কষ্ট না পান, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা রাজাদের ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য। ন্যূনকল্পে চারি মাস পারিবারিক খরচ চালাইবার উপযোগী বৃত্তি এবং শিল্পোপকরণ রাজকোষ হইতে দিবার ব্যবস্থা ছিল। শিল্পীদের কেহ কেহ রাজধানীর ভিতরেই বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইতেন।[৯৪]

ধনী শিল্পিগণ হইতে কর আদায়—শিল্পকার্য্যের দ্বারা যাঁহারা ধনী হইয়া উঠিতেন, শিল্পের আয়ের একটা আনুপাতিক হিসাবে তাঁহাদিগকে রাজকর দিতে হইত। রাজা তাঁহাদের শিল্পের আয়, উন্নতি, প্রসার প্রভৃতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিতেন। বিশেষ অনুসন্ধানে যাঁহাদের আয় মোটা রকমের মনে হইত, তাঁহাদের উপরই শিল্পকর ধার্য্য করিতেন। কিন্তু কোথাও যাহাতে উৎপীড়ন না হয়, কর ধার্য্য করিতে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত রাজগণকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হইয়াছে। অতিরিক্ত ধনতৃষ্ণায় যাহাতে শিল্পের মূলোচ্ছেদ না হয়, সেই বিষয়ে রাজাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ

৯২ ফলজং মধু। সভা ৫১।১৩। মৈরেয়পানানি। বি ৭২।২৮
হিমবৎপুষ্পজঞ্চৈব স্বাদু ক্ষৌদ্রং তথা বহু। সভা ৫২।৫

৯৩ শিল্পিনঃ শ্রিতান্। সভা ৫।৭১

৯৪ গৃহৈশ্চ পরিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্দ্ধরৈঃ। সভা ৫।৩৬
সর্ব্ব-শিল্পবিদস্তত্র বাসায়াভ্যাগমংস্তদা। আদি ২০৭।৪০
দ্রব্যোপকরণং কিঞ্চিৎ সর্ব্বদা সর্ব্বশিল্পিনাম্। ইত্যাদি। সভা ৫।১১৮,১১৯

সতর্ক-বাণী প্রযুক্ত হইয়াছে। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ধনী শিল্পী ব্যতীত অন্যদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল।[২৫]

শিল্পের সমাদর—দেশে শিল্পের যে বিশেষ সমাদর ছিল, তাহার প্রমাণ উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাতেই পাওয়া যায়। শিল্প রক্ষা করিবার ভার ধনীদের উপর ন্যস্ত থাকিলেও সাধারণ জনগণ এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। সভাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে যাঁহারা আপন আপন শ্রেষ্ঠ শিল্প উপায়নরূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কাহারও প্রেরণায় ঐরূপ করিয়াছিলেন, তেমন কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সেইসকল বস্তুর নির্ম্মাণে সমাজের স্বাভাবিক আগ্রহই ছিল। যুদ্ধের শস্ত্রাদি উপকরণ একমাত্র দেশশাসকদের আদেশে বা প্রয়োজনে এবং মণিমুক্তা প্রভৃতির অলঙ্কারাদি ধনীদের ব্যবহার্য্যরূপে নির্ম্মিত হইলেও গৃহাদি স্থাপত্য-শিল্প, প্রয়োজনীয় লৌহ ও কাংস্যশিল্প এবং বস্ত্রাদি ধনিদরিদ্রনির্ব্বিশেষে আবশ্যক হইত। সুতরাং এইগুলির উন্নতির মূলে রাজতন্ত্রের সহানুভূতি থাকিলেও সাধারণ সমাজই এইগুলির স্রষ্টা। সাধারণের আগ্রহ, প্রয়োজন এবং উৎসাহেই এইগুলির সৃষ্টি, প্রসার এবং উন্নতি সাধিত হইত। পার্ব্বত্য জাতির মধ্যেও বস্ত্র, কম্বল, অজিন, কুথ প্রভৃতি শিল্পের বিলক্ষণ উন্নতি ঘটিয়াছিল। শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময়কে 'দানব' বলিবার কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তাঁহার নিবাস ছিল খাণ্ডবপ্রস্থে, খুব জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে। দানবরাজ বৃষপর্ব্বার সভামণ্ডপের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। এইসকল কারণেই কি তিনি দানব? ময়ের শিল্পনিপুণতায় মনে হয়, সম্ভবতঃ তৎকালে ভদ্রসমাজ অপেক্ষা সাধারণ সমাজে বা তথাকথিত দানবাদির সমাজে শিল্পবিদ্যায় শক্তিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। হয়তো তাঁহারাই স্থাপত্যাদি শিল্পে গুরুস্থানীয় ছিলেন।

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রশংসা—অর্থের প্রশংসাচ্ছলে অর্জ্জুন বলিয়াছেন, ধর্ম্ম এবং কাম, অর্থ ছাড়া টিকিতে পারে না। এই সংসার কর্ম্মভূমি। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যতীত ধনাগমের উৎকৃষ্ট উপায় আর

উৎপত্তিং দানবৃত্তিঞ্চ শিল্পং সম্প্রেক্ষ্য চাসকৃৎ।
শিল্পং প্রতি করানেবং শিল্পিনঃ প্রতিকারয়েৎ। ইত্যাদি। শা ৮৭।১৪-১৮

নাই। সুতরাং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিই সমস্ত বৈষয়িক উন্নতির মূল। সমাজের আর্থিক উন্নতির মূলেও এই তিনটি।[৯৬]

আহার ও আহার্য্য

প্রত্যেক প্রাণীকেই শরীররক্ষার নিমিত্ত আহার করিতে হয়; মানুষের আহার শুধু শরীররক্ষার জন্য নহে। আহারের সহিত মনের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে, মনের উপরে খাদ্যের প্রভাব খুব বেশী।

প্রকৃতিভেদে আহার্য্যভেদ—যে আহার্য্য আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধন করে, যাহা রসাল, স্নিগ্ধ, স্থির এবং হৃদ্য তাহাই সাত্ত্বিক-প্রকৃতি লোকের প্রিয়। কটু, অম্ল, লবণ, অত্যুষ্ণ, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য, রসশূন্য রুক্ষদ্রব্য এবং বিদাহী দ্রব্য রাজসপ্রকৃতির প্রিয় খাদ্য। এইজাতীয় আহার্য্য হইতে নানাবিধ রোগের আশঙ্কা আছে। যাহা যাতযাম (এক প্রহরের বেশী সময় পূর্ব্বে পাক করা) রসশূন্য, পূতি, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং অমেধ্য, তাহাই তামসপ্রকৃতি লোকদের প্রিয় খাদ্য।[১] আরও এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, আহারে সংযম থাকিলে পাপ নাশ হয়। পাপ পুণ্য যাহাই হউক, আহারের সংযমে শরীর সুস্থ থাকে এবং অনেক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। শরীর ও মনের অনুকূল খাদ্য গ্রহণ করিবার উপদেশরূপে এইসকল উক্তি।[২]

আহারে ক্ষুধাই প্রধান সহায়—এই কথাটি বাঙ্গালা এবং ইংরেজী ভাষায়ও প্রবচনরূপে প্রচলিত আছে। মহাভারতে বলা হইয়াছে, ক্ষুধা থাকিলে অরুচি হয় না, খাদ্যকে স্বাদু বলিয়া মনে হয়।[৩]

দুইবারমাত্র ভোজনের বিধান—সাধারণতঃ দিনের বেলা একবার এবং রাত্রিতে একবার, এই দুইবারমাত্র ভোজনের নিয়ম ছিল। কেহ কেহ অন্য

৯৬ কর্ম্মভূমিরিয়ং রাজন্নিহ বার্ত্তা প্রশস্যতে।
কৃষির্বাণিজ্যগোরক্ষং শিল্পানি বিবিধানি চ॥ ইত্যাদি। শা ১৬৭।১১,১২

১ আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ইত্যাদি। ভী ৪১।৮-১০

২ আহারনিয়মেনাস্য পাপ্মা শাম্যতি রাজসঃ। শা ২১৭।১৮

৩ ক্ষুৎ স্বাদুতাং জনয়তি। উ ৩৪।৫০

ময়েও খাইতেন। যাঁহারা মাত্র দুইবার আহার্য্য গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগকে 'দোপবাসী' বলা হইত।[৪] দুইবারমাত্র খাওয়ার অনেক প্রশংসা এবং কীর্ত্তনের বাহুল্যে মনে হয়, তখনও সাধারণসমাজে দুইবার খাওয়ার নিয়ম প্রচলিত হয় নাই। প্রচলিত হইলে এত প্রশংসা করার কি প্রয়োজন ?

ব্রীহি ও যব প্রধান খাদ্য—খাদ্যের মধ্যে ধান্য ও যবই প্রধান। ভোজনে সর্ব্বত্রই অন্নের আয়োজন দেখিতে পাই। যবের দ্বারা কি ভাবে, কোন খাদ্য প্রস্তুত হইত, তাহা জানা যায় না।[৫]

অন্যান্য খাদ্য—পিঠা, গুড়, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তিল, মৎস্য, মাংস, নানাজাতীয় শাক, তরকারী প্রভৃতি খাদ্যের নাম গৃহীত হইয়াছে। হরিবংশের এক স্থানে নানাবিধ খাদ্যের উল্লেখ আছে। আচার, নানাজাতীয় টক এবং ... এর বর্ণনাও সেখানে দেখিতে পাই।[৬]

মাংসভক্ষণে মতভেদ—মাংসভক্ষণের নিন্দা ও বিধান দুইই কীর্ত্তিত হইয়াছে। উদাহরণে দেখা যায়, প্রায় সকলেই মাংস খাইতেন। নিন্দাচ্ছলে বলা হইয়াছে, যিনি কোন প্রাণীর মাংস আহার করিয়া আপনার দেহের শক্তি বৃদ্ধি করিতে চান, তিনি অতি ক্ষুদ্র ও নৃশংস। যাঁহারা মাংস খাওয়ার নিমিত্ত প্রাণিহত্যা করেন, তাঁহারাও জন্মান্তরে নিহত হন।[৭]

পক্ষান্তরে মাংসভক্ষণের উদাহরণও মহাভারতে অল্প নহে। ব্রাহ্মণও মাংসভোজন করিতেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে বরাহ এবং হরিণের মাংস দিয়াছিলেন।[৮] বনবাসকালে পাণ্ডবগণ ফলমূল এবং মাংস

৪ সায়ং প্রাতর্মনুষ্যাণামশনং দেবনির্ম্মিতম্।
নান্তরা ভোজনং দৃষ্টমুপবাসী তথা ভবেৎ ॥ শা ১৯৩।১০। অনু ৯৩।১০। অনু ১৬২,৪০

৫ ব্রীহিরসং যবাংশ্চ। অনু ৯৩।৩৩,৪৪
সং পৃথিব্যাং ব্রীহিযবম্। আদি ৮৫।১৩

৬ অপূপান্ বিবিধাকারান্ শাকানি বিবিধানি চ। ইত্যাদি। অনু ১১৬।২
শালীক্ষুগোরসৈঃ। ইত্যাদি। অশ্ব ৮৫।২১
মাংসানি পক্বানি ফলাম্লিকানি। ইত্যাদি। হরি, বিষ্ণু প ১৪৮তম অঃ।

৭ স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নাস্তি ক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎ স নৃশংসতরো নরঃ ॥ ইত্যাদি। অনু ১১৬।১১-৩৬

৮ মাংসৈর্ব্বারাহহারিণৈঃ। ইত্যাদি। সভা ৪।২

আহার করিতেন। মাংসই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল।[৯] ধৃতরাষ্ট্র ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মাংসভাত (পোলাও) খাও, তথাপি কেন তুমি দিন দিন এত কৃশ হইতেছ?"[১০] যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে সংগৃহীত আহার্য্যের মধ্যে পশুপক্ষীও একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।[১১] মৌষলপর্ব্বে উল্লিখিত আছে, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় নরপতিগণ অতিশয় মাংসপ্রিয় ছিলেন।[১২] এইসকল উদাহরণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সমাজে মাংসের প্রচুর ব্যবহার ছিল এবং তাহা উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে বিবেচিত হইত।

বৈধ মাংসভক্ষণে দোষ নাই—পূর্ব্বে মাংসভক্ষণের প্রতিকূলে যে-সকল উক্তি পাওয়া গিয়াছে, মাংসাহারের নিন্দা করা সেইগুলির উদ্দেশ্য নহে, অবৈধ মাংস আহারের নিন্দা করাই আসল উদ্দেশ্য। মহাভারতে কতকগুলি মাংসকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। পিতৃলোকের পারলৌকিক তৃপ্তির উদ্দেশ্যে পশুবধ নিষিদ্ধ নহে, ইহা বিহিত, সুতরাং বৈধ।[১৩] বিহিত মন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষিত মাংস এবং ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে হত পশুপক্ষীর মাংস আহার করা অবৈধ নহে।[১৪] মন্ত্রসংস্কৃত সমস্ত মাংসকেই 'হবিঃ' বলা হয়। শাস্ত্রসম্মত মাংস ভোজন করা দূষণীয় নহে।[১৫] বেদবিহিত যজ্ঞাদিতে পশুবধ নিষিদ্ধ নহে। সুতরাং যজ্ঞাদিতে নিহত পশুর মাংস আহার করায় দোষ নাই।[১৬] অনুশাসনপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মৃগয়ায় নিহত পশুর মাংস

৯ আহরেয়ুরিমে যেঽপি ফলমূলমৃগাংস্তথা। বন ২।৮
আরণ্যানাং মৃগানাঞ্চ মাংসৈর্নানাবিধৈরপি। বন ২৬১।৩

১০ অশ্নাসি পিশিতৌদনম্। ইত্যাদি। সভা ৪৯।৯

১১ স্থলজা জলজা যে চ পশবঃ। ইত্যাদি। অশ্ব ৮৫।২২

১২ মাংসমনেকশঃ। মৌ ৩।৮

১৩ ত্রীন্ মাসানাবিকেনাহুশ্চতুর্মাসং শশেন হ। ইত্যাদি। অনু ৮৮।৫-১০

১৪ প্রোক্ষিতাভ্যুক্ষিতং মাংসং তথা ব্রাহ্মণকাম্যয়া। ইত্যাদি। অনু ১১৫।৪৫। অনু ১৬২।৬৫

১৫ বেদোক্তেন প্রমাণেন পিতৃণাং প্রক্রিয়াসু চ।
অতোঽন্যথা বৃথামাংসমভক্ষ্যং মনুরব্রবীৎ॥ ইত্যাদি। অনু ১১৫।৫২,৫৩

১৬ বিধিনা বেদদৃষ্টেন তদ্ভুক্ত্বেহ ন দুষ্যতি। ইত্যাদি। অনু ১১৬।১৪
ঔষধ্যো বিরুধশ্চৈব পশবঃ মৃগপক্ষিণঃ।
অন্নাদ্যভূতা লোকস্য ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ॥ বন ২০৭।৬

আহার করাও নিন্দিত নহে, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। কারণ বন্য সমস্ত পশুকে ঋষি অগস্ত্য প্রোক্ষণ (মন্ত্রসংস্কৃত) করিয়াছিলেন।[১৭]

সুতরাং দেখা যায়, বৈধ মাংসভোজন সেই যুগে চলিত ছিল। কেবল আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে মাংসভোজন প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।[১৮]

অভক্ষ্য মাংস—বর্ণিত বৈধ মাংস ভিন্ন সকলপ্রকার মাংসই ছিল বৃথামাংস। দেবতা, অতিথি অথবা পিতৃলোকের উদ্দেশে নিবেদিত না হইলে তাহাকেই বলা হইত বৃথামাংস।[১৯] বৃথামাংস-ভক্ষণ করা তৎকালে গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত, এমন কি, কোন বিষয়ে শপথ করিতে হইলে বলা হইত, "যিনি অমুক কাজ করিয়াছেন, তিনি বৃথামাংস আহার করুন।" অর্থাৎ বৃথামাংস আহার করিলেই তিনি দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিবেন।[২০] শাস্ত্রীয় নিয়মে মাংস ভোজন করিলে ভোক্তাকে 'অমাংসাশী' বলা হইত।[২১]

বৃথামাংস-ভোজন—ভোজনাদি বিষয়ে প্রাণীর প্রবৃত্তি স্বভাবজাত; উপদেশ দিয়া কাহাকেও প্রবৃত্ত করাইতে হয় না। নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই উপদেশের প্রয়োজন হয়। অনেক স্থানেই বৃথামাংস-ভক্ষণ নিষেধ করা হইয়াছে, অথচ মিথিলানগরীর বাজারে মাংসের দোকানে ক্রেতাদের যে ভিড় দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, সমাজ সেই নিষেধ গ্রহণ করে নাই। গ্রহণ করিলে বাজারে মাংসের দোকান থাকিতে পারিত না।[২২]

মাংসবর্জ্জনের প্রশংসা—মাংসবর্জ্জনকে পুণ্যের হেতুরূপে বলা হইয়াছে। যাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন না, তাঁহারা তপস্বী, তাঁহারা মুনি—এইরূপ বহু উক্তি অনুশাসনপর্ব্বের ১১৪তম ১১৫তম অধ্যায়ে শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, মাংসবর্জ্জনকে অশ্বমেধযজ্ঞের সহিত তুলনা করিয়া শতমুখে প্রশংসা

১৭ আরণ্যাঃ সর্ব্বদৈবত্যাঃ সর্ব্বশঃ প্রোক্ষিতা মৃগাঃ। অনু ১১৬।১৬

১৮ আত্মনে পাচয়েন্নান্নং ন বৃথা ঘাতয়েৎ পশূন্। ইত্যাদি। বন ২।৫৮

১৯ দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে দত্ত্বাপি যঃ সদা।
যথাবিধি যথাশ্রাদ্ধং ন প্রদুষ্যতি ভক্ষণাৎ॥ বন ২০৭।১৪

২০ বৃথামাংসাশনশ্চাস্তু। অনু ৯৩।১২১

২১ অভক্ষয়ন্ বৃথামাংসমমাংসাশী ভবত্যুত। অনু ৯৩।১২

২২ বন ২০৬তম অঃ।

করা হইয়াছে।[২৩] এইসকল প্রশংসাবাদ হইতেও অনুমিত হয়, সমাজে মাংসের ব্যবহার খুব বেশী ছিল, তাহা না হইলে নিবৃত্তির নিমিত্ত এত উপদেশ দিতে হইত না।

খাদ্য মাংস—অন্তরে দুরভিসন্ধি লইয়া জয়দ্রথ বনে পাঞ্চালীর কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইলে দ্রৌপদী সমাগত অতিথিকে যথানিয়মে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতেছেন, "আমার পতিগণ মৃগয়ায় গিয়াছেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে আপনাকে ঐণেয়, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্ষ, রুরু, শম্বর, গবয়, মৃগ, বরাহ, মহিষ এবং অন্যান্য পশু দেওয়া হইবে"।[২৪]

পাখীর মাংসও ভক্ষ্য ছিল। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নাই।[২৫] যে-সকল প্রাণীর পাঁচটি নখ, তাহাদের মধ্যেও শশক, শল্লকী, গোধা, গণ্ডার ও কূর্ম খাদ্যরূপে গৃহীত হইত।[২৬] ব্যাপারাদিতে প্রচুর মাংসের আয়োজন করা হইত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞে ও অভিমন্যুর বিবাহে প্রচুর মাংস সংগ্রহ করা হইয়াছিল। হরিণ এবং বরাহের মাংসই বেশী প্রচলিত ছিল।[২৭]

মাংসের বহুল ব্যবহার—সমস্ত খাদ্যের মধ্যে মাংসেরই আদর ছিল বেশী। ভোজের কথায় মাংসের বর্ণনাই বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে। এমন কি, বিরাটপুরীতে ভীমসেন যখন পাচকরূপে ছিলেন, তখন তিনি অন্য পাণ্ডবদিগকে ছলপূর্ব্বক মাংসই বেশী পরিমাণে দিতেন।[২৮] ধনিপরিবারে আহার্য্যের মধ্যে মাংসের ব্যবহারই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।[২৯]

মাছ—মাছের ব্যবহার তেমন ছিল না। মাংস অপেক্ষা মাছের উল্লেখ অনেক কম। উল্লিখিত আছে, মান্ধাতা ব্রাহ্মণগণকে রোহিত মৎস্য দান

২৩ যো যজেতাশ্বমেধেন মাসি মাসি যতব্রতঃ।
বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ সমমেতদ্ যুধিষ্ঠির। অনু ১১৫।১০

২৪ ঐণেয়ান্ পৃষতান্ন্যঙ্কূন্ হরিণান্ শরভান্ শশান্। ইত্যাদি। বন ২৬৬।১৪,১৫

২৫ জরায়ুজাণ্ডজাতানি। ইত্যাদি। অশ্ব ৮৫।৩৪

২৬ পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ বিশঃ।
যথাশাস্ত্রং প্রমাণন্তে মাভক্ষ্যে মানসং কৃথাঃ॥ শা ১৪১।৭০

২৭ মাংসৈর্ব্বারাহহারিণৈঃ। সভা ৪।২

২৮ ভীমসেনোঽপি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ। ইত্যাদি। বি ১৩।৭

২৯ আঢ্যানাং মাংসপরমম্। উ ৩৪।৪৯

করিয়াছিলেন।[৩০] পিতৃকৃত্যে মৎস্য ব্যবহারের কথা দেখিতে পাই। শ্রাদ্ধে মৎস্য দান করিলে পিতৃগণ দুইমাস পরিতৃপ্ত থাকেন বলিয়া মহাভারতে লিখিত আছে।[৩১] যে-সকল মৎস্যের শল্ক (আঁশ) নাই, তাহা ব্রাহ্মণের অখাদ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যেরা সমস্ত মৎস্যই আহার করিতেন, ব্রাহ্মণগণ শল্কযুক্ত মৎস্য আহার করিতেন।[৩২]

স্বাদু দ্রব্য একাকী খাইতে নাই—খাদ্য সম্বন্ধে আরও কতকগুলি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণ খাদ্য ব্যতীত কোন বিশেষ সুস্বাদু দ্রব্য অন্যকে পূর্ব্বে না খাওয়াইয়া নিজে খাওয়া নিন্দার বিষয়। এমন কি, ইহা পাপজনক বলিয়া মহর্ষি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পায়স, কৃসর (খিচুড়ী), মাংস, পিষ্টক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য কখনও একাকী খাইতে নাই।[৩৩]

পরিবারের সকলের সমান খাদ্য—অতিথি, পোষ্যবর্গ এবং ভৃত্যের সহিত পরিবারের কর্ত্তারও একই খাদ্য খাওয়ার নিয়ম, নিজের উদ্দেশ্যে কোনপ্রকার অতিরিক্ত আয়োজন করা নিষিদ্ধ।[৩৪] দেবতা, পিতৃগণ এবং পোষ্যগণকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট ভোজন করিলে সেই পুণ্যবান্ ভোক্তাকে 'বিঘসাশী' বলা হয়।[৩৫] সেই অবশিষ্ট ভোজ্য 'অমৃত' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শুধু আপনার খাওয়ার উদ্দেশ্যে পাক করা নিষিদ্ধ।[৩৬]

যোগিগণের খাদ্য—বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা। যোগিগণের পক্ষে কণ, পিণ্যাক, যাবক, ফলমূল প্রভৃতি ভোজনের ব্যবস্থা,

৩০ অদদদ্ রোহিতান্ মৎস্যান্ ব্রাহ্মণেভ্যো বিশাম্পতে। দ্রো ৬০।১২। শা ২৯।৯১

৩১ দ্বৌ মাসৌ তু ভবেত্তৃপ্তির্মৎস্যৈঃ পিতৃগণস্য হ। অনু ৮৮।৫

৩২ অভক্ষ্যা ব্রাহ্মণৈর্মৎস্যাঃ শল্কৈর্যে বৈ বিবর্জ্জিতাঃ। শা ৩৬।২২

৩৩ সংযাবং কৃসরং মাংসং শষ্কুলীং পায়সং তথা।
আত্মার্থং ন প্রকর্ত্তব্যং দেবার্থন্তু প্রকল্পয়েৎ॥ অনু ১০৪।৪১। শা ৩৬।৩৩-৩৫।
শা ২২৮। ৬৩

একো স্বাদু সমশ্নাতু। অনু ৯৩।১৩১। অনু ৯৩।৩৮,২১। উ ৩৩।৪৫

৩৪ অতিথীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রেষ্যাণাং স্বজনস্য চ।
সামান্যং ভোজনং ভৃত্যৈঃ পুরুষস্য প্রশস্যতে॥ শা ১৯৩।৯

৩৫ দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ সংশ্রিতেভ্যস্তথৈব চ
অবশিষ্টানি যো ভুঙ্‌ক্তে তমাহুর্বিঘসাশিনম্॥ অনু ৯৩।১৫

৩৬ অমৃতং কেবলং ভুঙ্‌ক্তে ইতি বিদ্ধি যুধিষ্ঠির। অনু ৯৩।১৩
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। ভী ২৭।১৩

তাঁহারা স্নেহদ্রব্য বর্জ্জন করিবেন।[৩৭] ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে মুনিদের খাদ্যরূপে কতকগুলি আরণ্য ফলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ সমাগত বেশ্যাকে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতেছেন, "তোমাকে পরিপক্ব ভল্লাতক, আমলক, করূষক, ইঙ্গুদ, ধন্বন, পিপ্পল প্রভৃতি ফল দিতেছি যথারুচি গ্রহণ কর।"[৩৮] আরণ্য ফলমূল সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। ধরিয়া লওয়া হইত যে, তাহা ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। বহু ফলমূল যাহাতে অপর কেহ নষ্ট না করে, রাজা সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন তিল ব্রাহ্মণদের একটি প্রধান খাদ্য ছিল। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ব্রাহ্মণকে তিল দান করা এবং তিল খাওয়ার নিয়ম ছিল।[৩৯]

পার্ব্বত্য জাতির ভক্ষ্য—পার্ব্বত্য জাতিরা তখনও পাকপ্রণালীর সহিত পরিচিত হয় নাই। তাহারাও ফলমূল খাইয়াই জীবন ধারণ করিত।[৪০]

দধি, দুগ্ধ প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা—দধি, দুগ্ধ এবং ঘৃতের ব্যবহার তৎকালে খুব বেশী ছিল। অনুশাসনপর্ব্বের দানধর্ম্ম-প্রকরণে গোদানের মাহাত্ম্য বর্ণনায় ক্ষীরকে অমৃতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দধি, দুগ্ধ এবং ঘৃতের প্রশংসা বহু স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।[৪১]

সোমরস-পান—সোমরস-পানের কোন উদাহরণ দেখা যায় না কিন্তু একস্থানে সোম-পানের অধিকারী নির্দ্দেশ করিতে বলা হইয়াছে যাহার ঘরে তিন বৎসর চলিবার উপযোগী খাদ্য আছে, একমাত্র তিনিই সোমপানের অধিকারী। ইহাতে জানা যায়, বড় বড় ধনী ব্যতীত অন্যদের পক্ষে সোমপানের সম্ভাবনা ছিল না।[৪২]

---

৩৭ কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত। ইত্যাদি। শা ১০০।৪৩,৪৪

৩৮ ফলানি পক্কানি দদানি তেঽহং ভল্লাতকান্যামলকানি চৈব। ইত্যাদি। বন ১১১।১৩

৩৯ বনস্পতীন্ ভক্ষ্যফলান্ন ছিন্দ্যুর্ব্বিষয়ে তব।
ব্রাহ্মণানাং মূলফলং ধর্ম্মমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ শা ৮৯।১
বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু তিলান্ দদ্যাদ্দ্বিজাতিষু। ইত্যাদি। অনু ৬৮।১৯

৪০ ফলমূলাশনা যে চ কিরাতাশ্চর্ম্মবাসসঃ। সভা ৫২।৯

৪১ অমৃতং বৈ গবাং ক্ষীরমিত্যাহ ত্রিদশাধিপঃ। অনু ৬৬।৪৫
গবাং রসাৎ পরমং নাস্তি কিঞ্চিৎ। ইত্যাদি। অনু ৭১।৫১। অনু ৮৩তম অঃ।

৪২ যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং চাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি॥ শা ১৬৫।৫

সুরাপান—সুরাপানের বড় বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। অভিমন্যুর বিবাহবাসরে প্রচুর সুরার আয়োজন ছিল।[৪৩] আচার্য্য শুক্র সুরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন। অসুরগণ তাঁহার শিষ্য কচকে (বৃহস্পতির পুত্র) দগ্ধ করিয়া তাহার দেহভস্ম শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশাইয়া দিয়াছিল।[৪৪] পরে সঞ্জীবনী-বিদ্যার প্রভাবে কচকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আচার্য্য সুরা সম্বন্ধে নিয়ম করিলেন, যে-ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে গর্হিতকর্ম্মা বলিয়া বিবেচিত হইবেন।[৪৫] বলরামের সুরাপানের কথা বহু স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে।[৪৬] উদ্যোগপর্ব্বে একটি দৃশ্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দুইজনকেই সুরামত্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়; তখন তাঁহারা যেন নেশায় অভিভূত। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দূতরূপে পাঠাইলে সঞ্জয়ের প্রতি উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিতে পারা যায়, উভয়েই প্রচুর সুরা পান করিয়াছেন। কথাবার্ত্তা কর্কশ এবং অহঙ্কারসূচক।[৪৭] দ্রোণপর্ব্বে দেখিতে পাই, একদিন যুদ্ধে যাত্রাকালে ভীমসেন শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কৈরাতক মধু পান করিলেন, তারপর দ্বিগুণ বলে বলীয়ান্ হইয়া যাত্রা করিলেন।[৪৮] যুদ্ধযাত্রাকালে উৎসাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত মদ্যপান করা অনেকেরই যেন অভ্যাস ছিল। একদিন সাত্যকিকেও ভীমসেনের অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।[৪৯] কেহ কেহ সখ করিয়াও সুরাপান করিতেন। কামুক কীচক দ্রৌপদীকে বলিতেছেন—"এস, আমার সহিত মধুকপুষ্পজ মদিরা পান কর।"[৫০] যদুবংশে সুরার ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। অত্যধিক সুরাপানই যদুবংশের ধ্বংসের কারণ।[৫১] বড় বড় ব্যাপারাদিতেও প্রচুর সুরার আয়োজন করা

---

৪৩ সুরামৈরেয়পানানি প্রভূতান্যুপহারয়ন্। বি ৭২।২৮

৪৪ অসুরৈঃ সুরায়াং ভবতোঽস্মি দত্তো,
হত্বা দগ্ধ্বা চূর্ণয়িত্বা চ কাব্য ॥ আদি ৭৬।৫৫

৪৫ যো ব্রাহ্মণোঽদ্য প্রভৃতীহ কশ্চিৎ। ইত্যাদি। আদি ৭৬।৬৭

৪৬ ততো হলধরঃ ক্ষীবো রেবতীসহিতঃ প্রভুঃ। আদি ২১৯।৭। আদি ২২০।২০।
উ ১৫৬।১৯

৪৭ উভৌ মধ্বাসবক্ষীবাবুভৌ চন্দনরূষিতৌ। ইত্যাদি। উ ৫৯।৫

৪৮ আলভ্য মঙ্গলান্যষ্টৌ পীত্বা কৈরাতকং মধু। ইত্যাদি। দ্রো ১২৫।১৩,১৪

৪৯ ততঃ স মধুপর্কার্হঃ পীত্বা কৈলাতকং মধু। দ্রো ১১০।৬১

৫০ এহি তত্র ময়া সার্দ্ধং পিবস্ব মধুমাধবীং। বি ১৬।৩

৫১ মদ্যং মাংসমনেকশঃ। ইত্যাদি। মৌ ৩।৮-৩২

হইত। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে খাদ্য ও পানীয়ের তালিকাতে মাংস ও সুরারই প্রাচুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।[৫২] অভিজাত ঘরের কুলবধূগণও সুরপানে অভ্যস্ত ছিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জলকেলির উদ্দেশ্যে যমুনায় যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রমুখ কুলবধূগণও আছেন। কেহ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, কেহ বা হাসিতেছেন, কেহ কেহ উৎকৃষ্ট আসব পান করিয়া মত্ত হইয়াছেন।[৫৩] মৎস্যরাজের মহিষী সুদেষ্ণা পিপাসা-শান্তির নিমিত্ত সুরা পান করিতেন। সুরা আনিবার উদ্দেশ্যেই তিনি দ্রৌপদীকে কীচকালয়ে পাঠাইয়াছিলেন।[৫৪] অভিমন্যুর শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিতা শোকাকুলা উত্তরাকে দেখিয়া গান্ধারী বিলাপ করিয়া বলিতেছেন, "মাধ্বীকের মত্ততায় মূর্চ্ছিত হইয়াও যে উত্তরা স্বামীকে আলিঙ্গন করিতে লজ্জিত হইত, আজ সেই উত্তরা সর্ব্বসমক্ষে পতির অঙ্গ পরিমার্জ্জন করিতেছে।"[৫৫] এই বিলাপোক্তি হইতেও জানা যায়, ধনিগণের অন্তঃপুরেও প্রায় সকলেই সুরার সহিত পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ বিলাসিতার অন্যতম উপকরণরূপে সুরাও গৃহীত হইত। সাধারণ সমাজেও কোন কোন মহিলা মদ্যপান করিতেন।[৫৬]

সুরাপানের নিন্দা—সমাজে প্রচলিত থাকিলেও নানাস্থানে সুরাপানের নিন্দা করা হইয়াছে।[৫৭] কর্ণ ও শল্যের মধ্যে যখন পরস্পর কলহ হয়, তখন কর্ণ মদ্রদেশের মহিলাদের সুরাপানের উল্লেখ করিয়া শল্যকে তিরস্কার করিয়াছেন।[৫৮] নিন্দাকীর্ত্তন দেখিলে মনে হয়, সুরাপান ও বৃথামাংসভোজন সামাজিক দুর্নীতির মধ্যেই গণ্য ছিল।

৫২ এবং বভূব স যজ্ঞো ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
বহ্বন্নধনরত্নৌঘঃ সুরামৈরেয়সাগরঃ। অশ্ব ৮৯।৩৯

৫৩ কাশ্চিৎ প্রহৃষ্টা ননৃতুশ্চুক্রুশুশ্চ তথাপরাঃ।
জহসুশ্চাপরা নার্য্যঃ পপুশ্চান্যা বরাসবম্॥ আদি ২২২।২৪

৫৪ অপ্রৈষীদ্রাজপুত্রী মাং সুরাহারীং তবান্তিকম্।
পানমাহর মে ক্ষিপ্রং পিপাসা মেতি চাব্রবীৎ॥ বি ১৬।৪

৫৫ লজ্জমানা পুরা চৈনং মাধ্বীকমদমূর্চ্ছিতা। ইত্যাদি। স্ত্রী ২০।৭

৫৬ সা পীত্বা মদিরাং মত্তা সপুত্রা মদবিহ্বলা। আদি ১৪৮।৮

৫৭ সুরাস্তু পীত্বা পততীতি শব্দঃ। শা ১৪১।৯০। শা ১৬৫।৩৪। উ ৩৫।৩৪। কর্ণ ৪৫।২৯

৫৮ বাসাংস্যুৎসৃজ্য নৃত্যন্তি স্ত্রিয়ো যা মদ্যমোহিতাঃ। কর্ণ ৪০।৩৪

গোমাংস অভক্ষ্য—মহাভারতের সময়ে গোহত্যা পাপজনক বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।[৫৯]

অতি প্রাচীন কালে গোহত্যা—অতি প্রাচীন কালে গোমাংস-ভক্ষণের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। মহাভারতেও দুই তিনটি স্থানে প্রাচীন যুগের ব্যবহাররূপে গোমাংস-ভক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। রন্তিদেবের উপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, তিনি প্রত্যহ দুই হাজার গরু বধ করিতেন এবং সেই মাংস দান করিতেন। এই দানের ফলেই রন্তিদেবের কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়াছে।[৬০] অতিথি এবং অভ্যাগতের সম্মানার্থে পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি উপচারের সহিত গো উপঢৌকন দেওয়া হইত। কোথাও হত্যার উল্লেখ নাই, পরন্তু রক্ষা করার কথাই বলা হইয়াছে। জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত জানিয়া ব্যাসদেব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি মহর্ষিকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে গরুও দান করিয়াছিলেন, মহর্ষিও সমস্ত গ্রহণ করিয়া গরুটিকে রক্ষা করেন।[৬১] অতিথির উপঢৌকন-স্বরূপ গোদানের দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সম্মান প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এই রীতি প্রচলিত ছিল।[৬২]

অখাদ্য—খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে মহাভারতে কতকগুলি বিধিনিষেধের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতে সেই সময়ের রুচির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। গরু, ছোট পাখী, শ্লেষ্মাতক, কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পদ জলজন্তু, মণ্ডুক, ভাস, হংস, সুপর্ণ, চক্রবাক, প্লব, বক, কাক, মদ্‌গু, গৃধ্র, শ্যেন, উলূক প্রভৃতি অভক্ষ্য। মাংসাশী পশু, দংষ্ট্রাযুক্ত পশু প্রভৃতি অভক্ষ্য। প্রসবের পর দশ দিনের মধ্যে সূতিকা গাভীর দুধ খাইতে নাই। মানুষের দুধ এবং মৃগীর দুধও অগ্রাহ্য।[৬৩]

---

৫৯ বাক্‌পারুষ্যং গোবধো রাত্রিচর্য্যা। ইত্যাদি। কর্ণ ৪৫।২৯
ন চাসাং মাংসমশ্নীয়াদ্ গবাং পুষ্টিং তথাপ্নুয়াৎ। অনু ৭৮।১৭

৬০ উক্ষাণং পক্ত্বা সহ ওদনেন। ইত্যাদি। বন। ১৯৬।২১
অহন্যহনি বধ্যেতে দ্বে সহস্রে গবাং তথা। বন ২০৭।৯

৬১ পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ অর্ঘ্যং গাঞ্চ বিধানতঃ।
পিতামহায় কৃষ্ণায় তদর্হায় ন্যবেদয়ৎ॥ ইত্যাদি। আদি ৬০।১৩,১৪

৬২ সভা ২১।৩১। উ ৮।২৬। উ ৩৫।২৬। শা ৩২৬।৫

৬৩ অনড্বান্ মৃত্তিকা চৈব তথা ক্ষুদ্রপিপীলিকাঃ। ইত্যাদি। শা ৩৬।২১-২৫

অন্নগ্রহণে বিধিনিষেধ—অন্নগ্রহণেও কতকগুলি নিয়ম আছে। প্রেত-শ্রাদ্ধের অন্ন, সূতিকান্ন ও অশৌচীর অন্ন অভোজ্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের এবং শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করাও উচিত নহে। ক্ষত্রিয়ের অন্ন তেজ নাশ করে এবং শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণত্বের ক্ষতি ঘটায়। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ান্ন গ্রহণের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। দ্রৌপদী স্বহস্তে পাক করিয়া ব্রাহ্মণগণকে খাওয়াইতেন। রাজা পৌষ্য উতঙ্ককে অন্ন দান করিয়াছিলেন।[৬১] আরও কতকগুলি অন্ন বর্জ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। স্বর্ণকার, পতি-পুত্রহীনা নারী, সুদখোর, গণিকা, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক, স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ, অগ্নিষোমীয়-যাগে দীক্ষিত যজমান, কদর্য্য (অতি কৃপণ), অর্থের বিনিময়ে যজ্ঞকারী, তক্ষা, চর্ম্মকার, রজক, চিকিৎসক, রক্ষী, রঙ্গজীবী, স্ত্রীজীবী, পরিবিত্তী, বন্দী, দ্যূতবিৎ প্রভৃতির অন্ন অগ্রাহ্য। চিকিৎসকের অন্ন পুরীষতুল্য, গণিকার অন্ন মূত্রের সমান। কারুকের (শিল্পজীবী) অন্ন অতিশয় নিন্দিত। যিনি বিদ্যোপজীবী, অর্থাৎ বিদ্যাবিনিময়ে জীবিকা অর্জ্জন করেন, তিনি শূদ্রতুল্য। তাঁহার অন্নও ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য নহে। নিন্দিত এবং খলের অন্ন গ্রহণ করিতে নাই। অসংকৃত এবং অবজ্ঞাত অন্ন কোন অবস্থায় গ্রহণ করা উচিত নয়। গোঘ্ন, ব্রহ্মঘ্ন, নগরীরক্ষক প্রভৃতির অন্ন অতিশয় নিন্দিত। সুরাপায়ী, ন্যাসাপহারী, গুরুতল্পী এবং অন্য প্রকারের পাতকীর অন্নও অগ্রাহ্য।[৬৫] বাম হস্তে প্রদত্ত অন্ন, সুরাসংস্পৃষ্ট, উচ্ছিষ্ট, শুষ্ক মাংস, হস্তদত্ত লবণ প্রভৃতি খাইতে নাই। পর্য্যুষিত কোন দ্রব্য খাওয়া উচিত নহে। রাত্রিতে দধি এবং ছাতু খাওয়া অনুচিত।[৬৬]

আপৎকালে ভোজ্যাভোজ্যের বিচার চলে না—খাদ্যাভাবে প্রাণ-হানির আশঙ্কা উপস্থিত হইলে মানুষ বিচার করিবার অবকাশ পায় না

---

৬১ প্রেতান্নং সূতিকান্নঞ্চ যচ্চ কিঞ্চিদনির্দ্দশম্। ইত্যাদি। শা ৩৬।২৬,২৭

ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণস্যেহ ভোজ্যা যে চৈব ক্ষত্রিয়াঃ। ইত্যাদি। অনু ১৩৫।২,৩

পতীংশ্চ দ্রৌপদী সর্ব্বান্ দ্বিজাতীংশ্চ যশস্বিনী। ইত্যাদি। বন ৫০।১০। বন ৩।৮৩

আদি ১৯২।৪

স তথেত্যুক্ত্বা যথোপপন্নেনান্নেনৈনং ভোজয়ামাস। আদি ৩।১১৫

৬৫ আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নমবীরায়াশ্চ যোষিতঃ। ইত্যাদি। শা ৩৬।২৭-৩১

ভুঙ্‌ক্তে চিকিৎসকস্যান্নং তদন্নঞ্চ পুরীষবৎ। ইত্যাদি। অনু ১৩৫।১৪-১৯

৬৬ শা ৩৬। ৩২, ৩৩। শা ২২৮।৫৭। অনু ১০৪। ৯২-৯৪

তখন যে-কোন বস্তু পাইলেই তাহা খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। আচার্য্য ধৌম্যের শিষ্য ক্ষুধার জ্বালায় আকন্দপাতা খাইয়াছিলেন। (দ্রঃ ১২০তম পৃঃ।) শান্তিপর্ব্বের ১৪১তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, একদা দুর্ভিক্ষের সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া এক শ্বপচের গৃহে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং একখানি কুকুরের জঙ্ঘা হরণ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে সেই মাংস খাইতে হয় নাই। বিশ্বামিত্রের তপোবলে বর্ষণ হওয়ায় দুর্ভিক্ষের অবসান হয়। অনুশাসনপর্ব্বের ৯৩তম অধ্যায়েও বর্ণিত আছে, শৈব্যের যজ্ঞে বৃত ঋত্বিক্‌গণ ক্ষুধার জ্বালায় মানুষের শবদেহ পাক করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নৃপতি শৈব্যের বাধাদানে তাঁহারা বনে পলায়ন করেন। এইসকল উপাখ্যানের যথার্থতা বিশ্বাস করা যায় না। বিপদের সময় ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ সবই করিতে পারে, ইহাই এইসকল উপাখ্যানের সারমর্ম্ম। আপৎকালে অখাদ্য খাইয়াও প্রাণধারণ করা উচিত, ইহা মহাভারতের উপদেশ।[৬৭]

আর্থিক অবস্থার তারতম্যে খাদ্যের তারতম্য—যাঁহার যেরূপ আর্থিক অবস্থা, তাঁহার খাদ্যও সেইরূপই হইয়া থাকে। ধনীর খাদ্যের ন্যায় খাদ্য দরিদ্র কিরূপে সংগ্রহ করিবেন? সমাজে যাঁহারা ধনী ছিলেন, তাঁহাদের প্রধান খাদ্য ছিল মাংস। মধ্যবিত্ত-পরিবারে দধি-দুগ্ধকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত। তরকারীর সহিত তৈল সংগ্রহ করিতে পারিলেই দরিদ্রেরা কৃতার্থতা বোধ করিতেন।[৬৮]

ধনী ও দরিদ্রের ভোজনশক্তির প্রভেদ—নানাবিধ ভোজ্য সংগ্রহ করিবার মত যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, প্রায়ই দেখা যায়, তাঁহারা গ্রহণীরোগে ভুগিতেছেন, তাঁহাদের ভোজনের বা হজম করিবার শক্তি কম। যাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাঁহাদের জঠরাগ্নির শক্তি বেশী। এই সত্যটি তখনকার দিনেও ঠিক একই ভাবে ছিল।[৬৯] দরিদ্রেরা উপকরণ ছাড়া কেবল

---

৬৭ এবং বিদ্বানদীনাত্মা ব্যসনস্থো জিজীবিষুঃ।
সর্ব্বোপায়ৈরুপায়জ্ঞো দীনমাত্মানমুদ্ধরেৎ॥ শা ১৪১।১০০

৬৮ আঢ্যানাং মাংসপরমং মধ্যানাং গোরসোত্তরম্।
তৈলোত্তরং দরিদ্রাণাং ভোজনং ভরতর্ষভ॥ উ ৩৪।৪৯

৬৯ প্রায়েণ শ্রীমতাং লোকে ভোক্তুং শক্তির্ন বিদ্যতে।
জীর্য্যন্ত্যপি তু কাষ্ঠানি দরিদ্রাণাং মহীপতে॥ উ ৩৪।৫১। শা ২৮।২৯

ভাত পাইলেই সন্তুষ্ট থাকেন, ক্ষুধাই তাঁহাদের প্রধান উপকরণ। কিন্তু ধনিগণের প্রচুর উপকরণ থাকিলেও প্রায়ই ভোজনের ক্ষমতা থাকে না।[৭০]

পাক—সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের উপরই পাকের ভার ছিল; কোন কোন পুরুষও পাক করিতে জানিতেন। নৃপতি নল উৎকৃষ্ট পাক করিতে পারিতেন, বিশেষতঃ মাংস-রন্ধনে তাঁহার একটু বিশেষত্ব ছিল। বর্ণিত আছে দময়ন্তী তাঁহার পাককরা মাংসের স্বাদেই তাঁহাকে চিনিতে পরিয়াছিলেন এই বর্ণনা হইতে মনে হয়, নল যেন সখ করিয়া প্রায়ই নিজে মাংস পাক করিতেন। তাঁহার প্রস্তুত মাংসের স্বাদ দময়ন্তীর সুপরিচিত।[৭১] ভীমসেনও পাককার্য্যে খুব পটু ছিলেন। বিরাটরাজার পুরীতে অজ্ঞাতবাসের সময় পাচকরূপেই তিনি আত্মপরিচয় দেন এবং একবৎসর কাল ঐ কর্ম্মে অতিবাহিত করেন। প্রথম মৎস্যনগরে প্রবেশ করিবার কালে হাতে একটি কাঁটা আর একখানি হাতা লইয়া উপস্থিত হইলেন। নৃপতি বিরাটের প্রশ্নের উত্তরে নিজের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিলেন, "আমি পাচক, আপনার পরিচর্য্যা করিতে চাই, পাককার্য্যে আমি অভ্যস্ত, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পাচক ছিলাম।" বিরাট তাঁহাকে সসম্মানে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই ঘটনা হইতে মনে হয়, বড়লোকের পরিবারে পুরুষ পাচক রাখিবার ব্যবস্থা সেই যুগেও ছিল।[৭২] মনে হয়, পরিবারের স্ত্রীলোকরাই নিজেদের পরিবারে পাক করিতেন। বিবাহের দিনেই দ্রৌপদী কুন্তীর আদেশে পাক এবং পরিবেষণ করিয়াছিলেন।[৭৩] বনবাসের সময়ও দ্রৌপদী নিজেই পাক ও পরিবেষণ করিতেন। ইন্দ্রপ্রস্থে যখন বাস করিতেন, তখনও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁহাকেই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত, সেই সময়েও নিজে

যেষামপি চ ভোক্তব্যং গ্রহণীদোষপীড়িতাঃ।
ন শক্নুবন্তি তে ভোক্তুং পশ্য ধর্ম্মভৃতাং বর॥ বন ২০৮।১৬

৭০ সম্পন্নতরমেবান্নং দরিদ্রা ভুঞ্জতে সদা।
ক্ষুৎ স্বাদুতাং জনয়তি সা চাঢ্যেষু সুদুর্লভা॥ উ ৩৪।৫০

৭১ সোচিত্বা নলসিদ্ধস্য মাংসস্য বহুশঃ পুরা।
প্রাশ্য মত্বা নলং সূতং প্রাক্রোশদ্ ভৃশদুঃখিতা॥ বন ৭৫।২২, ২৩

৭২ নরেন্দ্র সূদঃ পরিচারকোঽস্মি তে জানামি সূপান্ প্রথমং ন কেবলান্॥ ইত্যাদি। বি ৮

৭৩ ত্বমগ্রমাদায় কুরুষ্ব ভদ্রে বলিঞ্চ বিপ্রায় চ দেহি ভিক্ষাম্। ইত্যাদি। আদি ১৯২।৪

াক করিতেন কি না, ঠিক জানা যায় না।[৭৪] ইহা রাজপরিবারের কথা। াজপরিবারেও যখন স্বয়ং রাণীকেই পাক করিতে হইত, তখন অন্য রিবারেও নিশ্চয়ই এই নিয়ম ছিল। আচার্য্য বেদের পত্নী পুণ্যকব্রত উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।[৭৫]

পাকপাত্র—কিরূপ পাত্রে পাক করা হইত, তাহা জানা যায় না। নবাসকালে দ্রৌপদী একটি তামার হাঁড়িতে পাক করিতেন।[৭৬] ভীমসেনের াটা ও হাতা কোন ধাতুর নির্ম্মিত, তাহা জানিবার উপায় নাই।

ভোজনপাত্র—রাজপরিবারে সোনা ও রূপার থালায় ভোজনের বর্ণনা াওয়া যায়। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে কাঁসার ব্যবহারই বেশী ছিল।[৭৭]

পরিবেষণ—বড় বড় ব্যাপারাদিতে পুরুষেরাই খাদ্য পরিবেষণ করিতেন। আবশ্যক হইলে দাসদাসী এবং পাচকগণও পরিবেষণে যোগ দিতেন।[৭৮]

ভোজনের অন্যান্য নিয়ম—ভোজনের সময় কি ভাবে বসিতে হইবে, কি ভাবে ভোজন আরম্ভ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়েও অনেক কথাই বলা হইয়াছে। খাইতে বসিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে মুখ, হাত ও পা ধুইতে হইবে, বসিয়াই তিনবার আচমন করিতে হইবে। বসিবার আসন এবং ভোজনপাত্র পরিষ্কার ও পবিত্র থাকা চাই। ভোজনকালে গায়ে উত্তরীয় বা অন্য কিছু থাকিবে, একখানিমাত্র বস্ত্র পরিয়া খাইতে নাই। মস্তক উন্মুক্ত থাকিবে, ভোজনকালে উষ্ণীষের ব্যবহার নিষিদ্ধ। দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া খাইতে নাই। জুতা বা খড়ম পায়ে রাখিয়া কোন কিছু খাওয়া নিষিদ্ধ। এইসকল নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে আসুর ভোজন হইয়া থাকে। একাকী বসিয়া একাগ্রচিত্তে মৌনভাবে ভোজন করিতে

৭৪ যুধিষ্ঠিরং ভোজয়িত্বা শেষমশ্নাতি পার্ষতী। বন ৩।৮৪। বন ২৩২।৪৫
বন ২৬২তম অঃ। (দুর্ব্বাসার উপাখ্যান)

৭৫ ব্রাহ্মণান্ পরিবেষ্টুমিচ্ছামি। আদি ৩।৯৭

৭৬ গৃহীত্ব পিঠরং তাম্রম্। বন ৩।৭২

৭৭ ভুঞ্জতে রুক্মপাত্রীভির্যুধিষ্ঠিরনিবেশনে। সভা ৪৯।১৮। বন ২৩২।৪২
উচ্চাবচং পার্থিবভোজনীয়ং পাত্রীষু জাম্বূনদরাজতীষু। আদি ১৯৪।১৩
ভিন্নকাংস্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। অনু ১০৪।৬৬

৭৮ দ্বিজানাং পরিবেষ্টারস্তস্মিন্ যজ্ঞে চ তেঽভবন্। সভা ১২।১৪। সভা ৪৯।৩৫
দাসাশ্চ দাস্যশ্চ সুমৃষ্টবেশাঃ সম্ভোজকাশ্চাপ্যুপজহ্রুরন্নম্। আদি ১৯৪।১৩

হয়। পানীয় জল, পায়স, ছাতু, দধি, ঘৃত এবং মধুর ভুক্তাবশিষ্ট অং পুত্রাদিকে দেওয়া যাইতে পারে। দধ্যন্ত আহার নিষিদ্ধ, দধির প আরও কিছু খাইতে হইবে। ভোজনের পরিসমাপ্তিতে তিনবার মু জল দিয়া দুইবার মার্জ্জন করিতে হয়। অনুশাসনপর্ব্বের ১০৪ তম অধ্যা ভোজনের বিস্তৃত নিয়মাবলী উক্ত হইয়াছে।

দ্রুপদের পুরীতে পাণ্ডবগণ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে পাদপীঠযুক্ত মহার্হ আসন (চেয়ার?) দেওয়া হয়। সেই আসনে বসিয়াই তাঁহার ভোজন করিয়াছিলেন। এরূপ ব্যবহার আর কোথাও চোখে পড়ে না।[৯]

পরিচ্ছদ ও প্রসাধন

বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র।—জনসমাজে তখনও নানারকমের কাপড়-চোপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল, রুচি অনুসারে নানা রংএর কাপড় ব্যবহৃত হই আচার্য্য দ্রোণ এবং কৃপ সাদা রংএর ধুতি পরিতেন। কর্ণ পীত র এবং অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধন নীল রংএর কাপড় ব্যবহার করিতেন। বির পুরীতে যুদ্ধে অর্জ্জুনের হাতে পরাস্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্য-প্রমুখ বীরগণ য জ্ঞানশূন্য অবস্থায় স্ব-স্ব-রথে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন তাঁহা পরিধেয় বস্ত্র হরণ করিবার নিমিত্ত উত্তরকে আদেশ করেন। তাঁহ প্রত্যেকের বস্ত্রের বর্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] বলদেবের কাপড় রংএর ছিল।[২]

৯ পঞ্চার্দ্রো ভোজনং ভুঞ্জ্যাৎ। শা ১৯৩।৬। অনু ১০৪।৬১-৬৬
অন্নং বুভুক্ষমাণস্তু ত্রিমু্র্খেন স্পৃশেদপঃ। ইত্যাদি। অনু ১০৪।৫৫
নৈকবস্ত্রেণ ভোক্তব্যম্। অনু ১০৪।৬৭
যদ্বেষ্টিতশিরা ভুঙ্‌ক্তে যদ্ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যদ্ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বং বিদ্যাত্তদাসুরম্॥ অনু ৯০।১৯
বাগ্যতো নৈকবস্ত্রশ্চ। ইত্যাদি। অনু ১০৪।৯৬-১০০
তে তত্র বীরা পরমাসনেষু। ইত্যাদি। আদি ১৯৪।১২

১ আচার্য্যশারদ্বতয়োস্তু শুক্লে কর্ণস্য পীতং রুচিরঞ্চ বস্ত্রম্।
দ্রৌণেশ্চ রাজ্ঞশ্চ তথৈব নীলে বস্ত্রে সমাদৎস্ব নরপ্রবীর। বি ৬৬।১৩

২ কেশবস্যাগ্রজো বাপি নীলবাসা মদোৎকটঃ। বন ১৮।১৮

ব্রাহ্মণগণের সাদা কাপড় ও মৃগচর্ম্ম—ব্রাহ্মণগণ সম্ভবতঃ সাদা কাপড় এবং সাদা যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করিতেন। দ্রোণাচার্য্যের বর্ণনাতে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র বর্ণিত আছে—ব্রাহ্মণগণ মৃগচর্ম্ম পরিধান করিতেন। কৃষ্ণ-সহ ভীম ও অর্জ্জুন জরাসন্ধপুরীতে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র শুক্লবর্ণের ছিল, জরাসন্ধ তাঁহাদের বেশভূষা দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন।[৩]

শুক্ল বস্ত্রের শুচিতা—শুক্ল বস্ত্রকে অপেক্ষাকৃত শুচি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত।[৪]

রাজাদের প্রাবার-ব্যবহার—রাজারা প্রাবার-নামে একপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ দুর্য্যোধনের শারীরিক দুরবস্থা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছেন, "তুমি প্রাবার পরিধান করিতেছ, এবং পোলাও খাইতেছ, তবে কেন দিন দিন তোমাকে এত কৃশ দেখিতেছি"?[৫]

কার্য্যবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রের ব্যবহার—সকল সময় একই রকমের বস্ত্র ব্যবহার করিবার নিয়ম ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন কাজের সময় ভিন্ন ভিন্ন রকমের বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা হইত। অন্যের ব্যবহৃত এবং যাহাতে দশা (প্রান্তভাগে বদ্ধিত সূতা) নাই, তেমন বস্ত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। শয়নের সময়, চলাফেরার সময় এবং দেবতার পূজা-অর্চ্চায় বিভিন্ন রকমের কাপড় ব্যবহারের বিধান দেখা যায়।[৬]

যুদ্ধে রক্ত-বস্ত্র—যুদ্ধের সময় বীরগণ রক্ত-বস্ত্র পরিধান করিতেন।[৭] লাল রংএরও একটা উন্মাদনা আছে, এই কারণেই বোধ করি এরূপ নিয়ম ছিল।

৩ ততঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লযজ্ঞোপবীতবান্। আদি ১৩৪।১৯
ব্রাহ্মণৈস্তু প্রতিচ্ছন্নৌ রৌরবাজিনবাসিভিঃ। আদি ১৯০।৪১
এবং বিরাগবসনা বহির্মাল্যানুলেপনাঃ।
সত্যং বদত কে যূয়ং সত্যং রাজসু শোভতে॥ সভা ২১।৪৪

৪ শুক্লবাসাঃ শুচির্ভূত্বা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ॥ অনু ১২৭।১৪

৫ আচ্ছাদয়সি প্রাবারানশ্নাসি পিশিতৌদনম্।
আজানেয়া বহন্তি ত্বাং কেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ সভা ৪৯।৯। বন ৩।৫১

৬ স্নাতস্য বর্ণকং নিত্যমার্দ্রং দদ্যাদ্বিশাম্পতে।
বিপর্য্যয়ং ন কুর্ব্বীত বাসসো বুদ্ধিমান্নরঃ। ইত্যাদি। অনু ১০৪।৮৫-৮৭

৭ রক্তাম্বরধরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে রক্তবিভূষণাঃ। দ্রো ৩৩।১৫

দেশভেদে বস্ত্রভেদ—দেশভেদেও পোশাকপরিচ্ছদের পার্থক্য ছিল। রাজসূয়যজ্ঞে সিংহল হইতে সমাগত ব্যক্তিদের পরিধানে মণিখচিত বস্ত্র ছিল।[৮] পার্ব্বত্য কিরাতগণ পশুর চামড়া দিয়া লজ্জা নিবারণ করিত।[৯]

রাক্ষসদের বস্ত্রপরিধান—রাক্ষসগণও কাপড়-চোপড় পরিত এবং গন্ধমাল্য প্রভৃতির ব্যবহার জানিত।[১০]

উষ্ণীষ—ভারতের সকল দেশেই উষ্ণীষ ব্যবহারের প্রথা ছিল কি না, ঠিক বুঝা না গেলেও এই বিষয়ে দুই-চারিটি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, সর্ব্বত্রই উষ্ণীষের ব্যবহার ছিল। কারণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের মাথায়ও উষ্ণীষ দেখিতে পাই।[১১]

পুরুষদের অঙ্গদাদি অলঙ্কার-ব্যবহার—অঙ্গদ, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কারের ব্যবহার পুরুষদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সেই সময় দেশে সোনার অভাব ছিল না, সমস্ত অলঙ্কারই ছিল সোনার। উদাহরণ হইতে বুঝা যায়, কেবল ধনীরাই অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন, সাধারণ লোকের বর্ণনায় অলঙ্কারের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১২]

রাজাদের মুকুটে মণি, গলায় নিষ্কনির্ম্মিত হার—নৃপতিগণ মুকুটে মণি ব্যবহার করিতেন, গলায় হার পরিতেন, সেই হার তাৎকালিক স্বর্ণমুদ্রা (নিষ্ক) দ্বারা প্রস্তুত হইত। প্রব্রজ্যাগ্রহণের সময় পাণ্ডু তাঁহার অলঙ্কারগুলি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই আমরা উল্লিখিত অলঙ্কার সমূহের কথা জানিতে পারি।[১৩]

---

৮ শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্।
সংবৃতা মণিচীরৈস্তু শ্যামাস্তাম্রান্তলোচনাঃ॥ সভা ৫২।৩৬

৯ ফলমূলাশনা যে চ কিরাতাশ্চর্ম্মবাসসঃ। সভা ৫২।৯

১০ সর্ব্বাভরণসংযুক্তং সুসূক্ষ্মাম্বরবাসসম্। আদি ১৫৩।১৪

১১ শ্বেতোষ্ণীষং শ্বেতহয়ং শ্বেতবর্ম্মাণমচ্যুতং।
অপশ্যাম মহারাজ ভীষ্মং চন্দ্রমিবোদিতম্॥ ভী ১৬।২২। উ ১৫২।১৯
শিরসস্তস্য বিভ্রষ্টং পপাত চ বরাংশুকম্।
নালতাড়নবিভ্রষ্টং পলাশং নলিনাদিব॥ দ্রো ২৮।৪৯

১২ বাহূন্ পরিঘসঙ্কাশান্ সংস্পৃশন্তঃ শনৈঃ শনৈঃ।
কাঞ্চনাঙ্গদদীপ্তাংশ্চ চন্দনাগুরুভূষিতান্॥ উ ১৫২।১৮

১৩ ততশ্চূড়ামণিং নিষ্কমঙ্গদে কুণ্ডলানি চ
বাসাংসি চ মহার্হাণি স্ত্রীণামাভরণানি চ॥ আদি ১১৯।৩৮

সোনার শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি—যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহের বর্ণনা হইতেও এই-সকল অলঙ্কারের বিষয় জানিতে পারা যায়। যোদ্ধৃগণ কাঞ্চনের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন, অঙ্গদ এবং কুণ্ডল তখনকার সময়ে অতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার ছিল। অলঙ্কারের বর্ণনাপ্রসঙ্গে অঙ্গদ ও কুণ্ডলের কথাই প্রথমতঃ বলা হইয়াছে।[১৪]

পুরুষদের মাথায় লম্বা চুল, বেণী প্রভৃতি—পুরুষদের চুলের নানা-রকম চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ লম্বা চুল ধারণ করিতেন, আবার কেহ কেহ বেণী পাকাইতেন। দুর্য্যোধনের মাথায় লম্বা চুল ছিল।[১৫] অর্জ্জুনের মাথায় বেণী ছিল।[১৬] কোন কোন পার্ব্বত্য জাতির মধ্যেও দীর্ঘ বেণী রাখার নিয়ম ছিল।[১৭] সাধারণতঃ লম্বা চুল রাখার প্রথাই বেশী ছিল। রণভূমিতে লুণ্ঠিত মস্তকের বর্ণনায় বুঝা যায়, সেই কালে অনেকেই লম্বা চুল রাখিতেন।[১৮] বিরাটপর্ব্বে ভীমসেন ও কীচকের যুদ্ধের বর্ণনায় উল্লিখিত আছে, ভীম কীচকের চুল আকর্ষণ করিয়াছিলেন। একটু লম্বা না হইলে চুলে ধরা সম্ভবপর হইত না।[১৯] জরাসন্ধের মাথায়ও লম্বা চুল ছিল।[২০]

শৃঙ্গের আকারে কেশবিন্যাস—কেহ কেহ শৃঙ্গের আকারে কেশবিন্যাস করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা আর্য্য ছিলেন না, যেহেতু যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশের অধিকার পান নাই।[২১]

---

১৪ অনুকর্ষৈঃ পতাকাভিঃ শিরস্ত্রাণৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ।
বাহুভিশ্চন্দনাদিগ্ধৈঃ সাঙ্গদৈশ্চ বিশাম্পতে। দ্রো ১১১।১৪
শশাঙ্কসন্নিকাশৈশ্চ বদনৈশ্চারুকুণ্ডলৈঃ। দ্রো ১১১।১৬
শূরৈঃ পরিবৃতং যোধৈঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিভিঃ। বি ৩১।৬

১৫ যময়ন্ মূর্দ্ধজাংস্তত্র বীক্ষা চৈব দিশো দশ। ইত্যাদি। শল্য ৬৪।৪,৫

১৬ বিমুচ্য বেণীমপিনহ্য কুণ্ডলে। বি ১১।৫। বি ২।২৭

১৭ খশা একাসনা হ্যর্হাঃ প্রদরা দীর্ঘবেণবঃ। সভা ৫২।৩

১৮ কৃত্তকেশমলঙ্কৃতম্। বি ৩২।১২। কেশপক্ষে পরামৃশং। দ্রো ১৩।৫৯
তমাগলিতকেশান্তং দদৃশুঃ সর্ব্বপার্থিবাঃ॥ দ্রো ১৩।৬১

১৯ ততো জগ্রাহ কেশেষু মাল্যবৎসু মহাবলঃ। বি ২২।৫২

২০ কেশান্ সমনুগৃহ্য চ। সভা ২৩।৬

২১ শকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ রোমশাঃ শৃঙ্গিণো নরাঃ। ইত্যাদি। সভা ৫১।৩০

কাকপক্ষ—কৃষ্ণের এবং অভিমন্যুর মাথায় কাকপক্ষ ছিল। প্রাচীনকালে কেহ কেহ মাথায় পাঁচটি শিখা রাখিতেন, তাহারই নাম ছিল কাকপক্ষ। কোন কোন আভিধানিকের মতে কাকপক্ষ শব্দের অর্থ জুল্‌ফি।[২২] জুল্‌ফি অর্থই সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

ব্যাস ও দ্রোণাচার্য্যের শ্মশ্রু—বেদব্যাস ও দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত অন্য কোন গৃহীর শ্মশ্রুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।[২৩]

ব্রহ্মচারীর পোশাক—গৃহীদের পোশাকের সহিত ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসিগণের পোশাকের মিল ছিল না। ব্রহ্মচারিগণ সব সময় হাতে একটি দণ্ড রাখিতেন। দণ্ডটি পলাশ অথবা বিল্বকাষ্ঠের দ্বারা প্রস্তুত হইত। মুঞ্জ (তৃণ) নির্ম্মিত মেখলা, যজ্ঞোপবীত এবং জটা ধারণকরাও তাঁহাদের কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হইত।[২৪]

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণের পরিচ্ছদাদি—বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ চর্ম্ম ও বল্কল ধারণ করিতেন। অনেকেই কেশ ও শ্মশ্রু রাখিতেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং বিদুর বানপ্রস্থাশ্রমে চর্ম্ম ও বল্কলই পরিধান করিয়াছেন। মহাপ্রস্থানের সময় যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাই এবং দ্রৌপদী বল্কলাজিন ব্যবহার করিয়াছেন। পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া অরণ্যযাত্রাকালেও তাঁহাদের একই রকমের পরিচ্ছদ দৃষ্ট হয়।[২৫]

যজ্ঞে যজমানের পরিচ্ছদ—যজ্ঞে যজমানের পোশাকও অনেকটা ব্রহ্মচারীদের মত। অলঙ্কার-ব্যবহারে বাধা ছিল না, অশ্বমেধযজ্ঞে

---

২২ পূর্ণচন্দ্রাভবদনং কাকপক্ষবৃতাক্ষিকম্। দ্রো ৫৮।১৭। হরি, বিষ্ণুপ ৬৮তম অঃ।

২৩ বভ্রূনি চৈব শ্মশ্রূণি দৃষ্ট্বা দেবী ন্যমীলয়ৎ। আদি ১০৬।৫

শুক্লকেশঃ সিতশ্মশ্রুঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ। আদি ১৩৪।১৯

২৪ ধারয়ীত সদা দণ্ডং বৈল্বং পালাশমেব বা। অশ্ব ৪৬।৪

মেখলা চ ভবেৎ মৌঞ্জী জটী নিত্যোদকস্তথা।

যজ্ঞোপবীতী স্বাধ্যায়ী অলুব্ধো নিয়তব্রতঃ॥ অশ্ব ৪৬।৬

২৫ চর্ম্মবল্কলসংবাসী। অশ্ব ৪৬।৮

দান্তো মৈত্রঃ ক্ষমাযুক্তঃ কেশান্ শ্মশ্রু চ ধারয়ন্। অশ্ব ৪৬।১৫

তথৈব দেবী গান্ধারী বল্কলাজিনধারিণী।

কুন্ত্যা সহ মহারাজ সমানব্রতচারিণী॥ ইত্যাদি। আশ্র ১৯।১৫-১৮

উৎসৃজ্যাভরণান্যঙ্গাজ্জগৃহে বল্কলান্যুত। ইত্যাদি। মহাপ্র ১।২০। সভা ৭৭।১০

দীক্ষিত যুধিষ্ঠিরের পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাই বুঝিতে পারি। যুধিষ্ঠিরের গলায় স্বর্ণমাল্য, পরিধানে ক্ষৌমবস্ত্র ও কৃষ্ণাজিন, হাতে দণ্ড।[২৬]

মহিলাদের পোশাকপরিচ্ছদ—স্ত্রীলোকের পোশাকপরিচ্ছদ বিষয়ে বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত। অনেকস্থলেই শুধু 'সপরিচ্ছদ' এই বিশেষণ ব্যতীত আর কোন কিছু বলা হয় নাই।[২৭]

বিবাহের বস্ত্র—বিবাহের সময় দ্রৌপদী ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন।[২৮] সুভদ্রা রক্তবর্ণের কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন।[২৯]

স্বর্ণমাল্য প্রভৃতি অলঙ্কার—সুবর্ণমাল্য, কুণ্ডল, মণিরত্ন, নিষ্ক (তাৎকালিক প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা), কম্বু (শঙ্খ), কেয়ূর (বাহুভূষণ) প্রভৃতি তখনকার দিনে অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইত। নিষ্ক হারের মত কণ্ঠের অলঙ্করণে প্রযুক্ত হইত। শাঁখা সম্ভবতঃ হাতেরই শোভাবর্দ্ধন করিত।[৩০]

স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে কুণ্ডলের ব্যবহার—পুরুষেরাও কুণ্ডল পরিতেন, সচরাচর সোনা দিয়াই কুণ্ডল প্রস্তুত হইত। রাজা সৌদাসের পত্নী মদয়ন্তীর কুণ্ডলটি রত্ননির্ম্মিত ছিল।[৩১]

ভ্রূ-মধ্যে কৃত্রিম চিহ্ন—ভ্রূ-যুগলের মধ্যে একপ্রকার কৃত্রিম চিহ্ন দেওয়া হইত, তাহার নাম ছিল 'পিপ্লু'। দময়ন্তীর ভ্রূ-মধ্যে ঐ চিহ্নটি ছিল সহজাত। এই চিহ্নকেও সৌন্দর্য্যের বর্দ্ধক অলঙ্কারের মত মনে করা হইত।[৩২]

২৬ হেমমালী রুক্মকণ্ঠঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ।
কৃষ্ণাজিনী দণ্ডপাণিঃ ক্ষৌমবাসাঃ স ধর্ম্মজঃ॥ অশ্ব ৭৩.৫

২৭ স্ত্রিয়শ্চ রাজ্ঞঃ সর্ব্বাস্তাঃ সপ্রেষ্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ। আদি ১৩৪।১৫ আদি ১৫৩।১৪; বি ৭২।৩১

২৮ কৃষ্ণা চ ক্ষৌমসংবীতা কৃতকৌতুকমঙ্গলা। আদি ১১৯।৩

২৯ সুভদ্রাং ত্বরমাণশ্চ রক্তকৌশেয়বাসিনীম্। আদি ২২১।১৯

৩০ শতং দাসীসহস্রাণি কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
কম্বুকেয়ূরধারিণ্যো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। ইত্যাদি। বন ২৩২।৪৬,৪৭
সুবর্ণমালাং বাসাংসি কুণ্ডলে পরিহাটকে।
নানাপত্তনজে শুভ্রে মণিরত্নে চ শোভনে॥ ইত্যাদি। আদি ৭৩।২,৩

৩১ শ্রুত্বা চ সা তদা প্রাদাত্ততস্তে মণিকুণ্ডলে। অশ্ব ৫৮।৩

৩২ অস্যা হ্যেষ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে সহজঃ পিপ্লুরুত্তমঃ। বন ৬৯।৫
চিহ্নভূতো বিভূত্যর্থময়ং ধাত্রা বিনির্ম্মিতঃ। বন ৬৯।৭

ছাতা ও জুতা—ছাতা ও জুতার ব্যবহারও ব্যাপকভাবেই ছিল, শুধু অভিজাত পরিবারেই তাহা সীমাবদ্ধ ছিল না, যেহেতু স্নাতক এবং ব্রাহ্মণকে সেইগুলি দান করিবার কথাও বলা হইয়াছে।[৩৩]

চন্দন—প্রসাধনরূপে যে-সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইত, সেইগুলির মধ্যে চন্দনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই শরীরে চন্দন লেপন করিতেন। চন্দনের সঙ্গে একটু অগুরুও মিশাইয়া দেওয়া হইত। ধনিপরিবারে দাসীরা চন্দন প্রস্তুত করিতেন। বিরাটরাজার অন্তঃপুরে দ্রৌপদী এই কাজেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৩৪]

চন্দন, মাল্য প্রভৃতি—বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনায় চন্দন, মাল্য প্রভৃতি দিবার নিয়ম ছিল। বীরশয্যায় শায়িত বীর ভীষ্মকে কুমারীগণ চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন।[৩৫]

তুঙ্গ ও কৃষ্ণাগুরু—'তুঙ্গ'-নামে এক প্রকার গন্ধদ্রব্য ও কৃষ্ণাগুরু চন্দনের সঙ্গে মিশাইবার প্রথা ছিল। অনুলেপনের কাজে শ্বেত চন্দনই ব্যবহার করা হইত। কেবল কৃষ্ণাগুরু লেপন করার উদাহরণও দেখিতে পাওয়া যায়।[৩৬]

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সমাগত রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ প্রভূত গন্ধদ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারে ভারে চন্দন, কালীয় (কৃষ্ণাগুরু) এবং অন্যান্য গন্ধদ্রব্যের আমদানি করিয়াছিলেন। মলয়

৩৩ দত্তমানায় বিপ্রায় যঃ প্রযচ্ছত্যুপানহৌ।
স্নাতকায় মহাবাহো সংশিতায় দ্বিজাতয়ে॥ অনু ৯৬।২০
ন কেবলং শ্রাদ্ধকৃত্যে পুণ্যকেষপি দীয়তে। অনু ৯৫।২

৩৪ শালস্তম্ভনিভাস্তেষাং চন্দনাগুরুরূষিতাঃ।
অশোভন্ত মহারাজ বাহবো বাহুশালিনাম্। ইত্যাদি। সভা ২১।২৮। সভা ১৮।৩৫
ন যা জাতু স্বয়ং পিংষে গাত্রোদ্বর্ত্তনমাত্মনঃ।
অন্যত্র কুন্ত্যা ভদ্রন্তে সা পিনষ্ম্যদ্য চন্দনম্॥ বি ২০।২৩

৩৫ কন্যাশ্চন্দনচূর্ণৈশ্চ লাজৈর্মাল্যৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
অবাকিরঞ্ছান্তনবং তত্র গত্বা সহস্রশঃ। ভী ১২১।৩

৩৬ চন্দনেন চ শুক্লেন সর্ব্বতঃ সমলেপয়ন্।
কালাগুরুবিমিশ্রেণ তথা তুঙ্গরসেন চ॥ আদি ১২৭।২০
রাজসিংহান্ মহাভাগান্ কৃষ্ণাগুরুবিভূষিতান্। আদি ১৮৫।২৪

দর্দ্দুর-পর্ব্বত হইতে প্রচুর চন্দন ও অগুরু উপায়নস্বরূপ আনীত হয়। চন্দনরসে পরিপূর্ণ অসংখ্য সোনার কলস যুধিষ্ঠিরকে দেওয়া হইয়াছিল।[৩৭]

ইঙ্গুদ ও এরণ্ড-তৈল—স্নানের পূর্ব্বে শরীরে ইঙ্গুদ ও এরণ্ড-তৈল মাখিবার কথাও পাওয়া যায়। গৃহীদের পক্ষে যেন এই নিয়ম ছিল না।[৩৮]

পিষ্ট রাইসরিষা—গৃহস্থগণ স্নানের পূর্ব্বে শরীরে বাঁটা রাইসরিষা মাখিতেন।

স্নানান্তে পুষ্পাদি ধারণ—স্নানের পর চন্দন, বেলফুল, তগর, নাগকেসর, বকুল প্রভৃতি গন্ধ এবং পুষ্পে সজ্জিত হইবার নিয়ম ছিল।[৩৯]

পুষ্পমাল্য—মাথায় এবং গলায় মাল্য ধারণ করা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। পুষ্পমাল্যই সমধিক আদৃত হইত। রক্তমাল্য গলে ধারণ করা নিষিদ্ধ; শুক্ল মাল্যই প্রশস্ত। রক্তমাল্য মাথায় ধারণ করা যাইতে পারে। পদ্ম বা কুবলয়ের (কুমুদ) মালা পরিতে নিষেধ করা হইয়াছে।[৪০]

পুষ্পপ্রীতি—পুষ্পপ্রীতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রসাধনে পুষ্পই অনুপম উপকরণ। মনকে আনন্দিত করে, শরীর ও মনে শ্রীসঞ্চার করে, এই কারণে পুষ্পকে 'সুমনস্' বলা হয়।[৪১] যে পুষ্প হৃদয়ে পুলক সঞ্চার করে, বিমর্দ্দনে যাহা হইতে মধুর সৌরভ প্রসৃত হয়, যাহার রূপ মন হরণ করে, তেমন পুষ্পই মনুষ্যসমাজে পরম আদরের বস্তু।[৪২] সমস্ত শুভ কর্ম্মেই পুষ্পকে বিশেষ উপকরণরূপে ধরা হইত, বিশেষতঃ বিবাহাদিতে পুষ্পের যথেষ্ট আদর ছিল।[৪৩]

---

৩৭ চন্দনাগুরুকাষ্ঠানাং ভারান কালীয়কস্য চ।
চর্ম্মরত্নসুবর্ণানাং গন্ধানাঞ্চৈব রাশয়ঃ। সভা ৫২।১০
সুরভীংশ্চন্দনরসান্ হেমকুম্ভসমাস্থিতান্। ইত্যাদি। সভা ৫২।৩৩,৩৪

৩৮ ইঙ্গুদৈরণ্ডতৈলানাং স্নেহার্থে চ নিষেবনম্। অনু ১৪২।৭

৩৯ প্রিয়ঙ্গুচন্দনাভ্যাঞ্চ বিল্বেন তগরেণ চ।
পৃথগেবানুলিম্পেত কেসরেণ চ বুদ্ধিমান্॥ ইত্যাদি। অনু ১০৪।৮৭,৮৮

৪০ রক্তমাল্যং ন ধার্য্যং স্যাচ্ছুক্লং ধার্য্যং তু পণ্ডিতৈঃ।
বর্জ্জয়িত্বা তু কমলং তথা কুবলয়ং প্রভো॥ ইত্যাদি। অনু ১০৪।৮৩,৮৪

৪১ মনো হ্লাদয়তে যস্মাচ্ছ্রিয়ং চাপি দধাতি চ।
তস্মাৎ সুমনসঃ প্রোক্তা নরৈঃ সুকৃতকর্ম্মভিঃ॥ অনু ৯৮।২০

৪২ মনোহৃদয়নন্দিন্যো বিমর্দ্দে মধুরাশ্চ যাঃ।
চারুরূপাঃ সুমনসো মনুষ্যাণাং স্মৃতা বিভো॥ অনু ৯৮।৩২

৪৩ সন্নয়েৎ পুষ্টিযুক্তেষু বিবাহেষু রহঃসু চ॥ অনু ৯৮।৩৩

কেশবিন্যাস ও অঞ্জনলেপন—দিনের প্রথম ভাগে কেশপ্রসাধন ও অঞ্জনলেপন করিবার বিধান।[৪৪]

বিধবাদের নিরাভরণতা—বিধবাদের কোনও ভূষণ থাকিত না। শুক্ল বস্ত্র এবং শুক্ল উত্তরীয়মাত্র তাঁহারা পরিধান করিতেন। আশ্রমবাসিকপর্ব্বে বিধবাদের বর্ণনায় তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।[৪৫]

সদাচার

সদাচার শব্দের অর্থ—আচরণের দ্বারাই সাধু পুরুষ সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। যাঁহাদিগকে সাধু এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বসাধারণ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আচারই 'সদাচার' নামে অভিহিত হইয়াছে। সাধুগণ ধর্ম্মবুদ্ধিতে যে আচরণ করেন, সেই আচরণই 'সদাচার'। তাঁহাদের সকল আচরণই যে সাধু হইবে, তাহা নহে। মানুষমাত্রেরই ভুলত্রুটি থাকে, সুতরাং সকল আচরণই সদাচাররূপে গ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রবিহিত অনিন্দিত আচারই সদাচার। শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া যথারুচি ব্যবহার করিলে সেই ব্যবহারকে সদাচার বলা যায় না।[১]

আচার-পালনের ফল—আচার-পালনে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়, আচারের দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে শ্রী ও কীর্ত্তি লাভ করে; দুরাচার পুরুষ দুঃখী ও অল্পায়ু হয়। সুতরাং উন্নতিকাম পুরুষ সর্ব্বদা আচার পালনে যত্নবান্ হইবেন। যে ব্যক্তি আর্ষ (ঋষিপ্রোক্ত) বিধিনিষেধ অনুসারে চলেন না,

৪৪ প্রসাধনঞ্চ কেশানামঞ্জনং দন্তধাবনম্।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ পূজনম্॥ অনু ১০৪।২৩

৪৫ এতাস্তু সীমন্তশিরোরুহা যাঃ শুক্লোত্তরীয়া নররাজপত্ন্যঃ।
রাজ্ঞোঽস্য বৃদ্ধস্য পরং শতাখ্যাঃ স্নুষা নৃবীরা হতপুত্রনাথাঃ। আশ্র ২৫।১৬

১ সাধূনাঞ্চ যথাবৃত্তমেতদাচারলক্ষণম্। অনু ১০৪।৯
দুরাচারাশ্চ দুর্দ্ধর্ষা দুর্ম্মুখাশ্চাপ্যসাধবঃ।
সাধবঃ শীলসম্পন্নাঃ শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্॥ অনু ১৬২।৩৪
প্রমাণমপ্রমাণং বৈ যঃ কুর্য্যাদবুধো জনঃ।
ন স প্রমাণতামর্হেদ্ বিবাদজননো হি সঃ॥ অনু ১৬২।২৫

অথচ শিষ্টাচারকেও উপেক্ষা করেন, ইহলোক ও পরলোক উভয়লোক হইতেই তিনি ভ্রষ্ট, কোথাও তাঁহার কল্যাণ নাই।[১]

সকল কাজে সাধু পুরুষদের অনুসরণ করিবার নিমিত্ত মহাভারতে অসংখ্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি সদাচারের উল্লেখও করা হইয়াছে। প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তি ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিবেন। তারপর যথাবিধি শৌচাদি সমাপনান্তে উপাসনা করিবেন। দন্তধাবন, প্রসাধন এবং অঞ্জন লেপন পূর্ব্বাহ্ণেই করা উচিত, দেবতাদের অর্চ্চনাদিও পূর্ব্বাহ্ণেই করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ এবং অতিথির সেবা অবশ্যকর্ত্তব্য।[২] এইরূপে আনুষ্ঠানিক প্রায় সমস্ত বিধিনিষেধই অনুশাসনপর্ব্বের ১০৪তম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাসুদেব-উগ্রসেন-সংবাদে অনেকগুলি সদাচারের উল্লেখ দেখা যায়। "কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি মানুষের পরম শত্রু, ইহাদিগকে সংযত রাখিবে। যথাযোগ্য শ্রম এবং অবধানতার সহিত সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিবে, কাহারও ঐশ্বর্য্যে কাতর হইতে নাই। দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে—ইত্যাদি"।[৩]

সদাচার-প্রকরণ—দ্বিজব্যাধ-সংবাদ (বন ২০৫তম—২০৮ তম অঃ) যক্ষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ (বন ৩১২তম অঃ), শ্রীবাসব-সংবাদ (শা ২২৮তম অঃ) এবং দুর্গাতিতরণাধ্যায়ে (শা ১১০তম অঃ) সদাচার বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে। 'চতুরাশ্রম' প্রবন্ধের 'গৃহস্থ'-প্রকরণে যে-সকল আচারের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি সদাচার নামে অভিহিত। যে আচারে মানুষ কল্যাণ লাভ করিতে পারে, সেই আচারই প্রকৃতপক্ষে সদাচার। মহাভারতে বহু উপাখ্যানের মধ্য দিয়াও সদাচারই প্রদর্শিত হইয়াছে।[৪]

অন্তঃশুদ্ধি—সদাচার পালন করিতে বাহ্যিক শুচিতা রক্ষা করিতে হয়।

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাল্লভতে শ্রিয়ম্।
আচারাৎ কীর্ত্তিং লভতে পুরুষঃ প্রেত্য চেহ চ॥ ইত্যাদি। অনু ১০৪.৬-১৩
অনু ১০৪।১৫৫-১৫৭
যস্য নার্ষং প্রমাণং স্যাচ্ছিষ্টাচারশ্চ ভাবিনি।
নৈব তস্য পরো লোকো নায়মস্তীতি নিশ্চয়ঃ॥ বন ৩১।২২
আচারো হ্যলক্ষণম্। উ ৩৯।৪৪
শা ২৩০ তম অঃ।
যৎ কল্যাণমভিধায়েত্তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ। শা ৯৪।১০

বাহিরের শুচিতা অপেক্ষা অন্তরের শুচিতার মূল্য অনেক বেশী। মান: তীর্থের স্নানই প্রকৃত স্নান। চরিত্র বিশুদ্ধ না হইলে শুধু বাহিরের আচা: ভণ্ডামিতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।[৫]

আর্য্য ও অনার্য্য—যাঁহারা বেদাদিশাস্ত্রবিহিত সাধু আচারের অনুসর করিতেন, তাঁহাদিগকে 'আর্য্য' বলা হইত, আর যাঁহারা বিপরীত আচর করিতেন, তাঁহাদের সংজ্ঞাই 'অনার্য্য'। সদাচার ও অসদাচারের দ্বারা আর্য এবং অনার্য্য স্থির করা হইত।[৬] আজকাল আর্য্য ও অনার্য্য শব্দ সে: অর্থে প্রযুক্ত হয় না। ইংরেজী 'এরিয়ান্' ও 'নন্-এরিয়ান্' শব্দের অনুবাদ রূপে আর্য্য ও অনার্য্য শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

পারিবারিক ব্যবহার

প্রত্যেক গৃহস্থকেই মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্রাদি পরিজনে পরিবেষ্টিত হই থাকিতে হয়। সমস্ত প্রাণিজগতের সহিত প্রত্যেকের যোগ আছে এব অপরের জীবনযাত্রার নিমিত্ত প্রত্যেকের দায়িত্বও কম নয়, এই কথা সত হইলেও সকল মানব এই অনুভূতির সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য দুই চারি জীবনে লাভ করিতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক গৃহস্থই আপন পরিবারের মধ্যে আপনাকে অনেকটা দান করিবার সুযোগ পান। পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি গৃহস্থের যে কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব রহিয়াছে, যথোচিতরূপে তাহা পালন করিতে পারিলে অন্তঃকরণ ক্রমশঃ প্রসারিত হইবার সুযোগ পায়। মহাভারতে আশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্য চিন্তা করিলেও এই সত্যই প্রথমতঃ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। মহাভারতের মতে গৃহস্থের দায়িত্বই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অপরের সুখের নিমিত্ত আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয় বলিয়া সুগৃহস্থই সকল আশ্রমীদের মধ্যে বড় ত্যাগী।

৫ অগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতোয়ে ধৃতিহ্রদে।
স্নাতব্যং মানসে তীর্থে সত্ত্বমালম্ব্য শাশ্বতম্। ইত্যাদি। অনু ১০৮।৩-৯

৬ বৃত্তেন হি ভবত্যার্য্যো ন ধনেন ন বিদ্যয়া। উ ৯০।৫৩। বন ২৬০।১
অনার্য্যত্বমনাচারঃ। অনু ৪৮।৪১। সভা ৬৭।৩৭, ৫০। সভা ৫৪।৬
যদার্য্যজননিন্দিতং কর্ম্ম তন্নাচরেদ্‌বুধঃ শা ৯৪।১০। শা ৯৩।১৬

পিতা ও মাতা—গুরুজন সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[১] গুরুজনের মধ্যে মাতাপিতাকে মহাগুরু বলা হয়। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে মহাগুরুর প্রীতি উৎপাদন করা মানুষমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। যে পুত্র মাতাপিতার আদেশ-পালনে তৎপর, তাহাকেই যথার্থ পুত্র বলা যাইতে পারে।[২] মাতাপিতা প্রত্যক্ষ দেবতা। দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া এবং অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও মাতা সন্তানকে পালন করেন। তপস্যা, দেবতাপূজা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্যের ফলে জনকজননী সন্তান লাভ করেন। পুত্র ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ এবং যশস্বী হইলেই মাতাপিতা আনন্দিত হন। যাহারা মাতাপিতার আশা পূর্ণ করে, তাহাদের ঐহিক এবং পারত্রিক অশেষ কল্যাণ হইয়া থাকে। সুতরাং কায়মনোবাক্যে মাতাপিতার সেবা করা অবশ্যকর্ত্তব্য।[৩]

পিতা ও মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে মতভেদ—মাতাপিতার মধ্যে সন্তানের নিকট কাহার গুরুত্ব বেশী, এই বিষয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, গর্ভধারণ এবং প্রতিপালনে মাতারই সমধিক কষ্ট হইয়া থাকে, এই কারণে পিতা অপেক্ষা মাতার গুরুত্বই বেশী। অন্য পক্ষে বলা হয় যে, পিতা তপস্যা, দেবপূজা, তিতিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা সৎপুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, পুত্রের সংস্কারাদি কর্ম্মও পিতারই অধীন। অতএব পিতার গুরুত্বই বেশী। মতভেদের আলোচনায় বুঝা যায়, উভয়ের গুরুত্বই সন্তানের পক্ষে সমান। সন্তানের নিকট উভয়ই তুল্যরূপে মহাগুরু।[৪]

কল্যাণ গুরুজনের সেবার অধীন—পিতা গার্হপত্য অগ্নির, মাতা দক্ষিণ অগ্নির এবং আচার্য্য আহবনীয় অগ্নির সমান। অপ্রমত্তভাবে এই অগ্নিত্রয়ের পরিচর্য্যা করিলে ইহলোক, পরলোক ও ব্রহ্মলোককে জয় করা যায়। মানবের যাবতীয় কল্যাণ গুরুসেবার অধীন, মঙ্গলেচ্ছু পুরুষ সতত ইহাদের

---

১ তীর্থানাং গুরবস্তীর্থম্। অনু ১৬২।৪৮

২ মাতাপিত্রোর্ব্বচনকৃদ্ধিতঃ পথ্যশ্চ যঃ সুতঃ। ইত্যাদি। আদি ৮৫।২৫-৩০

৩ প্রত্যক্ষেণ হি দৃশ্যন্তে দেবা বিপ্রর্ষিসত্তম। ইত্যাদি। বন ২০৪।৩,৪

৪ গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ। আদি ১৯৬।১৬

নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ। অনু ১০৬।৬৫। অনু ৬২।৯২। অনু ১০৫।১৮

পিতা পরং দৈবতং মানবানাং মাতুর্ব্বিশিষ্টং পিতরং বদন্তি। শা ২৯৭।২

মাতৃস্তু গৌরবাদন্যে পিতৄনন্যে তু মেনিরে। ইত্যাদি। বন ২০৪।১৫-১৭

তুষ্টি বিধানে অবহিত হইবেন।[৫] পিতার তুষ্টিতে প্রজাপতি তুষ্ট হন, মাতার তুষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী সন্তুষ্ট হয় এবং আচার্য্যের তৃপ্তিতে ব্রহ্মের তুষ্টিলাভ হয়।[৬] নারদ কৃষ্ণকে বলিতেছেন—যাঁহারা মাতা, পিতা এবং গুরুজনের প্রতি তোমার মত ব্যবহার করেন, তাঁহারা তোমারই মত সমস্ত কল্যাণের অধিকারী হইয়া থাকেন।[৭] যাঁহারা গুরুজনের যথোচিত পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আয়ু, যশ এবং শ্রী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।[৮]

আচার্য্যপূজা—আচার্য্যশুশ্রূষা সম্বন্ধে 'শিক্ষা'-প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইয়াছে। আচার্য্যপূজা বিষয়ে কচের একটি সুন্দর উক্তি আছে—"যিনি আমার কর্ণে অমৃত ক্ষরণ করিয়াছেন, যিনি আমার মূর্খতা অপনোদন করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি পিতা ও মাতা বলিয়াই মনে করি। যে লব্ধবিদ্য পুরুষ অমূল্য নিধিস্বরূপ ঋতের (বেদ) দাতা আচার্য্যকে পূজা না করে, সে অপ্রতিষ্ঠিত থাকে এবং পাপলোকে গমন করে"।[৯]

গুরুজনের প্রীতি-উৎপাদন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—গন্ধমাদনপর্ব্বতে মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ হইলে মহর্ষি কুশলপ্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পার্থ, মাতাপিতার আজ্ঞা যথোচিতভাবে পালন কর ত? গুরুগণ এবং বৃদ্ধ পণ্ডিতগণকে যথাযোগ্য পূজা কর কি"?[১০] পিতা, মাতা, অগ্নি, গুরু এবং আত্মা এই পাঁচজন যাঁহাদের দ্বারা পূজিত হন, তাঁহারা ইহলোক এবং পরলোক জয় করিতে পারেন।[১১] একমাত্র পুত্রের হিতকামনায় যাঁহারা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারেন, সেই স্নেহময়ী জননী এবং স্নেহময়

৫ শা ১০৮তম অঃ।

৬ যেন প্রীণাতি পিতরং তেন প্রীতঃ প্রজাপতিঃ। ইত্যাদি। শা ১০৮।২৫,২৬।

৭ মাতাপিত্রোর্গুরুষু চ সম্যগ বর্ত্তন্তি যে সদা। ইত্যাদি। অনু ৩১।৩৫

৮ গুরুমভ্যর্চ্চ্য বর্দ্ধন্তে আয়ুষা যশসা শ্রিয়া। অনু ১৬২।৪৫

৯ যঃ শ্রোত্রয়োরমৃতং নিষিঞ্চেৎ। ইত্যাদি। আদি ৭৬।৬৩,৬৪

১০ মাতাপিত্রোশ্চ তে বৃত্তিঃ কচ্চিৎ পার্থ ন সীদতি।
কচ্চিত্তে গুরবঃ সর্ব্বে বৃদ্ধা বৈদ্যাশ্চ পূজিতাঃ॥ বন ১৫৯।৬,৭

১১ পিতা মাতা তথৈবাগ্নির্গুরুরাত্মা চ পঞ্চমঃ।
যস্যৈতে পূজিতাঃ পার্থ তস্য লোকাবুভৌ জিতৌ॥ বন ১৫৯।১৪

জনককে সন্তুষ্ট রাখাই পুত্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, ইহাই পুত্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মহাপুরুষগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[১২]

গুরুজনের সেবাতে স্বর্গবাস—যিনি শুদ্ধ সমাহিত এবং যিনি সত্যে রত থাকিয়া মাতৃপিতৃপূজনে আপনাকে নিযুক্ত রাখেন, তিনি তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হন।[১৩] যিনি পিতা, মাতা, আচার্য্য এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করেন, কখনও তাঁহাদিগকে অসূয়া করেন না, তিনি ঈপ্সিত স্বর্গ লাভ করেন এবং গুরুশুশ্রূষাবশতঃ তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না।[১৪] মাতাপিতা-প্রমুখ গুরুজনের আদেশ-পালনে হিতাহিত চিন্তার অবকাশ নাই। তাঁহারা যে আদেশই করুন না কেন, নির্ব্বিচারে পালন করাই পুত্রের কাজ।[১৫]

পিতৃমাতৃভক্ত ধর্ম্মব্যাধ—আদর্শ পিতৃমাতৃসেবক ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান সকলেই জানেন। পিতৃমাতৃসেবাতেই ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত বিষয়ে তাঁহার যোগজ প্রত্যক্ষ হইত। একমাত্র সেই সেবার দ্বারাই তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী হইতে পারিয়াছিলেন।[১৬]

দেবব্রতের মৃত্যুঞ্জয়তা—সত্যব্রত ভীষ্মের পিতৃভক্তিও সর্ব্বজনবিদিত। সন্তুষ্ট পিতার আশীর্ব্বাদে তিনি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিয়াছিলেন।[১৭]

গুরুজনের ভরণপোষণ না করিলে পাপ—যাহারা মাতাপিতার ভরণপোষণ করে না, তাহারা মহাপাপী বলিয়া কথিত। যে ব্যক্তি অকারণে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করে, সে শাস্ত্রানুসারে পতিত হয়।[১৮] পিতামাতা

১২ এতদ্ধর্ম্মফলং পুত্র নরাণাং ধর্ম্মনিশ্চয়ে।
যত্তুষ্টাস্ত পিতরো মাতা চাপ্যেকদর্শিনী॥ উ ১৪৫।৭

১৩ তপঃশৌচবতা নিত্যং সত্যধর্ম্মরতেন চ।
মাতাপিত্রোরহরহঃ পূজনং কার্য্যমঞ্জসা॥ শা ১২৯।১০

১৪ মাতাপিত্রোঃ পূজনে যো ধর্ম্মস্তমপি মে শৃণু। ইত্যাদি। অনু ৭৫।৪০-৪২

১৫ মাতুঃ পিতুর্গুরূণাঞ্চ কার্য্যমেবানুশাসনম্।
হিতং বাপ্যহিতং বাপি ন বিচার্য্যং নরর্ষভ॥ অনু ১০৪।১৪৫

১৬ বন ২১৩তম ও ২১৪তম অঃ।

১৭ ন তে মৃত্যুঃ প্রভবিতা যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি। আদি ১০০।১০৩

১৮ জীবতো বৈ গুরূন্ ভৃত্যান্ ভরস্বস্ত পরে জনাঃ। অনু ৯৩।১২৮
ত্যজত্যকারণে যশ্চ পিতরং মাতরং গুরুম্। ইত্যাদি। শা ১৬৫।৬২। শা ১৫৩।৮১

যাহাতে মনে কষ্ট পান, তেমন আচরণ করা সন্তানের পক্ষে একান্ত গর্হিত। যে সন্তান পিতামাতাকে অবমাননা করে, সে মৃত্যুর পর গর্দ্দভাদি-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অশেষ ক্লেশ পাইয়া থাকে।[১৯]

প্রত্যুষে মহাগুরুপ্রণতি—শয্যা ত্যাগ করিয়াই পিতামাতা ও গুরুজনকে পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিবার বিধান।[২০]

গুরুজনের আগমনে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন—গুরুজনের আগমনে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদন করিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।[২১]

সকল কার্য্যে অনুমতিগ্রহণ—পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কিছুই করা উচিত নহে। পিতামাতার অনুমতি না লইয়া ব্রাহ্মণ কৌশিক বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত দেশান্তরে গমন করেন, পরে তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত পিতৃমাতৃভক্ত ব্যাধের নিকট আপনার অন্যায় আচরণের জন্য বিশেষ লজ্জিত হইয়া তাঁহারই উপদেশে গৃহে ফিরিয়া পিতামাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।[২২]

পিতামাতার দোষ ধরিতে নাই—কহোড়পুত্র অষ্টাবক্র মাতৃকুক্ষিতে (?) থাকিয়াই পিতার অধ্যাপনায় দোষারোপ করিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহার শরীরের আটটি স্থান বক্র হইয়া যায়। পিতামাতা-প্রমুখ গুরুজনের কাজে দোষ অন্বেষণ করা অকর্ত্তব্য, এই উদ্দেশ্যেই বোধ করি, উপাখ্যানটি বিবৃত হইয়াছে।[২৩]

তাঁহাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিলে পাপ হয়—পিতামাতাকে কোনও কার্য্যে নিযুক্ত করা পুত্রের পক্ষে অত্যন্ত পাপজনক।[২৪] আরও বহু উপাখ্যানে পিতামাতার প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিবার উপদেশ পাওয়া যায়।

মহাগুরুর তৃপ্তিতে বিশ্বের তৃপ্তি—চিরকারিকোপাখ্যানে[২৫] পিতা-

১৯ পিতরং মাতরঞ্চৈব যস্তু পুত্রোঽবমন্যতে। ইত্যাদি। অনু ১১১।৫৮-৬০

২০ মাতাপিতরমুত্থায় পূর্ব্বমেবাভিবাদয়েৎ। অনু ১০৪।৪৩

২১ ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥ উ ৩৮।১

২২ স তু গত্বা দ্বিজঃ সর্ব্বাং শুশ্রূষাং কৃতবাংস্তদা। বন ২১৫।৩৩

২৩ উপালব্ধঃ শিষ্যমধ্যে মহর্ষিঃ স তং কোপাদুদরস্থং শশাপ। বন ১৩২।১১

২৪ পুত্রশ্চ পিতরং মোহাৎ প্রেষয়িষ্যতি কর্ম্মসু। শা ২২৭।১১৩

২৫ শা ২৬৫ তম অঃ।

তার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ পাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, "পিতা নিখিল দেবতার সমষ্টি এবং মাতা বতা ও মর্ত্ত্যবাসী সর্ব্বভূতের সমষ্টিস্বরূপ। সুতরাং তাঁহাদের তুষ্টিতেই খিলের পরিতৃপ্তি।"[২৬] পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা, তা পরিতৃপ্ত হইলে সকল দেবতাই পরিতৃপ্ত হন।[২৭]

পিতৃত্রয়—জনক, ভয় হইতে ত্রাণকর্ত্তা এবং অন্নদাতা—এই তিন জনকেই তা বলিয়া ভক্তি করিতে হইবে।[২৮]

দীন পুত্রের প্রতি পিতামাতার স্নেহ বেশী—জনকজননী যদিও সকল নকেই সমান চক্ষে দেখেন, তথাপি সন্ততিদের মধ্যে যে দীন, তাহার ত তাঁহাদের স্নেহের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে।[২৯]

ভ্রাতা ও ভগিনী—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার রিবার নিয়ম। "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আনুগত্য কার করা উচিত।"

পাণ্ডবগণ ও বিদুরের আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম—ভীমসেনাদি চারি ভাই ষ্ঠিরকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন—ইহা মহাভারতের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। ও সময় সময় ভীমসেনকে যুধিষ্ঠিরের কাজের ভালমন্দ-সমালোচনা রতে দেখা যায়, তথাপি তাহাতে সাময়িক অধীরতা ছাড়া তীব্র অশ্রদ্ধা অভক্তি কখনও প্রকাশ পায় নাই। আদর্শ ক্ষত্রিয়চরিত সরলচেতাঃ মসেন সকল সময় আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারিতেন না, তাই য় সময় কিঞ্চিৎ চঞ্চলতা প্রকাশ পাইয়াছে।[৩০] কিন্তু জ্যেষ্ঠের আদেশ তীত কখনও কিছু করেন নাই। পাণ্ডবদের এবং বিদুরের আদর্শ তৃপ্রীতি মহাভারতে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভীম, অর্জ্জুন-প্রমুখ

---

[২৬] দেবতানাং সমবায়মেকস্থং পিতরং বিদুঃ।
মর্ত্ত্যানাং দেবতানাঞ্চ স্নেহাদভ্যেতি মাতরম্। শা ২৬৫।৪৩

[২৭] পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে সর্ব্বাঃ প্রীয়ন্তি দেবতাঃ। শা ২৬৫।২১

[২৮] যশ্চৈনমুৎপাদয়তে যশ্চৈনং ত্রায়তে ভয়াৎ।
যশ্চাস্য কুরুতে বৃত্তিং সর্ব্বে তে পিতরস্ত্রয়ঃ॥ অনু ৬৯।১৮

[২৯] দীনস্য তু সতঃ শক্র পুত্রস্যাভ্যধিকা কৃপা। বন ৯।১৬

[৩০] সভা ৬৮ তম অঃ। বন ৩৩ শ ও ৩৪ শ অঃ। শা ১০ ম অঃ।

বীরগণ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং অমিতবলশালী হইয়াও সর্ব্বদা অগ্রজের অনুবর্ত্ত করিতেন। তাঁহারা যদি জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তন না করিতেন, তবে কপটচারী শকুনির পাশাখেলার সময়েই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইত। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে বাস করাও শ্রেয়ঃ মনে করেন নাই।[৩১]

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের আচরণ—অনুশাসনপর্ব্বে ভীষ্মযুধিষ্ঠির-সংবাদে একটি অধ্যায়ের নাম 'জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ-বৃত্তি'। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে একের প্রতি অন্যের ব্যবহার কিরূপ হইবে, এই অধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, "হে তাত, তুমি ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, সুতরাং আপনার জ্যেষ্ঠত্ব স্মরণ করিয়া এমনভাবে কনিষ্ঠদের সহিত ব্যবহার করিবে, তাহারা যেন তোমাকে গুরুর মত সম্মান করিতে পারে। অকৃতপ্রজ্ঞ গুরুকে শিষ্য সম্মান করিতে পারে না, গুরুর দীর্ঘদর্শিতা থাকা প্রয়োজন, তাহা না থাকিলে শিষ্য কিরূপে দীর্ঘদর্শী হইবে? জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ হইলেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সময়বিশেষে কনিষ্ঠের দোষ দেখিয়া অন্ধের মত এবং জড়ের মত ব্যবহার করিবেন। সাধারণ বিষয়ে যদি সর্ব্বদা কনিষ্ঠের দোষ প্রদর্শন করা হয়, তবে কনিষ্ঠের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। কনিষ্ঠের দোষ দেখিলে কৌশলে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে। যদি সর্ব্বসমক্ষে কনিষ্ঠকে দোষের জন্য তিরস্কার করা হয়, তবে ছিদ্রান্বেষী পরশ্রীকাতর শত্রুপক্ষ কনিষ্ঠকে কুমন্ত্রণা দিয়া আপনার দলে ভর্ত্তি করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। বংশের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সুব্যবহারে কুল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে, আবার তাঁহারই অসৎ আচরণে বংশের গৌরব নষ্ট হয়। যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, তিনি জ্যেষ্ঠ-শব্দের বাচ্য নহেন এবং তিনি পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগে শ্রেষ্ঠ অংশের দাবী করিতে পারেন না; পরন্তু তিনি রাজদণ্ডের পাত্র। কনিষ্ঠ সহোদরগণ যদি উন্মার্গগামী হয়, তবে তাহাদিগকে পৈতৃক ধন হইতে বঞ্চিত করাই উচিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান কনিষ্ঠগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবে এবং পিতার ন্যায় তাঁহাকে ভক্তি করিবে"।[৩২]

৩১ গন্তুমিচ্ছামি তত্রাহং যত্র তে ভ্রাতরো গতাঃ। মহাপ্র ৩।৩৭

৩২ অনু ১০৫ তম অঃ। ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা। শা ২৪২।২০

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবমাননা করা অনুচিত—পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে :-ব্যক্তি অবমাননা করে, সে মৃত্যুর পর ক্রৌঞ্চযোনি প্রাপ্ত হয়, তারপর কবৎসর পরে পুনরায় মরিয়া চীরকরূপে (পক্ষিবিশেষ) জন্মগ্রহণ করে; তৎপর পাপ ক্ষয় হইলে মনুষ্যরূপে জন্মলাভ করে।[৩৩]

নলরাজার আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম—নলরাজা কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুষ্করকর্তৃক ত্যন্ত লাঞ্ছিত হইয়াও পরে পুষ্করের সমস্ত জয় করিয়া তাহাকে সম্পত্তি ত্যর্পণপূর্ব্বক ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই উপাখ্যানে নলের ভ্রাতৃস্নেহের শ্চ বিস্মিত হইতে হয়।[৩৪]

ভাইদের মধ্যে বন্ধুতা ও সৌহার্দ্দ্য—পাণ্ডবদের মধ্যে কেবল র ভক্তি ও স্নেহের বন্ধনই ছিল, তাহা নহে, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতাও তিশয় গভীর। প্রায় সমস্ত কাজেই যুধিষ্ঠির ভাইদের পরামর্শ গ্রহণ রিতেন। সময়-সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কনিষ্ঠেরাও তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া র্ত্তব্য কাজে সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ দেখা যায়। অরণ্যবাসের সময়, দ্ধর সময় এবং অশ্বমেধযজ্ঞের সময় ভীমসেনাদি পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত না বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন; অযাচিতভাবে সুহৃদের মত তাঁহাকে ণা দিয়াছেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদের অযাচিত পরামর্শের মর্য্যাদা কখনও । হইতে দেন নাই, তিনিও তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করা অবশ্যকর্ত্তব্য নিয়া মনে করিতেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; অজিজ্ঞাসিত য়াও সকল সময়ই ধৃতরাষ্ট্রের হিতের নিমিত্ত পরামর্শ দিতে ত্রুটি করেন ই। এই কারণে অবিমৃশ্যকারী দুর্য্যোধনপক্ষীয়গণ তাঁহাকে তেমন সুদৃষ্টিতে খিতেন না, কিন্তু তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যে সর্ব্বদা জাগরূক ছিলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম যথেষ্টই ছিল। ধৃতরাষ্ট্র ভালরূপেই জানিতেন , বিদুরই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী বন্ধু, কিন্তু সময়ে সময়ে অত্যধিক ত্রস্নেহরূপ দুর্ব্বলতার নিকট তাঁহার বিবেককে হার মানিতে হইত।

পৃথক্ পরিবারে বাস করা ক্ষতিকর—ভাইদের সহিত এক পরিবারে স করাই উচিত। পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া পৃথক্‌ভাবে বাস করা ভাইদের ক্ষে ক্ষতিকর। এই বিষয়ে একটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বিভাবসু-

---

৩৩ জ্যেষ্ঠং পিতৃসমং চাপি ভ্রাতরং যোঽবমন্যতে। ইত্যাদি। অনু ১১১।৮৭,৮৮

৩৪ পুষ্কর ত্বং হি মে ভ্রাতা সংজীব শরদঃ শতম্। বন ৭৮।২৫

নামে এক কোপনস্বভাব ঋষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল সুপ্রতীক। সুপ্রতীক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে পৃথক্ পরিবারে বাস করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা বিভাবসুকে বলিতেন। বিভাবসু একদিন সুপ্রতীককে বলিলেন, "দেখ, অনেক মূঢ় পৃথক্ পরিবারে বাস করা ভাইদের পক্ষে ভাল বলিয়া মনে করে, এবং পরে ধনমদে মত্ত হইয়া পরস্পরের মধ্যে কলহ করিতে থাকে; তখন পয়োমুখ বিষকুম্ভ শত্রুগণ সুযোগ বুঝিয়া ভাইদের কলহাগ্নির ইন্ধন যোগায়, ফলে উভয় পক্ষই বিনষ্ট হয়। সুতরাং সাধু পুরুষগণ ভাইদের পৃথক্ পরিবারে বাস করা অনুমোদন করেন না।[৩৫]

জ্যেষ্ঠা ভগিনী—জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাতার সমান। যাহারা মোহবশতঃ ভগিনীর সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারা যমলোক প্রাপ্ত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।[৩৬]

কনিষ্ঠা ভগিনী—কনিষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে কিরূপ ব্যবহার চলিত তাহার উদাহরণ সুভদ্রা ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকে খুব স্নেহ করিতেন। হস্তিনাপুরে গেলে ভগিনী ও পিসীঠাকুরাণীকে (কুন্তী) দেখিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন।[৩৭]

অনপত্যা বিধবা ভগিনীর ভরণপোষণ—অনপত্যা বিধবা ভগিনীর ভরণপোষণ করা ভ্রাতার কর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য ছিল। তাহার সর্ব্বপ্রকারের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল ভ্রাতার উপর।[৩৮]

আদর্শ সর্ব্বত্র অনুসৃত হয় নাই, গরুড় ও নাগগণ—ভ্রাতাভগিনীর এই মধুর সম্পর্কই ছিল আদর্শ। সর্ব্বত্র যথারীতি আদর্শ অনুসৃত হইত, তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রাচীন যুগে বৈমাত্রেয় ভাই গরুড় এবং নাগদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা অতি প্রসিদ্ধ।[৩৯]

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী মাতার সমান—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সেই সময়কার আদর্শ। পাণ্ডবগণ বনবাসে যাত্রার সময় কুন্তীকে

৩৫ বিভাগং বহবো মোহাৎ কর্ত্তুমিচ্ছন্তি নিত্যশঃ। ইত্যাদি। আদি ২৯।১৮-২১

৩৬ জ্যেষ্ঠা মাতৃসমা চাপি ভগিনী ভরতর্ষভ। অনু ১০৫।১৯

জ্যেষ্ঠাঃ স্বসারঃ পিতরং মাতরঞ্চ যথা শত্রুং মদমত্তাশ্চরন্তি। ইত্যাদি। অনু ১০২।১২

৩৭ দদর্শানন্তরং কৃষ্ণো ভগিনীং স্বাং মহাযশাঃ। সভা ২।৪

৩৮ চত্বারি তে তাত গৃহে বসন্তু…ভগিনী চানপত্যা। উ ৩৩।৭৪

৩৯ আদি ৩৪ শ অঃ।

বিদুরের গৃহে রাখিয়া যান। বিদুর তাঁহাকে সসম্মানে তের বৎসর স্বগৃহে স্থান দিয়াছিলেন।[৪০]

সস্ত্রীক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শয়নগৃহে কনিষ্ঠের প্রবেশ দূষণীয় নহে, বৈপরীত্যে দোষ—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী দেবরকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। যুধিষ্ঠিরের উক্তি হইতে জানা যায়—সস্ত্রীক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শয়ন-গৃহে কনিষ্ঠের প্রবেশে কোন দোষ নাই, কিন্তু সস্ত্রীক কনিষ্ঠের শয়নগৃহে জ্যেষ্ঠের প্রবেশ বিহিত নহে।[৪১]

কনিষ্ঠের পত্নীর প্রতি ভাশুরের ব্যবহার—আশ্রমবাসিকপর্ব্বে দেখিতে পাই, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কুন্তীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সস্নেহ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেবর বা ভাশুরের দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রের উৎপাদন তৎকালে দূষণীয় ছিল না এবং শুধু পুত্রোৎপাদনের সময় ব্যতীত অন্য সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে মাতৃবৎ এবং কনিষ্ঠের পত্নীকে পুত্রবধূর মত দেখিবার বিধান ছিল। (দ্রঃ ৪০শ পৃঃ)

গুরুজনকে 'তুমি' বলা তাঁহাকে হত্যা করার সমান—একদিন কর্ণের বাণে জর্জ্জরিত হইয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে খুব ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার গাণ্ডীব, কেতু, রথ প্রভৃতিরও নিন্দা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা-অনুসারে গাণ্ডীবের নিন্দাকারীর শিরশ্ছেদের উদ্দেশ্যে অসি বাহির করিলেন। কৃষ্ণ উপস্থিত বিপদে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন, "সম্মানিত ব্যক্তি যতদিন সম্মান লাভ করেন, ততদিনই তিনি জীবিত, অবমাননাই তাঁহার মৃত্যু। তুমি যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' সম্বোধন করিলেই তাঁহার মরণ হইবে। গুরুজনকে অবজ্ঞাভরে 'তুমি' বলিলেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়"।[৪২]

৪০ জ্যেষ্ঠা মাতৃসমা চাপি ভগিনী ভরতর্ষভ।
ভ্রাতুর্ভার্য্যা চ তদ্বৎ স্যাৎ............॥ অনু ১০৫।২০
বিদুরশ্চাপি তামার্ত্তাং কুন্তীমাশ্বাস্য হেতুভিঃ।
প্রাবেশয়দ্ গৃহং ক্ষত্তা স্বয়মার্ত্ততরঃ শনৈঃ॥ সভা ৭৯।৩১

৪১ গুরোরনুপ্রবেশো হি নোপঘাতো যবীয়সঃ। ইত্যাদি। আদি ২১৩।৩২

৪২ যদা মানং লভতে মাননার্হস্তদা স বৈ জীবতি জীবলোকে। ইত্যাদি। কর্ণ ৬৯।৮১-৮৩
ত্বঙ্কারো বা বধো বেতি বিদ্বৎসু ন বিশিষ্যতে। অনু ১২৬।৫৩
ত্বঙ্কারনামধেয়ঞ্চ জ্যেষ্ঠানাং পরিবর্জ্জয়েৎ। শা ১৯৩।২৫

অপমান করিবার উদ্দেশ্যে 'তুমি' বলা অত্যন্ত অন্যায়, অন্যথা নহে—গুরুজনকে 'তুমি' বলার বহু উদাহরণ মহাভারতে আছে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নাম ধরিয়া ডাকার উদাহরণও আছে। ভীমকে অর্জ্জুন নাম ধরিয়াই সম্বোধন করিতেন। কিন্তু অপমান করিবার উদ্দেশ্যে সেইগুলি প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যাঁহার সহিত সকল সময় সশ্রদ্ধ ব্যবহার করা হয়, কখনও অবজ্ঞাভরে তাঁহাকে কোনপ্রকার সম্বোধন করা অত্যন্ত অন্যায়।[৪৩] পত্নী, পুত্রবধূ, কন্যা প্রভৃতির সহিত কিরূপ ব্যবহার সমাজের আদর্শ ছিল, তাহা 'নারী' প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

জামাতার আদর—শ্বশুর ও শাশুড়ীর কাছে জামাতার আদর তখনও যথেষ্টই ছিল।[৪৪]

জ্ঞাতির দোষ—জ্ঞাতিবর্গের দোষ এবং গুণ উভয়ই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"জ্ঞাতিগণকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলিয়া জানিবে। জ্ঞাতির মত শ্রীকাতর আর কেহই নাই। সমীপবর্ত্তী সামন্ত নৃপতি যেমন রাজার ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি সহ্য করিতে পারেন না, জ্ঞাতিও সেইরূপ জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য সহ্য করিতে পারেন না। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহ ঋজুস্বভাব মৃদু বদান্য সুশীল সত্যবাদী পুরুষের বিনাশ কামনা করেন না।[৪৫]

জ্ঞাতির গুণ—জ্ঞাতির উপকারিতার কথাও বহু জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ভীষ্মের উক্তি হইতে জানা যায়, যাঁহার জ্ঞাতি নাই, সেই পুরুষ সুখী নহেন, জ্ঞাতিবিহীন পুরুষ সকলের অবজ্ঞার পাত্র, তিনি অনায়াসেই শত্রু দ্বারা পরাভূত হন। কাহাকেও যখন অন্য সকলে পরিত্যাগ করে, জ্ঞাতিই তখন তাঁহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। জ্ঞাতিকে অন্য ব্যক্তি অপমান করিলে জ্ঞাতি তাহা সহ্য করিতে পারেন না।[৪৬]

জ্ঞাতির প্রতি ব্যবহার—জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতির অপমানকে নিজের অপমান বলিয়াই মনে করেন। জ্ঞাতিগণের দোষ এবং গুণ দুইই আছে। বাক্যে ও

---

৪৩ গুরূণামবমানো হি বধ ইত্যভিধীয়তে। কর্ণ ৭০।৫১, ২। আদি ১৫৪।১৮

৪৪ অধিকা কিল নারীনাং প্রীতির্জামাতৃজা ভবেৎ। আদি ১১৬।১২

৪৫ জ্ঞাতিভ্যশ্চৈব বুধ্যেথা মৃত্যোরিব ভয়ং সদা।
উপরাজেব রাজর্দ্ধিং জ্ঞাতির্ন সহতে সদা। ইত্যাদি। শা ৮০।৩২, ৩৩

৪৬ অজ্ঞাতিনোঽপি ন সুখা নাবজ্ঞেয়াস্ততঃ পরম্।
অজ্ঞাতিমন্তং পুরুষং পরে চাভিভবন্ত্যুত। ইত্যাদি। শা ৮০।৩৪, ৩৫

কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতিদের সম্মান ও যথাযোগ্য সমাদর করিবে, কখনও তাঁহাদের অপ্রিয় আচরণ করিতে নাই। অন্তরের সহিত বিশ্বাস না করিয়া বাহ্যতঃ বিশ্বস্তের মত ব্যবহার করা উচিত। যাঁহারা খুব বিবেচনাপূর্ব্বক জ্ঞাতিবর্গের মন বুঝিয়া ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারা শত্রুগণকেও মিত্র করিতে সমর্থ হন।[৪৭] জ্ঞাতিগণ বিপন্ন হইলে তাঁহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করা জ্ঞাতির অবশ্যকর্ত্তব্য।[৪৮]

বিপন্ন দুর্য্যোধনের প্রতি পাণ্ডবগণের ব্যবহার—ঘোষযাত্রাকালে দুর্য্যোধনাদি গন্ধর্ব্ব-কর্ত্তৃক পরাভূত এবং বন্দী হইলে দুর্য্যোধনের পরাজিত সৈনিকগণ বনবাসী পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। অতিদর্পী দুর্য্যোধনের এইপ্রকার বিপদের বার্ত্তা শুনিয়া ভীমসেন আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "গন্ধর্ব্বেরা আমাদের পরম বন্ধুর কাজ করিয়াছেন, আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য যে-কার্য্য বহু আয়াসসাধ্য ছিল, গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা তাহাই সম্পাদিত হইল"। ভীমের কথায় ধর্ম্মরাজ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এখন আনন্দের সময় নয়। জ্ঞাতিদের মধ্যে পরস্পর কলহ হইয়াই থাকে, কিন্তু কোন অবস্থায়ই কুলের মর্য্যাদা নষ্ট করা উচিত নয়। অন্য ব্যক্তি আমাদের জ্ঞাতিকে নির্য্যাতন করিবে, আর আমরা চুপ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিব, ইহা কি কখনও হইতে পারে"? এইরূপ প্রবোধবাক্যে ভীমকে শান্ত করিয়া সপরিজন দুর্য্যোধনের মোচনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিলেন। ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে পাত্রমিত্র সহ দুর্য্যোধন মুক্তিলাভ করিলেন।[৪৯] মূল মহাভারতে না থাকিলেও টীকাকার নীলকণ্ঠ যুধিষ্ঠিরের উক্তিরূপে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে—"আমাদের পরস্পর বিরোধের বেলায় আমরা পাঁচ ভাই এবং দুর্য্যোধনেরা একশত ভাই। কিন্তু অপর কাহারও সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে আমরা মিলিতভাবে একশত পাঁচ ভাই"।[৫০]

---

৪৭ আত্মানমেব জানাতি নিকৃতং বান্ধবৈরপি। ইত্যাদি। শা ৮০।৩৬-৪১

৪৮ যেন কেনচিদার্ত্তানাং জ্ঞাতীনাং সুখমাবহেৎ। আদি ৮০।২৪

৪৯ যদা তু কশ্চিজ্জ্ঞাতীনাং বাহ্যঃ প্রার্থয়তে কুলম্।
ন মর্ষয়ন্তি তৎ সন্তো বাহ্যেনাভিপ্রধর্ষণম্॥ ইত্যাদি। বন ২৪২।৩-২২

৫০ পরস্পরবিরোধে হি বয়ং পঞ্চ চ তে শতম্।
অন্যৈঃ সহ বিরোধে তু বয়ং পঞ্চোত্তরং শতম্॥ নীলকণ্ঠ। শান্তি ৮০।৪১

জ্ঞাতিপ্রীতি—বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, "গুণহীন জ্ঞাতিগণকেও অনুগ্রহ করিতে হয়। পরস্পরের মধ্যে খাওয়াদাওয়া, আলাপ-আলোচনা এবং প্রীতিস্থাপন অবশ্যকর্ত্তব্য। সাধু জ্ঞাতি বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, আর দুর্ব্বৃত্ত জ্ঞাতি বিপদে নিমজ্জিত করে; যদি ধনী জ্ঞাতির আশ্রয়ে থাকিয়া কেহ কষ্টভোগ করেন, তবে তাঁহার কষ্টের জন্য আশ্রয়দাতারই পাপ হইয়া থাকে। অতএব মহারাজ, পাণ্ডবদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন"।[৫১]

বৃদ্ধ জ্ঞাতিকে আশ্রয়দান—সহায়বিহীন বৃদ্ধ জ্ঞাতিকে স্থান দেওয়া প্রত্যেক কল্যাণকাম পুরুষেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।[৫২]

পরস্পর বিবাদে শত্রুবৃদ্ধি—যে জ্ঞাতিগণ সর্ব্বদা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত থাকেন, তাঁহারা অচিরেই শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হন। একত্র ভোজন, কথোপকথন, কার্য্যবিশেষে পরস্পর পরামর্শ-গ্রহণ, একত্র বাস প্রভৃতি জ্ঞাতির কাজ। বিবাদ-বিসম্বাদে জ্ঞাতিদের শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে। পরস্পরের সহানুভূতি এবং সদ্ব্যবহারে জলাশয়স্থ উৎপলের মত জ্ঞাতিগণ বর্দ্ধিষ্ণু হইতে থাকেন।[৫৩]

জ্ঞাতিহিংসায় শ্রীভ্রংশ—যে-ব্যক্তি কল্যাণগুণসম্পন্ন জ্ঞাতিকে হিংসা করে, সেই অজিতাত্মা অসংযত পুরুষ শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকে।[৫৪]

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের উপদেশ—কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "মহারাজ, তোমার পুত্র সর্ব্বক্ষয়কারী কালরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। তুমি তাহাকে সাধু পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ, সুতরাং জ্ঞাতিবধ হইতে তাহাকে বারণ কর। জ্ঞাতিনিধন অতিশয় নীচ কর্ম্ম, তুমি এইরূপ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হইয়া আমার অপ্রিয়াচরণ

৫১ যো জ্ঞাতিমনুগৃহ্লাতি দরিদ্রং দীনমাতুরম্। ইত্যাদি। উ ৩৮।১৭-২৭ উ ৩৫।৪৩

৫২ বৃদ্ধো জ্ঞাতিঃ। উ ৩৩।৭৪। অনু ১০৪।১১৩

৫৩ এবং যে জ্ঞাতয়োঽর্থেষু মিথো গচ্ছন্তি বিগ্রহম্।
তেঽমিত্রবশমায়ান্তি শকুনাবিব বিগ্রহাৎ॥ ইত্যাদি। উ ৬৪।১০,১১
অন্যোন্যসমুপষ্টম্ভাদন্যোন্যাপাশ্রয়েণ বা।
জ্ঞাতয়ঃ সংপ্রবর্দ্ধন্তে সরসীবোৎপলান্যুত॥ উ ৩৬।৬৫

৫৪ যঃ কল্যাণগুণান্ জ্ঞাতীন্ মোহাল্লোভাদ্দিদৃক্ষতে।
সোঽজিতাত্মা জিতক্রোধো ন চিরং তিষ্ঠতি শ্রিয়ম্॥ উ ৯১।৩০

করিও না। আপনার দেহস্বরূপ কুলধর্ম্মকে যে নষ্ট করে, সে ধর্ম্ম হইতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়"।[৫৫]

জ্ঞাতি বশ করিবার উপায়—কৃষ্ণের প্রতি নারদের উক্তি হইতে জানা যায়—সদ্‌ব্যবহার এবং মিষ্ট ভাষাই জ্ঞাতিগণকে আপন করিবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উপায়। যথাশক্তি অন্নদান, তিতিক্ষা, আর্জ্জব, মৃদুতা, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন, এই কয়েকটি উপায়কে বলা হইয়াছে—'অনায়স শস্ত্র'। এইসকল শস্ত্র জ্ঞাতির প্রতি ব্যবহার করিলে তাঁহারা বশীভূত হইয়া থাকেন। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং ত্যাগের দ্বারা পুরুষ জ্ঞাতিসমাজে যশস্বী হইতে পারেন।[৫৬]

জ্ঞাতিবিরোধে মধ্যস্থতা মিত্রকর্ম্ম—জ্ঞাতিদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে যত সত্বর সেই বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে, সেই বিষয়ে চেষ্টা করা প্রত্যেক শুভানুধ্যায়ী পুরুষের অবশ্যকর্ত্তব্য। পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় গান্ধারী কুরুপাণ্ডবের জ্ঞাতিবিরোধ মীমাংসা না করার জন্য কৃষ্ণকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।[৫৭] গান্ধারীর এই অভিসম্পাতের ঔচিত্য বিচার্য্য। কারণ কৃষ্ণ মধ্যস্থরূপে বিবাদের মীমাংসা করিতে কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কুরুসভায় মধ্যস্থরূপে উপস্থিত কৃষ্ণের উক্তিতেই জানা যায়, একমাত্র মীমাংসার উদ্দেশ্যেই তাঁহার দৌত্যগ্রহণ। তিনি বিদুরকে বলিতেছেন, "হে ক্ষত্ত, আমি বিবাদ প্রশমের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। মিত্রদের ব্যসনের সময় যিনি সাহায্য না করেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'নৃশংস' আখ্যা দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ জ্ঞাতিকলহে যিনি মধ্যস্থস্বরূপ কলহপ্রশমের উপায় না করেন, তিনি মিত্র নামের অযোগ্য। আমি যদি মীমাংসার চেষ্টা না করি, তবে মূঢ় ব্যক্তিগণ বলিবে যে, কৃষ্ণ উভয় পক্ষের কলহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াও চেষ্টা করেন নাই। লোকসমাজে যাহাতে কলঙ্কিত না হই, সেইজন্যই আমার আগমন"।[৫৮]

পারিবারিক সাধু ব্যবহার—সকলের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া

৫৫ ধর্ম্ম্যং দেশয় পন্থানং সমর্থো হ্যসি বারণে। ইত্যাদি। ভী ৩।৫৩-৫৬

৫৬ শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষার্জ্জবমার্দ্দবম্। ইত্যাদি। শা ৮১।২১-২৭

৫৭ পাণ্ডবা ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ দগ্ধাঃ কৃষ্ণ পরস্পরম্। ইত্যাদি। স্ত্রী ২৫।৩৯-৪৫

৫৮ সোঽহং যতিষ্যে প্রশমং ক্ষত্তঃ কর্ত্তুমমায়য়া। ইত্যাদি। উ ৯৩।৮-১৭

যাঁহারা গার্হস্থ্য পালন করেন, তাঁহারাই যথার্থ মুনি।[৫৯] পরিবার-পরিজনের প্রতি যাঁহাদের ব্যবহার নিষ্করুণ, তাঁহারা বিশুদ্ধ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেও নিষ্পাপ হইতে পারেন না, তাঁহাদের সকল তপস্যাই নিষ্ফল।[৬০] সাধু গৃহস্থ পরিবারের পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে সতত যত্নশীল থাকেন, অভ্যাগত ও পোষ্যবর্গের ভোজনের পর তিনি ভোজন করেন, তাঁহাকে বলা হয় 'অমৃতভোজন'। সকলকে খাওয়ানই গৃহস্থের প্রধান যজ্ঞ, যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজ্যের নাম 'হবিঃ' অথবা 'অমৃত'। গৃহস্থ প্রত্যহ অমৃত ভোজন করেন বলিয়া তাঁহাকে 'অমৃতাশী'ও বলা হয়। ভৃত্যবর্গের ভোজনের পর অবশিষ্ট যে ভোজ্য দ্রব্য থাকে, তাহার নাম 'বিঘস'। যিনি ভৃত্যাশেষ ভোজন করেন, তাঁহাকে বলা হয় 'বিঘসাশী'। প্রত্যেক গৃহস্থেরই অমৃত এবং বিঘস ভোজন করা উচিত। ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত ব্যক্তি, বৃদ্ধ, শিশু, আতুর, বিদ্বান, অবিদ্বান্, দরিদ্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী এবং অন্যান্য আত্মীয়কুটুম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহস্থকে থাকিতে হয়। কখনও তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে নাই। মাতা, পিতা, সগোত্রা স্ত্রীলোক, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্য্যা, দুহিতা এবং ভৃত্যদের সহিত সাধু ব্যবহার করা উচিত। যে সাধু পুরুষ পরিবার-প্রতিপালনে সর্ব্বদা অবহিত থাকেন, কখনও বিরক্তি অনুভব করেন না, তিনিই জগতে মহাপ্রাণ। তাঁহাকে পুরুষশ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তিনি ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হন। আচার্য্যের পূজাতে ব্রহ্মলোক, মাতৃপিতৃভক্তিতে প্রজাপতিলোক, অতিথিসৎকারে ইন্দ্রলোক এবং ঋত্বিকের পূজায় দেবলোকে অধিকার জন্মে। সগোত্রা স্ত্রীলোকের সেবাতে অপ্সরা-লোক এবং জ্ঞাতিদের সেবায় বৈশ্বদেবলোক জয় করিতে পারা যায়। সম্বন্ধী বান্ধবগণ দিকের অধিপতি, মাতা এবং মাতুল পৃথিবীর; বৃদ্ধ, বালক, আতুর এবং কৃশ ব্যক্তি আকাশের অধিপতি। ইহাদের সেবায় সেই-সেই স্থানের আধিপত্য জন্মে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান, ভার্য্যা ও পুত্র নিজের অভিন্ন দেহ, ভৃত্যবর্গ আপনারই ছায়া, আর দুহিতা নিতান্ত করুণার পাত্রী।

[৫৯] তিষ্ঠন্ গৃহে চৈব মুনির্নিত্যং শুচিরলঙ্কৃতঃ।
যাবজ্জীবং দয়াবাংশ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ বন ১৯৯।১০১

[৬০] ন জ্ঞাতিভ্যো দয়া যস্য শুক্লদেহো বিকল্মষঃ।
হিংসা সা তপসস্তস্য নানাশিত্বং তপঃ স্মৃতম্॥ বন ১৯৯।১০০

সুতরাং তাঁহারা কোন অন্যায় আচরণ করিলেও সহ্য করিতে হয়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে নিয়োজিত ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া পরিবারের হিতকামনায় আত্মনিবেদন করিবেন, ইহাই তাঁহার তপস্যা। সাধু গৃহস্থ সব সময়েই আপন অভিলষিত সুখ ভোগ করিতে পারেন। পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের আনন্দের তুলনায় স্বর্গসুখও তাঁহার নিকট তুচ্ছ।[৬১]

প্রকীর্ণ ব্যবহার

পারিবারিক ব্যবহার ব্যতীত আরও নানাবিধ ব্যবহারের সহিত সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। মহাভারতের সময়ের অনেকগুলি লৌকিক ব্যবহার এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীসমাজে চলিতেছে, কতকগুলি এখন লুপ্ত এবং কতকগুলি অপরাপর সমাজে প্রচলিত। বিষয়গুলি অকারাদি-ক্রমে সঙ্কলিত হইল।

অদৃশ্য বস্তু দর্শনের উপায়—অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় কোন বস্তু দেখিবার নিমিত্ত মন্ত্রপূত জলের দ্বারা চক্ষু প্রক্ষালন করিবার নিয়ম ছিল। ইহাও সেইকালের বহুপ্রচলিত একপ্রকার লৌকিক সংস্কার। অন্তর্হিত জীবজন্তুকে প্রত্যক্ষরূপে দেখিবার নিমিত্তও সেই মন্ত্রসংস্কৃত বারি ব্যবহৃত হইত। গুহ্যকাদি দেবযোনিগণ এইসকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, মন্ত্রসংস্কারে তাঁহাদের যথেষ্ট শক্তি ছিল।[১]

অন্তঃপুরে প্রবেশবিধি—বিশেষ কার্য্য উপলক্ষ্যে কোনও সম্ভ্রান্ত পুরুষের সহিত অন্তঃপুরে দেখা করিতে হইলে কৃতাঞ্জলি হইয়া পায়ের অঙ্গুলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রবেশ করিবার বিধান। এমনভাবে প্রবেশ করিতে হইত, যাহাতে শুদ্ধ সংযত ভাবটি অব্যাহত থাকে, শিষ্টতা একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়।[২]

অপমানিত করার উপায়—গুরু অপরাধের শাস্তিস্বরূপ অপরাধীর চুল মাঝে মাঝে কাটিয়া মাথার মধ্যে পাঁচ জায়গায় চুল রাখিয়া তাহাকে

৬১ নাস্তানশ্নন্ গৃহে বিপ্রো বসেৎ কশ্চিদপূজিতঃ। ইত্যাদি। শা ২৪২।৭-২৭

১ ইদমন্তঃ কুবেরস্তে মহারাজ প্রযচ্ছতি। ইত্যাদি। বন ২৮৮।১০

২ পাদাঙ্গুলীরভিপ্রেক্ষন্ প্রযতোঽহং কৃতাঞ্জলিঃ। ইত্যাদি। উ ৫৯।৩

ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বনবাসকালে দ্রৌপদীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ার অপরাধে ভীমসেন জয়দ্রথের মাথায় পাঁচচুলা করিয়াছিলেন।[৩] 'আমি তোমার দাস'—সর্ব্বসমক্ষে বিজিত পুরুষ বিজেতাকে এই কথা বলিলে তাহাকে ক্ষমা করা হইত। এইপ্রকারের স্বীকারোক্তি খুবই অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত।[৪] গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার প্রথা তখনও বিদ্যমান ছিল। তাড়িত ব্যক্তি তাহাতে খুব অপমান বোধ করিতেন। বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই এরূপ শাস্তি দিতে সাহস করিতেন।[৫]

অপুত্রিকাদি নারীর মাঙ্গলিক কার্য্যে অনধিকার—অপুত্রিকা, রজস্বলা এবং শ্বিত্ররোগগ্রস্তা নারীর মাঙ্গলিক কার্য্যে অধিকার ছিল না।[৬]

অভিবাদন—গুরুজনকে অভিবাদন করা প্রাত্যহিক কর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। কল্যাণার্থী পুরুষ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই মাতা, পিতা, আচার্য্য-প্রমুখ গুরুজনকে প্রণাম করিবেন।[৭] কোথাও যাত্রা করিবার সময় গুরুজনের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করার প্রথা তখনও ছিল, সর্ব্বত্রই সেই বর্ণনা দেখিতে পাই। দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং উপস্থিত প্রণম্য ব্যক্তিগণকে প্রণাম না করিয়া কেহই যাত্রা করিতেন না।[৮] দূর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং উপস্থিত গুরুজনকে প্রণাম করিবার নিয়ম ছিল।[৯] অভিবাদন করিবার সময় আপনার নাম উল্লেখ করিবার বিধানও পাওয়া যায়।[১০] গুরুজনের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া এবং হাত দিয়া পাদস্পর্শ করিয়া, এই দুইভাবেই প্রণাম করা হইত। গুরুজন প্রণত কল্যাণাস্পদকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিতেন।

৩ এবমুক্ত্বা সটাস্তস্য পঞ্চ চক্রে বৃকোদরঃ। বন ২৭১।৯

৪ দাসোঽস্মীতি ত্বয়া বাচ্যং সংসৎসু চ সভাসু চ। বন ২৭১।১১

৫ গলে গৃহীত্বা ক্ষিপ্তোঽস্মি বরুণেন মহামুনে। অনু ১৫৪।২২

৬ রজস্বলা চ যা নারী শ্বিত্রিকাপুত্রিকা চ যা। ইত্যাদি। অনু ১২৭।১৩

৭ মাতাপিতরমুত্থায় পূর্ব্বমেবাভিবাদয়েৎ। অনু ১০৪।৪৪

৮ আদি ১৪৫।১-৪। আদি ১১৩।২২। অশ্ব ৬৩।২২

৯ আদি ১১৩।৪৩। আদি ২০৭।২১। সভা ৪৯।৪৩। সভা ২।৩৪

১০ অভ্যবাদয়ত প্রীতঃ শিরসা নাম কীর্ত্তয়ন্। বন ১৫৯।১
কৃষ্ণোঽহমস্মীতি নিপীড্য পাদৌ। আদি ১৯১।২০

কুশল প্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার ধর্ম্ম এবং শাস্ত্র অক্ষুণ্ণ আছে কি? পূজার্হ গুরুজনের যথারীতি সম্মান কর ত?"[১১] দূত বা বার্ত্তাবহের মুখেও গুরুজনকে প্রণাম নিবেদন করা হইত। প্রণম্য ব্যক্তিগণও অন্যের সহযোগে কল্যাণীয়কে আশীর্ব্বাণী এবং কুশলবার্ত্তা পাঠাইতেন। এই ব্যবহার খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[১২]

অভিষেক—রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে ভাবী রাজাকে অভিষিক্ত করা হইত। অভিষেক একপ্রকার শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক উৎসব। প্রত্যেক রাজার পক্ষেই এই অনুষ্ঠানের নিত্যতা ছিল। কর্ণের অভিষেক[১৩] এবং যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের[১৪] বর্ণনা বিশদরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি জলপূর্ণ স্বুবর্ণঘটে খই এবং পুষ্প প্রক্ষেপ করিয়া কর্ণকে স্বুবর্ণপীঠে উপবেশন করাইয়া সেই জল দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অভিষেক করিয়াছিলেন। অভিষেকের পর তাহার মাথার উপর ছত্র ধরা হয়, বালব্যজন দ্বারা তাঁহাকে বীজন করা হয় এবং চতুর্দ্দিকে তুমুল জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। রাজপুত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধের যোগ্যতা লাভের নিমিত্ত কর্ণকে পরীক্ষামঞ্চেই দুর্য্যোধন অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, সুতরাং যথাসম্ভব সত্বর এবং সংক্ষেপে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে বাধ্য হন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পর যুধিষ্ঠিরের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

যুধিষ্ঠির শুভক্ষণে কাঞ্চনপীঠে উপবেশন করিলেন। কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, ধৌম্য প্রমুখ গুরুজন আপন আপন আসন পরিগ্রহ করিলে যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ শ্বেত পুষ্প, স্বস্তিক (সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি-অঙ্কিত দেবতাপীঠ), অক্ষত, ভূমি, সুবর্ণ, রজত এবং মণি স্পর্শ করিলেন। প্রজাগণ পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে লইয়া ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে অভিষেকের যাবতীয় উপকরণ স্থাপিত হইল। সুবর্ণ, রজত, তাম্র এবং মৃত্তিকানির্ম্মিত কলসগুলি জলপূর্ণ করিয়া স্থাপন করা হইল। পুষ্প,

১১ স ত্বয়া মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রাতঃ পরিষ্বক্তশ্চ কেশবঃ। সভা ২।৩
অপি ধর্ম্মেণ বর্ত্তধ্বং শাস্ত্রেণ চ পরন্তপাঃ। ইত্যাদি। আদি ১৬৯।৪

১২ বৃদ্ধাঃ স্ত্রিয়ো যাশ্চ গুণোপপন্নাঃ। ইত্যাদি। উ ৩০।৩২

১৩ ততস্তস্মিন্ ক্ষণে কর্ণঃ সলাজকুসুমৈর্ঘটৈঃ। ইত্যাদি। আদি ১৩৬।৩৭,৩৮

১৪ শা ৪০ শ অঃ।

খই, কুশ, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, শমী, পিপ্পল ও পলাশ-সমিধ, স্রুব, ঔডুম্বর ও শঙ্খ আনীত হইল। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পুরোহিত ধৌম্য ঈশানকোণ কিঞ্চিৎ ঢালুভাবে থাকে, এমন একটি বেদি প্রস্তুত করিলেন। সর্ব্বতোভদ্র শুভ্র আসনের উপর ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন স্থাপন করিয়া তদুপরি যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে বসাইয়া পুরোহিত ধৌম্য মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র আহুতি প্রদান করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পূজিত শঙ্খের জল দ্বারা যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করিলে, ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতৃগণ এবং উপস্থিত প্রজাবৃন্দ ধর্ম্মরাজকে অভিষিক্ত করিলেন। পাঞ্চজন্য দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া মহারাজ সবিশেষ দীপ্তিমান হইয়াছিলেন। অতঃপর পণব, আনক ও দুন্দুভির বাদ্যে এবং মুহুর্মুহুঃ জয়শব্দে সভাস্থল মুখরিত হইতে লাগিল। মহারাজ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করিয়া পূজা করিলেন, উপস্থিত গুরুজনকে প্রণামপূর্ব্বক অপর সকলের সহিত যথাযোগ্য অভিবাদনাদি সমাপনান্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

অমঙ্গলসূচক শব্দ শ্রবণে 'স্বস্তি' শব্দ উচ্চারণ—অমঙ্গলসূচক শৃগালাদির শব্দ শুনিলে বিজ্ঞগণ উচ্চস্বরে 'স্বস্তি স্বস্তি' উচ্চারণ করিতেন। কুরুসভায় দ্রৌপদীর উপর যখন দুর্য্যোধনাদির নির্লজ্জ অত্যাচার চলিতেছিল, তখন ধৃতরাষ্ট্রভবনে গৃহাগ্নিসমীপে অকস্মাৎ শৃগাল বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, গাধা ও পেচকাদি পক্ষিগণ সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনি করিল। তত্ত্বদর্শী বিদুর, গান্ধারী, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপাচার্য্য সেই দারুণ শব্দ শুনিয়া ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উচ্চস্বরে 'স্বস্তি স্বস্তি' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।[১৫]

আত্মহত্যার উপায়—বিষভক্ষণ, অগ্নিপ্রবেশ, জলে-ডুবা এবং উদ্বন্ধন এই কয়টি আত্মহত্যার উপায় লোকসমাজে জানা ছিল।[১৬]

আত্মীয়ের গৃহ হইতে বিদায়ের দৃশ্য—আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী হইতে বিদায়গ্রহণের সময় সকলের সহিত দেখাশোনা করিয়া যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পর অন্তঃপুরে যাইয়া মাসী, পিসী, ভগিনী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবার রীতি ছিল।[১৭]

১৫ ভীষ্মদ্রোণৌ গোতমশ্চাপি বিদ্বান্ স্বস্তি স্বস্তীত্যপি চৈবাহুরুচ্চৈঃ। সভা ৭১।২৩

১৬ বিষমগ্নিঃ জলং রজ্জুমাস্থাস্যে তব কারণাৎ। বন ৫৬।৪

১৭ অভিগম্যাব্রবীৎ প্রীতঃ পৃথাং পথুযশা হরিঃ। ইত্যাদি। সভা ৪৫।৫৭-৫৯

আনন্দ প্রকাশ—আনন্দজনক কোন কিছু ঘটিলে সুহৃদ্‌গণের মধ্যে পরস্পর করমর্দ্দন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা হইত। বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির আকস্মিক সমাগমে আনন্দাতিশয্যে তাঁহার করমর্দ্দন করা হইত।[১৮] আনন্দ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে করতালি দেওয়াও তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল। রঙ্গমঞ্চে এবং যুদ্ধভূমিতে দর্শকগণ করতালি দ্বারা অভিনেতার এবং যুদ্ধবীরের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।[১৯]

সভাসমিতিতে বস্ত্রাঞ্চল-কম্পনের দ্বারাও আনন্দ প্রকাশ করা হইত। ধৃতরাষ্ট্রের বরে দ্রৌপদীর দাসীত্বমুক্তিতে সভাসদ্‌গণ বস্ত্রাঞ্চল-কম্পনের দ্বারা হর্ষপ্রকাশ করিয়াছিলেন।[২০] ব্রাহ্মণবেশধারী অর্জ্জুন দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় লক্ষ্যবেধে কৃতকার্য্য হইলে পর সমাগত অসংখ্য ব্রাহ্মণ আনন্দাতিশয্যে সগৌরবে আপন আপন চৈলখণ্ড বিজয়ধ্বজের মত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরেন।[২১] যুদ্ধের প্রারম্ভে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ উল্লাসে বস্ত্রাঞ্চল প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লসিত সৈন্যদের বস্ত্রাঞ্চল কম্পনের বর্ণনাও পাওয়া যায়।[২২]

'যোগ যোগ' শব্দটিও আনন্দের সূচক। একই উদ্দেশ্যে অনেকের মিলনের সময় উল্লাসের সহিত 'যোগ যোগ' বলা হইত।[২৩]

আর্য্যগণ অপশব্দ উচ্চারণ করিতেন না—আর্য্যগণ (সুশিক্ষিত এবং বৈদিকাচার-সম্পন্ন পুরুষগণ) অপশব্দ ব্যবহার করিতেন না। ভাষায় যে-সকল বিশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার ছিল, সেইগুলি ব্যতীত প্রাদেশিক অথবা অস্পষ্ট অর্থের বোধক অসঙ্গত শব্দকে ম্লেচ্ছশব্দ বলা হইত। যাঁহারা অপশব্দ অর্থাৎ যথার্থ র্থবোধনে সামর্থ্যহীন শব্দের ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদিগকে সমাজে খুব

১৮ ততঃ প্রহসিতাঃ সর্ব্বে তেঽন্যোন্যস্য তলান্ দদুঃ। বন ২৩৭।২৪
করেণ চ করং গৃহ্য কর্ণস্তু মুদিতো ভৃশম্। ইত্যাদি। বন ২৬১।২৫। উ ১৫৬।২২। শল্য ৩২।৪১

১৯ হর্ষয়ামাসুরুচ্চৈস্তাং সিংহনাদতলস্বনৈঃ। বন ২০।২৭
তং মত্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দেন মানবাঃ। ইত্যাদি। শল্য ৩৩।৬০

২০ চেলাবেধাংশ্চাপি চক্রুর্নদন্তঃ। সভা ৭০।৭

২১ চৈলানি বিব্যধুস্তত্র ব্রাহ্মণাশ্চ সহস্রশঃ। আদি ১৮৮।২৩

২২ হৃষ্টাঃ সুমনসো ভূত্বা চৈলানি দুধুবুশ্চ হ। ইত্যাদি। ভী ৪৩।৩০। দ্রো ২০।১৩

২৩ যোগো যোগ ইতি প্রীত্যা ততঃ শব্দো মহানভূৎ। আশ্র ২৩।২

ভাল দৃষ্টিতে দেখা হইত না।[২৪] বিদুর, যুধিষ্ঠির প্রমুখ ব্যক্তিগণ ম্লেচ্ছভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। যাহাতে অন্য কেহ তাঁহাদের সাঙ্কেতিক আলাপ বুঝিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে বারণাবতে যাত্রার সময় বিদুর যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছভাষায় অনেক কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন।[২৫]

ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মীয়স্বজনকে বিদায় দেওয়া হইত না—আত্মীয়-কুটুম্ব বাড়ীতে আসিলে 'তুমি যাও' অথবা 'এখন তোমার যাওয়া উচিত' এইভাবে বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইত না। এমন কি, কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার যাওয়া একান্ত আবশ্যক, ইহা বুঝিতে পারিলেও গৃহস্বামী আত্মীয়কে স্বয়ং বলা উচিত মনে করিতেন না। দ্রৌপদীর বিবাহের পর দ্রুপদপুরীতে অবস্থিত পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঠাইয়াছিলেন। রাজা দ্রুপদ বিদুরকে বলিয়াছিলেন "ইঁহাদের যাওয়া একান্ত উচিত, কিন্তু আমার বলা ত উচিত নয়"।[২৬]

উত্তেজিত করা—কাহাকেও উত্তেজিত করিতে তাঁহার জন্ম সম্পর্কে দিব্য দেওয়া হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "পার্থ, যদি তুমি পাণ্ডুর পুত্র হও, তবে যে যে দিব্য ও মানুষ-অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, সেইগুলির প্রয়োগ কর"।[২৭]

উৎসব—উৎসবাদিতে নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ করা হইত। দুর্য্যোধনের পাপ পরামর্শ-অনুসারে সমাতৃক পাণ্ডবগণকে যখন বারণাবতে পাঠান হয়, তখন বলা হইয়াছে—সেখানে 'পশুপতি-সমাজ' উপস্থিত। পশুপতি-সমাজ বলিতে বুঝা যায়, পশুপতির পূজা উপলক্ষ্যে মেলা। ইহাতে অনুমিত হয়, বিশেষ-বিশেষ পূজা-পার্ব্বণাদিতে উৎসবের উদ্দেশ্যে মেলা বসিত।[২৮] সমাতৃক পাণ্ডবগণের একচক্রা-নগরীতে অবস্থানকালে বিপন্ন ব্রাহ্মণ-পরিবারকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মাতার আদেশে ভীমসেন বক-রাক্ষসকে বধ করেন। তারপর নগর এবং নিকটস্থ জনপদের ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ মিলিত হইয়া 'ব্রহ্ম-মহের' অনুষ্ঠান করেন। একজন ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক রাক্ষস

২৪ নার্য্যা ম্লেচ্ছন্তি ভাষাভির্মায়য়া ন চরন্ত্যুত। সভা ৫৯।১১

২৫ প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞং প্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞং বচোঽব্রবীৎ। সভা ১৪৫।২০

২৬ ন তু তাবন্ময়া যুক্তমেতদ্ বক্তুং স্বয়ং গিরা। আদি ২০৭।২

২৭ তদ্দর্শয় ময়ি ক্ষিপ্রং যদি জাতোঽসি পাণ্ডুনা। দ্রো ১০০।৩৬

২৮ অয়ং সমাজঃ সুমহান্ রমণীয়তমো ভুবি। আদি ১৪৩।৩

ৃত হইয়াছে—এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ-পূজা উপলক্ষ্যে এই মহের (উৎসব) আয়োজন করা হয়।[২৯] বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশীয় স্ত্রী-পুরুষগণ মিলিত হইয়া সুসজ্জিত রৈবতকগিরিতে অনেকদিন ব্যাপিয়া রৈবতক-মহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উৎসবটি পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা মাত্র। সম্মিলিত ীরগণ উৎসবানন্দের মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিয়াছিলেন।[৩০] রৎকালে নূতন ধান্য পাকিলে মৎস্যনগরে বিরাট উৎসবের আয়োজন ইয়াছিল। সেই উৎসবের নাম ছিল 'ব্রহ্মোৎসব'। নানাস্থান হইতে প্রসিদ্ধ ল্লগণ উৎসব উপলক্ষ্যে মৎস্যনগরে উপস্থিত হন। সেই উৎসবেই জীমূত-ামক মল্লের সহিত পাচকবেশধারী প্রচ্ছন্ন ভীমের যুদ্ধ হয়।[৩১]

যুদ্ধে জয় লাভ করিলে বিজয়ী রাজার পুরীতে উৎসব করা হইত। সেই-সকল উৎসবে কুমারীগণ বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া পুরীর বাহিরে রাজপথে ভ্রমণ করিতেন। নানাবিধ বাদ্যে পুরী মুখরিত হইয়া উঠিত। বারাঙ্গনাগণ খুব জাঁকজমকের সহিত অলঙ্কৃতা হইয়া আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হইতেন।[৩২] দ্ধবিজয়ে রাজপথকে পতাকা দ্বারা সুশোভিত করা হইত। পুষ্পাদি উপহার দিয়া দেবতাদের অর্চ্চনা করা হইত। ঘণ্টা বাজাইয়া এক ব্যক্তি সুদৃশ্য হাতীতে চড়িয়া সমস্ত নগরীতে এবং বড় বড় রাস্তায় জয় ঘোষণা করিতেন। স্বস্তিক (দধি, দূর্ব্বা প্রভৃতি) হাতে লইয়া প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার জয়গান করিয়া বেড়াইতেন। অলঙ্কৃতা কুমারী এবং বারাঙ্গনাগণ বিজয়ী বীরকে পথ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া নগরে লইয়া যাইতেন।[৩৩] উৎসবাদিতে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরাও যাইতেন। রৈবতক-মহে দেখিতে পাই, রাজা উগ্রসেন অসংখ্য মহিলাকে সঙ্গে লইয়া উৎসবের মেলায় ভ্রমণ করিতেছেন। কুমারীদের ত কথাই নাই; রৈবতকমহেই সখীপরিবৃতা সুভদ্রা অর্জ্জুন-কর্তৃক অপহৃতা হন।[৩৪]

২৯ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ক্ষত্রিয়াশ্চ সুবিস্মিতাঃ।
বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মুদিতাশ্চক্রুর্ব্রহ্মমহং তদা। আদি ১৬৪।২০

৩০ ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকাশ্চৈব মহে তস্য গিরেস্তদা। আদি ২১৯।২

৩১ অথ মাসে চতুর্থে তু ব্রহ্মণঃ সুমহোৎসবঃ। বি ১৩।১৪

৩২ কুমার্য্যঃ সমলঙ্কৃতা পর্য্যাগচ্ছন্তু মে পুরাৎ। ইত্যাদি। বি ৩৪।১৭,১৮

৩৩ রাজমার্গাঃ ক্রিয়ন্তাং মে পতাকাভিরলঙ্কৃতাঃ। ইত্যাদি। বি ৬৮।২৩-২৮

৩৪ তথৈব রাজা বৃষ্ণীনামুগ্রসেনঃ প্রতাপবান্।
গন্ধর্ব্বৈরনুগীয়মানো স্ত্রীসহস্রসহায়বান্। আদি ২১৯।৮

উপহাস—কাহারও হাস্যোদ্দীপক কোন আচরণ দেখিলে বা শুনিলে অট্টহাস্য করিয়া তাহাকে উপহাস করা হইত। মহিলাগণও অট্টহাস্য করিয়া পুরুষদিগকে অস্বাভাবিক আচরণের জন্য উপহাস করিতেন।[৩৫]

উল্কা ও উল্মুক—অন্ধকারে পথ চলিতে উল্কা (মশাল) এবং উল্মুকের (জ্বলৎকাষ্ঠ) সাহায্য গ্রহণ করার দৃশ্য দেখিতে পাই।[৩৬]

কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যধিক পুত্রস্নেহে ভালমন্দ-বিচারে অক্ষম হইয়া সুপরামর্শদাতা বিদুরকে নানাবিধ কটুবাক্যে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ব্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া বনে পাণ্ডবদের সমীপে চলিয়া যান। ধৃতরাষ্ট্র পরে আপনার অন্যায় বুঝিতে পারিয়া সঞ্জয়কে পাঠাইয়া বিদুরকে আনয়ন করেন। বিদুর আসিলে পর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে কোলে বসাইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।[৩৭]

ক্রীড়া-কৌতুক—শিশুদের নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুকের বর্ণনা পাওয়া যায়। শৈশবে পাণ্ডবগণ 'বীটা' দ্বারা খেলা করিতেন। 'বীটা' শব্দের অর্থ যবাকৃতি প্রাদেশপরিমিত কাষ্ঠখণ্ড। বোধ হয়, ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে অপেক্ষাকৃত লম্বা অপর কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা দূরে ক্ষেপণ করা হইত। নীলকণ্ঠের কথায় মনে হয়, আধুনিক ডাণ্ডাগুলির সহিত তাহার সাদৃশ্য ছিল। কেহ কেহ বীটা শব্দে লৌহগুলিকাকে বুঝিয়া থাকেন।[৩৮] শিশু কুরুপাণ্ডবগণ মিলিত হইয়া দৌড়াদৌড়ি, লক্ষ্যাভিহরণ (দৌড়িয়া কোনও বস্তু আনয়ন), ভোজ্য (খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি), পাংসুবিকর্ষণ (ধূলিপ্রক্ষেপ) প্রভৃতি খেলা করিতেন।[৩৯] কোন খেলাতেই ভীমকে কেহ হঠাইতে পারিতেন না। কৈশোরে পাণ্ডবগণ জলবিহারে (সাঁতার কাটা) আনন্দ লাভ করিতেন।[৪০]

৩৫ তত্র মাং প্রাহসৎ কৃষ্ণঃ পার্থেন সহ সুস্বরম্।
দ্রৌপদী চ সহ স্ত্রীভির্ব্যথয়ন্তী মনো মম॥ সভা ৫০।৩০

৩৬ সহসৈব সমাদ্রুত্য রাধায়োল্কাঃ সহস্রশঃ। বি ২২।৯১
উল্মুকস্তু সমুদ্যম্য তেষামগ্রে ধনঞ্জয়ঃ। আদি ১৭০।৪

৩৭ ক্ষম্যতামিতি হোবাচ যদুক্তোঽসি ময়ানঘ। বন ৬।২১

৩৮ ক্রীড়ন্তো বীটয়া তত্র বীরাঃ পর্য্যচরন্ মুদা। আদি ১৩১।১৭

৩৯ জবে লক্ষ্যাভিহরণে ভোজ্যে পাংসুবিকর্ষণে। আদি ১২৮।১৬

৪০ ততো জলবিহারার্থং কারয়ামাস ভারত। আদি ১২৮।৩১

একদা প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে সুহৃৎপরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যমুনায় যাত্রা করিলেন। সেখানে পূর্ব্বেই বিচিত্র গৃহাদি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। নানাবিধ বৃক্ষলতা-পরিশোভিত যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া সুহৃজ্জন-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সুগন্ধিমাল্যধারণ-পূর্ব্বক কৃত্রিম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর দ্রৌপদী, সত্যভামা প্রমুখ মহিলাগণও পুরুষদের সহিত ক্রীড়ায় রত হইলেন। কেহ বনে, কেহ জলে, কেহ বা গৃহে থাকিয়াই কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত খেলিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বস্ত্রালঙ্কারাদি দান করিতে লাগিলেন, তাঁহারা দুইজনে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। নারীদের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ হাসিতে লাগিলেন, কেহ কেহ উৎকৃষ্ট আসবপানে মত্ত, কেহ কেহ পরস্পরের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, আবার একদল পরস্পরের মধ্যে প্রহারাদিতে ব্যস্ত, কেহ কেহ বিশ্রম্ভালাপে আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গের ধ্বনিতে যমুনাপুলিন মুখরিত।[৪১]

ধনিসমাজে অক্ষক্রীড়ার খুব প্রচলন ছিল। মহাভারতের যুদ্ধের মূলই অক্ষক্রীড়া। অবসর সময়ে এবং উৎসবাদিতে অক্ষক্রীড়ায় কালক্ষেপ করা যেন সেই সময়ে ফ্যাশনের মধ্যে গণ্য ছিল। সমরবিজয়ী পুত্রের প্রত্যাগমনে বিরাটরাজ কঙ্কের সহিত দ্যূতে প্রবৃত্ত হন।[৪২] দ্যূতক্রীড়ায় বিশেষজ্ঞরূপেই যুধিষ্ঠির বিরাটপুরীতে প্রবেশ করেন। নলরাজা এবং তাঁহার ভ্রাতা পুষ্করের অক্ষক্রীড়ার পরিণতি সর্ব্বজনবিদিত। কুরুসভায় অক্ষক্রীড়ার নিমিত্ত আহূত হইয়া যুধিষ্ঠির শকুনিকে বলিয়াছেন—"ধূর্ত্তদের সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়া মহাপাপ, ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করাই প্রকৃত জয়, মুনিসত্তম অসিতের ইহাই অভিপ্রায়।"[৪৩] অক্ষক্রীড়ায় বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে 'অক্ষহৃদয়' নামে বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। বনবাসী যুধিষ্ঠির বৃহদশ্ব-মুনি হইতে সেই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।[৪৪] নলরাজা ঋতুপর্ণ হইতে 'অক্ষহৃদয়'-

৪১ ততঃ কতিপয়াহস্ত বীভৎসুঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ। ইত্যাদি। আদি ২২২।১৪-২৬

৪২ অক্ষানাহর সৈরন্ধ্রি, কঙ্ক দ্যূতং প্রবর্ত্ততাম্। ইত্যাদি। বি ৬৮।৩০। বন ৫৯ তম অঃ।

৪৩ ইদং বৈ দেবনং পাপং নিকৃত্যা কিতবৈঃ সহ।
ধর্ম্মেণ তু জয়ো যুদ্ধে তৎ পরং ন তু দেবনম্। সভা ৫৯।১০

৪৪ ততোঽক্ষহৃদয়ং প্রাদাৎ পাণ্ডবায় মহাত্মনে। বন ৭৯।২১

বিদ্যা লাভ করেন। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, পাশার অধিষ্ঠাত্রী একজন দেবতা আছেন। সেই দেবতাকে হৃদয়ের মত বশীভূত করিবার মন্ত্রের নাম অক্ষহৃদয়। মন্ত্রের প্রয়োগে দ্যূতক্রীড়ায় পাশাতে অনুকূল দান পড়িয়া থাকে।[৪৫] নীতিজ্ঞদের মতে দ্যূতক্রীড়া নিন্দিত ছিল। পাণ্ডবগণের বনগমনের পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "যদি আমি কুরুরাজের সভায় উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে পাশাখেলার দোষ প্রদর্শন করিয়া নিশ্চয়ই বারণ করিতাম। স্ত্রীতে অত্যাসক্তি, অক্ষক্রীড়া, মৃগয়া এবং সুরাপান হইতে মানুষ শ্রীভ্রষ্ট হয়"।[৪৬]

গৃহারম্ভ ও গৃহপ্রবেশ—দেবতার অর্চ্চনা, মাঙ্গল্য উৎসব, ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাপ্রদান প্রভৃতি গৃহারম্ভ ও গৃহপ্রবেশের অঙ্গ। বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া পায়সাদি উৎকৃষ্ট ভোজ্যে আপ্যায়িত করা হইত। ব্রাহ্মণগণ স্বস্তি ও পুণ্যাহবচনে গৃহস্বামীর কল্যাণ কামনা করিতেন এবং আশীর্ব্বাদ করিতেন।[৪৭]

গো-দোহন—ব্রাহ্মণগণও নিজেরাই গো-দোহন করিতেন। বর্ণিত আছে যে, জমদগ্নি শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প করিয়া স্বয়ং হোমধেনুকে দোহন করিয়াছিলেন।[৪৮] আজকাল কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণের দোহানো দুগ্ধ দৈব এবং পৈত্র্য কর্ম্মে ব্যবহৃত হয় না।

চিন্তার বহিঃপ্রকাশ—নখ দিয়া মাটী খোঁড়া এবং গম্ভীর দৃষ্টিতে নীচের দিকে চাহিয়া থাকা চিন্তার দ্যোতক।[৪৯] বিষণ্ণভাবে গালে হাত দিয়া কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও বোঝা যায়, কোন কঠিন সমস্যায় পড়িয়া চিন্তা করা হইতেছে।[৫০]

---

৪৫ এবমুক্তা সদৌ বিদ্যামৃতুপর্ণো নলায় বৈ। বন ৭২।২৯

৪৬ বারয়েয়মহং দ্যূতং বহূন দোষান্ প্রদর্শয়ন্। বন ১৩।২
স্ত্রিয়োঽক্ষা মৃগয়া পানমেতৎ কামসমুত্থিতম্। ইত্যাদি। বন ১৩।৭

৪৭ ততঃ পুণ্যে শিবে দেশে শান্তিং কৃত্বা মহারথাঃ। ইত্যাদি। আদি ২০৭।২৯। সভা ১।১৮
প্রবিশ্যাভ্যন্তরং শ্রীমান্ দৈবতান্যভিগম্য চ। ইত্যাদি। শা ৩৮।১৪-২১

৪৮ শ্রাদ্ধং সঙ্কল্পয়ামাস জমদগ্নিঃ পুরা কিল।
হোমধেনুস্তমাগাচ্ছ স্বয়মেব দুদোহ তাম্। অশ্ব ৯২।৪১

৪৯ দুর্য্যোধনঃ স্মিতং কৃত্বা চরণেনোল্লিখন্ মহীম্। বন ১০।২৯

৫০ দধ্যৌ চ সুচিরং কালং করাসক্তমুখাম্বুজাঃ। সভা ৭৯।৩৩

নর্ত্তকগণ অন্তঃপুরে পুরাণ কাপড় পাইতেন—অর্জ্জুন বৃহন্নলাবেশে বিরাটরাজার অন্তঃপুরে থাকিয়া কুমারীগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন। মারীরাও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরাণ কাপড়-চোপড় দান করিতেন।[৫১]

নববধূকে সঁপিয়া দেওয়া—নববধূকে তাহার পিতৃপক্ষীয় পুরুষেরা তিগৃহের প্রাচীনা কোনও রমণীর হাতে সঁপিয়া দিতেন।[৫২]

নিমন্ত্রণে দূত প্রেরণ—ব্যাপারাদিতে ব্রাহ্মণ ও রাজন্য প্রমুখ পুরুষগণকে নমন্ত্রণ করিতে দূত পাঠান হইত।[৫৩]

পতির নামগ্রহণ—সাধ্বী রমণীগণের মধ্যে কেহ কেহ পতির নাম খে আনিতেন না, তাঁহারা 'আর্য্য' বলিয়াই পরিচয় দিতেন। কেহ কেহ নামও উচ্চারণ করিতেন।[৫৪]

পতির প্রতি আশঙ্কা—ঋষি মন্দপালের উক্তি হইতে জানা যায়—তি সাধ্বী রমণীও পতিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। মহর্ষি বশিষ্ঠও সুব্রতা অরুন্ধতীর আশঙ্কার পাত্র ছিলেন। মন্দপাল বলিয়াছেন, এই মনোবৃত্তি নারীদের স্বভাবজাত। সম্ভবতঃ সাময়িক ক্ষোভ হইতেই ঋষির এই উক্তি।[৫৫]

পতিগৃহে এবং পিতৃগৃহে প্রসব—সাধারণতঃ পতিগৃহে থাকিয়াই নারীগণ সন্তান প্রসব করিতেন, কোন কোন গর্ভবতী পতিকুলের অনুমতিক্রমে পিতৃগৃহে চলিয়া যাইতেন এবং সেখানেই সন্তান প্রসব করিতেন।[৫৬]

প্রথম দর্শনে কুশল-প্রশ্নাদি—পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পর কুশল-প্রশ্নের বিনিময় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।[৫৭]

---

৫১ বাসাংসি পরিজীর্ণানি লব্ধান্যন্তঃপুরেঽর্জ্জুনঃ। বি ১৩।৮

৫২ দ্রৌপদীং সান্ত্বয়িত্বা চ সুভদ্রাং পরিদায় চ। সভা ২।৮

৫৩ নিমন্ত্রণার্থং দূতাংশ্চ প্রেষয়ামাস শীঘ্রগান্। বন ২৫৫।৬
সমাজ্ঞপ্তাস্ততো দূতাঃ পাণ্ডবেয়স্য শাসনাৎ। সভা ৩৩।৪২

৫৪ ধিগ্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য চ গাণ্ডীবম্। ইত্যাদি। বন ১২।৬৭, ৭৭, ৭৮
নরবীরস্য বৈ তস্য নলস্যানয়নে যত। বন ৬৯।২৯
আর্য্যঃ সূর্য্যরথং বোঢ়ুং গতোঽসৌ মাসচারিকঃ। শা ৩৫৭।৮

৫৫ সুব্রতা চাপি কল্যাণী সর্ব্বভূতেষু বিশ্রুতা।
অরুন্ধতী মহাত্মানং বশিষ্ঠং পর্য্যশঙ্কত॥ আদি ২৩৩।২৮

৫৬ তস্য জাতা ময়া দৃষ্টা দশার্ণেষু পিতৃগৃহে। বন। ৬৯।১৫

৫৭ চক্রতুশ্চ যথান্যায়ং কুশলপ্রশ্নসংবিদম্। আদি ২০৬।১০

প্রিয় সংবাদ শ্রবণে ধনদান—যে বার্ত্তাবহ কোন প্রিয় সংবাদ দি তাহাকে তখনই ধনরত্নাদি দিয়া পুরস্কৃত করা হইত।[৫৮]

বরদান—দেবতা, মানুষ, যক্ষ, রক্ষঃ, প্রসন্ন হইলে সকলেই বরদ করিতে পারেন; এমন কি, তির্য্যক্ প্রাণিগণও বরদানে সমর্থ। সং পুরুষের সংহত ইচ্ছাশক্তি হইতে জাত প্রসাদ বা আশীর্ব্বাদই বর হই দাঁড়ায়। বরদান এবং বরগ্রহণেরও নিয়মপ্রণালী ছিল। বৈশ্যবর্ণের ব্যা কাহারও নিকট হইতে একটির বেশী বর গ্রহণ করিতে পারিবেন : ক্ষত্রনারী তুইটি এবং ক্ষত্রিয়পুরুষ তিনটি বরের বেশী গ্রহণ করিতে পারেন ন ব্রাহ্মণ অসংখ্য বর গ্রহণ করিতে পারেন। শূদ্রের বিষয়ে কিছু বলা ঃ নাই।[৫৯]

বশীকরণ—মন্ত্র, ঔষধ প্রভৃতির সাহায্যে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বশীভূ করিতে পারে, এই ধারণা এবং বশীকরণের উপায় তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল। সুশিক্ষিতা মহিলা সত্যভামার মুখে বশীকরণের ক শুনিতে পাই।[৬০]

বালচাপল্য—পতিবিরহে বিবর্ণা উন্মত্তপ্রায়া দময়ন্তী যখন চেদিরাঃ পুরীতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একদল গ্রাম্য বালক কৌতূহলবশ তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। বালকদের এইপ্রকার চপলতা চিরদিন সমান।[৬১]

বিরাগে 'নমস্কার' শব্দের প্রয়োগ—নিবৃত্তি-অর্থে নমস্কার শব্দে প্রয়োগ পাওয়া যায়। 'বৈষয়িক চিন্তা করিবে না', 'বিষয়লিপ্সা হইতে নিবৃত্ত হইবে' এই অর্থে 'বিষয়কে নমস্কার করিবে'—এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। বাঙ্গালা ভাষায়ও নিবৃত্তি-অর্থে নমস্কার শব্দের প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু তাহাতে প্রায়ই একটু বিদ্রূপ বা অনুতাপের ভাব মিশ্রিত থাকে।[৬২]

ভর্ৎসনা—কাহাকেও ভর্ৎসনা করিতে শ্লেষপূর্ণ ভাষায় তাহার অনুষ্ঠিত

৫৮ প্রিয়াখ্যাননিমিত্তং বৈ দদৌ বহুধনং তদা। ইত্যাদি। অশ্ব ৮৭।১৬। বি ৬৮।২২

৫৯ একমাহুর্বৈশ্যবরং দ্বৌ তু ক্ষত্রস্ত্রিয়ো বরৌ।
ত্রয়স্তু রাজ্ঞো রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণস্য শতং বরাঃ। সভা ৭১।৩৫

৬০ ব্রতচর্য্যা তপো বাপি স্নানমন্ত্রৌষধানি বা। ইত্যাদি। বন ২৩২।৭,৮

৬১ অনুজগ্মুস্তত্র বালা গ্রামিপুত্রাঃ কুতূহলাৎ। বন ৬৫।৪৮

৬২ বিষয়েভ্যো নমস্কুর্য্যাদ্ বিষয়ান্ন চ ভাবয়েৎ। শা ১৯৬।১৫

অন্যায় আচরণগুলির উল্লেখ করা হইত এবং তাহাকে খুব বড় বড় বিশেষণ-যুক্ত করিয়া নিন্দা করা হইত। দ্রোণাচার্য্য দুঃশাসনকে এইভাবে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছেন।[৬৩]

ভাশুর-অর্থে শ্বশুর-শব্দ—ভাশুর-অর্থে শ্বশুর-শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। ভ্রাতৃশ্বশুর শব্দের ভ্রাতৃ শব্দ লুপ্ত হইয়া কেবল শ্বশুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।[৬৪]

ভাশুর ভ্রাতৃজায়ার সহিত আলাপ করিতেন না—ভাশুর ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে বোধ করি, আলাপ-ব্যবহার ছিল না। কুন্তীর সেবায় সন্তোষ লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর মারফতে কুন্তীকে আপন সন্তুষ্টির বিষয় জানাইয়াছেন।[৬৫]

ভূতাবেশের প্রবাদ—ভূতের দ্বারা যদি কেহ অভিভূত হয়, তাহা হইলে যেমন তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না, ভূতের ইচ্ছায়ই সে চলিতে থাকে; রণক্ষেত্রে যোদ্ধৃগণও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের সহিত যেন সেইরূপ অন্যপরিচালিত হইয়াই যুদ্ধ করিতেছিলেন।[৬৬] নলরাজার দেহে কলির অবস্থান সর্ব্বজনবিদিত।[৬৭]

ভূমিতে পদাঘাত—ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিপক্ষের মাথায় লাথি মারার উদ্দেশ্যে ভূমিতে পদাঘাত করা হইত এবং মুখে বলা হইত যে, "আমি তোমার মাথায় লাথি মারিলাম"।[৬৮]

মনুষ্যক্রয়-বিক্রয়—অর্থের বিনিময়ে মানুষ ক্রয় করা সমাজে প্রচলিত ছিল। একচক্রার কোনও ব্রাহ্মণপরিবারে যে-দিন বক-রাক্ষসের ভোজনের পালা, সেইদিন ব্রাহ্মণ বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—"আমার এমন বিত্ত নাই, যাহা দ্বারা একজন মানুষ খরিদ করিয়া বকের ভোজ্যরূপে পাঠাইতে পারি"।[৬৯]

মনুষ্য-বিক্রয় অবিহিত—মনুষ্যক্রয়-বিক্রয়ের কথা যদিও বলা হইয়াছে,

---

৬৩ দ্রো ১২০ তম অঃ।

৬৪ কৃতশৌচং ততো বৃদ্ধং শ্বশুরং কুন্তীভোজজা। আশ্র ১৯।৬

৬৫ গান্ধারি পরিতুষ্টোঽস্মি বধ্বাঃ শুশ্রূষণেন বৈ। আশ্র ১৮।৮

৬৬ আবিষ্টা ইব যুধ্যন্তে পাণ্ডবাঃ কুরুভিঃ সহ। ভী ৪৬।৩

৬৭ বন ৭২ তম অঃ।

৬৮ সর্ব্বেষাং বলিনাং মূর্দ্ধ্নি ময়েদং নিহিতং পদম্। ইত্যাদি। সভা ৩৯।২। সভা ৪৪।৪০

৬৯ ন চ মে বিদ্যতে বিত্তং সংক্রেতুং পুরুষং কচিৎ। আদি ১৬০।১৫

তথাপি মনুষ্য-বিক্রয় করা মহাভারতের অনুশাসনে অবিহিত। সম্ভবতঃ সমাজে প্রচলিত থাকিলেও সেই ব্যবহার বৈধ ছিল না, অথবা দেশবিশেষে কিংবা বিভিন্ন কালে প্রচলিত ছিল।[৭০]

মন্ত্র দ্বারা রাক্ষসী-মায়া নাশ—মন্ত্র দ্বারা রাক্ষসী-মায়া নাশ করার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭১]

মাঙ্গলিক দ্রব্য—কতকগুলি দ্রব্যকে মাঙ্গলিকরূপে ব্যবহার করা হইত। সেইসকল দ্রব্যকে গৃহে রাখা এবং উৎসবাদিতে যথাবিধি ব্যবহার করা গৃহস্থদের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। মেষ এবং গরুকে একত্রে রাখা বিশেষ কল্যাণপ্রদ। চন্দন, বীণা, দর্পণ, মধু, ঘৃত, লোহা, তাম্র, শঙ্খ, শালগ্রাম, রোচনা প্রভৃতি দ্রব্য গৃহে স্থাপন করিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়।[৭২] খই, চন্দনচূর্ণ প্রভৃতির বিকিরণ প্রত্যেক মাঙ্গলিক কৃত্যের অঙ্গীভূত ছিল।[৭৩] দধিপাত্র, ঘৃত এবং অক্ষত (আতপতণ্ডুল) কল্যাণপ্রদ দ্রব্যরূপে বিবেচিত হইত।[৭৪] শ্বেত পুষ্প, স্বস্তিক, ভূমি, সুবর্ণ, রজত, মণি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যের স্পর্শ কল্যাণজনক।[৭৫] যে-ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া গো, ঘৃত, দধি, সর্ষপ এবং প্রিয়ঙ্গু স্পর্শ করেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হন।[৭৬]

মৃগয়া—রাজাদের মধ্যে মৃগয়ার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই দেশে চলিতেছে। মহাভারত রচনার সময়ে যে-সকল ঘটনা পুরাতন ইতিহাসরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেইগুলির মধ্যেও মৃগয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। শান্তনু, পাণ্ডু, তাঁহার পুত্রগণ এবং কৃষ্ণের মৃগয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে।[৭৭]

৭০ অস্তোঽপ্যথ ন বিক্রেয়ো মনুষ্যঃ কিং পুনঃ প্রজাঃ। অনু ৪৫।২৩

৭১ অথ তাং রাক্ষসীং মায়ামুত্থিতাং ঘোরদর্শনাম্। ইত্যাদি। বন ১১।১৯

৭২ অজোক্ষা চন্দনং বীণা আদর্শো মধুসর্পিষী। ইত্যাদি। উ ৪০।১০,১১

৭৩ লাজৈশ্চন্দনচূর্ণৈশ্চ বিকীর্য্য চ জনাস্ততঃ। বন ২৫৩।২
তত্তশ্চন্দনচূর্ণৈশ্চ লাজৈশ্চাপি সমন্ততঃ। হরি, বিষ্ণুপ ১১৯ তম অঃ।

৭৪ বাচয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ দধিপাত্রঘৃতাক্ষতৈঃ। কর্ণ ১।১১

৭৫ অত্রোপবিষ্টো ধর্ম্মাত্মা শ্বেতাঃ সুমনসোঽস্পৃশৎ। শা ৩০।৭

৭৬ কল্য উত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ স্পৃশেদ্ গাং বৈ ঘৃতং দধি। ইত্যাদি। অনু ১২৬।১৮

৭৭ স কদাচিদ্ বনং রাজন্ মৃগয়াং নির্যযৌ পুরাৎ। ইত্যাদি। আদি ১৭৬।২। আদি ১১৮তম অঃ। আদি ৯৫।৫৯। আদি ৯৭।২৫। আদি ২২১।৬৪

রোদন—অতিশয় শোকে রোদনের সময় স্ত্রীলোকেরা বক্ষে করাঘাত করিতেন। চুলগুলি আপনা হইতেই এলোমেলো হইয়া যাইত ; অলঙ্কার, মাল্য প্রভৃতি অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িত। রোদনের সময় উত্তরীয়-বস্ত্র অথবা হাত দিয়া মুখ আবৃত করার দৃশ্যও দেখা যায়।[৭৮]

শপথ—শপথ করিবার নানাবিধ নিয়ম তৎকালে প্রচলিত ছিল। আজকালও সেইগুলি অক্ষুণ্ণই আছে। অরণ্যে জটাসুরবধের সময় ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "হে রাজন্, আমি আত্মা, ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্ম, সুকৃত এবং ইষ্টের দ্বারা শপথ করিতেছি, নিশ্চয়ই আমি এই রাক্ষসকে বধ করিব"। ভাবার্থ এই—যদি আমি বধ করিতে না পারি, তবে আপন ব্যক্তিত্ব, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য, ধর্ম্ম, সুকৃত এবং ইষ্ট হইতে যেন ভ্রষ্ট হই।[৭৯] শপথ এবং প্রতিজ্ঞা প্রায় একই রকমের। প্রতিজ্ঞা পালন করিতে না পারিলে 'অমুক পাপ বা অনিষ্ট যেন হয়' এইপ্রকার উক্তি যে প্রতিজ্ঞার সহিত সম্বদ্ধ, তাহারই নাম শপথ। বীর পুরুষরা আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেন। উদ্দেশ্য এই যে—যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারি, তবে আয়ুধ যেন আমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ না হয়।[৮০] মাথায় হাত দিয়া শপথের উল্লেখও পাওয়া যায়। অম্বা শাল্বপতিকে বলিতেছেন—"আমি মাথায় হাত দিয়া শপথ করিতে পারি, তোমা-ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিরূপে চিন্তা করি নাই।" সহস্রারে পরমশিবের অবস্থিতি, এই ধারণাতেই বোধ করি, মাথায় হাত দেওয়া অনেকটা দেববিগ্রহ স্পর্শ করার মত। দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়া নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিতেছি না, ইহাই সম্ভবতঃ শপথের তাৎপর্য্য।[৮১]

ভীমসেন কুরুসভায় দুর্য্যোধনের অশিষ্ট আচরণে অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া শপথ করিতেছেন, "যদি মহাযুদ্ধে তোমার এই উরু ভাঙ্গিতে না পারি,

৭৮ প্রকীর্ণমূর্দ্ধজাঃ সর্ব্বা বিমুক্তাভরণস্রজঃ।
উরাংসি পাণিভির্ঘ্নন্ত্যো ব্যলপন্ করুণং স্ত্রিয়ঃ॥ সৌ ৭।১৭
বাষ্পমাহারয়দ্দেবী বস্ত্রেণাবৃত্য বৈ মুখম্। ইত্যাদি। স্ত্রী ১৫।৩৩। আশ্র ১০।৭

৭৯ আত্মনা ভ্রাতৃভিশ্চৈব ধর্ম্মেণ সুকৃতেন চ। ইত্যাদি। বন ১৫৭।৫৫

৮০ প্রতিজানাসি তে সত্যং রাজন্নায়ুধমালভে। বন ২৫২।২৩

৮১ ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র তথা মূর্দ্ধানমালভে। উ ১৭৪।১৬

তবে যেন আমি পিতৃগণের সালোক্য প্রাপ্ত না হই”।[৮২] “অব্রতী, ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপ, গুরুদাররত, ব্রহ্মস্বহারী প্রভৃতি পাপিগণ যে লোকে গমন করে, আজ ধনঞ্জয়কে বধ না করিয়া যদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করি, তবে আমাদেরও সেই গতি হইবে—” সংশপ্তকগণ এইপ্রকার শপথ করিয়াছিলেন।[৮৩] অভিমন্যু শপথ করিতেছেন—“যদি আজ শত্রুপক্ষীয় কেহ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া জীবিত থাকে, তবে আমি অর্জ্জুনের পুত্র নহি, সুভদ্রা আমার গর্ভধারিণী নহেন”।[৮৪] পুত্রশোকে অধীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথ-বধের নিমিত্ত নানাপ্রকার শপথ করিতেছেন—“যদি আমি আগামী কল্য জয়দ্রথকে যুদ্ধে নিধন করিতে না পারি, তবে শূরসম্মত পুণ্যলোকে যেন আমার স্থান না হয়, আমি যেন পিতৃঘাতী, মাতৃঘাতী, গুরুদারগ, পিশুন প্রভৃতি, পাপীদের সমান গতি প্রাপ্ত হই”।[৮৫] বিসস্তৈন্যোপাখ্যানে বহুবিধ শপথের উল্লেখ করা হইয়াছে। যে বিসস্তৈন্য (চুরী) করিয়াছে, সে পা দিয়া গরু স্পর্শ করুক, সূর্য্যের দিকে পুরীষোৎসর্গ করুক, অনধ্যায় দিনে অধ্যয়ন করুক, শরণাগতকে হত্যা করুক, মিথ্যা সাক্ষ্য দান করুক, জলে পুরীষোৎসর্গ করুক—ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, এইসকল কাজে যে যে পাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, বিসতন্ত-চোরেরও সেই সেই পাপ হইবে।[৮৬]

শাপ—মহাভারতের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ ঘটনার মূলেই একটা না একটা অভিসম্পাত। জনমেজয়ের সর্পসত্র পণ্ড হইল, তার মূলে একটি সারমেয়ীর অভিসম্পাত। ভীষ্মের জন্ম, বিদুরের জন্ম, পাণ্ডুর মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনার মূলে এক-একটি অভিসম্পাত। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের মূলেও দুর্য্যোধনের প্রতি ঋষি মৈত্রেয়ের অভিসম্পাতকে অন্যতম কারণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এমন কি, মহাভারতে যিনি পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলিয়া বর্ণিত, সেই পার্থ-সারথিকেও গান্ধারীর অভিশাপে হীনভাবে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল। সমস্ত মহাভারতের অভিশাপগুলি একত্র সংগ্রহ করিলে সম্ভবতঃ সংখ্যায়

৮২ পিতৃভিঃ সহ সালোক্যং মাস্ম গচ্ছেদ্বৃকোদরঃ। সভা ৭১।১৪

৮৩ যে বৈ লোকাশ্চাব্রতিনাং যে চৈব ব্রহ্মঘাতিনাম্। ইত্যাদি। দ্রো ১৭।২৯-৩৫

৮৪ নাহং পার্থেন জাতঃ স্যাম্ ন চ জাতঃ সুভদ্রয়া। দ্রো ৩৪।২৭

৮৫ যদ্যেতদেবং সংগ্রামে ন কুর্য্যাং পুরুষর্ষভাঃ।
মাস্ম পুণ্যকৃতাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াং শূরসম্মতান্। ইত্যাদি। দ্রো ৭১।২৪-৩৯

৮৬ অনু ৯৩তম অঃ।

হাজারের কম হইবে না। একের সংহত ইচ্ছাশক্তি অপরের ভাগ্য, পৌরুষ প্রভৃতি সমস্তকে পরাভূত করিতে পারে—এই ভাবটি প্রকাশ করাই হয়ত শাপবর্ণনার অন্যতম উদ্দেশ্য। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কাহারও অভিসম্পাতের ব্যর্থতা কোথাও বর্ণিত হয় নাই। শাপ দিলে তাহার ফল অবশ্যই ফলিবে। তপঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষদের মনের শক্তি বেশী, তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি অপরের পৌরুষের প্রতিকূলে ক্রিয়া করিতে পারে—ইহা যোগিগণের অভিমত। কাহারও মনে কষ্ট দিলে ক্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণের সংহত শক্তি কষ্টদাতার ভাগ্য ও পৌরুষকে স্তব্ধ করিয়া ফেলে। শাপের বর্ণনার দ্বারা বোধ করি, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করাই প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাদের অভিপ্রেত। কেহ কেহ হাতে জল লইয়া অভিসম্পাত-বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিতেন।[৮৭]

শ্মশানসম্ভূত পুষ্পের অগ্রাহ্যতা—শ্মশান এবং দেবস্থানের পুষ্প বিবাহাদি পৌষ্টিক কর্ম্মে অথবা প্রসাধনে ব্যবহার করিতে নাই।[৮৮]

সন্ধ্যাকালে কর্ম্মবিরতি—সন্ধ্যাকালে সমস্ত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার বিধান। স্নান, ভোজন, অধ্যয়ন প্রভৃতি সায়ংকালে নিষিদ্ধ। তখন সংযতচিত্তে ভগবচ্চিন্তা করিবার নিয়ম।[৮৯]

সপত্নীবিদ্বেষ—সপত্নীদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ্য সকল যুগেই বিরল। মহাভারতের কয়েকটি সপত্নীবিদ্বেষের দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কশ্যপপত্নী কদ্রু ও বিনতার ঈর্ষ্যা ও বিবাদ পৌরাণিক উপাখ্যানে অতি প্রসিদ্ধ। এই বিবাদও জনমেজয়ের সর্পসত্রের অন্যতম কারণ। বিনতাকে দাসীরূপে পাইবার নিমিত্ত কদ্রুর কি জঘন্য চেষ্টা।[৯০] কুন্তী ও মাদ্রীর মধ্যেও বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। দুই একটি উক্তির ভিতর দিয়া তাঁহাদের পরস্পর বিদ্বেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কুন্তীর তিনটি পুত্র জন্মিয়াছে দেখিয়া মাদ্রী একদিন নির্জ্জনে পাণ্ডুকে বলিতেছেন, "মহারাজ, তোমার সন্তান উৎপাদনের অযোগ্যতা, কুন্তী-অপেক্ষা আমার নিজের কনিষ্ঠতা, এমন কি,

৮৭ ততঃ স বার্য্যুপস্পৃশ্য কোপসংরক্তলোচনঃ। বন ১০।৩২

৮৮ ন তু শ্মশানসম্ভূতা দেবতায়তনোদ্ভবাঃ।
সন্নয়েৎ পুষ্টিযুক্তেষু বিবাহেষু রহঃসু চ। অনু ৯৮।৩৩

৮৯ সন্ধ্যায়াঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন স্নায়েন্ন তথা পঠেৎ। ইত্যাদি। অনু ১০৪।১৪১

৯০ এবং তে সময়ং কৃত্বা দাসীভাবায় বৈ মিথঃ। আদি ২০।৫

গান্ধারীর শত পুত্রের জন্মসংবাদও আমাকে দুঃখিত করিতে পারে নাই ; কিন্তু মহারাজ, আমার সপত্নী কুন্তীদেবী পুত্রবতী হইলেন, আর আমি অপুত্রা রহিলাম—ইহা আমার পরম সন্তাপের কারণ। কুন্তী অনুগ্রহ করিলে (মন্ত্র শিখাইয়া দিলে) আমার গর্ভেও তোমার ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে। আমি তাঁহার সপত্নী, কি করিয়া এই অভিলাষ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করি। তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বল, তবে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে"।[২১] কুন্তীর অনুগ্রহে মাদ্রী নকুল ও সহদেবের জননী হইয়াছিলেন। পুনরায় মাদ্রীর যাহাতে সন্ততিসম্ভাবনা হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে পাণ্ডু কুন্তীকে নির্জ্জনে বলিলে পর কুন্তী উত্তর করিলেন—"রাজন্, আমি পুনরায় মাদ্রীকে আহ্বানমন্ত্র বলিয়া দিতে পারিব না ; আমি অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি, মাদ্রী আমাকে প্রতারণা করিয়াছে। এক মন্ত্রে অশ্বিনীকুমারকে আহ্বান করিয়া দুইটি পুত্র লাভ করিয়াছে। পুনরায় মন্ত্র শিখাইলে আমা অপেক্ষা মাদ্রীর পুত্রসংখ্যা বেশী হইবে, তাহাতে আমি আরও প্রতারিত হইব। সুতরা আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে আর এই অনুরোধ করিও না"।[২২] অর্জ্জুন নবপরিণীতা সুভদ্রাকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছেন। দেবতা, গুরুজন ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া একাকী অন্তঃপুরে দ্রৌপদীর নিকটে যাইবামাত্র প্রণয়কুপিতা দ্রৌপদী বলিলেন, "আর এখানে কেন ? সাত্বতাত্মজা সুভদ্রার নিকটে যাও, দৃঢ়তর অন্য বন্ধন থাকিলে পূর্ব্বের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়"। এইভাবে দ্রৌপদী নানা সকোপ বিলাপবাক্যে অর্জ্জুনকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অতি কষ্টে দ্রৌপদীকে শান্ত করিলেন এবং নববধূকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন।[২৩]

মন্দপালপত্নী জরিতা ও লপিতার মধ্যেও বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। ঋষি মন্দপাল ভার্য্যাদের কটুবাক্যে সময় সময় বড় দুঃখ বোধ করিতেন।[২৪] বিদুরনীতিতে উক্ত হইয়াছে—যাঁহাদের ঘরে সপত্নী বর্ত্তমান, সেইসকল

২১ ন মেঽস্তি ত্বয়ি সন্তাপো বিগুণেঽপি পরন্তপ। ইত্যাদি। আদি ১২৪।২-৬

২২ কুন্তীমথ পুনঃ পাণ্ডুর্মাদ্র্যর্থে সমচোদয়ৎ। ইত্যাদি : আদি ১২৪।২৫-২৮

২৩ তং দ্রৌপদী প্রত্যুবাচ প্রণয়াৎ কুরুনন্দনম্।
তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা। ইত্যাদি। আদি ২২১।১৬-১৯

২৪ আদি ২৩৩ তম অঃ।

মহিলা অতি দুঃখে কালাতিপাত করেন।[৯৫] সপত্নী ছাড়াও সমান অবস্থার একজন যদি খুব সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন, তবে অন্যের পক্ষে তাহা সহ্য করা কঠিন হয়। পরশ্রীকাতরতা পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সকল যুগেই সমান। দ্রৌপদী ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে হস্তিনাপুরে আসিয়াছেন, নানাবিধ উৎকৃষ্ট ভূষণে তিনি অলঙ্কৃতা। তাঁহার ঋদ্ধি দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণ সন্তুষ্ট হন নাই।[৯৬]

সভা-সমিতি—তখনকার সময়ে নিত্যই রাজাদের দরবার বসিত। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে অনেকে সমবেত হইয়া পরামর্শ করা, আমোদ-আহ্লাদ করা প্রভৃতি সমস্ত দেশ জুড়িয়াই ছিল। সভায় জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষগণ উপস্থিত না থাকিলে তাহাকে সভাই বলা হইত না। সভ্যগণ ধর্ম্মপথে থাকিয়া কথা বলিবেন, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে পরিষদের কোন অর্থই থাকে না। সভায় সত্য এবং ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইলে সভাসদ্‌গণ অধর্ম্মে লিপ্ত হন।[৯৭] সমিতিতে উপস্থিত সভ্যদের অনেকেই কথা বলিতেন না। অনেকের বক্তব্য বিষয়ে যদি মতভেদ না থাকে, তবে সকলের মুখপাত্রস্বরূপ এক ব্যক্তিই সেই অভিমত ব্যক্ত করিতেন। সাধারণতঃ বয়স এবং বিদ্যায় যাঁহাকে উপযুক্ত মনে করা হইত, তাহাকেই সভ্যগণ আপন প্রতিনিধিরূপে বলিবার ভার দিতেন।[৯৮] সভা-সমিতিতে বসিয়া কাহারও সহিত যদি গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় কোন বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহাকে সঙ্গে হইয়া সভাগৃহের বাহিরে যাইয়া পরামর্শ করিবার নিয়ম ছিল।[৯৯]

সোমপান—সোমপানে অধিকারিগণকে পুণ্যাত্মা বলিয়া মনে করা হইত।[১০০]

---

৯৫ যাং রাত্রিমবিবিন্না স্ত্রী। ইত্যাদি। উ ৩৫।৩১

৯৬ যজ্ঞসেন্যাঃ পরামৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা প্রজ্বলিতামিব। সভা ৫৮।৩৩

৯৭ ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধাঃ। ইত্যাদি। উ ৩৫।৫৮। উ ৯৫।৪৮
ধ্বস্তে ধর্ম্মে পরিষৎ সম্প্রদুষ্যেৎ। সভা ৭১।৪৮

৯৮ তেষামথ বৃদ্ধতমঃ প্রত্যাখ্যায় কৃতাঞ্জলী।
ঋষীণাং মতমাজ্ঞায় মহর্ষিরিদমব্রবীৎ। আদি ১২৬।২১
ততঃ সম্ভায় তে সর্ব্বে বাক্যাক্ষেপ সমাসতঃ।
একস্মিন্ ব্রাহ্মণে রাজন্নিবেশ্যোচুর্নরাধিপম। আশ্র ১০।১০

৯৯ তত উত্থায় ভগবান্ ব্যাসো দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
করে গৃহীত্বা রাজানং রাজবেশ্ম সমাবিশৎ। আদি ১৯৬।২১

১০০ পুণ্যকৃৎ সোমপোঽগ্নিমান্ বন ৬৪।৫০

ক্ষোভে বস্ত্রাঞ্চলাদি-কম্পন—ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলে গাত্রাবরণ, উত্তরীয়, অজিন প্রভৃতি কাঁপাইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করা হইত।[১০১]

অতিথিসেবা ও শরণাগতরক্ষণ

অতিথিসেবা নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত—অতি প্রাচীন কাল হইতে সমাজে অতিথিসেবা চলিয়া আসিতেছে। বৈদিক সাহিত্যেও এই বিষয়ে উপদেশ পাওয়া যায়। পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে মনুষ্যযজ্ঞ বা অতিথিসেবা অন্যতম।[১] (দ্রঃ ১০৭তম পৃঃ)।

অতিথির সেবা না করিলে পাপ—অতিথিকে গুরুজ্ঞানে পূজা করিবার নিয়ম ছিল। অতিথি যাঁহার গৃহে যথাযোগ্য সম্মান পান না, তিনি স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা প্রভৃতির সমান পাপে লিপ্ত হন। অতিথিকে বিমুখ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ সেই গৃহস্থকে ত্যাগ করেন। অতিথির আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করিতে হয়, তাঁহাকে অদেয় কিছুই নাই।[২]

অতিথি শব্দের অর্থ—যিনি অনির্দ্দিষ্ট কাল গৃহস্থের বাড়ীতে অবস্থিতি করেন, তিনিই অতিথি। অতিথি এক বেলার বেশী অবস্থান করেন না।[৩]

অতিথিসংকারে আড়ম্বর নিষিদ্ধ—অতিথিসংকারে আড়ম্বর নিষিদ্ধ। নিজের প্রয়োজনে যে আহার্য্যের আয়োজন করা হয়, অতিথিকেও তাহাই নিবেদন করিবে। অতিথির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কিছু করিতে যাওয়া উচিত নহে।[৪] বস্তুতঃ অতিথিসেবা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল বলিয়া প্রত্যহ অতিথির উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ আহার্য্যের ব্যবস্থা করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না। অধিক খরচের ভয়ে অতিথিভক্তি হ্রাস হওয়ারও আশঙ্কা। তাই বোধ করি, অতিথিসংকারে অনাবশ্যক আড়ম্বর নিষেধ করা হইয়াছে।

---

১০১ উদক্রোশন্ বিপ্রমুখ্যা বিধুন্বন্তোঽজিনানি চ। আদি ১৮৮।২

১ পঞ্চযজ্ঞাংস্তু যো মোহান্ন করোতি গৃহাশ্রমী। ইত্যাদি। শা ১৪৬।৭। শা ১১০।৫। অনু ২।৬৯-৯৩। অনু ১২৭।৯

২ অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে। ইত্যাদি। অনু ১২৬।২৬,২৮। শা ১১০।৫। শা ১৯১।১২

৩ অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে। অনু ৯৭।১৯

৪ আপো মূলং ফলঞ্চৈব মমেদং প্রতিগৃহ্যতাম্।
যদর্থো হি নরো রাজংস্তদর্থোঽস্যাতিথিঃ স্মৃতঃ। আশ্র ২৬।৩৬

অতিথিপূজার পদ্ধতি—অতিথি গৃহে আসিলে গৃহপতি দাঁড়াইয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা করিবেন, অতঃপর বসিবার আসন নিবেদন করিবেন। অতিথির পথক্লান্তি দূর হইলে তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা যথাবিহিত অর্চ্চনা করিবেন। এই নিয়ম সকল গৃহস্থের পক্ষেই সমান।[৫]

সমাজে বিশিষ্ট অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনা—যাঁহারা অভিজাত ঘরের লোক এবং ধনী তাঁহারা বিশিষ্ট অভ্যাগতের আগমন উপলক্ষ্যে বাড়ীর পথঘাট পরিষ্কার করাইতেন। পথকে চন্দনরসে সিক্ত করিয়া নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত করিতেন। নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফুল পথে ছড়ান হইত। গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া পথিমধ্যে অভ্যাগতকে স্বাগত আহ্বান করিবার নিয়ম ছিল। পুরীর বা গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এক-যোগে বিশেষ সম্মানিত অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করিতেন।[৬]

সম্মানিত অভ্যাগতকে বস্ত্রাদি উপঢৌকন দান—ধনিগণ সম্মানিত অভ্যাগতকে নানাবিধ মূল্যবান্ বস্ত্রাদি উপঢৌকন দিতেন।[৭]

রাজপুরীতে মুনি-ঋষিদের অভ্যর্থনা—মুনি-ঋষি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজপুরীতে আসিলে রাজা মন্ত্রী ও পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন। পুরোহিত অগ্রগামী হইয়া অর্ঘ্যাদি উপচার নিবেদন করিতেন।[৮]

অতিথি শত্রু হইলেও অভ্যর্থনা বিধেয়—শত্রুও যদি অতিথিরূপে উপস্থিত হন, তবে তাঁহারও যথারীতি অভ্যর্থনা করিবার নিয়ম ছিল। শত্রুর প্রদত্ত পাদ্য প্রভৃতি সকলে গ্রহণ করিতেন না।[৯]

---

৫ অভ্যাগচ্ছতি দাশার্হে প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরেশ্বরঃ।
সহৈব দ্রোণভীষ্মাভ্যামুদতিষ্ঠন্মহাযশাঃ॥ ইত্যাদি। উ ৯৪।৩৬-৩৮। উ ৮৯।১৩,১৪
তমাগতমৃষিং দৃষ্ট্বা নারদং সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। ইত্যাদি। সভা ৫।১৩-১৫
পাদ্যার্ঘাভ্যাং যথান্যায়মুপতস্থুর্মনীষিণঃ। বন ১৮৩।৪৮।অনু ৫২।১৩-১৮
সমীপতো ভীমমিদং শশাস প্রদীয়তাং পাদ্যমর্ঘ্যং তথাস্মৈ॥ আদি ১৯৩।২১

৬ সংমৃষ্টসিক্তপন্থানং পুষ্পপ্রকরশোভিতম্। ইত্যাদি। আদি ২২১।৩৬, ৩৭। উ৪৭।৪। উ ৮৪।২৫-২৯

৭ উ ৮৬ তম অঃ।

৮ তস্মৈ পূজাং ততোঽকার্ষীৎ পুরোধাঃ পরমর্ষয়ে। আদি ১০৫।২৯
ততঃ স রাজা জনকো মন্ত্রিভিঃ সহ ভারত।
পুরঃ পুরোহিতং কৃত্বা সর্ব্বাণ্যন্তঃপুরাণি চ। ইত্যাদি। শা ৩২৬।১-৫

৯ শত্রুতো নার্হণাং বয়ং প্রতিগৃহ্নীম। সভা ২১।৫৪

অতিথির প্রত্যাবর্ত্তনে অনুগমন—অতিথির প্রত্যাবর্ত্তনের সময় গৃহস্বামী কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিতেন।[১০] অতিথিসৎকারের খুবই উজ্জ্বল একটা আদর্শ সেই কালে প্রচলিত ছিল। কেবল পরিবার-পরিজন লইয়াই গৃহীর সংসার ছিল না। অনাত্মীয়কেও পরম আত্মীয়রূপে, এমন কি, দেবতারূপে দেখিবার মত উদার চক্ষু উন্মীলিত করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। দেবতা মানুষের কল্যাণ করিয়া থাকেন, অতিথিও গৃহের ক্ষুদ্র পরিসর হইতে গৃহীর দৃষ্টিকে উদার করিয়া থাকেন।

অতিথির ভোজনাবশিষ্ট অন্নের পবিত্রতা—অতিথিকে অন্নদান করার পর গৃহস্থের গৃহে যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাহার মত পূত আর কিছু হইতে পারে না—এই উক্তি হইতেও বুঝিতে পারি, গৃহীর অন্তঃকরণকে উদার ও প্রশস্ত করিবার নিমিত্তই অতিথিসেবাকে নিত্যকর্ম্মের ভিতরে স্থান দেওয়া হইয়াছে।[১১] আজকাল অতিথি প্রায় দেখাই যায় না। পথশ্রমে ক্লান্ত হইলেও পথিক নিজের পয়সা খরচ করিয়াই খাওয়া-দাওয়া করেন, কাহারও অতিথি হওয়া পছন্দ করেন না। গৃহস্থেরাও এখন প্রায়ই অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন না।

শিবির আত্মত্যাগ—বিপন্ন শরণাগত প্রাণীকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত বহু উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শুধু মানুষ নহে, ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত আর্য্য ঋষিগণের সদয় দৃষ্টি হইতে বাদ পড়ে নাই।[১২] রাজা শিবির আত্মত্যাগের উপাখ্যান সর্ব্বজনবিদিত। মহাভারতে একাধিক স্থানে ঐ উপাখ্যান কীর্ত্তন করা হইয়াছে।[১৩]

কপোত-লুব্ধক-সংবাদ—শান্তিপর্ব্বের কপোতলুব্ধক-সংবাদে শরণাগত-পালনের যে চমৎকার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতীব শিক্ষাপ্রদ। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলিয়াছেন, "মহারাজ, শরণাগত-পালনের ফল অতি মহৎ। শিবি-প্রমুখ সৎপুরুষগণ শরণাগত-পালনের ফলে সিদ্ধি

১০ প্রত্যুত্থানাভিগমনং কুর্য্যান্ন্যায়েন চার্চ্চনাম্। বন ২।৫৩

তেঽনুব্রজন্ত ভদ্রং বো বিষয়ান্তং নৃপোত্তমান্। ইত্যাদি। সভা ৪৫।৪৫,৪৬

১১ অতো মৃষ্টতরং নান্যৎ পূতং কিঞ্চিচ্ছতক্রতো।

দত্ত্বা যস্ত্বতিথিভ্যোঽন্নং ভুঙ্‌ক্তে তেনৈব নিত্যশঃ। বন ১৯৩।৩২

১২ আগতস্ত গৃহং ত্যাগস্তথৈব শরণার্থিনঃ। ইত্যাদি। আদি ১৬১।১০

১৩ বন ১৩০ তম ও ১৩১ তম অঃ। বন ১৯৪ তম অঃ। বন ১৯৬ তম অঃ। অনু ৩২শ

লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা ভার্গব মুচুকুন্দ রাজার নিকট কপোত ও লুব্ধকের যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি। তাহাতেই বুঝিতে পারিবে, একটি কপোত গৃহাগত শত্রু ব্যাধকে অর্চ্চনা করিয়া কিরূপে আত্মমাংস প্রদান করিয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহার কি উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছিল।”[১৪]

স্বর্গারোহণে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী কুকুর—যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণকালে কুকুররূপী ধর্ম্ম তাঁহার অনুগমন করেন। ইন্দ্র সেই কুকুরকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই। ইন্দ্রের অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “ভক্তকে ত্যাগ করা ব্রহ্মহত্যার সমান, সুতরাং কেবল আত্মসুখের নিমিত্ত আমি এই অনুগত কুকুরকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না”। ভীত, ভক্ত, আর্ত্ত বা প্রাণলিপ্সুকে আপন প্রাণের বিনিময়েও রক্ষা করিতে হয়। শরাণাগতের পরিত্যাগ, স্ত্রীবধ, মিত্রদ্রোহ এবং ব্রাহ্মণের বিত্তাপহরণ এই চারিটি কুকর্ম্ম ভক্তত্যাগের তুল্য।[১৫]

কুন্তীর দয়া—জতুগৃহ-দাহের পর সমাতৃক পাণ্ডবগণ যখন একচক্রা-গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন বক-রাক্ষসের বলিরূপে সেই পরিবার হইতে একজনকে যাইতে হইবে বলিয়া ক্রন্দনের রোল উঠিল। কুন্তীদেবী ব্রাহ্মণ-পরিবারকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন যে, তাঁহার একটি অমিতবল পুত্র রাক্ষসের বলি লইয়া যাইবে; রাক্ষস তাহাকে কিছুতেই গ্রাস করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর অনেক বাধা সত্ত্বেও কুন্তী ভীমসেনকে রাক্ষসের নিকট পাঠাইলেন। ভীম রাক্ষসকে অবলীলাক্রমে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। যদিও ব্রাহ্মণ-পরিবার কুন্তীর শরণাপন্ন হন নাই, তথাপি তাঁহাদের অসহায় করুণ অবস্থা দেখিয়া কুন্তীর হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল। ইহাও শরণাগতরক্ষণের সমান।[১৬]

১৪ শা ১৪৩ তম—১৪৯ তম অঃ।

১৫ ভক্তত্যাগং প্রাহুরত্যন্তপাপম্। ইত্যাদি। আশ্র ৩।১১-১৬

ভক্তঞ্চ ভজমানঞ্চ তবাস্মীতি চ বাদিনম্।

ত্রীণেতাঞ্ছরণপ্রাপ্তান্ বিষমেঽপি ন সংত্যজেৎ। উ ৩৩।৭২

১৬ আদি ১৬১ তম—১৬৩ তম অঃ।

যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে ক্ষমাগুণ—প্রধান প্রধান চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে বলা যাইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে ক্ষমাগুণ সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যত জায়গায় যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, প্রায় সর্ব্বত্র তাঁহার একই রূপ। মাত্র একদিন কর্ণের সহিত যুদ্ধে বিব্রত হইয়া তিনি কিঞ্চিৎ অধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন।[১]

শমীক-ঋষির অনুপম ক্ষমা—আরও একজন ঋষির চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, যাঁহাকে সাক্ষাৎ ক্ষমার মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। ঋষির নাম ছিল শমীক। মৌনব্রত ধ্যাননিমগ্ন ঋষির স্কন্ধে রাজা পরীক্ষিৎ মরা সাপ ঝুলাইয়া দিলেন। মুনি একটুও বিচলিত হইলেন না। তাঁহার পুত্র শৃঙ্গী সমবয়স্ক ঋষিপুত্র কৃশ হইতে এই সংবাদ জানিলেন এবং কৃশ এই বিষয়ে তাঁহাকে ভৎর্সনা করায় অতিশয় উত্তেজিত হইয়া অভিসম্পাত করিলেন, "যে পাপাত্মা আমার পিতার স্কন্ধে মরা সাপ ঝুলাইয়া দিয়াছে, সে আজ হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষকদংশনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে"। শমীক পুত্রের অভিসম্পাতের বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন, "বৎস, ভাল কর নাই। আমরা সেই রাজার অধীনে বাস করি, তাঁহাকে শাপ দেওয়া উচিত হয় নাই। ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অরক্ষিত হইলে মানুষকে নাশ করিয়া থাকে। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও পিতা তাহাকে উপদেশ দেন, সুতরাং বলিতেছি—তোমার পক্ষে শাপ দেওয়া উচিত হয় নাই। ক্রোধ যতিগণের দুঃখসঞ্চিত ধর্ম্মকে হরণ করিয়া থাকে, ধর্ম্মবিহীন পুরুষ ইষ্ট গতি প্রাপ্ত হন না। ক্ষমাসম্পন্ন যতিগণের পক্ষে একমাত্র শমই সিদ্ধির হেতু। ইহলোক ও পরলোক ক্ষমা দ্বারা বশ করা যায়। তুমি সতত ক্ষমার সেবা করিবে। এখন আমার যতটুকু সাধ্য, ততটুকু চেষ্টা করিয়া দেখিব, মহারাজের কিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারি কি না"। পুত্রকে এইমাত্র বলিয়া ঋষি একজন শিষ্যকে মহারাজের নিকট পাঠাইয়া বলিলেন—"তাঁহাকে বলিও, আমার স্কন্ধে মরা সাপ দেখিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমার পুত্র অধীর হইয়া পড়ে, সে তাঁহাকে এই প্রকার অভিসম্পাত করিয়াছে। আমি এই ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কি করিব, এখন আমার কোন হাত নাই, তিনি

১ কর্ণ ৬৮ তম অঃ।

যেন আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন"।[২] ঋষির ক্ষমা এবং অপকারীর উপচিকীর্ষা আমাদিগকে বিস্মিত করে। মহাভারতে অঙ্কিত চরিত্রে ক্ষমার এরূপ উদাহরণ আর নাই।

ক্ষমার প্রশংসা, যযাতির উপদেশ—যযাতি স্বর্গগমন-কালে পুরুকে উপদেশ দেন, অক্রোধন পুরুষ ক্রোধী হইতে উৎকৃষ্ট এবং তিতিক্ষু অতিতিক্ষু হইতে মহান্। তোমাকে কেহ মন্দ কথা বলিলেও তাহার প্রতি আক্রোশ করিও না; ক্ষমাশীল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্রোধ আক্রোশকারীকে দগ্ধ করিয়া থাকে। কাহারও অন্তরে কষ্ট দিও না, নৃশংসের মত আচরণ করিতে নাই। যে-বাক্যে অপর ব্যক্তি মনে কষ্ট পায়, তেমন বাক্য কাহাকেও বলিবে না। মৈত্রী, দয়া এবং দানের দ্বারা সকলকেই আপন করিতে পারা যায়"।[৩]

বিদুরনীতি—বিদুর বলিয়াছেন, চরিত্রের মৃদুতা, সর্ব্বভূতে অনসূয়া, ক্ষমা, ধৃতি এবং মৈত্রী মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে।[৪] অপকারীর অপকার করিতে সমর্থ হইয়াও যে পুরুষ ক্ষমা দ্বারা তাহাকে জয় করেন, তিনিই মহাত্মা। ক্ষমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণ আর কিছুই নাই। অশক্ত পুরুষ ত সামর্থ্য নাই বলিয়াই সাধারণতঃ নিরস্ত থাকিতে বাধ্য; তাহার ক্ষমা লোকের কাছে তেমন মর্য্যাদা পায় না। শক্তিশালী পুরুষ ক্ষমা করিলে তাঁহাকেই বীর বলা হয়।[৫]

যুধিষ্ঠিরদ্রৌপদী-সংবাদ—বনবাসক্লিষ্টা অভিমানিনী দ্রৌপদীর সান্ত্বনাচ্ছলে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—"ক্রুদ্ধ পুরুষের হিতাহিত-বিচার লুপ্ত হইয়া যায়, সে যাহা অভিরুচি তাহাই করিতে থাকে। জগৎ যদি কেবল ক্রোধেরই বশীভূত হইত, তবে লোকস্থিতি সম্ভবপর হইত না, কাটাকাটি মারামারির অন্ত

২ ন মে প্রিয়ং কৃতং তাত নৈষ ধর্ম্মস্তপস্বিনাম্। ইত্যাদি। আদি ৪১।২০-২২
পিত্রা পুত্রো বয়স্থোঽপি সততং বাচ্য এব তু। ইত্যাদি। আদি ৪২।৪-৭
শম এব যতীনাং হি ক্ষমিনাং সিদ্ধিকারকঃ।
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্॥ ইত্যাদি। আদি ৪২।৯-২১

৩ আদি ৮৭ তম অঃ।

৪ মার্দ্দবং সর্ব্বভূতানামনসূয়া ক্ষমা ধৃতিঃ।
আয়ুষ্যাণি বুধাঃ প্রাহুর্মিত্রাণাঞ্চাপি মাননা॥ উ ৩৯।৫৩

৫ নাতঃ শ্রীমত্তরং কিঞ্চিদন্যৎ পথ্যতমং মতম্।
প্রভবিষ্ণোর্যথা তাত ক্ষমা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ ইত্যাদি। উ ৩৯।৫৭-৬০

থাকিত না। পৃথিবীসম সর্ব্বংসহ পুরুষগণ আছেন বলিয়াই লোকস্থিতি সম্ভবপর হইতেছে। যিনি সামর্থ্য সত্ত্বেও অপরের দ্বারা আক্রুষ্ট বা তাড়িত হইয়া কোন প্রত্যপকারের চিন্তা করেন না, তিনিই পুরুষোত্তম; তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। ক্রোধন পুরুষ অল্পজ্ঞ, সে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইতে দূরে। মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমাবান্ পুরুষ সম্বন্ধে যে গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি—ক্ষমাহীন পুরুষের ধর্ম্মাচরণ নিরর্থক, ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা শ্রেষ্ঠ তপস্যা। ক্ষমাশীল পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞবিদের গতি প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মলোক তাঁহাদের পক্ষে সুখলভ্য। ক্ষমা তেজস্বী পুরুষের তেজ, ক্ষমা তপস্বীর ব্রহ্ম, ক্ষমা সত্যবাদীর সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ এবং ক্ষমাই শম। যাহাতে সত্য, ব্রহ্ম, যজ্ঞ এবং লোকত্রয় প্রতিষ্ঠিত, সেই ক্ষমাকে কি ত্যাগ করা যায়? ক্ষমা এবং অনৃশংসতাই সনাতন ধর্ম্ম"।[৬]

শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা—মহামতি বিদুর বলিয়াছেন—ক্ষমা পরম বল, ক্ষমা অশক্তের পক্ষে একটি গুণ এবং শক্তের ভূষণ। সংসারে ক্ষমা উত্তম বশীকরণ, ক্ষমা দ্বারা সকলই সাধিত হয়। শান্তিরূপ খড়্গ হাতে থাকিলে দুর্জ্জন ব্যক্তি কি করিতে পারে? ক্ষমাশীল পুরুষের প্রতি যদি কেহ ক্রুদ্ধ হয়, তবে তাহার ক্রোধ অতৃণে পতিত বহ্নির মত আপনা হইতেই প্রশমিত হইয়া থাকে। ক্ষমাই পরম শান্তি।[৭]

ক্রোধশান্তিতে ক্ষমার শক্তি—ক্রোধীর ক্রোধ শান্ত করিতে ক্ষমার মত উৎকৃষ্ট সাধন আর কিছু নাই। অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা, কদর্য্যকে দানের দ্বারা এবং অনৃতকে সত্যের দ্বারা জয় করিবে।[৮]

৬। যদি ন স্যুর্মানুষেষু ক্ষমিণঃ পৃথিবীসমাঃ।
ন স্যাৎ সন্ধির্মনুষ্যাণাং ক্রোধমূলো হি বিগ্রহঃ॥ বন ২৯।২৫-৫২

৭ ক্ষমা গুণো হ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা। ইত্যাদি। উ ৩৩।৫৩-৫৬। উ
শ্লাঘনীয়া যশস্যা চ লোকে প্রভবতাং ক্ষমা। শা ১১।৬৮

৮ হন্তি নিত্যং ক্ষমা ক্রোধম্। ইত্যাদি। উ ৩৯।৪৪। বন ১৯৪।৬
অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥ উ ৩৯।৭৩

শম-দমের প্রশংসাচ্ছলে ক্ষমার উল্লেখ—বহু জায়গায় নানা প্রসঙ্গে শম ও দমের প্রশংসা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ শান্তিপর্ব্বে এই বিষয়ে এত বেশী বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তাহার সঙ্কলনে প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া দাঁড়ায়। মোক্ষধর্ম্মের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের অল্পবিস্তর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দম, তপঃ, সত্য প্রভৃতির প্রশংসাপর এক-একটি অধ্যায় আপদ্ধর্ম্ম-প্রকরণেও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে যে-সকল মানস সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন অপরিহার্য্য, সেইসকল বিষয়ের উপদেশে শান্তিপর্ব্ব পরিপূর্ণ। দম-প্রশংসাধ্যায়ে বলা হইয়াছে, "দমের সমান ধর্ম্ম জগতে কিছুই নাই। অদান্ত পুরুষকে নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। আশ্রম-চতুষ্টয়ে দমই উত্তম ব্রত। ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, আর্জ্জব, জিতেন্দ্রিয়তা, দাক্ষ্য, মার্দ্দব, হ্রী, অচাপল্য, অকার্পণ্য, অসংরম্ভ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অবিহিংসা ও অনসূয়া এই কয়েকটি একত্র হইলেই তাহাকে দম বলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, স্তম্ভ, অহঙ্কার, রোষ, ঈর্ষ্যা, পরাবমাননা প্রভৃতি দান্ত পুরুষে কখনও দেখা যায় না। সদ্‌গুণাবলীর মধ্যে যে-কোনও একটি যদি চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে অপরগুলি আপনা-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, তন্নিমিত্ত কোন চেষ্টা করিতে হয় না। মৈত্রী, শীলতা, প্রসন্নতা ও তিতিক্ষা পুরুষকে দেবত্বে উন্নীত করিতে পারে। ক্ষমার গুণ অসংখ্যেয়, ক্ষমা দ্বারা সমস্ত লোক বশ করা যায়। দান্ত পুরুষের অরণ্যে কি প্রয়োজন? তিনি যেখানে বাস করেন, সেই স্থানই পবিত্র আশ্রম। জ্ঞানারাম দান্ত পুরুষের কাহারও সহিত বিরোধ নাই, তিনি সত্যসঙ্কল্প, সত্যকাম, সমস্ত লোকে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্মের ভয় নাই। শুচি সত্যাত্মা পুরুষ ক্ষমার দ্বারা সত্যসংস্কারাদি গুণের অধিকারী হইয়া উভয় লোক জয় করিতে সমর্থ হন।[১]

ক্ষমাশীল ব্যক্তির পরাভব—ক্ষমার গুণ যদিও অসংখ্য, তথাপি তাহার একটি দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। অবিবেচক পুরুষেরা ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে প্রত্যপকারে অশক্ত মনে করিয়া তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ অসদ্‌-ব্যবহার করিতে থাকে। অনার্য্য পাপাত্মা, সাধু পুরুষকে সর্ব্বদা অবমাননা করিয়া থাকে। সুতরাং ক্ষমা যদিও উৎকৃষ্ট মানস বৃত্তি, তথাপি সেইরূপ দুষ্ট

---

১ শা ১৬০ তম অঃ।

লোককে ক্ষমা করা অনুচিত। নিতান্ত নীচমনা দুষ্ট লোক ক্ষমার মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করে যে, ক্ষমাশীল ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার নিকট পরাজিত।[১০]

সর্ব্বদা ক্ষমা করা উচিত নহে—ক্ষমা এবং তেজস্বিতা প্রদর্শনের মধ্যে কোনটি ভাল, এই বিষয়ে বলি তাঁহার পিতামহ প্রহ্লাদকে প্রশ্ন করিলে প্রহ্লাদ উত্তর দিয়াছিলেন—"বৎস, সর্ব্বদা তেজঃপ্রদর্শন বা সর্ব্বদা ক্ষমা করা এই দুইটির কোনটিই সঙ্গত নহে। যিনি সতত ক্ষমা করিয়া থাকেন, ভৃত্যগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া চলে, শত্রু এবং মধ্যস্থ পুরুষেরাও তাঁহাকে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। সাধারণ অজ্ঞ লোকও তাঁহাকে ঠকাইতে চেষ্টা করে। তাঁহার ধনসম্পত্তিতে যেন সকলের সমান অধিকার; যাহার যেমন খুশি খরচ করিতে থাকে। তাঁহাকে কটুকথা বলিতে কেহ ইতস্ততঃ করে না। প্রেষ্য, পুত্র, ভৃত্য, পত্নী প্রভৃতি পরিবার-পরিজনের নিকটেও তিনি নিতান্তই অবজ্ঞা এবং অনুগ্রহের পাত্র। সর্ব্বসাধারণ তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারে না, সুতরাং সংসারে থাকা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র।[১১]

সতত উগ্রতা বর্জ্জনীয়—যাঁহারা ক্ষমা কাহাকে বলে জানেন না, সব-সময় উগ্রভাবে ব্যবহার করেন, তাঁহারাও সুখী হইতে পারেন না। মিত্রবিরোধ, স্বজনদ্বেষ প্রভৃতি তাঁহাদের ভাগ্যে অপরিহার্য্য। অপমান, অর্থ-হানি, উপালম্ভ, অনাদর, সন্তাপ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মোহ প্রভৃতি হইতে নির্লিপ্তভাবে থাকা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। শীঘ্রই তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যভ্রংশ হয়, এমন কি, প্রাণনাশ ঘটিবারও আশঙ্কা থাকে। যে-ব্যক্তি উপকারী এবং অপকারী উভয়ের প্রতিই উগ্র ব্যবহার করে, তাহাকে দেখিলেই মানুষ সাপের মত ভয় করে। মানুষ যাহাকে সংশয়ের চক্ষে দেখে, যাহাকে দেখিলেই সাধারণ লোকের আতঙ্ক বা উদ্বেগ উপস্থিত হয়; তাহার জীবন অশান্তিময়, কল্যাণের কল্পনা তাহার সুদূর-পরাহত।[১২]

১০ এক এব দমে দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে।
যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ। শা ১৬০।৩৪
একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে। ইত্যাদি। উ ৩৩।৫২
ক্ষমাবন্তং হি পাপাত্মা জিতোঽয়মিতি মন্যতে। দ্রো ১৯৬।২৬

১১ ন শ্রেয়ঃ সততং তেজো ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা। ইত্যাদি। বন ২৮।৬-১৫

১২ অথ বৈরোচনে দোষানিমান্ বিদ্ধ্যক্ষমাবতাম্। ইত্যাদি। বন ২৮।১৬-২২

সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিতে হয়—সতত উগ্রতা বা সতত ক্ষমা প্রদর্শন, কোনটিই ভাল নহে। সময় বুঝিয়া মৃদু আচরণ করিবে, আবার সময়মত তীক্ষ্ণভাব অবলম্বন করিবে। যিনি সময় বুঝিয়া উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সুখে সংসার করিতে পারেন।[১৩]

ক্ষমার পাত্রাপাত্র ও কালের বিবেচনা—ক্ষমার উপযুক্ত কাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—যিনি পূর্ব্বে কোনও উপকার করিয়াছেন, তিনি গর্হিত ভাবে কোন অপকার করিলেও তাঁহাকে ক্ষমা করা উচিত। মানুষ সবসময় বিশেষ চিন্তা করিয়া কাজ করে না, যদি নিতান্ত খেয়ালের বশে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কেহ অন্যায় আচরণ করে, তবে তাহাকে ক্ষমা করিবে। স্বেচ্ছায় অন্যায় ব্যবহার করিয়া যদি পরে মিথ্যা কথা বলে, তাহা হইলে সেই শঠ পাপবুদ্ধিকে ক্ষমা করিতে নাই। প্রথমকৃত অপরাধের জন্য প্রত্যেককেই ক্ষমা করা উচিত। দ্বিতীয় বার সমান-জাতীয় অপরাধ করিলে কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে নাই। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে যদি জানা যায়, অপরাধটি অজ্ঞানকৃত, তাহা হইলে শাস্তি দেওয়া নিতান্তই অন্যায়। বিবেচক অপরাধীকে ক্ষমা করিলে সে কঠোর শাসন অপেক্ষাও তীব্র অনুতাপ ভোগ করে।[১৪]

লোকনিন্দার ভয়ে ক্ষমা—দেশ, কাল এবং আপনার শক্তিসামর্থ্য বুঝিয়া ক্ষমা করিতে হয়। অনেক সময় লোকনিন্দার ভয়ে অপরাধীকে ক্ষমা করিতে হয়।[১৫]

শ্রদ্ধা ভিন্ন কিছুই নিষ্পন্ন হয় না—যে-কোনও কাজ শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হয় না। আন্তরিক নিষ্ঠাকেই শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই পূর্ণ ফল প্রদান করিতে সমর্থ। দান, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই শ্রদ্ধার সহিত করিতে হয়। অশ্রদ্ধা পরম পাপ, আর শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচিনী। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও পবিত্রই থাকেন। শ্রদ্ধাহীনের কোনও কাজ সফল হইতে পারে না।[১৬]

১৩ তস্মান্নাত্যুংস্জেত্তেজো ন চ নিত্যং মৃদুর্ভবেৎ। ইত্যাদি। বন ২৮।২৩,২৪

১৪ ক্ষমাকালাংস্তু বক্ষ্যামি শৃণু মে বিস্তরেণ তান্। ইত্যাদি। বন ২৮।২৫-৩১

১৫ দেশকালৌ তু সংপ্রেক্ষ্য বলাবলমথাত্মনঃ। ইত্যাদি। বন ২৮।৩২,৩৩

১৬ অশ্রদ্ধা পরমং পাপং শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচিনী।
জহাতি পাপং শ্রদ্ধাবান্ সর্পো জীর্ণামিব ত্বচম্। ইত্যাদি। শা ২৬৩।১৫-১৯

শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ তামস—সশ্রদ্ধ অনুষ্ঠান পুরুষকে অনন্ত ফল প্রদান করে। শ্রদ্ধধান পুরুষের সৎকর্মজনিত ধর্ম্ম অক্ষয়ত্ব লাভ করে। শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞকে 'তামস যজ্ঞ' বলা হইয়াছে।[১৭]

সাত্ত্বিকাদি-ভেদে শ্রদ্ধা তিনপ্রকার—জন্মান্তরীয় সংস্কারের বলে মানুষ সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া থাকেন। যে-ব্যক্তি যে-প্রকার শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাঁহার সেই প্রকৃতি প্রবল হইয়া উঠে। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি সাত্ত্বিক, রাজস শ্রদ্ধাসম্পন্ন রাজস এবং তামস শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি তামস প্রকৃতির হন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ পৃথক্।[১৮]

অশ্রদ্ধার অনুষ্ঠান নিষ্ফল—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"হে পার্থ, অশ্রদ্ধার সহিত হোম করা, কাহাকেও কিছু দান করা, তপস্যা, অথবা অন্য যে-কোনও অনুষ্ঠান করা হয় না কেন, তাহাই অসৎকর্ম্ম। সেই কর্ম্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও কল্যাণপ্রসূ হয় না।"[১৯]

অহঙ্কার ও কৃতঘ্নতা

অহঙ্কারী দুর্য্যোধনের পরিণতি—অত্যধিক অহঙ্কারের ভীষণ পরিণতি মহাভারতে চিত্রিত হইয়াছে। অহঙ্কারী দুর্য্যোধনের শেষ পরিণতি বড়ই করুণ। তাঁহার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূলে অহঙ্কার, গুরুজনের অবমাননা, অতি লোভ এবং জ্ঞাতিহিংসা। বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের চরিত্র নানা দিক্ দিয়া উজ্জ্বল হইলেও দুর্য্যোধনের অহংবৃদ্ধিতে তিনিই প্রধান সহায়ক ছিলেন।

অহঙ্কার ত্যাগের উপদেশ—অহঙ্কারের দোষ প্রদর্শন করিয়া হাজার হাজার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শান্তিপর্ব্বের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই দুই

১৭ অপি ক্রতুশতৈরিষ্ট্বা ক্ষয়ং গচ্ছতি তদ্ধবিঃ।
ন তু ক্ষীয়ন্তি তে ধর্ম্মাঃ শ্রদ্দধানৈঃ প্রযোজিতাঃ॥ অনু ১২৭।১১
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে। ভী ৪১।১৩
দৈবতং হি মহচ্ছ্রদ্ধা পবিত্রং যজতাঞ্চ যৎ। ইত্যাদি। শা ৬০।৪১-৪৫

১৮ ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। ইত্যাদি। ভী ৪১।২-২৭

১৯ অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ভী ৪১।২৮

চারিটি শ্লোক পাওয়া যায়, যাহাতে শম, দম প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

অহঙ্কার পতনের হেতু—মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সহদেব পথিমধ্যে পড়িয়া গেলে ভীমের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সহদেব কাহাকেও আপনার সমান প্রাজ্ঞ মনে করিতেন না, অত্যধিক অহঙ্কারই তাঁহার পতনের কারণ"। নকুলের রূপের খুব অহঙ্কার ছিল। এই কারণে তাঁহারও পতন ঘটে। ভীমসেন এবং অর্জ্জুনও অহঙ্কারের জন্যই পথিমধ্যে পতিত হন।[১]

যযাতির অধঃপতন—দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গত যযাতিকে প্রশ্ন করিলেন, "রাজন, তুমি জীবনে অনেক পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তপঃশক্তিতে তুমি কাহার তুল্য?" উত্তরে যযাতি বলিয়াছিলেন, "দেবরাজ, আমি ত্রিভুবনে আমার সমান তপস্বী পুরুষ দেখিতেছি না, এরূপ কঠোর তপস্যা অন্য কেহ করিতে পারেন না।" দেবরাজ যযাতির এইপ্রকার সদম্ভ উক্তি শুনিয়া বলিলেন, "অতিশয় গর্ব্বেই তোমার সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হইয়াছে, এখন তুমি স্বর্গে বাস করিবার উপযুক্ত নহ, শীঘ্রই মর্ত্ত্যে তোমার পতন ঘটিবে"।[২]

নহুষের সর্পত্বপ্রাপ্তি—নহুষ পুণ্যফলে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি শচীদেবীকে অঙ্কশায়িনীরূপে পাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দেবতাগণ তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। পরে বৃহস্পতির পরামর্শে শচীদেবী নহুষকে বলিলেন, "যদি মহর্ষিগণকে রথের বাহন নিযুক্ত করিয়া আমার মন্দিরে যাইতে পারেন, তবে অবশ্যই আপনাকে বরণ করিব।" নহুষ বলদর্পে হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অগস্ত্যাদি-ঋষিগণকে রথে যোজনা করিলেন, পথে কথাপ্রসঙ্গে ঋষিদের সঙ্গে কলহ আরম্ভ হইল। ক্রুদ্ধ দর্পিত নহুষ অগস্ত্যের মাথায় লাথি মারিলেন। এতদিনে তাঁহার

১ মহাপ্র ২য় অঃ।

২ নাহং দেবমনুষ্যেষু গন্ধর্ব্বেষু মহর্ষিষু।
আত্মনস্তপসা তুল্যং কঞ্চিৎ পশ্যামি বাসব। ইত্যাদি। আদি ৮৮।২,৩

অত্যাচারের কুফল ফলিল। মহর্ষির শাপে সর্পরূপ ধারণ করিয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন।[৩]

আত্মগুণ-খ্যাপন আত্মহত্যার সমান—নিজের মুখে নিজের গুণাবলী প্রচার করা আত্মহত্যার সমান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যিনি গাণ্ডীবের নিন্দা করিবেন, তাঁহাকেই বধ করিবেন। একদিন কর্ণশরে জর্জ্জরিত যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি অর্জ্জুনকে কটু বাক্যে তিরস্কার করিলেন, প্রসঙ্গতঃ গাণ্ডীবেরও নিন্দা করিলেন। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শান্ত করেন এবং বলেন যে, গুরুজনের অবমাননাই তাঁহার মৃত্যুর সমান। সুতরাং যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক ভৎর্সনা করিলেই অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে। অর্জ্জুন কৃষ্ণের কথামত যুধিষ্ঠিরকে ভৎর্সনা করিলেন। তাহাতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপমান করায় অর্জ্জুনের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি আত্মহত্যার নিমিত্ত অসি নিষ্কাশন করিবামাত্র কৃষ্ণ তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "অর্জ্জুন, আত্মহত্যা মহাপাপ ; তোমার মত বীর পুরুষ সামান্য কারণে এত বিচলিত হইলে চলিবে কেন? স্থির হও, বাক্য দ্বারা যেমন অপরকে হত্যা করা যায়, বাক্যের দ্বারা তেমন আত্মহত্যাও করা যাইতে পারে। নিজের মুখে নিজের স্তুতি কর, তাহাতেই আত্মহত্যা করা হইবে"। অর্জ্জুন কৃষ্ণের উপদেশ-অনুসারে আত্মহত্যা করিলেন। আত্মগুণ-খ্যাপন অতিশয় গর্হিত, এই কথা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই বোধ করি, এই উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইয়াছে।[৪]

কৃতঘ্নতার দোষ—উপকারীর প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিয়া কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা অত্যন্ত গর্হিত। ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, চোর, ভগ্নব্রত প্রভৃতি পাপী পুরুষ প্রায়শ্চিত্ত করিলে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির পক্ষে কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমরণ তাহাকে মিত্রদ্রোহের ফল ভোগ করিতে হয়।[৫]

৩ উ ১৭শ অঃ। বন ১৭৯ তম অঃ। অনু ১০০ তম অঃ।

৪ ব্রবীহি বাচাদ্য গুণানিহাত্মনস্তথা হতাত্মা ভবিতাসি পার্থ। কর্ণ ৭০।২৯
কামং নৈতৎ প্রশংসন্তি সন্তঃ স্ববলসংস্তবম্ ; আদি ৩৪।২

৫ ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা রাজন্ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ইত্যাদি। শা ১৭২।২৫,২৬। শা ১৭৩।১৭

দানপ্রকরণ

ইহলোকে ও পরলোকে দানের ফলভোগ—দানের ফল ঐহিক এবং পারত্রিক। দান করিলে দাতার আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, পরলোকেও তিনি পুণ্যফল ভোগ করেন। যথাসাধ্য দান করিবার নিমিত্ত সকলকেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। দানের ফলে দাতার স্বর্গপ্রাপ্তির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনুশাসনপর্ব্বে দানের মাহাত্ম্য নানাভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই কারণে অনুশাসনপর্ব্বকে দানধর্ম্মও বলা হয়।[১]

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, দান এবং তপস্যার মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। তাহার উত্তরে মহর্ষি বলিলেন, "তাত, দান অপেক্ষা দুষ্কর আর কিছুই নাই। মানুষ অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত যত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে। ধনের নিমিত্ত সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করা, পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করা প্রভৃতি কিছুই অসম্ভব নহে। মানুষ অর্থের নিমিত্ত দাসত্ব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এরূপ দুঃখার্জ্জিত অর্থ অন্যকে দিয়া দেওয়া খুবই মহৎ অন্তঃকরণের পরিচায়ক। সৎপাত্রে দান অপেক্ষা ন্যায়োপার্জ্জিত ধনের উত্তম গতি আর কিছুই হইতে পারে না।[২]

সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ দান—দান তিনপ্রকার, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। যে-ব্যক্তি কখনও দাতার কোন উপকার করেন নাই, সেই ব্যক্তির পাত্রত্ব বিবেচনা করিয়া পুণ্য স্থানে, পুণ্য কালে, তাঁহাকে দান করার নাম 'সাত্ত্বিক দান'। প্রত্যুপকার অথবা অন্য কোন ফলের আশায় দান করিয়া পরে প্রদত্ত বস্তুর জন্য যদি অনুশোচনা করিতে হয়, তবে সেই দানই 'রাজস দান'। স্থান, কাল ও পাত্রের বিচার না করিয়া অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার সহিত দান করিলে সেই দানই 'তামস'-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে।[৩] দান করিয়া যিনি অনুশোচনা করেন, তাহাকে 'নৃশংস' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।[৪]

১ দানং দমং পবিত্রী স্যাং। অনু ৯৩।১২। অনু ১৬৩।১২
অনু ৬০ তম।৬।১৩৭ তম অঃ।

২ বন।২৫৮তম অঃ।

৩ দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। ইত্যাদি। ৪১।২০-২২

৪ দত্তানুতাপী। উ ৪৩।১৯

মতান্তরে পঞ্চবিধ দান—অন্যত্র দানকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, ভয়, কাম এবং করুণা এই পাঁচ কারণে দান করা হয়। অসূয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে যে দান করা হয়, ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে সেই দানের ইচ্ছা হইয়া থাকে। অমুক ব্যক্তি আমাকে কিছু দিয়াছে, দিতেছে বা দিবে—ইহা মনে করিয়া যদি কাহাকেও দান করা হয়, তখন বুঝিতে হইবে, দানের পশ্চাতে প্রতিদান পাওয়ার ইচ্ছা আছে। এইরূপ দানের নাম অর্থদান। দুষ্টপ্রকৃতি পুরুষ পাছে অনিষ্ট ঘটায়, এই আশঙ্কায় তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত সুধী ব্যক্তিকেও দান করিতে হয়, এইপ্রকার দানের হেতু ভয়। প্রিয়জনের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত যে দান করা হয়, তাহার নাম কাম-দান। দীন, ভিক্ষুক, অনাথ প্রভৃতিকে যে দান করা হয়, তাহার হেতু করুণা, সেই দানের নাম কারুণ্য-দান।[৫]

অশ্রদ্ধার দান অতি নিন্দিত—উল্লিখিত পাঁচপ্রকার দানের মধ্যে ধর্ম্মদান ও কারুণ্যদানকে সাত্ত্বিক বলা যাইতে পারে। সাত্ত্বিক দানে দাতার অহঙ্কার জন্মিতে পারে না। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করা নিতান্ত গর্হিত।[৬]

নিষ্কাম দানের প্রশস্ততা—কোন কিছু কামনা না করিয়া দান করাই প্রশস্ত। শিবিচরিতে দেখা যায়, মহারাজ শিবি নিষ্কাম দানের প্রশস্ততা কীর্ত্তন করিয়াছেন।[৭]

দানের উপযুক্ত পাত্র—অক্রোধ, সত্যবাদী, অহিংস, দান্ত, সরল-প্রকৃতি, শান্ত, আচারবান্ পুরুষই দানের উপযুক্ত পাত্র। যে ব্রাহ্মণ আপন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে দান করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।[৮]

অপাত্রে দানে দাতার অকল্যাণ—উৎকৃষ্ট পাত্রে দান করিবার যেমন বিধান আছে, সেইরূপ অপাত্রে দানের বহু নিন্দাও করা হইয়াছে। যাহারা

৫ অনু ১৩৮তম অঃ। ভয়েং কদর্য্যাং দানেন। উ ৩৯।৭৪। বন ১৯৪।৬

৬ কালে চ শক্ত্যা মৎসরং বর্জ্জয়িত্বা শুদ্ধাত্মানঃ শ্রদ্ধিনঃ পুণ্যশীলাঃ। অনু ৭১।৪৮। উ ৫৫।৪

অশ্রদ্ধয়া দীয়তে যত্তথৈবাশ্রদ্ধয়াপি বা।

তদাহুরধমং দানং মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ। শা ২৯৩।১৯

৭ নৈবাহমেতদ্ যশসে দদানি। ইত্যাদি। বন ১৯৭।২৩, ২৭

৮ অক্রোধঃ সত্যবচনমহিংসা দম আর্জ্জবম্। ইত্যাদি। অনু ৩৭।৮,৯। শা ২৯৩।১৭-১৯

অনু ২২শ অঃ।

স্বধর্ম্মত্যাগী, তাহাদিগকে দান করিলে দাতার অকল্যাণ হয়।[৯] পতিত, চোর, মিথ্যাবাদী, কৃতঘ্ন, বেদবিক্রয়ী, পরিচারক প্রভৃতিকে দান করিতে নাই। এইরূপ ষোড়শপ্রকার দানকে বৃথাদান বলা হইয়াছে।[১০]

প্রার্থীকে বিমুখ করিতে নাই—অনুশাসনপর্ব্বে অন্নদান-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রার্থীকে অবমাননা করিতে নাই, শ্বপাকই হউক, আর কুকুরাদি ইতর প্রাণীই হউক, কাহাকেও দান করিলে দান ব্যর্থ হয় না।[১১]

দানে জাতি বিচার্য্য নহে, পাত্র বিচার্য্য—দানে পাত্রবিচার অনাবশ্যক, এইরূপ অর্থ আমরা উল্লিখিত উক্তি হইতে গ্রহণ করিতে পারি না। পরন্তু বুভুক্ষিত প্রাণীকে খাইতে দিতে হয়, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য। অবশ্য মানুষের বেলায় তাঁহার চরিত্র বিচার করিতে হইবে, জাতি বিচার্য্য নহে। এইরূপ অর্থ না করিলে পূর্ব্বকথিত বৃথাদানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না।

নানাবিধ দানের প্রশংসা—প্রাণদান, ভূমিদান, গোদান, অন্নদান প্রভৃতি নানাবিধ দানের উল্লেখপূর্ব্বক প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমস্ত অনুশাসনপর্ব্ব দানমাহাত্ম্যে ভরপুর। 'গোসেবা'-প্রবন্ধে গোদানের বিষয়ে বলা হইয়াছে। যে বস্তু অন্যায়ভাবে উপার্জ্জিত হইয়াছে, সেই বস্তু কখনও দান করিতে নাই।[১২]

বাপী, কূপ প্রভৃতি খনন—বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি খনন করাইয়া সর্ব্বসাধারণের পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত গৃহীকে বহু উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইসকল কাজের পুণ্যফলও নানাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।[১৩]

কালবিশেষে দানে পুণ্যাধিক্য—মাস, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতির

৯ যে স্বধর্ম্মাদপেতেভ্যঃ প্রযচ্ছন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ।
শতং বর্ষাণি তে প্রেতা পুরীষং ভুঞ্জতে জনাঃ। ইত্যাদি। শা ২৬।২৯-৩১। উ ৩৩।৬৩

১০ ব্যর্থন্তু পতিতে দানং ব্রাহ্মণে তস্করে তথা। ইত্যাদি। বন ১৯৯।৬-৯

১১ নাবমন্যেদভিগতং ন প্রণুদ্যাৎ কদাচন।
অপি শ্বপাকে শুনি বা ন দানং বিপ্রনশ্যতি। অনু ৬৩।১৩

১২ নো দাতব্যা যাশ্চ মূল্যোপপন্নাস্তৈঃ। ইত্যাদি। অনু ৭৭।৭

১৩ পানীয়ং পরমং দানং দানানাং মনুরব্রবীৎ। ইত্যাদি। অনু ৬৫।৩-৬। অনু ৬৮।২০-২২

পুণ্যকালে দান করিলে বেশী পুণ্য লাভ হয়, এরূপ অসংখ্য বচন পাওয়া যায়।[১৪]

অতি দান নিন্দিত—নিজের পরিবার-পরিজনের সংস্থানের বিবেচনা না করিয়া যথেচ্ছরূপে দান করা মহাভারত অনুমোদন করেন নাই। আপন সামর্থ্য না বুঝিয়া দান করিলে লক্ষ্মী সেই ব্যক্তির নিকটে যাইতেও ভয় পান।[১৫]

১৪ পর্ব্বসু দ্বিগুণং দানমৃতৌ দশগুণং ভবেৎ। ইত্যাদি। বন ১৯৯।১২৪-১২৭। অনু ৬৪তম অঃ।

১৫ অত্যার্য্যমতিদাতারং * * * শ্রীর্ভয়ান্নোপসর্পতি। উ ৩৯।৩৪

মহাভারতের সমাজ

দ্বিতীয় খণ্ড

ধর্ম্ম

চতুর্ব্বর্গে ধর্ম্মের স্থান—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটিকে বলা হয় চতুর্ব্বর্গ। সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া এইগুলিকে পুরুষার্থও বলা হয়। পুরুষার্থচতুষ্টয়ের মধ্যে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ, ইহা সকল শাস্ত্রকারের অভিমত। মানুষের রুচিভেদে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের মধ্যে প্রত্যেকের প্রাধান্য থাকিলেও ধর্ম্মই প্রধান—ইহা মহাভারতের সিদ্ধান্ত।[১] এই তিনটির মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। ধর্ম্মের আচরণে অর্থ এবং কাম আনুষঙ্গিকভাবে উপস্থিত হয়, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন নাই। গৃহীদেরও ধর্ম্মাচরণের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়।

একসঙ্গে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের উপভোগ বিরুদ্ধ নহে—যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, যাঁহার ভার্য্যা ধর্ম্মাচরণের অনুকূল, সেই গৃহস্থ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম একসঙ্গে ভোগ করিতে পারেন। ধর্ম্ম হইতে অর্থও লাভ হয়। অর্থ কামনা পূরণ করিতে সমর্থ। সুতরাং এই তিনটির মধ্যে কোন বিরোধ নাই।[২]

ধর্ম্মের প্রয়োজন—ধর্ম্ম কাহাকে বলে, এই প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে দেওয়া হইয়াছে। একটিমাত্র বাক্যে যদি সেইসকল উত্তরের সার সঙ্কলন করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইহলোক ও পরলোকে স্থিতির অনুকূল যে আচরণ তাহাই ধর্ম্ম।[৩] ধর্ম্মের প্রয়োজন—আত্মতুষ্টি, চিত্তশুদ্ধি, লোকস্থিতি এবং মোক্ষপ্রাপ্তি। এই বিষয়ে মহাভারতে উপদিষ্ট অংশগুলি নিম্নে সঙ্কলিত হইল। তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, ধর্ম্মের সংজ্ঞা একটিমাত্র বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। ধর্ম্ম নানা শাখায় বিভক্ত, যেমন সমাজধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, লৌকিক ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ইত্যাদি। ধর্ম্মের বৃদ্ধিতে সমাজের কল্যাণ, ধর্ম্মের নাশে সমাজের অকল্যাণ।

ধর্ম্মশব্দের দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি—মহাভারতে ধর্ম্মশব্দের ব্যুৎপত্তিগত দুইটি

১ শা ১৬৭ তম অঃ। শা ২৭০।২৪-২৭

২ যদা ধর্ম্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ। বন ৩১২।১০২

৩ লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্ম্মং প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ। ইত্যাদি। শা ১৪২।১৯

অর্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। 'ধন' পূর্ব্বক 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'মক্' প্রত্যয় যোগ করিলে ধর্ম্ম শব্দটি সিদ্ধ হয়। তাহার অর্থ—যাহা হইতে ধন প্রাপ্তি ঘটে। ধনশব্দে পার্থিব এবং অপার্থিব সকলপ্রকার ধনকেই বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় ধর্ম্ম শব্দটি ধারণার্থক 'ধৃঞ্' ধাতুর সহিত 'মন্' প্রত্যয় যোগ করায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ—যাহা সকলকে ধারণ করে; অর্থাৎ লোকস্থিতি যাহার উপর নির্ভরশীল। উল্লিখিত দুইটি অর্থের যে-কোন একটিকে অথবা উভয়টিকেই আমরা ধর্ম্মশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থরূপে গ্রহণ করিতে পারি। যাহা দ্বারা ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে লোকস্থিতি বিধৃত, অর্থাৎ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেকেরই জীবনযাত্রা চলিতেছে, অথবা যে বস্তু সাধু উপায়ে অর্থ-কামাদি লাভের সহায়ক, তাহার নাম ধর্ম্ম।[৪]

অনিন্দ্য আচরণই ধর্ম্ম—ধর্ম্মশব্দের ধাতুপ্রত্যয়লভ্য অর্থ যাহাই হউক, শব্দটি শুনিলেই কতকগুলি অনিন্দ্য আচরণের বিষয় আমাদের মনে উপস্থিত হয়। নানাভাবে প্রযুক্ত ধর্ম্মশব্দের প্রতিশব্দ-স্বরূপ অনিন্দ্য আচরণ কথাটি বোধ করি, ব্যবহার করা যাইতে পারে। আচরণ যে কেবল বাহিরের অনুষ্ঠান মাত্র, তাহা নহে, মনের সাধু চিন্তাও ধর্ম্মাচরণের মধ্যে গণ্য।

ধর্ম্ম উভয় লোকে কল্যাণপ্রদ—একমাত্র ইহলৌকিক স্থিতিকে ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্যরূপে প্রকাশ করা মহাভারতের অভিপ্রায় নহে। অধিকাংশ ধর্ম্মানুষ্ঠানই কষ্টসাধ্য। স্বভাবতঃ কষ্টবিমুখ মানব পরলোকের কল্যাণ কামনায় ঐহিক দুঃখকেও ধর্ম্মের নিমিত্ত বরণ করিয়া থাকে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের কতকগুলি ঐহিক কল্যাণের নিমিত্ত আবার কতকগুলি একমাত্র পারলৌকিক কল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলিয়াছেন, "অনেকেই ধর্ম্মবিষয়ে সন্দিহান; ধর্ম্মের বিধিপ্রণালী লৌকিক ব্যবহারের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আপৎকালে অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ধর্ম্ম নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ধর্ম্ম ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণ বহন করিয়া আনে। লোকস্থিতি এবং আত্মশুদ্ধির নিমিত্তই সকল ধর্ম্মের উপদেশ। অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি

৪ ধনাৎ স্রবতি ধর্ম্মো হি ধারণাদ্বেতি নিশ্চয়ঃ। শা ৯০।১৭

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।

যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ইত্যাদি। কর্ণ ৬৯।৫৯। শা ১০৯।১১

হয়, চিত্তশুদ্ধি চরম পুরুষার্থের অনুকূল। সুতরাং যিনি উভয় লোকের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি ধর্ম্মাচরণে নিশ্চয়ই আত্মনিয়োগ করিবেন"। ধর্ম্মাচরণের শেষ লক্ষ্য মুক্তি, একমাত্র লোকযাত্রা নহে।[৫]

আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি—ব্রাহ্মণব্যাধ-সংবাদে ব্যাধ ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—শাস্ত্রজ্ঞানী অনেক ধার্ম্মিক পুরুষ আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মকেই জীবনের সার বলিয়া মনে করেন। শিষ্ট পুরুষের আচার অনুসরণ করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম হইতে যে অর্থ লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যাহাতে কণামাত্র গুণও দেখা যায়, ধার্ম্মিক পুরুষ তাহাতেই অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই তৃপ্তি অনুভব করেন, ঐহিক ও পারলৌকিক অনন্ত সুখের একমাত্র তিনিই অধিকারী, তাঁহার চিত্তপ্রসাদ অতুলনীয়।

ধর্ম্মই মোক্ষের প্রাপক—ধার্ম্মিক ব্যক্তি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি বহির্বিষয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ধর্ম্মাচরণে যখন চিত্তশুদ্ধি জন্মে, তখন তিনি কেবল অনুষ্ঠান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সেই অতৃপ্তিই তাঁহার অন্তরে নির্ব্বেদের বীজ বপন করে এবং সেই উপ্ত বীজ মহামহীরুহে পরিণত হইতে থাকে। কালক্রমে সেই পুরুষ সংসারের ক্ষয়িষ্ণুতা উপলব্ধি করিয়া বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া উঠেন। সেই বৈরাগ্যই তাঁহাকে নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর করে।[৬]

ধর্ম্মবিষয়ে বেদের প্রামাণ্য প্রাথমিক—ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম নির্ণয় করিতে বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বেদ যে-আচরণকে অনিন্দ্য বলিয়া থাকেন, তাহাই ধর্ম্মশব্দের প্রাথমিক অর্থ। যে যে আচারের সাধুতা বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সেই আচারই মুখ্য ধর্ম্ম।[৭]

তারপর ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য—বেদের পরেই ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার-বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থান। মনুসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করা

---

৫ অপি হ্যুক্তানি ধর্ম্মাণি ব্যবস্যন্ত্যুত্তরাবরে।
লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্ম্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ। ইত্যাদি। শা ২৫৮।৪-৬

৬ ত্রৈলোক্যঃ শাশ্বতো ধর্ম্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। বন ২০৫।৪১
সতাং ধর্ম্মেণ বর্ত্তেত ক্রিয়াং শিষ্টবদাচরেৎ। ইত্যাদি। বন ২০৮।৪৪-৫৩

৭ শ্রুতিপ্রমাণো ধর্ম্মঃ স্যাদিতি বৃদ্ধানুশাসনম্। ইত্যাদি। বন ২০৫।৪১। বন ২০৮।২। অনু ১৬২ তম অঃ।

হইয়াছে, তাহাও ধর্ম্ম। মহাভারতকার মনুকে ধর্ম্মশাস্ত্রকাররূপে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। বহুস্থানে মনুর বচন দ্বারা আপনার মতকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। যদিও ধর্ম্মনির্ণয়ে কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রকে প্রমাণ ধরিতে হইবে, নামতঃ তাহার উল্লেখ নাই, তথাপি বলা যাইতে পারে, মন্বাদিসংহিতা, ধর্ম্মসূত্র, রামায়ণ (রামায়ণ প্রধানতঃ কাব্য হইলেও ধর্ম্মনিবন্ধ্‌গণ তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেও স্থান দিয়াছেন।) এবং পুরাণগুলিকে ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে গ্রহণ করা মহাভারতের অভিপ্রায়। ধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রৌতসূত্রাদি শ্রুতির সমান বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্ররূপে সেইগুলিকে গ্রহণ করা চলে না। স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ আচার-পদ্ধতির পথপ্রদর্শক এবং বেদানুমোদিত, সেই জন্য ধর্ম্মনির্ণয়ে তাহার স্থান দ্বিতীয়।[৮]

ধর্ম্মনির্ণয়ে শিষ্টাচারের প্রামাণ্য—শিষ্ট ব্যক্তির আচারকেও ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাঁহাদের আচরণ সৎপুরুষের অনুমোদিত, তাঁহারাই সাধু বা শিষ্ট পুরুষ। ধর্ম্মবিষয়ে শিষ্টাচারের প্রামাণ্য মহাভারতে স্বীকৃত হইয়াছে। (দ্রঃ ২২০ তম পৃঃ) কিন্তু তাহার স্থান শ্রুতি ও স্মৃতির পরে। সুতরাং শিষ্টাচারকে তৃতীয় প্রমাণ বলা যাইতে পারে।[৯]

প্রমাণের বলাবলত্ব—উপরি-উক্ত সঙ্কলন হইতে বুঝা যাইতেছে, ধর্ম্মবিষয়ে কোন প্রশ্ন জাগিলে প্রথমতঃ শ্রুতির অভিপ্রায় কি তাহা জানিতে হইবে। শ্রুতিতে যদি কোন অনুশাসন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিমত জানিতে হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রও যদি সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসায় নীরব থাকেন, তাহা হইলে শিষ্ট বা সৎপুরুষের আচারের অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং শিষ্টানুসৃত পথকেই অনুসরণ করিতে হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে, শ্রুতির সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনের যদি কোথাও বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শ্রৌত প্রমাণকেই গ্রহণ করিতে হইবে,

৮ বেদোক্তঃ পরমো ধর্ম্মো ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চাপরঃ। ইত্যাদি। বন ২০৬।৮০। অনু ১৪১।৬৫
সদাচারঃ স্মৃতির্বেদাস্ত্রিবিধং ধর্ম্মলক্ষণম্। শা ২৫৮।৩

৯ শিষ্টাচারশ্চ শিষ্টানাং ত্রিবিধং ধর্ম্মলক্ষণম্। ইত্যাদি। বন ২০৬।৮৩,৭৫। শা ১৩২।১৫
সদাচারঃ স্মৃতির্বেদাস্ত্রিবিধং ধর্ম্মলক্ষণম্। ইত্যাদি। শা ২৫৮।৩। শা ২৫৯।৫
শিষ্টাচীর্ণোঽপরঃ প্রোক্তস্ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ। ইত্যাদি। অনু ১৪১।৬৫। অনু ৪৫।৫।
অনু ১০৪।৯

আর ধর্ম্মশাস্ত্র ও শিষ্টাচারের মধ্যে বিরোধ হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। শ্রুতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে আপাতবিরোধী উক্তির মীমাংসা করিতে শিষ্টাচারের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হয়। কারণ শিষ্টাচারসমূহ প্রায়ই অমূলক নহে। শিষ্টাচার এবং স্মৃতির সাহায্যে বিলুপ্ত শ্রুতির অনুমান করা চলে, ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। মহাভারতেও এই ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—'কঃ পন্থাঃ'—যক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, কেবল লৌকিক বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে পৌছান শক্ত, যেহেতু তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, অর্থাৎ যাঁহার প্রতিভা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ, তিনি অপরের যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে অনায়াসেই খণ্ডন করিতে পারেন। শ্রুতিকেও আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক বলিয়া মনে হয়। ঋষিদের মধ্যেও মতভেদ আছে, একজন ঋষির অনুশাসন মানিয়া চলিব, এমন কোন ঋষির নাম করিতে পারা যায় কি? ধর্ম্মের তত্ত্ব অতিশয় দুরধিগম্য, বিশেষরূপে বিচার ব্যতীত স্থির করা শক্ত। অতএব মহাজন অর্থাৎ শিষ্ট পুরুষগণ যে পথে গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ, তাঁহাদের অনুসৃত আদর্শই আমাদের আদর্শ। ধর্ম্মবিষয়ে শাস্ত্রনিরপেক্ষ তর্কের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না। আর্ষবাক্য এবং পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ব্যবহারের প্রামাণ্যে আশঙ্কা করা নিতান্তই অশোভন। অন্ধবিশ্বাসে শুধু মহাজনমার্গ অনুসরণ করাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।[১০]

শ্রুতিস্মৃতির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে শিষ্টাচারের সহায়তা—বেদ এবং স্মৃতি-পুরাণাদি আর্ষশাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়া গন্তব্য পথ স্থির করিতে হইবে, এই তাৎপর্য্যে উল্লিখিত বাক্য প্রযুক্ত হয় নাই। যদি তাহাই হইত, তবে বেদ এবং স্মৃত্যাদির প্রামাণ্যবিষয়ক পূর্ব্ব-সঙ্কলিত বচনগুলির কোন সার্থকতা থাকিত না। আপাতবিরোধী অর্থের সামঞ্জস্য করা যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং সাধারণের পক্ষে মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। কাঁহাকে মহাজন বলিব?

১০ তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥ বন ৩১২।১১৭
অজ্ঞো জড় ইবাশঙ্কী যদ্ ব্রবীমি তদাচর। ইত্যাদি। অনু ১৬২।২২-২৫

যিনি বিদ্যা, অর্থ প্রভৃতির প্রাচুর্য্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সাধারণতঃ আমরা তাঁহাকে 'মহাজন' বলিয়া মনে করি ; কিন্তু মহাভারতকারের বক্তব্য অন্যরূপ। তিনি সাধু, সৎ, শিষ্ট প্রভৃতি শব্দের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, মহাজন শব্দও সেই অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যথা শিষ্টজনের পদানুসরণ করিবার উপদেশ একেবারেই নিরর্থক হয়। সুতরাং বলিতে হইবে, যিনি বেদাদিশাস্ত্রের অবিরোধী আচার-পালনে তৎপর, তিনিই মহাভারতে 'মহাজন'-পদবাচ্য। বস্তুতঃ বাহিক আচারে খুঁটিনাটি লইয়া মতের বৈষম্য থাকিলেও মহাজনদের মধ্যে আসলে কোন দ্বৈধ নাই। মহাজনগণ শ্রুতিস্মৃতির তাৎপর্য্য নির্ণয়ে সর্ব্বত্র সমর্থ না হইলেও তদনুসারেই আপনার জীবনযাত্রাপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করেন, এইজন্যই শ্রুতি-স্মৃতির আপাতবিরোধী উক্তির সামঞ্জস্য করিতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক হয়। সুতরাং যে ধর্ম্ম অতিশয় দুর্ব্বিজ্ঞেয়, যাহার তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম্', তাহাকে নির্ণয় করিতে আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে শিষ্টাচারই প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। ইহাই বোধ করি, মহাভারতের উপদেশ।[১১]

জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম—জাতিধর্ম্ম এবং কুলধর্ম্মের আচরণও মহাজনের পদাঙ্কানুসরণের মধ্যে গণ্য। পিতৃপিতামহের অনুষ্ঠিত আচরণই কুলধর্ম্ম। কুলধর্ম্ম অপেক্ষা ব্যাপক অর্থে জাতিধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ করা হয়। ব্রাহ্মণের জাতিগত অধিকার অমুক অমুক বিষয়ে, ক্ষত্রিয়ের অমুক অমুক বিষয়ে, ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন জাতির আচরণীয় হিসাবে যে-সকল কর্ম্মের নির্দেশ করা হইয়াছে, সেইগুলি জাতিধর্ম্ম। জাতিধর্ম্মের অপর নাম স্বধর্ম্ম এবং সহজ কর্ম্ম। (দ্রঃ ১৫০ তম পৃঃ) পিতৃপিতামহের আচরিত কুলধর্ম্ম কোন অবস্থায়ই পরিত্যাজ্য নহে। মহাভারতকার বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন কুলধর্ম্ম অবশ্যই পালন করিবেন।[১২]

দেশধর্ম্ম—দেশবিশেষে ধর্ম্মাচরণের পার্থক্য হয়। যে-দেশে যেরূপ

---

১১ শিষ্টাচারশ্চ শিষ্টশ্চ ধর্ম্মো ধর্ম্মভৃতাং বর।
সেবিতব্যো নরব্যাঘ্র প্রেত্যেহ চ সুখেপ্সুনা॥ শা ৩৫।৪৮
শিষ্টৈশ্চ ধর্ম্মো যঃ প্রোক্তঃ স চ মে হৃদি বর্ত্ততে। শা ৫৪।২০

১২ জাতিশ্রেণ্যধিবাসানাং কুলধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বতঃ।
বর্জ্জয়ন্তি চ যে ধর্ম্মং তেষাং ধর্ম্মো ন বিদ্যতে। শা ৩৬।১৯
ব্রাহ্মণেষু চ যা বৃত্তিঃ পিতৃপৈতামহোচিতা। ইত্যাদি। অনু ১৬২।২৪

শিষ্টাচার প্রচলিত, সেই দেশবাসীর পক্ষে তাহাই পালন করা উচিত।[১৩] যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভীষ্ম বলিয়াছিলেন, "হে জনার্দ্দন, আমি দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম এবং কুলধর্ম্মও সম্যক্ অবগত আছি"।[১৪] এই উক্তিতে মনে হয়, তৎকালে সামাজিকগণ এইসকল বিষয়েও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেন। দেশভেদে আচার-আচরণের পার্থক্য মহাভারতে বহুবিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। আচার-অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক।

ধর্ম্মলাভের উপায়—যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্যবচন, ক্ষমা, দয়া এবং নিস্পৃহা—এই আটটিকে ধর্ম্মলাভের পথস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে লোকসমাজে খ্যাতির নিমিত্তও অনেকে যজ্ঞাদি চারিটির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আন্তরিকতা না থাকিলেও নামের আকাঙ্ক্ষায় কোনরূপে শুষ্ক আচরণমাত্র করিয়াই কৃতার্থতা বোধ করেন। কিন্তু সত্য, ক্ষমা, দয়া এবং নিস্পৃহা একমাত্র মহাত্মারই ধর্ম্ম। লোকদেখানর নিমিত্ত এইগুলির অনুশীলন করা যায় না। এইগুলি ভিতরের প্রেরণা হইতে জন্মে।[১৫]

সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম—অদত্ত পরকীয় দ্রব্য গ্রহণ না করা, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, সত্য, শৌচ, অক্রোধ, যাগ প্রভৃতিকে ধর্ম্ম বলা হয়। অক্রোধ, সত্যবচন, ক্ষমা, স্বদাররতি, অদ্রোহ, আর্জ্জব ও ভৃত্যভরণ, এই কয়টি সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত। অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, সংবিভাগিতা, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, আতিথেয়, সত্য, অক্রোধ, শৌচ, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা, এইগুলিকেও ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।[১৬]

---

১৩ দেশধর্ম্মাংশ্চ কৌন্তেয় কুলধর্ম্মাংস্তথৈব চ। শা ৬৬।২৯
দেশাচারান্ সময়ান্ জাতিধর্ম্মান্। ইত্যাদি। উ ৩৩।১১৮

১৪ দেশজাতিকুলানাঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞোঽস্মি জনার্দ্দন। শা ৫৪।২০

১৫ ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্ষমা ঘৃণা। ইত্যাদি। উ ৩৫।৫৬, ৫৭। বন ২।৭৫

১৬ অদত্তস্যানুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ।
অহিংসা সত্যমক্রোধ ইজ্যা ধর্ম্মস্য লক্ষণম্। ইত্যাদি। শা ৩৬।১০। শা ২৯৬।২৩, ২৪। অনু ১৪১।২৬, ২৭

অক্রোধঃ সত্যবচনং সম্বিভাগঃ ক্ষমা তথা।
প্রজনঃ স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ। ইত্যাদি। শা ৬০।৭, ৮

ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা—আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মসমূহ জাতিবর্ণবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও ধর্ম্মের আন্তর স্বরূপ এবং লক্ষ্য সকলেরই সমান। চিত্তপ্রসাদ, লোকবিধৃতি এবং ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণই ধর্ম্মের লক্ষ্য। সমস্ত জগতের সুখদুঃখের সঙ্গে আপনার সুখদুঃখের অনুভূতিকে মিশাইয়া দেওয়াই মহাভারতের মতে পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানস বস্তু, বাহিরের অনুষ্ঠান সহায়ক-মাত্র, তাহা উপেয় নহে। উপায় ও উপেয়ের মধ্যে যাহাতে একত্ববোধ না হয়, সেই উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে—ধর্ম্ম মানস বস্তু, সুতরাং সর্ব্বভূতের কল্যাণচিন্তাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আচরণ। নিখিল জগতের কল্যাণচিন্তা এবং সর্ব্বভূতে অদ্রোহভাব ধর্ম্মের সার বস্তু, ইহা সকল মনীষী একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্রোহ, সত্যবচন, দয়া, দম প্রভৃতিকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া স্বায়ম্ভুব মনুও বলিয়াছেন।[১৭]

অহিংসা ও মৈত্রী—তুলাধারজাজলি-সংবাদে দেখিতে পাই, শ্রেষ্ঠ তপস্বী তুলাধার জাজলিকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে যাইয়া প্রথমেই বলিয়াছেন, "হে জাজলি, আমি সরহস্য সনাতন ধর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত আছি। সর্ব্বভূতের হিতচিন্তা এবং মৈত্রীই শাশ্বত ধর্ম্ম। কাহারও অপকার না হয়, এরূপভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। যিনি নিখিল বিশ্বের সুহৃৎ, বিশ্বকল্যাণে নিরত, যিনি কায়মনোবাক্যে আপনাকে বিশ্বহিতে নিয়োগ করেন, তিনিই ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন।[১৮] অহিংসাই ধর্ম্মের সার ; অহিংসা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বভূতে মৈত্রী ও নিখিল বিশ্বের শুভকামনা অপেক্ষা সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম আর কিছুই হইতে পারে না। একমাত্র অহিংসার প্রতিষ্ঠাতেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। জগতে অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পারে না। বনপর্ব্বে যক্ষযুধিষ্ঠির-সংবাদে দেখা যায়, যক্ষরূপী ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"যশঃ, সত্য, দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, অচাপল্য, দান, তপস্যা এবং ব্রহ্মচর্য্য, এই কয়টি

১৭ মানসং সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মনসা শিবমাচরেৎ ॥ শা ১৯৩।৩১
অদ্রোহেণৈব ভূতানাং যঃ স ধর্ম্মঃ সতাং মতঃ। ইত্যাদি। শা ২১।১১, ১২

১৮ বেদাহং জাজলে ধর্ম্মং সরহস্যং সনাতনম্।
সর্ব্বভূতহিতং মৈত্রং পুরাণং যং জনা বিদুঃ। ইত্যাদি। শা ২৬১।৫-৯

আমার শরীর। অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপস্যা, শৌচ ও অমাৎসর্য্য, এই কয়টি আমাকে লাভ করিবার উপায়।[১৯]

ধর্ম্মের সনাতনতা—ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দয়া, ধৃতি ও ক্ষমা সনাতন ধর্ম্মের সনাতন মূলস্বরূপ।[২০] এইখানে দেখিতেছি, ধর্ম্মকে বলা হইয়াছে সনাতন এবং তাহার মূলকেও। তাৎপর্য্য এই যে, স্থানকালের বিভিন্নতায় বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের পার্থক্য থাকিলেও এইসকল ধর্ম্মের মূল স্থান বা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না। উহারা অবিনশ্বর এবং সর্ব্বদেশে সমান।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম—ভোগ্য বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখার নাম শম। শম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসমূহের মধ্যে অন্যতম। যদিও গৃহস্থদের প্রবৃত্তিমূলক নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তথাপি সেইগুলির লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি। চিত্তের প্রসন্নতা জন্মিলে অনুষ্ঠাতা সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া থাকেন। শম-দমাদি নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মগুলি সাক্ষাৎভাবেই মুক্তির হেতু। বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুদের পক্ষে সেইগুলির অনুষ্ঠান সমধিক কল্যাণপ্রদ।[২১]

১৯ অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। ইত্যাদি। বন ২০৬।৭৪
ন ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন। ইত্যাদি। শা ২৬১।৩০। অশ্ব ৪৩।২১। অশ্ব ৫০।৩
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ কর্ণ ৬৯।৫৭। অনু ১১৬।২১। অনু ১৬২।২৩। শা ১০৯।১২
যশঃ সত্যং দমঃ শৌচমার্জ্জবং হ্রীরচাপলম্। ইত্যাদি। বন ৩১৩।৭,৮

২০ ব্রহ্মচর্য্যং তথা সত্যমনুক্রোশো ধৃতিঃ ক্ষমা।
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতৎ সনাতনম্॥ ইত্যাদি। অশ্ব ৯১।৩৩। অনু ২২।১৯

২১ শমস্তু পরমো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তঃ সৎসু নিত্যশঃ।
গৃহস্থানাং বিশুদ্ধানাং ধর্ম্মস্য নিচয়ো মহান্॥ ইত্যাদি। অনু ১৪১।৭০। অনু ২২।২৪
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো গৃহস্থেষু বিধীয়তে।
তমহং বর্ত্তয়িষ্যামি সর্ব্বভূতহিতং শুভম্॥ অনু ১৪১।৭৬
নিবৃত্তিলক্ষণস্ত্বন্যো ধর্ম্মো মোক্ষায় তিষ্ঠতি।
তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু মে দেবি তত্ত্বতঃ॥ অনু ১৪১।৮০

ধর্ম্মের পথ সত্য ও সরল—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে প্রথমেই ন্যায় ও অন্যায়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে আচরণে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে হয়, তাহা কখনও ধর্ম্ম হইতে পারে না। ধর্ম্মে অন্যায় বা পাপের গন্ধ-মাত্র থাকিতে পারে না। নিষ্কলুষ অকপট ব্যবহারকে আনুষ্ঠানিক এবং মনের সদ্‌বৃত্তির অনুশীলনকে মানস বা সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম-নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

ধর্ম্মে ছল বা কুটিলতার স্থান নাই—ধর্ম্মের মধ্যে কুটিলতার স্থান নাই, তাই সর্ব্বত্র সরলতাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।[২২] বিশেষ কর্ত্তব্যের অনুরোধে একদিন রাত্রিতে অর্জ্জুন, দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। তারপর পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি বন-গমনের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি চাহিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমার ত কোন অন্যায় হয় নাই। কারণ সস্ত্রীক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শয়নগৃহে কনিষ্ঠের প্রবেশে দোষ কি? কনিষ্ঠের শয়নকক্ষে জ্যেষ্ঠের প্রবেশই ত দোষের, তুমি ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা করিও না"। অর্জ্জুন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "ছলপূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষা করিতে নাই—ইহা ত আপনারই উপদেশ। আমাদের প্রতিজ্ঞা অন্যরকম। সুতরাং হে রাজন্, আমি কিছুতেই ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইব না; আমাকে বনে যাইতে অনুমতি করুন"।[২৩]

ফলে অনাসক্তির প্রশস্ততা—ফলে অনাসক্ত হইয়া যাঁহারা ধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক। বাহ্য অনুষ্ঠানেও অনাসক্তি খুবই প্রশস্ত।[২৪]

ধর্ম্মসংশয়ে জ্ঞানীদের উপদেশ গ্রাহ্য—ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে জ্ঞানী পুরুষদের উপদেশ মত কাজ করিতে হয়। দশজন বেদজ্ঞ পুরুষ অথবা তিনজন ধর্ম্মপাঠক যে-আচরণকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, সন্দিগ্ধ পুরুষ তাহাই ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিবেন। আপৎ-কালে অনেক অধর্ম্মকেও

২২ আরম্ভো ন্যায়যুক্তো যঃ স হি ধর্ম্ম ইতি স্মৃতঃ। ইত্যাদি। বন ২০৬।৭৭। শা ২০৯।১০
আর্জ্জবং ধর্ম্মমিত্যাহুরধর্ম্মো জিহ্ম উচ্যতে। অনু ১৪২।৩০
স বৈ ধর্ম্মো যত্র ন পাপমস্তি। শা ১৪১।৭৩

২৩ ন ব্যাজেন চরেদ্ধর্ম্মমিতি মে ভবতঃ শ্রুতম্। আদি ২১৩।৩৪

২৪ দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত। বন ৩১।২

ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতে হয়।[২৫] সন্দিগ্ধ যে কোনও বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।[২৬]

ধর্ম্মের পরস্পর অবিরোধ—এক ধর্ম্মের সহিত অপর ধর্ম্মের বিরোধ হইতে পারে না। ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য এক হওয়ায় যে-সকল মানস সদনুশীলনকে ধর্ম্মনামে অভিহিত করা হয়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটুও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সুসমঞ্জস মিলন হইলেই বুঝিতে হইবে সেইগুলি সত্য সত্যই ধর্ম্ম। দয়ার সহিত ক্ষমার কোন বিরোধ নাই। অহিংসার সহিত তিতিক্ষার কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যে কোনও সদ্‌বৃত্তির সহিত যাহার কোন বিরোধ নাই, তাহাই ধর্ম্ম। আর যদি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে যুক্তিতর্কের সাহায্যে পরস্পরের বলাবল বিচার করিতে হইবে। যে পক্ষ গ্রহণ করিলে অন্য প্রবলতর কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইবে, সেই পক্ষ অগ্রাহ্য।[২৭]

ধর্ম্মবণিক্ অতিশয় নিন্দিত—ধর্ম্মকে যাহারা বাণিজ্যের উপকরণরূপে মনে করে, তাহারা অতিশয় নিন্দিত। ধর্ম্মের ভান, ভণ্ডামি বা ধর্ম্মের ভান করিয়া বক্তৃতা দিয়া অর্থোপার্জ্জন করা—এইসকল কাজের নাম ধর্ম্মবাণিজ্য।[২৮]

ধর্ম্মবিষয়ে বলবানের অত্যাচার—সেই যুগেও সমাজে ধনিগণ অনেক সময় জোর করিয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্মের নামে চালাইতে চেষ্টা করিতেন। অবিবেকী প্রতিপত্তিশালীর অত্যাচার সকল যুগেই সমান।[২৯]

২৫ দশ বা বেদশাস্ত্রজ্ঞাস্ত্রয়ো বা ধর্ম্মপাঠকাঃ।
যদ্ ব্রূয়ুঃ কার্য্য উৎপন্নে স ধর্ম্মো ধর্ম্মসংশয়ে॥ শা ৩৬।২০
তস্মাদাপদ্ধর্ম্মোঽপি শ্রূয়তে ধর্ম্মলক্ষণঃ। শা ১৩০।১৬

২৬ ন হি ধর্ম্মমবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ধর্ম্মার্থৌ বেদিতুং শক্যৌ বৃহস্পতিসমৈরপি॥ বন ১৫০।২৬

২৭ ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুবর্ত্ম তৎ।
অবিরোধাত্তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রম॥ ইত্যাদি। বন ১৩১।১১-১৩

২৮ ধর্ম্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ব্রহ্মবাদিনাম্। বন ৩১।৫
ধর্ম্মবাণিজকা হ্যেতে যে ধর্ম্মমুপভুঞ্জতে। অনু ১৬২।৬২

২৯ সর্ব্বং বলবতাং ধর্ম্মঃ সর্ব্বং বলবতাং স্বকম্। আশ্র ৩০।২৪
বলবাংশ্চ যথা ধর্ম্মং লোকে পশ্যতি পুরুষঃ। সভা ৬৯।১৫

ধর্ম্মে গুরুর সহায়তা—ধর্ম্মাচরণে একজন শিষ্ট আদর্শ পুরুষকে গুরুরূপে মানিয়া লইতে হয়। তাঁহার উপদেশমত চলিলে স্খলনের আশঙ্কা থাকে না। যিনি গুরুর উপদেশ ব্যতীত আপনার খামখেয়ালির বশে ধর্ম্ম নির্ণয় করেন, তিনি অনেক সময়ে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া ভুল করিতে পারেন। সুতরাং কল্যাণকাম পুরুষ আদর্শ গুরুর অনুসরণ করিবেন। যদিও রাজধর্ম্ম-প্রকরণে এই কথা বলা হইয়াছে, তথাপি যাবতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধেই এই উপদেশের সার্থকতা আছে বুঝিতে হইবে। কারণ সেখানে বিশেষভাবে কোন নির্দ্দেশ করা হয় নাই। যাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান গুরুর অধীন, তিনি কখনও বিপন্ন হন না। উপদেষ্টা তাঁহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া থাকেন।[৩০]

একাকী ধর্ম্মাচরণের বিধান—আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম খুব গোপনে একাকী অনুষ্ঠান করিবে, ধর্ম্মাচরণে সঙ্ঘবদ্ধতা উচিত নহে। মিলিতভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বা উপাসনায় অনেকটা লোকদেখান-ভাব আসিতে পারে, তাহাতে নামের লোভে অনুষ্ঠাতার অধঃপতনের আশঙ্কা থাকে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক উপাসনাদি যথাসম্ভব গোপন রাখিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা লোকদেখান আচরণ করে এবং তাহার ফলে কিঞ্চিৎ নাম-যশের আশাও করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বলা হয় ধর্ম্মধ্বজিক। ধর্ম্মের পতাকা উড়াইয়া লোকসমাজে ধার্ম্মিকরূপে খ্যাতিলাভ করা এবং আনুষঙ্গিকভাবে ধর্ম্মকে জীবিকার উপায়রূপে গ্রহণ করা অতিশয় জঘন্য। প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সাধারণ লোক অনুষ্ঠাতাকে ধার্ম্মিকরূপে খাতির করিতে আরম্ভ করে, তখন অনুষ্ঠাতারও একটু অহমিকার ভাব জাগা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। সম্মানের বিড়ম্বনা হইতে আপনাকে রক্ষা করা দুর্ব্বলচেতা মানুষের পক্ষে সহজ নহে। এইজন্যই বোধ হয়, সঙ্ঘবদ্ধরূপে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে। শুধু ঔচিত্যবোধেই আচরণ করিবে, অভিমান পোষণ করিবে না।[৩১]

৩০ যস্য নাস্তি গুরুর্ধর্ম্মে ন চান্যানপি পৃচ্ছতি।
সুখতন্ত্রোঽর্থলাভেষু ন চিরং সুখমশ্নুতে॥ ইত্যাদি। শা ৯২।১৮,১৯

৩১ এক এব চরেদ্ধর্ম্মং নাস্তি ধর্ম্মে সহায়তা। ইত্যাদি। শা ১৯৩।৩২। শা ২৪৪।৪
এক এব চরেদ্ধর্ম্মং ন ধর্ম্মধ্বজিকো ভবেৎ। অনু ১৬২।৬২
কর্ত্তব্যমিতি যৎ কার্য্যং নাভিমানাৎ সমাচরেৎ। বন ২।৭৬

দেশকাল-বিবেচনায় অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন—দেশকাল-ভেদে আনু-ষ্ঠানিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন চলিতে পারে। অহিংসাদি মানস ধর্ম্ম শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনশীল, দেশকালের দ্বারা তাহার সঙ্কোচ করা চলে না। শান্তিপর্ব্বের আপদ্ধর্ম্মপ্রকরণে দেখিতে পাই, অবস্থা-বিশেষে বহু ধর্ম্মকৃত্যের পরিবর্ত্তনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের স্বৈরাচার ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে, এমন কথা কোথাও বলা হয় নাই। আপৎকালে সংশয় উপস্থিত হইলে বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ সুধীগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের দ্বারা ধর্ম্ম স্থির করা যাইতে পারে। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি সময়-বিশেষে অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। তদ্বিপরীত হিংসাদিই তখন ধর্ম্ম হইবে।[৩২]

ধর্ম্ম কখনও পরিত্যাজ্য নহে—মানুষ কিছুতেই ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, ইহা মহাভারতের উপদেশ। যত বিপদই আসুক না কেন, ধর্ম্মকে ত্যাগ করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। কাম, লোভ, ভয় প্রভৃতি যেন ধর্ম্মনাশের হেতু না হয়, সেই নিমিত্ত নিখিল বিশ্বকে সাবধান করা হইয়াছে। এমন কি, বাঁচিবার জন্যও যদি ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে হয়, তবে সেই বাঁচাও মরণেরই সমান।[৩৩]

ধর্ম্মই রক্ষক—ধর্ম্মই মানুষকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করে। ধর্ম্ম সমস্ত পাপ-তাপ দূর করিয়া মানুষকে শান্তির আস্বাদ দিতে পারে।[৩৪]

ধর্ম্ম পালনের নিমিত্ত অসংখ্য উপদেশ—ধর্ম্মপালনের অসংখ্য উপদেশ মহাভারতে প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কলন করিলে হাজারেরও অধিক হইবে বোধ করি। ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ লভ্য জগতে কিছুই নাই। ধর্ম্মাচরণই মানুষের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে পারে।[৩৫] ধর্ম্মপালন করিলে ধর্ম্মই মানুষকে রক্ষা করে, আর অরক্ষিত ধর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির বিনাশ সাধন করিয়া থাকে।

৩২ ধর্ম্মো হ্যাবস্থিকঃ স্মৃতঃ। শা ৩৬।১১

৩৩ ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্ম্মং জহ্যাজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ। ইত্যাদি। উ ৪০।১২। স্বর্গা ৫।৬৪

ধর্ম্মং বৈ শাশ্বতং লোকে ন জহ্যাদ্ধনকাঙ্ক্ষয়া। শা ২৯২।১৯

৩৪ ধর্ম্মেণ পাপং প্রণুদতীহ বিদ্বান্ ধর্ম্মো বলীয়ানিতি তস্য সিদ্ধিঃ। উ ৪২।২৫

৩৫ ন ধর্ম্মাৎ পরমো লাভঃ। অনু ১০৬।৬৫

সুতরাং কল্যাণেচ্ছু পুরুষ সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম আচরণে মনোনিবেশ করিবেন।[৩৬] মানুষ পরলোকে গমন করিয়া একমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঞ্চিত পুণ্যফলেই শান্তি ভোগ করিয়া থাকে। পার্থিব কোনও বস্তু সঙ্গে না গেলেও ধর্ম্মের ফল কেবলমাত্র ঐহিক ভোগের নিমিত্ত নহে, ধর্ম্মই লোকান্তরে একমাত্র বন্ধু।[৩৭] ধর্ম্মের আচরণে বিত্তের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেবল ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে যিনি অর্থের স্পৃহা করেন, তাঁহার পক্ষে নিস্পৃহতাই শ্রেয়ঃ।[৩৮] কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলকেই কোন না কোন-প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে, ধর্ম্ম ব্যতীত মানুষ টিকিয়া থাকিতে পারে না। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের ধর্ম্ম বিভিন্ন হইলেও অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং মানুষ মাত্রই ধর্ম্মাচরণে বাধ্য।[৩৯]

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ—যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়।[৪০] এই বাক্যটিকে মহাভারতের মূলসূত্র বলা যাইতে পারে। এই বাক্যটিকে সূত্ররূপে ধরিয়াই যেন সমস্ত মহাভারত ভাষ্যরূপে রচিত হইয়াছে। ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখান এবং ধর্ম্মের জয় আর অধর্ম্মের ক্ষয়—এই সত্যের মহিমা প্রচার করাই যেন সমস্ত মহাভারতের উদ্দেশ্য। যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ। (উ ৬৮।৯।শল্য ৬২।৩২)

ভারতসাবিত্রীতে ধর্ম্মমহিমা-কীর্ত্তন—মহাভারতের উপসংহারে যে ভারতসাবিত্রী কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনেই ভরপুর। ব্যাসদেব প্রথমতঃ যে চারিটি শ্লোক রচনা করিয়া শুকদেবকে পড়াইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, "আমি উর্দ্ধবাহু হইয়া স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছি, ধর্ম্ম হইতেই অর্থ এবং কামের উদ্ভব, কিন্তু কেহই আমার চীৎকারে কর্ণপাত করিল না"।[৪১] সুখদুঃখ অনিত্য বস্তু, কিন্তু ধর্ম্ম নিত্য।

৩৬ ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। বন ৩১২।১২৮

৩৭ ধর্ম্ম একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পারলৌকিকঃ। ইত্যাদি। অনু ১১১।১৬। শা।২৭২

৩৮ ধর্ম্মার্থং যস্য বিত্তেহা বরং তস্য নিরীহতা। বন ২।৪৯

৩৯ বন ২য় অঃ।

৪০ ভী ২১।১১। উ ৩৯।৯। স্ত্রী ১৪।৯

৪১ উর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥ স্বর্গা ৫।৬৩

সুতরাং অনিত্যের নিমিত্ত নিত্য চিরসুহৃৎকে ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে।[৪২]

ধর্ম যেমন অর্থ ও কামের জনক, সেইরূপ মোক্ষেরও হেতু, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শুভানুষ্ঠাতা পুরুষ কল্যাণের মধ্য দিয়া আপনার শান্তি-বিধান করিতে সমর্থ হন। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা তাঁহার প্রজ্ঞা ধর্ম্মাভিমুখী হয়, অশুভ চিন্তা তাঁহার অন্তরে স্থান পায় না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি বাহ্যিক উপভোগ্য সামগ্রী ধার্ম্মিকের আয়ত্তে আসে। তিনি যথেচ্ছ-রূপে ভোগ করিতে পারেন। ভোগে মানুষের চরম শান্তি হইতে পারে না, সুতরাং ভোগের পর তাঁহাকে ত্যাগের পথ খুঁজিতে হয়। অবশেষে তিনি বীতস্পৃহ হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। বিষয়বৈরাগ্য তাঁহার জীবনের গতি বদ্‌লাইয়া দেয়। তিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়া তখন ধর্ম্মের আচরণ করিতে থাকেন, জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ে সুদৃঢ় ধারণা জন্মে এবং তিনি মুক্তির নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সেই ব্যাকুলতাই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, তিনি শাশ্বত মুক্তির আনন্দে পূর্ণকাম হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন।[৪৩]

সমাজভেদে ধর্ম্মভেদ—সমাজবিশেষে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের স্বরূপ বিভিন্ন। মানুষ যে-সমাজে যে-অবস্থার মধ্যেই থাকুক না কেন, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম তাহাকে অনুসরণ করিতেই হইবে। মহাভারতে কিরাতাদি পার্ব্বত্য-জাতি, দস্যু প্রভৃতির ধর্ম্মও বর্ণিত হইয়াছে। সভ্য-সমাজের ধর্ম্মের সহিত সেইসকল ধর্ম্মের অনেক বিষয়েই মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

দস্যু প্রভৃতির ধর্ম্ম—মান্ধাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্, আমার রাজত্বে অনেক যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, আন্ধ্র, মদ্রক, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ প্রভৃতি প্রজা আছেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সকল জাতির লোকই আছেন। অনেক দস্যুও আমার রাজত্বে বাস করে,

৪২ নিত্যো ধর্ম্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে। ইত্যাদি। স্বর্গা ৫।৬৪। উ ৪০।১২

৪৩ কুশলেনৈব ধর্ম্মেণ গতিমিষ্টাং প্রপদ্যতে।
য এতান্ প্রজ্ঞয়া দোষান্ পূর্ব্বমেবানুপশ্যতি। ইত্যাদি। শা ২৭২।১৩-২৩
ধর্ম্মে স্থিতানাং কৌন্তেয় সিদ্ধির্ভবতি শাশ্বতী। শা ২৭২।২৪

আমি তাহাদের কিরূপ ধর্ম্ম স্থির করিয়া দিব, দয়া করিয়া বলুন"। ইন্দ্র উত্তর করিলেন—"পিতৃমাতৃ-শুশ্রূষা দস্যুগণের পক্ষেও অবশ্য-কর্ত্তব্য। পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান, কূপ, প্রপা প্রভৃতির উৎসর্গ, অহিংসা, সত্যবচন, পুত্রদারাদির ভরণপোষণ, এইগুলিকে সামান্যতঃ মানবধর্ম্ম বলা হয়। অতএব দস্যুরাও এইসকল ধর্ম্ম অবশ্যই পালন করিবে"।[৪৪] আপদ্ধর্ম্মপ্রকরণে বলা হইয়াছে, দস্যুগণও সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে পারে। অযুধ্যমান পুরুষকে হনন করিতে নাই, স্ত্রীলোকধর্ষণ, কৃতঘ্নতা প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ব্রহ্মবিত্ত-হরণ অথবা কাহারও সর্ব্বস্ব-হরণ উচিত নহে। কোনও জনপদকে আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্বলুণ্ঠন অতিশয় অনুচিত।[৪৫]

দস্যুধর্ম্মেরও উদ্দেশ্য মহৎ—উক্ত হইয়াছে যে, কায়ব্য-নামে এক দস্যুসর্দ্দার দস্যুধর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহার দলের দস্যুগণ তাঁহার নিকট দস্যুধর্ম্ম জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "স্ত্রীলোক, শিশু, তপস্বী, অযুধ্যমান পুরুষ এবং ভীরুকে বধ করিতে নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে কখনও হাত দিও না, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত দস্যুতা করিবে। সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণের ও তপস্বীদের কল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে। পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথির পূজায় নিত্য অবহিত থাকিবে। যাহারা সাধু পুরুষগণকে কষ্ট দিয়া থাকে, কেবল তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়াই দস্যুধর্ম্ম। যাহাদের ধন সৎকাজে ব্যয়িত হয় না, তাহাদের ধন হরণ করিলে কিছুমাত্র পাপ নাই। অসাধু হইতে ধন হরণ করিয়া সাধু পুরুষের পোষণ করা ধর্ম্মকর্ম্মের অন্তর্গত"।[৪৬]

সাধু উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়, তাহাই ধর্ম্ম—এইসকল বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, লোকস্থিতির উদ্দেশ্যে সাধু সঙ্কল্পে যাহাই করা যায় না কেন, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঁধাধরা নিয়ম করা চলে না।

৪৪ শা ৬৫ তম অঃ।

৪৫ অযুধ্যমানস্য বধো দারামর্ষঃ কৃতঘ্নতা।
ব্রহ্মবিত্তস্য চাদানং নিঃশেষকরণং তথা। ইত্যাদি। শা ১৩৩।১৫-১৮

৪৬ মা বধীস্ত্বং স্ত্রিয়ং ভীরুং মা শিশুং মা তপস্বিনম্। ইত্যাদি। শা ১৩৫।১৩-২৪
অসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
আত্মানং সংক্রমং কৃত্বা কৃৎস্নধর্ম্মবিদেব সঃ। শা ১৩৬।৭

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ধর্ম্মের স্বরূপ বিভিন্ন। তবে উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই সাধু হওয়া উচিত। যে কাজের উদ্দেশ্য সাধু, তাহা আপাতদৃষ্টিতে অন্যায় মনে হইলেও অধর্ম্ম নহে।

যুগধর্ম্ম—বনপর্ব্বের হনুমদ্ভীম-সংবাদ এবং মার্কণ্ডেয়যুধিষ্ঠির-সংবাদ হইতে জানা যায়, সত্যযুগে ধর্ম্মই ছিল মানুষের প্রধান অবলম্বন। ঈশ্বরের সহিত মানুষের যে যোগ, তাহাই সত্যযুগের সূচক। যখনই যে পুরুষের সেই যোগ দৃঢ় হইবে, তাঁহার পক্ষে তখনই সত্যযুগ। ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের এক চরণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহাও অপেক্ষাকৃত ভাল। ত্রেতাযুগেও নরগণ স্বধর্ম্মজ্ঞ এবং অনুষ্ঠানরত থাকেন। দ্বাপরযুগে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া যায়; মানুষ প্রায়ই সত্যভ্রষ্ট হয়। কলিযুগে মাত্র একপাদ ধর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে, মানুষের প্রকৃতি প্রায়ই কলুষিত হইয়া উঠে; নানাবিধ আধিব্যাধি দেখা দেয় এবং মানুষের জীবন তীব্র অশান্তিতে অতিষ্ঠভাব ধারণ করে।[৪৭] যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয়মুনি বলিতেছেন—"কলিযুগে অনেকেই ধর্ম্মের ভান করিয়া সরল লোকদিগকে বঞ্চনা করিবে। সাধারণতঃ অল্প একটু বিদ্যা শিখিলেই অতিশয় অহঙ্কারী হইয়া ধরাকে শরারূপে জ্ঞান করিবে, যাগযজ্ঞ বিলুপ্ত হইবে। স্বেচ্ছাচারীর দল আপনার প্রয়োজনানুসারে যে-কোন আচরণকে ধর্ম্মের নামে চালাইবে—ইত্যাদি"।[৪৮]

ধর্ম্মের আদর্শ ও উপেয়—বাহিরের আচরণে সকল যুগেই পার্থক্য থাকিবে। এমন কি, দেশভেদেও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম একরূপ নহে। কিন্তু ধর্ম্মের লক্ষ্য এবং মনের প্রশস্ততা দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সমস্ত মানস সদ্বৃত্তিকেই যদি ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, মহাভারতবর্ণিত ধর্ম্ম অবিনশ্বর, নির্ম্মল, সর্ব্বজনীন এবং সার্ব্বভৌম। যে ধর্ম্মের লক্ষ্য বিশ্বকল্যাণ, তাহাতে সঙ্কীর্ণতার স্থান থাকিতে পারে না। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মসমূহ প্রধানতঃ চিত্তশুদ্ধির উপায়, অনুষ্ঠাতার উপেয় নহে। চিত্তশুদ্ধিই মানুষকে মহৎ হইতে মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে এবং অনুষ্ঠাতা পরিশেষে চরম উপেয়কে প্রাপ্ত হন। এই কারণেই বলা হইয়াছে, "নিত্যো ধর্ম্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে"।

[৪৭] বন ১৪৯তম অঃ। বন ।১৯০।৯-১২

[৪৮] বন ১৮৮তম অঃ ও ১৯০তম অঃ।

সত্য বাঙ্ময় তপস্যা—মহাভারত বলেন, সত্য একপ্রকার তপস্যা। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকরবাক্য এবং বেদাভ্যাসকে বলা হইয়াছে বাঙ্ময় তপস্যা।[১] তপস্যার ফল আত্মতৃপ্তি ও ভগবদ্দর্শন। বাঙ্ময় তপস্যাতেও ঐ ফল অব্যাহত। সত্যনিষ্ঠায় আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, এই বিষয়ে সমস্ত শাস্ত্রের অভিমত এক।[২]

সত্যই সকল ধর্ম্মের মূল—সত্য কি, কি উপায়ে তাহা লাভ করা যায় এবং কিভাবে সত্য রক্ষিত হয়, যুধিষ্ঠির এই বিষয়ে ভীষ্মকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে ভীষ্ম বলিয়াছেন, "সত্য সাধুদের পরম ধর্ম্ম, সত্য সনাতনস্বরূপ, সতত সত্যের সেবা করিবে। সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই যোগ, সত্যই ব্রহ্ম; সত্যের উপাসনাই যাগযজ্ঞ"।

তের-প্রকার সত্য—সত্য তের-প্রকার, যথা—(ক) সত্য—সত্য অব্যয়, অবিকারী এবং নিত্য, কোনও ধর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ নাই। যোগানুশীলনে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সমস্ত ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ আচরণের নাম সত্য, ইহাই সত্যের আসল স্বরূপ। প্রকৃত সত্য চিরকালই সমান, স্থান বা কালের দ্বারা তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই বলা হইয়াছে, ধর্ম্ম যেখানে, সত্যও সেখানে। সমস্ত বস্তু সত্যের দ্বারা স্বীয় রূপ লাভ করে।[৩] (খ) সমতা—ইষ্ট, অনিষ্ট, শত্রু, মিত্র সকলের প্রতি সমান ব্যবহার এবং সমান মানস বৃত্তির নাম সমতা। ইহাও একপ্রকার সত্য। (গ) দম—ইচ্ছাও নাই দ্বেষও নাই, এরূপ যে অবস্থা, ইহাও একপ্রকার সত্য। এই সত্যকে বলা হয় 'দম'। কাম-ক্রোধাদি রিপু যাঁহার কিছুই করিতে পারে না, যিনি স্বপ্রতিষ্ঠ, গম্ভীর এবং মহিমবান্, তিনিই এইপ্রকার সত্যের উপাসক। (ঘ) অমাৎসর্য্য—দানে এবং ধর্ম্মকার্য্যে সংযম আর মৃদুতাকে বলা হয়—অমাৎসর্য্য। ইহাও একপ্রকার সত্য। (ঙ) ক্ষমা—ক্ষমার গুণ অসংখ্য। সাধু

১ অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে। গী ৪১।১৫

২ সত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যমেকাক্ষরং তপঃ। ইত্যাদি। শা ১৯৯।৬৪-৭০
নাস্তি সত্যসমং তপঃ। শা ৩২৯।৬

৩ যতো ধর্ম্মস্ততঃ সত্যং সর্ব্বং সত্যেন বর্দ্ধতে। শা ১৯৯।৭০

ক্ষমাশীল পুরুষ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং ক্ষমা একপ্রকার সত্য। (চ) হ্রী—কল্যাণকর অনুষ্ঠানে নিরত পুরুষ কখনও বিপন্ন হন না, তিনি নিত্য প্রশান্তবাক্ ও প্রশস্তমনা। তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে হ্রীর (সমুচিত লজ্জা) উৎপত্তি। হ্রীসেবক পুরুষ সত্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। (ছ) তিতিক্ষা—তিতিক্ষা-শব্দের অর্থ সহিষ্ণুতা, সুখ-দুঃখে সমভাব। তিতিক্ষা দ্বারা সত্যকাম পুরুষ লোকসংগ্রহ করিতে সমর্থ হন, সকলই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। (জ) অনসূয়তা—সর্ব্বভূতের কল্যাণচিন্তাই অনসূয়তা। সুতরাং তাহাও সত্যের অন্তর্গত। (ঝ) ত্যাগানুসন্ধান—ভোগ্য বিষয়ে অতিশয় আকর্ষণকে ছিন্ন করিবার চেষ্টাই ত্যাগানুসন্ধান। যিনি বিষয়ত্যাগে অনেকটা অগ্রসর, তিনিই ত্যাগরূপ সত্যের স্বাদে আনন্দ অনুভব করেন। (ঞ) আর্য্যতা —আর্য্যতা শব্দের অর্থ সর্ব্বভূতের হিতকামনা এবং সাধু অনুষ্ঠান। যে বীতরাগ পুরুষ আর্য্যতার উপাসক, তাঁহাকেও সত্যের উপাসক বলা যাইতে পারে। (ট) ধৃতি—সুখদুঃখে অবিকৃতির নাম ধৃতি। ধৃতিমান্ পুরুষ ধৃতির প্রতিষ্ঠাতেই সত্যে অবিচলিত। (ঠ) দয়া—দয়াও একপ্রকার সত্য। (ড) অহিংসা—কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ আচরণ এবং বিশ্বের কল্যাণ-ধ্যানের নাম অহিংসা। ইহাও সত্যবিশেষ। এই তের-প্রকার সত্য এক মহান্ আদর্শকে পরিপুষ্ট করে। সেই আদর্শই যথার্থ সত্যপদবাচ্য। আর উল্লিখিত তেরটি সদ্গুণ তাহারই অবান্তর প্রকাশ বা ব্যষ্টি আদর্শ। সমষ্টিরূপ সত্যই মহাসত্য।[৪]

সত্য সকল সদ্গুণের অধিষ্ঠান—সত্যের ফল নিঃশেষে কীর্ত্তন করা অসম্ভব। সত্য হইতে বড় কোন ধর্ম্ম নাই এবং মিথ্যা হইতে বড় পাতক নাই। সত্যই ধর্ম্মের স্থিতি, কখনও সত্যের অপলাপ করিতে নাই।[৫] উল্লিখিত ভীষ্মবাক্যে সত্য-শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, সকল সদ্গুণের মূলেই সত্যনিষ্ঠা।

সত্য-শব্দের সাধারণ অর্থ—যথার্থ বচন—যদিও ব্যাপক অর্থে সত্য-শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, তথাপি সত্য-শব্দের আপাতলভ্য অর্থ যথার্থ বাক্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গীতার মতে সত্য বাঙ্ময় তপঃস্বরূপ।

---

৪ সত্যং ত্রয়োদশবিধং সর্ব্বলোকেষু ভারত। ইত্যাদি। শা ১৬২।৭-২৩

৫ নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্। ইত্যাদি। শা ১৬২।২৪

অন্যত্র বলা হইয়াছে—যাঁহারা কেবল সত্য বলিবার উদ্দেশ্যেই কথা বলেন, তাঁহারা কখনও বিপদে পতিত হন না।[৬]

সত্য-উপাসনার উপদেশ—শ্রী-রুক্মিণী-সংবাদে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা সতত সত্য কথা বলেন, শ্রীদেবী তাঁহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিতা হন।[৭] লোকযাত্রা-কথনাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, কল্যাণকাম পুরুষ অসংপ্রলাপ, নিষ্ঠুরভাষণ, পিশুনতা এবং অনৃত, এই চারি প্রকার বাক্যদোষ পরিত্যাগ করিবেন।[৮]

প্রাণিহিতকর বাক্যই সত্য—সত্য-শব্দ 'যথার্থবচন'-অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যাহা প্রাণিগণের হিতকর বাক্য, যে বাক্যে কাহারও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তাহাই সত্য। প্রাণিগণের হিতের নিমিত্ত যদি অযথার্থ কিছু বলা হয়, মহাভারতের মতে তাহাও সত্য-শব্দের বাচ্য।[৯]

অযথার্থ বচনকেও সত্য বলা যায়—মোক্ষধর্মে ভীষ্ম বলিয়াছেন, "আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান; সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। সত্যবচন অপেক্ষাও হিতবাক্য শ্রেষ্ঠ। যাহা ভূতগণের অত্যন্ত হিতকর, তাহাই সত্য, ইহাই আমার অভিমত"।[১০]

সত্যানৃত-বিবেচনা—সময়বিশেষে প্রাণিহিতের নিমিত্ত অযথার্থ বাক্য বলিলে দোষ নাই। কোন কোন সময়ে অযথার্থ বচনকেও সত্য বলা যাইতে পারে, ইহা মহাভারতে বহুস্থানে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরিহাস-বাক্য অনৃত হইলেও দোষ নাই। কামুকী-গমনের ব্যাপার গোপন করিলে দোষ নাই। বিবাহের বিষয়ে অর্থাৎ ঘটকতায় অনৃত বচন দূষণীয় নহে। যদি যথার্থ কথা বলিলে কাহারও প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে, তবে সেই স্থলে মিথ্যা বলা দূষণীয় নহে। যে স্থলে যথার্থ বাক্য দ্বারা কাহারও সর্ব্বস্ব নাশের আশঙ্কা, সেখানেও মিথ্যাবচনে দোষ নাই। গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, দীন অথবা আতুরের উপকারের নিমিত্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও অন্যায় নহে। গুরুর উপকারের নিমিত্ত অথবা

৬ বাক্ সত্যবচনার্থায় দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে। শা ১১০।২৩

৭ সত্যস্বভাবার্জ্জবসংযুতাসু। ইত্যাদি। অনু ১১।১১

৮ অসংপ্রলাপঃ পারুষ্যং পৈশুন্যমনৃতং তথা। ইত্যাদি। অনু ১৩।৪

৯ যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা। ইত্যাদি। বন ২০৮।৪। বন ২১২।৩১

১০ আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতং মম। ইত্যাদি। শা ৩২৯।১৩, শা ২৮৭।২০

আপনার জীবন বিপন্ন হইলে অযথার্থ বাক্য বলায় দোষ নাই।[১১] সময়-বিশেষে যথার্থবচনে পাপ হয়, অনৃত ভাষণই তখন প্রশস্ত। আপনার বা অপরের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অনৃত বাক্য বলিলে কোন পাপ হয় না।[১২]

অন্যের অনিষ্টজনক যথার্থ বচন—অনৃত—সকল সময় যথার্থ বাক্য বলা উচিত নহে। সত্য এবং অসত্যের তত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। খুব চিন্তা করিয়া যথার্থ বাক্য বলিতে হয়। প্রাণাত্যয়ে, বিবাহে, সর্ব্বস্বের অপহারে, রতিসংপ্রয়োগে এবং বিপ্রের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে অযথার্থ বাক্য বলাই সমুচিত। যিনি এইসকল সময়ে যথার্থ বাক্যের পক্ষপাতী, তাঁহাকে সত্যবাদী বলা যাইতে পারে না। সত্যানৃতের নিশ্চয় করা খুবই বিবেচনাসাপেক্ষ।[১৩]

কৌশিকোপাখ্যান—যে যথার্থ বচন অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহা বলা অনুচিত। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট নিম্নবর্ণিত প্রাচীন উপাখ্যানটি বিবৃত করেন। কৌশিক-নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রামের নিকটে নদীতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, সর্ব্বদা সত্যবাক্য বলা। একদা কয়েকজন পথিক দস্যুভয়ে আশ্রমের নিকটস্থ এক বনে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত লুকাইয়া থাকেন। দস্যুগণ পলায়িত পথিকদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৌশিককে পথিকদের খবর জিজ্ঞাসা করিল। কৌশিক পথিকদের আত্মরক্ষার স্থান দস্যুদিগকে দেখাইয়া দিলেন। দস্যুগণ কৌশিকের নিকট পথিকদের সন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে হনন করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া গেল। যথার্থ বলার পাপে কৌশিক মৃত্যুর পর অনন্ত নরকে নিমজ্জিত হইলেন। সুতরাং যথার্থ ভাষণই সত্য নহে, প্রাণিহিতের নিমিত্ত যাহা বলা যায়, তাহাই সত্য।[১৪]

সত্য ও ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—সত্য এবং ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একের অভাবে অপরের সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

১১ ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি। ইত্যাদি। আদি ৮২।১৬,১৭। বন ২০৮।৩
ন গুর্ব্বর্থং নাত্মনো জীবিতার্থে। ইত্যাদি। শা ১৬৫।৩০। শা ১০৯ তম অঃ।

১২ সত্যাজ্জ্যায়োঽনৃতং বচঃ। ইত্যাদি। দ্রো ১৮৯।৪৭

১৩ সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্
তত্ত্বেনৈব হি দুর্জ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্॥ ইত্যাদি। কর্ণ ৬৯।৩১-৩৬

১৪ কর্ণ ৬৯ তম অঃ।

যে আচরণের মধ্যে সত্য নাই, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। যাহাতে সর্বপ্রকারের অভ্যুদয় ঘটে, তাহাই ধর্ম্ম। অহিংসা, অপীড়ন প্রভৃতির অনুরোধে যদি সময়বিশেষে অগত্যা অনৃতকে আশ্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অনৃত আচরণকেই ধর্ম্মরূপে স্বীকার করা হয়। একমাত্র সর্ব্বভূতের কল্যাণ যাহাতে নিহিত, তাহাই সত্য, আর সত্য যে আচরণের অঙ্গীভূত, সেই আচরণই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ও সত্যকে পৃথক্ করিয়া ব্যষ্টিরূপে দেখিবার উপায় নাই, পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ।[১৫]

শঙ্খলিখিতোপাখ্যান—শঙ্খ ও লিখিতের উপাখ্যান সকলের নিকট সুপরিচিত। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত সামান্য কারণে শঙ্খ সহোদর ভাইকে কঠোর শাস্তি দ্বারা শোধন করিয়া লইয়াছিলেন।[১৬]

সত্য বাক্যের প্রশংসা—সত্যের প্রশংসায় মহাভারত পঞ্চমুখ। বহুস্থানে সত্যের প্রশংসাপর বাক্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। উমামহেশ্বর-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—যাঁহারা সত্যধর্ম্মে রত, তাঁহাদের স্থান স্বর্গলোকে। যাঁহারা নর্ম্মহাসচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলেন না, যাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত বা অন্য কোন কারণে অনৃত উচ্চারণ করেন না, তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। যাঁহারা কখনও কুটিল আলোচনায় যোগ দেন না, নিষ্ঠুর পরুষ বা কটুকথা মুখে আনেন না, যাঁহারা ঋত এবং মৈত্র ভাষণকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বর্গে বাস হয়।[১৭]

বাচিক ও মানস সত্য—যাঁহারা মানস সত্যরূপ ব্রত পালনে তৎপর, তাঁহারাও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অরণ্যে বা বিজনে পরস্ব দেখিয়াও যাঁহারা কিছুমাত্র বিচলিত হন না, যাঁহারা অবৈর এবং মৈত্রচিন্তারত, যাঁহারা শ্রদ্ধাশীল, পবিত্র এবং সত্যনিষ্ঠ, সেইসকল মহাপুরুষ স্বর্গভোগের অধিকারী। তাঁহারা সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া নানা কল্যাণকর অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহাদের নিকট শত্রু-মিত্র সকলই সমান।[১৮]

---

১৫ নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি। উ ৩৫।৫৮
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্। শা ১০৯।১০

১৬ শা ২৩ শ অঃ।

১৭ সত্যধর্ম্মরতাঃ সন্তঃ সর্ব্বলিঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ। ইত্যাদি। অনু ১৪৪।৫—২৭

১৮ অরণ্যে বিজনে ন্যস্তং পরস্বং দৃশ্যতে যদি।
মনসাপি ন হিংসন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ। ইত্যাদি। অনু ১৪৪।৩১-৫২

অশ্বমেধযজ্ঞ অপেক্ষাও সত্যের ফল বেশী—সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ হইতেও সত্যের মূল্য বেশী। অনৃতের সমান পাতক আর কিছুই নাই। সত্যের মহিমাতেই সূর্য্য আলোক প্রদান করেন, অগ্নি প্রদীপ্ত হন, বায়ু প্রবাহিত হন, সমস্ত বিশ্ব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যের উপাসনায় দেবগণ ও পিতৃগণ সন্তোষ লাভ করেন। সত্য সমস্ত ধর্ম্মের সার। মুনিগণ সত্যবিক্রম ও সত্যরত। সত্যব্রত সংশিতচিত্ত মহাপুরুষগণ স্বর্গলোকে অনন্ত সুখের অধিকারী হন। সত্যভ্রষ্ট পুরুষের সমস্ত আয়োজন ও অনুষ্ঠান ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। চিত্তশুদ্ধি, সত্যপ্রীতি এবং যাগযজ্ঞের শেষ ফল সমান।[১৯]

সত্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়—সত্যই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। প্রজ্ঞাহীন পুরুষ ব্রাহ্মী শ্রী লাভ করিতে পারেন না। প্রজ্ঞা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব সত্যই উপায়সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন, "মহারাজ, সত্যে অমৃত প্রতিষ্ঠিত, সত্যই সমস্ত সদ্‌গুণের মূল, সত্যেই ত্রিলোক বিধৃত আছে, আপনি সত্যচেতা হউন"।[২০]

সত্য দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করা—মিথ্যাবাদী পুরুষও সত্যের নিকট মাথা নত করিতে বাধ্য হয়। মিথ্যাকে জয় করার ন্যায় মিথ্যাবাদীকে জয় করিবারও প্রধান শস্ত্র—সত্যবচন।[২১]

ভীষ্মদেবের শেষ উক্তি, সত্যবিষয়ে—পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে লৌকিক অলৌকিক সকল বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন। যুধিষ্ঠির যেন নিখিল মানবসমাজের প্রতিনিধি, আর ভীষ্ম সর্ব্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার। মানুষের মনে যতপ্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া মহাভারতকার সকল প্রশ্নই করাইয়াছেন, কিছুই বাকী রাখেন নাই। ভীষ্মদেব উত্তরের পর উত্তর দিয়া চলিয়াছেন। শরীর ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সুহৃদ্গুলীকে

---

১৯ অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥ ইত্যাদি। আদি ৭৪।১০৩-১০৬। অনু ৭৫।৩০-৩৫
তুলাং যজ্ঞশ্চ সত্যঞ্চ হৃদয়স্য চ শুদ্ধতা। অনু ১২৭।১৮

২০ সত্যার্জ্জবে হ্রীর্দমশৌচবিদ্যাঃ। ইত্যাদি। উ ৪২।৪৬
সত্যাত্মা ভব রাজেন্দ্র সত্যে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তাংস্তু সত্যমুখানাহুঃ সত্যে হ্যমৃতমাহিতম্॥ উ ৪৩।৩৭

২১ জয়েৎ কদর্য্যং দানেন সত্যেনানৃতবাদিনম্।
ক্ষময়া ক্রূরকর্ম্মাণমসাধুং সাধুনা জয়েৎ॥ বন ১৯৪।৬

শেষ উপদেশ দিলেন—"তোমরা সত্যকেই আশ্রয় করিবে, সত্যই পর বল"।[২২]

কপট সত্য অতিশয় ঘৃণ্য—সত্যের মধ্যে কোন কপটতা থাকি পারে না, সত্য সকল সময়েই সত্য। একটু পিশুনতা থাকিলেই তাহার মহ নষ্ট হইয়া যায়।[২৩]

হতো গজ ইতি—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আত্মপক্ষ বাঁচাইবার জন্য যুধিষ্ঠি সত্যসন্ধ হইয়াও কপট সত্যের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যবধের সহায়তা করিয়াছিলে তাঁহার জীবনে কলঙ্কসমূহের মধ্যে তাহা অন্যতম। মিথ্যাকে সত্যের আবর গোপন করিতে গেলে যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা নরকযন্ত্রণার সমান যুধিষ্ঠিরও এই গ্লানি বহন করিয়াছেন। তাঁহার কপট সত্যের প্রতিফ স্বর্গারোহণ-পর্ব্বে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত সুখসম্পদের অধিকা হইয়াও তিনি পরলোকে নরকদর্শন হইতে অব্যাহতি পান নাই।[২৪]

দেবতা

দেবতার স্বরূপ—দেবতাগণ যেন একপ্রকার উন্নত শ্রেণীর জীব তাঁহাদের সামর্থ্য মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশী, তাঁহারা পরমেশ্বরের সমৃদ্ধি সমৃদ্ধ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আদিত্যগণে মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কদের মধ্যে রবি, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি এ নক্ষত্রদের মধ্যে শশী"। অধ্যায়ের সমাপ্তিতে বলিয়াছেন, "জগতে যে যে ব বিভূতিসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন এবং তেজস্বী, সেইসকল বস্তু আমার তেজের অং হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে।"[১]

২২ সত্যেষু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলম্। অনু ১৬৭।৪৯

২৩ ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনাভ্যুপেতম্। উ ৩৫।৫৮

২৪ দ্রো ১৮৯ তম অঃ।
ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ দর্শিতো নরকস্তব। স্বর্গা ৩।১৫

১ আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। ইত্যাদি। ভী ৩৪।২১-২৩
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্। ভী ৩৪।৪১

তাঁহারা ঈশ্বরের বলে বলীয়ান্—এইসকল উক্তি হইতে মনে হয়, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রমুখ দেবতাগণ ঈশ্বরের বলে বলীয়ান্। দেবতাদের অলৌকিক ক্ষমতাও পরমেশ্বরের ক্ষমতা হইতে পৃথক্ নহে।

উপাসকের নিকট তাঁহার দেবতাই পরমেশ্বর—অন্যদিকে লক্ষ্য করিলে মহাভারতেই দেখিতে পাই—উপাসক তাঁহার দেবতাকে পরমেশ্বর-বুদ্ধিতেই উপাসনা করিতেছেন। পরমেশ্বর ও উপাসকের দেবতার মধ্যে যে কোন প্রভেদ আছে, তাহা বুঝা যায় না। প্রত্যেকেই আপন আপন ইষ্টদেবতাকে পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ মনে করেন। গীতাতে ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"যে ভক্ত যে মূর্ত্তিরই পূজা করিতে চান না কেন, আমি সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহার অচল শ্রদ্ধা জন্মাইয়া থাকি"।[২] উপাসকের নিকট তাঁহার উপাস্য দেবতাই ভগবান্। উপাসক তাঁহার ইষ্টদেবতা ও ভগবানের মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখিতে পান না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, ভক্তের নিকট ভগবদ্-রূপেই দেবতাদের স্বরূপ কল্পিত হয়। কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং ঐ কল্পনা করিয়া থাকেন, অথবা ভক্ত কল্পনা করেন, এই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। উভয় পক্ষের সমর্থক শাস্ত্রবচনই দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ স্বয়ং কল্পনা করিয়াছেন, এই পক্ষেরই জোর বেশী এবং ইহাই সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। এখানে এই বিষয়ে আলোচনা করা অনাবশ্যক। মহাভারতে যে যে দেবতার নাম ও স্বরূপাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেইসকল দেবতার বিষয়ই আমাদের মুখ্যতঃ আলোচ্য।

মূল দেবতা তেত্রিশ জন—তেত্রিশ-জন দেবতাকে খুব প্রাচীন ও আদিম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে এই তেত্রিশজনের নামতঃ উল্লেখ নাই।[৩] তাণ্ড্যব্রাহ্মণে (৬।২।৫) ও বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৩।৯) উল্লিখিত হইয়াছে—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি এবং ইন্দ্র, এই তেত্রিশ-জনই দেবতা। নীলকণ্ঠের টীকাতেও ঐ তেত্রিশ-জনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।[৪] রামায়ণে (৩।১৪।১৪) ইন্দ্র ও প্রজাপতির স্থানে

২ যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ভী ৩১।২১

৩ ত্রয়স্ত্রিংশত ইত্যেতে দেবাঃ। ইত্যাদি। আদি ৬৬।৩৭। আদি ১।৪১। বন ২১৩।১৯। বন ২৬০।২৫। বি ৫৬।৮। অনু ১৫০।২৪

৪ নীলকণ্ঠ—আদি ১।৪১। আদি ৬৬।৩৭

অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই তেত্রিশ-জন আদি দেবতা হইতেই ক্রমশঃ দেবতাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তেত্রিশ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। নীলকণ্ঠ দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[১] তেত্রিশ কোটি শব্দটি বোধ করি, একটা বৃহৎ সংখ্যা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ শ্লোকের টীকাতেই নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, 'সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে', অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব। পৃথিবী, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র এবং নক্ষত্রসমূহ অষ্টবসু-শব্দের বাচ্য।

জড় বস্তুর অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেবতার কল্পনা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়ই একাদশ রুদ্র। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠাদি দ্বাদশ মাসই দ্বাদশ আদিত্য। ইন্দ্র শব্দের অর্থ পর্জন্য এবং প্রজাপতি শব্দের অর্থ যজ্ঞ। এইসকল বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী চেতনাকেই দেবতা-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অচেতন বস্তুগুলির অধিষ্ঠাত্রী বা অভিমানিনী এক-একজন দেবতার কথা ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রাগুক্ত শ্লোকের টীকাতে সেই প্রাচীন সিদ্ধান্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন। অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহার্য্য জড় বস্তুগুলির অধিষ্ঠাত্রী চেতনার উপলব্ধি করিয়াই ঋষিগণ এইসকল দেবতার সন্ধান পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ যে কয়েকটি বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী সম্বন্ধে তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সেই কয়টিতেই দেবতার উপলব্ধি করিয়া দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন। পরে অন্যান্য বস্তুর শক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই ক্রমবিকাশের পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, জড় বস্তুর মধ্যেও যে মহাশক্তির লীলা চলিতেছে, সেই শক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে পূজা করা হইয়াছে।

দেবতাদের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ—অলৌকিক যোগবলে ঐশ্বর্য্যশালী ঋষিগণ দেবতাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতেন, মহাভারতে এরূপ ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। যোগৈশ্বর্য্যের শক্তি স্বীকার করিলে যোগিগণের প্রত্যক্ষকেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐশী শক্তির বিশেষ বিশেষ প্রকাশকেই যদি দেবতারূপে স্বীকার করা যায়, তবে সাকার উপাসকের ভক্তির টানে

---

১ ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটয় ইত্যর্থঃ। নীলকণ্ঠ। আদি ১।৪১।

বিশেষ বিশেষ বিভূতিরূপে রূপ-পরিগ্রহ করা সর্ব্বশক্তিশালী ঈশ্বরের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নহে। উপাসকের নিকট তাঁহার দেবতা কেবল জড়বস্তু-বিশেষের চেতনারূপে কল্পিত হন না, তাঁহার নিকট তিনিই সর্ব্বস্ব, তিনিই বিশ্বের পরিচালিকা মহাশক্তি, তিনিই ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ দেবতাগণকে পূর্ণ ব্রহ্মরূপেই মহাভারত স্বীকার করেন। মহাভারতের দেবতাতত্ত্ব অত্যন্ত দুরূহ। ঈশ্বররূপে এবং বিশেষ বিশেষ জড়বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী-রূপে, এই উভয়রূপেই দেবতাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত আলোচনা করিলে মনে হয়, উপাস্য দেবতাগণ উপাসকের নিকট ঈশ্বররূপেই পূজিত। একই ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ জড়-প্রকাশক অবস্থাকে অথবা বিশেষ বিশেষ বিভূতিকে বিশেষ বিশেষ দেবতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সবই এক।

অগ্নি—অগ্নির প্রতাপ সুবিদিত। দেবতাদের মধ্যে তিনি খুব তেজস্বী। তিনি সকল দেবতার প্রতীক।[৬]

আহুতি প্রদান ও উপাসনা—মন্ত্রসংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেই দেবগণ প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করিয়া যজমানের কল্যাণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, পশুপতি, রুদ্র, হিরণ্যরেতাঃ, জাতবেদাঃ প্রভৃতি অগ্নিরই নামান্তর। অগ্নিহোত্রিগণ অগ্নিরও উপাসনা করিতেন এবং অগ্নিতেই অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে হবিঃ নিবেদন করিতেন।[৭]

সহদেবকৃত অগ্নিস্তুতি—দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে সহদেব মাহিষ্মতী-নগরীতে উপস্থিত হইলে নগররক্ষক অগ্নিদেব তাঁহার সৈন্যগণকে বেষ্টন করিয়া ফেলেন। সহদেব তখন অনন্যোপায় হইয়া অগ্নির শরণাপন্ন হন। সহদেবের স্তবে প্রসন্ন হইয়া অগ্নিদেব তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন। সেই স্তুতিতেও অগ্নিই পরমেশ্বর—এইরূপ আভাস পাওয়া যায়।[৮]

মন্দপালকৃত স্তুতি—খাণ্ডবপ্রস্থদাহের সময় পুত্রদারাদির কল্যাণকামনায় ঋষি মন্দপাল অগ্নিদেবতার স্তুতি করিয়াছিলেন। সেই স্তুতিতে বলা হইয়াছে,

৬ অগ্নিহি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ। ইত্যাদি। অনু ৮৪।৫৬। অনু ৮৫।১৫১

৭ অগ্নির্ব্রহ্মা পশুপতিঃ শর্ব্বো রুদ্রঃ প্রজাপতিঃ। অনু ৮৫।১৪৭
স্বাহা প্রাদুষ্চকারাগ্নিম্। ইত্যাদি। অনু ১৯।৩০। উ ৮৩।৯

৮ সভা ৩১।৪০-৫৯

"হে অগ্নে, তুমিই সর্ব্বভূতের মুখস্বরূপ। তোমার স্বরূপ অতিশয় গূঢ়। ঋষিগণ তোমাকে দিব্য, ভৌম এবং ঔদর্য্যরূপে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। পঞ্চভূত, সূর্য্য, চন্দ্র ও যজমানরূপে তুমিই যজ্ঞনির্ব্বাহক। তোমাতেই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত"। স্তুতির শব্দগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যায়, ঋষি অগ্নিকে পরমেশ্বরবুদ্ধিতেই স্তুতি করিয়াছেন।[৯]

সারিস্থক্কাদি-কৃত স্তুতি—মন্দপালের পুত্র সারিস্থক, জরিতারি প্রমুখ ঋষিগণ অগ্নি দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কায় যে স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাতেও প্রত্যেকটি শব্দই পরমেশ্বরের বাচক। ঋষিকুমারগণ সর্ব্বশক্তির আকররূপে অগ্নিকে প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন।[১০]

অগ্নির সপ্ত জিহ্বা—কালী, মনোজবা, ধূম্রা, করালী, লোহিতা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচি এই সাতটি অগ্নির জিহ্বা। দার্শনিক ব্যাখ্যায় পঞ্চেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই সাতটিকে অগ্নির জিহ্বারূপে কল্পনা করা হয়।[১১]

ইন্দ্র—দেবতাদের মধ্যে যিনি রাজা, তাঁহাকে ইন্দ্র, বাসব, শতক্রতু, পুরন্দর প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি অন্যান্য দেবতাদের শাসনকর্ত্তা। স্বর্গলোক তাঁহার বাসস্থান। তাঁহার পত্নীর নাম শচী।

ইন্দ্রের সভার বর্ণনা—দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট ইন্দ্রের সভার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র বজ্র। তাঁহার মন্ত্রী বৃহস্পতি। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় বহু দেবতা ও দেবর্ষি-গণের সমাগম হইয়া থাকে। উর্ব্বশী, রম্ভা প্রমুখ অপ্সরাগণ নৃত্যগীতের দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন।[১২]

নহুষের ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি—দুশ্চর তপস্যা দ্বারা মর্ত্ত্যবাসী পুরুষও ইন্দ্রত্ব

৯ সোঽভিতুষ্টাব ব্রহ্মর্ষির্ব্রাহ্মণো জাতবেদসম্। ইত্যাদি। আদি ২২৯।২২-৩০

১০ আত্মাসি বায়োর্জ্জ্বলন শরীরমসি বীরুধাম্। আদি ২৩২।৭-১৯

১১ কালী মনোজবা ধূম্রা করালী লোহিতা তথা। ইত্যাদি। আদি ২৩২।৭। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

১২ ইন্দ্রো হি রাজা দেবানাম্। ইত্যাদি। আদি ১২৩।২২। আদি ২২৭।২৯। সভা ৬।১৭। বি ২।২৩

ইন্দ্রের সভাবর্ণন—সভা ৭ম অঃ।

বৃত্রবধোপাখ্যান—বন ১০১ তম অঃ। উ ১০ম অঃ। বন ১৭৪ তম অঃ। বন ২২৩ তম অঃ। বন ২২৬ তম অঃ। শা ১২২।২৭। শা ২৮০ তম অঃ।

লাভ করিতে পারেন। বর্ণিত হইয়াছে যে, রাজা নহুষ দীর্ঘকাল ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৩]

ইন্দ্র একটি উপাধি—'ইন্দ্র' একটি উপাধিমাত্র। যিনি দেবতাদের রাজা, তাঁহাকে 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত করা হয়।[১৪]

ইন্দ্রের কর্ত্তব্য—অমিতশক্তি স্কন্দের অভ্যুদয়ে দেবরাজ শচীপতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্কন্দের শরণাপন্ন হন। পরে ইন্দ্র ও মহর্ষিগণ মিলিতভাবে স্কন্দের নিকট গমন করিয়া ইন্দ্রত্ব গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করেন। স্কন্দ মহর্ষিগণকে প্রশ্ন করিলেন—'ইন্দ্রের কর্ত্তব্য কি কি?' মহর্ষিগণ উত্তর করিলেন—"ইন্দ্র ত্রিলোকের রক্ষক, তিনি প্রাণিগণের বল, তেজ, প্রজা ও সুখ এইগুলির কারণ, তিনি ত্রিলোকের কল্যাণকর্ত্তা, তিনি দুর্ব্বৃত্তের শাস্তা এবং সজ্জনের পুরস্কর্ত্তা। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতি সকলকে স্ব স্ব মর্য্যাদায় স্থাপন করা ইন্দ্রেরই কাজ। ইন্দ্র বিপুল বলবান্; তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপরই সকলের কল্যাণ নির্ভর করে।"[১৫] উল্লিখিত মহর্ষিবাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যিনি দেবতাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারই নাম (উপাধি) হইবে 'ইন্দ্র'।

ইন্দ্র পর্জ্জন্যের অধিপতি—দ্বিজগণ বেদমন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলে যজ্ঞে পূজিত দেবতাগণ ইন্দ্রের নিকট আপন আপন তৃপ্তির কথা জানাইয়া থাকেন। দেবরাজ তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া কালোপযোগী বর্ষণে পৃথিবীকে শস্য-সম্পদে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহাতে নিখিল প্রাণিজগৎ উপকৃত হয়।[১৬]

ইন্দ্রধ্বজের পূজা—রাজা উপরিচরবসু প্রথমে ইন্দ্রধ্বজ-পূজার প্রচলন করেন। মাটিতে একটি বেণুযষ্টি প্রোথিত করিয়া তাহাতেই ইন্দ্রের পূজার ব্যবস্থা করা হইত। বৎসরের মধ্যে মাত্র একদিন এইরূপ পূজার বিধান ছিল। ইন্দ্রধ্বজ-পূজার পরের দিন বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি উপচারে হংসরূপী ইন্দ্রের

১৩ বন ১৭৯ তম অঃ। উ ১১শ—১৭শ অঃ। শা ৩৪২ তম অঃ। অনু ১০০ তম অঃ

১৪ বহুনীন্দ্রসহস্রাণি সমতীতানি বাসব। শা ২২৪।৫৫

১৫ ইন্দ্রো দধাতি ভূতানাং বলং তেজঃ প্রজাঃ সুখম্। ইত্যাদি। বন ২২৮।৯-১২

১৬ বভূব যজ্ঞো দেবেভ্যো যজ্ঞঃ প্রীণাতি দেবতাঃ। ইত্যাদি। শা ১২১।৩৭—৩৯
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যঃ। ভী ২৭।১৪

পূজার নিয়ম ছিল। টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, মহারাষ্ট্রাদি দেশে অদ্যাপি ইন্দ্রধ্বজ প্রোথিত করা হয়।[১৭]

ঋভুগণ—ঋভুনামে একশ্রেণীর দেবগণ স্বর্গলোকে বাস করেন। তাঁহারা দেবতাদেরও দেবতা।[১৮] অন্যত্র তাঁহাদিগকেও দেবতাদের পর্য্যায়েই গ্রহণ করা হইয়াছে।[১৯]

কালী (কাত্যায়নী, চণ্ডী)—সৌপ্তিকপর্ব্বে বর্ণিত আছে, ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া সুপ্ত বীরগণকে যখন হত্যা করিতেছিলেন, তখন হন্যমান পুরুষগণ রক্তমুখী, রক্তনয়না, কৃষ্ণবর্ণা, রক্তমাল্যানুলেপনা, পাশহস্তা এক ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই দেবী কালরাত্রি-স্বরূপা, তিনি পাশবদ্ধ প্রেতগণকে আকর্ষণ করিতেছিলেন।[২০]

কালীর ভীষণ স্বরূপ সংহারের প্রতীক—কালরাত্রিস্বরূপিণী কালীকে সংহারের বিগ্রহরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুপর্ব্বে প্রদ্যুম্নের কত্যায়নীপূজা ও অনিরুদ্ধের চণ্ডীস্তুতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।[২১]

কুবের—ধনের অধিপতি দেবতার নাম কুবের। তিনি গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস প্রমুখ জাতিদেরও অধিনায়ক।[২২] তিনি কৈলাসপর্ব্বতে বাস করেন। মণিভদ্র প্রভৃতি যক্ষবীরগণ তাঁহার পার্শ্বচর।[২৩] অন্যত্র বলা হইয়াছে—তাঁহার বাসস্থান 'গন্ধমাদন'।[২৪]

গঙ্গা—গঙ্গা যদিও নদীরূপে প্রবাহিতা, তথাপি মহাভারত ঐ নদীকে দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহর্ষি কপিলের অভিসম্পাতে সগরের

১৭ ততঃ প্রভৃতি চাদ্যাপি যষ্টেঃ ক্ষিতিপসত্তমৈঃ।
প্রবেশঃ ক্রিয়তে রাজন্ যথা তেন প্রবর্ত্তিতঃ॥ ইত্যাদি। আদি ৬৩।১৮-২১

১৮ ঋভবো নাম তত্রান্যে দেবানামপি দেবতাঃ। বন ২৬০।১৯

১৯ ঋভবো মরুতশ্চৈব দেবানাং চোদিতো গণঃ। শা ২০৮।২২

২০ কালীং রক্তাস্যনয়নাং রক্তমাল্যানুলেপনাম্। ইত্যাদি। সৌ ৮।৬৫-৬৮

২১ কালী স্ত্রী পাণ্ডবৈর্দ্দৃষ্টৈঃ প্রবিশ্য হসতী নিশি। ইত্যাদি। সৌ ৩।১
নমস্ত্রৈলোক্যমায়ায়ৈ কাত্যায়ন্যৈ নমো নমঃ। ইত্যাদি। হরি, বিষ্ণুপ ১৬৬ তম ও ১১৮ তম অঃ।

২২ ধনানাং রাক্ষসানাঞ্চ কুবেরমপি চেশ্বরম্। শা ১২২।২৮

২৩ অনু ১৯ শ অঃ। বন ১৬১ তম ও ১৬২ তম অঃ।

২৪ গন্ধমাদনমাজগ্মুঃ প্রকর্ষন্ত ইবাম্বরম্। ইত্যাদি। বন ১৬১।২৯,৩০

পুত্রগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। সেই বংশের অধস্তন পুরুষ ভগীরথ কঠোর তপস্যা দ্বারা গঙ্গাদেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে অভিশপ্ত পিতৃকুলকে উদ্ধার করেন। গঙ্গাকে মহাভারতে শৈলরাজসুতা-রূপে স্থির করা হইয়াছে। স্বর্গচ্যুত গঙ্গাধারাকে প্রথমতঃ মহাদেব মস্তকে ধারণ করেন, তারপর সেই ধারা ভগীরথ-প্রদর্শিত পথে সমুদ্রে পৌঁছিয়াছিল। রাজা ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে কন্যারূপে কল্পনা করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার অপর নাম ভাগীরথী। জহ্নু-মুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করায় মুনি তাঁহাকে পান করিয়া পুনরায় পরিত্যাগ করেন। এই কারণে তাঁহার অপর নাম জাহ্নবী। মহাভারতে ভাগীরথীকে শান্তনুরাজার পত্নীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ভাগীরথীই দেবব্রত ভীষ্মের

গঙ্গামাহাত্ম্য—গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য মহাভারতে বহু স্থানে কীর্ত্তিত হইয়াছে।[২৬]

দুর্গা (যুধিষ্ঠিরকৃত স্তুতি)—অজ্ঞাতবাসের সময়ে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ যখন মৎস্যনগরে প্রবেশ করেন, তখন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী দুর্গার স্তুতি করিয়াছিলেন। ঐ স্তুতিতে বর্ণিত হইয়াছে—দুর্গাদেবী যশোদা-গর্ভসম্ভূতা এবং নন্দগোপকুল-জাতা। তিনি কংসকর্ত্তৃক শিলাতলে বিনিক্ষিপ্তা হইয়া আকাশে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। দেবী দিব্যমাল্যবিভূষিতা, দিব্যাম্বরধরা ও খড়্গখেটকধারিণী। তাঁহার বর্ণ বালার্কসদৃশ, তাঁহার আনন পূর্ণচন্দ্রনিভ এবং তিনি চতুর্ভুজা ও চতুর্ব্বক্ত্রা। আবার তিনি কৃষ্ণবর্ণা এবং অষ্টভুজারূপেও পূজিতা হন। তাঁহার অষ্টভুজে বর, অভয়, পানপাত্র, পঙ্কজ, ঘণ্টা, পাশ, ধনু ও মহাচক্র ধৃত হইয়াছে। দিব্য কুণ্ডল, মাথায় উৎকৃষ্ট কেশবন্ধ এবং তদুপরি দিব্য মুকুট বিরাজিত। বেণী কটিসূত্র পর্য্যন্ত লম্বিত। দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী এবং বিন্ধ্যবাসিনী। যুধিষ্ঠিরের স্তবে পরিতুষ্টা ভগবতী তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে অজ্ঞাতবাসের বর দান করিয়া অন্তর্হিতা হন।[২৭]

দুর্গা-নামের অর্থ—সকলপ্রকার দুর্গতি হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া উপাসকগণ ভগবতীকে দুর্গা-নামে উপাসনা করিয়া থাকেন।[২৮]

---

২৫ বন ১০৮ তম অঃ ও ১০৯ তম অঃ।

২৬ আদি ৯৭ তম অঃ। অনু ২৬ শ অঃ।

২৭ বি ৬ষ্ঠ অঃ।

২৮ দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে তত্ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ। বি ৬।২০

অর্জ্জুনকৃত স্তুতি—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ দুর্গার স্তুতি করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবতীর স্তুতিগান করেন। সেই স্তুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে—ভগবতী যোগিগণের পরম সিদ্ধিদাত্রী, ব্রহ্মস্বরূপিণী, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, জরামৃত্যুবিহীনা, ভদ্রকালী, বিজয়া, কল্যাণপ্রসূ, মুক্তিস্বরূপা, সাবিত্রী, কালরূপিণী, মোহিনী, কান্তিমতী, পরমা সম্পৎ, শ্রী, হ্রী ও জননী। স্তুতিতে কীর্ত্তিত অনেক শব্দই পরমব্রহ্মের বাচক। জগতের আদি মহাশক্তিরূপে ভগবতীকে স্তুতি করা হইয়াছে। অর্জ্জুনের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দুর্গাদেবী অন্তরীক্ষ হইতে তাঁহাকে শত্রুজয়ের বর প্রদান করেন।[২৯]

মহাদেবের পত্নী—ভগবতীকে মহাদেবের পত্নী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অনুশাসনপর্ব্বের উমামহেশ্বর-সংবাদাদিতে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়।[৩০]

শৈলপুত্রী—তিনি হিমালয়ের কন্যারূপে দেহধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'শৈলপুত্রী' বলা হয়।[৩১]

বরুণ—বরুণ জলের অধিপতি দেবতা। পুরাকালে তিনি দেবগণের সেনাপতি ছিলেন। মহাদেব তাঁহাকে জলের অধিপতিরূপে নিযুক্ত করেন।[৩২]

বিশ্বকর্ম্মা—দেবতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাঁহার নাম 'বিশ্বকর্ম্মা'। দেবগণের দিব্য বিমান, অস্ত্র-শস্ত্র ও ভূষণাদি তাঁহারই নির্ম্মিত। তিনি মনুষ্যসমাজেও শিল্প-ব্যবসায়িদ্বারা বিশেষভাবে পূজিত, তাঁহার উপাসনাতে সিদ্ধ শিল্পীরা আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন।[৩৩]

বিষ্ণু—একদল উপাসক ভগবান্‌কে বিষ্ণুরূপে উপাসনা করেন।[৩৪]

২৯ ভী ২৩শ অঃ।

৩০ দেব্যা প্রণোদিতো দেবঃ কারুণ্যার্দ্রীকৃতেক্ষণঃ। ইত্যাদি। শা ১৫৩।১১১
উমামহেশ্বর-সংবাদ—অনু ১৪০তম অঃ—১৪৫তম অঃ। অশ্ব ৮ম অঃ।

৩১ শৈলপুত্র্যা সহাসীনম্। শল্য ৪৪।২৩

৩২ পুরা যথা মহারাজো বরুণং বৈ জলেশ্বরম্। শল্য ৪৫।২২
অপাং রাজ্যে সুরাণাঞ্চ বিদধে বরুণং প্রভুম্। শা ১২২।২৯

৩৩ বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগো জজ্ঞে শিল্পপ্রজাপতিঃ। ইত্যাদি। আদি ৬৬।২৮-৩০

৩৪ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। ইত্যাদি। বন ১০১।১০। বন ১১৫।১৫

বিষ্ণু-উপাসনার ফলশ্রুতি—বিষ্ণুরূপে অব্যয় অনন্ত পুরুষের ধ্যান করিয়া তাঁহার পূজাঅর্চ্চাদ্বারা উপাসক যাবতীয় পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকেন। পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনায় সাধক সকল দুঃখের হাত হইতে মুক্ত হন। যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, বিদ্যা, শিল্প প্রভৃতি জনার্দ্দন হইতেই উদ্ভূত। তিনি এক হইয়াও ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত। তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করা বাক্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে। তিনি সর্ব্বাতিগ, সর্ব্বব্যাপী। তিনি বিশ্বেশ্বর, তিনি অজ।[৩৫] এইসকল উক্তি হইতে বুঝা যায়, পরমেশ্বর-বুদ্ধিতেই এক-একটি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ে এক-একজন দেবতা পূজিত হইতেন। সাকার উপাসনায় এক-একরূপে এক-এক সম্প্রদায় পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিতেন। দেবতা ও পরমেশ্বরে ভেদবুদ্ধি সাধকদের মধ্যে ছিল না।

কাম্য বিষ্ণুপূজা—কাম্য বিষ্ণুপূজার বিশেষ বিশেষ বিধানের উল্লেখ করা হইয়াছে। মার্গশীর্ষমাসের দ্বাদশী তিথিতে অহোরাত্র ব্যাপিয়া 'কেশবের' অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সমস্ত দুষ্কৃত নাশ হয়। পৌষমাসে উক্ত তিথিতে 'নারায়ণ' নামে পূজা করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হয়। মাঘমাসে 'মাধব', ফাল্গুনে 'গোবিন্দ', চৈত্রে 'বিষ্ণু', বৈশাখে 'মধুসূদন', জ্যৈষ্ঠে 'ত্রিবিক্রম', আষাঢ়ে 'বামন', শ্রাবণে 'শ্রীধর', ভাদ্রে 'হৃষীকেশ', আশ্বিনে 'পদ্মনাভ', এবং কার্ত্তিকে 'দামোদর'-নামে অর্চ্চনা করিলে ঈপ্সিত ফল লাভ হয়।[৩৬]

বিষ্ণুর সহস্র-নাম—ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট বিষ্ণুর সহস্র-নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায়, বিষ্ণুকে পরম ব্রহ্মরূপে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। বিষ্ণুই নিখিলের চরম উপেয়। তিনি পবিত্র হইতে পবিত্রতর, কল্যাণ হইতে কল্যাণতর, দেবতাদেরও পরম দেবতা এবং সর্ব্বভূতের পিতা। (শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুর সহস্র-নামের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।)[৩৭]

বিষ্ণুর মূর্ত্তি—ধুন্ধুমারোপাখ্যানে বিষ্ণুর স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় শয়ান। তাঁহার নাভি হইতে সূর্য্যপ্রভ পদ্ম উদ্গত

---

৩৫ তমেব চার্চ্চয়ন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্। ইত্যাদি। অনু ১৪৯।৫, ৬
যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং বিদ্যাঃ শিল্পাদি কর্ম্ম চ। ইত্যাদি। অনু ১৪৯।১৩৯-১৪২

৩৬ অনু ১০৯তম অঃ।

৩৭ অনু ১৪৯তম অঃ।

হইয়াছে এবং পিতামহ ব্রহ্মা সেই পদ্ম হইতে উৎপন্ন। বিষ্ণু কিরীটী এবং কৌস্তুভধারী, মহাদ্যুতিসম্পন্ন। তাঁহার পরিধানে পীতকৌশেয় বস্ত্র, সহস্র সূর্য্যভাস্বর দীপ্যমান তাঁহার দেহ, তেজ এবং ঐশ্বর্য্যে তিনি পরিপূর্ণ।[৩৮]

নারায়ণ-প্রণতি—মহাভারতে প্রত্যেক পর্ব্বের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার নারায়ণকে প্রণাম করিয়াছেন।[৩৯]

ব্রহ্মা—শেষশয্যায় শয়ান ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। তিনি চতুর্ম্মুখ, চতুর্ব্বেদ ও চতুর্ম্মূর্ত্তিস্বরূপ। ব্রহ্মা পদ্মযোনি ও জগৎস্রষ্টা, ব্রহ্মরূপে তিনি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি পিতামহ, দেবতাদের মধ্যে অধিকাংশ হইতেই বয়োজ্যেষ্ঠ।[৪০]

ব্রহ্মাই মহাভারত-রচনার মূল প্রবর্ত্তক—জগতের কল্যাণ-কামনায় মহাভারত প্রকাশের নিমিত্ত ব্রহ্মা মহর্ষি দ্বৈপায়ন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং গণেশের দ্বারা গ্রন্থ লিখাইবার কথা মহর্ষিকে বলিলেন।[৪১]

যম—যম মৃত্যুর অধিপতি। সাবিত্র্যুপাখ্যানে তাঁহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি রক্তবাস, বদ্ধমৌলি, তেজস্বী, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু এবং পাশহস্ত। তাঁহার আকৃতি ভয়ানক। যমকে পিতৃলোকের অধিপতিরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে।[৪২]

শিব—শিব, মহাদেব, শঙ্কর, রুদ্র প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে দেবতাকে অভিহিত করা হইয়াছে, তাঁহার উপাসনা তৎকালে খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। বহু সাধক শিবের উপাসনার দ্বারা অভিলষিত ফল লাভ করিয়াছেন। শিবের বাসস্থান কৈলাস-পর্ব্বত।[৪৩]

৩৮ লোককর্ত্তা মহাভাগ ভগবানচ্যুতো হরিঃ।
নাগভোগেন মহতা পরিরভ্য মহীমিমাম্। ইত্যাদি। বন ২০২।১২-১৮

৩৯ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।

৪০ যুগাদৌ তব বার্ষ্ণেয় নাভিপদ্মাদজায়ত। ইত্যাদি। বন ১২।৩৮। বন ২০২।১৩,১৪; বন ২৯০।১৭

৪১ তত্রাজগাম ভগবান্ ব্রহ্মা লোকগুরুঃ স্বয়ম্।
প্রীত্যর্থং তস্য চৈবর্ষের্লোকানাং হিতকাম্যয়া। ইত্যাদি। আদি ১।৫৭-৭৪

৪২ বদ্ধমৌলিং বপুষ্মন্তমাদিত্যসমতেজসম্। ইত্যাদি। বন ২৯৬।৮, ৯
যমং বৈবস্বতঞ্চাপি পিতৃণামকরোৎ প্রভুম্। শা ১২২।২৭

৪৩ কৈলাসং পর্ব্বতং গত্বা তোষয়ামাস শঙ্করম্। ইত্যাদি। বন ১০৮।২৬। অনু ১৪শ অঃ।

সহস্রনাম-স্তোত্র—শিবের সহস্র-নাম স্তোত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। তৎসহ সহস্র-নাম স্তোত্র পাঠের নানাবিধ ফলশ্রুতিও বর্ণিত হইয়াছে।[৪৪]

দক্ষযজ্ঞ-নাশ—অতি প্রাচীন কালে বোধ হয়, মহাদেব যাগযজ্ঞে পূজিত হইতেন না। প্রজাপতি দক্ষ শিবকে বাদ দিয়া সমস্ত দেবতাকে যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাপতির যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দেন। অতঃপর যাজ্ঞিকগণ রুদ্রকেও যজ্ঞের একটা বিশিষ্ট অংশ নিবেদন করিতেন। রুদ্র যদি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ত্রিলোকে প্রলয়কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইবে, এই কারণে দেবতাগণ রুদ্রকে খুবই ভয় করিয়া চলেন।[৪৫]

মূর্ত্তি—মহাদেবের মূর্ত্তিবিষয়েও কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, "মহাদেব তোমাকে স্বপ্নে দর্শন দিবেন। বৃষ তাঁহার বাহন, তিনি নীলকণ্ঠ, পিনাকধারী এবং কৃত্তিবাসা"।[৪৬] রাজা সগর পিনাকী, শূলপাণি, ত্র্যম্বক ও বহুরূপ নামে উমাপতির আরাধনা করিয়াছিলেন।[৪৭] ইন্দ্র অর্জ্জুনকে মহাদেবের উপাসনার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—"তিনি ভূতেশ, শিব, ত্র্যক্ষ এবং শূলধর"।[৪৮] অর্জ্জুন মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, "হে দেবদেব, নীলগ্রীব, জটাধর, ত্র্যম্বক, ললাটাক্ষ, শূলপাণে, পিনাকপাণে মহাদেব, প্রসন্ন হউন"।[৪৯] পাশুপত-অস্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত অর্জ্জুন মহাদেবকে বহুবিধ স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। সেই স্তুতিতেও দেখা যায়—তিনি নীলগ্রীব, পিনাকী, শূলী, ত্রিনেত্র, বস্থরেতাঃ, অম্বিকাভর্ত্তা, বৃষভধ্বজ, জটী, সহস্রশিরাঃ, সহস্রভুজ, সহস্রনেত্র, সহস্রপাদ।[৫০] প্রজাপতি মহাদেবকে বৃষভ দান করেন।[৫১] শতরুদ্রীয়-অধ্যায়ে ব্যাসদেব অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "তিনি মহোদর, মহাকায়, দ্বীপিচর্ম্মপরিধায়ী, ত্রিশূলপাণি, খড়্গচর্ম্মধর, পিনাকী,

---

৪৪ অনু ১৭শ ও ১৮শ অঃ।

৪৫ অনু ১৬০ তম অঃ। দ্রো ২০১ তম অঃ। সৌ ১৮শ অঃ।

৪৬ স্বপ্নে দ্রক্ষ্যসি রাজেন্দ্র ক্ষপান্তে ত্বং বৃষধ্বজম্। ইত্যাদি। সভা ৪৬।১৩-১৫

৪৭ শঙ্করং ভবমীশানং পিনাকিং শূলপাণিনম্।
ত্র্যম্বকং শিবমুগ্রেশং বহুরূপমুমাপতিম্॥ ইত্যাদি। বন ১০৬।১২। শল্য ৪৪।৩২

৪৮ যদা দ্রক্ষ্যসি ভূতেশং ত্র্যক্ষং শূলধরং শিবম্। বন ৩৭।৫৭

৪৯ দেবদেব মহাদেব নীলগ্রীব জটাধর। ইত্যাদি। বন ৩৯।৭৪-৭৮

৫০ নমো ভবায় সর্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চ। ইত্যাদি। দ্রো ৭৮।৫৩-৬২

৫১ বৃষভঞ্চ দদৌ তস্মৈ সহ গোভিঃ প্রজাপতিঃ। অনু ৭৭।২৭

ত্র্যক্ষ, মহাভুজ, চীরবাসা, উষ্ণীষী, সুবক্ত্র ও সহস্রাক্ষ। তাঁহার অনেক পার্ষদ আছেন। তাঁহারা জটিল, মুণ্ড, হ্রস্বগ্রীব, মহোদর, মহাকায়, মহাকর্ণ, বিকৃতানন, বিকৃতপাদ ও বিকৃতবেষ। সকল সময়েই তাঁহারা মহাদেবের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন।"[৫২]

সহস্রনাম-স্তোত্রে মহাদেবের স্বরূপ-প্রকাশক অনেক শব্দ কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিষ্ণুর স্তোত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—মধুকৈটভ-বধের সময় ক্রুদ্ধ বিষ্ণুর ললাট হইতে শূলপাণির উৎপত্তি।[৫৩]

মহাদেবের মাহাত্ম্য ও উপাসনা—বহুস্থানে মহাদেবের অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্যের বর্ণনা করা হইয়াছে।[৫৪] শিবের উপাসনা সম্বন্ধে যে যে স্থানে উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহা সঙ্কলিত হইল।

দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মে শঙ্কর আরাধনা (আদি ১৬৯।৮ ও ১৯৭।৪৫)। অর্জ্জুন শঙ্করকে মনে মনে স্মরণ করিয়া দ্রুপদরাজার সভায় লক্ষ্যবেধের নিমিত্ত ধনু গ্রহণ করিলেন (আদি ১৮৮।১৮)। কৈলাসপর্ব্বতে শ্বেতকিরাজার শিব-উপাসনা (আদি ২২৩।৩৬)। জরাসন্ধের শিব-উপাসনা (সভা ১৪।৬৪। সভা ২২।১১। সভা ২২।২৯)। জরাসন্ধ মানুষ বলি দিয়া রুদ্রযজ্ঞ করিবার নিমিত্ত বহু নৃপতিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম তাঁহাকে যুদ্ধে বধ করিলে বন্দিগণ মুক্তিলাভ করেন। কুমারী গান্ধারীর শিব-উপাসনা (আদি ১১০।৯)। মৃন্ময় স্থণ্ডিলে অর্জ্জুন মাল্যদ্বারা শিবপূজা করিয়াছিলেন (বন ৩৯।৬৫)। রাজা সগর পুত্রকামনায় পত্নীসহ কৈলাসপর্ব্বতে গিয়া মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন (বন ১০৬।১২)। জয়দ্রথ ভীমকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া সুদীর্ঘকাল গঙ্গাদ্বারে বিরূপাক্ষের উপাসনায় মনোনিবেশ করেন তপস্যায় প্রীত হইয়া বৃষধ্বজ তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন (বন ২৭১।২৫-২৯) অম্বার উগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে ভীষ্মবধের বর দিয়াছিলেন অম্বাই পর-জন্মে শিখণ্ডিরূপে জন্মগ্রহণ করেন (উ ১৮৯।৭। দ্রুপদরাজ অপত্য-কামনায় দীর্ঘকাল শঙ্করের উপাসনা করেন (উ ১৯০।৩)। কৃষ্ণ ও

---

৫২ দ্রো ২০১ তম অঃ।

৫৩ অনু ১৭শ অঃ।

ললাটাজ্জাতবান্ শম্ভুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ। বন ১২।৪০

৫৪ সৌ ৭ম অঃ। দ্রো ২০১ তম অঃ। অনু ১৪শ, ১৪০ তম ও ১৬০ তম অঃ অশ্ব ৮ম অঃ।

অর্জ্জুন মহাদেবের আরাধনা করিয়া পাশুপত-অস্ত্র লাভ করেন, সেই অস্ত্র দ্বারাই অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বধ করিয়াছিলেন (দ্রো ৮।৫৩-৬২)। সোমদত্ত বীর পুত্র-কামনায় কঠোর তপস্যায় শঙ্করের তুষ্টি-বিধান করিয়াছিলেন (দ্রো ১৪২।১৫)। অশ্বত্থামা শিবের উপাসনায় বিশেষ শক্তি লাভ করেন (সৌ ৭।৫৪)। কৃষ্ণের শিব-উপাসনা (বন ২০।১২)।

লিঙ্গমাহাত্ম্য ও পূজাবিধান—লিঙ্গরূপ প্রতীকে মহাদেবের পূজার বিধানও দেখিতে পাই। উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বভূতের উৎপত্তির হেতুরূপে জানিয়া যিনি লিঙ্গরূপ মূর্ত্তিতে মহাদেবের অর্চ্চনা করেন, বৃষভধ্বজ তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিয়া থাকেন।[৫৫] লিঙ্গ-মূর্ত্তির পূজায় আস্তিক পুরুষগণ অভিলষিত ফল লাভ করিয়া থাকেন।[৫৬] যিনি মহাদেবের বিগ্রহ অথবা লিঙ্গরূপ বিগ্রহের পূজা করেন, তিনি মহতী শ্রী লাভ করিয়া থাকেন।[৫৭] লিঙ্গপূজার মাহাত্ম্য অনুশাসনপর্ব্বের সপ্তদশ অধ্যায়ে এবং তাহার নীলকণ্ঠ-টীকাতে বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সৌপ্তিক-পর্ব্বের সপ্তদশ অধ্যায়ে শিবলিঙ্গের উৎপত্তির বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

মহাদেব উমাপতি—মহাদেবকে ভগবতী দুর্গাদেবীর পতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উমামহেশ্বর-সংবাদে (অনু ১৪০ তম-১৪৫ তম অঃ) এবং অন্যান্য স্থানেও এই বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়।[৫৮]

শিব ও রুদ্র—মহাদেবের রুদ্রমূর্ত্তি সংহারের প্রতীক, আবার তাঁহার শান্ত সমাহিত যোগীন্দ্রবিগ্রহ ভক্তদের কল্যাণে সতত দক্ষিণ। স্তব-স্তুতিতে প্রত্যেক দেবতারই সর্ব্বময়ত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।[৫৯]

শ্রী—দেবতা 'শ্রী' সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী। তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই

৫৫ সর্ব্বভূতভবং জ্ঞাত্বা লিঙ্গমর্চ্চতি যঃ প্রভোঃ।
তস্মিন্নভ্যধিকাং প্রীতিং করোতি বৃষভধ্বজঃ। দ্রো ২০০।৯৬

৫৬ লিঙ্গং স্বষ্কাপ্যবিধাত। সৌ ১৭।২১। নীলকণ্ঠ।

৫৭ লিঙ্গং পূজয়িত্বা নিত্যং মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে। অনু ১৬১।১৬

৫৮ স দদর্শ মহাবীর্য্যো দেবদেবমুমাপতিম্। শল্য ৪৪।২৩
দেব্যা প্রণোদিতো দেবঃ। শা ১৫৩।১১১
পার্ব্বত্যা সহিতঃ প্রভুঃ। বন ২৩০।২৯

৫৯ স রুদ্রো দানবান্ হত্বা কৃত্বা ধর্ম্মোত্তরং জগৎ।
রৌদ্রং রূপমপোহক্ষিপ্য চক্রে রূপং শিবং শিবঃ॥ শা ১৬৬।৬৩

সম্পৎ। শুভ আদর্শের যেখানে কোন চ্যুতি-বিচ্যুতি নাই, তিনি সেখানেই বাস করিয়া থাকেন। অমেধ্য, অকল্যাণ ও ছল-চাতুরী হইতে তিনি সব সময়ই দূরে থাকেন। তাঁহাকে পূজা-অর্চার দ্বারা সন্তুষ্ট করা যায় না। যিনি সত্যনিষ্ঠ শুচি ও কল্যাণের উপাসক, শ্রীদেবী তাঁহার নিকট আপনা-আপনিই উপস্থিত হন।[৬০]

শ্রীর প্রসাদ—শ্রীর চরিত্র হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, উপাসক যদি শুদ্ধ সংযতচেতা হন এবং সাধু আদর্শে জীবন যাপন করেন, তাহা হইলে দেবতার প্রসাদ লাভ করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় সহজ। সকল দেবতাই কুটিল, ভাবদুষ্ট ও অমেধ্যচরিত্রকে বর্জ্জন করেন। কেবল বাহ্য পূজায় তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না। প্রত্যেক দেবতা সম্বন্ধেই এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পরন্তু শ্রীর প্রসাদ সম্বন্ধে যে-সকল অধ্যায় বিবৃত হইয়াছে, সেইগুলিতে অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টভাবে এই কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ—প্রায় সর্ব্বত্রই কৃষ্ণকে পরম ব্রহ্মজ্ঞানে অর্চ্চনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণের ঐশ্বরিক বিভূতিও নানাভাবে বিভিন্ন উপাখ্যান এবং দার্শনিক অংশের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম—মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ শুধু যদুবংশজ জ্ঞানী বীরপুরুষমাত্র নহেন, তিনি 'অচিন্ত্যগতিরীশ্বরঃ'। উদ্যোগপর্ব্বে দেখিতে পাই, দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া গর্ব্বিত দুর্য্যোধনাদিকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার ভীষ্মপর্ব্বে দেখা যায়, নির্ব্বিণ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া ভক্ত সখার নির্ব্বেদ অপনোদন করিয়াছেন। শান্তিপর্ব্বে ও সভাপর্ব্বে ভীষ্মকৃত স্বরূপবর্ণনায় তাঁহার পরব্রহ্মস্বরূপ প্রতি শব্দে বিঘোষিত। তাঁহাকে ভিত্তিস্বরূপ কল্পনা করিয়াই সমগ্র মহাভারত বিরচিত, 'মূলং ত্বহং ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ' (উ ২৯।৫৩)। তিনি যোগীশ্বর, তিনি অনাদি, অনন্ত, অপ্রমেয়, পরমাত্মা। প্রত্যেক পর্ব্বে এরূপ অসংখ্য উক্তি আছে, যাহা হইতে স্থির করা যায় যে, মহাভারতের মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম-রূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহারই লীলা প্রকাশের নিমিত্ত অগণিত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

সরস্বতী—সরস্বতীদেবী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী। বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি

৬০ শা ১২৪ তম ও ২২৮ তম অঃ। অনু ১১ শ ও ৮২ তম অঃ।

দণ্ডনীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[৬১] প্রত্যেক পর্ব্বের প্রারম্ভে 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি শ্লোকে দেবী সরস্বতীকেও প্রণাম করা হইয়াছে।[৬২]

সাবিত্রী—মদ্ররাজ অশ্বপতি অপত্যকামনায় আঠার বৎসর কঠোর নিয়মের সহিত সাবিত্রীদেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন। সাবিত্রীমন্ত্রে এক লক্ষ আহুতি প্রদান করার পর দেবী অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া রাজাকে বর দেন। সাবিত্রীর বরে রাজা একটি কন্যারত্ন লাভ করেন। সাবিত্রীর প্রসাদে লাভ করায় রাজা কন্যার নাম রাখিলেন—'সাবিত্রী'।[৬৩]

পৈপ্পলাদির সাবিত্রী-উপাসনা—জাপকোপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ পৈপ্পলাদি সংহিতা-জপপূর্ব্বক দীর্ঘকাল সংযতভাবে ব্রাহ্ম-তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। অনেক বৎসর পর সাবিত্রীদেবী তাঁহার জপে প্রীত হইয়া মূর্ত্তি-পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দেন এবং অভিলষিত বর প্রদান করেন।[৬৪]

সূর্য্য—সূর্য্য-উপাসনার কয়েকটি উদাহরণ মহাভারতে দেখিতে পাই। প্রাচীন কালে কুরুরাজ সম্বরণ সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন।[৬৫] বিরাট-পত্নীর আদেশে দ্রৌপদী সুরা আনিবার নিমিত্ত কীচকভবনে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে মুহূর্ত্তকাল সূর্য্যের উপাসনা করেন। উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য দ্রৌপদীর রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[৬৬] পৌর্ব্বাহ্নিক নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যের উপাসনা করিতেন।[৬৭] শরশয্যায় শয়ন করিয়া ভীষ্ম পরিখাপ্রতিবিম্বে সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন।[৬৮]

সূর্য্যের অষ্টোত্তর-শতনাম—ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের নিকট সূর্য্যের অষ্টোত্তর-শতনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই স্তোত্রে সূর্য্যকেই অনন্ত, বিশ্বাত্মা,

---

৬১ সসৃজে দণ্ডনীতিং সা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা। শা ১২২।২৫

৬২ দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।

৬৩ বন ২৯২ তম অঃ।

৬৪ শা ১৯৯ তম অঃ।

৬৫ অপর্ক্ষপুত্রঃ কৌন্তেয় কুরূণামৃষভো বলী।
সূর্য্যমারাধয়ামাস নৃপঃ সম্বরণস্তদা॥ আদি ১৭১।১২

৬৬ উপাতিষ্ঠত সা সূর্য্যং মুহূর্ত্তমবলা ততঃ। বি ১৫।১৯

৬৭ উপতস্থে বিবস্বন্তম্। উ ৮৩।৯

৬৮ উপাসিষ্যে বিবস্বন্তমেবং শরশতাচিতঃ। ভী ১২০।৫৪

ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বকর্মা এবং শাশ্বতরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে।[৬৯]

যুধিষ্ঠিরকৃত সূর্য্যস্তুতি ও সূর্য্যের বরদান—বনবাসকালে যুধিষ্ঠির শুচিসমাহিত চিত্তে সূর্য্যের স্তুতিগান করিয়াছিলেন। সেই স্তুতিতেও বলা হইয়াছে—তুমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তির হেতু, তুমি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। যুধিষ্ঠিরের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ সূর্য্য দীপ্যমান দেহ ধারণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সমীপে আগমন করেন এবং তাঁহাকে একটি তামার পাকপাত্র (পিঠর) দান করেন। সেই পাত্রস্থ অন্ন দ্রৌপদীর আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অক্ষয় থাকিবে—এইরূপ বর দিয়া বনবাসী যুধিষ্ঠিরের অতিথি-সৎকারের উপায়ও সূর্য্যদেবই করিয়া দিয়াছিলেন।[৭০]

সৌরব্রত—সৌরব্রত নামে একপ্রকার সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। তাহা খুব সৌভাগ্যবর্দ্ধক বলিয়া নীলকণ্ঠের টীকাতে উল্লিখিত হইয়াছে।[৭১]

স্কন্দ—স্কন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়। অগ্নি সপ্তর্ষিভার্য্যাগণকে দেখিয়া কামের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠেন, পরন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায় দেহত্যাগের উদ্দেশ্যে এক গভীর অরণ্যে চলিয়া যান। দক্ষদুহিতা স্বাহা পূর্ব্ব হইতেই অগ্নিকে কামনা করিতেছিলেন। তিনি স্থির করিলেন, সপ্তর্ষিভার্য্যাগণের রূপ-পরিগ্রহ করিয়া অগ্নির বাসনা পূর্ণ করিবেন। প্রথমেই তিনি অঙ্গিরার পত্নী শিবার রূপ গ্রহণ করিয়া অগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন এবং অগ্নির শুক্র হস্তে ধারণ করিয়া সুপর্ণীরূপ গ্রহণপূর্ব্বক সুরক্ষিত এবং শরস্তম্বসংবৃত শ্বেতপর্ব্বতে কোনও একটি কাঞ্চনকুণ্ডে সেই শুক্র স্থাপন করিলেন। অরুন্ধতীর তেজস্বিতা ও তপঃশক্তি অনন্যসাধারণ, তাই স্বাহা অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করিতে পারিলেন না। অপর পাঁচজন ঋষিপত্নীর রূপ-পরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে অগ্নির তেজ সেই কুণ্ডে প্রক্ষেপ করিলেন। তারপর এক প্রতিপদ্-তিথিতে সেই কুণ্ডেই স্কন্দের জন্ম হয়।

স্কন্দের স্বরূপ—প্রথম দিনেই সেই স্কন্ন (স্খলিত) তেজ ষট্‌শির, দ্বাদশশ্রোত্র, দ্বাদশাক্ষি, দ্বাদশভুজ, একগ্রীব এবং একজঠরে পরিণত হইল।

---

৬৯ বন ৩।১৪-২৮

৭০ বন ৩।৩৫-৭৩

৭১ সৌভাগ্যবর্দ্ধকং সৌরব্রতাদিকম্। বন ২৩২।৮

দ্বিতীয় দিনে রূপ অভিব্যক্ত হইল। তৃতীয় দিনে ঐ রূপ একটি শিশুতে পরিণত হইল। চতুর্থ দিবসে বালক লোহিতমেঘসংবৃত বিদ্যুতের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। ত্রিপুরারিপ্রদত্ত অসুরবিনাশন ভীষণ ধনু গ্রহণ করিয়া অমিতশক্তি বালক ভয়ঙ্কর নাদে দশ দিক্ প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার ভীষণ নিনাদ শ্রবণে চিত্র ও ঐরাবত-নামক মহানাগদ্বয় সেখানে উপস্থিত হইলে তিনি দুই হাতে দুইটি নাগকে ধারণ করিলেন। অপর এক হাতে শক্তি ও এক হাতে অতিশয় বলবান্ তাম্রচূড় কুক্কুটকে ধারণ করিয়া অমিত শক্তিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দুই হাতে শঙ্খ ধারণ করিয়া এমন ভীষণভাবে বাজাইতে লাগিলেন যে, সমস্ত জগৎ যেন প্রলয়নিনাদে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। দুই হাতে আকাশে আঘাত করিতে লাগিলেন।[৭২] স্কন্দ হিরণ্যকবচ, হিরণ্যস্রক্, হিরণ্যচূড়, হিরণ্যমুকুট, হিরণ্যাক্ষ, লোহিতাম্বরসংবৃত, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র এবং কুণ্ডলযুক্ত।[৭৩] তাঁহার ছয় মাথা, বার চক্ষু এবং বারখানি হাত। তিনি পীনাংস এবং অত্যন্ত শক্তিশালী।[৭৪]

স্কন্দের শৈশব—মাতৃগণের মধ্যে ধাত্রী স্কন্দকে আপন পুত্ররূপে রক্ষা করিতে লাগিলেন। লোহিতোদধির কন্যা ক্রূরা স্কন্দকে কোলে লইয়া আদরযত্ন করিতে লাগিলেন এবং অগ্নি ছাগবক্ত্র ও বহুপ্রজ হইয়া বালকের ক্রীড়ার সহায় হইলেন।[৭৫]

স্কন্দের কৃত্তিকাপুত্রত্ব—তারকবধোপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে—দেবতা ও ঋষিগণের প্রার্থনায় কৃত্তিকাগণ অগ্নি হইতে গর্ভধারণ করেন। তাঁহারা ছয়জনে একই সময়ে সন্তান প্রসব করিলেন। ছয়টি শিশু যখন একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শরবনে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তখন একদিন কৃত্তিকাগণ পুত্রস্নেহবশতঃ সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র একটি শিশুকে দেখিতে পান। সেই শিশুটি ছয় মুখে ছয় মাতার স্তন্য পান করিয়া সকলকেই মাতৃগৌরবে আনন্দিত করিয়াছিলেন।[৭৬]

---

৭২ বন ২২৪ তম অঃ।

৭৩ উপবিষ্টস্তু তং স্কন্দং হিরণ্যকবচস্রজম্। ইত্যাদি। বন ২২৮।১-৩

৭৪ ষড়াননং কুমারস্তু দ্বিষড়ক্ষং দ্বিজপ্রিয়ম্। ইত্যাদি। অনু ৮৬।১৮,১৯

৭৫ সর্ব্বাসাং যা তু মাতৄণাং নারী ক্রোধসমুদ্ভবা। ইত্যাদি। বন ২২৫।২৭-২৯

৭৬ বিপন্নকৃত্যা রাজেন্দ্র দেবতা ঋষয়স্তথা।
কৃত্তিকাশ্চোদয়ামাসুরপত্যভরণায় বৈ। ইত্যাদি। অনু ৮৬।৫-১৩

অগ্নি ও গঙ্গা হইতে স্কন্দের জন্ম—সুবর্ণোৎপত্তিপ্রকরণে বর্ণিত আছে যে, তারকাসুরের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দেবগণ তেজস্বী পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত অগ্নিকে প্রার্থনা জানান। দেবগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া অগ্নি গঙ্গাদেবীর সহিত মিলিত হন। অগ্নির তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গা মেরুপর্ব্বতে গর্ভ বিসর্জ্জন দেন। সেই গর্ভ দিব্য শরবনে কৃত্তিকাগণের স্তন্যদুগ্ধে পুষ্টিলাভ করে। সেই হেতু বালকের নাম 'কার্ত্তিকেয়'।[৭৭]

হরপার্ব্বতী হইতে উৎপত্তি—কার্ত্তিকেয় ভগবান্ শিবের ঔরসে উমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন—এইরূপ বর্ণনা শিবপুরাণাদিতে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস এই বর্ণনাকে অবলম্বন করিয়া 'কুমারসম্ভব'-মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। মহাভারতেও অত্যন্ত গৌণভাবে এই বিষয়ে একটু উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবান্ রুদ্র বহ্নিতে অনুপ্রবিষ্ট হন এবং ভগবতী উমা স্বাহাতে অনুপ্রবেশ করেন। তারপর বহ্নি ও স্বাহার মিলনে রুদ্রসুত স্কন্দের উৎপত্তি হইয়াছে।[৭৮]

বিস্তৃত জন্মবিবরণ—স্কন্দের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অন্যপ্রকার বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়। সারস্বতোপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে—মহেশ্বরের তেজ অগ্নিতে পতিত হইলে সর্ব্বভক্ষ ভগবান্ অগ্নিও তাহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি ব্রহ্মার আদেশে সেই তেজ গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেন। গঙ্গাদেবীও সেই তেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া হিমালয়পর্ব্বতে তাহা পরিত্যাগ করেন। হিমালয়েই সেই তেজ দিনে দিনে দীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃত্তিকাগণ হিমালয়ের শরস্তম্বে অনলপ্রভ সেই তেজোরাশি দেখিবামাত্র 'এইটি আমার, এইটি আমার'—এই বলিতে বলিতে তেজঃপুঞ্জের সমীপে গমন করেন। তৎক্ষণাৎ সেই তেজঃপুঞ্জ ষড়াননরূপ ধারণ করিয়া কৃত্তিকাগণের স্তন্য পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃত্তিকাগণ তাঁহার অদ্ভুত আকৃতি দর্শনে বিস্মিত হইয়া বালককে সেখানে রাখিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। সেই বালক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া দিব্য তেজস্বিরূপে বিরাজ করিতেছিলেন।

---

৭৭ অনু ৮৫।৫৫-৮২

৭৮ অনুপ্রবিশ্য রুদ্রেণ বহ্নিং জাতো হ্যয়ং শিশুঃ। বন ২২৮।৩০

রুদ্রেণাগ্নিং সমাবিশ্য স্বাহামাবিশ্য চোময়া।

হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং জাতস্ত্বমপরাজিতঃ॥ বন ২৩০।৯

হঠাৎ একদা শৈলরাজপুত্রীসহ প্রমথগণবেষ্টিত মহাদেবকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন—এমন সময় মহাদেব, ভগবতী দুর্গা, অগ্নি ও গঙ্গাদেবী এই চারিজন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"আহা, এমন সুন্দর শিশু প্রথমে কাহার নিকট উপস্থিত হয় দেখিতে হইবে"। প্রত্যেকেই প্রথমে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। কার্ত্তিকেয় তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া যোগবলে চারিটি শরীর ধারণ করিয়া যুগপৎ চারিজনের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়া উল্লিখিত দেবতা-চতুষ্টয় তাঁহার যথাযোগ্য সম্মানের নিমিত্ত পিতামহের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। পিতামহ তাঁহাকে সর্ব্বভূতের সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন।[৭৯]

কুমারের অভিষেক ও পারিষদবর্গ—পুণ্যসলিলা সরস্বতী নদীর তীরে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন করেন। উপস্থিত দেবতাগণ নবাভিষিক্ত সেনাপতিকে সাধ্যমত ভূষণাদি উপঢৌকনে আপ্যায়িত করেন। কুমারের অভিষেক-ক্রিয়ায় যে দেবতাগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক রণপ্রিয় দেবতা তখনই আনন্দের সহিত কার্ত্তিকেয়ের অনুগত পারিষদের পদে বৃত হইয়াছিলেন।[৮০]

কুমারানুচর মাতৃবর্গ—প্রভাবতী. বিশালাক্ষী, পালিতা, ভদ্রকালী, শতঘণ্টা, মুণ্ডী, অমোঘা প্রমুখ অসংখ্য দেবমাতৃগণ কুমারের দেহরক্ষার্থ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।[৮১]

অভিষেক সম্বন্ধে অন্যপ্রকার বর্ণনাও পাওয়া যায়। দেবরাজ ইন্দ্র, স্কন্দের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রপদে বরণ করিতে চাহিলে স্কন্দ অস্বীকার করিলেন। অতঃপর ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি সেনা-নায়কতা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে দেবগণ ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করেন। তিনি দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত দেবতাদের অভিপ্রায় অনুসারে দেবসেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মাথার উপর কাঞ্চনচ্ছত্র ধৃত হইল। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে দিব্য কাঞ্চনমালা প্রদান করিলেন। ভগবান্ বৃষভধ্বজ দেবীসহ আগমন করিয়া সেনাপতির

---

৭৯ শল্য ৪৪শ অঃ। অনু ৮৬।৩১, ৩২

৮০ শল্য ৪৫শ অঃ।

৮১ শল্য ৪৬শ অঃ।

যথোচিত সম্মান করিলেন। বিমল রক্তবস্ত্রে অধিকতর দীপ্তিমান্ স্কন্দকে অগ্নিদেব রথের কেতুস্বরূপ একটি মহান্ কুক্কুট দান করিলেন।

দেবসেনার সহিত বিবাহ—শতক্রতু প্রজাপতিদুহিতা দেবসেনাকে সেখানে উপস্থিত করিয়া স্কন্দকে বলিলেন—"সেনাপতে, আপনার জন্মের পূর্ব্বেই প্রজাপতি আপনার পত্নী স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সম্প্রতি আপনি ইঁহার পাণিগ্রহণ করুন"। দেবগুরু বৃহস্পতি যথাবিধি হোমাদি সমাপন করিলে পর স্কন্দ দেবসেনার পাণিগ্রহণ করিলেন।[৮২]

স্কন্দকর্ত্তৃক মহিষাসুর ও তারকাসুরের নিধন—দেবরাজ, স্কন্দের সহায়তায় দৈত্যগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। বর্ণিত আছে যে, দুর্জ্জয় দৈত্য মহিষাসুর স্কন্দ-কর্ত্তৃক নিহত হন এবং মহিষের সহচর ভীষণ দৈত্যকুল স্কন্দের পারিষদগণের ভক্ষ্যরূপে কল্পিত হইয়াছিল। স্কন্দ তারকাসুরকেও বধ করেন।[৮৩]

দেবতাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—দেবতাদের মধ্যে কার্ত্তিকেয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় যোদ্ধা।[৮৪]

স্কন্দের ঈশ্বরত্ব—মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠির সমীপে যে স্কন্দস্তুতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে 'সহস্রশীর্ষ', 'অনন্তরূপ', 'ঋতস্য কর্ত্তা', 'সনাতনানামপি শাশ্বতঃ' প্রভৃতি অনেক শব্দ আছে, যে-সকল শব্দ পরমব্রহ্মেরই বাচক। স্কন্দোপাসক কোন সম্প্রদায় তৎকালে ছিলেন, এরূপ কোন বর্ণনা মহাভারতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।[৮৫]

যুদ্ধারম্ভে বীরকর্ত্তৃক স্কন্দপ্রণতি—বীরপুরুষগণ যুদ্ধারম্ভে কার্ত্তিকেয়কে প্রণাম করিতেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনানায়কত্ব গ্রহণের সময় শক্তিপাণি কুমারদেবকে নমস্কার নিবেদন করিয়াছেন।[৮৬]

৮২ বন ২২৮ তম অঃ।
কার্ত্তিকেয়ো যথা নিত্যং দেবানামভবং পুরা। ভী ৫০।৩৩

৮৩ পপাত ভিন্নে শিরসি মহিষস্ত্যক্তজীবিতঃ। ইত্যাদি। বন ২৩১।৯৬-১০
অনু ৮৬ তম অঃ।

৮৪ কার্ত্তিকেয়মিবাহবে। দ্রো ১৭৮।১৩

৮৫ বন ২৩১ তম অঃ।

৮৬ নমস্কৃত্য কুমারায় সেনান্যে শক্তিপাণয়ে।
অহং সেনাপতিস্তেঽদ্য ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ। উ ১৫৫।৭

কার্ত্তিকেয়াদি নামের যৌগিক অর্থ—কৃত্তিকাগণের স্তন্যদুগ্ধে পরিপুষ্ট বলিয়া তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় এবং তিনি অগ্নির স্কন্ন (স্খলিত) শুক্র হইতে উৎপন্ন, তাই তাঁহার নাম স্কন্দ। গুহাস্থিত শরবনে তাঁহার জন্ম, তাই অপর নাম গুহ।[৮৭]

জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত-সংগ্রহ—কার্ত্তিকেয়ের জন্ম সম্বন্ধে যে কয়েকটি বিবরণ তৎকালে লোকসমাজে জানা ছিল, একটি শ্লোকে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে।[৮৮]

হেরম্ব—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতের রচনা শেষ করিয়া কি ভাবে শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করিবেন—এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ পিতামহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে দ্বৈপায়ন বলিলেন, "ভগবন্, এরূপ বিস্তৃত ইতিহাসের লেখক ত পৃথিবীতে দেখিতেছি না, আমার এই কাব্য লিখিবার নিমিত্ত কাহাকে নিযুক্ত করিব"? পিতামহ উত্তর করিলেন, "এই কাব্য লিখিবার নিমিত্ত গণেশকে স্মরণ করুন"। পিতামহ প্রস্থান করিলে মহর্ষি গণেশকে স্মরণ করিলেন। গণেশ উপস্থিত হইলে যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া মহর্ষি আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। প্রার্থনা শুনিয়া গণেশ মহর্ষিকে বলিলেন—"আমার লেখনী যাহাতে অবিশ্রাম চলিতে পারে, যদি সেই ভাবে আপনি বলিতে পারেন, তাহা হইলে আমি লেখনী ধারণ করিতে প্রস্তুত"। মহর্ষি উত্তর করিলেন, "আপনি আমার উক্তির অর্থ সম্যক্‌রূপে গ্রহণ না করিয়া কিছুই লিখিতে পারিবেন না, যদি এই সর্ত্ত স্বীকার করেন, তবে আমি আপনার লেখনীর যাহাতে বিরতি না ঘটে, সেই ভাবে বলিতে থাকিব"। হেরম্ব মহর্ষির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া লেখনী ধারণ করিলেন।[৮৯] (এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।)

অনেক দেবতার নাম গ্রহণ—নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেক দেবতার নাম ও উৎপত্তিবিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেইসকল

৮৭ অভবৎ কার্ত্তিকেয়ঃ স ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
স্কন্নত্বাৎ স্কন্দতাং প্রাপ্তো গুহাবাসাদ্ গুহোঽভবৎ॥ ইত্যাদি। অনু ৮৬।১৪। অনু ৮৫।৮২

৮৮ আগ্নেয়ঃ কৃত্তিকাপুত্রো রৌদ্রো গাঙ্গেয় ইত্যপি।
শ্রূয়তে ভগবান্ দেবঃ সর্ব্বগুহ্যময়ো গুহঃ॥ আদি ১৩৭।১৩

৮৯ আদি ১।৫৫-৭৯

দেবতার মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমান কালে অপ্রসিদ্ধ। গ্রন্থবাহুল্য-ভয়ে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা হইল না।

(ক) আদিত্যাদি-বংশ-বর্ণন—আদি ৬৫ তম ও ৬৬ তম অঃ। (খ) সভাবর্ণন—সভা ৬।১৬, ১৭। (গ) মার্কণ্ডেয়সমাস্যা—বন ২০৪।৩। (ঘ) কুমারোৎপত্তি—বন ২২৭ তম—২২৯ তম অঃ। (ঙ) স্কন্দোৎপত্তি—শল্য ৪৫ শ অঃ। (চ) জ্বাপকোপাখ্যান—শা ১৯৮।৫,৬। (ছ) সর্ব্বভূতোৎপত্তি—শা ২০৭ তম ও ২০৮ তম অঃ। (জ) শুকোৎপত্তি—শা ৩২৩ তম অঃ। (ঝ) দানধর্ম্ম—অনু ৮২।৭। (ঞ) তারকবধ—অনু ৮৬।১৫—১৭।

অধিক পূজিত দেবতা—দেবতাদের মধ্যেও যাঁহারা উগ্রপ্রকৃতির, তাঁহাদিগকেই সাধারণতঃ বেশী-বেশী পূজা করা হয়। রুদ্ররূপে মহাদেবের সংহারমূর্ত্তি অতি ভীষণ, তাই তাঁহার পূজার প্রচলন বেশী। সেইরূপ স্কন্দ, শক্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, বায়ু, বৈশ্রবণ, রবি, বসুগণ, মরুৎ, সাধ্য, বিশ্বেদেব প্রমুখ দেবগণ খুব উগ্র, সেইহেতু শক্তের ভক্ত মানবগণ তাঁহাদেরই উপাসনায় রত। কিন্তু ব্রহ্মা, ধাতা, পূষা প্রমুখ নিরীহ সমদর্শী দেবতাগণকে পূজা করা অনেকেই আবশ্যক মনে করেন না।[১০] যদিও নির্ব্বিণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুন এই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি তৎকালে যে-সকল দেবতার উপাসনা বেশী প্রচলিত ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত এই উক্তি হইতেও পাইতে পারি। দেবতারা মানুষের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই উগ্রভাব ধারণ করিয়া আছেন, এইরূপ কল্পনা নিতান্তই ভিত্তিহীন। প্রত্যেক দেবতাই যদি পরমেশ্বরবুদ্ধিতে পূজিত হন, তবে তাঁহারা ভীষণ হইবেন কেন?

দেবতাদের জন্ম-মৃত্যু—দেবতাদেরও জন্ম-মৃত্যু আছে। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, এইজন্য তাঁহাদিগকে অমর বলা হয়। বর্ণিত আছে—পুরাকালে দেবাসুরের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইলে দৈত্যগুরু শুক্রচার্য্য মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যার বলে মৃত অসুরগণকে পুনর্জ্জীবন দান করিতে পারিতেন, কিন্তু দেবতারা সেই বিদ্যা না জানায় তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিনই কমিতেছিল। অতঃপর দেবতাগণ পরামর্শ করিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সেই বিদ্যা

---

১০ য এব দেবা হন্তারস্তাল্লোকোঽর্চ্চয়তে ভৃশম্। ইত্যাদি। শা ১৫।১৬-১৯। শা ১২২ তম অঃ।

ায়ত্ত করিবার নিমিত্ত বৃহস্পতিপুত্র কচকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে প্রেরণ করেন।[৯১]

জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া—দেবতাদের মধ্যেও জাতকর্ম্মাদি বৈদিক সংস্কারের প্রচলন আছে। স্কন্দের জন্মের পর মহর্ষি বিশ্বামিত্র (অন্যত্র দেখা যায়, দেবগুরু বৃহস্পতি) তাঁহার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।[৯২]

চাতুর্ব্বর্ণ্য—মনুষ্যসমাজের চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থার ন্যায় দেবসমাজেও চাতুর্ব্বর্ণ্য বিদ্যমান। দেবতাদের মধ্যেও সকলের শক্তি সমান নহে, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে তাঁহারা নিযুক্ত।[৯৩]

দেবতাদের ঐশ্বর্য্য—দেবতারা সকলেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে বলীয়ান্। ইচ্ছামাত্র তাঁহারা অনেক-কিছু করিতে পারেন। ইন্দ্রের বিসতন্তু-প্রবেশ এবং শিব ও বিষ্ণুর ব্যাপকত্বের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়।[৯৪]

দেবতাদের বিশেষ চিহ্ন—বর্ণিত আছে যে, দময়ন্তীর স্বয়ংবর-সভায় ইন্দ্রাদি দেবতাগণ নলের রূপ ধারণ করিয়া দময়ন্তীকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তোলেন। দময়ন্তী স্বীয় প্রখর বুদ্ধিবলে কয়েকটি বিশেষ চিহ্নের দ্বারা নল হইতে দেবতাদের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া নলের গলায়ই বরমাল্য অর্পণ করেন। দেবতাদের শরীরে কখনও ঘর্ম্ম হয় না, তাঁহাদের চক্ষুতে পলক নাই, তাঁহাদের পা কখনও মাটি স্পর্শ করে না এবং তাঁহাদের পুষ্পমালা মলিন হয় না।[৯৫]

দেবতাগণ স্বপ্রকাশ—মানুষ কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, কিন্তু দেবতাগণ স্বতঃ-প্রকাশস্বরূপ, কাজ না করিলেও তাঁহাদের তেজ মলিন হয় না।[৯৬]

৯১ আদি ৭৬ তম অঃ।

৯২ মঙ্গলানি চ সর্ব্বাণি কৌমারাণি ত্রয়োদশ।
জাতকর্ম্মাদিকাস্তস্য ক্রিয়াশ্চক্রে মহামুনিঃ॥ বন ২২৫।১৩
জাতকর্ম্মাদিকাস্তত্র ক্রিয়াশ্চক্রে বৃহস্পতিঃ। শল্য ৪৪।২১

৯৩ শা ২০৮ তম অঃ।

৯৪ বিসতন্তুপ্রবিষ্টঞ্চ তত্রাপশ্যচ্ছতক্রতুম্। উ ১৪।১১

৯৫ সাপশ্যদ্বিবুধান্ সর্ব্বানস্বেদান্ স্তব্ধলোচনান্। ইত্যাদি। বন ৫৭।২৪

৯৬ প্রকাশলক্ষণা দেবা মনুষ্যাঃ কর্ম্মলক্ষণাঃ। অশ্ব ৪৩।২১

দেবতাদের মধ্যে উপাস্য-উপাসক-ভাব—দেবতাদের মধ্যেও উপাস্য-উপাসকভাব বর্ত্তমান। বৃত্রবধোপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের ভয়ে নারায়ণের শরণাপন্ন হন। নারায়ণ ভীত পুরন্দরের দেহে আত্মতেজ সংক্রমিত করেন, তাহাতেই ইন্দ্র জয়লাভ করিয়াছিলেন।[৯৭] দেবতাগণ হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।[৯৮]

অবতারবাদ—যখন সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধিতে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তখন ভগবান্ শরীর ধারণপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন করেন। তিনিই বিশৃঙ্খল লোকস্থিতিকে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় স্থাপন করেন।[৯৯]

শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের অবতারত্ব—শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকে মহাভারত অবতাররূপে স্বীকার করেন।[১০০]

কল্কীর অবতারত্ব—মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ধর্ম্মে যখন অত্যন্ত অনাচার উপস্থিত হইবে, তখন সম্ভলগ্রামে কোনও এক ব্রাহ্মণ-পল্লীতে বিষ্ণুযশা-নাম ধারণপূর্ব্বক কল্কী অবতীর্ণ হইবেন। তিনি পরে ধর্ম্মবিজয়ী রাজ্যচক্রবর্ত্তিরূপে ধর্ম্মের পুনঃ-সংস্থাপনে আত্মনিয়োগ করিবেন।[১০১]

বরাহ—মোক্ষধর্ম্মে বরাহ-অবতারের লীলা বর্ণিত হইয়াছে।[১০২]

যক্ষপিশাচাদি দেবযোনির পূজা—যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব প্রমুখ দেবযোনি-

৯৭ কালেয়ভয়সন্ত্রস্তো দেবঃ সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।
জগাম শরণং শীঘ্রং তং তু নারায়ণং প্রভুম্॥ ইত্যাদি। বন ১০১।৯-১১

৯৮ দেবদেবং সুরারিঘ্নং বিষ্ণুং সত্যপরাক্রমম্। বন ১১৫।১৫

৯৯ যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ইত্যাদি। ভী ২৮।৭,৮। বন ১৮৯।২৭-৩১
যদা ধর্ম্মো গ্লাতি বংশে সুরাণাম্।
তদা কৃষ্ণো জায়তে মানুষেষু॥ অনু ১৫৮।১২

১০০ বিষ্ণুঃ স্বেন শরীরেণ রাবণস্য বধায় বৈ। বন ৯৯।৪১
অংশেনাবতরস্বেবং তথেত্যাহ চ তং হরিঃ। আদি ৬৪।৫৪

১০১ কল্কী বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কালপ্রচোদিতঃ। ইত্যাদি। বন ১৯০।৯২-৯৭

১০২ শা ২০৯ তম অঃ।

গণও কোন কোন সম্প্রদায়ের নিকট পূজিত হইতেন। তাঁহাদের প্রসাদে নানাবিধ ব্যাধি প্রশমিত হয় এবং পূজক প্রভূত সম্পদ্ লাভ করেন—এই ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিল।[১০৩] অর্কপুষ্প, জলজ পুষ্পের মাল্য প্রভৃতি বস্তু দেবযোনিগণের বিশেষ প্রিয়।[১০৪]

গৃহদেবী, রাক্ষসী (?)—প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে নাকি এক-একজন রাক্ষসী থাকেন, তাঁহাকে গৃহদেবী বলা হয়। তাঁহার সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য নিবেদন করিতে হয়।[১০৫] এইসকল পূজা ভদ্র পরিবারে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সাত্ত্বিকাদি প্রকৃতিভেদে পূজ্যভেদ—গীতাতে ভগবানের উক্তি হইতে জানা যায়, সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোক দেবগণের পূজাই করিয়া থাকেন, রাজসগণ যক্ষ-রাক্ষসাদির পূজা করেন, আর তামস পুরুষগণ প্রেত ও ভূতগণের পূজা করেন।[১০৬]

বিভূতির পূজা—যেখানে বিশেষ কোন বিভূতির প্রকাশ, সেখানেই মানুষের মাথা আপনা-আপনি নত হইয়া আসে। অনেক সময় সেই শ্রীমৎ তেজোরূপ বস্তুটিকে দেবতারূপে পূজা করিবার প্রবৃত্তিও জাগে। অশ্বত্থবন্দন, হিমালয়বন্দন প্রভৃতি বিভূতিরই পূজা।[১০৭]

সকল দেবতাই ভগবানের বিভূতি, তিনিই চরম উপাস্য—উপাসকগণ আপন-আপন প্রবৃত্তি-অনুসারে এক-একজন দেবতার পূজা দ্বারা সেই পরম পুরুষেরই অর্চনা করিয়া থাকেন, ইহাই মহাভারতের সিদ্ধান্ত। ভগবান্ প্রত্যেক দেবতার মধ্য দিয়া সাধকের অভিলাষ পূর্ণ

১০৩ বন ২২৯।৪৭-৫৯

১০৪ অর্কপুষ্পেষু তে পঞ্চ গণাঃ পূজ্যা ধনার্থিভিঃ। ইত্যাদি। বন ২৩০।১৪,১৫
জলজানি চ মাল্যানি পদ্মাদীনি চ যানি বৈ। ইত্যাদি। অনু ৯৮।২৯

১০৫ গৃহে গৃহে মনুষ্যাণাং নিত্যং তিষ্ঠতি রাক্ষসী। সভা ১৮।২

১০৬ যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ। ভী ৪১।৪

১০৭ অশ্বত্থং রোচনাং গাঞ্চ পূজয়েদ্ যো নরঃ সদা। ইত্যাদি। অনু ১২৬।৫
শিশুর্যথা পিতুরঙ্কে সুসুখং বর্ত্ততে নগ।
তথা তবাঙ্কে ললিতং শৈলরাজ ময়া প্রভো। ইত্যাদি। বন ৪২।২৭-৩০

করেন। মন্ত্র-তন্ত্র বিধি-ব্যবস্থা সবই তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত। সুতরাং দেবতাও তাঁহা হইতে পৃথক্‌রূপে উপাস্য নহেন [১০৮]

উপাসনা

উপাসনা মুক্তির অনুকূল—যে-সকল কর্ম্ম মুক্তির উপায়, তন্মধ্যে উপাসনা অন্যতম। প্রত্যেক ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপ অবগতির নিমিত্ত ব্যাকুল। কেহ কেহ স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হন, আর কেহ কেহ অনিচ্ছায় যন্ত্রচালিতের মত প্রবৃত্ত হন। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, এক সময়ে মানুষকে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

শাক্ত-শৈবাদি সম্প্রদায়—সাকার উপাসনায় শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় আছেন। মহাভারতে নামতঃ সম্প্রদায়ের উল্লেখ না থাকিলেও উল্লিখিত তিনটি সম্প্রদায়ের বর্ণনা পাওয়া যায়।

নিরাকার-চিন্তার দুঃসাধ্যতা—শ্রীমদ্ভগদ্গীতাতে বলা হইয়াছে—নিরাকারের চিন্তা সুকঠিন। অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ বিরাট্ পুরুষের ধারণা করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ তিনি বাক্য ও মনের অতীত। সুতরাং মনের দ্বারা অব্যক্ত অরূপ পুরুষের ধ্যান করা শক্ত। সগুণের উপাসকগণ একটা-কিছু রূপের ধ্যান করেন বলিয়া সোপান আরোহণের মত ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবার সুযোগ পান। এইহেতু তুলনামূলক বিবেচনায় তাঁহাদের উপাসনা অনেকটা সরল। নির্ব্বিষয়, নিরালম্ব ব্রহ্মে চিত্ত স্থির করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।[১]

উপাসনার ফল—গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যাহারা আমাকেই অর্থাৎ সগুণ পরমেশ্বরকেই ভগবদ্রূপে ধ্যান করেন, আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগকে মৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি"[২]।

১০৮ যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ভী ২৯।১২
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ। ভী ২৯।১৫

১ ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ভী ৩৬।৫

২ অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ॥ ভী ৩৬।৬, ৭

পিতৃলোকের পূজা—বাহ্য উপচারে সাকার উপাসনার মত লোকান্তরিত পিতৃগণের পূজার ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। সাকার উপাসনাতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধানে দেবতাস্বরূপ ভগবানের পূজা করা হয়, আর পিতৃপূজনে লোকান্তরিত পিতৃলোককে পিণ্ডাদি প্রদানরূপ শ্রাদ্ধ দ্বারা তৃপ্ত করা হয়।

দেবপিতৃপূজনের ফল—উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা দেবগণের অর্চ্চনা এবং পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ করে না, তাহারা মূঢ়; তাহারা কখনও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা পিতৃগণ, দেব, দ্বিজ ও অতিথির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হন। যথাবিধানে পূজিত হইলে দেবতাগণ প্রীত হন। তাঁহাদের প্রীতিতে মানুষের কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। যাগ-যজ্ঞাদিও দেবতার প্রীতির হেতু।[৩]

সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম—ত্রিসন্ধ্যা, অগ্নিহোত্র এবং অর্চ্চনা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটিই বাহ্য উপাসনার অঙ্গ।[৪] নিত্য-উপাসনার অসংখ্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধান প্রধান কতকগুলি সঙ্কলিত হইল।[৫]

নৈমিত্তিক ও কাম্য পূজাদি—গৃহপ্রবেশ, বিদেশযাত্রা, তীর্থযাত্রা ও প্রত্যাবর্ত্তন, পুত্রজন্মাদি উৎসবআনন্দ এবং বিশেষ-বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে বিশেষ-বিশেষ কামনায় ভগবানের বিশেষ-বিশেষ মূর্ত্তিতে পূজা করিবার বিধান।[৬]

উপাসনায় জপের প্রাধান্য—উপাসনায় জপ প্রধান অঙ্গ। জাপ-

৩ শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যো ন দদাতি দৈবতানি ন চার্চ্চতি। ইত্যাদি। ৩৩।৪০
সম্যক্ পূজয়সে নিত্যং গতিমিষ্টামবাপ্স্যসি। অনু ৩১।৩৬
অপি চাত্র যজ্ঞক্রিয়াভির্দ্দেবতাঃ প্রীয়ন্তে। নিবাপেন পিতরঃ। শা ১৯১।১৩
অনু ১০০।৯,১০। অনু ১০৪।১৪২

৪ অগ্নিহোত্রঞ্চ যত্নেন সর্ব্বশঃ প্রতিপালয়েৎ। অনু ১৩০।২০
বলি-হোমনস্কারৈর্ম্মন্ত্রৈশ্চ ভরতর্ষভ। বন ১৫০।২৪
জপৈর্ম্মন্ত্রৈশ্চ হোমৈশ্চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নেন চ। বন ১৯৯।১৩

৫ সভা ৪৬।৩১। উ ৮৪।২৬। শা ২৯২।২০-২২। শা ৩৪৩।৪৩। শা ৩৪৫।২৬-২৮। আশ্ব ৩২।১

৬ আদি ১৬৫।১৩। সভা ১।১৮-২০। সভা ৪।৬। সভা ২৩।৪,৫। বন ৩৭।৩৩। বন ৮২ তম ও ৮৩ তম অঃ। বি ৪।৫৫। উ ১৯৩।৯ শা ৩৭।৩১। শা ৩৮।১৪-১৮

কোপাখ্যানে জপ-সম্বন্ধে অনেক-কিছু বলা হইয়াছে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—যজ্ঞের মধ্যে জপই শ্রেষ্ঠ।[৭]

দেবপূজায় পূর্ব্বাহ্ণ প্রশস্ত, পিতৃপূজায় অপরাহ্ণ—দেবপূজার প্রশস্ত কাল পূর্ব্বাহ্ণ এবং পিতৃপূজার প্রশস্ত কাল অপরাহ্ণ।[৮]

গন্ধপুষ্পাদি বাহ্য উপচার—বাহ্য পূজায় যে-সকল উপচারের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে গন্ধ (চন্দনাদি), পুষ্প, ধূপ (গুগ্‌গুল প্রভৃতি) ও দীপ প্রধান। নানাস্থানে এইসকল উপচারের প্রশস্ততা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধূপ এবং দীপকে কি কি উপায়ে অধিকতর প্রীতিপ্রদ করা যায়, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।[৯]

পূজকের খাদ্যই দেবতার নৈবেদ্য—বাহ্য পূজায় উপাস্য দেবতাকে নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হয়। পূজকের যাহা খাদ্য, তাহাই দেবতাকে নিবেদন করিবার নিয়ম।[১০]

ভক্তিভাবে প্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদি ভগবান্ গ্রহণ করেন—গীতাতে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, "পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি যে আমাকে ভক্তির সহিত নিবেদন করে, আমি তাহার নিবেদিত সেই বস্তু সানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকি"।[১১]

মূর্ত্তিপূজা—"যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে মূর্ত্তিতে আমার অর্চ্চনা করিতে চান, আমি সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা জন্মাইয়া থাকি"।[১২] এই উক্তি ব্যতীত অন্যত্রও প্রতিমার উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৩]

৭ রাত্রাবহনি ধর্ম্মজ্ঞ জপন্ পাপৈর্ন লিপ্যতে।
তত্তেঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ॥ অনু ১৫০।৬। শা ১৯৭ তম—১৯৯ তম অঃ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি। ভী ৩৪।২৫

৮ পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ পূজনম্। অনু ১০৪।২৩

৯ দেবতাভ্যঃ সুমনসো যো দদাতি নরঃ শুচিঃ। অনু ৯৮।২১
গন্ধেন দেবাস্তুষ্যন্তি। অনু ৯৮।৩৫-৩৮। অনু ৯৮।৪০-৫৪

১০ যদন্না হি নরা রাজন্ তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ। অনু ৬৬।৬১

১১ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ভী ৩৩।২৬

১২ যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ভী ৩১।২১

১৩ দেবতা-প্রতিমাশ্চৈব। ভী ২।২৬

ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রেয়ঃ নির্দ্দেশ করে—কথিত হইয়াছে যে, ষড়ঙ্গ বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র মানবের শ্রেয়োনির্দ্দেশ করিয়া থাকে, শ্রেয়ঃপন্থা প্রদর্শনের নিমিত্তই বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান।[১]

বেদ ও বেদানুমোদিত স্মৃতির প্রামাণ্য—ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম স্থির করিতে একমাত্র লৌকিক বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, শুষ্ক তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতির আশ্রয় লইতে হইবে। প্রভুর আজ্ঞা যেমন ভৃত্যকে নির্ব্বিচারে পালন করিতে হয়, সেইরূপ বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতেও সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীরা বাধ্য। এই কারণে এইসকল শাস্ত্রকে প্রভুসম্মিত শাস্ত্র বলা হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ে বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বেদ যে আচরণকে অনিন্দ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং যে-সকল অনুষ্ঠানকে যে-সকল বর্ণ ও আশ্রমের পক্ষে বিহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বর্ণাশ্রমি-সমাজ তাহা অবনত মস্তকে মান্য করেন।[২]

বেদ স্বতঃই প্রমাণ, এই কারণে সকল শাস্ত্রের মধ্যে তাহার প্রাধান্য।[৩] ধর্ম্মনির্ণয়ে বেদের পরেই ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থান। যাগাদি আচার-অনুষ্ঠানের নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রকে 'স্মৃতি'ও বলা হইয়া থাকে। শ্রুতির অর্থ স্মরণ করিয়া ঋষিগণ এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাই ইহার নাম স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্র বেদমূলক বলিয়াই তাহার প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে।[৪]

মনুর আদর—মহাভারতে মনুসংহিতার অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। আচার-অনুষ্ঠান, রাজধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে মনুর অভিমত গ্রহণ করা হইয়াছে।

---

১ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি বেদাশ্চ ষড়ঙ্গানি নরাধিপ।
শ্রেয়সোঽর্থে বিধীয়ন্তে নরস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥ শা ২৯৭।৪০

২ শ্রুতিপ্রমাণো ধর্ম্মঃ স্যাদিতি বৃদ্ধানুশাসনম্। বন ২০৫।৪১। বন ২০৬।৮৩। বন ২০৮।২। অনু ১৪১।৬৫
কুর্ব্বন্তি ধর্ম্মং মনুজাঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যদর্শনাৎ। শা ২৯৭।৩৩
শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিং স্মৃতিম্। বন ১৯৯।১১৪

৩ নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রম্। অনু ১০৬।৬৫
বেদে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। শা ২৬৯।৪৩

৪ ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চাপরঃ। ইত্যাদি। বন ২০৬।৮৩। অনু ১৪১।৬৫

কোনও মতকে সমর্থন করিবার সময় গ্রন্থকার শ্রদ্ধার সহিত মনুকে স্মরণ করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়, তৎকালে মনুসংহিতা সমাজে খুব একটা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে মনুস্মৃতির প্রাধান্য চিরদিনই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সনাতন হিন্দুসমাজ এবং শাস্ত্র-নিবন্ধকারগণের মধ্যে এখনও মনুস্মৃতির প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

গৃহস্থকর্ম্মের বিধিব্যবস্থা—শান্তি ও অনুশাসন-পর্ব্বের কতকগুলি অধ্যায় শুধু আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ। শয্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় শয্যা গ্রহণ পর্য্যন্ত একজন গৃহস্থকে যে যে কাজ করিতে হইবে, তাহার বিস্তৃত পদ্ধতি সেইসকল অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কোন কোন অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ('চতুরাশ্রম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) যে-সকল অধ্যায়ে গৃহস্থকর্ম্ম সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে, নিম্নে সেইসকল অধ্যায়-সংখ্যা সঙ্কলিত হইল।[৫]

আর্ষ শাস্ত্রের অনতিক্রমনীয়তা—শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়, ঋষিবচনে কখনও সংশয় করিতে নাই। আর্ষ প্রমাণকে তুচ্ছ করিয়া যিনি যথেচ্ছভাবে চলাফেরা করেন, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রানুশাসন উল্লঙ্ঘন করায় জীবনে কখনও কল্যাণের মুখ দেখিতে পান না। তিনি নিতান্তই মূঢ়।[৬] যে-ব্যক্তি আর্ষ শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করেন এবং শিষ্ট মনীষীদের আচরণকে অনুসরণ করেন না, তিনি ইহলোকে বা পরলোকে কখনও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন না।[৭]

ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা—পুরাণাদি শাস্ত্রের রচয়িতা ঋষিদের প্রজ্ঞাতে

৫ শা ৬৩ তম, ১১০ তম, ১৯৩ তম ও ২৯৪ তম অঃ।
অনু ১০৪ তম, ১০৬ তম, ১৩৫ তম ও ১৪৫ তম অঃ।

৬ আর্ষং প্রমাণমুৎক্রম্য ধর্ম্মং ন প্রতিপালয়ন্।
সর্ব্বশাস্ত্রাতিগো মূঢ়ঃ শং জন্মসু ন বিন্দতি॥ বন ৩১।২১
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ গী ৪০।২৩

৭ যস্ত নার্ষং প্রমাণং স্যাচ্ছিষ্টাচারশ্চ ভাবিনি।
নৈব তস্য পরো লোকো নায়মস্তীতি নিশ্চয়ঃ॥ বন ৩।২২

সংশয় করিতে নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বদর্শী। সমাজের কল্যাণকামনায় তাঁহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত।[৮]

শাস্ত্রাদেশ-পালনের পরিণাম শুভ—আচার-অনুষ্ঠান সকলই যদি বৃথা হয়, তাহা হইলে দেবতা, ঋষি, মানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি অনুষ্ঠাতৃগণ কেন শাস্ত্রীয় আচারের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন? ধ্যান-ধারণা ও তপস্যার ফল হাতে-হাতে ফলিয়া থাকে। তাহা হইতেও সকল আচার-অনুষ্ঠানের অদৃষ্ট-ফলের অনুমান করা যাইতে পারে। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পরিণাম শান্তিকর বলিয়াই অনুষ্ঠাতৃগণ নির্ব্বিচারে শাস্ত্রের আদেশ পালন করিয়া থাকেন। অনুষ্ঠান করা মাত্রই সকল কর্ম্ম ফল দিতে পারে না। সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। অনুষ্ঠাতা কর্ম্মজনিত শুভ বা অশুভ ফল যথাকালে ভোগ করিয়া থাকেন। কর্ম্মের ফল একমাত্র শাস্ত্রগম্য, সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা শুভ ও অশুভের বিচার করা কঠিন। অবিদ্যাদি দোষে মানুষের প্রজ্ঞা আচ্ছাদিত। সুতরাং শাস্ত্রানুশাসন পালন করাই কল্যাণের হেতু।[৯]

শাস্ত্রবিহিত অদৃষ্ট ফলে সংশয় করিতে নাই—আচার-অনুষ্ঠানের ফল সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ না হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় করা উচিত নয়, কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যথাশাস্ত্র যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।[১০]

কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য—অনুষ্ঠান ব্যতীত চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না, অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম, সুতরাং কর্ম্ম মানুষকে করিতেই হইবে—মনুর এই অভিমত।[১১]

শ্রদ্ধাই সকল কর্ম্মকাণ্ডের মূল—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে শ্রদ্ধাই পরম সম্বল। অশ্রদ্ধার সহিত সম্পাদিত অনুষ্ঠান ফলদানে সমর্থ হয় না। অশ্রদ্ধা পরম পাপ, শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচনী। মনের ভাব যদি নির্ম্মল না হয়, তবে অগ্নিহোত্র, ব্রতচর্য্যা, উপবাস প্রভৃতি সকলই মিথ্যা।[১২]

---

৮ শিষ্টৈরাচরিতং ধর্ম্মং কৃষ্ণে মা স্মাভিশঙ্কিথাঃ।
পুরাণমৃষিভিঃ প্রোক্তং সর্ব্বজ্ঞৈঃ সর্ব্বদর্শিভিঃ। বন ৩১।২৩

৯ বিপ্রলম্ভোঽয়মত্যন্তং যদি স্যুরফলাঃ ক্রিয়াঃ। ইত্যাদি। বন ৩১।২৮-৩৬

১০ ন ফলাদর্শনাদ্ধর্ম্মঃ শঙ্কিতব্যো ন দেবতাঃ।
যষ্টব্যং চ প্রযত্নেন দাতব্যং চানসূয়তা। ইত্যাদি। বন ৩১।৩৮, ৩৯

১১ কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেতি মনোরেষ বিনিশ্চয়ঃ। বন ৩২।৩৯

১২ অশ্রদ্ধা পরমং পাপং শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচনী।
জহাতি পাপং শ্রদ্ধাবান্ সর্পো জীর্ণামিব ত্বচম্। শা ২৬৩।১৫

শয্যাত্যাগের সময় স্মরণীয়—ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগের সময় বিষ্ণু, স্কন্দ, অম্বিকা প্রমুখ দেবতাগণ; যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, কাক্ষীবান, ঔশিজ প্রমুখ রাজন্যগণ এবং অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, ব্যাস, বিশ্বামিত্র প্রমুখ মহর্ষিগণকে স্মরণ করা উচিত। যাঁহারা প্রাতঃকালে ইঁহাদের নাম স্মরণ করেন, তাঁহাদের সকল প্রকার অশুভ দূরীভূত হয়।[১৩]

প্রাতঃকালে স্পৃশ্য—গরু, ঘৃত, দধি, রোচনা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যকে প্রাতঃকালে স্পর্শ করিলে শুভ হয়।[১৪]

সূর্য্যোদয়ের পরে নিদ্রা যাইতে নাই—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিতে হয়।[১৫]

মলমূত্রোৎসর্গের নিয়ম—রাজপথে, গোষ্ঠে, ধান্যক্ষেত্রে, জলে, গ্রামের অতি নিকটে এবং ভস্মস্তূপে মূত্র-পুরীষোৎসর্গ নিষিদ্ধ। দিবাভাগে উত্তরাভিমুখ এবং রাত্রিতে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া মল-মূত্রোৎসর্গ করিতে হয়। সূর্য্যের দিকে উৎসর্গ অতীব অন্যায়। দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র ত্যাগ করিতে নাই।[১৬]

শৌচাচমনাদি—যথাবিহিত শৌচাদি সমাপনান্তে বিশেষভাবে পদদ্বয় প্রক্ষালন ও আচমন করিতে হয়, না করিলে নানাবিধ অশুভ হইয়া থাকে। পথ চলিয়া পরে গৃহে প্রবেশের সময়েও পাদশৌচ অবশ্য করণীয়। নলরাজা পাদপ্রক্ষালন না করায় কলি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন।[১৭]

অগ্নিহোত্রং বনে বাসঃ শরীরপরিশোষণম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি মিথ্যা স্যুর্যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ॥ বন ১৯৯।৯৭

১৩ বিষ্ণুর্দ্দেবোঽথ জিষ্ণুশ্চ স্কন্দশ্চাম্বিকয়া সহ।

* * *

এতান্ বৈ কল্যমুত্থায় কীর্ত্তয়ন্ শুভমশ্নুতে॥ অনু ১৫০।২৮-৬০

১৪ কল্য উত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ স্পৃশেদ্ গাং বৈ ঘৃতং দধি। ইত্যাদি। অনু ১২৬।১৮

১৫ ন চ সূর্য্যোদয়ে স্বপেৎ। ইত্যাদি। শা ১৯৩।৫। অনু ১০৪।১৬, ৪৩

১৬ নোৎসৃজেত পুরীষঞ্চ ক্ষেত্রে গ্রামস্য চান্তিকে। ইত্যাদি। অনু ১০৪।৫৪, ৬১। অনু ৯৩।১২৪। শা ১৯৩।৩

উভে মূত্রপুরীষে তু দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ। ইত্যাদি। অনু ১০৪।৭৬, ৬১। অনু ৯৩।১১৭।

১৭ কৃত্বা মূত্রমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্ত নৈষধঃ।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং তত্রৈনং কলিরাবিশৎ॥ ইত্যাদি। বন ৫৯।৩। শা ১৯৩।৪। অনু ১০৪।৩৯

দন্তধাবন—অমাবস্যা এবং অন্যান্য পর্ব্বদিনে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। প্রাতঃকালই দন্তধাবনে বিহিত। মৌনী হইয়া শাস্ত্রবিহিত কাষ্ঠের দ্বারা দন্তধাবন কর্ত্তব্য।[১৮]

গৃহমার্জ্জনাদি—গৃহকে সকল সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। অপরিষ্কৃত গৃহ হইতে দেবতা ও পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান। গোময়-জল দ্বারা গৃহকে উত্তমরূপে লেপন করিতে হয়।[১৯]

স্নানবিধি—দন্তধাবনের পর স্নানের ব্যবস্থা। নদীতে স্নান প্রশস্ত।[২০]

সন্ধ্যা-আহ্নিক—স্নানের পরেই সন্ধ্যা-উপাসনা এবং তর্পণের ব্যবস্থা। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে; মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার বিষয় মহাভারতে আলোচিত হয় নাই। ঋষিগণ সন্ধ্যাবন্দনাতেই বেশী সময় কাটাইতেন, এইকারণে তাঁহারা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতেন। যে-ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে পরাঙ্মুখ, রাজা তাহার দ্বারা শূদ্রের কাজ করাইবেন। সন্ধ্যোপাসনা ব্যতীত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হয় না।[২১]

অগ্নিহোত্র—প্রাতঃ-কৃত্য এবং সায়ং-কৃত্যের মধ্যে হোম একটি নিত্যকর্ম্ম। শাস্ত্রবিধানে অগ্ন্যাধান কর্ম্ম দ্বিজাতির পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য। অগ্নির পরিচর্য্যা দ্বারা বিপ্র শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অগ্নিহোত্র-যাগই সকল বৈদিক কর্ম্মের মূলীভূত।[২২]

অগ্নিপ্রতিনিধি—অগ্নির অভাবে স্বর্ণকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বল্মীকবপা, ব্রাহ্মণপাণি, কুশস্তম্ব, জল, শকট এবং অজের দক্ষিণ কর্ণকেও অগ্নির প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা পাওয়া যায়।[২৩]

যজ্ঞের অধিকারিনির্ণয়—শুধু দ্বিজাতির যজ্ঞে অধিকার স্বীকার করা

---

১৮ দন্তকাষ্ঠঞ্চ যঃ খাদেদমাবস্যামবুদ্ধিমান্। ইত্যাদি। অনু ১২৭।৫। অনু ১০৪।২৩, ৪২-৪৫

১৯ গোশকৃৎ-কৃতলেপনা। ইত্যাদি। অনু ১৪৬।৪৮। অনু ১২৭।৭

২০ উপস্পৃশ্য নদীং তরেৎ। শা ২৯৩।৪

২১ সায়ংপ্রাতর্জ্জপেৎ সন্ধ্যাং তিষ্ঠন্ পূর্ব্বাং তথেতরাম্। ইত্যাদি। শা ১৯৩।৫। অনু ১০৪।১৬, ১৭

ঋষয়ো নিত্যসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুবন্। ইত্যাদি। অনু ১০৪।১৮-২০

২২ আহিতাগ্নির্হি ধর্ম্মাত্মা যঃ স পুণ্যকৃদুত্তমঃ। ইত্যাদি। শা ২৯২।২০-২২। অনু ৯৭।৭

২৩ অগ্ন্যভাবে চ কুরুতে বহ্নিস্থানেষু কাঞ্চনম্। ইত্যাদি। অনু ৮৫।১৪৮-১৫০

হইয়াছে, শূদ্রকে অধিকার দেওয়া হয় নাই।[২৪] দ্বিজাতিগণের মধ্যেও স্ত্রীলোকের অধিকার নিষেধ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোক অমন্ত্রজ্ঞ, এইহেতু অগ্নিহোত্র-হোমে আহুতি প্রদানের অধিকারী নহেন। আশ্বলায়ন স্মার্ত্তাগ্নি-হোমে স্ত্রীলোকের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং মহাভারত-বচনে শ্রৌতাগ্নিহোমে তাঁহাদের অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে—ইহাই নীলকণ্ঠের অভিমত। ইঁহারা শাস্ত্রবচন উল্লঙ্ঘন করিয়া হোমানুষ্ঠান করিলে নরকগামী হইয়া থাকেন।[২৫]

যজ্ঞে অবিহিত দ্রব্য—শূদ্রগৃহের কোন দ্রব্য যজ্ঞকর্ম্মে ব্যবহার করা যাইতে পারে না, সুতরাং যজ্ঞের নিমিত্ত শূদ্র হইতে কিছুই গ্রহণ করিতে নাই।[২৬]

সন্ধ্যা-উপাসনার অসংখ্য উদাহরণ—সন্ধ্যা-উপাসনার উদাহরণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। এমন কি, যুদ্ধকালেও সন্ধ্যা-উপাসনার কথা কেহই বিস্মৃত হন নাই।[২৭]

দেবপূজা—পূর্ব্বাহ্ণই দেবপূজার প্রশস্ত কাল। সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরে দেবপূজার বিধান। দেবতার পূজা না করিয়া কোথাও যাত্রা করিতে নাই।[২৮]

প্রসাধন—কেশ-প্রসাধন এবং অঞ্জনলেপন পূর্ব্বাহ্ণেই করিতে হয়।[২৯]

মধ্যাহ্নস্নান—মধ্যাহ্ন-কালে পুনরায় স্নান করিতে হয়। নগ্ন হইয়া স্নান করিতে নাই। নিশাকালে স্নান নিষিদ্ধ। স্নানের পরে শরীর মার্জ্জন করা অনুচিত। আর্দ্র বস্ত্রে অবস্থান করাও নিষিদ্ধ।[৩০]

২৪ দ্বিজাতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ স যষ্টুং পুরুষোঽর্হতি। ইত্যাদি। শা ৬০।৫১,৪৬। শা ১৬৫।২১

২৫ নৈব কন্যা ন যুবতির্নামন্ত্রজ্ঞো ন বালিশঃ।
পরিবেষ্টাগ্নিহোত্রস্য ভবেন্নাসংস্কৃতস্তথা॥ ইত্যাদি। শা ১৬৫।২১, ২২। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

২৬ আহরেদথ নো কিঞ্চিৎ কামং শূদ্রস্য বেশ্মনঃ।
ন হি যজ্ঞেষু শূদ্রস্য কিঞ্চিদস্তি পরিগ্রহঃ॥ শা ১৬৫।৮

২৭ উপাস্য সন্ধ্যাং বিধিবৎ পরন্তপাঃ। ইত্যাদি। শা ৫৮।৩০। বন ১৬১।১। দ্রো ৭০।৮।
উ ৯৪।৬। আশ্র ২৭।৫

২৮ পূর্ব্বাহ্ণ এব কুর্ব্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনম্। ইত্যাদি। অনু ১০৪।২৩,৪৬

২৯ প্রসাধনঞ্চ কেশানামঞ্জনং…।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি…॥ অনু ১০৪।২৩

৩০ ন নগ্নঃ কর্হিচিৎ স্নায়ান্ন নিশায়াং কদাচন। ইত্যাদি। অনু ১০৪।৫১,৫২

স্নানের দশটি গুণ—স্নানের দশটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—বলবৃদ্ধি, রূপ স্বর ও বর্ণের বিশুদ্ধি, সুস্পর্শ ও সুগন্ধকারিতা, বিশুদ্ধিজনকতা, শ্রী ও সুকুমারতার বৃদ্ধি এবং নারীপ্রিয়ত্ব।[৩১]

অন্যব্যবহৃত বস্ত্রাদি অব্যবহার্য্য—অন্যের ব্যবহৃত জুতা ও বস্ত্রাদি কখনও ব্যবহার করিতে নাই।[৩২]

অনুলেপন—স্নানের পর অনুলেপন প্রশস্ত।[৩৩]

বৈশ্বদেবাদি-বলি—ভোজনের পূর্ব্বেই বলি (ভোজ্যদান) ও বৈশ্বদেববিধি ব্যবস্থিত হইয়াছে। যজ্ঞ দ্বারা দেবতা, আতিথ্য দ্বারা মানুষ এবং বলি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বভূতের প্রীতি সম্পাদন করিতে হয়।[৩৪] অন্ন পাক করা হইলে সেই অন্ন দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি বৈশ্বদেব-বলি দিতে হইবে। অনন্তর অগ্নীষোম, ধন্বন্তরি, সেই অন্ন প্রজাপতি প্রমুখ দেবতার উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি প্রদান করিবে।[৩৫]

নিশাচর-বলি—তারপর দক্ষিণদিকে যম, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে সোম, বাস্তুর মধ্যে প্রজাপতি, ঈশানকোণে ধন্বন্তরি, পূর্ব্বে শক্র, গৃহদ্বারে মনুষ্য, গৃহমধ্যে মরুদ্গণ এবং আকাশে বিশ্বেদেবগণকে বলি নিবেদন করিবে। রাত্রিতে নিশাচরগণের উদ্দেশে বলি নিবেদন করিতে হয়।[৩৬]

ভিক্ষাদান—বলিদানের পর দ্বারে উপস্থিত বিপ্রকে ভিক্ষা দিতে হয়। বিপ্রের অনুপস্থিতিতে ভোজ্যের অগ্রভাগ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়।[৩৭]

শ্রাদ্ধদিনে বলি-বিধান—শ্রাদ্ধের দিনে শ্রাদ্ধকৃত্যের পর বলি প্রদানের

৩১ গুণা দশ স্নানশীলং ভজন্তে বলং রূপং স্বরবর্ণপ্রশুদ্ধিঃ। ইত্যাদি। উ ৩৭।৩৩

৩২ উপানহৌ চ বস্ত্রঞ্চ ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ। অনু ১০৪।২৮

৩৩ ন চানুলিম্পেদস্নাত্বা। অনু ১০৪।৫২

৩৪ সদা যজ্ঞেন দেবাশ্চ সদাতিথ্যেন মানুষাঃ। ইত্যাদি। অনু ৯৭।৬,৭

৩৫ অগ্নীষোমং বৈশ্বদেবং ধান্বন্তর্য্যমনন্তরম্।
প্রজানাং পতয়ে চৈব পৃথগ্‌ঘোমো বিধীয়তে॥ অনু ৯৭।১০

৩৬ তথৈব চানুপূর্ব্ব্যেণ বলিকর্ম্ম প্রযোজয়েৎ।
দক্ষিণায়াং যমায়েতি প্রতীচ্যাং বরুণায় চ॥ ইত্যাদি। অনু ৯৭।১১-১৪

৩৭ এবং কৃত্বা বলিং সম্যগ্ দদ্যাদ্ভিক্ষাং দ্বিজায় বৈ।
অলাভে ব্রাহ্মণস্যাগ্নাবগ্রমুদ্ধৃত্য নিক্ষিপেৎ॥ অনু ৯৭।১৫

বিধান।[৩৮] পিতৃকৃত্যের পর যথাক্রমে বলি, বৈশ্বদেব, ব্রাহ্মণভোজন, অতিথিসেবা ইত্যাদি কর্ত্তব্য।[৩৯]

'বৈশ্বদেব' শব্দের অর্থ—সকল প্রাণীর উদ্দেশে যে দান করা হয়—তাহারই নাম 'বৈশ্বদেব'। দিনে এবং রাত্রিতে ভোজনের পূর্ব্বে বৈশ্বদেব-বিধানে বলিকৃত্য সম্পন্ন করিতে হয়।[৪০]

সকলের ভোজনের পরে অন্নগ্রহণ—উল্লিখিত বিধানে অন্ন নিবেদনের পর পরিবারস্থ সকলের আহার হইয়া গেলে গৃহস্থ অন্নগ্রহণ করিবেন।[৪১]

দেবযক্ষাদি-ভেদে বলির দ্রব্যভেদ—দেববলিতে সপুষ্প দধি এবং দুগ্ধময় সুগন্ধ প্রিয়দর্শন অন্ন নিবেদন করিবে। যক্ষ ও রাক্ষসের বলিতে মাংসাদি দ্রব্য, নাগবলিতে সুরাসবসমন্বিত খৈ প্রভৃতি এবং ভূতবলিতে গুড়মিশ্রিত তিল প্রশস্ত। নিত্য এইসকল দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং স্ব-স্ব খাদ্যদ্রব্য দ্বারা প্রত্যেকের উদ্দেশে বলি নিবেদন করিবে।[৪২]

বলিদানে আত্মতুষ্টি—যে গৃহী নিত্য বলি দান করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় প্রশস্ত হয় এবং তিনি নিরতিশয় প্রীতি লাভ করেন। দাতার যেমন প্রীতি লাভ হয়, গ্রহীতৃগণও সেইরূপ অপরিসীম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন।[৪৩]

দ্বিজগণের যজ্ঞোপবীত-ধারণ—দ্বিজগণ নিত্যই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন। যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড করিতে হয়।[৪৪]

তাম্রপাত্রের প্রশস্ততা—উপবাসের সঙ্কল্পে জলাদিগ্রহণ, বলি-নিবেদন,

৩৮ যদা শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যোঽপি দাতুমিচ্ছেত মানবঃ।
তদা পশ্চাৎ প্রকুর্ব্বীত নিবৃত্তে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥ অনু ৯৭।১৬

৩৯ পিতৄন্ সন্তর্পয়িত্বা তু বলিং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ। ইত্যাদি। অনু ৯৭।১৭,১৮

৪০ শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ভুবি।
বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ম্প্রাতর্বিধীয়তে॥ অনু ৯৭।২২

৪১ গৃহস্থঃ পুরুষঃ কৃষ্ণ শিষ্টাশী চ সদা ভবেৎ। অনু ৯৭।২১

৪২ বলয়ঃ সহ পুষ্পৈস্তু দেবানামুপহারয়েৎ।
দধি দুগ্ধময়াঃ পুণ্যাঃ সুগন্ধাঃ প্রিয়দর্শনাঃ॥ ইত্যাদি। অনু ৯৮।৬০-৬২

৪৩ যথা চ গৃহিণস্তোষো ভবেদ্বৈ বলিকর্ম্মণি।
তথা শতগুণা প্রীতির্দ্দেবতানাং প্রজায়তে॥ অনু ১০০।৭

৪৪ নিত্যোদকী নিত্যযজ্ঞোপবীতী॥ উ ৪০।২৫

ভিক্ষাদান, অর্ঘ্যপ্রদান এবং পিতৃলোকের তিলোদক-দানাদিতে তাম্রপাত্রের প্রশস্ততা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।[৪৫]

গোশৃঙ্গাভিষেক—কতকগুলি কাম্য ব্রত এবং অনুষ্ঠানাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি অনুষ্ঠানের নাম গোশৃঙ্গের অভিষেক। প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিকের পর গোষ্ঠে যাইয়া দর্ভবারি (কুশসংস্পৃষ্ট জল) দ্বারা গোশৃঙ্গে অভিষেক করিবে এবং সেই জল স্বয়ং মস্তকে ধারণ করিবে। ইহাতে নিখিল তীর্থস্নানের ফল প্রাপ্তি হয়।[৪৬]

সোম-বলি—পূর্ণিমাতিথিতে দণ্ডায়মান হইয়া ঘৃতাক্ষতযুক্ত জল অঞ্জলি দ্বারা সোমের উদ্দেশে নিবেদন করিলে হোমকার্য্যের ফল লাভ হয়। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, তাম্রপাত্রে মধুমিশ্র পকান্ন দ্বারা পূর্ণিমাতিথিতে সোমবলি নিবেদন করিলে সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় এবং অপর দেবগণ সেই বলি গ্রহণ করিয়া থাকেন।[৪৭]

নীলষণ্ড-শৃঙ্গাভিষেক—নীলবৃষের শৃঙ্গদ্বারা মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক তিন দিন অভিষেক করিলে সমস্ত অশুভ দূরীভূত হয়।[৪৮]

আকাশশয়ন-যোগ—পৌষমাসের শুক্লপক্ষে যদি রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে সেই যোগকে বলা হয়—'আকাশশয়ন'। স্নাত, শুচি ও একবস্ত্র হইয়া ভক্তিভাবে সোমরশ্মি পান করিলে মহাযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।[৪৯]

৪৫ উপবাসে বলৌ চাপি তাম্রপাত্রং বিশিষ্যতে। ইত্যাদি। অনু ১২৬।২২, ২৩
প্রগৃহ্যৌদুম্বরং পাত্রং তোয়পূর্ণ উদঙ্মুখঃ। ইত্যাদি। অনু ১২৬।২০। অনু ১২৫।৮২।
অনু ১৩৪।৪

৪৬ কলামুখায় গোমধ্যে গৃহ্য দর্ভান সহোদকান্।
নিষিঞ্চেত গবাং শৃঙ্গে মস্তকেন চ তজ্জলম্॥ ইত্যাদি। অনু ১৩০।১০-১২

৪৭ সলিলস্যাঞ্জলিং পূর্ণমক্ষতাশ্চ ঘৃতোত্তরাঃ।
সোমস্যোত্তিষ্ঠমানস্য তজ্জলং চাক্ষতাংশ্চ তান॥ ইত্যাদি। অনু ১২৭।১,২। অনু ১৩৪।৪-৭

৪৮ নীলষণ্ডস্য শৃঙ্গাভ্যাং গৃহীত্বা মৃত্তিকান্তু যঃ।
অভিষেকং ত্র্যহং কুর্য্যাত্তস্য ধর্ম্মং নিবোধত॥ ইত্যাদি। অনু ১৩৪।১-৩

৪৯ পৌষমাসস্য শুক্লে বৈ যদা যুজ্যেত রোহিণী।
তেন নক্ষত্র-যোগেন আকাশশয়নো ভবেৎ॥ ইত্যাদি। অনু ১২৬।৪৮, ৪৯

অমাবস্যায় বৃক্ষচ্ছেদন নিষিদ্ধ—অমাবস্যাতিথিতে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে নাই, করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হয়।[৫০]

ব্রতের ফল—শাস্ত্রীয় ব্রতোপবাসাদি ধর্ম্ম যিনি যথাযথরূপে পালন করেন, তিনি সনাতনলোক প্রাপ্ত হন। সংসারে যম-নিয়মের ফল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়।[৫১]

সঙ্কল্পবিধান—প্রাতঃকালে উদঙ্মুখ হইয়া তাম্রপাত্রে জলগ্রহণপূর্ব্বক ব্রতের সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিতে হয়; তাম্রপাত্রাদির অভাবে মনে-মনে ব্রতের সঙ্কল্পমাত্র করিবে।[৫২]

মন্ত্রসংস্কৃত দ্রব্যই হবিঃ—মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত এবং প্রোক্ষিত দ্রব্যকেই 'হবিঃ' বলা হয়। দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্মে হবিঃ প্রযুক্ত হয়।[৫৩]

উপবাস-বিধি—সকলপ্রকার ব্রতের মধ্যে অনশন-ব্রতই প্রধান। বিশেষ-বিশেষ তিথি, নক্ষত্র এবং মাসভেদে কাম্য উপবাসের বহুবিধ ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, বাহুল্য-বোধে উল্লিখিত হইল না।[৫৪] জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, হবিঃ, ঔষধ এবং ব্রাহ্মণের বা গুরুর আদেশে অপর কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও উপবাসব্রত ভঙ্গ হয় না।[৫৫]

পুণ্যাহবাচন—মাঙ্গলিক কার্য্যে পুণ্যাহবাচন করিবার বিধান।[৫৬]

দক্ষিণাদান—সমস্ত ব্রতানুষ্ঠানাদির সিদ্ধির নিমিত্ত দক্ষিণা দান করিতে হয়। যাগযজ্ঞাদি দক্ষিণা ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। ভূমি, গো অথবা কাঞ্চন দক্ষিণা দান করিবার ব্যবস্থা।[৫৭]

৫০ বনস্পতিঞ্চ যো হন্যাদমাবস্যামবুদ্ধিমান্।
অপি হ্যেকেন পত্রেণ লিপ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ অনু ১২৭।৩

৫১ যো ব্রতং বৈ যথোদ্দিষ্টং তথা সম্প্রতিপদ্যতে।
অখণ্ডং সম্যগারভ্য তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ॥ ইত্যাদি। অনু ৭৫।৮, ৯

৫২ প্রগৃহ্যৌদুম্বরং পাত্রং তোয়পূর্ণমুদঙ্মুখঃ।
উপবাসন্তু গৃহ্ণীয়াদ্ যদ্বা সঙ্কল্পয়েদ্ ব্রতম্॥ ইত্যাদি। অনু ১২৬।২০, ২১

৫৩ হবির্যৎ সংস্কৃতং মন্ত্রৈঃ প্রোক্ষিতাভ্যুক্ষিতং শুচি। ইত্যাদি। অনু ১১৫।৫২। অনু

৫৪ তপো নানশনাৎ পরম্। ইত্যাদি। অনু ১০৬।৬৫

৫৫ অষ্টৌ তান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ। ইত্যাদি। উ ৩৯।৭১, ৭২

৫৬ ততঃ পুণ্যাহঘোষোঽভূৎ। শা ৩৮।১৯

৫৭ বেদোপনিষদশ্চৈব সর্ব্বকর্ম্মসু দক্ষিণাঃ।
সর্ব্বক্রতুষু চোদ্দিষ্টং ভূমির্গাবোঽথ কাঞ্চনম্। ইত্যাদি। অনু ৮৪।৫। শা ৭৯।১১

পুরাণাদি-শ্রবণের দক্ষিণা—ব্রাহ্মণাদি হইতে তত্ত্বকথা বা পুরাণাদি শ্রবণ করিলেও দক্ষিণা দান করিতে হয়।[৫৮]

অনুকল্প-ব্যবস্থা—আপৎকালে অনুষ্ঠান-সাধ্য ধর্ম্মকর্ম্মে অনুকল্পের বিধান করা হইয়াছে। যে-ব্যক্তি সমর্থ, তাঁহার পক্ষে প্রথম কল্পের ব্যবস্থা, অসমর্থ হইলে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে অনুষ্ঠান করিলেও ফলের বেলায় কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যিনি প্রথম কল্পে কার্য্য করিতে সমর্থ, তিনি যদি কল্পান্তর আশ্রয় করেন, তবে শাস্ত্রবিহিত ফল লাভ করিতে পারিবেন না। পরলোকে যে-সকল কাজের ফল ভোগ করিতে হয় বলিয়া শাস্ত্রের অভিপ্রায়, সেইসকল কাজ যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে সমাধা করাই উচিত।[৫৯]

প্রতিগ্রহের যোগ্যতা—দক্ষিণাদির প্রতিগ্রহে বিশুদ্ধ ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কোন পাপ হয় না। যে ব্রাহ্মণ যথারীতি সাবিত্রী-জপ করিয়া থাকেন, যাঁহার চরিত্র নির্ম্মল, প্রতিগ্রহে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না। অধ্যাপনা, যাজন এবং প্রতিগ্রহ তেজস্বী ব্রাহ্মণের পক্ষে দূষণীয় নহে। তাদৃশ ব্রাহ্মণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় পবিত্র।[৬০]

অপ্রতিগ্রাহ্য দ্রব্য (তিলাদি)—কোন কোন দ্রব্যের প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণের তেজ কিঞ্চিৎ মলিন হইয়া যায়, সেইহেতু তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থারও উল্লেখ করা হইয়াছে। তিল ও ঘৃতের প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণ সাবিত্রীমন্ত্রে সমিৎ আহুতি প্রদান করিবেন, মাংস মধু ও লবণের প্রতিগ্রহে সূর্য্যদর্শন, কাঞ্চন-প্রতিগ্রহে গুরুশ্রুতি-মন্ত্রের জপ; বস্ত্র, স্ত্রী, কৃষ্ণায়স, অন্ন, পায়স ও ইক্ষুরসের প্রতিগ্রহে ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন; ব্রীহি, পুষ্প, ফল প্রভৃতি প্রতিগ্রহ করিলে শতসংখ্যক গায়ত্রী-জপ করিতে হইবে। ভূমির প্রতিগ্রহে ত্রিরাত্র উপবাসের ব্যবস্থা।[৬১]

---

৫৮ গো-কোটিং স্পর্শয়ামাস হিরণ্যং তু তথৈবচ। ইত্যাদি। শা ৩১৮।৯৬। স্বর্গা ৬ষ্ঠ অঃ।

৫৯ অনুকল্পঃ পরো ধর্ম্মো ধর্ম্মবাদৈস্তু কেবলম্। ইত্যাদি। শা ১৬৫।১৫, ১৬
প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে।
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্বিদ্যতে ফলম্॥ শা ১৬৫।১৭

৬০ সায়ংপ্রাতশ্চ সন্ধ্যাং যো ব্রাহ্মণোঽভ্যুপসেবতে। ইত্যাদি। বন ১৯৯।৮৩,৮৪
নাধ্যাপনাদ্ যাজনাদ্বা অন্যস্মাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলিতাগ্নিসমা দ্বিজাঃ॥ বন ১৯৯।৮৭

৬১ ঘৃতপ্রতিগ্রহে চৈব সাবিত্রী-সমিদাহুতিঃ। ইত্যাদি। অনু ১৩৬।৪-১১

তীর্থপর্য্যটন—ভারতের বহু তীর্থস্থানের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বনপর্ব্ব ও শল্যপর্ব্বে অসংখ্য তীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাই। বর্ত্তমান কালে সেইসকল তীর্থের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অনেকগুলির সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত এবং অনেকগুলি লুপ্ত। সকল তীর্থের মধ্যে গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।[৬২]

তীর্থযাত্রার অধিকারী—তীর্থভ্রমণে যাগ-যজ্ঞের সমান ফল লাভ করা যায় এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। তীর্থসেবনের যথোক্ত ফল লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চিত্তের পবিত্রতা আবশ্যক। পবিত্র অন্তঃকরণ শ্রেষ্ঠ তীর্থ, মানসিক পবিত্রতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।[৬৩]

তীর্থফল-লাভে অধিকারী—যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন সুসংযত, কখনও অন্যায্য বিষয়ে লিপ্ত হয় নাই, যিনি প্রতিগ্রহবিমুখ এবং দম্ভাদিহীন, যিনি অক্রোধন, সত্যশীল, দয়ালু এবং ভক্তিপরায়ণ, তিনিই তীর্থফল লাভ করিতে পারেন।[৬৪]

শয়নে দিক্-নির্ণয়—উত্তর দিকে অথবা পশ্চিম দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিতে নাই, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করা উচিত। ভগ্ন শয্যায় শয়ন করিতে নাই।[৬৫]

শ্মশ্রুকর্ম্ম—প্রাঙ্মুখ বা উত্তরাভিমুখ হইয়া শ্মশ্রুকর্ম্ম করিলে আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।[৬৬]

সন্ধ্যাকালে কর্ম্মবিরতি—সন্ধ্যার সময় সকলপ্রকার বৈষয়িক কাজ হইতে বিরত হইবে।[৬৭]

৬২ অনু ২৬শ অঃ।

৬৩ তীর্থাভিগমনং পুণ্যং যজ্ঞৈরপি বিশিষ্যতে। বন ৮২।১৭
তীর্থানাং হৃদয়ং তীর্থম্। শা ১৯৩।১৮
মানসং সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মমাহুর্ম্মনীষিণঃ। শা ১৯৩।৩১

৬৪ যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে। ইত্যাদি। বন ৮২।৯-১৩

৬৫ উদক্-শিরা ন স্বপেত তথা প্রত্যক্‌শিরা ন চ।
প্রাক্‌শিরাস্তু স্বপেদ্বিদ্বানথবা দক্ষিণাশিরাঃ। ইত্যাদি। অনু ১০৪।৪৮,৪৯

৬৬ প্রাঙ্মুখঃ শ্মশ্রুকর্ম্মাণি কারয়েৎ সুসমাহিতঃ।
উদঙ্মুখো বা রাজেন্দ্র তথায়ুর্ব্বিন্দতে মহৎ। অনু ১০৪।১২৯

৬৭ সন্ধ্যায়াং ন স্বপেদ্ রাজন্ বিদ্যাং নৈব সমাচরেৎ। ইত্যাদি। অনু ১০৪।১১৯,১২০,১৪৩

আচার-পালনে দীর্ঘায়ু—যাঁহারা শাস্ত্রবিহিত আচার পালন করেন, তাঁহারা স্বাস্থ্য ও স্বস্তির সহিত শতবর্ষ জীবিত থাকেন এবং মৃত্যুর পর উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্ত হন। সুতরাং আচারসমূহ সযত্নে পালন করা উচিত।[৬৮]

প্রায়শ্চিত্ত

শাস্ত্রবিহিতের অকরণ এবং নিষিদ্ধের আচরণে পাপ—যে-সকল কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত, সেইসকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে পাপ হয়, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও পাপ জন্মিয়া থাকে। পাপ অশুভ অদৃষ্টবিশেষ। একমাত্র শাস্ত্রই এই বিষয়ে প্রমাণ। পাপপুণ্য-সম্বন্ধেও মনুর অভিপ্রায়ই মহাভারতের অনুমোদিত। পাপজনক কর্ম্ম করিলে শাস্ত্রবিহিত চান্দ্রায়ণাদি-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। এইসকল নিয়ম প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এখনও হিন্দুসমাজে পাপ-ক্ষালনের নিমিত্ত ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা হয়। পাপকর্ম্মের দ্বারা যে দুরদৃষ্টের উৎপত্তি হয়, শাস্ত্রবিহিত ব্রতাদির অনুষ্ঠানে সেই দুরদৃষ্টের ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহাই প্রায়শ্চিত্তের ফল। ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ অন্যতম।

প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে পাপমুক্তি—পাপ করিলে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পাপের ক্ষয় না হইলে কেহ শুভ গতি প্রাপ্ত হন না। ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে পাপী পাপমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধি লাভ করে। পাপপুণ্য সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে গেলে জন্মান্তর এবং পরলোক অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

জন্মান্তরে বিশ্বাসই প্রায়শ্চিত্তের প্রবর্ত্তক—পাপকার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পরলোকে বা জন্মান্তরে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যকর্ত্তব্য। জন্মান্তর সম্বন্ধে সংশয়ী বা অবিশ্বাসীর নিকট প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ বৃথা। বেদ, সংহিতা, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে পরলোক বা জন্মান্তর সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নাই, এই কারণে সেইসকল শাস্ত্রের অনুশাসনে প্রায়শ্চিত্তেরও বিশেষ একটা স্থান আছে।[১]

৬৮ শতায়ুরুক্তঃ পুরুষঃ শতবীর্য্যশ্চ জায়তে। ইত্যাদি। অনু ১০৪।১-৯

১ অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধানি চাচরন্।
প্রায়শ্চিত্তীয়তে হ্যেবং নরো মিথ্যানুবর্ত্তয়ন্। শা ৩৪।২

পাপজনক অনুষ্ঠান—শান্তিপর্ব্বের প্রায়শ্চিত্তীয়োপাখ্যানে অনেকগুলি কাজের নাম করা হইয়াছে, যাহাদের অনুষ্ঠান পাপজনক। যেমন—মিথ্যাচরণ, সূর্য্যোদয়ে শয়ন (ব্রহ্মচারীর পক্ষে), জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্ব্বে দারপরিগ্রহ, গার্হস্থ্যে প্রবেশেচ্ছু হইয়াও কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্ব্বে দারপরিগ্রহ না করা, ব্রহ্মহত্যা, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের পূর্ব্বে কনিষ্ঠাকে বিবাহ করা, কনিষ্ঠার বিবাহের পরে জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করা, ব্রতনাশ, অপাত্রে দান, বিহিতপাত্রে দান না করা, অনেকের যাজন, মাংসবিক্রয়, বিদ্যাবিক্রয়, সোমবিক্রয়, গুরুহত্যা, স্ত্রীবধ, বৃথা পশুবধ, গৃহদহন, গুরুর প্রতিরোধ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, স্বধর্ম্মপরিত্যাগ, পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান, অযাজ্য-যাজন, অভক্ষ্যভক্ষণ, শরণাগত-পরিত্যাগ, ভৃত্যের ভরণপোষণ না করা, লবণ গুড় প্রভৃতি রসদ্রব্যের বিক্রয়, পশুপক্ষী প্রভৃতি হনন, সামর্থ্যসত্ত্বে অগ্ন্যাধান না করা, নিত্যকর্ম্মে শিথিলতা, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, প্রতিশ্রুত দান না দেওয়া, ব্রাহ্মণস্বহরণ, ধনের নিমিত্ত পিত্রাদি গুরুজনের সহিত বিবাদ, গুরুপত্নীগমন, যথাকালে ধর্ম্মপত্নীতে অনভিগমন, এইসকল কাজ পাপের হেতু। পাপনাশের নিমিত্ত শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান।[১]

সময়বিশেষে পাপাভাব (প্রতিপ্রসব)—উল্লিখিত কর্ম্মগুলিও সময়-বিশেষে পাপজনক হয় না। বলা হইয়াছে যে, যদি বেদান্তবিৎ কোন ব্রাহ্মণও যুদ্ধক্ষেত্রে শস্ত্রহাতে উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে হিংসা করাই উচিত। তাহাতে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না। যে-ব্রাহ্মণ জাতিগত ক্রিয়াকাণ্ড হইতে বিচ্যুত, তিনি আততায়িরূপে সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে হত্যা করিলে পাপ হইবে না। যে রোগে চিকিৎসকগণ মদ্যকেই একমাত্র ঔষধ বলিয়া ব্যবস্থা করেন, সেই রোগ আরামের নিমিত্ত মদ্যপান ততটা দূষণীয় নহে, শুধু পুনরায় উপনয়ন-সংস্কারের প্রয়োজন হয়। খাদ্যাভাবে প্রাণনাশের আশঙ্কা হইলে অভক্ষ্যও ভক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। গুরুর আদেশে শুধু গুরুর বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে গুরুপত্নীগমন দূষণীয় নহে। গুরু-উদ্দালক শিষ্য দ্বারা

পাপকেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাভ্রেণেব চন্দ্রমাঃ। ইত্যাদি। বন ২০৬।৫৭। অনু ১৬২।৫৮
শা ১৫২।৩৭

১ প্রায়শ্চিত্তমকৃত্বা তু প্রেত্য তপ্তাসি ভারত। শা ৩২।২৫

২ সূর্য্যোণাভ্যুদিতো যশ্চ ব্রহ্মচারী ভবত্যুত। ইত্যাদি। শা ৩৪।৩-১৫

স্বীয় পত্নীতে শ্বেতকেতু-নামক পুত্র উৎপাদন করাইয়াছিলেন। আপৎকালে গুরুর পরিবার-প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত চুরি করিলেও পাপ হয় না। অপরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বিত্ত ব্যতীত অন্য জাতির বিত্ত অপহরণে পাপ নাই। আপনার অথবা অপরের প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে মিথ্যাও বলিতে হয়, তাহাতে পাপ হয় না। গুরুর রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যাবচন দূষণীয় নহে। স্ত্রীলোকের নিকট এবং বিবাহাদি ব্যাপারের ঘটকতায় মিথ্যা বলা পাপের নহে। স্বপ্নে শুক্রক্ষয় হইলে বিশেষ পাপ হয় না বটে, কিন্তু অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত বা প্রব্রজিত হইলে কনিষ্ঠের বিবাহে দোষ হয় না। কামার্ত্তা মহিলা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলে পরদারগমনও দূষণীয় নহে। যজ্ঞে পশুহিংসা করিলে পাপ হয় না। না জানিয়া অনর্হ পাত্রকে দান এবং সৎপাত্রকে দান না করিলেও পাপ নাই। ব্যভিচারিণী পত্নীকে উপেক্ষা করিলে কোন পাপ হয় না। 'সোমরস দেবতাদের পরম প্রিয় বস্তু' এই কথা মনে করিয়া যদি কেহ সোমরস বিক্রয় করেন, তবে তিনি পাপী হন না। যে ভৃত্য প্রভুর সেবায় পরাঙ্মুখ, তাহাকে ত্যাগ করিলে কোন পাপ নাই। গরুর ঘাসের উন্নতির নিমিত্ত বনকে পোড়াইয়া দিলেও পাপ হইবে না।[৩]

চতুর্দ্দশবর্ষের ন্যূনবয়স্কের পাপ হয় না—যাহাদের বয়স চৌদ্দ বৎসরের কম, কোন অন্যায় কাজেও তাহাদের পাপ হয় না।[৪]

অনুশোচনায় পাপক্ষয়—একবার পাপকার্য্য করিয়া যদি অনুশোচনা আসে এবং 'পুনরায় করিব না' এইপ্রকার দৃঢ় সঙ্কল্প জন্মে, তবেই প্রায়শ্চিত্তে ফল হয়, অনুশোচনা না হইলে প্রায়শ্চিত্তের কোন সার্থকতা থাকে না। অনুতাপ সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রায়শ্চিত্ত। পাপী যদি পাপকার্য্যের পরে অনুতাপ করে, তবে তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।[৫]

৩ এতান্যেব তু কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি মানবাঃ।
যেষু যেষু নিমিত্তেষু ন লিপ্যন্তেঽথ তান্ শৃণু॥ ইত্যাদি। শা ৩৪।১৬-৩২

৪ আচতুর্দ্দশকাদ্ বর্ষান্ন ভবিষ্যতি পাতকম্।
পরতঃ কুর্ব্বতামেব দোষ এব ভবিষ্যতি॥ আদি ১০৮।১৭

৫ বিকর্ম্মণা তপ্যমানঃ পাপাদ্বি পরিমুচ্যতে। বন ২০৬।৫১
তপসা কর্ম্মণা চৈব প্রদানেন চ ভারত।
পুনাতি পাপং পুরুষঃ পুনশ্চেন্ন প্রবর্ত্ততে॥ শা ৩৫।১

তপস্যাদি প্রায়শ্চিত্ত—তপশ্চরণ, জপ, হোম, উপবাস, ব্রত ইত্যাদি সবকিছুই পাপনাশক। শাস্ত্রে সাধারণতঃ যে-সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত-পদ্ধতির উল্লেখ করা হয় নাই, সেইসকল পাপ নাশের নিমিত্ত জপ, হোম এবং উপবাসের প্রশস্ততা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুণ্যসলিলা নদীতে অবগাহন, পুণ্যপর্ব্বতে বাস, সুবর্ণপ্রাশন, রত্নাদিস্নান, দেবস্থানপর্য্যটন, ঘৃতপ্রাশন প্রভৃতি কর্ম্মও প্রায়শ্চিত্তরূপে বিবেচিত হয়।[৬] দানের দ্বারাও পাপ ক্ষয় হয়। গো, ভূমি এবং টাকাকড়ি দানের প্রায়শ্চিত্তরূপতা কথিত হইয়াছে।[৭] ব্রহ্মহত্যাকারী বা ঐরূপ কোন কঠোর-পাতকী ব্যক্তিকে দেখিলে সূর্য্যদর্শন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হয়।[৮]

নরপতির পক্ষে অশ্বমেধের পাপনাশকতা—ক্ষত্রিয় নরপতির পক্ষে অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ নিখিল পাপের নাশক। অগণিত জ্ঞাতি, সুহৃৎ, গুরু ও বন্ধুবান্ধব নিধনের পর পাপ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের উপদেশে অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।[৯] মহর্ষি শৌনক পাপবিনাশের নিমিত্ত রাজা জনমেজয়কে অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত করেন।[১০] ব্রাহ্মণ-বৃত্রকে হনন করার পর দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া নিষ্পাপ হন।[১১] এইসকল উদাহরণ হইতে জানা যায়, রাজারা শক্ত পাপ করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতেন।

অকৃত প্রায়শ্চিত্তের নরকভোগ—অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত পাপী নানাবিধ নরকযাতনা ভোগ করিয়া থাকে। যমদ্বারে অবস্থিত উষ্ণা বৈতরণী নদী, অসিপত্র-বন, পরশুবন, দংশোৎপাতক, ক্ষুরসংবৃত, লৌহকুম্ভী প্রভৃতি বহু নরকের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২]

৬ তপসা তরতে সর্ব্বমেনসশ্চ প্রমুচ্যতে। অনু ১২২।৯
অনাদেশে জপো হোম উপবাসস্তথৈব চ। ইত্যাদি। শা ৩৬।৬-৯

৭ গাশ্চ ভূমিঞ্চ বিত্তঞ্চ দত্ত্বেহ ভৃগুনন্দন।
পাপকৃৎ পূয়তে মর্ত্ত্য ইতি ভার্গব শুশ্রুম॥ অনু ৮৪।৪১

৮ দ্বাক্ ব্রহ্মহণং দৃষ্ট্বা জনঃ সূর্য্যমবেক্ষতে। দ্রো ১৯৭।২১

৯ অশ্বমেধো হি রাজেন্দ্র পাবনঃ সর্ব্বপাপ্মনাম্।
তেনেষ্ট্বা ত্বং বিপাপ্মা বৈ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ॥ অশ্ব ৭১।১৬

১০ ততঃ স রাজা ব্যপনীতকল্মষঃ শ্রেয়োবৃতঃ প্রজ্বলিতাগ্নিরূপবান্। শা ১৫২।৩৯

১১ তত্রাশ্বমেধঃ সুমহান্ মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ। উ ১৩।১৭

১২ উষ্ণাং বৈতরণীং মহানদীং। ইত্যাদি। শা ৩২১।৩২
তমসা সংবৃতং ঘোরং কেশশৈবলশাদ্বলম্। ইত্যাদি। স্বর্গা ২।১৭-২৫

নৈতিক হীনতার পাপত্ব—যে-সকল অধর্ম্ম-আচরণে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সেইগুলির একটি তালিকা অনুশাসনপর্ব্বে দেখিতে পাই। গুরুর প্রাণরক্ষা এবং শরণাগত ব্যক্তিকে অভয় দিতে যাইয়া যদি মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, তথাপি কোন দোষ নাই; তাহা ছাড়া মিথ্যা বলিলে নরকে বাস করিতে হয়। পরদারাভিমর্শন এবং পরদারহরণের সহায়তা নরকের হেতু। পরস্বহারী, পরস্ববিনাশক এবং পরনিন্দকের নরকভোগ সুনিশ্চিত। প্রপা, সভাসমিতি এবং গৃহাদির বিনাশসাধন অতীব পাপজনক। অনাথা মহিলাকে যাহারা প্রতারণা করে, তাহাদের পাপের অন্ত নাই। এই প্রকরণে আরও অনেকগুলি পাপজনক আচরণের উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৩]

পরপীড়নই পাপের হেতু—সাধারণবুদ্ধিতেও মানুষ আপনার কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য ভালরূপে বুঝিতে পারে। যে-কাজে অপরের কোনপ্রকার ক্ষতির আশঙ্কা আছে, সেই কাজই পাপের হেতু। অনেক বিষয়েই আপন বিবেকবুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিচারক। যে-সকল অতীন্দ্রিয় বিষয় বুদ্ধি-গোচর নহে, সেইসকল বিষয়ে কিছু স্থির করিতে হইলে শাস্ত্রানুশাসন এবং মহাজনপদবীর অনুসরণই সুবুদ্ধির কাজ।

বহুবিধ পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ—নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলিতে বহুবিধ পাপ এবং পাপের প্রতীকারার্থ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে পৃথক-পৃথক-রূপে নাম গ্রহণ করা হইল না।

বশিষ্ঠের আত্মহত্যার সঙ্কল্প, আদি ১৭৬।৪৪। চৈত্ররথপর্ব্ব, আদি ১৮০। ৯-১১। দুর্য্যোধনের প্রায়োপবেশন, বন ২৫১।২। বিদুরবাক্য, উ ৩৭।১২, ১৩। প্রায়শ্চিত্তীয়, শা ৩২শ-৩৫শ অঃ। ব্যাসবাক্য, শা ৩৬শ অঃ। ইন্দ্রোত-পারিক্ষিতীয়, শা ১৫২ তম অঃ। প্রায়শ্চিত্তীয়, শা ১৬৫ তম অঃ। ব্রহ্মহত্যা-বিভাগ, শা ২৮১ তম অঃ। ব্রহ্মস্বকথন, অনু ২৪শ অঃ। অহিংসাফলকথন, অনু ১১৬ তম অঃ। লোমশরহস্য, অনু ১২৯ তম অঃ। প্রায়শ্চিত্তকথন, অনু ১৩৬ তম অঃ।

১৩ নিরয়ং যেন গচ্ছন্তি স্বর্গং চৈব হি তচ্ছৃণু। ইত্যাদি। অনু ২৩।৫৯-৮২

শবদাহ ও অশৌচ

মৃত্যুর পর শবদেহের সাজসজ্জা এবং অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি সম্বন্ধে যে-সকল আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই সঙ্কলিত হইল।

শবদেহের আচ্ছাদন—শবকে বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিবার নিয়ম ছিল।[১]

শবদেহের সাজসজ্জা—ভীষ্মদেবের দেহ হইতে প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হইবার পর বিদুর এবং যুধিষ্ঠির ক্ষৌম বস্ত্র আর মাল্য দ্বারা তাঁহার পবিত্র শবকে বিশেষরূপে আচ্ছাদন করিলেন। যুযুৎসু শবের উপর ছত্র ধারণ করিলেন। ভীম ও অর্জ্জুন চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। নকুল-সহদেব পিতামহের মাথার উপর উষ্ণীষ ধারণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র পদপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন। কুরুকুললক্ষ্মীগণ তালবৃন্ত দ্বারা ধীরে ধীরে শবদেহে ব্যজন করিতে লাগিলেন।[২]

চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা দাহ ও সামগীতি—বিবিধ গন্ধদ্রব্য, চন্দন-কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া শবদেহের উপর কালীয়ক, কালাগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য স্থাপনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ ব্যক্তিগণ চিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি দাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। শবদেহে অগ্নিসংযোগের সময় হইতে সামগ পণ্ডিতগণ শ্মশানভূমিতে বসিয়া বেদগান করিতে লাগিলেন।[৩]

দাহপদ্ধতি—পাণ্ডুর শবদাহের যে দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই—শতশৃঙ্গপর্ব্বতে পাণ্ডুর মৃত্যু হইল, তাঁহাকে দাহ করার সময় মাদ্রী পতির চিতায় আরোহণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। মহর্ষিগণ উভয়ের দেহের ভস্মাবশিষ্ট অস্থি লইয়া মৃত্যুর সপ্তদশ দিনে হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আদেশ করিলেন, উভয়ের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যেন রাজোচিতভাবে সম্পন্ন হয়। বিদুর ভীষ্মের সহিত পরামর্শক্রমে বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং পবিত্র স্থানে চিতা রচনা করিলেন। কুরু-পুরোহিতগণ আজ্যগন্ধি অগ্নি বহন করিয়া শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন।

১. আদি ১২৭।৩

২. অনু ১৬৮।১২-১৫

৩. ততোঽস্য বিধিবচ্চক্রুঃ পিতৃমেধং মহাত্মনঃ। ইত্যাদি। অনু ১৬৮।১৫-১৭

বিবিধ পুষ্প ও গন্ধের দ্বারা শিবিকা সজ্জিত হইল। মাল্য ও বস্ত্রে আচ্ছাদিত শিবিকায় শবদেহের ভস্মাবশিষ্ট অস্থি স্থাপন করিয়া অমাত্য, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণ শিবিকা বহন করিয়া শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্বেতচ্ছত্র, চামর ও ব্যজন লইয়া কয়েকজন পুরুষ শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নানাবিধ বাদিত্র-নিনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রার্থিগণ যে যাহা প্রার্থনা করিল, সে তাহাই পাইল। অসংখ্য পুরুষ শবের অনুগমন করিলেন। গঙ্গাতীরে রমণীয় বনের নিকটে সেই শিবিকা রাখা হইলে তাহা হইতে শবখণ্ড বাহির করিয়া কালীয়ক, চন্দন প্রভৃতি লেপন করিয়া জলপূর্ণ সুবর্ণঘটে শবকে স্নান করান হইল। স্নানান্তে পুনরায় শুক্ল চন্দনের প্রলেপ দিয়া কালাগুরুবিমিশ্র তুঙ্গরসে সজ্জিত করিয়া দেশজ শুক্ল বস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হইল। অতঃপর শবদেহ ঘৃতাবসিক্ত করিয়া তুঙ্গ, পদ্মক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এবং চন্দনকাষ্ঠের দ্বারা দাহ করা হইল।[৪]

সাগ্নিকের দাহবিধি—বসুদেবের মৃত্যুর পর উত্তম যানে (খাট কি?) তাঁহার শবদেহ স্থাপন করিয়া বাড়ীর বাহিরে আনা হইল। শবদেহ মানুষের দ্বারাই আনীত হইয়াছিল। দ্বারকাবাসী পৌর-জানপদগণ শ্মশান পর্য্যন্ত শবের অনুগমন করিলেন। যাজকেরা রাজার আশ্বমেধিক ছত্র এবং প্রজ্বলিত অগ্নি বহন করিয়া আগে আগে চলিলেন। তাঁহার সদ্যোবিধবা মহিষীগণও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। জীবিতকালে যে স্থানটি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, সেই স্থানেই তাঁহার শবদেহ চিতায় স্থাপন করা হইল। দেবকী-প্রমুখ চারিজন মহিষী তাঁহার চিতায় আরোহণ করিলেন। চন্দনাদি নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি কাষ্ঠে তাঁহাদের দেহ ভস্ম করা হইল। দাহকালে যাজকদের উচ্চ সামধ্বনি এবং পৌরবর্গের ক্রন্দনের রোলে শ্মশানভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল।[৫]

যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদের শবদাহ—মহাযুদ্ধের পরেও যুধিষ্ঠিরের আদেশে সুধর্ম্মা, ধৌম্য, বিদুর, সঞ্জয় প্রমুখ ব্যক্তিগণের উদ্যোগে যুদ্ধভূমিতে পতিত সকল শবকেই যথাবিধি দাহ করা হইয়াছিল। শ্মশানে বেদজ্ঞদের সামগান,

[৪] ১২৭ তম অঃ।

[৫] ততঃ শৌরিং নৃযুক্তেন বহুমূল্যেন ভারত।
যানেন মহতা পার্থো বহির্নিষ্ক্রাময়ত্তদা। ইত্যাদি। মৌ ৭।১৯-২৬

নারীদের ক্রন্দন এবং আত্মীয়-কুটুম্বদের শোকোচ্ছ্বাস একত্র মিলিত হইয়া রাত্রির নিস্তব্ধতা দূর করিয়া দিয়াছিল। ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতির অভাব ছিল না।[৬]

দাহান্তে স্নান—শবদাহের পর বৃদ্ধব্যক্তিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শ্মশানবন্ধুগণ স্নান করিয়া পবিত্র হইতেন। নিকটে নদী থাকিলে নদীতেই স্নান করিতেন।[৭]

স্নানান্তে উদকক্রিয়া—স্নান করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির নিমিত্ত শ্মশানযাত্রিগণ উদকক্রিয়া (প্রেততর্পণ) করিতেন।[৮]

যতির দেহ অদাহ্য—যাঁহারা যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহাদের শব দগ্ধ করিতে নাই। মহামতি বিদুর যোগবলে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে ধর্ম্মরাজ তাঁহার দেহের সংস্কার করিতে উদ্যত হন। তখন অশরীরী বাণী তাঁহাকে নিষেধ করিল। তিনি শুনিতে পাইলেন—"মহারাজ, বিদুরের দেহ দাহ করিবেন না, এই শবদেহ এখানেই থাকিবে। মহামতি বিদুর 'সান্তানিক'-নামক লোক প্রাপ্ত হইবেন, ইনি যতিদের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন"।[৯]

অশৌচবিধি—মাতাপিতা প্রমুখ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনের বিয়োগ হইলে অশৌচ-পালন করিবার সময় কি কি নিয়ম প্রতিপালিত হইত, তাহার বিস্তৃত কোন বর্ণনা নাই। শুধু এইমাত্র দেখিতে পাই, পিতার মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণ ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন। অনেক পৌরবাসী ব্রাহ্মণাদি প্রজাও তখন পাণ্ডবদের মতই শয়ন করিতেন।[১০] পাণ্ডুর অস্থি দাহ করার দিন হইতে বার দিন পর্য্যন্ত (মৃত্যুর দিন হইতে আঠাশ দিন পর্য্যন্ত) পাণ্ডবেরা

৬ এবমুক্তো মহাপ্রাজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
আদিদেশ সুধর্ম্মাণং ধৌম্যং সূতঞ্চ সঞ্জয়ম্॥ ইত্যাদি। স্ত্রী ২৬।২৪-৪৩

৭ ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য গঙ্গামভিমুখোঽগমং। ইত্যাদি। স্ত্রী ২৬।৪৪। অনু ১৬৮।১৯

৮ ততো ভীষ্মোঽথ বিদুরো রাজা চ সহ পাণ্ডবৈঃ।
উদকং চক্রিরে তস্য সর্ব্বাশ্চ কুরুযোষিতঃ॥ ইত্যাদি। আদি ১২৭।২৮। অনু ১৬৮।২০

৯ ধর্ম্মরাজশ্চ তত্রৈব সঞ্চকারয়িষুস্তদা।
দগ্ধুকামোঽভবদ্বিদ্বানথ বাগভ্যভাষত। ইত্যাদি। আশ্র ২৬।৩১-৩৩

১০ যথৈব পাণ্ডবা ভূমৌ সুষুপুঃ সহ বান্ধবৈঃ।
তথৈব নাগরা রাজন্ শিশ্যিরে ব্রাহ্মণাদয়ঃ॥ আদি ১২৭।৩১

অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা পুরীর বাহিরে বাস করিতেন। বার দিনের পর শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন হইলে বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাদিগকে লইয়া হস্তিনায় প্রবেশ করেন।[১১]

যুদ্ধে মৃত্যুতে জ্ঞাতিবর্গের সদ্যঃশৌচ—যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদের সপিণ্ডগণ সদ্যঃ অশৌচ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়গণ বার দিন অশৌচ পালন করেন। মহাযুদ্ধে মৃত রাজন্যবর্গের শবদাহের পর ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, পাণ্ডবগণ এবং সমস্ত কুরুকুলের মহিলাগণ বার দিন পুরীর বাহিরে অবস্থান করিয়া অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। আঠারদিন-ব্যাপক যুদ্ধে মৃতদের জ্ঞাতিবর্গ সদ্যঃ-শৌচ পালন করিয়াছেন। যুদ্ধের অন্ত্যদিনে নিহত সুপ্ত বীরগণের মৃত্যুতে সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া বার দিন অশৌচ পালন করা হইয়াছে।[১২]

শ্রাদ্ধ ও তর্পণ

পিতৃঋণ-পরিশোধ—পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের দ্বারাও পিতৃঋণ পরিশোধের কথা বলা হইয়াছে, পুত্রোৎপাদনই ঋণশোধের একমাত্র উপায় নহে।[১] (দ্রঃ ১০৯ তম পৃঃ) শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের দ্বারা আস্তিক পুরুষ পিতৃলোকের সহিত আপনার সম্বন্ধ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদেরও আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। (দ্রঃ ১০৬ তম পৃঃ)

শ্রাদ্ধ ও তর্পণ—পিণ্ডদানাদি শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপযুক্ত অনুষ্ঠানের নাম 'শ্রাদ্ধ'। শ্রদ্ধার সহিত পিতৃলোকের উদ্দেশে জলাঞ্জলি-অর্পণের নাম 'তর্পণ'। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ, এই উভয়ই 'পিতৃকৃত্য'-নামে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।[২]

---

১১ তদ্গতানন্দমস্বস্থমাকুমারমহৃষ্টবৎ।
বভুব পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং নগরং দ্বাদশ ক্ষপাঃ॥ ইত্যাদি। আদি ১২৭।৩২। আদি ১২৮।৩

১২ কৃতোদকাস্তে সুহৃদাং সর্ব্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ
বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সর্ব্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ॥ ইত্যাদি। শা ১।১-৩। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

১ স্বাধ্যায়েন মহর্ষিভ্যো দেবেভ্যো যজ্ঞকর্ম্মণা।
পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধদানেন নৃণামভ্যর্চ্চনেন চ॥ শা ২৯২।১০

২ অদ্ভিশ্চ তর্পয়ন্। শা ৯।১০

'সূচীকটাহন্যায়' অনুসারে তর্পণের বিষয় প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে।

তর্পণবিধি—প্রথমতঃ আপন-বংশীয় মৃত ব্যক্তিগণকে জলাঞ্জলি দান করিতে হয়, তারপর লোকান্তরিত সুহৃৎ এবং আত্মীয়বর্গের তর্পণ করার বিধান।[৩]

ঋষিতর্পণ—পিতামহ, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরাঃ, ক্রতু, কশ্যপপ্রমুখ তপস্বিগণ মহর্ষি বলিয়া খ্যাত। ইঁহারা মহাযোগেশ্বর এবং পিতৃলোকের ন্যায় তর্পণীয়।[৪]

নিত্যবিধি—পিতৃগণকে প্রত্যহ স্মরণ করা এবং তাঁহাদের উদ্দেশে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি দান করা প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য।[৫]

বলীবর্দ্দ-পুচ্ছোদকে তর্পণ—পিতৃগণ বলীবর্দ্দের পুচ্ছযুক্ত স্রোতোজলের তর্পণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।[৬]

অমাবস্যার প্রশস্ততা—প্রত্যেক অমাবস্যা-তিথিতে বিশেষভাবে তর্পণের ব্যবস্থা দেখা যায়।[৭] পিতৃগণ অমাবস্যাতে এবং দেবগণ পূর্ণিমাতে জলাদি-প্রাপ্তির আশা করিয়া থাকেন। সুতরাং এই সময়ে যথাসম্ভব উপচারে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করা বিধেয়।[৮]

তীর্থতর্পণ—তীর্থোদকে পিতৃলোকের তর্পণ করা শাস্ত্রানুমোদিত। যে-কোন তীর্থে গেলে সেই তীর্থের পুণ্য সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক তর্পণ করিতে হয়। বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সর্ব্বত্রই তর্পণের ব্যবহার দেখিতে পাই। অর্জ্জুন গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইয়া ভাগীরথীতে অবগাহনপূর্ব্বক প্রথমেই তর্পণ

৩ পূর্ব্বং স্ববংশজানান্তু কৃত্বাদ্ভিস্তর্পণং পুনঃ।
সুহৃৎসম্বন্ধিবর্গাণাং ততো দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্॥ অনু ৯২।১৭

৪ পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠঃ পুলহস্তথা।
অঙ্গিরাশ্চ ক্রতুশ্চৈব কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ॥ ইত্যাদি। অনু ৯২।২০-২২

৫ নদীমাসাদ্য কুর্ব্বীত পিতৃণাং পিণ্ডতর্পণম্। ইত্যাদি। অনু ৯২।১৬

৬ কল্মাষগোযুগেনাথ যুক্তেন তরতো জলম্।
পিতরোঽভিলষন্তে বৈ নাবং চাপ্যধিরোহিতাঃ॥ অনু ৯২।১৮

৭ মাসার্দ্ধে কৃষ্ণপক্ষস্য কুর্য্যান্নির্ব্বপণানি বৈ। অনু ৯২।১৯

৮ অমাবাস্যাং হি পিতরঃ পৌর্ণমাস্যাং হি দেবতাঃ। আদি ৭।১১

করিয়াছিলেন।[৯] কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর নিহত বীরগণের উদকক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। বীরপত্নীগণ মিলিত হইয়া স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা এবং অপরাপর কুটুম্বগণের উদ্দেশে গঙ্গোদকে তর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রেততর্পণ—মৃত্যুর সম্বৎসর-মধ্যে যে তর্পণ করা হয়, তাহার নাম প্রেততর্পণ। উল্লিখিত তর্পণ প্রেততর্পণেরই অন্তর্গত।[১০]

শ্রাদ্ধের ফল—শ্রাদ্ধের মুখ্য ফল যদিও পিতৃতৃপ্তি, কিন্তু তাহাতে অনুষ্ঠাতার আরও কতকগুলি কল্যাণ সংসাধিত হয় বলিয়া শাস্ত্রের অভিমত। পিতৃলোকের তৃপ্তির ফলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা উৎকৃষ্ট সন্তান, অটুট স্বাস্থ্য এবং প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়া থাকেন। সর্ব্ববিধ বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা পরম শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারেন। পিতৃপূজনে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। পিতৃলোকের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ দানের নানাবিধ প্রশংসাবাক্য অনুশাসনপর্ব্বে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে।[১১]

শ্রদ্ধার প্রাধান্য—শ্রদ্ধাবর্জ্জিত দান পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না, পরন্তু দাতারও তাহাতে অকল্যাণ হইয়া থাকে। অশ্রদ্ধা ও অসূয়ার সহিত পিতৃগণকে কিছু দান করিতে গেলে তাহা অসুরেন্দ্রের ভাগে পড়ে। অতএব সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সশ্রদ্ধ শুচিতার যেন অভাব না হয়।[১২]

দান শ্রাদ্ধের অঙ্গ—মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধার সহিত যাহা দান করা হয়, তাহাতেই প্রতিগ্রহীতার তৃপ্তি পিতৃগণকেও তৃপ্ত করিয়া থাকে। দান শ্রাদ্ধের অঙ্গস্বরূপ। উপযুক্ত পাত্রে দান করিলে পিতৃলোকের সন্তোষ

৯ তর্পয়িত্বা পিতামহান্। আদি ২১৪।১২

১০ তে সমাসাদ্য গঙ্গাস্তু শিবাং পুণ্যজলোচিতাম্।

* * *

সুহৃদাঞ্চাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ প্রচক্রুঃ সলিলক্রিয়াঃ ॥ স্ত্রী ২৭।১-৩

১১ যে চ শ্রাদ্ধানি কুর্ব্বন্তি তিথ্যাং তিথ্যাং প্রজার্থিনঃ।
সুবিশুদ্ধেন মনসা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ইত্যাদি। শা ১১০।২০। শা ৩৪৫।২৬, ২৭
নিত্যশ্রাদ্ধেন সন্ততিঃ। ইত্যাদি। অনু ৫৭।১২। অনু ৬৩।১৫। অনু ৯২।২০

১২ অসূয়তা চ যদ্দত্তং যচ্চ শ্রদ্ধাবিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বং তদসুরেন্দ্রায় ব্রহ্মা ভাগমকল্পয়ৎ ॥ অনু ৯০।২০

জন্মিয়া থাকে। হাতী, ঘোড়া, গরু, ভূমি, অন্ন প্রভৃতি মৃতের সদ্গতি-কামনায় সৎপাত্রে দান করিতে হয়।[১৩]

নিমির সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতে শ্রাদ্ধপ্রথা প্রচলিত—অনেকের ধারণা এই যে, দত্তাত্রেয়ঋষির পুত্র নিমি প্রথমতঃ শ্রাদ্ধবিধির প্রবর্ত্তন করেন। মহাভারতের আখ্যায়িকা এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। নিমির পুত্র শ্রীমান্ পরিণত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নিমি অমাবস্যাতিথিতে সাতজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সভোজ্য ফলমূলের সহিত ব্রাহ্মণগণকে অলবণ শ্যামাকান্ন দান করেন। তারপর শ্রীমানের নাম-গোত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণাগ্র পবিত্র কুশোপরি তদুদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। দানের পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"পিত্রাদির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবার শাস্ত্র আছে, কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ করিবার ত কোন শাস্ত্র নাই। মুনিগণ কখনও এরূপ আচরণ করেন নাই। ব্রাহ্মণগণ নিশ্চয়ই অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের জন্য আমাকে অভিসম্পাত করিবেন"। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষি অত্রিকে স্মরণ করিলেন। অত্রি উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি আশ্বস্ত হও, তোমার আচরণ অশাস্ত্রীয় নহে। স্বয়ং স্বয়ম্ভূ এইপ্রকার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বয়ম্ভূ ব্যতীত অপর কেহ শ্রাদ্ধবিধির প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না"। তাঁহার সান্ত্বনাবাক্যে মহর্ষি নিমি প্রকৃতিস্থ হইলেন।[১৪]

কুশোপরি পিণ্ড-স্থাপনের ব্যবস্থা—মহারাজ শান্তনুর মৃত্যুর পর ভীষ্মদেব গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বার) তাঁহার শ্রাদ্ধশান্তি সমাধা করিয়াছিলেন। এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদেয় পিণ্ড কুশোপরি স্থাপন করিতে হয়। ভীষ্ম পিণ্ডদান করিতে উদ্যত হইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা হস্ত প্রসারণ করিয়া যেন পিণ্ড প্রার্থনা করিতেছেন। ভীষ্মদেব শাস্ত্রবিধান-অনুসারে কুশের উপরেই পিণ্ড দিয়াছিলেন, পিতার হাতে দেন নাই। এই ব্যবহারে তাঁহার পিতৃগণ অতীব সন্তোষ লাভ করেন।[১৫]

১৩ আশ্র ১৪ শ অঃ।

১৪ অনু ৯১ তম অঃ।

১৫ পিতা মম মহাতেজাঃ শান্তনুর্নিধনং গতঃ।
তস্য দিৎসুরহং শ্রাদ্ধং গঙ্গাদ্বারমুপাগমম্॥ ইত্যাদি। অনু ৮৪।১১-২৩

পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ—মহারাজ পাণ্ডু লোকান্তরিত হইলে পাণ্ডবগণ, কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম এবং পাণ্ডুর অপরাপর বন্ধুগণ শাস্ত্রবিধানানুসারে শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য সম্পন্ন করেন। সেই উপলক্ষ্যে হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার রত্ন এবং গ্রামাদি দান করা হয়।[১৬]

বিচিত্রবীর্য্যের শ্রাদ্ধ—বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পরে ভীষ্মদেব যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধশান্তি করাইয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ ঋত্বিগ্‌গণের সহায়তায় তাঁহার মহিষীগণ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।[১৭]

দানে শ্রাদ্ধসিদ্ধি—মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি-কামনায় যাহা কিছু দান করা হয়, তাহাই শ্রাদ্ধের অন্তর্গত। মহাযুদ্ধের অবসানে যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতিবান্ধবগণের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ দান করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও সেই সময়ে পুত্রদের তৃপ্তি-কামনায় বিবিধ উপকরণযুক্ত অন্ন, গরু এবং নানাবিধ ধনরত্ন দান করেন। যুধিষ্ঠির হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে নানাবিধ ধনরত্ন এবং বস্ত্রাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। যে-সকল নির্ব্বান্ধব বীর মহাযুদ্ধে হত হন, তাঁহাদেরও প্রত্যেকের সদ্‌গতিকামনায় যুধিষ্ঠির বিবিধ দান করিয়াছিলেন। সভানির্ম্মাণ, প্রপা এবং তড়াগোৎসর্গ করিয়া সুহৃদ্‌বর্গের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সকলের শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করিয়া যুধিষ্ঠির আপনাকে কৃত-কৃত্য বোধ করিতে লাগিলেন।[১৮]

মহাযুদ্ধে নিহত বীরগণের শ্রাদ্ধ—মহাযুদ্ধের পর বিদুর নিহত ব্যক্তিদের প্রেতকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন।[১৯]

---

১৬ পিতুর্নিধনমাবেদয়ন্তস্তস্যৌর্দ্ধদেহিকং ন্যায়তশ্চ কৃতবন্তঃ। আদি ৯৫।৬৮
ততঃ কুন্তী চ রাজা চ ভীষ্মশ্চ সহ বন্ধুভিঃ।
দদুঃ শ্রাদ্ধং তদা পাণ্ডোঃ স্বধামৃতময়ং তদা॥ ইত্যাদি। আদি ১২৮।১,২

১৭ ভীষ্মঃ শান্তনবো রাজা প্রেতকার্য্যাণ্যকারয়ৎ। ইত্যাদি। আদি ১০১।১১। আদি ১০২।৭২, ৭৩। আদি ১০৩।১

১৮ শা ৪২ শ অঃ।
মহাদানানি বিপ্রেভ্যো দদতামৌর্দ্ধদেহিকম্। ইত্যাদি। অশ্ব ১৪।১৫, ১৬

১৯ পুত্রাণামথ পৌত্রাণাং পিতৄণাঞ্চ মহীপতে।
আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বেষাং প্রেতকার্য্যাণি কারয়॥ স্ত্রী ৯।৭

মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকৃত শ্রাদ্ধ—মহাপ্রস্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির তাঁহার মাতুল, বাসুদেব, বলরাম এবং অন্যান্য যদুবীরগণের শ্রাদ্ধক্রিয়া শাস্ত্রীয় পদ্ধতি-অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বাসুদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে তিনি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, নারদ, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে নানা বস্তু দান করিয়াছিলেন। বাসুদেবের নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক মহর্ষিগণকে স্বাদু ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। রত্ন, বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব, রথ, স্ত্রী প্রভৃতি শতশত দ্রব্য মৃত ব্যক্তিদের তৃপ্তির নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত শ্রাদ্ধে ভোজ্য ও দানীয় নানা দ্রব্য পাইয়া বিপ্রকুল পরম তুষ্টি লাভ করেন।[২০]

বৃষ্ণিবংশে শ্রাদ্ধকৃত্য—বজ্র-প্রমুখ বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের জীবিত পুরুষ এবং মহিলাগণ তাঁহাদের বংশের মৃত ব্যক্তিদের যথারীতি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।[২১]

মাতামহ ও মাতুল কর্ত্তৃক অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ—মাতামহ বসুদেব এবং মাতুল শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ খুব ভালরূপেই করিয়াছিলেন। কয়েক সহস্র ব্রাহ্মণকে উত্তম ভোজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নানাবিধ দানে পরম আপ্যায়িত করা হয়।[২২]

মৃতভ্রমে জীবিতের শ্রাদ্ধ—জতুগৃহ হইতে সমাতৃক পাণ্ডবদের পলায়নের পর, তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।[২৩]

আত্মশ্রাদ্ধ—পরিণত বয়সে প্রব্রজ্যাগ্রহণ-কালে প্রথমতঃ পিত্রাদির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ, তর্পণ ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়া আত্মশ্রাদ্ধ করিবারও ব্যবস্থা আছে। জীবিত ব্যক্তি নিজেই আপনার উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান করিয়া শ্রাদ্ধ করেন। মৃত্যুর পর তিনি সেই শ্রাদ্ধজনিত শুভ ফল প্রাপ্ত হন, ইহাই

২০ ইত্যুক্ত্বা ধর্ম্মরাজঃ স বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মাতুলস্য চ বৃদ্ধস্য রামাদীনাং তথৈব চ॥ ইত্যাদি। মহাপ্র ১।১০-১৪

২১ ততো বজ্রপ্রধানাস্তে বৃষ্ণ্যন্ধককুমারকাঃ।
সর্ব্বে চৈবোদকং চক্রুঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মহাত্মনঃ॥ ইত্যাদি। মৌ ৭।২৭-৩২

২২ এতচ্ছ্রুত্বা তু পুত্রস্য বচঃ শূরাত্মজস্তদা।
বিহায় শোকং ধর্ম্মাত্মা দদৌ শ্রাদ্ধমনুত্তমম্॥ ইত্যাদি। অশ্ব ৬২।১-৬

২৩ এবমুক্ত্বা ততশ্চক্রে জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
উদকং পাণ্ডুপুত্রাণাং ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ॥ আদি ১৫০।১৪

শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থ-গ্রহণের সময় গান্ধারীর ও নিজের শ্রাদ্ধ স্বয়ং সম্পন্ন করেন।[২৪]

ধৃতরাষ্ট্রাদির শ্রাদ্ধ—মহর্ষি নারদের মুখে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীর দেহপরিত্যাগের সংবাদ জানিয়া পাণ্ডবগণ যথাবিহিত অশৌচাদি পালন-পূর্ব্বক গঙ্গাদ্বারে তাঁহাদের ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য সমাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীর সদ্‌গতির উদ্দেশ্যে প্রভূত স্বর্ণ, রজত, গো, যান, আচ্ছাদন, শয্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে দান করেন।[২৫]

উল্লিখিত উদাহরণগুলি হইতে বুঝা যায়, তৎকালে শ্রাদ্ধের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সকলেই স্বীকার করিতেন। প্রত্যেক গৃহী শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-অনুসারে প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করিতেন। উদাহরণগুলি রাজপরিবারের; সুতরাং দান-বাহুল্যের বর্ণনা রহিয়াছে। সাধারণ সমাজেও সেইরূপ ছিল, তাহা বলা যায় না। প্রত্যেকেই আপন আপন সামর্থ্য-অনুসারে ব্যয় করিতেন। 'ব্রাহ্মণাদি-পরীক্ষা' প্রকরণ হইতে তাহা জানা যায়।

শ্রাদ্ধের প্রধান ফল—শ্রাদ্ধের নানাবিধ ফলশ্রুতি থাকিলেও পিতৃ-লোকের পরিতৃপ্তি এবং আনুষঙ্গিক আত্মতৃপ্তিই প্রধান ফল, অপর ফলকীর্ত্তন প্রাসঙ্গিকমাত্র।[২৬]

নিত্যশ্রাদ্ধ—প্রত্যহ তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নপ্রভৃতি, জল, দুগ্ধ, মূল বা ফলের দ্বারা প্রত্যহ পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবে।[২৭]

প্রশস্ত কাল—শুক্লপক্ষ অপেক্ষা শ্রাদ্ধাদিতে কৃষ্ণপক্ষ প্রশস্ত; কৃষ্ণপক্ষেও পূর্ব্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণের প্রশস্ততা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত তিথি অমাবস্যা।[২৮]

২৪ এবং স পুত্রপৌত্রাণাং পিতৃণামাত্মনস্তথা।
গান্ধার্য্যাশ্চ মহারাজ প্রদদাবৌর্দ্ধদেহিকম্॥ আশ্র ১৪।১৫

২৫ দ্বাদশেঽহনি তেভ্যঃ স কৃতশৌচো নরাধিপঃ।
দদৌ শ্রাদ্ধানি বিধিবদ্দক্ষিণাবন্তি পাণ্ডবঃ॥ ইত্যাদি। আশ্র ৩৯।১৬-২০

২৬ পিতরঃ কেন তুষ্যন্তি মর্ত্ত্যানামল্পচেতসাম্। ইত্যাদি। অনু ১২৫।৭০-৭৩

২৭ কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন চ।
পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি পিতৄণাং প্রীতিমাহরন্॥ অনু ৯৭।৮

২৮ মাসার্দ্ধে কৃষ্ণপক্ষস্য কুর্য্যান্নির্ব্বপণানি বৈ। অনু ৯২।১৯
দৈবং পৌর্ব্বাহ্ণিকে কুর্য্যাদপরাহ্ণে চ পৈতৃকম্। অনু ২৩।২

নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ—সদ্ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে শ্রাদ্ধ করা শাস্ত্রবিহিত। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সমাগম, দধি, ঘৃত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্যের প্রাপ্তি, অমাবস্যা-তিথি, আরণ্য-মাংসের প্রাপ্তি প্রভৃতি নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধের নিমিত্তরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।[২৯]

গুণবান্ অতিথির সমাগমে শ্রাদ্ধ—উতঙ্কোপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে, গুরুপত্নীর আদেশ-অনুসারে উতঙ্ক পৌষ্যরাজার নিকট উপস্থিত হইলে পৌষ্য বলিলেন—"ভগবন্, সচরাচর উপযুক্ত পাত্র দুর্লভ, আপনি গুণবান্ অতিথি, সুতরাং ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি শ্রাদ্ধ করিতে চাই"।[৩০] পরে শ্রাদ্ধীয় অন্নের অশুচিতার জন্য উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। মহাভারতে সুযোগ্য অতিথির সমাগমে শ্রাদ্ধের ইহাই একমাত্র উদাহরণ।

কাম্য শ্রাদ্ধ—বিভিন্ন ফলের কামনায় যে-সকল শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাদের সংজ্ঞা 'কাম্য শ্রাদ্ধ'। তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতির বিশেষ-বিশেষ যোগে শ্রাদ্ধকর্ত্তার বিশেষ-বিশেষ ফল প্রাপ্তি হয়।

কার্ত্তিকে গুড়ৌদন-দান—রেণুক-দিগ্গজ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ-পক্ষের অষ্টমীতিথিতে যদি অশ্লেষা-নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে পিতৃলোকের উদ্দেশে গুড়মিশ্রিত অন্ন দান করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।[৩১]

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার প্রশস্ততা—কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথি শ্রাদ্ধবিষয়ে প্রশস্ত। বনপ্রবেশের পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র সেই তিথিতে ভীষ্মাদির কাম্য শ্রাদ্ধ করেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি প্রভূত ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন।[৩২]

গজচ্ছায়া-যোগ—ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষে মঘা-নক্ষত্রের যোগে গজচ্ছায়া-

যথা চৈবাপরঃ পক্ষঃ পূর্ব্বপক্ষাদ্বিশিষ্যতে।
তথা শ্রাদ্ধস্য পূর্ব্বাহ্লাদপরাহ্নো বিশিষ্যতে॥ অনু ৮৭।১৯

২৯ শ্রাদ্ধস্যঃ ব্রাহ্মণঃ কালঃ প্রাপ্তং দধি ঘৃতং তথা।
সোমক্ষয়শ্চ মাংসঞ্চ যদারণ্যং যুধিষ্ঠির॥ অনু ২৩।৩৪

৩০ ভবাংশ্চ গুণবানতিথিস্তদিচ্ছে শ্রাদ্ধং কর্ত্তুম্। আদি ৩।১১৪

৩১ কার্ত্তিকে মাসি চাশ্লেষা বহুলস্যাষ্টমী শিবা। ইত্যাদি। অনু ১৩২।৭, ৮

৩২ ইত্যুক্তে বিদুরেণাথ ধৃতরাষ্ট্রোঽভিনন্দ্য তান্।
মনশ্চক্রে মহাদানে কার্ত্তিক্যাং জনমেজয়॥ ইত্যাদি। আশ্র ১৩।১৫। আশ্র ১৪শ অঃ।

ামক প্রশস্ত শ্রাদ্ধীয় যোগ হয়। সেই যোগে দক্ষিণমুখ হইয়া অষ্টম মুহূর্ত্তে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে।[৩৩]

হস্তীর ছায়ায় শ্রাদ্ধ—হস্তীর কর্ণ-পরিবীজিত স্থানে তাহারই ছায়ায় বসিয়া শ্রাদ্ধ করিলে বহু বৎসরেও সেই শ্রাদ্ধের ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।[৩৪]

তিথিবিশেষে ফল—পিতৃযজ্ঞ যশ এবং সন্ততিবর্দ্ধক। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, সর্প, রক্ষঃ, পিশাচ, কিন্নর প্রভৃতি সকলকেই পিতৃযজ্ঞ করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। তিথিবিশেষে কাম্য শ্রাদ্ধের ফলকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে ভীষ্মদেব বলিয়াছেন, প্রতিপদ্ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট ভার্য্যা লাভ হয়। এইরূপে দ্বিতীয়ায় সুদর্শন দুহিতা, তৃতীয়ায় অশ্ব, চতুর্থীতে ক্ষুদ্র পশু, পঞ্চমীতে বহু পুত্র, ষষ্ঠীতে দিব্য কান্তি, সপ্তমীতে প্রচুর শস্য, অষ্টমীতে বাণিজ্যে উন্নতি, নবমীতে একখুর অসংখ্য পশু, দশমীতে গোসম্পৎ, একাদশীতে উৎকৃষ্ট বস্ত্র পাত্র প্রভৃতি এবং ব্রহ্মবর্চ্চস্বী বহু পুত্র, দ্বাদশীতে নানাবিধ ধনরত্ন, ত্রয়োদশীতে জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠতা এবং চতুর্দ্দশীতে যুদ্ধনৈপুণ্য লাভ হয়। পরন্তু চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করিলে যুবক পুত্রাদির মৃত্যুরূপ অনিষ্টও হইয়া থাকে। অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীকে বাদ দিয়া দশমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে পাঁচটি তিথি, তাহা শ্রাদ্ধের পক্ষে অতিশয় প্রশস্ত।[৩৫]

নক্ষত্রবিশেষে ফল—নক্ষত্রবিশেষেও কাম্য শ্রাদ্ধের বিশেষ-বিশেষ ফল ভীষ্ম কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যম শশবিন্দুর নিকট নাক্ষত্রিক কাম্য শ্রাদ্ধের ফলাফল অতি প্রাচীন কালে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কৃত্তিকা নক্ষত্রযোগে শ্রাদ্ধ করিলে সুস্থ শরীরে পুত্রপৌত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। এইরূপে রোহিণীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অপত্য, মৃগশিরায় তেজস্বিতা, আর্দ্রানক্ষত্রে ক্রূরকর্ম্মে আসক্তি, পুনর্ব্বসুতে কৃষিকর্ম্মে সমুন্নতি, পুষ্যাতে পুষ্টি, অশ্লেষাতে সুপণ্ডিত পুত্র, মঘাতে কুলশ্রেষ্ঠতা, পূর্ব্বফল্গুনীতে সুভগত্ব, উত্তরফল্গুনীতে অপত্য, হস্তানক্ষত্রে সর্ব্ববিষয়ে সফলতা,

---

৩৩ শ্রূয়তাং পরমং গুহ্যং রহস্যং ধর্ম্মসংহিতম্।
পরমান্নেন যো দদ্যাৎ পিতৄণামৌপহারিকম্॥ ইত্যাদি। অনু ১২৬।৩৫-৩৭

৩৪ ছায়ায়াং করিণঃ শ্রাদ্ধং তৎকর্ণপরিবীজিতে। বন ১৯৯।১২১

৩৫ অনু ৮৭ তম অঃ।

চিত্রায় সুদর্শন পুত্র, স্বাতীতে বাণিজ্যের উন্নতি, বিশাখাতে বহুপুত্রতা, অনুরাধা নক্ষত্রে ঐশ্বর্য্য, জ্যেষ্ঠায় আধিপত্য, মূলাতে নীরোগতা, পূর্ব্বাষাঢ়ায় উত্তম যশ, উত্তরাষাঢ়ায় শোকরাহিত্য, অভিজিন্নক্ষত্রে মহতী বিদ্যা, শ্রবণায় পরলোকে সদ্গতি, ধনিষ্ঠায় রাজ্য, শতভিষায় চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষতা, পূর্ব্বভাদ্রপদে বহুসংখ্যক ছাগল ও মেষ, উত্তরভাদ্রপদে গোসম্পৎ, রেবতীতে বহুবিত্ততা, অশ্বিনীনক্ষত্রে অশ্ব এবং ভরণীতে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়।[৩৬]

মঘাত্রয়োদশী—সনৎকুমার-কথিত পিতৃগাথাতে ত্রয়োদশীশ্রাদ্ধে মঘা-নক্ষত্রের যোগের অতিশয় প্রশস্ততা কীর্ত্তিত হইয়াছে। দক্ষিণায়নে মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে সর্পিঃসংযুক্ত পায়সের দ্বারা, ছাগমাংসের দ্বারা কিংবা লালবর্ণ শাকের দ্বারা যিনি শ্রদ্ধার সহিত পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তিনি ভাগ্যবান্। মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে কুঞ্জরচ্ছায়া-যোগে পিতৃগণ শ্রাদ্ধপ্রাপ্তির আশা করিয়া থাকেন।[৩৭]

গয়াশ্রাদ্ধ (অক্ষয় বট)—গয়াশ্রাদ্ধও পিতৃলোকের পরম আকাঙ্ক্ষিত। সেখানে একটি বটবৃক্ষ পিতৃলোকের অনন্ত তৃপ্তির সাক্ষী। পিতৃগণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন যে, "আমাদের সন্ততিসংখ্যা বর্দ্ধিত হউক, তাহাদের মধ্যে হয়ত কেহ গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে"। এই বচনে গয়াশ্রাদ্ধের প্রশস্ততা সূচিত হইতেছে।[৩৮]

শ্রাদ্ধীয় পদ্ধতি সম্বন্ধেও মহাভারতে অনেক কিছু কথিত হইয়াছে।

প্রশস্ত দ্রব্য—ঘৃত, তিল, উৎকৃষ্ট তণ্ডুল, মধু, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রশস্ত।[৩৯]

অগ্নৌকরণ—পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদানের পূর্ব্বে অগ্নিদেবের উদ্দেশে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের কিয়দংশ দান করিতে হয়; তাহার নাম 'অগ্নৌকরণ'।

---

৩৬ অনু ৮৯ তম অঃ।

৩৭ গাথাশ্চাপ্যত্র গায়ন্তি পিতৃগীতা যুধিষ্ঠির।
সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা মহ্যভ্যভাষত॥ ইত্যাদি। অনু ৮৮।১১-১৩

৩৮ এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ॥
যত্রাসৌ প্রথিতো লোকেষক্ষয্যকরণো বটঃ॥ অনু ৮৮।১৪

৩৯ পাত্রমৌদুম্বরং গৃহ্য মধুমিশ্রং তপোধন। অনু ১২৫।৮২
পরমান্নেন যো দদ্যাৎ পিতৃণামৌপহারিকম্। অনু ১২৬।৩৫
তিলোদকঞ্চ যো দদ্যাৎ পিতৃণাং মধুনা সহ। অনু ১২৯।১১

ব্রহ্মরাক্ষসাদি বিঘ্নকর্ত্তৃগণের প্রভাব অগ্নৌকরণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইয়া থাকে। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের উদ্দেশে যথাক্রমে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সাবিত্রীজপ—প্রত্যেক পিণ্ডের উপর সাবিত্রীমন্ত্র জপ করিতে হয়। 'সোমায় পিতৃমতে' ইত্যাদি মন্ত্র অবশ্য পাঠ্য।[৪০]

পিণ্ডত্রয়ের বিসর্জ্জনপ্রণালী—পিণ্ডত্রয়ের মধ্যে পিতৃপিণ্ড জলে বিসর্জ্জন করিতে হয়। ঐ পিণ্ড চন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে ; চন্দ্র পিতৃগণকে আপ্যায়িত করেন। মধ্যম পিণ্ড (পিতামহপিণ্ড) পুত্রকামা পত্নীকে দিতে হয়। পিতামহের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পিণ্ডের ভোজনে পত্নী উৎকৃষ্ট পুত্রসন্তানের জননী হন। প্রপিতামহের পিণ্ড অগ্নিতে আহুতি দিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।[৪১]

শ্রাদ্ধে সংযম—শ্রাদ্ধকর্ত্তা এবং শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণ সংযম ও শ্রদ্ধার সহিত কাজ করিবেন। শ্রাদ্ধদিনে এবং তৎপূর্ব্বদিনে স্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ।[৪২]

মৎস্য-মাংসাদি নিবেদন—শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যসমূহের মধ্যে মৎস্যমাংসও প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[৪৩]

বিভিন্ন প্রাণীর মাংসে তৃপ্তি—তিল, ব্রীহি, যব, মাষ, ফল, মূল প্রভৃতি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ এক মাস তৃপ্ত থাকেন। শ্রাদ্ধে তিলেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য। মৎস্যে পিতৃগণ দুই মাস পরিতৃপ্ত থাকেন। মেষমাংসে তিন মাস, শশমাংসে চারি মাস, ছাগমাংসে পাঁচ মাস, বরাহমাংসে ছয় মাস, শাকুলমাংসে সাত মাস, পার্ষতমাংসে আট মাস, রৌরবমাংসে নয় মাস, গবয়মাংসে দশ মাস, মহিষমাংসে এগার মাস, গব্যে সম্বৎসর, পায়স এবং সর্পিতেও সম্বৎসর তৃপ্ত থাকেন। বাধ্রীণসমাংসের তৃপ্তি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। গণ্ডারের মাংসে অনন্ত তৃপ্তি। কালশাক, লালশাক, এবং

---

৪০ সহিতাস্তাত ভোক্ষ্যামো নিবাপে সমুপস্থিতে। ইত্যাদি। অনু ৯২।১০-১৫

৪১ পিণ্ডো হ্যধস্তাদ্ গচ্ছংস্তু অপ আবিশ্য ভাবয়েৎ।
পিণ্ডস্তু মধ্যমং তত্র পত্নী ত্বেকা সমশ্নুতে।
পিণ্ডস্তৃতীয়ো যস্তেষাং তং দদ্যাজ্জাতবেদসি॥ ইত্যাদি। অনু ১২৫। ২৫, ২৬, ৩৭-৪০

৪২ শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ পুরুষো যঃ স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ।
পিতরস্তস্য তং মাসং তস্মিন্ রেতসি শেরতে॥ ইত্যাদি। অনু ১২৫।২৪,৪১

৪৩ প্রীয়ন্তে পিতরশ্চৈব ন্যায়তো মাংসতর্পিতাঃ। অনু ১১৫।৬০

ছাগমাংস শ্রাদ্ধে অক্ষয় ফলদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। জল, মূল, ফল, মাংস অন্ন প্রভৃতি মধুসংযুক্ত হইলে পিতৃলোকের বিশেষ তৃপ্তিজনক হইয়া থাকে।[৪৪]

বর্জ্জনীয় ব্রীহ্যাদি—শ্রাদ্ধে অনেক বস্তুর বর্জ্জনীয়তা সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে। কোদ্রব (ধান্যবিশেষ), পুলক (অপুষ্ট ধান), পলাণ্ডু, লশুন শোভাঞ্জন (সজিনা), কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), গৃঞ্জন (বিষযুক্তশস্ত্রহত পশুর মাংস), গোল অলাবু, কৃষ্ণ লবণ, গ্রাম্য বরাহের মাংস, অপ্রোক্ষিত দ্রব্য, কৃষ্ণজীরা, বিড়লবণ, শীতপাকী (শাকবিশেষ), বংশকরীর প্রভৃতি অঙ্কুর, শৃঙ্গাটক, লবণ, জম্বুফল, সুদর্শন (শাকবিশেষ) প্রভৃতি দ্রব্য বর্জ্জনীয়।[৪৫]

বর্জ্জনীয় ব্যক্তি—শ্রাদ্ধভূমিতে চণ্ডাল, শ্বপচ, গৈরিকবস্ত্রধারী, কুষ্ঠী, ব্রহ্মঘ্ন, সঙ্করযোনি বিপ্র, পতিত, পতিতসংসর্গী, রজস্বলা নারী, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি ব্যক্তিদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। ইহাদের উপস্থিতিতে শুচিতা রক্ষিত হয় না।[৪৬]

অন্যবংশজ নারীর পক্কান্নাদি নিষিদ্ধ—অন্যবংশজা কোন নারীর পাককরা অন্নাদিও শ্রাদ্ধে দিতে নাই।[৪৭]

অমেধ্য দ্রব্য বর্জ্জনীয়—লঙ্ঘিত, অবলীঢ়, কলহপূর্ব্বক কৃত, অবঘুষ্ট, উচ্ছিষ্ট, ক্ষুতদূষিত, কুকুরস্পৃষ্ট, কেশকীটযুক্ত, অশ্রুজলসিক্ত ও আজ্যবিহীন দ্রব্য শ্রাদ্ধকর্ম্মে নিবেদন করিতে নাই। এইসকল বস্তু অমেধ্য, সুতরাং দৈব-কর্ম্মে ও পিতৃকর্ম্মে বর্জ্জনীয়।[৪৮]

ব্রাহ্মণ-বরণ—ব্রাহ্মণ ব্যতীত শ্রাদ্ধসিদ্ধি হয় না। পিত্র্যাদির উদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিতে হয়। ব্রাহ্মণের তৃপ্তিতেই পিতৃলোকের তৃপ্তি। দৈবকর্ম্মে যে-সকল দান করিবার ব্যবস্থা, তাহা যে-কোন ব্রাহ্মণকে দিতে বাধা নাই। কিন্তু পিত্র্যকর্ম্মে ব্রাহ্মণকে বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া বরণ করিতে নাই।

---

৪৪ অনু ৮৮ তম অঃ।

৪৫ অশ্রাদ্ধেয়ানি ধান্যানি কোদ্রবাঃ পুলকাস্তথা।
হিঙ্গুদ্রব্যেষু শাকেষু পলাণ্ডু লশুনং তথা॥ ইত্যাদি। অনু ৯১।৩৮-৪২

৪৬ চাণ্ডালশ্বপচৌ বর্জ্জ্যৌ নিবাপে সমুপস্থিতে। ইত্যাদি। অনু ৯১।৪৩, ৪৪।
অনু ৯২।১৫। অনু ২৩।৪

৪৭ সংগ্রাহ্যা নান্যবংশজা। অনু ৯২।১৫

৪৮ লঙ্ঘিতং চাবলীঢ়ঞ্চ কলিপূর্ব্বঞ্চ যৎকৃতম্। ইত্যাদি। অনু ২৩।৪-১০। অনু ৯১।৪১

ব্রাহ্মণপরীক্ষা—কুল, শীল, বয়স, রূপ, বিদ্যা, বিনয়, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে বরণ করিতে হয়।[৪৯]

দেবকৃত্যে বর্জ্জনীয় ব্রাহ্মণ—শান্তিপর্ব্বে একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে, দেবকৃত্যেও ব্রাহ্মণকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত। যে-ব্রাহ্মণ যুদ্ধ-বিগ্রহ, কৃষি, বাণিজ্য বা চাকুরী দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করেন, তিনি নিন্দনীয়। বেশ্যাসক্ত, দুশ্চরিত্র, বৃষলীপতি, ব্রহ্মবন্ধু, গায়ক, নর্ত্তক, খল, রাজপ্রেষ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শূদ্রের সমান। ইহারা দেবকৃত্যে বর্জ্জনীয়।[৫০]

দমাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বরণীয়—দম, শম, সত্য, সরলতা, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ যে ব্রাহ্মণসন্তানে থাকিবে, তিনিই পিত্র্যাদিকর্ম্মে বৃত হইতে পারেন। সংযমী, নানাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, সাবিত্রীজ্ঞ, ক্রিয়াবান্, অগ্নিহোত্রী, অচৌর, অতিথিবৎসল, অহিংস, অল্পদোষ, স্বল্পসঞ্চয়ী ব্রাহ্মণসন্তান শ্রাদ্ধে বরণীয়। যিনি জীবনের পূর্ব্বভাগে নানাবিধ দুষ্কৃতে লিপ্ত থাকিয়াও পরে আপনাকে সংশোধন করিতে পারেন, তিনিও শ্রাদ্ধকৃত্যে বরণের যোগ্য।[৫১]

পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ অতি প্রশস্ত—বিদ্যাবেদব্রতস্নাত, সদাচাররত, ত্রিণাচিকেত (তন্নামক মন্ত্রের অধ্যেতা) পঞ্চাগ্নিনিরত (গার্হপত্যাদি আবসথ্যান্ত অগ্নির পরিচর্য্যাকারী), ত্রিসুপর্ণ (চতুষ্কপর্দ্দা ইত্যাদি বহ্বৃচমন্ত্রত্রয়ের অধ্যেতা), শিক্ষাদি বেদাঙ্গবিৎ, বেদাধ্যাপক, ছন্দোগ, মাতৃপিতৃবশ্য, অন্ততঃ দশপুরুষ হইতে শ্রোত্রিয়, ধর্ম্মপত্নীনিরত, গৃহস্থব্রহ্মচারী, অথর্ব্বশিরোধ্যেতা, যতব্রত, সত্যবাদী, স্বকর্ম্মনিরত, পুণ্যতীর্থে কৃতাভিষেক, অবভৃথপ্লুত (যজ্ঞিয় স্নানের দ্বারা পবিত্রীকৃতশরীর), অক্রোধন, অচঞ্চল, ক্ষান্ত, দান্ত, সর্ব্ব-ভূতহিতে রত, এরূপ ব্রাহ্মণকে বলা হয়—'পঙ্‌ক্তিপাবন'। ইঁহারাই শ্রাদ্ধে বৃত হওয়ার উপযুক্ত। মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ যতি এবং প্রযতব্রত যে-সকল ব্রাহ্মণ

৪৯ ব্রাহ্মণান্ন পরীক্ষেত ক্ষত্রিয়ো দানধর্ম্মবিৎ।
দৈবে কর্ম্মণি পিত্র্যে তু ন্যায্যমাহুঃ পরীক্ষণম্॥ ইত্যাদি। অনু ৯০।২-৪

৫০ জ্যাকর্ষণং শত্রুনিবর্হণঞ্চ * * *।
রাজন্নেতান্ বর্জ্জয়েদ্দেবকৃত্যে॥ ইত্যাদি। শা ৬৩।১-৫

৫১ দমঃ শৌচমার্জ্জবঞ্চাপি রাজন্। ইত্যাদি। শা ৬৩।৭, ৮
চীর্ণব্রতা গুণৈর্যুক্তা ভবেয়ুর্যেঽপি কর্ষকাঃ।
সাবিত্রীজ্ঞাঃ ক্রিয়াবন্তস্তে রাজন্ কেতনক্ষমাঃ॥ ইত্যাদি। অনু ২৩।২৪-৩১

ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মে যথার্থ ক্রিয়াবান্, তাঁহাদের দৃষ্টিতেই শ্রাদ্ধক্রিয়া সফল হইয়া থাকে।[৫২]

মিত্র অথবা শত্রু বরণীয় নহে—মিত্র অথবা শত্রুকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতে নাই। অনাত্মীয় ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের উপযুক্ত পাত্র। অনর্হ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে শ্রাদ্ধের ফল সর্ব্বথা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সম্ভোজনী অতি নিন্দিত—শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে বন্ধুবান্ধব-শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতৃপ্ত করাকে বলা হয়—'সম্ভোজনী'। 'সম্ভোজনী' মহাভারতে 'পিশাচদক্ষিণা' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রাদ্ধ ত অসিদ্ধ হইবেই, পরন্তু শ্রাদ্ধকর্ত্তা পাপে লিপ্ত হইবেন। সুতরাং যাঁহার সহিত কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই, তেমন ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের যোগ্য।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের বরণ প্রশংসনীয়—দরিদ্র, নিরীহ, পবিত্রচেতা, ধর্ম্ম-বিশ্বাসী, পোষ্যবহুল, ব্রতী, তপোনিষ্ঠ, ভৈক্ষ্যচর ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধাদিতে ভোজ্য প্রভৃতি দান করিলে অনন্ত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।[৫৩]

শ্রাদ্ধাদিতে অনর্চ্চনীয় ব্রাহ্মণ—যে-সকল ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ করিতে নাই, তাহাদের কথা বলা হইতেছে। নিন্দিতকর্ম্মকর্ত্তা, বীভৎসবর্ণ, কুনখী, কুষ্ঠী, মায়াবী ক্ষাত্রবৃত্তি, বর্ণসঙ্কর, মূর্খ, নর্ত্তক, গায়ক, পরনিন্দাকারী, খল, ভ্রূণহা, যক্ষ্মী, পশুপাল, সুদব্যবসায়ী, বৈশ্যজীবী, গৃহদাহী, গরদ, জারজান্ন-ভোজী, সোমবিক্রয়ী, সামুদ্রিক, রাজভৃত্য, তৈলব্যবসায়ী, কূটকারক, পিতৃ-দ্রোহী, পুংশ্চলীপতি, অভিশস্ত, স্তেন (চোর), বেশান্তরধারী, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, শূদ্রাধ্যাপক, শস্ত্রাজীবী, মৃগয়াব্যসনী, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, চিকিৎসক, দেবল (অর্থবিনিময়ে দেবপূজক), পৌনর্ভব, কাণ, ষণ্ড, শ্বিত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয়। শ্রাদ্ধাদিতে এইসকল ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়।[৫৪] স্বর্গনরকগামি-প্রকরণে বলা হইয়াছে—পতিত,

---

৫২ ইমে তু ভরতশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ। ইত্যাদি। অনু ৯০।২৪-৩৭

৫৩ যস্য মিত্রপ্রধানানি শ্রাদ্ধানি চ হবীংষি চ।
ন প্রীণন্তি পিতৃন্ দেবান্ স্বর্গঞ্চ ন স গচ্ছতি॥ ইত্যাদি। অনু ৯০।৪১-৪৬
যেষাং দারাঃ প্রতীক্ষন্তে সুবৃষ্টিমিব কর্ষকাঃ।
উঞ্ছেষপরিশেষং হি তান্ ভোজয় যুধিষ্ঠির। ইত্যাদি। অনু ২৩।৪৯-৫৮

৫৪ শ্রাদ্ধকালে তু যত্নেন ভোক্তব্যা হ্যজুগুপ্সিতাঃ। ইত্যাদি। বন ১৯৯।১৭-১৯। শা ২৯৪।৫। অনু ৯০ তম অঃ।

জড়, উন্মত্ত, শ্বিত্রী, ক্লীব, কুষ্ঠী, যক্ষ্মী, অপস্মারী, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবলক, বৃথানিয়মধারী, সোমবিক্রয়ী, গায়ক, নর্ত্তক, যোধক, বৃষলযাজক, বৃষল-শিষ্য, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যেতা, শূদ্রাপতি, শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মভ্রষ্ট, অনগ্নি, মৃতনির্য্যাতক, পুত্রিকাপুত্র, ঋণকর্ত্তা, সুদখোর, প্রাণিবিক্রয়ী, স্ত্রীজিত, স্ত্রীপণ্যোপজীবী, বেশ্যাগামী, সন্ধ্যাবন্দনরহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয়। শ্রাদ্ধাদিতে ইহাদিগকে সর্ব্বথা বর্জ্জন করিতে হইবে।[৫৫] বর্ত্তমান যুগে এরূপ বিচার করিলে সদ্‌ব্রাহ্মণ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিবেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহাদিগকে পাওয়া সম্ভব, তন্মধ্যেই অপেক্ষাকৃত সদাচার ব্যক্তিকে বরণ করিতে হইবে। সদ্‌ব্রাহ্মণের অভাবে এখন কুশময় ব্রাহ্মণের ব্যবহার শ্রাদ্ধাদিতে চলিতেছে।

সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের ভোজনব্যবস্থা—উল্লিখিত ব্রাহ্মণপরীক্ষা-প্রকরণ হইতে বুঝা যায় যে, স্বকর্ম্মনিরত শান্ত শিষ্ট এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধীয় দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। এতদ্ব্যতীত অপর ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণেরই অধিকার নাই। সকল ক্রিয়াকর্ম্মেই ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা ছিল; পরন্তু উল্লিখিত গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছাড়া কেবল নামধারক ব্রহ্মবন্ধুকে ব্রাহ্মণের স্থানে নিযুক্ত করিলে ক্রিয়াই পণ্ড হয়।[৫৬]

সামর্থ্য-অনুসারে ব্যয়বিধান—পিতৃকৃত্যে ব্রাহ্মণপরীক্ষার কড়াকড়ি নিয়ম দেখিয়া মনে হয়, সেইরূপ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ তৎকালে নিতান্ত দুর্ল্লভ ছিলেন না। মহাভারতের বর্ণিত ক্রিয়াকাণ্ড শুধু রাজপরিবারের। সাধারণ সমাজে নিশ্চয়ই ততটা আড়ম্বর ছিল না। দানাদি কর্ম্মে রাজারাই ছিলেন মুক্তহস্ত। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রসমাজে আপন-আপন আর্থিক অবস্থার অনুরূপ ব্যয়বিধান হইত। ঋণ করিয়া এইসকল ধর্ম্মকৃত্যের অনুষ্ঠান কোন সময়েই প্রশংসার বিষয় ছিল না। কারণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে পাতকী বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।[৫৭]

---

৫৫ অত ঊর্দ্ধং বিসর্গস্য পরীক্ষাং ব্রাহ্মণে শৃণু। ইত্যাদি। অনু ২৩।১১-২২
রাজপৌরুষিকে বিপ্রে ঘাণ্টিকে পরিচারিকে। ইত্যাদি। অনু ১২৬।২৪,২৫

৫৬ তর্পয়ামাস বিপ্রেন্দ্রান্ নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগতান্। সভা ৪।৪
সর্ব্বে ব্রাহ্মণমাবিশ্য সদান্নমুপভুঞ্জতে।
ন তস্যাশ্নন্তি পিতরো যস্য বিপ্রা ন ভুঞ্জতে॥ অনু ৩৪।৭
ব্রাহ্মণেষু চ তুষ্টেষু প্রীয়ন্তে পিতরঃ সদা। অনু ৩৪।৮

৫৭ ঋণকর্ত্তা চ যো রাজন্। ইত্যাদি। অনু ২৩।২১

শ্রাদ্ধে অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণের বরণ নিন্দিত—শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণসংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল। স্পষ্টরূপে এই কথা লিখিত না থাকিলেও পরীক্ষা-প্রকরণ হইতে ব্যাসদেবের মনোভাব অনুমিত হয়। বিশেষতঃ সদ্‌ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রতিগ্রহবিমুখ। প্রতিগ্রহ ব্রহ্মতেজ বিনাশ করে, ইহাই ছিল ব্রাহ্মণদের ধারণা।[৫৮] সুতরাং অধিকসংখ্যক সদ্‌ব্রাহ্মণ লাভ করা ধনিসম্প্রদায়ের পক্ষে কষ্টেসৃষ্টে সম্ভবপর হইলেও অন্যদের পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় মহাভারত মনুর আদর্শকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে স্থান দিয়াছেন। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধে দেবপক্ষে দুইজন এবং পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণ, অথবা দেবপক্ষে একজন এবং পিতৃপক্ষেও একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়, সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিও তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দান করিবেন না। ব্রাহ্মণের সংখ্যাবাহুল্য হইলে তাঁহাদের সেবা, দেশ, কাল, শুদ্ধি, অশুদ্ধি এবং পাত্রাপাত্রবিচারের বিধান যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং শ্রাদ্ধকৃত্যে অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিতে নাই।[৫৯]

সংহিতা এবং পুরাণাদিরও এই অভিমত—সমস্ত স্মৃতিসংহিতায় ব্রাহ্মণবাহুল্যের নিন্দা দেখিতে পাই। বসিষ্ঠস্মৃতির একাদশ অধ্যায়ের দুইটি বচন পূর্ব্বোক্ত মনুবচনের সহিত অভিন্ন। মৎস্যপুরাণেও (১৬।৩১, ১৭।১৪) অনুরূপ দুইটি বচন পাওয়া যায়।

প্রাচীন শ্রাদ্ধাদি-পদ্ধতির অনাড়ম্বরতা—এইসকল শাস্ত্রবচনের আলোচনায় অনুমিত হয়, বর্ত্তমান সমাজের মত তখনকার সমাজে শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে আড়ম্বরের স্থান ছিল না এবং সমাজের নিকট মান-রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া বিপদে পড়িতে হইত না। শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে অনেকেই শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরে ব্যয়বাহুল্য করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকেন। প্রাচীন সমাজের অনাড়ম্বর সহজ ব্যাপার-পদ্ধতি সেইরূপ ছিল না।

---

৫৮ প্রতিগ্রহেণ তেজো হি বিপ্রাণাং শাম্যতেঽনঘ। অনু ৩৫।২৩
কৃষ্ণপক্ষে তু যঃ শ্রাদ্ধং পিতৃণামশ্নুতে দ্বিজঃ।
অন্নমেতদহোরাত্রাং পূতো ভবতি ব্রাহ্মণঃ॥ ইত্যাদি। অনু ১৬৩।১২-১৯

৫৯ দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্যেত বিস্তরে॥ ইত্যাদি। মনু ৩।১২৫,১২৬

শ্রাদ্ধের অধিকারী—শ্রাদ্ধের অধিকারী সম্বন্ধে মহাভারতে কোন আলোচনা নাই। কিন্তু অনুমানে বুঝা যায়, পুত্রই মুখ্যাধিকারী, তাহার পরেই পত্নীর অধিকার। একই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে তাহার নিকটসম্বন্ধী বন্ধুবান্ধবগণ পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ তাঁহার মাতুলকুলেও পুনরায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপে দুর্য্যোধনাদির উদ্দেশে তাঁহাদের বিধবা ভার্য্যাগণ শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করার পরেও ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।[৬০]

গঙ্গায় অস্থি-প্রক্ষেপ—গঙ্গাতে অস্থি প্রক্ষেপের কথা মাত্র এক জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে।[৬১]

ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ—ক্ষত্রিয়-শিষ্যও ব্রাহ্মণ-গুরুর উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি দান করিতেন। দ্রোণাচার্য্যের সদ্‌গতির নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরাদি তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।[৬২]

শ্রাদ্ধাদি দ্বারা সমাজের উপকার—শ্রাদ্ধপ্রকরণের আলোচনায় এই বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির উদ্দেশেই তাহার আত্মীয়গণ শ্রাদ্ধ করিতেন। সেই উপলক্ষ্যে নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইত। ধনিসমাজে মৃতব্যক্তির তৃপ্তিকামনায় তড়াগাদির খনন, মঠপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। শ্রদ্ধার সহিত অনাড়ম্বর শান্তভাবে এইসকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। দরিদ্র স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়াকাণ্ডে দান গ্রহণ করিতেন। প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র প্রস্তুত করিতে সমাজের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা আদর্শ হিসাবে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। সৎপ্রতিগ্রহকে যাঁহারা বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের বিদ্যা, চরিত্রবল ও বৃত্তির শুচিতা অনন্যসাধারণ ছিল। সুতরাং এইসকল ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা গৌণভাবে সমাজেরও অনেক উপকার হইত।

দায়বিভাগ

প্রথমতঃ পুত্রের অধিকার—দায়বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার-নির্ণয়ও ধর্ম্মশাস্ত্রীয় আলোচনার

৬০ স্ত্রী ২৭শ অঃ। আশ্র ১৪শ অঃ। শা ৪২শ অঃ।

৬১ সঙ্কল্প্য তেষাং কুল্যানি পুনঃ প্রত্যাগমংস্ততঃ। ইত্যাদি। আশ্র ৩৯।২২,২৩

৬২ আশ্র ১৪শ অঃ। শা ৪২শ অঃ।

অন্তর্গত। পিতার পরিত্যক্ত ধনে পুত্রেরই প্রাথমিক অধিকার। সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত সকল পুত্রেরই অধিকার সমান, শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন একভাগ বেশী পাইবেন।

জননীক্রমে ধনবিভাগে পার্থক্য—যদি সবর্ণা ভার্য্যার সংখ্যাও একাধিক হয়, তবে প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র একটি অংশ গ্রহণ করিবে, মধ্যমার পুত্র মধ্যমাংশ, অর্থাৎ প্রথমার গর্ভজাত পুত্রের অংশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন অংশ গ্রহণ করিবে। এইরূপে জননীদের পৌর্ব্বাপর্য্যে ধন-বিভাগের বিশেষত্ব সম্বন্ধে মহর্ষি মারীচকাশ্যপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিভিন্ন-জাতীয়া ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে জননীর জন্মগত বর্ণের পার্থক্যবশতঃ দায়বিভাগের বৈষম্য শাস্ত্রবিহিত।

ব্রাহ্মণের চাতুর্ব্বর্ণিক বিবাহ—ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু শাস্ত্রতঃ শূদ্রকন্যাগ্রহণ তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। শুধু প্রবৃত্তিবশে ব্রাহ্মণও সময়-সময় শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতেন।

জননীর পিতার বর্ণভেদে পুত্রের অধিকারভেদ—ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণতনয় সুলক্ষণ বৃষ, রথ প্রভৃতি যান, উৎকৃষ্ট বস্ত্র ইত্যাদি ভ্রাতাদের সহিত ভাগ না করিয়া একাই গ্রহণ করিবেন। অবশিষ্ট ধনকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহা হইতেও চারি ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত ব্রাহ্মণসন্তান ব্রাহ্মণ হইলেও জননীর অসবর্ণতার জন্য তিন অংশের মালিক হইবেন। এইরূপে বৈশ্যার গর্ভোৎপন্ন সন্তানের অংশে দুই ভাগ এবং শূদ্রাপুত্রের অংশে একভাগ পড়িবে। শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণতনয় হইলেও ব্রাহ্মণ নহেন। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা ছোট অংশে তাঁহার অধিকার। পৈতৃক ধনে তিনি দাবী করিতে পারেন না, পিতার যথেচ্ছ দানের উপর তাঁহার আপত্তি করিবার কিছু নাই। যদিও শাস্ত্রতঃ পৈতৃক ধনে তাঁহার অধিকার নাই, তথাপি পিতা দয়া করিয়া তাঁহাকে দশমাংশ দান করিবেন, ইহাই রীতি।

ব্রাহ্মণীর অধিকারবৈশিষ্ট্যে পুত্রের বিশেষ অধিকার—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের যে-সকল পুত্র জন্মে, যদিও তাঁহারা ব্রাহ্মণ, তথাপি ব্রাহ্মণের গৃহে হব্যকব্যাদি যাবতীয় বিষয়ে একমাত্র ব্রাহ্মণী-পত্নীরই অধিকার। এই জন্য তাঁহার গর্ভজাত পুত্র পিতৃধনের মোটা একটি অংশ গ্রহণ করিবেন। অতঃপর ক্ষত্রিয়ার স্থান, বৈশ্যা ভার্য্যার স্থান ক্ষত্রিয়ার পরে।

ক্ষত্রিয়ের ধনবিভাগ—ক্ষত্রিয়-বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, ও শূদ্রকন্যাতে পুত্র জন্মিলে, ক্ষত্রিয়ের সম্পত্তি আট ভাগে বিভক্ত হইবে। ক্ষত্রিয়াপুত্র চারি অংশ, বৈশ্যাপুত্র তিন অংশ এবং শূদ্রাপুত্র এক অংশ গ্রহণ করিবেন। শূদ্রাবিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শাস্ত্রবিগর্হিত। যদি প্রবৃত্তিবশে শূদ্রাকেও ভার্য্যারূপে গ্রহণ করা হয়, তবে তাঁহার গর্ভজাত সন্তানকেও একভাগ দেওয়া উচিত। যুদ্ধাদিজয়ে ক্ষত্রিয় যে ধন পাইবেন, তাহাতে শুধু সবর্ণার গর্ভজাত পুত্রের অধিকার।

বৈশ্যের ধনবিভাগ—বৈশ্যের বৈশ্যা এবং শূদ্রাপত্নীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র থাকিলে তাঁহার সম্পত্তি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে। সবর্ণাপুত্র চারি ভাগের মালিক হইবে, অবশিষ্ট এক ভাগ শূদ্রাপুত্রের অংশে পড়িবে। পরন্তু শূদ্রাপুত্রকে পিতার করুণার উপর নির্ভর করিতে হইবে, কোন দাবী খাটিবে না।

শূদ্রের ধনবিভাগ—শূদ্র অন্যজাতীয়া পত্নী গ্রহণের অধিকারী নহেন। সুতরাং সবর্ণার গর্ভজাত পুত্রগণ সমান অংশে পিতৃসম্পত্তি ভোগ করিবেন।[১]

যৌতুকধনে কুমারীর অধিকার—অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার ধনে কন্যার অধিকার।[২] মাতার যৌতুকধনে একমাত্র কুমারী কন্যারই অধিকার।

দৌহিত্রের দাবী—পুত্র-কন্যার অভাবে মৃত ব্যক্তির ধনে দৌহিত্র অধিকারী। দৌহিত্র পিতা এবং মাতামহ উভয়েরই শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়া থাকেন। পুত্র এবং দৌহিত্রের মধ্যে ধর্ম্মতঃ কোন পার্থক্য নাই।

পুত্রিকাকরণের পর ঔরসের জন্মে ধনবিভাগ—কন্যাকেই পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া সম্পত্তির অধিকার দেওয়ার পরে যদি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তির ধনের পাঁচ ভাগের দুই ভাগে কন্যার এবং তিন ভাগে পুত্রের অধিকার হইবে। কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া যদি পুনরায় দত্তক-পুত্র গ্রহণ করা হয়, তবে দত্তক দুই অংশের অধিকারী এবং কন্যা তিন অংশের অধিকারিণী হইবেন।[৩]

১ অনু ৪৭ শ অঃ।

২ কুমারো নাস্তি যেষাঞ্চ কন্যাস্তত্রাভিষেচয়। শা ৩৩।৪৫

৩ যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ॥ ইত্যাদি। অনু ৪৫।১২-১৫

পত্নীকে ধন-দানের বিধান—পত্নীকেও কিছু ধন দেওয়া ভর্ত্তার উচিত। প্রচুর ধন থাকিলেও পত্নীকে তিন সহস্র মুদ্রার বেশী ধন দেওয়া অনুচিত। স্ত্রী ভর্ত্তৃদত্ত ধন যথেচ্ছভাবে ভোগ করিতে পারিবেন। পুত্রেরা ঐ ধন গ্রহণ করিবার অধিকারী নহেন।

মাতার ধনে দুহিতার অধিকার—ব্রাহ্মণ পিতা যদি ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহকালে অথবা পরে কোন কিছু দান করেন, তবে সেই ধনে সেই কন্যার মৃত্যুর পর তদীয় দুহিতারই একমাত্র অধিকার। এইরূপ শাস্ত্রবিহিত নিয়ম অনুসারে ধন বিভাগ করিতে হয়। মন্বাদি ঋষিগণ এই বিষয়ে ব্যবস্থা স্থির করিয়া গিয়াছেন।[৪]

ধনের অতিবৃদ্ধি শাস্ত্রবিহিত নহে—গৃহস্থের পক্ষে ধনের স্তূপীকরণ শাস্ত্রবিহিত নহে। তিন বৎসর কাল পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনাদি চলিবার উপযোগী সঞ্চয় থাকিলে আর সঞ্চয় না করিয়া সৎপথে অর্থ ব্যয় করা শাস্ত্রবিহিত।[৫]

পিতৃব্যবসায়-পরিত্যাগী পিতৃধনে বঞ্চিত—পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হাতেই পড়ে, তিনি সকল ভ্রাতাকে তাঁহাদের যথার্থ প্রাপ্য অংশ বিভাগ করিয়া দিবেন, ইহাই নীতিসঙ্গত। যদি তিনি কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন, তবে তাঁহাকে রাজদ্বারে যথোচিত দণ্ডিত হইতে হয়। যদি কেহ পিতৃপুরুষের বৃত্তিব্যবসা ছাড়িয়া অসৎ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তবে তাহাকে পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিতে হয়।[৬]

অঙ্গহীনের অনধিকার—ধর্ম্মজ্ঞ এবং বদান্য হইয়াও প্রতীপের পুত্র, শান্তনুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি রাজ্য পান নাই। কারণ তাঁহার চর্ম্মরোগ (কুষ্ঠ ?) ছিল। নেত্রহীন ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্য পান নাই।[৭]

৪ ত্রিসহস্রপরো দায়ঃ স্ত্রিয়ৈ দেয়ো ধনস্য বৈ। ইত্যাদি। অনু ৪৭।২৩-২৬

৫ ত্রৈবার্ষিকাদ্ যদা ভক্তাদধিকং স্যাদ্দ্বিজস্য তু।
যজেত তেন দ্রব্যেণ ন বৃথা সাধয়েদ্ধনম্॥ অনু ৪৭।২২

৬ অথ যো বিনিকুর্ব্বীত জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যবীয়সঃ।
অজ্যেষ্ঠঃ স্যাদভাগশ্চ নিয়ম্যো রাজভিশ্চ সঃ॥ ইত্যাদি। অনু ১০৫।৭-১০

৭ উ ১৪৯ তম অঃ।

স্বোপার্জ্জিত ধনে স্বতন্ত্রতা—পিতৃসম্পত্তির সাহায্য ব্যতীত যিনি কেবল আপন ক্ষমতাবলে কোন কিছু উপার্জ্জন করেন, সেই উপার্জ্জিত ধন হইতে অপরকে ভাগ দেওয়া বা না দেওয়া তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। না দিলেও দাবী করিবার কিছু নাই।[৮]

পুত্রগণের ইচ্ছায় বিভাগে সমান-বিভাগ—অবিভক্ত ভ্রাতৃগণ পরস্পর পৃথক্‌ভাবে পিতৃসম্পত্তি ভোগ করিবার নিমিত্ত যদি পিতাকে অভিপ্রায় জানান, তাহা হইলে পিতা সকল পুত্রকেই সমান অংশের ভাগ দিবেন, কোনপ্রকার বৈষম্য-প্রদর্শন শাস্ত্রবিহিত নহে।[৯]

ভার্য্যাদির অস্বাতন্ত্র্য—ভার্য্যা, পুত্র এবং দাস—এই তিনজনই সতত পরাধীন। তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতেও নিজেদের কোন অধিকার নাই। ভার্য্যার শিল্পাদি কার্য্যের দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে ভর্ত্তাই একমাত্র অধিকারী। পুত্র যাহাই উপার্জ্জন করুন না কেন, তাহা পিতার হাতে দিবেন। দাসের উপার্জ্জিত অর্থে প্রভুর অধিকার।

শিষ্যধনে গুরুর অধিকার—শিষ্যের উপার্জ্জিত ধনে গুরুর অধিকার। যতদিন শিষ্য গুরুগৃহে থাকিবেন, ততদিন তাঁহার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি গুরুকে নিবেদন করিতে হইবে।[১০]

৮ অনুপঘ্নন্ পিতুর্দ্দায়ং জঙ্ঘাশ্রমফলোঽধ্বগঃ।
স্বয়মীহিতলব্ধন্তু নাকামো দাতুমর্হতি। অনু ১০৫।১১

৯ ভ্রাতৃ়ণামবিভক্তানামুত্থানমপি চেৎ সহ।
ন পুত্রভাগং বিষমং পিতা দদ্যাৎ কদাচন॥ অনু ১০৫।১২

১০ ত্রয় এবাধনা রাজন্ ভার্য্যা দাসস্তথা সুতঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্॥ ইত্যাদি। উ ৩৩।৬৮। আদি ৮২।২২
ত্রয়ঃ কিলেমে হ্যধনা ভবন্তি। ইত্যাদি। সভা ৭১।১

মহাভারতের সমাজ

তৃতীয় খণ্ড

রাজধর্ম্ম (ক)

শান্তিপর্ব্বের রাজধর্ম্মপ্রকরণ বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। সভাপর্ব্বের নারদীয় রাজধর্ম্ম ও কণিকের কূটনীতি, আশ্রমবাসিকপর্ব্বের ধৃতরাষ্ট্রজিজ্ঞাসা, উদ্যোগ-পর্ব্বের বিদুরনীতি প্রভৃতি প্রকরণে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সেইসকল উক্তি সঙ্কলনপূর্ব্বক মহাভারতে রাজ-ধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বিষয় অতি বিস্তৃত, এই কারণে একাধিক প্রবন্ধে রাজধর্ম্মেরই আলোচনা চলিবে। রাজ-করণ, রাজার লক্ষণ এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। মহর্ষি মনুর বচনে মহাভারতকারের শ্রদ্ধা অপরিসীম, প্রত্যেক প্রকরণেই দুই-চারিবার মনুর অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্যাসদেব সসম্ভ্রমে মনুর নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য রাজধর্ম্মপ্রণেতা প্রাচীন মুনিঋষিগণের নামও গৃহীত হইয়াছে।

রাজধর্ম্মপ্রণেতা মুনিগণ—বৃহস্পতি, বিশালাক্ষ, কাব্য (উশনাঃ), মহেন্দ্র, ভরদ্বাজ, গৌরশিরা প্রমুখ ব্রহ্মণ্য ব্রহ্মবাদী মুনিগণ রাজধর্ম্মপ্রণেতা।[১]

অরাজক সমাজের দুরবস্থা—অরাজক সমাজে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ লাগিয়াই থাকে, কেহই নিশ্চিন্তমনে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে পারেন না, বিশেষতঃ দস্যুগণ নানাপ্রকার উৎপাতের দ্বারা মানুষের ধনপ্রাণকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, সুতরাং কখনও লোকসমাজকে অরাজক অবস্থায় রাখিতে নাই।[২]

মাৎস্য-ন্যায়—অরাজক রাষ্ট্রে মাৎস্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে (জলে সবল মৎস্যেরা যেমন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মৎস্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে সেইরূপ)। প্রত্যেককেই সন্ত্রস্ত হইয়া কাল কাটাইতে হয়, নিশ্চিন্তমনে কিছুমাত্র করিবার উপায় থাকে না। কেবল 'জোর যার মুলুক তার' এই অবস্থা দাঁড়ায়। সুতরাং রাষ্ট্রকে অরাজক রাখা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।[৩]

---

১ বৃহস্পতির্হি ভগবান্ নান্যং ধর্ম্মং প্রশংসতি। ইত্যাদি। শা ৫৮।১-৩। শা ৫৬শ ও ৫৭শ অঃ।

২ অরাজকেষু রাষ্ট্রেষু ধর্ম্মো ন ব্যবতিষ্ঠতে। ইত্যাদি। শা ৬৭।৩-৮

৩ রাজা চেন্ন ভবেল্লোকে পৃথিব্যাং দণ্ডধারকঃ।
জলে মৎস্যানিবাভক্ষ্যন্ দুর্ব্বলং বলবত্তরাঃ॥ ইত্যাদি। শা ৬৭।১৬,১৭

রাজাই সমাজের রক্ষক—প্রজাদের ধর্ম্ম-আচরণের মূল একমাত্র রাজা। রাজার ভয়েই মনুষ্যসমাজ পরস্পরকে হিংসা করিতে পারে না। ধন, প্রাণ, স্ত্রী, পুত্র কিছুই রাজার অভাবে নিরাপদ থাকিত না। কেহই কোন বস্তুকে 'আমার' বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিত না। কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি রাজার সুব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে। রাজা সমাজের নিয়ন্তা। তাঁহার অভাবে মানুষের বাঁচিয়া থাকাই দুঃসাধ্য। নিয়ত উদ্বিগ্নভাবে জীবনযাপন করা মানুষের পক্ষে দুর্ব্বিষহ। রক্ষক না থাকিলে নিশ্চিন্তমনে কাল কাটাইবার সম্ভাবনা কোথায়? বিদ্যাস্নাত, ব্রতস্নাত তপস্বী ব্রাহ্মণগণ রাজার ব্যবস্থার ফলেই বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতে পারেন। রাজা না থাকিলে বর্ণসঙ্কর বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে দুর্ভিক্ষের অন্ত থাকে না। রাজশাসনের ফলেই সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে, রাজার সুশাসনের ফলে অলঙ্কারভূষিতা অবলাগণও রাজপথে চলাফেরা করিতে পারেন।[৪]

শমীকমুনি-বর্ণিত অরাজক রাষ্ট্রের ভীষণতা—ক্ষমাশীল মুনি শমীক তাঁহার পুত্র শৃঙ্গীকে বলিয়াছিলেন, অরাজক জনপদে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে কাল কাটাইতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগকে রাজা দণ্ডের দ্বারা শান্ত করিয়া থাকেন। রাজদণ্ডের ভয়ে প্রত্যেকেই যখন আপন-আপন কর্ত্তব্য ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখনই সমাজে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয়। সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্তে কেহই ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন না, রাজা হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। রাজাই যাগ-যজ্ঞের প্রবর্ত্তক। যজ্ঞের ফলে দেবতাতুষ্টি, তাহা হইতে সুবৃষ্টি, সুবৃষ্টিতে সুশস্য এবং সুশস্যে প্রজাগণের জীবনধারণ। অতএব দেখা যাইতেছে, রাজা না থাকিলে লোকস্থিতি সম্ভবপর হয় না, রাজাই সমস্তের মূল। রাজাই মনুষ্যসমাজের ধাতা। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—রাজা দশজন শ্রোত্রিয়ের সমান মান্য।[৫]

আদি রাজা বৈন্য—সূত্রাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলিয়াছেন, সত্যযুগে রাজকরণপদ্ধতি মোটেই ছিল না; কেবল ধর্ম্মভয়ে সকলে স্ব-স্ব কর্ত্তব্যে অবহিত থাকিতেন। হঠাৎ তাঁহারা মোহগ্রস্ত হইয়া লোভবশতঃ

৪ শা ৬৮ তম অঃ।

৫ অরাজকে জনপদে দোষা জায়ন্তি বৈ সদা। ইত্যাদি। আদি ৪১।২৭-৩১

…নৃপহীনঞ্চ রাষ্ট্রম্, এতে সর্ব্বে শোচ্যতাং যান্তি রাজন্। শা ২৯০।২৬

পরস্পর শ্রীকাতর ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে দেবতাগণ চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট সকল বিবরণ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা প্রথমতঃ নিখিল শাস্ত্র এবং দণ্ডনীতি প্রণয়ন করিয়া পরে নারায়ণের সহায়তায় একজন রাজাকে নির্ম্মাণ করেন। সেই রাজার নাম পৃথু, বেনের দক্ষিণ পাণি মন্থন করায় তাঁহার উৎপত্তি, সেইহেতু তাঁহাকে বৈন্যও বলা হয়।[৬]

মতান্তরে মনুই আদি রাজা—রাজকরণাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে মানবগণ পিতামহের শরণাপন্ন হন। পিতামহ পৃথিবীতে রাজপদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মনুকে আদেশ করিলেন। মনু প্রথমতঃ সেই গুরুভার বহনে অসম্মতি জানাইলেও পরে প্রজাদের অনুনয় এবং নানাবিধ কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে সম্মত হইলেন। তিনিই পৃথিবীর আদি রাজা।[৭] একই বিষয়ে দুইটি প্রাচীন উপাখ্যান বর্ণিত হইলেও উভয়েরই প্রতিপাদ্য সমান। রাজা না থাকিলে সমাজব্যবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, সেই বিষয়ে তৎকালেও রাজধর্ম্মজ্ঞ-মহলে আন্দোলন চলিত। সমাজে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মজ্ঞানে একটু শিথিলতা আসিলেই ভূপতি ব্যতীত চলিতে পারে না—ইহাই বোধ করি, উল্লিখিত উপাখ্যানের গূঢ় অর্থ।

রাজকরণ ও রাজার সম্মান—পরেও বলা হইয়াছে—পৃথিবীতে যাঁহারা উন্নতির আশা করেন, তাঁহারা প্রথমেই ভূপতিকে বরণ করিবেন; অরাজক রাষ্ট্র বাসের অনুপযুক্ত। রাজাকে ভক্তি করিবে এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আনুকূল্য করিবে। প্রজারাই যদি রাজাকে যথোচিত সম্মান না করে, তবে অপর লোক তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে থাকে। রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা অতিশয় অকল্যাণকর।[৮]

রাজনিয়োগে প্রজাসাধারণের অধিকার—এইসকল বর্ণনা হইতে আরও বুঝা যায় যে, রাজার নিয়োগব্যাপারে প্রজাসাধারণের অধিকার ছিল।

৬ নৈব রাজ্যং ন রাজাসীন্ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ।
ধর্ম্মেণৈব প্রজাঃ সর্ব্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্॥ ইত্যাদি। শা ৫৯।১৪-১০৯

৭ অরাজকাঃ প্রজাঃ পূর্ব্বং বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্। ইত্যাদি। শা ৬৭।১৭-৩২

৮ এবং যে ভূতিমিচ্ছেয়ুঃ পৃথিব্যাং মানবাঃ কচিৎ।
কুর্য্যু রাজানমেবাগ্রে প্রজানুগ্রহকারণাৎ॥ ইত্যাদি। শা ৬৭।৩৩-৩৫

নিরাপদে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিবার নিমিত্ত প্রজাগণ সম্মিলিত হইয়া রাজসুলভ গুণযুক্ত এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতেন। এই প্রথা ছিল অতি প্রাচীন।

বংশগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত—রাজসিংহাসনে বংশপরম্পরায় অধিকার অতি প্রাচীন প্রথা না হইলেও মহাভারতের সমাজে বংশগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল।

রাজা ভগবানের বিভূতিস্বরূপ—রাজার চরিত্রে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, এই বিষয়ে অসংখ্য উক্তি সঙ্কলিত হইয়াছে। উশনা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, মনু প্রমুখ রাজধর্ম্মবেত্তাদের অভিমত মহাভারতকার বহুস্থানে গ্রহণ করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে ভীষ্মের মুখে মহর্ষি আপনার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন। বিভূতিযোগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "নরগণের মধ্যে আমি নরাধিপ"। অর্থাৎ রাজাতেই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, তাই রাজা শ্রীভগবানের বিভূতিস্বরূপ।[৯]

রাজাদের সহজাত গুণ—জন্মান্তরের সুকৃতিবলে নৃপতিগণ কতকগুলি অনন্যসুলভ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া থাকেন, পরন্তু শিক্ষার দ্বারাও কতকগুলি গুণ তাঁহাদিগকে অর্জ্জন করিতে হয়। স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র, অনিল, যম, অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের প্রভৃতি দেবতাগণের শরীরের সমান উপাদানে ভগবান্ রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার তেজ অপর সকলকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয়।[১০]

চরিত্রগঠনে রাজার দায়িত্ব—রাজধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মূল। সকল প্রাণীর পদচিহ্নই যেমন হাতীর পদচিহ্নে বিলীন হইয়া যায়, অপর ধর্ম্মগুলিও সেইরূপ রাজধর্ম্মে বিলীন হইয়া যায়। রাজধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে অপর কোন ধর্ম্ম উন্নত হইতে পারে না। সুতরাং সমাজের স্থিতিবিষয়ে আপন দায়িত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া রাজা চরিত্রগঠনে মনোযোগী হইবেন।[১১]

৯ নরাণাঞ্চ নরাধিপম্। ভী ৩৪।২৭

১০ ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥ ইত্যাদি। মনু ৭।৪,৫

১১ বাহ্বায়ত্তং ক্ষত্রিয়ৈর্মানবানাং লোকশ্রেষ্ঠং ধর্ম্মমাসেবমানৈঃ। ইত্যাদি। শা ৬৩।২৪-৩০

আদর্শ রাজচরিত্র—রাজার চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে রাজধর্ম্মপ্রকরণে যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রদত্ত ভীষ্মের অসংখ্য উপদেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে সেইগুলি সঙ্কলিত হইল।

পুরুষকার—উদ্যোগ ব্যতীত কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না, সুতরাং সর্ব্বদা পুরুষকারের সেবা করিবে। কোনও আরব্ধ কর্ম্ম যদি দৈববশতঃ অসমাপ্ত থাকে, তথাপি সন্তাপ করিতে নাই, পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে সেই কার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান হইবে।

সত্যনিষ্ঠা—সত্যই কার্য্যসিদ্ধির প্রধান সাধন, বিশেষতঃ রাজাদের পক্ষে। সত্যনিষ্ঠ নৃপতি ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন। শৌর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি গুণযুক্ত নৃপতি কখনও শ্রীভ্রষ্ট হন না।

মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মধ্যম পন্থা অবলম্বন—রাজা যদি মৃদুস্বভাব হন, তবে প্রজাগণ তাঁহাকে বেশী গ্রাহ্য করে না; আর অতিশয় তীক্ষ্ণস্বভাব হইলেও প্রজারা উদ্বিগ্ন হয়। সুতরাং তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবেন। রাজা বসন্তসূর্য্যের মত যথোচিত মৃদুত্ব ও তীক্ষ্ণত্ব অবলম্বন করিবেন। প্রজাগণ সত্যবাদী ধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতির অনুরক্ত হইয়া থাকে।

ব্যসন-পরিত্যাগ—সর্ব্বপ্রকার ব্যসন হইতে রাজা দূরে থাকিবেন। নিজের কোন দোষ আছে কি না, সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিবেন এবং যত্নের সহিত চরিত্র সংশোধন করিবেন।

প্রজাহিতের নিমিত্ত গর্ভিণীধর্ম্মাবলম্বন—গর্ভিণী যেরূপ গর্ভস্থ সন্তানের হিতের নিমিত্ত আপনার প্রিয় বস্তু ত্যাগ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না, রাজাও সেইরূপ প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধনকেই আপনার ব্রতরূপে গ্রহণ করিবেন।

ধীরতা—কখনও ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবেন না, ধীর এবং যুক্তদণ্ড পুরুষের কিছুমাত্র ভয় নাই।

ভৃত্যাদির সহিত ব্যবহারে আপন মর্য্যাদারক্ষা—ভৃত্যদের সহিত অত্যধিক ঠাট্টা-তামাসা করিতে নাই। এইরূপ করিলে ভৃত্যেরা প্রভুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া থাকে। নৃপতি যদি অতিশয় মৃদু বা পরিহাসপ্রিয় হন, তাহা হইলে প্রজা এবং অমাত্যগণ নানাপ্রকার শৈথিল্য ও অশিষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাজ্যশাসনের পক্ষে তাহা বড়ই প্রতিকূল।[১২]

১২ শা ৫৬শ অঃ।

প্রজার হিতার্থে কঠোর ত্যাগ—সতত প্রজাবর্গের হিতচিন্তায় আপনাকে লিপ্ত রাখা নৃপতির কর্ত্তব্য। রাজা সগর প্রজাদের হিতার্থে জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করেন। প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্টকেও বরণ করিতে হয়। উদ্যম থাকিলে ত্যাগের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

চাতুর্ব্বর্ণ্য-সংস্থাপন—রাজাই চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মের সংস্থাপক। ধর্ম্মসঙ্কর ও বর্ণসঙ্কর হইতে প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত।

বিচারবুদ্ধি—কাহাকেও অতিশয় বিশ্বাস করিতে নাই। আপন-বিচারে নিপুণভাবে রাজ্যরক্ষা করিতে হয়।

প্রজারঞ্জন—যাঁহার শাসনে প্রজাগণ নিরুদ্বেগে ও আনন্দে কালাতিপাত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ রাজা। দীর্ঘদর্শী প্রজারঞ্জক রাজার ঐশ্বর্য্য চিরস্থায়ী হইয়া থাকে।[১৩]

ক্ষত্রধর্ম্মের গুরুত্ব—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তাহার যথোচিত পালনে ক্ষত্রিয়গণ ইহলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত পুণ্যফল ভোগ করিয়া থাকেন। শুধু প্রজাপালনের দ্বারাই সাধু নৃপতি মোক্ষ লাভে সমর্থ হন।[১৪]

সময়ানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি—যথাকালে উপযুক্ত চরের নিয়োগ এবং দূতপ্রেরণ, যথাকালে দান, সদ্‌বৃত্ত অমৎসরী অমাত্যগণ হইতে সৎপরামর্শ-গ্রহণ, অন্যায় উপায়ে প্রজা হইতে কর গ্রহণ না করা, সাধুসংসর্গ এবং অসাধু সংস্রবের পরিত্যাগ রাজধর্ম্মের অন্তর্গত।

সামাদি নীতির প্রয়োগে কালজ্ঞতা—যথাকালে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডনীতির প্রয়োগ, অনার্য্যকর্ম্মবর্জ্জন, প্রজাপালন ও পুরগুপ্তি রাজাদের অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত। যে রাজা নিয়ত পুরুষকারে প্রতিষ্ঠিত নহেন, যিনি প্রমাদী, অতিমৃদু বা অতিতীক্ষ্ণ, তিনি কখনও নিষ্কণ্টক ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন না। অকৃতাত্ম কাপুরুষ নৃপতি রাজপদের অনুপযুক্ত।

বিশ্বস্ততা—যে-সকল কাজে রাজার ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রজাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, তেমন কিছু করা রাজার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রজাগণ যাহাতে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সুখী হয়, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।[১৫]

১৩ শা। ৫৭শ অঃ।

১৪ শা। ৬৪ তম অঃ।

১৫ শা। ৫৮শ অঃ।

প্রিয়বাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি—রাজা অপরের দুরাধর্ষ হইলেও সকলের সহিত সহাস্যবদনে মধুর ব্যবহার করিবেন। উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা, গুরুজনে দৃঢ়ভক্তি, প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে দৃষ্টি এবং জিতেন্দ্রিয়তা রাজার শিক্ষণীয় বিষয়। দর্শনার্থীর সহিত মৃদু ও ভদ্র ব্যবহার করিতে হয়।[১৬] রাজাই প্রজাদের সুখশান্তির কারণ। মহাযশা নরপতিগণ দম, সত্য ও সৌহৃদ্যের দ্বারা পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন, সুমহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শাশ্বতপদ লাভ করেন। রাজা প্রথমতঃ আপনার চিত্তকে জয় করিবেন, অজিতেন্দ্রিয় নৃপতি পরকে কখনও বশে রাখিতে সমর্থ হন না।[১৭]

শাস্ত্রাভ্যাস ও দানশীলতা—রাজা স্বয়ং বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন এবং দানশীল হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের দুঃখমোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

রাজধর্ম্ম-পরিজ্ঞান—যাড়্গুণ্য, ত্রিবর্গ ও পরম ত্রিবর্গ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে।[১৮]

কার্য্যজ্ঞতা—রাগদ্বেষ-পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ, পরলোকের কল্যাণ-কামনায় স্নেহপ্রদর্শন, নিষ্ঠুর আচরণ না করিয়া অর্থোপার্জ্জন এবং অনুদ্ধতভাবে কামোপভোগ নৃপতিগণের পক্ষে বিহিত। নৃপতি সর্ব্বদা প্রিয় বাক্য বলিবেন, শূর হইয়াও শ্লাঘাবিহীন হইবেন এবং দাতা হইয়াও অপাত্রে দান করিবেন না।

অবধানতা প্রভৃতি—অপকারীকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। কাহাকেও ঈর্ষ্যা করিতে নাই। পূজার্হের পূজন ও দম্ভপরিত্যাগ নৃপধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ। আহার-বিহারে সংযমশিক্ষা একান্ত আবশ্যক। সংযম না থাকিলে অচিরে শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। সকল কাজে সময়-অসময় জ্ঞান থাকা উচিত। যে কাজ যে সময় করিতে হইবে, তাহা তখনই করা উচিত। যিনি রাজধর্ম্মের এইসকল নিয়ম পালন করেন, তিনি ইহকালে নানাবিধ কল্যাণ উপভোগ করিয়া পরলোকে পরম আনন্দ লাভ করেন। এই অধ্যায়ে ছত্রিশটি রাজগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রধান গুণগুলি প্রদর্শিত হইল।[১৯]

১৬ গোপ্তা তস্মাদ্দুরাধর্ষঃ স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিতা। ইত্যাদি। শা ৬৭।৩৮,৩৯

১৭ রাজা প্রজানাং হৃদয়ং গরীয়ো গতিঃ প্রতিষ্ঠা সুখমুত্তমঞ্চ। ইত্যাদি। শা ৬৮।৫৯, ৬০

১৮ শা ৬৯ তম অঃ।

১৯ শা ৭০ তম অঃ।

কাম ও ক্রোধকে জয়—কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজশ্রীর সেবা করিতে হয়। যে নরপতি কাম বা ক্রোধের তাড়নায় অন্যায় অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিতান্তই কৃপার পাত্র। ধর্ম্ম এবং অর্থ হইতে তাঁহার ভ্রংশ অবধারিত। সুরক্ষক, দাতা, নিরলস এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষ স্বভাবতই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হন।

রাজধর্ম্মের অনুশাসন-অনুসারে কৃত্যসম্পাদন—অর্থশাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে অর্থবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবে, অন্যথা অর্থের বৃদ্ধি হইলেও অকস্মাৎ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অশাস্ত্রীয়ভাবে শুধু প্রজার পীড়নে রাজ্যের কল্যাণ হইতে পারে না, বরং সকলই বিনষ্ট হয়। বেশী দুধ পাওয়ার নিমিত্ত যদি কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি ধেনুর পালান ছেদন করে, তবে তাহার ভাগ্যে দুধ পাওয়া যেরূপ অসম্ভব হয়, লুব্ধ অত্যাচারী রাজাদেরও সেইরূপ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে।[২০]

পূজ্যের পূজন—নিয়ত দানশীল, উপবাসাদিব্রত-পরায়ণ, প্রকৃতিরঞ্জক রাজাকে প্রজারা শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। রাজা ধার্ম্মিকদের যথোচিত সম্মান করিবেন, তাহাতে প্রজাগণও পূজ্য ব্যক্তির পূজা করিতে শিক্ষা পায়।

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন—রাজা যমের ন্যায় দুর্বৃত্তদিগকে কঠোর দণ্ড দিবেন; অসাধুকে ক্ষমা করিতে নাই। সুরক্ষিত প্রজাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের চতুর্থাংশ পুণ্যফল রাজা ভোগ করেন, সেইরূপ প্রজার পাপের চতুর্থাংশ ফলও তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়।

অতি ধার্ম্মিক ও অতি নিরীহ রাজা ভাল নহে—অতি ধার্ম্মিক বা অতিশয় নিরীহ ব্যক্তি রাজ্যপরিচালনের অযোগ্য। শুধু করুণাতেও রাজ্য রক্ষা হয় না।

সুরক্ষক নৃপতি সকলের প্রার্থনীয়—শূর, দুষ্টের শাস্তা ও শিষ্টের রক্ষক, অনৃশংস, জিতেন্দ্রিয়, প্রকৃতিবৎসল এবং স্বজনপ্রতিপালক নৃপতিকে আশ্রয় করিয়া প্রজাগণ নিশ্চিন্তমনে কাল কাটাইতে পারেন। ভূতজগৎ যেরূপ পর্জ্জন্যের উপর নির্ভরশীল এবং পক্ষিগণ যেরূপ স্বাদুফল বৃক্ষের আশ্রয়ে থাকিতে ভালবাসে, সেইরূপ সমস্ত জীবজগৎ সুরক্ষক নৃপতির আশ্রয়ে থাকা নিরাপদ মনে করে।[২১]

২০। শা ৭১ তম অঃ।

২১। শা ৭৫ তম অঃ।

সদ্ব্যবহারে প্রজার শ্রদ্ধা-আকর্ষণ—যে নৃপতি প্রজাসাধারণের প্রতি ভাল ব্যবহার করেন না, সর্ব্বদা ভ্রূকুটীমুখে অবস্থান করেন, তিনি সকলের অপ্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। যিনি সদা সহাস্যবদন, কাহাকেও দেখিবামাত্র পূর্ব্বেই কথা বলিয়া থাকেন, সেই নরপতি প্রজার চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। মধুর বচনে সকলকেই বশীভূত করিতে পারা যায়। যিনি সুকৃত, বিনয় এবং মধুরের উপাসক, তাঁহার সমান জগতে কেহই নাই।[২২]

অতি বিশ্বাস বিপজ্জনক—রাজা সতত অপরের বিশ্বাসভাজন হইবেন, কিন্তু কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবেন না; এমন কি, পুত্রকেও অতিশয় বিশ্বাস করা অনুচিত। অবিশ্বাস রাজচরিত্রের পরম সম্পৎ।[২৩]

যথেচ্ছ ভোগ নিন্দনীয়—সকল সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, রাজা ধর্ম্মের প্রতিপালক, যথেচ্ছ ভোগ করা রাজার আদর্শ নহে। ধর্ম্মাচরণে দেবত্ব-লাভ ও অধর্ম্মে নরকভোগ নিশ্চিত। জীবজগৎ ধর্ম্মেই বিধৃত, নৃপতি ধর্ম্মের সেবক। সুতরাং যিনি ধর্ম্মরক্ষায় সমর্থ, তিনিই রাজপদ গ্রহণের উপযুক্ত। ধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতিগণ প্রভূত অর্থকাম ভোগ করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে প্রজাবৃন্দ স্বচ্ছন্দে আপন-আপন কর্ত্তব্যে লিপ্ত থাকিয়া উন্নত হইতে পারেন, প্রজার উন্নতিতেই রাজ্যের উন্নতি।[২৪]

প্রজার আনন্দ রাজার ধর্ম্মনিষ্ঠার অনুমাপক—ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে প্রজাগণও ধার্ম্মিক হয়। দুর্গত ও অনাথ ব্যক্তিগণও যখন হৃষ্ট চিত্তে বাস করিতে পারে, তখনই অনুমান করা যায় যে, রাজার আচরণে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রজাদের আনন্দ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া রাজার ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় বুঝিতে পারা যায়। যিনি মিত্রের উন্নতি, শত্রুর অবনতি, সাধুর সম্মাননা এবং অসাধুর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তিনিই ধার্ম্মিক নরপতি।

ধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র—যিনি সত্যনিষ্ঠ, আশ্রিতবৎসল, বদান্য ও দাতা, প্রজাগণ তাঁহার অনুরক্ত হইয়া থাকে। যিনি উপযুক্ত

---

২২ শা ৮৪ তম অঃ।

২৩ বিশ্বাসয়েৎ পরাংশ্চৈব বিশ্বসেচ্চ ন কস্যচিৎ।
পুত্রেষপি হি রাজেন্দ্র বিশ্বাসো ন প্রশস্যতে॥ ইত্যাদি। শা ৮৫।৩৩,৩৪

২৪ ধর্ম্মায় রাজা ভবতি ন কামকরণায় তু। ইত্যাদি। শা ৯০।৩-৭
অথ যেষাং পুনঃ প্রাজ্ঞো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ। ইত্যাদি। অনু ৬২।৪৩,৪৪

পাত্রে ভূমি দান করিয়া থাকেন, ঋত্বিক্ পুরোহিত ও আচার্য্যের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে ধর্ম্মনিষ্ঠ বলা যাইতে পারে। রাজা সাধু-অসাধুর পরিচয়, ক্ষমা, ধৃতি, মধুরভাষিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুশীলন করিবেন। অনুশীলন শিক্ষাসাপেক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অপ্রমাদ, উদ্যোগ, শুচিতা প্রভৃতি গুণ—রাজ্যশাসন সহজ নহে, তাহা সুমহান্ ভারবিশেষ। অপ্রমাদী, উদ্যোগী, বুদ্ধিমান্ নৃপতিই সেই গুরুভারবহনে সমর্থ। লোকসংগ্রহ, মধুর বচন, অপ্রমাদ ও শুচিতা নৃপতি-চরিত্রের অপরিহার্য্য গুণ। পরচ্ছিদ্রদর্শন এবং স্বচ্ছিদ্রগোপনও রাজাদের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। উল্লিখিত গুণাবলী রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক বহুধা সেবিত ও প্রশংসিত। বাসব, যম, বরুণ প্রমুখ দৈব-রাজগণ এবং অপর রাজর্ষিগণ এইসকল নিয়ম পালন করাতেই প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন।[২৫]

ধর্ম্ম, অর্থ, মিত্র প্রভৃতির ভূরিতা কাম্য—অর্থ অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—এই কথা সকল সময় মনে রাখিতে হইবে। যিনি সৎপথে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, কামচার এবং আত্মশ্লাঘানিরত, তিনি অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বুদ্ধি ও মিত্র বিষয়ে সর্ব্বদা আপনাকে অপূর্ণ মনে করিবে। এইগুলিতেই রাজাদের ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠিত। কল্যাণরত অসূয়াবিহীন জিতেন্দ্রিয় নরপতি স্রোতঃপ্রবাহে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সাগরের মত বিরাজ করেন।[২৬]

আর্য্যসেবিত কর্ম্মে রুচি—যাঁহার সুশাসনে জনপদ উন্নতিশীল, যিনি অপর রাজাদের প্রিয়, যিনি সন্তুষ্ট এবং বহুসচিবপরিবৃত, সেই পার্থিবকে দৃঢ়মূল বলিয়া জানিবে। যিনি ক্রোধকে বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার শত্রু নাই; কখনও আর্য্যজনবিদ্বিষ্ট কর্ম্মে লিপ্ত হইতে নাই, সতত কল্যাণকৃত্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। যিনি উল্লিখিত নিয়মগুলি পালন করিয়া থাকেন, তিনি নিত্য বিজয়ে প্রতিষ্ঠিত।[২৭]

গুহ্য মন্ত্রণা ও সুবিবেচনা—দক্ষ, জিতেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিমান্ পুরুষই রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ। যিনি গুহ্য মন্ত্রণা গ্রহণ করেন, যিনি সচিবপরিবৃত এবং বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্য নিষ্পন্ন করেন, তিনিই নিখিল বসুমতী শাসন করিবার উপযুক্ত পাত্র।

---

২৫ শা ৯১ তম অঃ।

২৬ শা ৯২ তম অঃ।

২৭ শা ৯৪ তম অঃ।

আলস্যত্যাগ (উষ্ট্রবৃত্তান্ত)—আলস্য সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। আলস্য প্রাণিগণের সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রতিকূল। (প্রাজাপত্যযুগে জাতিস্মর প্রকাণ্ড এক উষ্ট্র নিতান্ত অলস হইয়া নগণ্য এক শৃগাল কর্ত্তৃক কিরূপে ক্রমে ক্রমে ভক্ষিত হইয়াছিল—সেই উপাখ্যানও এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।) তীক্ষ্ণ ধীশক্তির সহিত উদ্যোগ মিলিত হইলে অসাধ্য সাধন করা যায়। সুতরাং শ্রেয়স্কাম পুরুষ কখনও অলসভাবে সময় কাটাইবেন না।[২৮]

বিনয় (সরিৎসাগর-সংবাদ)—বিনয়ীর কখনও বিপদ ঘটিতে পারে না। (সরিৎসাগর-সংবাদে বেতসোপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে যে, বেতসলতা বাতাসে নত হইয়া পড়ে, এই কারণে কখনও ভাঙ্গে না)। সুতরাং বিনয় শিক্ষা করিবে।[২৯]

সচিবের সহায়তা গ্রহণ—সচিবদের সহিত একযোগে কাজ করা উচিত। একাকী শাসন করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাঁহার ভৃত্যগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ, এবং প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তিনিই রাজ্যফল ভোগ করিতে পারেন। যে-রাজার জনপদ সমৃদ্ধ, হৃষ্ট, অক্ষুদ্র ও সৎপথাবলম্বী, সেই রাজাই নিষ্কণ্টক রাজশ্রী ভোগ করিতে সমর্থ। সন্তুষ্ট ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা যাঁহার ধনাগার সতত উপচীয়মান, তিনিই রাজ্য ভোগ করিতে পারেন।

সন্ধি-বিগ্রহাদিপরিজ্ঞান—যাঁহার রাষ্ট্রে সুবিচারের ব্যবস্থা থাকে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য চিরস্থায়ী। যিনি রাজধর্ম্ম সম্যক্ অবগত থাকিয়া সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্বর্গে অভিজ্ঞ এবং প্রজাদের মনোরঞ্জনে যত্নশীল, তিনিই রাজ্যপালনে ধর্ম্ম লাভ করিতে পারেন।[৩০]

কর্ম্মচারিনিয়োগে নিপুণতা (ঋষিসংবাদ)—অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, কিন্তু তাহাদিগকে অতিশয় প্রশ্রয় দিতে নাই। এই বিষয়ে 'ঋষি-সংবাদ' উপাখ্যানটি বর্ণিত হইয়াছে। এক দয়ালু ঋষির তপঃপ্রভাবে একটি কুকুর ক্রমশঃ শরভে পরিণত হইয়া আপন অপবাদ ক্ষালনের নিমিত্ত ঋষিকেই হনন করিতে উদ্যত হইলে ঋষি পুনরায় তাহাকে কুকুরে পরিণত করেন।[৩১]

---

২৮ শা ১১২ তম অঃ।

২৯ শা ১১৩ তম অঃ।

৩০ শা ১১৫ তম অঃ।

৩১ শা ১১৬ তম ও ১১৭ তম অঃ।

অসংযমের দোষ (গান্ধারীর উপদেশ)—দাম্ভিক পুত্র দুর্য্যোধনকে দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী রাজসভায় যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, সেইগুলিও উল্লেখযোগ্য। "অবশেন্দ্রিয় পুরুষ দীর্ঘদিন ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন না, বিজিতাত্মা মেধাবী পুরুষই রাজ্যভোগের উপযুক্ত। অসংযত অশ্ব যেমন সারথিকে বিপন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজিতেন্দ্রিয় নরপতি কামক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় পথভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। বশ্যেন্দ্রিয়, জিতামাত্য এবং অসাধুর দণ্ডদাতা নরপতি সুদীর্ঘ কাল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও দর্পকে যিনি সম্যক্ জয় করিতে পারেন, তিনিই মহীপতি হওয়ার উপযুক্ত। যিনি কামক্রোধাদি রিপুর প্রেরণায় মিথ্যা ও কপট আচরণে প্রবৃত্ত হন, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে অচিরেই ত্যাগ করেন যিনি সুহৃদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তিনি শত্রুদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।"[৩২]

আদর্শ গৃহীর সমস্ত সদ্গুণ রাজাতে থাকা চাই—শাস্ত্রবিশারদ, ধীর, অমর্ষী, শুচি, তীক্ষ্ণ, শুশ্রূষু, শ্রুতবান্, শ্রোতা, যুক্তিবিৎ, মেধাবী, ধারণাযুক্ত, ন্যায়ানুবর্ত্তী, দান্ত, প্রিয়ভাষী, ক্ষমাশীল, দানশীল, শ্রদ্ধালু, সুখদর্শন, আর্ত্তশরণ, অমাত্যপ্রিয়, অনহঙ্কার, সুখদুঃখসহিষ্ণু, সুবিবেচক, ভক্তজনপ্রিয়, সংগৃহীতজন, অস্তব্ধ, প্রসন্নবদন, ভৃত্যজনাপেক্ষী, অক্রোধন, মহচ্চিত্ত, সমুচিতদণ্ডদাতা, ধর্ম্মকার্য্যরত, চরনেত্র, প্রজাবেক্ষণতৎপর, ধর্ম্মার্থকুশল নরপতি সর্ব্বজনবাঞ্ছিত। একজন আদর্শচরিত্র গৃহীর যে-সকল সদ্গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়, তন্মধ্যে কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই। যে নৃপতি নানাবিধ বস্তুর সংগ্রহে আগ্রহশীল, মিত্রাঢ্য এবং উদ্যোগী, তিনিই রাজসত্তম।[৩৩]

সময়বিশেষে অবস্থার পরিবর্ত্তন—ময়ুর যেরূপ বিচিত্রবর্ণের বর্হ ধারণ করে, সেইরূপ ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি অবস্থা-বিবেচনায় বাহ্যিক ব্যবহার করিবেন। তীক্ষ্ণত্ব, কৌটিল্য, অভয়প্রদত্ব, সত্য ও আর্জ্জব—এইসকল গুণে একান্ত অনুরক্ত না হইয়া যিনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন, তিনিই সুখী হইতে পারেন।

৩২ উ ১২৯ তম অঃ।

৩৩ এতৈরেব গুণৈর্যুক্তো রাজা শাস্ত্রবিশারদঃ। ইত্যাদি। শা ১১৮। ১৬-২৩
সর্ব্বসংগ্রহণে যুক্তো নৃপো ভবতি যঃ সদা।
উত্থানশীলো মিত্রাঢ্যঃ স রাজা রাজসত্তমঃ॥ শা ১১৮। ২৭

যে সময়ে যে অবস্থায় থাকা হিতকর, তাহাই সেই সময়ের রূপ, অর্থাৎ দণ্ডদানকালে ক্রূরতা এবং অনুগ্রহকালে শম প্রদর্শন করিতে হয়। বহুরূপধারণে অভ্যস্ত নৃপতির কোন বিষয়ে কণামাত্র ক্ষতি হয় না।

মন্ত্রগুপ্তি—ময়ূর যেমন শরৎকালে মৌন অবলম্বন করে, সেইরূপ সতত মৌনভাবে মন্ত্র রক্ষা করিবে; গুপ্ত মন্ত্রণা কখনও প্রকাশ করিতে নাই।

স্বয়ং কার্য্যপরিদর্শনাদি—যাঁহার ক্রোধ ও হর্ষের ফল ব্যর্থ হয় না, যিনি স্বয়ং কার্য্যসমূহ পরিদর্শন করেন, আত্মপ্রত্যয়ই যাঁহার কোষাগার, নিখিল বসুন্ধরা সেই নৃপতির ধন যোগাইয়া থাকে। যাঁহার অনুগ্রহ স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, যিনি সম্যক্ বিচারের পর নিগ্রহ করিয়া থাকেন, যিনি আত্মরক্ষায় ও রাষ্ট্ররক্ষায় সতত অবহিত, তিনিই যথার্থ রাজধর্ম্মজ্ঞ।[৩৪]

শীলের মাহাত্ম্য (ইন্দ্রপ্রহ্লাদ-সংবাদ)—শীলবর্ণনাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, শীলের দ্বারা ত্রিলোক জয় করা যাইতে পারে; শীলবান্ পুরুষের অসাধ্য কিছুই নাই। মান্ধাতা এক দিনে, জনমেজয় তিন দিনে এবং নাভাগ সাত দিনে শীলের মহিমায় সম্রাট্ হইতে পারিয়াছিলেন। শীলবান্ দয়ালু পার্থিবের হাতে গুণক্রীতা বসুধা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। শীলবান্ নরপতি কখনও শ্রীভ্রষ্ট হন না। যেখানে শীল সেখানেই ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত ও শ্রীর বসতি। সুতরাং বিবেচক নরপতি প্রথমেই আপন চরিত্রকে উন্নত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। দৈত্যপতি প্রহ্লাদ শীলের সহায়তায় দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্র প্রহ্লাদকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়া শীলমাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করেন। প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—"হে বিপ্র, আমি কখনও দ্বিজগণকে অসূয়া করি না; তাঁহাদের মুখ হইতে কাব্যপ্রণীত নীতিশাস্ত্র শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া থাকি। সংকৃত ব্রাহ্মণগণ আমাকে শাস্ত্রতত্ত্ব শুনাইয়া ধন্য করেন।" আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণের পর শিষ্য গুরুর প্রসাদস্বরূপ তাঁহার শীল প্রার্থনা করিলেন। প্রহ্লাদ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত অকুণ্ঠচিত্তে সর্ব্বস্ব দান করিলেন।[৩৫]

অভয়প্রদত্ব ও প্রজাবাৎসল্য—প্রজাকে সব সময় অভয় দিবে। মনু

[৩৪] শা ১২০ তম অঃ।

[৩৫] শা ১২৪ তম অঃ।

বলিয়াছেন, রাজার চরিত্রে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষাকর্ত্তা, বহ্নি, বৈশ্রবণ ও যম এই সাত জনের গুণ থাকে। প্রজার প্রতি অনুকম্পাবশতঃ নরপতি পিতৃবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। অত্যন্ত দুর্গতকেও সস্নেহে প্রতিপালন করেন বলিয়া তিনি মাতৃস্থানীয়। অনিষ্ট নাশ করেন বলিয়া অগ্নি এবং দুষ্টের শাসন করায় তাঁহাকে যম বলা যাইতে পারে। সাধু ব্যক্তিকে অভিলষিত অর্থ দান করেন বলিয়া কুবের, ধর্ম্মোপদেশে গুরু এবং আপদ্-বিপদে রক্ষা করেন বলিয়া তিনি রক্ষক। যিনি আত্মগুণে পৌর ও জানপদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন, তাঁহার রাজ্য কখনও বিপন্ন হয় না। যিনি প্রজাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, তাঁহার সুখের সীমা নাই। যাঁহার প্রজা নিয়ত করভাবে প্রপীড়িত, সেই রাজা শীঘ্রই পরাভব প্রাপ্ত হন। যাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জ সরোবরস্থ পদ্মফুলের মত নিয়ত প্রফুল্ল ও শ্রীমান্, তিনি নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন।[৩৬] সর্ব্বদা আত্মকার্য্যে অবহিত থাকিবে। কোন কোন নরপতি হিমের ন্যায় শীতল, অগ্নির ন্যায় ক্রূর এবং যমের ন্যায় বিচারক। আবার কেহ কেহ শত্রুর মূলোৎপাটন করিতে লাঙ্গলের মত এবং দুষ্টের শাসনে বজ্রকঠোর। সকল নরপতিরই কল্যাণ অনুষ্ঠানে রত থাকা উচিত।[৩৭]

রাজা কিভাবে আপন চরিত্র গঠন করিবেন, উল্লিখিত উপদেশসমূহ হইতে তাহা জানা যায়। এতদ্ব্যতীত উদ্যোগপর্ব্বে বিদুরনীতির প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোকেই মানবধর্ম্মের বর্ণনা করা হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করা হইল না। আদর্শ নৃপতির কি কি গুণ থাকা উচিত, মন্বাদিসংহিতা, কামন্দকীয় প্রভৃতি অর্থশাস্ত্র, রামায়ণ এবং অগ্নিপুরাণাদি গ্রন্থেও তাহা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। কিন্তু একই প্রকরণে মহাভারতের ন্যায় নানাবিধ বর্ণনা অপর কোন গ্রন্থে নাই। রাজ্যে সুশৃঙ্খলা ও শান্তি বিধানের নিমিত্ত রাজাকে কঠোর কর্ত্তব্যে লিপ্ত থাকিতে হয়, আরাম ভোগ করিবার উপায় নাই; রাজপদ অতীব দায়িত্বপূর্ণ। করব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, বিচারপদ্ধতি, আত্মরক্ষা, রাজকোষের বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে মহাভারতে অনেক কথাই বলা হইয়াছে।

৩৬. মাতা পিতা গুরুর্গোপ্তা বহ্নির্বৈশ্রবণো যমঃ।
সপ্ত রাজ্ঞো গুণানেতান্মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥ ইত্যাদি। শা ১৩৯।১০৩-১১০

৩৭. ঘটমানঃ স্বকার্য্যেষু কুরু নিঃশ্রেয়সং পরম্। ইত্যাদি। শা ১৫২।২০, ২১

ধর্ম্মপথে অর্থব্যয়— রাজা সঞ্চিত অর্থ ধর্ম্মপথে ব্যয় করিবেন, বাহ্যিক ভাগের নানাবিধ উপকরণে সমৃদ্ধ হইলেও মনকে সংযত রাখিবেন।

যথাশাস্ত্র ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের ভোগ—পিতৃপিতামহের আচার পালনপূর্ব্বক সকলের সহিত যথোচিত ব্যবহার করা উচিত। ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবর্গ ভোগ করিবার কাল শাস্ত্রে নিয়মিত। কখনও তাহার ব্যতিক্রম করিতে নাই। নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা কর্ত্তব্যে অবহিত থাকিতে হয়।

শত্রুমিত্রাদির কার্য্য পরিজ্ঞান—শত্রু, মিত্র এবং উদাসীনরা (যাঁহারা শত্রুও নয় মিত্রও নয়) কি করিতেছেন, তাহা সর্ব্বদা জানিতে হইবে।

পরিণাম-চিন্তন—অল্পায়াসসাধ্য অথচ পরিণামে মহাফলপ্রদ কর্ম্ম শীঘ্রই আরম্ভ করিতে হয়। সকল কাজেই বিচক্ষণতার সহিত পরিণাম চিন্তা করা উচিত।

বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর নিয়োগ—বিশ্বস্ত নির্লোভ কর্ম্মচারীদের উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে হয়। সমাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাজ গোপন রাখিতে হয়।

রাজকুমারদের শিক্ষার ব্যবস্থা—সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ আচার্য্যদের দ্বারা কুমারদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

পণ্ডিতসংগ্রহ—সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতের মতামতের মূল্য বেশী। রাজা সহস্র মূর্খকে স্থান না দিয়া অন্ততঃ একজন পণ্ডিতকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, কারণ পণ্ডিত ব্যক্তি বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ।

সামুদ্রিক দৈবজ্ঞ পণ্ডিতের নিয়োগ—সামুদ্রিকশাস্ত্রের নিয়মানুসারে শারীরিক শুভাশুভ চিহ্নের পরীক্ষায় নিপুণ, জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী, শুভাশুভনিমিত্তজ্ঞানী দৈবজ্ঞ পণ্ডিতকে পরম সমাদরে সভায় স্থান দিবেন। যাহার পক্ষে যে কাজ উপযুক্ত, তাহাকে সেই পদে নিযুক্ত করিবেন।

দক্ষ কর্ম্মচারীর বেতনাদিবৃদ্ধি—প্রজার যাহাতে কোন পীড়ন না হয়, সতত সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন কর্ম্মচারী যদি বিশেষ দক্ষতার সহিত কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তবে সমধিক পুরস্কার ও বেতনের দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিতে হয়। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন পুরুষকে যথোচিত পুরস্কৃত করা উচিত।

রাজহিতার্থ-বিপন্ন ব্যক্তিদের পরিবারপ্রতিপালন—যাঁহারা রাজার

নিমিত্ত প্রাণ বিপন্ন করেন, তাঁহাদের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের ভার রাজাকেই গ্রহণ করিতে হয়।

কোষাদির তত্ত্বাবধানে বিশ্বস্তের নিয়োগ—কোষ, শস্যগৃহ, দ্বার, আয়ুধ প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে খুব বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ পুরুষকে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা—আয় ও ব্যয়ের মধ্যে নিয়ত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবেন। আয়ের চতুর্থাংশ, অর্দ্ধাংশ অথবা ত্রিচতুর্থাংশ দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ করা উচিত। কোষকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

মদ্য-দ্যূতাদি ত্যাগ—মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি ব্যসন যদি চরিত্রে দেখা দেয়, তবে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে রাখিবে এবং ক্রমে-ক্রমে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে।

শেষরাত্রিতে ধর্ম্মার্থচিন্তন—রাত্রির শেষ প্রহরে জাগ্রত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে চিন্তা করিবে।

শিষ্ট ও দুষ্টের পরীক্ষা—সম্যক্ পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও পুরস্কৃত বা দণ্ডিত করা একান্ত অন্যায়।

শারীর ও মানস রোগের প্রতীকার—রোগ হইলে উপযুক্ত বৈদ্যের নির্দ্দেশমত ঔষধ ব্যবহার করিবে এবং জ্ঞানবৃদ্ধদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মানস পীড়ার উপশম করিবে।

সুবিচার—বিচারপ্রার্থী ও অভিযুক্ত পুরুষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবে।

পুরবাসী প্রজার চরিত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—অন্য কোন প্রবল পুরুষ হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া পুরবাসী প্রজা যেন বিদ্রোহী হইয়া না উঠে, সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখা উচিত।

প্রধান পুরুষদের সহিত সদ্ভাব—প্রধান প্রধান নৃপতিগণকে এমনভাবে বাধ্য রাখিতে হয়, তাঁহারা যেন কখনও বিদ্রোহাচরণ না করেন।

অগ্নিহোত্র, দান ও সদ্ব্যবহার—রাজা অগ্নিহোত্রহোমের অনুষ্ঠান দ্বারা বেদপাঠকে, দান এবং ভোগের দ্বারা ধনকে, চরিত্রগঠন ও পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা বিদ্যাশিক্ষাকে সফল করিবেন।

শিল্পী ও বণিক্‌দের উন্নতিবিধান—শিল্পী ও বণিক্‌দের যাহাতে উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। (এই বিষয়ে 'শিল্প' ও 'বাণিজ্য' প্রবন্ধে বলা হইয়াছে।)

হস্তিসূত্রাদি শিক্ষণীয় বিষয়—হস্তিসূত্র, অশ্বসূত্র, ধনুর্বেদ, যন্ত্রসূত্র প্রভৃতি রাজাকে অবশ্যই শিক্ষা করিতে হইবে। (দ্রঃ 'শিক্ষা'-প্রবন্ধ ১১৭তম পৃঃ।)

রাষ্ট্ররক্ষা ও বিপন্নকে দয়া—রাজা অগ্নিভয়, ব্যাল-(সর্পাদি) ভয় ও রোগভয় হইতে রাষ্ট্রকে সতত রক্ষা করিবেন। অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকৃতাঙ্গ, অনাথ এবং প্রব্রজিতকে পিতৃবৎ পালন করিবেন।

অতি নিদ্রাদি ষড়্দোষপরিত্যাগ—অতি নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মৃদুতা ও দীর্ঘসূত্রতা—এই ছয়টি অনর্থ পরিত্যাগ করা উচিত। মুখে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলিত হইল। রাজধর্ম্মের অনুশাসন বিষয়ে এই অধ্যায়টি পরম উপাদেয়।[৩৮]

মধ্যপন্থা-অবলম্বন—রাজা শত্রুবিজয়ের নিমিত্ত লোকসংগ্রহ করিবেন এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কিত মন্ত্রণা কখনও প্রকাশ করিবেন না। অকৃতাত্মা ব্যক্তি কখনও সুমহৎ রাজতন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। অত্যন্ত সরলপ্রকৃতি রাজাকেও সকলেই ঠকাইতে চেষ্টা করে, সুতরাং রাজা একান্ত সরল না হইয়া মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিবেন।[৩৯]

বিরক্তের সন্তুষ্টিবিধান—অন্যায় ব্যবহার করিয়া কাহারও মনে ব্যথা দিলে তাহাকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া ধন দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন।

আত্মামাত্যাদি সপ্তাত্মক রাজ্যের রক্ষণ—আত্মা, অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র, জনপদ ও পুর—এই সপ্তাত্মক রাজ্য নিপুণভাবে রক্ষা করিবেন। ষাড়্গুণ্যাদির জ্ঞান রাজ্যশাসনে খুবই প্রয়োজনীয়। নৃপতি বিশেষ পরিশ্রমে এইগুলি শিক্ষা করিবেন।[৪০]

রাজা কালস্য কারণম্—নরপতি যুগের স্রষ্টা। যদি সুশাসনের ফলে ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়, তবেই সত্যযুগ। এইরূপে ধর্ম্মের পাদ-পাদ হানিতে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের সৃষ্টি। সুতরাং যথাযথ ধর্ম্মপালনে রাজা নিয়ত অবহিত হইবেন। রাজাই সময়ের শুভতা ও অশুভতার হেতু।[৪১]

---

[৩৮] সভা ৫ম অঃ।

[৩৯] রাজ্ঞো রহস্যং তদ্বাক্যং যথার্থং লোকসংগ্রহঃ। ইত্যাদি। শা ৫৮।১৯-২৩

[৪০] কৃতে কর্ম্মণি রাজেন্দ্র পূজয়েদ্ধনসঞ্চয়ৈঃ। ইত্যাদি। শা ৬৯।৬২-৬৬

[৪১] রাজা কৃতযুগস্রষ্টা ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ। ইত্যাদি। শা ৬৯।৯৮-১০১। উ ১৩২।১৭-২০
কালো বা কারণং রাজ্ঞো রাজা বা কালকারণম্।
ইতি তে সংশয়ো মা ভূদ্ রাজা কালস্য কারণম্। শা ৬৯।৭৯। উ ১৩২।১৬

প্রজাকৃত পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ—প্রজা সুরক্ষিত হইলে প্রজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের চতুর্থাংশ পুণ্য রাজা ভোগ করিয়া থাকেন; পক্ষান্তরে রাজ্যমধ্যে রাজার ত্রুটিতে প্রজা যদি কোন পাপ কার্য্য করে, তবে তাহার চতুর্থাংশ ফলও রাজাকেই ভোগ করিতে হয়। সুতরাং রাজা সতত প্রজার কল্যাণে নিযুক্ত থাকিবেন।[৪২]

প্রজার হৃত ধনের সন্ধান না পাইলে রাজকোষ হইতে অর্পণ—কোন প্রজার ধন চুরি হইলে রাজা চোরকে শাস্তি দিবেন এবং মালিকের ধন মালিককে প্রত্যর্পণ করাইবেন। চোরকে ধরিতে না পারিলে স্বীয় কোষ হইতে সেই পরিমাণ ধন মালিককে দিতে হইবে।

ব্রহ্মস্বরক্ষণ—ব্রহ্মস্বের কোনপ্রকার ক্ষতি করিতে নাই। ব্রাহ্মণের প্রসাদেই রাজারা কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

লোভসংযম—লোভকে খুব সংযত রাখা উচিত। অতি লুব্ধ নরপতি কখনও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন না।[৪৩]

অমাত্যাদির দোষ-পরিজ্ঞান—যাঁহারা রাজ্যের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, রাজা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন। অমাত্যগণ রাজকোষের ক্ষতি ঘটাইলে রাজার কোন কর্ম্মচারী অথবা অন্য যে-কোন ব্যক্তি রাজাকে সেই খবর দিলে গোপনে সেই বিষয়ে সব কথা শোনা রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য। অমাত্যপ্রমুখ রক্ষকগণই যদি ভক্ষক হইয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে প্রভূত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

রাজকোষের কল্যাণকামী পুরুষের রক্ষণ—যে-ব্যক্তি রাজকোষের কল্যাণকামী, রাজা তাঁহাকে রক্ষা না করিলে সে একান্তই নিরুপায়। কারণ অর্থগৃধ্নু অমাত্যের নিকট সেই ব্যক্তি চক্ষুঃশূল।[৪৪]

আত্মরক্ষা—রাজা দর্প ও অধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। নিগৃহীত অমাত্য, অপরিচিতা স্ত্রীলোক, বিষম পর্ব্বত, হস্তী, অশ্ব ও সরীসৃপ প্রভৃতির নিকটে যাইবেন না। এইগুলিকে একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব হইলে রাত্রিকালে

৪২ যং হি ধর্ম্মং চরন্তীহ প্রজা রাজ্ঞা সুরক্ষিতাঃ।
চতুর্থং তস্য ধর্ম্মস্য রাজা ভারত বিন্দতি॥ ইত্যাদি। শা ৭৫।৬-৮

৪৩ প্রত্যাহর্ত্তুমশক্যং স্যাদ্ধনং চৌরৈর্হৃতং যদি।
তং স্বকোশাৎ প্রদেয়ং স্যাদশক্তেনোপজীবতঃ॥ ইত্যাদি। শা ৭৫।১০-১৪

৪৪ যঃ কশ্চিজ্জনয়েদর্থং রাজ্ঞা রক্ষ্যঃ সদা নরঃ। ইত্যাদি। শা ৮২।১-৪

কখনও ইহাদের নিকটে যাইতে নাই। অত্যাগ, অভিমান, দম্ভ ও ক্রোধ বর্জ্জন করিতে হইবে।[৪৫]

মূঢ় লুব্ধ নৃপতির শ্রীভ্রংশ—মূঢ় ইন্দ্রিয়সেবক লুব্ধ অনার্য্যচরিত শঠ বঞ্চক হিংস্র দুর্ব্বুদ্ধি মদ্যরত দ্যূতপ্রিয় লম্পট মৃগয়াব্যসন নৃপতি অচিরেই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। যিনি আপনাকে নানাবিধ প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের শান্তিবিধানে সমর্থ হন, তাঁহার শ্রী দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।[৪৬]

সময়পরিজ্ঞানের সুফল—দুর্গাদির সংস্থান, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুশাসন, মন্ত্রচিন্তা এবং আমোদ-প্রমোদ এই পাঁচটি যথাকালে অনুষ্ঠিত হইলে রাজ্য সুরক্ষিত ও বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া থাকে। এইসকল বিষয়ে দক্ষতা অর্জ্জন করিতে হয়। যিনি প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ-পন্থাকে গ্রহণ করেন, মানুষ সাধারণতঃ তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়া থাকে।

অপ্রিয় পথ্য বচন শ্রবণের ফল—যিনি অগ্রাম্যচরিত এবং অপ্রিয় পথ্যের শ্রোতা, তিনিই নরপতি হইবার যোগ্য।[৪৭]

সশঙ্কভাব ও সুবিবেচনা—রাজা রাত্রিকালে অন্তঃপুরে একাকী ভ্রমণ করিবেন, কদাচ তনুত্রাণ পরিত্যাগ করিবেন না। সর্ব্বত্র আত্মসংযমপূর্ব্বক কল্যাণ চিন্তা করিবেন। শম-বাক্য দ্বারা পরের বিশ্বাস জন্মাইতে হয়। অতীত ও অনাগত বিষয়ের বিচার করিয়া ধীরভাবে কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত।[৪৮] গ্রাম্য পুরুষগণ সাধারণতঃ একে অন্যের বিরুদ্ধে বহু কথা রাজার নিকট বলিয়া থাকে, সেইসকল কথা কানে তুলিতে নাই। সেইগুলির উপর নির্ভর করিয়া কাহাকেও পুরস্কার বা দণ্ড দেওয়া উচিত নহে।[৪৯]

সহায়সংগ্রাহক ব্যবহার—যেরূপ ব্যবহারে বহু ব্যক্তিকে সহায়স্বরূপ পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যবহার করাই উচিত। পণ্ডিতগণ আচারকেও ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।[৫০]

৪৫ স যথা দর্পসহিতমধর্ম্মং নানুসেবতে। ইত্যাদি। শা ৯০।২৮-৩১। শা ৯৩।৩১

৪৬ মূঢ়মৈন্দ্রিয়কং লুব্ধমনার্য্যচরিতং শঠম্। ইত্যাদি। শা ৯৩।১৬-১৮

৪৭ রক্ষাধিকরণং যুদ্ধং তথা ধর্ম্মানুশাসনম্। ইত্যাদি। শা ৯৩।২৪-৩০

৪৮ প্রাবৃষীবাসিতগ্রীবো মজ্জেত নিশি নির্জ্জনে। ইত্যাদি। শা ১২০।১৩-২০

৪৯ বহবো গ্রামবাস্তব্যা দোষাদ্ ব্রূয়ুঃ পরস্পরম্। ইত্যাদি। শা ১৩২।১১-১৩

৫০ যথা যথাস্য বহবঃ সহায়াঃ স্যুস্তথা পরে।
আচারমেব মন্যন্তে গরীয়ো ধর্ম্মলক্ষণম্। শা ১৩২।১৫

বিদ্যাবৃদ্ধের পরামর্শ-শ্রবণ—সতত বিদ্যাবৃদ্ধের উপদেশ শুনিতে হয়। প্রাতঃকালে তাঁহাদিগকে যথারীতি সম্মান করিয়া কৃত্যাকৃত্য জিজ্ঞাসা করিবে। জিতেন্দ্রিয় নরপতি সুযোগ্য পাত্রমিত্রের পরামর্শ ব্যতীত একাকী কিছুই করিবেন না।[৫১]

দিনকৃত্য—যাঁহারা ব্যয়াদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, ভূপতি তাঁহাদের সহিত প্রাতঃকালেই দেখা করিবেন। তারপর বেশভূষা সমাপনান্তে সৈন্যদের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। দূত এবং চরদের সহিত প্রদোষে দেখা করিতে হয়। মধ্যরাত্রি নিদ্রা ও বিহারাদিতে এবং শেষরাত্রি কার্য্যার্থনির্ণয়ে যাপন করিবেন।[৫২]

ছলনাপরিত্যাগ ও সাধু আচার—ছলনাপূর্ব্বক কাহারও সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নাই। শ্রুতিস্মৃতি-নির্দ্দিষ্ট এবং দেশকুলাগত ধর্ম্মের পালন করিলে রাজা সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকেন।[৫৩]

বলবৃদ্ধি—সর্ব্বতোভাবে বল বৃদ্ধি করা অবশ্যকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ অর্থ-বল ও মিত্রবল রাজাদের পরম সহায়। হীনবল নরপতি অতিশয় অবজ্ঞার পাত্র। রাজা পূর্ব্বে যাহাদের সহিত বিরোধ করিয়াছেন, তাহারা একটু ছিদ্র পাইলেই অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে। এমন কি, কপটমিত্র সাজিয়াও তাঁহার অনিষ্টের চেষ্টা করে। এইসকল বিষয়ে রাজাকে খুব সাবধান হইতে হয়।

আত্মমর্য্যাদা-রক্ষণ—কখনও আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে নাই। নতশির হইলে সাধারণ ব্যক্তিও রাজাকে গ্রাহ্য করিতে চায় না।[৫৪]

দস্যু, নিষ্কর্ম্মা ও অতি কৃপণের ধন হরণ করা উচিত—যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণের বিত্ত এবং দেবস্ব হরণ করিতে নাই। দস্যু এবং নিষ্কর্ম্মাদের সম্পত্তি হরণ করাই উচিত। যাহাদের ধন সৎপথে ব্যয়িত হয় না, রাজা তাহাদের ধন আত্মসাৎ করিবেন। অসাধুর ধন বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া সাধু ব্যক্তিকে দান করা রাজার ধর্ম্মরূপে পরিগণিত।[৫৫]

---

৫১ বিদ্যাবৃদ্ধান্ সদৈব ত্বমুপাসীথা যুধিষ্ঠির। ইত্যাদি। আশ্র ৫।১০-১৩

৫২ প্রাতরেব হি পশ্যেথা যে কুর্য্যুর্ব্যয়কর্ম্ম তে। ইত্যাদি। আশ্র ৫।৩২-৩৫

৫৩ ব্যাজেন বিন্দন্ বিত্তং হি ধর্ম্মাৎ স পরিহীয়তে। শা ১৩২।১৮

৫৪ অবলস্য কুতো রাজ্যমরাজ্ঞঃ শ্রীর্ভবেৎ কুতঃ। ইত্যাদি। শা ১৩৩।৪-১৩

৫৫ শা ১৩৬ তম অঃ।

ন চাদদীত বিত্তানি সতাং হস্তাৎ কদাচন। শা ৫৭।২২

ভবিষ্যচ্চিন্তন (শাকুলোপাখ্যান)—সকল কাজেই ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে হয়। বিপদের আশঙ্কা দেখিয়াই যে সাবধান হয়, সে অনাগতবিধাতা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে যে উপস্থিত বিপদে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সে প্রত্যুৎপন্ন-মতি। আর সব কাজেই যে অবহেলা করিয়া থাকে, সে দীর্ঘসূত্রী। অনাগত-বিধাতাই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্, তাঁহার কোন বিপদ ঘটিতে পারে না। প্রত্যুৎপন্নমতি মন্দের ভাল হইলেও তাহার শ্রেয়ঃ সংশয়িত, আর দীর্ঘসূত্রী সর্ব্বথা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং নৃপতি সতত অনাগতের বিধানে যত্নপর হইবেন। এই বিষয়ে শাকুলোপাখ্যানে গল্পের মধ্য দিয়া উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।[৫৬]

সময়বিশেষে শত্রু দ্বারাও মিত্রকার্য্য সাধিত হয় (মার্জ্জারমূষিক-সংবাদ)—শত্রুপরিবেষ্টিত হইলেও ধৈর্য্য হারাইতে নাই। সময়বিশেষে শত্রুও মিত্রের কাজ করিয়া থাকে। (মার্জ্জারমূষিক-সংবাদে এই বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।) কার্য্য উদ্ধার হইলেও শত্রুকে বিশ্বাস করিতে নাই।[৫৭]

স্বার্থসাধন—নৃপতি কূটনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার প্রতিপাল্যকে অপরের দ্বারা প্রতিপালন করাইয়া কোকিলের মত ব্যবহার করিবেন। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া হাতী প্রতিপালনের জন্য দিবেন, গ্রামবাসীরাই তাহার খরচ চালাইবে। এইরূপে গোপালন ও কৃষি বিষয়ে নিজে খরচ না করিয়া সঙ্গতিপন্ন বৈশ্যের দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধ করিবেন। পালককে পুরস্কৃত করিতে হয়।

কূটনীতি—রাজা শূকরের ন্যায় শত্রুর মূল-উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইবেন। মেরুর মত আপনার স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবেন। প্রসাদ, ক্রূরতা প্রভৃতি নানাভাবের সমাবেশে নটের অনুকরণ করিবেন। দরিদ্রের মত সতত সম্পদ্ কামনা করিবেন। প্রজাদের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভক্তিমিত্রের চরিত্র অনুকরণ করিবেন, অর্থাৎ অনাবশ্যক হইলেও বাহ্যতঃ স্নিগ্ধ ব্যবহার দেখাইবেন।[৫৮]

৫৬ অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিশ্চ যঃ।
দ্বাবেব সুখমেধেতে দীর্ঘসূত্রী বিনশ্যতি। ইত্যাদি। শা ১৩৭ তম অঃ।

৫৭ শা ১৩৮ তম অঃ।

৫৮ কোকিলস্য বরাহস্য মেরোঃ শূন্যস্য বেশ্মনঃ।
নটস্য ভক্তিমিত্রস্য যচ্ছ্রেয়স্তৎ সমাচরেৎ॥ শা ১৪০।২১

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রিপুকেও কুশল প্রশ্ন করিতে হয়। অলস, ক্লীব, অভিমানী, লোকনিন্দাভীত এবং দীর্ঘসূত্র নরপতি কখনও শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন না। আত্মচ্ছিদ্র কাহাকেও জানিতে দিবেন না, কিন্তু সর্ব্বদা পরচ্ছিদ্রের অনুসন্ধান করিবেন। কূর্ম্মের মত আত্মগুপ্তি রাজার অবশ্য-শিক্ষণীয়। রাজা বকের ন্যায় অর্থচিন্তা, সিংহের ন্যায় পরাক্রম, বৃকের ন্যায় আত্মগোপন এবং শরের ন্যায় শত্রুভেদ করিবেন। সুরাপান, অক্ষক্রীড়া, মৃগয়া, স্ত্রীসম্ভোগ, গীতবাদিত্র প্রভৃতি পরিমিতভাবে উপভোগ করিবেন। এইসকল বিষয়ে অত্যাসক্তি সমূহ অকল্যাণের হেতু। মৃগের ন্যায় সাবধানে শয়ন করিবেন। অবস্থা-বিবেচনায় অন্ধ বা বধিরের মত ব্যবহার করিবেন। বিচক্ষণ নরপতি দেশকাল-অনুসারে বিক্রম প্রকাশ করিবেন। সম্যক্‌রূপে আত্মবল পরীক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত। যতক্ষণ ভয় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ ভীত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিবেন ; ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য সহকারে প্রতীকারের উপায় করা উচিত। মানুষ সংশয়ের পথে না চলিয়া কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে না, সংশয়িত পথে চলিয়া যদি জয়যুক্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সমাগত সুখকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অনাগতের কল্পনা করা উচিত নহে। উপযুক্ত গুপ্তচর হইতে সকল বার্ত্তা অবগত হইয়া কাজ করা কর্ত্তব্য। শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই।[৫৯]

জ্ঞাতিবিরোধের কুফল—কখনও জ্ঞাতিবিরোধ করিতে নাই, জ্ঞাতিবিরোধ বহুবিধ অনর্থ আনয়ন করে।[৬০]

কুমারী বা পরস্ত্রীতে আসক্ত হইতে নাই—অবিজ্ঞাতা মহিলা, ক্লীব, স্বৈরিণী, পরভার্য্যা বা কন্যকাতে কদাচ আসক্ত হইতে নাই। বর্ণসঙ্করের ফলে কুলে পাপ প্রবেশ করে এবং অঙ্গহীন, ক্লীব প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। রাজা কখনও এরূপ প্রমাদগ্রস্ত হইবেন না।[৬১]

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিও কু-শাসনের ফল—রাজার কু-শাসনের ফলে শীতকালে উপযুক্ত শীত হয় না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ব্যাধি এবং উৎপাতাদির জন্যও রাজাই দায়ী[৬২]

৫৯ শা ১৪০ তম অঃ।

৬০ কুর্য্যাচ্চ প্রিয়মেতেভ্যো নাপ্রিয়ং কিঞ্চিদাচরেৎ। শা ৮০।৩৮

৬১ অবিজ্ঞাতাসু চ স্ত্রীষু ক্লীবাসু স্বৈরিণীষু চ। ইত্যাদি। শা ৯০।৩২-৩৫

৬২ অশীতে বিদ্যতে শীতং শীতে শীতং ন বিদ্যতে। ইত্যাদি। শা ৯০।৩৬-৩৮

অধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে দুর্গতি—রাজা যদি প্রমাদগ্রস্ত হন, তবে সমস্তই বিনষ্ট হয়। কাহারও সুখশান্তির আশা থাকে না। রাজা অধার্ম্মিক হইলে হাতী, ঘোড়া, উট, গরু প্রভৃতি জন্তুরাও অবসন্ন হইয়া থাকে। রাজাই রক্ষক, আবার রাজাই বিনাশক। রাজা যদি অধর্ম্মজ্ঞ নাস্তিক হন, তবে প্রজারা সতত উদ্বেগের সহিত কাল যাপন করে।[৬৩]

নৃশংস পুরুষকে অবিশ্বাস—নৃশংসকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। নৃশংস পুরুষ অত্যন্ত নীচকর্ম্মরত এবং বঞ্চনাপরায়ণ। নৃপতি কখনও তেমন লোককে কোন কাজে নিযুক্ত করিবেন না। সতত তাহার সংসর্গ বর্জ্জন করিয়া চলিবেন।[৬৪]

কৃতঘ্নের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন—মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন হইতে আপনাকে দূরে রাখা উচিত। কৃতঘ্নের অসাধ্য কোন পাপকার্য্য নাই। নির্ল্লজ্জ কৃতঘ্ন সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী। সুতরাং তাহার সহিত সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।[৬৫]

রাজার সামান্য ত্রুটিতেও প্রভূত ক্ষতি—রাজলক্ষ্মী অতিশয় চঞ্চলা। যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি লক্ষ্য করিলেই তিনি নৃপতিকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তাঁহাকে দীর্ঘকাল একস্থানে রাখা শক্ত।[৬৬] সত্য, দান, ব্রত, তপস্যা, পরাক্রম এবং ধর্ম্মের উপাসনা করিলে শ্রী প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকেন।[৬৭]

রাজাও সমাজেরই একজন—উল্লিখিত রাজধর্ম্মবিবৃতি হইতে তখনকার আদর্শের অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম, বীরত্ব এবং প্রজারঞ্জন যাহাতে রাজাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হয়, প্রায় সবগুলি উপদেশই সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা সমাজ হইতে দূরে থাকিতেন না; তিনিও

৬৩ রাজৈব কর্ত্তা ভূতানাং রাজৈব চ বিনাশকঃ। ইত্যাদি। শা ৯১।৯-১১
অথ যেষামধর্ম্মজ্ঞো রাজা ভবতি নাস্তিকঃ। ইত্যাদি। অনু ৬২।৪১,৪২

৬৪ শা ১৬৪ তম অঃ।

৬৫ শা ১৭৩ তম অঃ।

৬৬ যামেতাং প্রাপ্য জানীষে রাজশ্রিয়মনুত্তমাম্।
স্থিতা ময়ীতি তন্মিথ্যা নৈষা হ্যেকত্র তিষ্ঠতি। শা ২২৪।৫৮

৬৭ সত্যে স্থিতাস্মি দানে চ ব্রতে তপসি চৈব হি।
পরাক্রমে চ ধর্ম্মে চ * * * *। শা ২২৫।১২

সমাজেরই একজন ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তিনি যে নিতান্ত দুর্দ্দর্শ ও দুরধিগম্য ছিলেন, তাহাও নহে।

রাজার আদর্শ অতি উচ্চ—উল্লিখিত উপদেশ ব্যতীত আরও অনেকগুলি উপদেশ মহাভারতে রাজধর্ম্মপ্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। চরিত্র সংশোধন করিতে কি কি দোষ পরিত্যাজ্য, তাহা সেই প্রকরণের আলোচনায় জানিতে পারা যায়। সংসারে সম্পূর্ণ নিখুঁত চরিত্রের লোক একান্ত দুর্লভ, অথচ রাজাকে আদর্শ পুরুষ হইতে হইবে। সুতরাং তিনি যেমন উৎকৃষ্ট গুণের অনুশীলনে সতত চেষ্টা করিবেন, সেইরূপ রাজকার্য্যের প্রতিকূল দোষগুলি পরিহার করিতেও যত্নবান্ হইবেন।

উত্তরাধিকারীর কারণাধীন অধিকারচ্যুতি—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাভারতে রাজপদবী বংশগতরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্রাদিক্রমে সিংহাসন-আরোহণের অধিকার মহাভারতের সর্ব্বত্র বর্ণিত। কিন্তু কোন কোন কারণবশতঃ উত্তরাধিকারিগণের স্বাভাবিক অধিকার লোপের উদাহরণও আছে। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পারেন নাই, পাণ্ডুই সিংহাসন অধিকার করেন। বিদুর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠা যদিও অবান্তর, তথাপি রাজ্যপ্রাপ্তিতে জন্মগত নিয়মের ব্যবস্থা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বিদুরের বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, বিদুর শূদ্রার গর্ভজাত ছিলেন, এই কারণে সিংহাসনে তাঁহার অধিকার ছিল না।[৬৮]

অর্দ্ধ সম্পত্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের অধিকার—ধৃতরাষ্ট্র যদিও রাজসিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না, তথাপি অর্দ্ধেক সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[৬৯]

বিদুরের অধিকারসূচক কোন কথা নাই—বিদুরের অধিকারসূচক

৬৮ ধৃতরাষ্ট্রস্ত্বচক্ষুষ্ট্বাদ্ রাজ্যং ন প্রত্যপদ্যত।
পারশবত্বাদ্বিদুরো রাজা পাণ্ডুর্বভূব হ॥ ইত্যাদি। আদি ১০৯।২৫। আদি ১৪১।২৫

৬৯ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাণ্ডুশ্চ সুতাবেকস্য বিশ্রুতৌ
তয়োঃ সমানং দ্রবিণং পৈতৃকং নাত্র সংশয়ঃ॥ উ ২০।৪
প্রযচ্ছ পাণ্ডুপুত্রাণাং যথোচিতমরিন্দম।
যদীচ্ছসি সহামাত্যং ভোক্তুমর্দ্ধং মহীক্ষিতাম্॥ ইত্যাদি। উ ১২৯।৪৩-৪৬

কোন কথা নাই। শূদ্রা মাতার সন্তান বলিয়াই বোধ করি, সম্পত্তিতেও তাঁহাকে অধিকার দেওয়া হয় নাই।

পুত্রের অভাবে কন্যার অধিকার—পুত্রের অভাবে রাজ্যে কন্যার অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে।[৭০]

রাজধর্ম্ম (খ)

অমাত্য এবং সুহৃদের নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। কোষসঞ্চয় বিষয়েও আলোচিত হইবে।

একাকী রাজ্য-পরিচালনা অসম্ভব—রাজ্যশাসনে যে দায়িত্ব, তাহা একাকী বহন করা অসম্ভব। যতই ধীর, বীর এবং জিতেন্দ্রিয় হউন না কেন, একমাত্র রাজা কিছুতেই সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালন করিতে সমর্থ হন না।[১] সুতরাং প্রত্যেক বিভাগে তাঁহাকে সহকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। অবশ্য সব বিষয়েই তিনি স্বয়ং সর্ব্বময় কর্ত্তা। মন্ত্রী, মিত্র, সেনাপতি, গ্রামাধিপতি, অধিকরণিক প্রমুখ পাত্রমিত্রের সহায়তায় রাজা রাজ্য শাসন করিবেন।

বিচক্ষণতা-অর্জ্জন শিক্ষাসাপেক্ষ—পাত্রমিত্রের গুণাগুণ ও ব্যবহার লক্ষ্য করা এবং তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত—এইসকল বিষয় বিশেষভাবে শিক্ষা করিতে হয়। অর্থশাস্ত্র এবং মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রে এই বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মহাভারতের রাজধর্ম্মপ্রকরণে ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদচ্ছলে এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য প্রকরণেও অনেক কথাই বলা হইয়াছে। তৎকালে নৃপতিবৃন্দ বিশেষভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং সেই অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিতেন।

রামায়ণ ও মনুসংহিতার অনুসরণ—মহাভারতে বর্ণিত মন্ত্রণাব্যবহার ও কর্ম্মচারি-নিয়োগপদ্ধতি রামায়ণ এবং মনুসংহিতার অনুরূপ। (কামন্দক ও শুক্রনীতিতেও এইসকল বিষয়ে অনুরূপ অনেক কথা পাওয়া যায়।)

---

৭০ কুমারো নাস্তি যেষাঞ্চ কন্যাস্তত্রাভিষেচয়। শা ৩৩।৪৫

১ ন হ্যেকো ভৃত্যরহিতো রাজা ভবতি রক্ষিতা। শা ১১৫।১২

যদপ্যল্পতরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
পুরুষেণাসহায়েন কিমু রাজ্যং পিতামহ॥ শা ৮০।১

বীর ও শাস্ত্রবিদের সহায়তা প্রয়োজন—রাজ্যপরিচালনে সহায় একান্ত আবশ্যক। সুপুরুষ, বীর, শাস্ত্রবিৎ, কৃতজ্ঞ এবং কৃতপ্রজ্ঞ মিত্রের সহায়তায় নরপতি সমস্ত জয় করিতে সমর্থ হন।[২]

মন্ত্রীর গুণাদি-পরীক্ষা—শীলবান্ কুলীন বিদ্বান্ বিনীত ধর্ম্মার্থকুশল ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করা উচিত।[৩]

ব্রাহ্মণই প্রধানতঃ মন্ত্রিত্বে বরণীয়—ব্রাহ্মণের মন্ত্রণা ব্যতীত কোন ক্ষত্রিয় রাজা দীর্ঘকাল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন না। অতএব ব্রাহ্মণকেই মন্ত্রিত্বে বরণ করা উচিত।[৪]

সৎকুলোৎপন্ন সচিব-নিয়োগের ফল—বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া সচিব নিয়োগ করিতে নাই। ক্ষুদ্রাচার অকুলীন সচিবের নিয়োগে রাজা বিপন্ন হন। সৎকুলসম্ভূত সচিব অত্যন্ত অবমানিত হইলেও রাষ্ট্রের অশুভ চিন্তা করেন না; কিন্তু দুষ্কুলোৎপন্ন পুরুষ সজ্জনসংসর্গেও স্বভাব ত্যাগ করেন না; সময়-সময় সামান্য কারণেই শত্রুতা করিয়া থাকেন। সুতরাং নৃপতি খুব বিবেচনার সহিত কুলীন, শিক্ষিত, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানবিজ্ঞানপারগ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, সহিষ্ণু, পবিত্রদেশোৎপন্ন, কৃতজ্ঞ, বলবান্, ক্ষান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, লব্ধসন্তুষ্ট, স্বামী ও মিত্রের ঐশ্বর্য্যকামী, দেশকালজ্ঞ, তত্ত্বান্বেষী, ব্যূহতত্ত্বজ্ঞ, ইঙ্গিতাকারজ্ঞ, পৌরজানপদপ্রিয়, শুচি, অস্তব্ধ, মৃদুভাষী, ধীর, সন্ধিবিগ্রহপণ্ডিত এবং প্রিয়দর্শন পুরুষকে মন্ত্রিরূপে বরণ করিবেন। যিনি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিয়া এইসকল গুণে ভূষিত পুরুষকে বরণ করেন, তাঁহার রাজ্য জ্যোৎস্নার মত বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে।[৫]

উৎকৃষ্ট মন্ত্রীর নিয়োগে রাজ্যের মঙ্গল—যাঁহার মন্ত্রী সৎকুলোৎপন্ন, নির্লোভ, অনাগতবিধাতা, কালজ্ঞানবিশারদ এবং অর্থচিন্তাপরায়ণ, সেই নৃপতি নিরুদ্বেগে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন।[৬] সৎকুলোৎপন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ

২ অন্বেষ্টব্যাঃ সুপুরুষাঃ সহায়া রাজ্যধারণৈঃ। ইত্যাদি। শা ১১৮।২৪-২৭

৩ মন্ত্রিণশ্চৈব কুর্ব্বীথা দ্বিজান্ বিদ্যাবিশারদান্। ইত্যাদি। আশ্র ৫।২০, ২১

৪ নাব্রাহ্মণং ভূমিরিয়ং সভূতি—
বর্ণং দ্বিতীয়ং ভজতে চিরায়। বন ২৬।১৪

৫ নাপরীক্ষ্য মহীপালঃ সচিবং কর্ত্তুমর্হতি। ইত্যাদি। শা ১১৮।৪-১৫

৬ মন্ত্রিণো যস্য কুলজা অসংহার্য্যাঃ সহোষিতাঃ। ইত্যাদি। শা ১১৫।১৬-১৮
কুলীনান্ শীলসম্পন্নানিঙ্গিতজ্ঞাননিষ্ঠুরান্। ইত্যাদি। শা ৮৩।৮-১০

পুরুষ রাজকর্তৃক সাচিব্যাদি-কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে রাজার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইয়া থাকে।[৭]

অপণ্ডিত সুহৃৎকেও নিয়োগ করিতে নাই—সুহৃদ্‌ব্যক্তিও যদি অপণ্ডিত হন, তবে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে নাই। পণ্ডিতব্যক্তি যদি বহুভাষী হন, তবে তিনি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে নাই।[৮]

বংশপরম্পরায় মন্ত্রণাপটু পুরুষের নিয়োগে সুফল—অমানী, সত্যনিষ্ঠ, জিতাত্মা, ক্ষান্ত, কুলীন, দক্ষ, আত্মবান্, শূর এবং কৃতজ্ঞ পুরুষকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা উচিত। যাঁহার বংশ শুদ্ধ, যিনি বেদমার্গাবলম্বী, যাঁহার বংশপরম্পরা মন্ত্রণাদিকার্য্যে পটু, যাঁহার বুদ্ধি প্রসন্না ও প্রকৃতি শোভনা, তিনিই মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত।

তেজস্বী বীরপুরুষ—তেজ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, শৌচ, অনুরাগ, স্থিতি, ধৃতি, কপটাচারবিহীনতা, বীরত্ব, প্রতিপত্তি, ইঙ্গিতজ্ঞতা, অনিষ্ঠুরতা প্রভৃতি গুণে যিনি শোভিত, সেই পুরুষকে অমাত্যপদে বরণ করা উচিত।

শাস্ত্রজ্ঞ ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তির নিয়োগ—যে মন্ত্রীর শাস্ত্রজ্ঞান অতি সামান্য, তিনি নানাবিধ কল্যাণগুণসম্পন্ন হইলেও কার্য্যপরীক্ষা-ব্যাপারে তাদৃশ দক্ষ হন না। আবার যিনি বহুশ্রুত হইয়াও গুণসম্পন্ন নহেন, তিনি সূক্ষ্ম কার্য্যসমূহ খুব বিবেচনার সহিত করিতে পারেন না। যাঁহার সঙ্কল্প প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়, তিনি বিদ্বান্ এবং আগমজ্ঞ হইলেও কোন ভাল কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন না। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা উচিত নহে।[৯]

শিষ্ট ও স্থিরমতি পুরুষের নিয়োগ—শূর, প্রভুভক্ত, অরোগী, শিষ্ট, সম্মানিত, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, সাধু, স্থিরমতি, অপরের দ্বারা অপ্রতারিত,

---

৭ যদা কুলীনো ধর্ম্মজ্ঞঃ প্রাপ্নোত্যৈশ্বর্য্যমুত্তমম্।
যোগক্ষেমস্তদা রাজ্ঞঃ কুশলায়ৈব কল্পতে। শা ৭৫।৩০

৮ অপণ্ডিতো বাপি সুহৃৎ পণ্ডিতো বাপ্যনাত্মবান্।
নাপরীক্ষ্য মহীপালঃ কুর্য্যাৎ সচিবমাত্মনঃ॥ উ ৩৮।১৯

৯ অমানী সত্যবান্ ক্ষান্তো জিতাত্মা মানসংযুতঃ।
স তে মন্ত্রসহায়ঃ স্যাৎ সর্ব্বাবস্থাপরীক্ষিতঃ॥ ইত্যাদি। শা ৮৩।১৫-২৮

অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং লোকপ্রকৃতিজ্ঞ পুরুষকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়া পতি সমানভাবে তাঁহাদের সহিত ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিবেন।

নৃপতি ও সচিবের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য—কেবলমাত্র রাজচ্ছত্র ও আজ্ঞা-প্রদান—এই দুইটিতেই রাজার স্বাতন্ত্র্য, অন্য সমস্তই মন্ত্রীর অধীন।[১০]

সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতের ক্ষমতা বেশী—সহস্র মূর্খকে সভাসদ্ রাখিলেও কোন লাভ হয় না। কিন্তু মেধাবী, দক্ষ, শূর ও প্রত্যুৎপন্নমতি একজন অমাত্যকে উপযুক্ত স্থান দিলে নৃপতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।[১১]

অমাত্যহীন রাজা অতি বিপন্ন—যে রাজার অমাত্য নাই, তিনি তিন দিনও রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন না। অতএব নরপতি বুদ্ধিমান্ শৌর্য্যবীর্য্যশালী পুরুষকে অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।[১২]

দুষ্ট সচিবের নিয়োগে নৃপতির বিনাশ—দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ সচিবের নিয়োগে নরপতি শীঘ্রই সপরিবার বিনাশ প্রাপ্ত হন।[১৩]

গুণবানের নিয়োগে শ্রীবৃদ্ধি—কুলীন, শীলসম্পন্ন, তিতিক্ষু, আর্য্য, বিদ্বান্, প্রতিপত্তি-বিশারদ পুরুষকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা উচিত। এই সমস্ত গুণসম্পন্ন পুরুষ মন্ত্রণাদি কার্য্যে অধিকার প্রাপ্ত হইলে মঙ্গল বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।[১৪]

রহস্যবেত্তা ও সন্ধিবিগ্রহবিৎ সচিব উত্তম—যে-ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ রহস্যবেত্তা, সন্ধিবিগ্রহ বিষয়ে পটু, মতিমান্, ধীর, লজ্জাশীল, রহস্য-গোপনকারী, কুলীন, সত্ত্বসম্পন্ন এবং পবিত্রচরিত, তিনিই অমাত্য হইবার উপযুক্ত।[১৫]

ন্যূনকল্পে তিনজন মন্ত্রীর নিয়োগ—ন্যূনকল্পে তিনজন মন্ত্রী নিয়োগ

---

১০ শূরান্ ভক্তানসংহার্য্যান্ কুলে জাতানরোগিণঃ। ইত্যাদি। শা ৫৭।২৩-২৫

১১ একোঽপ্যমাত্যো মেধাবী শূরো দান্তো বিচক্ষণঃ।
রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপয়েন্মহতীং শ্রিয়ম্॥ সভা ৫।৩৭

১২ ন রাজ্যমনমাত্যেন শক্যং শাস্তমপি ত্র্যহম্। ইত্যাদি। শা ১০৬।১১,১২

১৩ অসৎপাপিষ্ঠসচিবো বধ্যো লোকস্য ধর্ম্মহা।
সহৈব পরিবারেণ ক্ষিপ্রমেবাবসীদতি॥ শা ৯২।৯

১৪ কুলীনঃ শীলসম্পন্নস্তিতিক্ষুরবিকত্থনঃ। ইত্যাদি। শা ৮০।২৮-৩১

১৫ ধর্ম্মশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সন্ধিবিগ্রহিকো ভবেৎ। ইত্যাদি। শা ৮৫।৩০, ৩১

করিবার বিধি। একস্থানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পাঁচজন বিচক্ষণ মন্ত্রীর পরামর্শমত রাজা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।[১৬]

আটজনের বিধান—অন্যত্র আটজন মন্ত্রী নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের জাতি, বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল। এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে রাজসভায় কয়জন পাত্রমিত্র রাখিতে হইবে, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির ছত্রিশজন মিত্র এবং একজন বিচক্ষণ সূতের গ্রহণ—বিদ্বান্, স্নাতক, প্রত্যুৎপন্নমতি চারিজন ব্রাহ্মণ, তাদৃশ গুণযুক্ত এবং বলবান্ শস্ত্রপাণি আটজন ক্ষত্রিয়, বিত্তশালী একুশজন বৈশ্য ও শুচি বিনীত নিত্যকর্ম্মাচরণশীল তিনজন শূদ্রকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহন, অপোহন, বিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান—এই আটটি গুণযুক্ত প্রগল্ভ, অনসূয়ক, শ্রুতিস্মৃতিসমাযুক্ত, বিনীত, সমদর্শী, কার্য্যে বিবদমান ব্যক্তিদের সৎপরামর্শ দানে সমর্থ, ব্যসনবর্জ্জিত পঞ্চাশবর্ষ বা কিঞ্চিদূর্দ্ধবয়স্ক সূতজাতীয় একজন অমাত্যকে স্থান দিতে হইবে।[১৭]

সাঁইত্রিশজন মিত্রের মধ্যে আটজন মন্ত্রী—উল্লিখিত সাঁইত্রিশজনের মধ্যে ব্রাহ্মণচতুষ্টয়, শূদ্রত্রয় এবং সূতজাতীয় পুরুষকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের পরামর্শক্রমে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। এক-একজন অমাত্যকে এক-এক বিভাগের ভার দিতে হয়। একই বিভাগে একাধিক পুরুষকে নিয়োগ করা শুভ নহে।[১৮]

সহার্থাদি চতুর্ব্বিধ মিত্র—সহার্থ, ভজমান, সহজ ও কৃত্রিম এই চারি-প্রকারের মিত্র সকল নৃপতিরই থাকেন। (ক) যিনি এইরূপ পরামর্শ করেন যে, "অমুক শত্রুকে আমরা উভয়ে মিলিতভাবে উন্মূলিত করিব", তিনি 'সহার্থ'। (খ) যিনি পিতৃপিতামহাদিক্রমে একই রাজপরিবারের সেবা করিতেছেন, তিনি 'ভজমান'। (গ) মাসতুতভাই, পিসতুতভাই প্রভৃতি মিত্র

---

১৬ মন্ত্রিণঃ প্রকৃতিজ্ঞাঃ স্যুস্ত্র্যবরা মহদীপ্সবঃ। শা ৮৩।৪৭
পঞ্চোপধাব্যতীতাংশ্চ কুর্য্যাদ্রাজার্থকারিণঃ। শা ৮৩।২২
মন্ত্রচিন্তা সুখং কালে পঞ্চভির্ব্বর্দ্ধতে মহী। শা ৯৩।২৪

১৭ চতুরো ব্রাহ্মণান্ বৈদ্যান্ প্রগল্ভান্ স্নাতকান্ শুচীন্। ইত্যাদি। শা ৮৫।৭-১০

১৮ অষ্টানাং মন্ত্রিণাং মধ্যে মন্ত্রং রাজোপধারয়েৎ। শা ৮৫।১১। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।
নৈব দ্বৌ ন ত্রয়ঃ কার্য্যা ন মৃষ্যেরন্ পরস্পরম্। শা ৮০।২৫

'সহজ'। (ঘ) ধনের দ্বারা সংগৃহীত মিত্রকে 'কৃত্রিম'-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়।

সত্যনিষ্ঠের পঞ্চম প্রকার মিত্রত্ব—যিনি ধর্মাত্মা এবং সত্যনিষ্ঠ, তিনি সকলেরই অহেতুক মিত্র।

ভজমান ও সহজের প্রাধান্য—উল্লিখিত মিত্রবর্গের মধ্যে ভজমান এবং সহজ মিত্রই শ্রেষ্ঠ। সহার্থ ও কৃত্রিম মিত্র অতি সাধারণ কারণেই শত্রুতা সাধন করিতে পারেন।[১৯]

গুণবান্, বহুদর্শী, বয়স্ক ব্যক্তিই উপযুক্ত অমাত্য—নারদীয় রাজধর্মে কথিত হইয়াছে যে, নৃপতি আত্মসম, পরিশুদ্ধ, কুলীন, কার্য্যাকার্য্যবিচারপটু, অনুরক্ত এবং বৃদ্ধ পুরুষকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিবেন। রাজার ঐশ্বর্য্য এবং বিজয় মন্ত্রীদের অধীন।[২০]

প্রজ্ঞাদি পঞ্চবিধ বল—প্রজ্ঞা, বংশ, ধন, অমাত্য ও বাহু—এই পাঁচটি বলে বলীয়ান্ নরপতি বসুন্ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হন, সুতরাং অমাত্যবল উপেক্ষণীয় নহে।[২১]

মন্ত্রণাপদ্ধতি—মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া রাজা কোন কাজে হাত দিবেন না। সংবৃতমন্ত্র, শাস্ত্রবিৎ মন্ত্রীর দ্বারাই রাজ্য রক্ষিত হইয়া থাকে।[২২]

মন্ত্রগুপ্তির শুভ ফল—মন্ত্রণা অত্যন্ত সাবধানে গোপন রাখিতে হয়। মন্ত্রগুপ্তি রাজাদের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। শরৎকালের ময়ূর যেরূপ মূক হইয়া থাকে, নৃপতিও তদ্রূপ মৌনাবলম্বন করিয়া মন্ত্র গোপন করিবেন। রাজার হিতৈষী মন্ত্রিগণও মন্ত্রগুপ্তি বিষয়ে সতত সতর্ক থাকিবেন। মন্ত্রই রাজাদের কবচ-স্বরূপ। বাহিরের লোক এবং নিতান্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিও যাঁহার মন্ত্রণা জানিতে পারে না, সেই সর্ব্বতশ্চক্ষু রাজা চিরকাল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। কাজ করিবার পূর্ব্বে কাহাকেও বলিতে নাই; করার পর সকলেই পূর্ব্বের সঙ্কল্প বুঝিতে পারে। মন্ত্রভেদ সমূহ-অকল্যাণের হেতু। যাঁহার অমাত্যগণ

১৯ চতুর্ব্বিধানি মিত্রাণি রাজ্ঞাং রাজন্ ভবন্ত্যুত। ইত্যাদি। শা ৮০।৩-৬

২০ কচ্চিদাত্মসমা বৃদ্ধাঃ শুদ্ধাঃ সম্বোধনক্ষমাঃ। ইত্যাদি। সভা ৫,২৬, ২৭

২১ বলং পঞ্চবিধং নিত্যং পুরুষাণাং নিবোধ মে। ইত্যাদি। উ ৩৭।৫২-৫৫

২২ কচ্চিৎ সংবৃতমন্ত্রৈস্তে অমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
রাষ্ট্রং সুরক্ষিতং তাত * * * * *। সভা ৫।২৮

মন্ত্রসম্বরণে পটু এবং যিনি স্বয়ং গূঢ়মন্ত্র, তাঁহার সিদ্ধিবিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।[২৩] মন্ত্রিগণকে মন্ত্রগুপ্তির আবশ্যকতা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে মন্ত্রিমণ্ডলী বিশেষ অবহিত হইবেন।[২৪]

প্রত্যেক অমাত্যের অভিমত বিভিন্ন সময়ে গ্রহণীয়—একই সময়ে অনেকের সহিত মন্ত্রণা করা উচিত নহে। প্রত্যেক অমাত্যের অভিমত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিলে ভাল হয়।[২৫]

রাত্রিতে মন্ত্রণা নিষিদ্ধ—বিশেষ বিবেচনা করিয়া মন্ত্রণার স্থান এবং সময় স্থির করিতে হয়। রাত্রিতে কখনও মন্ত্রণা করিতে নাই। কারণ অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া বিপক্ষের গুপ্তচর সব শুনিতে পারে।[২৬]

অরণ্যে বা তৃণশূন্য ভূমিতে বসিয়া মন্ত্রণা কর্ত্তব্য—অরণ্যে অথবা তৃণশূন্য নির্জ্জন ভূমিতে অবস্থিত হইয়া মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। তৃণের উপর বসিলে নিকটস্থ গুপ্তচরের পদধ্বনি শোনা যায় না।[২৭]

মন্ত্রণাগৃহের সুসংবৃতত্ব—স্থলে অবস্থানপূর্ব্বক মন্ত্রণা কর্ত্তব্য। মন্ত্রণাগৃহ সুরক্ষিত এবং সুসংবৃত হইবে।[২৮]

বামন, কুব্জ প্রভৃতি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়—যে স্থানে মন্ত্রণা করা হইবে, তাহার অগ্র, পশ্চাৎ, উর্দ্ধ, অধঃ বা তির্য্যগ্ দেশে বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, স্ত্রীলোক এবং নপুংসক, ইহারা কোনপ্রকারে যাতায়াত করিতে পারিবে না।[২৯] এইসকল প্রাণীকে মন্ত্রণাস্থান হইতে অপসারিত করিবার কোন কারণ মহাভারতে বর্ণিত না হইলেও মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন—শুকাদি পক্ষী, অতিশয় বৃদ্ধ পুরুষ এবং মহিলারা স্বভাবতঃ

২৩ কচ্চিত্তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো ন রাষ্ট্রং পরিধাবতি। সভা ৫।৩০
নিত্যং রক্ষিতমন্ত্রঃ স্যাদ্ যথা মূকঃ শরচ্ছিখী॥ ইত্যাদি। শা ১২০।৭। শা ৮৩।৫০।
উ ৩৮।১৫-২১

২৪ দোষাংশ্চ মন্ত্রভেদস্য ব্রূয়াস্ত্বং মন্ত্রিমণ্ডলে। ইত্যাদি। আশ্র ৫।২৫,২৬

২৫ কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ। সভা ৫।৩০
তৈঃ সার্দ্ধং মন্ত্রয়েথাস্ত্বং নাত্যর্থং বহুভিঃ সহ। ইত্যাদি। আশ্র ৫।২১,২২

২৬ ন চ রাত্রৌ কথঞ্চন। আশ্র ৫।২৩

২৭ অরণ্যে নিঃশলাকে বা। ইত্যাদি। আশ্র ৫।২৩। উ ৩৮।১৮

২৮ সুসংবৃতং মন্ত্রগৃহং স্থলং চারুহ্য মন্ত্রয়েঃ। আশ্র ৫।২২

২৯ ন বামনাঃ কুব্জকৃশা ন খঞ্জাঃ। ইত্যাদি। শা ৮৩।৫৬

অস্থিরবুদ্ধি, ইহারা শুনিলে মন্ত্রভেদের আশঙ্কা। আর বামন-কুব্জাদি বিকলাঙ্গ জন্মান্তরীয় দুষ্কৃতিবশে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহারা একটু অবমানিত হইলেই স্থির থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগকেও বিশ্বাস করিতে নাই।[৩০]

গিরিপৃষ্ঠ বা নির্জ্জন প্রাসাদে—গিরিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অথবা নির্জ্জন প্রাসাদোপরি অবস্থিত হইয়া মন্ত্রণা করার কথা বিদুরনীতিতে উল্লিখিত হইয়াছে।[৩১]

নৌকায় বসিয়া পরিষ্কার স্থানে—গুরুতর কোন বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে হইলে নৌকায় আরোহণ করিয়া কুশকাশাদিবিহীন পরিষ্কার স্থানে গমন করিবে। বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, শব্দ যেন নৌকার বাহিরে না যায়। চোখ, মুখ ও হাতপায়ের ভাবভঙ্গী বর্জ্জন করিতে হইবে।[৩২]

মন্ত্রী ভিন্ন অপরের উপস্থিতি নিষিদ্ধ—মন্ত্রী ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি মন্ত্রণাস্থানে থাকিতে পারিবেন না। এমন কি, মনুষ্যভাষার অনুকারী পক্ষী প্রভৃতিকেও মন্ত্রণা শুনাইতে নাই।

পক্ষী, বানর, জড়, পঙ্গু প্রভৃতি বর্জ্জনীয়—পক্ষী, বানর, জড়, পঙ্গু, অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি এবং রমণীর সাক্ষাতে মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য নহে।[৩৩]

অল্পপ্রজ্ঞ, দীর্ঘসূত্র প্রভৃতি বর্জ্জনীয়—বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া কাহারও সহিত মন্ত্রণা করিতে নাই। অল্পপ্রজ্ঞ, দীর্ঘসূত্র, চারণ, অলস, এবং হর্ষতরল পুরুষ মন্ত্রণাকার্য্যে বর্জ্জনীয়।[৩৪]

অননুরক্ত মন্ত্রী বর্জ্জনীয়—মন্ত্রী যদি রাজার প্রতি সম্যক্ অনুরক্ত না হন, তবে তাঁহার সহিতও মন্ত্রণা করিতে নাই। তাদৃশ মন্ত্রী অপর মন্ত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া রাজাকে সপরিবারে নাশ করিতে পারেন।[৩৫]

৩০ মনু ৭।১৫০

৩১ গিরিপৃষ্ঠমুপারুহ্য প্রাসাদং বা রহো গতঃ। উ ৩৮।১৭

৩২ আরুহ্য নাবন্ত তথৈব শূন্যং। ইত্যাদি। শা ৮৩।৫৭

৩৩ নাসুহৃৎ পরমং মন্ত্রং ভারতার্হতি বেদিতুম্। উ ৩৮।১৮
বানরাঃ পক্ষিণশ্চৈব যে মনুষ্যানুসারিণঃ। ইত্যাদি। আশ্র ৫।২৩, ২৪। সভা ৪২।৮

৩৪ অল্পপ্রজ্ঞৈঃ সহ মন্ত্রং ন কুর্য্যান্ন দীর্ঘসূত্রৈ রভসৈশ্চারণৈশ্চ। উ ৩৩।৭৩

৩৫ মন্ত্রিণ্যননুরক্তে তু বিশ্বাসো নোপপদ্যতে। ইত্যাদি। শা ৮৩।৩০, ৩১

শত্রুপক্ষাবলম্বী বর্জ্জনীয়—যিনি শত্রুর সহিত গোপনে যোগ দেন ও ...রবাসীদের প্রতি সদ্‌ব্যবহার করেন না, তাহাকে মন্ত্রণার সহায়রূপে গ্রহণ ...রিতে নাই। অবিদ্বান্, অশুচি, স্তব্ধ, শত্রুসেবী, অহঙ্কারী, অসুহৃৎ, ক্রোধন ...বং লুব্ধ পুরুষ মন্ত্রণা শুনিবার অনুপযুক্ত।

নবীন মিত্রও বর্জ্জনীয়—নূতন আগন্তুক পুরুষ অনুরক্ত, বিদ্বান্ এবং ...নাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত হইলেও তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিতে নাই।

রাজদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুত্র বর্জ্জনীয়—কোন অন্যায় কাজ করিয়া ...হার পিতা পূর্ব্বে রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি সংকৃত এবং ...জসভায় সংস্থাপিত হইলেও মন্ত্রশ্রবণের অধিকারী নহেন। সামান্য কারণ-...শতঃ যিনি সুহৃদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারেন, নানা গুণ সত্ত্বেও ...াজমন্ত্রণা শ্রবণের যোগ্যতা তাঁহার থাকিতে পারে না। যে-ব্যক্তি কৃতপ্রজ্ঞ, ...মধাবী, সুপণ্ডিত, পরমপবিত্রস্বভাব, জনপদবাসী এবং বুদ্ধিমান, একমাত্র ...তনিই মন্ত্রশ্রবণের যোগ্য। যিনি শত্রুর ও মিত্রের প্রকৃতি জানিতে সমর্থ ...এবং যিনি সুহৃদকে আত্মবৎ মনে করেন, তাদৃশ মিত্রের সহিত মন্ত্রণা ...কর্ত্তব্য।[৩৬]

অপরিণামদর্শীর মন্ত্রণা অগ্রাহ্য—যিনি কাজের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে ...চিন্তা না করিয়া পরামর্শ দেন, তাঁহার পরামর্শ মোটেই গ্রাহ্য নহে।[৩৭]

স্বামী ও অমাত্যের মিলিত মন্ত্রণায় উন্নতি—স্বামী ও অমাত্যগণ ...পরস্পর মিলিত হইয়া বন্ধুভাবে যদি রাষ্ট্রের চিন্তা করেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ...উন্নতি সুনিশ্চিত। কায়মনোবাক্যে যাঁহারা প্রভুর উন্নতি কামনা করেন, ...তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা না করিয়া কোন কাজ করিতে নাই।[৩৮]

মন্ত্রণার পরক্ষণেই কাজ আরম্ভ করিতে নাই—মন্ত্রীদের সহিত কোন ...বিষয়ে মন্ত্রণা করিয়াই সেই অনুসারে কাজ আরম্ভ করিতে নাই। মন্ত্রীদের ...অভিমত যদি একরূপই হয়, তবে ভাল; তাঁহাদের মত বিভিন্নপ্রকারের ...হইলে সেইসকল মত এবং আপনার অভিমত সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া

---

৩৬ যোঽমিত্রৈঃ সহ সম্বদ্ধো ন পৌরান্ বহুমন্যতে। ইত্যাদি। শা ৮৩।৩৬-৪৬

৩৭ কেবলাৎ পুনরাদানাৎ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
পরামর্শো বিশেষাণামশ্রুতস্যেহ দুর্ম্মতেঃ॥ শা ৮৩।২৯

৩৮ রাজ্যং প্রণিধিমূলং হি মন্ত্রসারং প্রচক্ষতে। ইত্যাদি। শা ৮৩।৫১,৫২

নৃপতি ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম বিষয়ে বিচক্ষণ জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট সম নিবেদন করিবেন। তিনিও যদি মন্ত্রণা বিষয়ে একমত হন, তাহা হই তদনুসারে কাজ চলিতে পারে।[৩৯]

রাজপুরোহিত সকলের উপরে—উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা য মন্ত্রীরাও মন্ত্রণা বিষয়ে চরম প্রমাণ নহেন। রাজগুরুই (পুরোহিত) সকলে উপরে। তাঁহার পরামর্শ চরম বলিয়া গৃহীত হইবে।

মন্ত্রীদের প্রতি রাজার ব্যবহার—কাহাকেও আপনার বন্ধুরূপে দেখিং হইলে তাঁহার প্রতি স্নিগ্ধ ব্যবহার করা উচিত, ইহা সকলেই জানেন কেবল অর্থের দ্বারা কাহাকেও সম্পূর্ণ আপন করা যায় না। এরূপ অসংখ উক্তি আছে যে, সুহৃৎকে লাভ করা অপেক্ষা সৌহৃদ্য রক্ষা করা কঠিন মন্ত্রিপ্রমুখ অমাত্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সেই বিষয়ে উপদেশও রাজধর্ম্ম-প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে।

উপযুক্ত পুরুষকে শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিয়োগ—যে-সকল অমাত্য শুদ্ধাচা ও সত্যনিষ্ঠ, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে রাজদরবারে স্থান পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিয়োগ করিবে।[৪০]

সম্মানের দ্বারা অমাত্যের চিত্ত জয়—অমাত্যগণকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিবে। সদৃশকর্ম্মে নিয়োগ করিলে কর্ম্মচারীরা সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি মহৎকার্য্যে নিয়োগের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই কার্য্যেই নিয়োগ করিবে, ইহাতে শ্রেয়োলাভ সুনিশ্চিত। যাঁহাকে যে-ভাবে সম্মানিত করা সুশোভন, সেইভাবেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবে। সুসঙ্গত সম্মানের দ্বারা সহজেই চিত্তকে জয় করা যায়।[৪১]

শুভানুধ্যায়ী অমাত্য পিতৃবৎ বিশ্বস্ত—যিনি মেধাবী স্মৃতিমান এবং দক্ষ, যে অমাত্য অবমানিত হইলেও অপকারের চিন্তা করেন না, তিনি

৩৯ তেষাং ত্রয়াণাং বিবিধং বিমর্ষং বিবুধ্য চিত্তং বিনিবেশ্য তত্র।
স্বনিশ্চয়ং তৎপ্রতিনিশ্চয়জ্ঞং নিবেদয়েদুত্তরমন্ত্রকালে॥ ইত্যাদি। শা ৮৩।৫৩, ৫৪

৪০ অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃপৈতামহান্ শুচীন্।
শ্রেষ্ঠান্ শ্রেষ্ঠেষু কচ্চিত্ত্বং নিযোজয়সি কর্ম্মসু॥ সভা ৫।৪৩

৪১ পূজিতাঃ সম্বিভক্তাশ্চ সুসহায়াঃ স্বনুষ্ঠিতাঃ। ইত্যাদি। শা ৮০।২৯, ৩০
যথার্হপ্রতিপূজা চ শস্ত্রমেতদনায়সম্। শা ৮১।২১

ঋত্বিক্, আচার্য্য বা প্রিয়সুহৃদ্-রূপে যদি রাজগৃহে বাস করেন, তবে নরপতি তাঁহাকে সমধিক সম্মান করিবেন এবং পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিবেন।[৪২]

অমাত্যের সম্মানে শ্রীবৃদ্ধি—কৃতজ্ঞ প্রাজ্ঞ দৃঢ়ভক্তি অমাত্য যথোচিত সম্মানিত হইলে রাজ্যের কল্যাণ অবধারিত।[৪৩]

সদৃশকর্ম্মে নিয়োগ—মন্ত্রীকে মন্ত্রণাকার্য্যে নিয়োগ না করিয়া যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আধকারে নিয়োগ করা হয়, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। উপযুক্ত ব্যক্তি সদৃশ কাজ না পাইলে সুখী হইতে পারেন না।[৪৪]

পাত্রমিত্রকে অসন্তুষ্ট করিতে নাই—বৃদ্ধিকাম নরপতি পাত্রমিত্রকে কখনও অসন্তুষ্ট করিবেন না; তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত না হইলে নানাবিধ অনিষ্টের আশঙ্কা। রাজা প্রাতঃকালেই বিদ্যাবৃদ্ধ শুভানুধ্যায়িগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাঁহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিবেন। তাঁহাদের সম্মানের ক্রটি না হইলে রাজ্যের সমূহ মঙ্গল হইয়া থাকে।[৪৫]

রাজার প্রতি মন্ত্রীর ব্যবহার, আনুগত্য—রাজার অনুমতি লইয়া রাজ্য শাসন করিতে হয়। কখনও রাজাকে অবজ্ঞা করিতে নাই।[৪৬]

অপৃষ্ট হইলেও হিতবাক্য বলিতে হয়—সময়বিশেষ অপৃষ্ট হইয়াও রাজাকে হিতবাক্য বালতে হয়। এই গুণটি ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী বিদুরের মধ্যে খুবই প্রকটিত। ধৃতরাষ্ট্র যদি তাঁহার মন্ত্রণা-মত চলিতেন, তাহা হইলে কুরুপাণ্ডবের বিবাদ ঘটিতে পারিত না। সংসারে অপ্রিয় অথচ পথ্য বচনের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ।[৪৭]

৪২ মেধাবী স্মৃতিমান্ দক্ষঃ প্রকৃত্যা চানৃশংসবান্। ইত্যাদি। শা ৮০।২২-২৪

৪৩ ধর্ম্মনিষ্ঠং স্থিতং নীত্যাং মন্ত্রিণং পূজয়েন্নৃপঃ। শা ৬৮।৫৬

৪৪ স্বজাতিগুণসম্পন্নাঃ স্বেষু কর্ম্মসু সংস্থিতাঃ।
প্রকর্ত্তব্যা হ্যমাত্যাস্তু নাস্থানে প্রক্রিয়া ক্ষমা। শা ১১৯।৩

৪৫ ন বিমানয়িতব্যাস্তে রাজ্ঞা বৃদ্ধিমভীপ্সতা। শা ১১৮।২৪
প্রাতরুত্থায় তান্ রাজন্ পূজয়িত্বা যথাবিধি। ইত্যাদি। আশ্র ৫।১১, ১২

৪৬ রাষ্ট্রং তবানুশাসন্তি মন্ত্রিণো ভরতর্ষভ। ইত্যাদি। সভা ৫।৪৪, ৪৫

৪৭ সুলভাতে খলু পাপীয়ান্ নরঃ সুপ্রিয়বাগিহ।
অপ্রিয়স্য হি পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ। সভা ৬৪।১৬। উ ৩৭।৩৫

অপ্রিয় হইলেও হিতকথা বলিতে হয়—কেহ কেহ সৌহৃদ্য নষ্ট হইবে ভাবিয়া রাজার দোষের উল্লেখ করেন না। আবার কেহ কেহ স্বার্থসাধনের নিমিত্ত নিয়ত প্রিয়বাক্যই বলিয়া থাকেন। অপ্রিয় হিত-বচনের শ্রোতা পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু কোন কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষ হিতকর অপ্রিয় বাক্য শুনিলেও বিচলিত হন না, বরং সংশোধনের চেষ্টা করেন।[৪৮]

হিতবক্তা অমাত্যই উত্তম—আপাততঃ অপ্রিয় হইলেও প্রকৃত সুহৃদ্ ব্যক্তি পথ্য বচন বলিতে কুণ্ঠিত হন না। মন্ত্রণাকালে মহামতি বিদুর দুইবার ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন—"রাজন্, যে মন্ত্রী যথার্থ ধার্ম্মিক, তিনি স্বামীর প্রিয় বা অপ্রিয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া হিতবাক্যই বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সেইরূপ মন্ত্রীই নৃপতির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ"।[৪৯] মন্ত্রিত্বকেও সাধারণ চাকুরীর মত মনে করিলে এতটা নির্ভীকতাপ্রদর্শন সম্ভবপর হইতে পারে না। অপর চাকুরী অপেক্ষা ইহার দায়িত্ব বেশী মনে করিলেই অপ্রিয় পথ্যবচন বলিবার মত সাহস থাকিতে পারে। তাদৃশ সাহসিকতার ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার করা শক্ত। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সকল সময় তাহার ফল বক্তার পক্ষে শুভ হয় না। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও স্পষ্টবাদী বিদুরের হিতবচন সকল সময় সহ্য করিতে পারেন নাই।[৫০] এই কারণেই সম্ভবতঃ অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, নৃপতিদের অনভিলষিত বা অপ্রিয় কোন কথা তাঁহাদিগকে বলিতে নাই।[৫১]

সভাসদ্—মন্ত্রী ব্যতীত আরও কয়েকজন সভাসদ্-নিযুক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদেরও গুণাগুণ-পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

শূর, বিদ্বান্ ও উৎসাহী পুরুষ প্রশস্ত—যাঁহারা স্বভাবতঃ লজ্জাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, সরল, প্রিয়াপ্রিয়কথনে সমর্থ, রাজা তাঁহাদিগকে সভাসদ্রূপে নিযুক্ত করিবেন। শূর, বিদ্বান্, ব্রাহ্মণ, সন্তুষ্ট ও উৎসাহী পুরুষ রাজসভায় স্থান পাইবার উপযুক্ত। কুলীন, রূপবান্, অনুরক্ত

৪৮ কেচিদ্ধি সৌহৃদাদেব ন দোষং পরিচক্ষতে।
স্বার্থহেতোস্তথৈবান্যে প্রিয়মেব বদন্ত্যত॥ ইত্যাদি। সভা ১৩।৪৯, ৫০

৪৯ যস্তু ধর্ম্মপরশ্চ স্যাদ্ধিত্বা ভর্ত্তুঃ প্রিয়াপ্রিয়ে।
অপ্রিয়াণ্যাহ পথ্যানি তেন রাজা সহায়বান্॥ সভা ৬৪।১৭। উ ৩৭।১৬

৫০ যথেচ্ছকং গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ত্বম্। ইত্যাদি। বন ৪।২১

৫১ যত্তস্যার্থো ন রোচেত ন তং তস্য প্রকাশয়েৎ। ইত্যাদি। শা ৮০।৫। বি ৪।১৬, ৩২

শক্তিশালী, সন্দেশোৎপন্ন, বহুশ্রুত এবং সদ্‌বক্তা পুরুষকে রাজা সভাসদরূপে বরণ করিবেন।[৫২]

লুব্ধ ও নৃশংস পুরুষ পরিত্যাজ্য—দৌষ্কুলেয়, লুব্ধ, নৃশংস, নির্লজ্জ পুরুষ কেবল সুসময়ের বন্ধু।[৫৩]

পণ্ডিতকে স্থান দেওয়া শ্রেয়স্কর—বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে রাজসভায় বিশিষ্ট আসন প্রদানের বিধান ছিল। সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতকে স্থান দেওয়া ভাল, এই কথা বহুস্থানে বলা হইয়াছে।[৫৪]

সামুদ্রিক পণ্ডিতের স্থান—সামুদ্রিক এবং উৎপাতলক্ষণজ্ঞ একজন জ্যোতিষী দৈবজ্ঞকে রাজসভায় একখানি বিশেষ আসন দিবার নিয়ম ছিল।[৫৫]

রাজসভায় জ্ঞানিসমাগম—তখনকার রাজসভায় আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, লোমশ, মার্কণ্ডেয়, মৈত্রেয় প্রমুখ দেবর্ষি, মহর্ষি এবং আচার্য্যগণ রাজার নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। সময়-সময় তাঁহারা কিছুদিন রাজপুরীতে অবস্থানও করিতেন। রাজনিযুক্ত স্থায়ী সভাসদ্ ব্যতীত এইসকল মহাজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ প্রায় সব সময়েই আপন উপস্থিতি দ্বারা রাজসভাকে ধন্য করিতেন। তাঁহাদের অর্চ্চনার নিমিত্ত রাজারাও অবহিত থাকিতেন। দ্বারপাল তাঁহাদের পথ রুদ্ধ করিত না। সময়-অসময়ে যখন ইচ্ছা তখনই তাঁহারা রাজসভায় প্রবেশ করিতে পারিতেন। এইসকল মনীষী আচার্য্যগণের নানাবিধ উপদেশ ও বর্ণিত উপাখ্যানে রাজাপ্রজার যে কত শিক্ষা হইত, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। শিষ্যগণ তাঁহাদের সহচর হইতেন। কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে রাজা সেইসকল জ্ঞানীদের নিকট বিনীতভাবে

৫২ হ্রীনিষেবাস্তথা দান্তাঃ সত্যার্জ্জবসমন্বিতাঃ।
শক্তাঃ কথয়িতুং সম্যক্ তে তব স্যুঃ সভাসদঃ॥ ইত্যাদি। শা ৮৩।২-৬, ১০

৫৩ তে ত্বাং তাত নিষেবেয়ুর্যাবদার্দ্রকপাণয়ঃ। শা ৮৩।৭

৫৪ ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তত্র পরিবার্য্যোপতস্থিরে। ইত্যাদি। মৌ ৭।৮। আদি ২০৭।৩৮
একো হি বহুভিঃ শ্রেয়ান্ বিদ্বান্ সাধুরসাধুভিঃ। বন ৯৯।২২
কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতম্। সভা ৫।৩৫

৫৫ কচ্চিদঙ্গেষু নিষ্ণাতো জ্যোতিষঃ প্রতিপাদকঃ।
উৎপাতেষু হি সর্ব্বেষু দৈবজ্ঞঃ কুশলস্তব॥ সভা ৫।৪২

তাহা নিবেদন করিতেন, তাঁহারাও প্রশ্নের যথোচিত মীমাংসা করিয়া সংশয় অপনোদন করিতেন। তাঁহারা কখন কখন অপৃষ্ট হইয়াও রাজ্যের কল্যাণার্থে নানাবিধ উপদেশ দিতেন। রাজারা তাহাতে আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। সুতরাং অস্থায়ী হইলেও তাঁহাদিগকে সাময়িক সভাসদ্ বলা যাইতে পারে। (দ্রঃ 'শিক্ষা' প্রবন্ধ ১৪১ তম ও ১৪৪ তম পৃঃ।)

মিত্রপরিজ্ঞান ও মিত্রসংগ্রহ—মিত্রসংগ্রহ করিতে না পারিলে রাজ্য রক্ষা করা অসম্ভব। দান, প্রিয়বচন, উদার ও অমায়িক ব্যবহার মিত্রসংগ্রহের অনুকূল। দৃঢ়ভক্তি, কৃতপ্রজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, অক্ষুদ্রকর্ম্মা ও কৃত্যপটু পুরুষকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা উচিত।[৫৬]

সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিই মিত্র—রাজার সমৃদ্ধিদর্শনে যাঁহার পরিতৃপ্তি হয়, অথচ ক্ষয়দর্শনে যিনি অতিশয় দুঃখিত হন, তিনিই পরম মিত্র।[৫৭]

ভাবী রাজাকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিতে নাই—আপনার মৃত্যুর পরে যাঁহার রাজা হওয়ার সম্ভাবনা, তিনি ভ্রাতা, জ্ঞাতি বা পুত্র হইলেও তাঁহাকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা অনুচিত।[৫৮]

রাজার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বিশ্বস্ত—শত্রুর সহিত যাঁহার অল্পমাত্রও সম্বন্ধ আছে, তিনি কখনও মিত্ররূপে গৃহীত হইতে পারেন না। রাজার অবর্ত্তমানে যিনি নিজের সমূহ অকল্যাণ হইবে বলিয়া মনে করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র। তাঁহাকে পিতৃবৎ বিশ্বাস করা যাইতে পারে।[৫৯]

অনিষ্টে হৃষ্ট ব্যক্তি পরম শত্রু—রাজার ক্ষতিকে যিনি আত্মক্ষতিরূপে

৫৬ দৃঢ়ভক্তিং কৃতপ্রজ্ঞং ধর্ম্মজ্ঞং সংযতেন্দ্রিয়ম্।
শূরমক্ষুদ্রকর্ম্মাণং নিষিদ্ধজনমাশ্রয়েৎ॥ শা ৬৮।৫৭

৫৭ যস্ত বৃদ্ধ্যা ন তৃপ্যেত ক্ষয়ে দীনতরো ভবেৎ।
এতদুত্তমমিত্রস্য নিমিত্তমিতি চক্ষতে॥ শা ৮০।১৬

৫৮ যং মন্যেত মমাভাবাদিমমর্থাগমং স্পৃশেৎ।
নিত্যং তস্মাচ্ছঙ্কিতব্যমমিত্রং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ॥ শা ৮০।১৩

৫৯ যস্য ক্ষেত্রাদপ্যুদকং ক্ষেত্রমন্যস্য গচ্ছতি। ইত্যাদি। শা ৮০।১৪, ১৫
যন্মন্যেত মমাভাবাদস্যাভাবো ভবেদিতি।
তস্মিন্ কুর্ব্বীত বিশ্বাসং যথা পিতরি বৈ তথা॥ শা ৮০।১৭

জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র, আর যিনি রাজার ক্ষতিদর্শনে আনন্দিত হন, তাঁহাকেই প্রকৃত শত্রুরূপে জ্ঞান করিবে।[৬০]

ব্যসনে ভীত পুরুষ আত্মতুল্য—যে-পুরুষ ব্যসনকে অতিশয় ভয় করেন এবং আপন সমৃদ্ধি দ্বারা কাহারও অনিষ্ট করেন না, তেমন পুরুষকে আত্মতুল্য বলিয়া জানিবে। যাঁহার আকৃতি ও কণ্ঠস্বর উত্তম, যিনি তিতিক্ষু, সৎকুলোৎপন্ন এবং অসূয়াশূন্য, তাঁহাকে ভূপতি মিত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারেন।[৬১] যিনি যশস্বী, কখনও নীতিবিগর্হিত কাজ করেন না, কামক্রোধাদিবশতঃ যিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন না, যাঁহার দক্ষতা, সত্যনিষ্ঠা এবং যথার্থবাদিতা অনন্য-সাধারণ, তাঁহাকে মিত্ররূপে লাভ করা ভূপতির পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ।[৬২]

পণ্ডিত শত্রুও ভাল, মূর্খ মিত্রও ভাল নহে—পণ্ডিত যদি শত্রু হন তাহাও ভাল ; কিন্তু মূর্খের সহিত মিত্রতা করা উচিত নহে।[৬৩]

বিদ্যাদি সহজ মিত্র এবং গৃহ-ক্ষেত্রাদি কৃত্রিম মিত্র—বিদ্যা, শৌর্য্য, বল, দক্ষতা এবং ধৈর্য্য এই পাঁচটি মানবের সহজাত পরম মিত্ররূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। গৃহ, তাম্রাদি পাত্র, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃজ্জন এই পাঁচকে পণ্ডিতেরা উপধিমিত্র অর্থাৎ কৃত্রিম মিত্র বলিয়া থাকেন। প্রয়োজনবোধে উপধিমিত্রকে ত্যাগ করা চলে।[৬৪]

পরোক্ষে নিন্দাকীর্ত্তন ইত্যাদি শত্রুর কার্য্য—যিনি পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকেন এবং গুণের কথা শুনিলে অসূয়া করেন, অন্য কেহ গুণকীর্ত্তন করিলেও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অন্যমনস্কভাবে থাকেন, গুণকীর্ত্তনকালে মুহুর্মুহুঃ ওষ্ঠদংশন ও শিরঃকম্পন করেন এবং যেন অনেকটা অসংলগ্নভাবে কথাবার্ত্তা বলেন, প্রতিশ্রুত কাজ করিতেও আগ্রহ প্রকাশ করেন না, দেখা হইলেও কথা

৬০ ক্ষতাস্তীতং বিজানীয়াদুত্তমং মিত্রলক্ষণম্।
যে তস্য ক্ষতিমিচ্ছন্তি তে তস্য রিপবঃ স্মৃতাঃ॥ ইত্যাদি। শা ৮০।১৯। শা ১০৩।৫০

৬১ ব্যসনান্নিত্যভীতো যঃ সমৃদ্ধ্যা যো ন দুষ্যতি।
যৎ স্যাদেবংবিধং মিত্রং তদাত্মসমমুচ্যতে॥ শা ৮০।২০
রূপবর্ণস্বরোপেতস্তিতিক্ষুরনসূয়কঃ। ইত্যাদি। শা ৮০।২১

৬২ কীর্ত্তিপ্রধানো যস্তু স্যাদ্ যশ্চ স্যাৎ সময়ে স্থিতঃ। ইত্যাদি। শা ৮০।২৬, ২৭

৬৩ শ্রেষ্ঠো হি পণ্ডিতঃ শত্রুর্ন চ মিত্রমপণ্ডিতঃ। শা ১৩৮।৪৬

৬৪ বিদ্যা শৌর্য্যঞ্চ দাক্ষ্যঞ্চ বলং ধৈর্য্যঞ্চ পঞ্চমম্। ইত্যাদি। শা ১৩৯।৮৫, ৮৬

বলেন না, একসঙ্গে ভোজনাদি পছন্দ করেন না, তাঁহাকে শত্রু বলিয়া জানিবে।[৬৫]

যিনি কদাচ অনিষ্ট চিন্তা করেন না তিনিই প্রকৃত মিত্র—স্বামী অধিকারচ্যুত করিলে বা পরুষ বাক্যে ভৎর্সনা করিলেও যিনি তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তিনিই প্রকৃত মিত্র।[৬৬]

শত্রুমিত্র-নির্ণয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগমপ্রমাণের সাহায্যে শত্রু ও মিত্র স্থির করিতে হয়। লোকটি উপকারী কি অপকারী, ইহা তাহার আচরণ প্রত্যক্ষ করিলেই বুঝা যায়। চোখমুখের হাবভাবদ্বারা মনোগত অভিসন্ধির অনুমান করা কঠিন নহে। অপর লোকদের সহিত কৃত ব্যবহার দেখিয়াও চরিত্র স্থির করা যায়, আবার সামুদ্রিকাদি শুভাশুভসূচক আগমের দ্বারা শরীরচিহ্ন পরীক্ষা করিয়াও চরিত্র স্থির করা যাইতে পারে। বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ বা শত্রু বলিয়া ত্যাগ করা উচিত নহে।[৬৭]

শত্রুতা ও মিত্রতা অহেতুক নহে—শত্রু-মিত্র স্থির করা কঠিন ব্যাপার, খুব বিবেচনার সহিত স্থির করিতে হয়। এই জগতে সচরাচর কেহই অহেতুক শত্রু বা মিত্র হয় না। স্বার্থসাধনের নিমিত্তই মানুষ মানুষের সঙ্গে মিত্রতা বা শত্রুতা করিয়া থাকে।[৬৮]

ভ্রাতা, ভার্য্যা প্রভৃতি অহেতুক মিত্র নহেন—ভ্রাতায়-ভ্রাতায় বা স্বামী-স্ত্রীতে যে সৌহার্দ্দ্য জন্মে, তাহাও নিষ্কারণ নহে। (বৃহদারণ্যক-উপনিষদের "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি"—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তির সঙ্গে মিল দেখিতে পাই।) ভ্রাতা, স্ত্রী প্রভৃতি সম্পর্কিত স্বভাবমিত্রগণ

৬৫ পরোক্ষমগুণানাহ সদ্গুণানভ্যসূয়তে। ইত্যাদি। শা ১০৩।৪৬-৪৯

৬৬ সংক্রুদ্ধশ্চৈকদা স্বামী স্থানাচ্চৈবাপকর্ষতি। ইত্যাদি। শা ৮৩।৩২-৩৪

৬৭ প্রত্যক্ষেণানুমানেন তথোপম্যাগমৈরপি।
পরীক্ষ্যাস্তে মহারাজ স্বে পরে চৈব নিত্যশঃ॥ শা ৫৬।৪১

৬৮ বেদিতব্যানি মিত্রাণি বিজ্ঞেয়াশ্চাপি শত্রবঃ।
এতৎ সুসূক্ষ্মং লোকেঽস্মিন্ দৃশ্যতে প্রাজ্ঞসম্মতম্॥ শা ১৩৮।১৩৭
ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্ রিপুঃ।
অর্থতস্তু নিবধ্যন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥ শা ১৩৮।১১০

কারণাধীন কুপিত হইলেও কিছুকাল পরে পুনরায় মিত্রতাই করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্যের পক্ষে প্রায়ই তাহা সম্ভবপর হয় না।[৬৯]

শত্রু ও মিত্রের উৎপত্তি কারণাধীন—সৌহৃদ্য বা শত্রুতা প্রায়ই চিরদিন স্থির থাকে না, শত্রু বা মিত্রের উদ্ভব প্রয়োজনের অধীন। কাল-বিশেষে মিত্র ও শত্রুর বিপর্য্যয় ঘটা অসম্ভব নহে, যেহেতু মানব সাধারণতঃ স্বার্থের দাসত্ব করিয়া থাকে। যিনি প্রয়োজন না বুঝিয়া মিত্রের উপরে অত্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করেন, অথবা শত্রুকে অতিশয় দ্বেষ্য মনে করেন, তাঁহার শ্রী চঞ্চলা। অবিশ্বস্তে বিশ্বাস এবং বিশ্বস্তে অতিবিশ্বাস উভয়ই সঙ্গত নহে। অবস্থাবিবেচনায় প্রিয়তমা পত্নী এবং প্রিয়তম পুত্রকেও পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং স্বার্থ বা আত্মরক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা।[৭০]

মিত্রগ্রহণে এবং পরিত্যাগে দীর্ঘকাল পরীক্ষা—বহুদিন পরীক্ষা করিয়া মিত্র নির্দ্ধারণ করিতে হয়, আর যাহাকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা যায়, তাহাকে ত্যাগ করিতেও দীর্ঘকাল পরীক্ষা করা দরকার। সবিশেষ পরীক্ষিত মিত্রকে প্রায়ই বিপরীত আচরণ করিতে দেখা যায় না।[৭১] যে-মিত্র ভয়বিচলিত, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে রক্ষা করা উচিত।[৭২]

মৈত্রীনাশক পুরুষ হতভাগ্য—মৈত্রী-সংস্থাপনের পর যদি যথারীতি পালন করা না হয়, তবে তাহার ফল বিশেষ কষ্টদায়ক। যাহার দোষে মৈত্রী নাশ হয়, সেই হতভাগ্য প্রায়ই আপৎকালে মিত্র লাভ করিতে পারে না। মিত্ররক্ষণে কখনও শৈথিল্য করিতে নাই, তাহাতে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা।[৭৩]

৬৯ কারণাৎ প্রিয়তামেতি দ্বেষ্যো ভবতি কারণাৎ।
অর্থার্থী জীবলোকোঽয়ং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ প্রিয়ঃ॥ ইত্যাদি। শা ১৩৮।১৫১-১৫৪

৭০ নাস্তি মৈত্রী স্থিরা নাম ন চ ধ্রুবমসৌহৃদম্।
অর্থযুক্ত্যা তু জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥ ইত্যাদি। শা ১৩৮।১৪১-১৪৬

৭১ চিরেণ মিত্রং বধ্নীয়াচ্চিরেণ চ কৃতং ত্যজেৎ।
চিরেণ হি কৃতং মিত্রং চিরং ধারণমর্হতি॥ শা ২৬৫।৬৯

৭২ যন্মিত্রং ভীতবৎ সাধ্যং যন্মিত্রং ভয়সংহিতম্।
সুরক্ষিতব্যং তৎকার্য্যং পাণিঃ সর্পমুখাদিব॥ শা ১৩৮।১০৮

৭৩ কৃত্বা হি পূর্ব্বং মিত্রাণি যঃ পশ্চান্নানুতিষ্ঠতি।
ন স মিত্রাণি লভতে কৃচ্ছ্রাস্বাপৎসু দুর্ম্মতিঃ॥ শা ১৩৮।১২৮
ন হি রাজ্ঞা প্রমাদো বৈ কর্ত্তব্যো মিত্ররক্ষণে॥ শা ৮০।৭

বিনষ্ট মৈত্রীকে পুনঃ স্থাপন করা ভাল নহে—রাজার অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া রাজপুরীতে বাস করা ভাল নহে। যে-স্থানে প্রথমতঃ সম্মান এবং পরে কোন কারণাধীন অপমান হইয়া থাকে, সেই স্থানে বাস করা পণ্ডিতগণ অনুমোদন করেন না। একবার মিত্রতা ভাঙ্গিলে তাহাকে পুনরায় জোড়া দেওয়া যায় না। সুতরাং তখন পুনঃ-সংস্থাপনের চেষ্টা না করাই ভাল। স্নেহ বা প্রীতি কেবল একের মধ্যে থাকিতে পারে না, উভয়তঃ প্রীতি না থাকিলে মিত্রতার সম্ভব কোথায় ?[৭৪]

জ্ঞাতির প্রতি ব্যবহার—জ্ঞাতি এবং অপরাপর আত্মীয়দের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সেই বিষয়ে 'পারিবারিক ব্যবহার'—নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। (দ্রঃ ২৩২তম পৃঃ ।)

পুরোহিত—সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত একজন পুরোহিত বরণ করিতে হয়। সমস্ত পাত্রমিত্র অপেক্ষা তাঁহার দায়িত্ব বেশী।

বিদ্বান্, মন্ত্রবিৎ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণের নিয়োগ—পুরোহিতের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যিনি যাবতীয় অনিষ্টের প্রশমন এবং ইষ্টের বর্দ্ধনে সমর্থ, যিনি বিদ্বান্, মন্ত্রবিৎ এবং বহুশ্রুত, যিনি রাজার ধর্ম্ম ও অর্থ—এই উভয়ের উন্নতিসাধনে সমর্থ, তিনিই পৌরোহিত্য-গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। ষড়ঙ্গবেদ-নিরত, শুচি, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা, কৃতাত্মা ব্রাহ্মণই পৌরোহিত্যের অধিকারী। রাষ্ট্রের সমস্ত ভার রাজার উপর ন্যস্ত, রাজার কল্যাণ-অকল্যাণের সমস্ত ভার যিনি গ্রহণ করেন, তিনিই পুরোহিত।[৭৫]

ব্রহ্মশক্তি ও ক্ষত্রশক্তির মিলনে শ্রীবৃদ্ধি—রাজা শুধু দৃষ্ট ভয়ের প্রতীকার করিতে পারেন, পুরোহিতের শক্তি অসীম, তিনি অদৃষ্ট ও অনাগত বিষয়েরও প্রতীকার করিতে সমর্থ। মুচুকুন্দোপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে-রাজা

৭৪ পূর্ব্বং সম্মাননা যত্র পশ্চাচ্চৈব বিমাননা।
ন তং ধীরাঃ প্রশংসন্তি সম্মানিতবিমানিতম্॥ ইত্যাদি। শা ১১১।৮৫, ৮৭

৭৫ য এব তু সতো রক্ষেদসতশ্চ নিবর্ত্তয়েৎ।
স এব রাজ্ঞা কর্ত্তব্যো রাজন্ রাজপুরোহিতঃ॥ ইত্যাদি। শা ৭২।১। শা ৭৩।১
বেদে ষড়ঙ্গে নিরতাঃ শুচয়ঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মাত্মানঃ কৃতাত্মানঃ স্যুর্নৃপানাং পুরোহিতাঃ॥ আদি ১৭০।৭৫
যোগক্ষেমো হি রাজ্ঞো হি সমায়ত্তঃ পুরোহিতে। শা ৭৪।১

সকল কাজে পুরোহিতের আদেশ পালন করেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীকে জয় করতে সমর্থ। তেজস্বী তাপস ব্রাহ্মণের ব্রহ্মশক্তি এবং ক্ষত্রিয়ের বাহুবল সম্মিলিত হইলেই রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, অন্যথা নহে।[৭৬] পুরোহিতবরণের অপরিহার্য্যতা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে এইসকল প্রকরণ অনুধাবনযোগ্য।

পুরোহিতের পরামর্শে চলিলে উন্নতি নিশ্চিত—গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ পুরোহিত নিয়োগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে বহু উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণকে অগ্রগামী না করিলে ক্ষত্রিয়ের জয়ের কোন ভরসা থাকে না। ব্রহ্মপুরস্কৃত ক্ষত্রিয় সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া থাকেন। সমস্ত শ্রেয়ঃকর্ম্মে পুরোহিতকে অগ্রে স্থাপন করিলে সিদ্ধি নিশ্চিত। যিনি ধর্ম্মবিৎ বাগ্মী সুশীল শুচি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার রাজ্যের উন্নতি বিষয়ে কোন সংশয় নাই। পুরোহিতের উপদেশ যিনি সশ্রদ্ধভাবে শ্রবণ করেন, সসাগরা পৃথিবী তাঁহার হাতে আপনিই উপস্থিত হয়। কেবল শৌর্য্য ও সাহসের দ্বারা রাজা কোন বড় কাজ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ্যের সহিত মিলিত না হইলে ক্ষত্রশক্তি নিতান্তই নিষ্প্রভ। ব্রাহ্মণ-পরিচালিত রাজ্য সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ।[৭৭]

বৃহস্পতি ও বশিষ্ঠাদির পৌরোহিত্যের ফল—গন্ধর্ব্বরাজ আরও বলিয়াছেন যে, "দেবরাজ ইন্দ্র পুরোহিত বৃহস্পতির সাহায্যেই দেবরাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের বিদ্যাবুদ্ধিবলে বহু প্রাচীন নৃপতি যাগ-যজ্ঞ দ্বারা উন্নত হইয়াছিলেন। সুতরাং হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, তুমিও একজন ধার্ম্মিক বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্যে বরণ কর। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমেই পুরোহিতকে বরণ করা উচিত। ধর্ম্মকামার্থতত্ত্ববিৎ পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীত কোন রাজাই উন্নত হইতে পারেন নাই। গুণবান্, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ ও তেজস্বী একজন ব্রাহ্মণকে তুমি নিশ্চয়ই বরণ করিবে—আমি এই

৭৬ এবং যো ধর্ম্মবিদ্ রাজা ব্রহ্মপূর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
জয়ত্যবিজিতামূর্ব্বীং যশশ্চ মহদশ্নুতে॥ ইত্যাদি। শা ৭৪।২১, ২২

৭৭ যস্তু স্যাং কামবৃত্তোঽপি পার্থ ব্রহ্মপুরস্কৃতঃ।
জয়েন্নক্তঞ্চরান্ সর্ব্বান্ স পুরোহিতধুর্গতঃ॥ ইত্যাদি। আদি ১৭০।৭৩-৮০

আশা করি”।[৭৮] বৃহস্পতি এবং বশিষ্ঠের উদাহরণে বুঝা যায় যে, পুরোহিতগণ যাজনের সহিত গুরুতর মন্ত্রণার দায়িত্বও গ্রহণ করিতেন। নারদীয় রাজনীতিতে বর্ণিত হইয়াছে “বিনয়সম্পন্ন, বহুশ্রুত, সৎকুলোদ্ভব, শাস্ত্রচর্চ্চাকুশল, ঋজু, মতিমান্, অনসূয়ু বিপ্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে হয়। পুরোহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেরও তত্ত্বাবধান করিবেন”।[৭৯]

পাণ্ডব কর্ত্তৃক ধৌম্যের বরণ—গন্ধর্ব্বরাজের নির্দ্দেশ-অনুসারে পাণ্ডবগণ উৎকোচকতীর্থস্থিত ধৌম্যের আশ্রমে গিয়া পৌরোহিত্য-গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। ধৌম্য স্বীকৃত হইলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের কৃতকৃত্য মনে করিতে লাগিলেন।[৮০]

পাণ্ডবহিতার্থে ধৌম্যের কার্য্য—পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবদের সহিত দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে বাস করেন। অজ্ঞাতবাসের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পাণ্ডবগণকে নানা নীতি-উপদেশ দিয়া অগ্নিহোত্রের সমস্ত উপকরণ সঙ্গে লইয়া তিনি পাঞ্চালে চলিয়া যান।[৮১] বিরাটপুরীতে প্রবেশের পূর্ব্বে ধৌম্য পাণ্ডবগণকে রাজবসতি সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ মূল্যবান্। যুধিষ্ঠির সেই উপদেশ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “আমরা আপনার নিকট হইতে চমৎকার শিক্ষা লাভ করিলাম। জননী কুন্তী এবং মহামতি বিদুর ভিন্ন আর কে এমন শুভানুধ্যায়ী আছেন, যিনি এইরূপ উপদেশ দিবেন। আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত আর যাহা করিতে হয়, তাহা করিবেন”।[৮২] (ধৌম্যের উপদেশ পরে বিবৃত হইবে।)

৭৮ পুরোহিতমিমং প্রাপ্য বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্। ইত্যাদি। আদি ১৭৪।১১, ১২
তস্মাদ্ধর্ম্মপ্রধানাত্মা বেদধর্ম্মবিদীপ্সিতঃ।
ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিৎ পুরোধাঃ প্রতিদৃশ্যতাম্। ইত্যাদি। আদি ১৭৪।১৩-১৫

৭৯ কচ্চিদ্ বিনয়সম্পন্নঃ কুলপুত্রো বহুশ্রুতঃ।
অনসূয়ুরনুপ্রষ্টা সৎকৃতস্তে পুরোহিতঃ॥ ইত্যাদি। সভা ৫।৪১, ৪২

৮০ তত উৎকোচকং তীর্থং গত্বা ধৌম্যাশ্রমন্তু তে।
তং বব্রুঃ পাণ্ডবা ধৌম্যং পৌরোহিত্যায় ভারত॥ ইত্যাদি। আদি ১৮৩।৬-১০

৮১ কৃত্বা তু নৈর্ঋতান্ দর্ভান্ ধীরো ধৌম্যঃ পুরোহিতঃ।
সামানি গায়ন্ যাম্যানি পুরতো যাতি ভারত॥ ইত্যাদি। সভা ৮০।২২। বি ৪।৫৭

৮২ অনুশিষ্টাঃ স্ম ভদ্রং তে নৈতদ্বক্তাস্তি কশ্চন।
কুন্তীমৃতে মাতরং নো বিদুরং বা মহামতিম্॥ বি ৪।৫২

রাজ্য-পরিচালনাদি বিষয়ে বিশেষ কোনও পরামর্শ দিতে ধৌম্যকে কখনও দেখা যায় নাই, সম্ভবতঃ তিনি যজনাদি কর্ম্মেই বেশী সময় কাটাইতেন।

সোমক-রাজার পুরোহিত—সোমকরাজবংশেরও একজন মন্ত্রবিৎ পবিত্র পুরোহিতের উল্লেখ আছে। তাঁহার যাজনকর্ম্ম ছাড়া অপর কর্ম্মেরও উল্লেখ করা হইয়াছে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পুরোহিতের বিশ্বস্ততা—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লক্ষ্যবেধের পর দ্রুপদরাজা লক্ষ্যবেদ্ধার যথার্থ পরিচয় জানিবার নিমিত্ত পুরোহিতকেই পাঠাইয়াছিলেন। উদ্যোগপর্ব্বের প্রথম দিকেই দেখিতে পাই, দ্রুপদরাজ তাঁহার পুরোহিতকে কৌরবসভায় পাঠাইতেছেন; উদ্দেশ্য—কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যাহাতে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়, তাহারই চেষ্টা করা। ঠিক এই কাজের নিমিত্তই পরে শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসভায় গিয়াছিলেন। এইসকল উদাহরণ হইতে বুঝা যায়, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পুরোহিতকে যথেষ্ট বিশ্বাস করা হইত।[৮৩] পুরোহিতের সহিত রাজাদের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ ছিল। আদান-প্রদানরূপ স্বার্থের সহিত তাহার কোন যোগ ছিল না।

পুরোহিত স্বামিপ্রকৃতির অন্তর্গত—স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই সাতটির সম্মিলিত ভাবের নাম রাজ্য।[৮৪] তন্মধ্যে স্বামিপ্রকৃতি তিনভাগে বিভক্ত—পুরোহিত, ঋত্বিক্ ও নৃপতি। অর্থাৎ স্বয়ং নৃপতি, পুরোহিত ও ঋত্বিক্—এই তিনজনই রাজ্যের স্বামিরূপে গণ্য ছিলেন। পুরোহিত ও ঋত্বিকের সম্মান এবং প্রতিপত্তি যে কত বেশী ছিল, সেই বিষয়ে বোধ করি, এই উক্তিই বিশেষ প্রমাণ।[৮৫]

শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্মে ঋত্বিকের বরণ—রাজা এবং পুরোহিত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজাদের শান্তিক এবং পৌষ্টিকাদি কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত।

৮৩ পুরোহিতঃ সোমকানাং মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণঃ শুচিঃ।
পরিস্তীর্য্য জুহাবাগ্নিমাজ্যেন বিধিবত্তদা॥ আদি ১৮৫।৩১
পুরোহিতং প্রেষয়ামাস তেষাং বিদ্মাম যুষ্মানিতি ভাষমাণঃ। আদি ১৯৩।১৪
ততঃ প্রজ্ঞাবয়োবৃদ্ধং পাঞ্চাল্যঃ স্বপুরোহিতম্।
কুরুভ্যঃ প্রেষয়ামাস যুধিষ্ঠিরমতে স্থিতঃ॥ উ ৫।১৮

৮৪ আত্মামাত্যাশ্চ কোষশ্চ দণ্ডো মিত্রাণি চৈব হি। ইত্যাদি। শা ৬৯।৬৪, ৬৫

৮৫ স্বামিরূপা প্রকৃতিঃ ঋত্বিক্পুরোহিতনৃপভেদেন ত্রিবিধা। নীলকণ্ঠ। শা ৭৯।১

বেদ ও মীমাংসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ঋত্বিকের বরণ—ঋত্বিক্ বেদ ও মীমাংসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবেন। তাঁহার সমদর্শিতা, অনৃশংসতা, সত্যনিষ্ঠা, তিতিক্ষা, দম, শম, ধী, অহিংসা ও কামদ্বেষাদিরাহিত্য—এই কয়টি গুণ থাকা আবশ্যক। এবম্বিধ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিয়া রাজা তাঁহার যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিবেন। ঋত্বিক্ রাজার কল্যাণ-কামনায় নানাবিধ যাগ-যজ্ঞে লিপ্ত থাকিবেন।[৮৬]

ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ—ব্রাহ্মণের আদেশ অনুসারে রাজাকে চলিতে হইবে। জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং পাথর হইতে লোহার উৎপত্তি। লোহা পাথর কাটিলে, অগ্নি জলে পড়িলে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদ্বেষী হইলে বিনাশ অনিবার্য্য। সুতরাং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আদেশ মত চলিবেন।[৮৭] তাপস ব্রাহ্মণের হাতে রাষ্ট্র ছাড়িয়া দিয়া বিনীতভাবে অবস্থান করিলে রাজার কোন ভয় নাই। সংশিতব্রত তাপস, রাজার সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।[৮৮]

ব্রাহ্মণের উপদেশ না লইলে অবনতি—সাধুচরিত্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে যাবতীয় গুরুতর কার্য্যে চরম প্রমাণরূপে বিবেচনা করা উচিত, গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ই তাঁহাকে নিবেদন করিতে হইবে। রাজা যদি পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকেন, তথাপি ব্রাহ্মণের পরামর্শ ব্যতীত শীঘ্রই বিপন্ন হইয়া পড়েন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পরম সহায়।[৮৯]

মূর্খ ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে নাই—মূর্খ অসদাচার ব্রাহ্মণকে ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিতে নাই। ধর্ম্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহারই আদেশ অনুসারে সকল কাজ করিবার বিধান।[৯০]

৮৬ প্রতিকর্ম্ম পরাচার ঋত্বিজাং স্ম বিধীয়তে। ইত্যাদি। শা ৭৯।২-৬

৮৭ ব্রহ্মৈব সন্নিয়ন্তৃ স্যাৎ ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্। ইত্যাদি। শা ৭৮।২১-২৩
অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি॥ শা ৫৬।২৪। শা ৭৮।২২। উ ১৫।৩৩

৮৮ আত্মানং সর্ব্বকার্য্যাণি তাপসে রাষ্ট্রমেব চ।
নিবেদয়েৎ প্রযত্নেন তিষ্ঠেৎ প্রহ্বশ্চ সর্ব্বদা॥ ইত্যাদি। শা ৮৬।২৬-৩২

৮৯ তস্মান্মান্যশ্চ পূজ্যশ্চ ব্রাহ্মণঃ প্রসৃতাগ্রভুক্।
সর্ব্বং শ্রেষ্ঠং বিশিষ্টঞ্চ নিবেদ্যং তস্য ধর্ম্মতঃ॥ ইত্যাদি। শা ৭৩।৩১, ৩২। শা ১২০।৮
ব্রাহ্মণানেব সেবেত বিদ্যাবৃদ্ধাংস্তপস্বিনঃ। ইত্যাদি। শা ১৪২।৩৬। শা ৭১।৩, ৪

৯০ অনধীয়ানমৃত্বিজম্। উ ৩৩।৮৩। শা ৫৭।৪৪

সেনাপতি-নিয়োগ—সেনাপতি-নিয়োগের কথা 'যুদ্ধ' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইবে।

দ্বারপাল ও দুর্গাদিরক্ষক—দ্বারপাল (প্রতীহার) এবং দুর্গনগরাদিরক্ষকের নিযুক্তিতেও তাঁহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার নিয়ম আছে। সদ্‌গুণসম্পন্ন, বাগ্মী, প্রিয়ংবদ, যথোক্তবাদী এবং স্মৃতিমান্ না হইলে সেই ব্যক্তি কোনও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য নহে।[৯১]

গণিতপারদর্শী হিসাবরক্ষক—আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবার নিমিত্ত গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী লেখক (কর্ম্মচারী) নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।[৯২]

নিদানাদি অষ্টাঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিৎসক—রাজপুরীতে চিকিৎসক নিয়োগ করিয়া তাঁহাকে যথোচিত বৃত্তিদ্বারা সৎকৃত করা হইত। নিদান, পূর্ব্বলিঙ্গ প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারাই রাজবৈদ্য হইবার যোগ্য।[৯৩]

স্থপতি প্রভৃতি—স্থপতিপ্রমুখ কর্ম্মিগণও পরম সমাদরে রাজপুরীতে স্থান পাইতেন।[৯৪]

দূতের নিয়োগ—সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে অন্য রাজপুরীতে অথবা অন্য কাহারও নিকট বার্ত্তা প্রেরণের উদ্দেশ্যে দূত নিয়োগ করিতে হইত।

শ্রীকৃষ্ণ ও পাঞ্চাল রাজার পুরোহিতের দৌত্য—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সময়-সময় উভয় পক্ষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অথবা পুরোহিতাদি বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও বার্ত্তাবহরূপে পাঠান হইত। উদ্যোগপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের এবং পাঞ্চাল-রাজের পুরোহিতের দৌত্যকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দূতের যোগ্যতা—যাঁহারা একমাত্র বার্ত্তাবহন কর্ম্মেই নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদেরও যোগ্যতা অমাত্যাদি কর্ম্মচারী অপেক্ষা কম হইলে চলে না। দূতনির্ব্বাচন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, সৎকুলে জন্ম, কুলোচিত কর্ম্মে নিপুণতা,

৯১ এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ প্রতীহারোঽস্য রক্ষিতা।
শিরোরক্ষশ্চ ভবতি গুণৈরেতৈঃ সমন্বিতঃ॥ শা ৮৫।২৯

৯২ কচ্চিদায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্ব্বে গণকলেখকাঃ। সভা ৫।৭২

৯৩ সাম্বৎসরচিকিৎসকাঃ। শা ৮৬।১৬
কচ্চিদ্বৈদ্যাশ্চিকিৎসায়ামষ্টাঙ্গায়াং বিশারদাঃ। সভা ৫।৯০

৯৪ মহেষ্বাসাঃ স্থপতয়ঃ * * * *। শা ৮৬।১৬

বাগ্মিতা, দক্ষতা, প্রিয়বাদিতা, যথোক্তভাষিতা ও স্মৃতিশক্তি—এই সাতটি গুণবিশিষ্ট পুরুষকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করিতে হয়।[৯৫] অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, অদাম্ভিক, শক্তিমান্, ক্ষিপ্রকারী, সদয়, প্রিয়দর্শন, অন্যকর্তৃক অভেদ্য, স্বাস্থ্যবান্ ও উদারবাক্ পুরুষকে দৌত্যে নিয়োগ করা উচিত।[৯৬]

বার্ত্তাবহ ও নিসৃষ্টার্থ—দূত দ্বিবিধ। কোন কোন দূত শুধু প্রেরকের কথাটির অনুভাষণেই আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করেন, আবার কেহ কেহ উভয় পক্ষের হাবভাব সম্যক্‌রূপে লক্ষ্য করিয়া প্রেরকের কল্যাণার্থে যাহা যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিয়া থাকেন। উভয় শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীই প্রশস্ততর। উদ্যোগপর্ব্বের দৌত্যকর্মে শ্রীকৃষ্ণ, পাঞ্চালপুরোহিত এবং সঞ্জয় ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর; আর দুর্য্যোধনের প্রেরিত উলূক ছিলেন শুধু বার্ত্তাবহ।

দূতের প্রতি ব্যবহার—দূত কোন অপ্রিয় কথা বলিলেও তাঁহাকে শাস্তি দিতে নাই। কারণ প্রেরকের কথাগুলিই সাধারণতঃ তাঁহার মুখে প্রকাশিত হয়, তিনি শুধু অনুভাষক। দূতকে কখনও কটুকথা বলিতে নাই।[৯৭] ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, দূতকে কখনও হত্যা করা উচিত নহে; দূত যথোক্তবাদী মাত্র; তাঁহার পরুষ বা অপ্রিয়ভাষণ প্রেরকেরই বাক্য। দূতকে বধ করিলে পিতৃগণ ভ্রূণহত্যার পাতকে লিপ্ত হন, হন্তাকেও নরকগামী হইতে হয়।[৯৮]

অন্তঃপুররক্ষায় বৃদ্ধের নিয়োগ—অন্তঃপুররক্ষার কাজে বৃদ্ধ পুরুষগণকে নিয়োগ করা হইত, যুবা বা প্রৌঢ়ের সেখানে স্থান ছিল না।[৯৯]

বিশেষ কাজে বিচক্ষণ পুরুষের নিয়োগ—দৌত্যকর্ম্ম ছাড়াও কোন বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানের নিমিত্ত বিচক্ষণ পুরুষদিগকে নিযুক্ত করা হইত।[১০০] বিচারবিভাগ, করসংগ্রহ এবং শত্রুমিত্রচিন্তনাদিতে যে-সকল

---

৯৫ কুলীনঃ কুলসম্পন্নো বাগ্মী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।
যথোক্তবাদী স্মৃতিমান্ দূতঃ স্যাৎ সপ্তভির্গুণৈঃ॥ শা ৮৫।২৮

৯৬ অস্তব্ধমক্লীবমদীর্ঘসূত্রম্। ইত্যাদি। উ ৩৭।২৭

৯৭ উলূকশ্চ ন তে বাচ্যঃ পরুষং পুরুষোত্তম।
দূতাঃ কিমপরাধ্যন্তে যথোক্তস্যানুভাষিণঃ॥ উ ১৬১।৩৭

৯৮ ন তু হন্যান্নৃপো জাতু দূতং কস্যাঞ্চিদাপদি। ইত্যাদি। শা ৮৫।২৬, ২৭

৯৯ স্থবিরৈর্বৃতম্। বন ৬৬।২৫

১০০ ভর্ত্তুরন্বেষণার্থন্তু পথ্যেয়ং ব্রাহ্মণানহম্।

কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইত, তাঁহাদের বিষয়ে পরে বলা হইবে। স্বামী, অমাত্য এবং সুহৃৎপ্রকৃতির যে-সকল পুরুষকে নিযুক্ত করা রাজার একান্ত আবশ্যক, তাঁহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

সর্ব্বত্র বুদ্ধিমান ও অনলস পুরুষের নিয়োগ—সকল কর্ম্মচারীর নিয়োগেই কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে নৃপতিদের লক্ষ্য রাখিতে হইত। রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে কয়েকজন লোকের প্রয়োজন, ঠিক সেই কয়েকজন বুদ্ধিমান, চতুর এবং অনলস পুরুষকে নিযুক্ত করা উচিত। যে-ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই বিভাগেই নিযুক্ত করার বিধান।

অধিকার-অনুসারে কার্য্যে নিয়োগ—অনুকম্পাবশতঃ ঋষি তাঁহার আশ্রমের কুকুরটিকে ক্রমশঃ শরভে পরিণত করিয়া কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন এবং পুনরায় কেন তাহাকে কুকুরে পরিণত করেন, সেই উপাখ্যানটি ঋষিসংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গেই রাজাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কখনও ভৃত্যের অধিকার না বুঝিয়া তাঁহাকে নিয়োগ করিতে নাই। যাহার যে স্থান, তাঁহাকে সেখানে স্থাপন করিতে হয়। যিনি ভৃত্যকে অনুরূপ কর্ম্মে নিয়োগ করেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। মূর্খ, ক্ষুদ্র, অপ্রাজ্ঞ ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে কোন কাজে নিয়োগ করিতে নাই। সিংহও যদি কুকুরমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তবে তাহার বিক্রম ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অতএব কুলীন, প্রাজ্ঞ ও বহুশ্রুত পাত্রমিত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া নৃপতি রাজ্য পরিচালন করিবেন। মৃদুশীল, প্রাজ্ঞ, অর্থবিধানবিৎ এবং শক্তিশালী পুরুষগণকে কার্য্যে নিয়োগ করিতে হয়।[১০১]

অনভিজ্ঞের নিয়োগে শ্রীভ্রংশ—যে ব্যক্তি কর্ম্মে নিপুণ এবং অনুরক্ত, তাঁহাকে মহৎকার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ, সুচতুর ভৃত্যগণকে অর্থবিভাগে নিযুক্ত করিতে হয়। মূঢ়, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, অনার্য্য-চরিত, শঠ, বঞ্চক, হিংস্র, দুর্ব্বুদ্ধি, মদ্যসেবী, দ্যূতশীল, অতিস্ত্রৈণ, মৃগয়াব্যসনী এবং

যদ্যেবমিহ বৎস্যামি ত্বৎসকাশে ন সংশয়ঃ॥ বন ৬৫।৭০

১০১ অনুরূপাণি কর্ম্মাণি ভৃত্যেভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
স ভৃত্যগুণসম্পন্নো রাজা ফলমুপাশ্নুতে॥ ইত্যাদি। শা ১১৯।৪-১৩

ভৃত্যা যে যত্র স্থাপ্যাঃ স্যুস্তত্র স্থাপ্যাঃ সুরক্ষিতাঃ। শা ১১৮।৩

মৃদুশীলং তথা প্রাজ্ঞং শূরং চার্থবিধানবিৎ।
স্বকর্ম্মণি নিযুঞ্জীত যে চান্যে চ বলাধিকাঃ॥ শা ১২০।২৩

অল্পজ্ঞ পুরুষকে মহৎকার্য্যে নিয়োগ করিলে নৃপতি শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।[১০২]

নৃপতি স্বয়ং নিয়োগ করিবেন—নৃপতি স্বয়ং ভৃত্য নিয়োগ করিবেন অপর কর্ম্মচারীর উপর এই বিষয়ে ভার দিতে নাই। বিশেষভাবে দোষগুণ পরীক্ষা করিয়া নিয়োগ কবিতে হয়।[১০৩]

রাজাই বেতন স্থির করিবেন—কাহার কত বেতন পাওয়া উচিত তাহা স্থির করিবার ভারও রাজার উপরই ছিল। তিনিই সব স্থির করিতেন. কর্ম্মপ্রার্থিগণও সাক্ষাৎভাবে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আপন-আপন আবেদন-নিবেদন জানাইতেন।[১০৪]

বিরাটপুরীতে পাণ্ডবদের কর্ম্মপ্রার্থনা—ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণ বিরাট-রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেইখানে বিশেষভাবে এই নিয়মটি দেখিতে পাই।[১০৫]

যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক কর্ম্মচারীর নিয়োগ—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠির নিজেই বিদুরাদি ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[১০৬]

যথাকালে বেতন-দান—কর্ম্মচারিগণ নিয়মিত সময়ে বেতন পান কি না, রাজা সেই বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। যথাকালে বেতন না পাইলে কর্ম্মচারিগণ অসন্তুষ্ট হন এবং প্রসন্নভাবে কাজ করিতে পারেন না, পরন্তু স্বামীর অনিষ্ট-চিন্তাই করিয়া থাকেন। সুতরাং যথাকালে বেতন দিয়া কর্ম্মচারিগণকে সন্তুষ্ট রাখা উচিত।[১০৭]

---

১০২ শক্তশ্চৈবানুরক্তশ্চ যুজ্যাম্মহতি কর্ম্মণি। ইত্যাদি। শা ৯৩।১৪,১৫
মূঢ়মৈন্দ্রিয়কং লুব্ধমনার্য্যচরিতং শঠম্। ইত্যাদি। শা ৯৩।১৬,১৭

১০৩ অশ্বাধ্যক্ষোঽসি * * *। বন ৬৭।৬
কিং বাপি শিল্পং তব বিদ্যতে কৃতম্। বি ১০।৮

১০৪ * * * বেতনং তে শতং শতাঃ। বন ৬৭।৬
* * * বদস্ব কিং চাপি তবেহ বেতনম্। বি ১০।৮

১০৫ বি ৫ম অঃ—১২শ অঃ।

১০৬ শা ৪১শ অঃ।

১০৭ দেয়ং কালে চ দাপয়েৎ। শা ৫৭।১২
কচ্চিদ্বলস্য ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্।
সংপ্রাপ্যকালে দাতব্যং দদাসি ন বিকর্ষসি॥ ইত্যাদি। সভা ৫।৪৮,৪৯

অবাধ্য কর্ম্মচারীর অপসারণ—যে অশিষ্ট কর্ম্মচারী তেমন শ্রদ্ধার সহিত আদেশ পালন করেন না, কোন কর্ম্ম করিতে আদিষ্ট হইয়াও যিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন, যিনি প্রজ্ঞাভিমানী এবং প্রায়ই প্রতিকূল কথা বলেন, তাঁহাকে অচিরে পদচ্যুত করা উচিত। নৃপতি পরোপকারী, প্রকৃতিরঞ্জক এবং সর্ব্বগুণবিশিষ্ট হইলেও যে ভৃত্য তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া থাকে, তাদৃশ পাপাত্মা ভৃত্য বর্জ্জনীয়।[১০৮]

অনুগতের সৌহৃদ্যে শ্রীবৃদ্ধি—যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে রাজার অভ্যুদয় আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে কখনও ত্যাগ করিতে নাই। যে রাজা আপনাকে এবং অনুগত পার্ষদগণকে রক্ষা করেন, তাঁহার প্রজা দিন দিন উন্নত হইয়া থাকেন এবং তিনিও নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন।[১০৯]

কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ স্বয়ং কর্ত্তব্য—বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীগুলি যেমন বিভিন্ন স্বরের অনুবর্ত্তন করে, রাজাও সেইরূপ যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের গতিবিধি স্বয়ং লক্ষ্য করিবেন।[১১০]

কর্ম্মচারীদের সহিত রাজার ব্যবহার—অমাত্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত প্রমুখ ব্যক্তিদের সহিত রাজার ব্যবহার এবং রাজার সহিত তাঁহাদের ব্যবহার বিষয়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্প্রতি ভৃত্যসাধারণের প্রতি রাজার ব্যবহার এবং রাজার প্রতি তাঁহাদের ব্যবহারের কথা আলোচনা করা যাইতেছে। যথার্থ কর্ম্মী ভক্ত ভৃত্যদের প্রতি সশ্রদ্ধ এবং সদয় ব্যবহারের কথা বহু স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ভীষ্মের উপদেশে কতকগুলি বিশেষ ব্যবহারের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে রাজ্যের ক্ষতি—ভৃত্যদের সহিত সময়-সময় অন্তরঙ্গভাবে মিশিলেও পরিহাস করা উচিত নহে। উপজীবী ভৃত্যদের সহিত নিয়ত হাস করিলে তাঁহারা যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন এবং আপন মর্য্যাদা

---

১০৮ বাক্যন্তু যো নাদ্রিয়তেঽনুশিষ্টঃ, প্রত্যাহ যশ্চাপি নিযুজ্যমানঃ। ইত্যাদি। উ ৩৭।২৬
অপি সর্ব্বগুণৈর্যুক্তং ভর্ত্তারং প্রিয়বাদিনম্।
অভিদ্রুহ্যতি পাপাত্মা ন তস্মাদ্বিশ্বসেজ্জনাৎ। শা ৯৩।৩৮

১০৯ ভক্তং ভজেত নৃপতিঃ সদৈব সুসমাহিতঃ। শা ৯৩।১৩
রক্ষিতাত্মা চ যো রাজা রক্ষ্যান্ যশ্চানুরক্ষতি। ইত্যাদি। শা ৯৩।১৮

১১০ অথ দৃষ্ট্বা নিযুক্তানি স্বানুরূপেষু কর্ম্মসু।
সর্ব্বাংস্তাননুবর্ত্তেত স্বরাংস্তন্ত্রীরিবায়তা। শা ১২০।২৪

উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রভুর বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করেন। কোন কাজের আদেশ করিলে সংশয় প্রদর্শনপূর্ব্বক তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন। অতিশয় গোপনীয় ছিদ্র-সকলও প্রকাশ করিয়া দেন। অপ্রার্থনীয় দ্রব্যের প্রার্থনা করিয়া থাকেন এবং অতি প্রগল্ভতাবশতঃ রাজার উদ্দেশ্যে উপস্থিত ভক্ষ্য দ্রব্যও নিঃসঙ্কোচে আহার করেন। প্রভুর উপর ক্রোধ প্রদর্শন এবং তাঁহা অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রজাদের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ বঞ্চনা দ্বারা রাজতন্ত্রের গ্লানি ঘটাইয়া থাকেন। কৃত্রিম শাসনপত্রাদি তৈয়ার করিয়া অধিকৃত দেশ-সমূহকে অন্তঃসারহীন করিয়া ফেলেন। মহিলারক্ষীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশের সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। পোশাক-পরিচ্ছদেও রাজাকেই অনুকরণ করেন। এরূপ নির্লজ্জ হইয়া যান যে, রাজসমক্ষে থুতু পরিত্যাগ, জৃম্ভন প্রভৃতিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব করেন না। নৃপতি যদি অত্যন্ত মৃদুস্বভাব ও নিয়ত পরিহাসপ্রিয় হন, তবে তাঁহার রথ, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতি বাহনকে আপন কাজে ব্যবহার করিতে কর্ম্মচারিগণ একটুও ইতস্ততঃ করেন না। "হে রাজন, আপনি অমুক কাজ করিতে পারিবেন না", "ইহা আপনার দুরভিসন্ধি", সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ অশিষ্টবচনে রাজাকে শাসাইতে তাঁহাদের দ্বিধা বোধ হয় না। নৃপতি ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহারা হাসিতে থাকেন, নৃপতির প্রসাদকেও গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার আদেশ অমান্যপূর্ব্বক দুষ্কৃতসমূহ প্রকাশ করিয়া দেন এবং মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়াও লজ্জিত হন না। অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্যায়ভাবে রাজস্বকে আত্মসাৎ করিতে চান, নিজ-বৃত্তিতে তুষ্ট থাকিতে পারেন না। অধিক কি, তাঁহারা সূত্রবদ্ধ পক্ষীর মত রাজাকে হাতের মুঠায় পাইয়া ক্রীড়া করিতে থাকেন। "রাজা ত আমারই হাতের পুতুল" এরূপ বাক্য বলিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। অতএব ভূপতি কখনও আপন মর্য্যাদা ভুলিবেন না।[১১৯]

সম্মানিত ব্যক্তির বিমাননা অমঙ্গলজনক—স্বয়ং বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া কোন কর্ম্মচারীকে শাস্তি দিতে নাই। কাহারও সাধুতায় আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে অসাধু কর্ম্মচারিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে রাজাকে অনেক কিছু বলিয়া থাকে। রাজা তাহাদের কথার উপর নির্ভর

১১৯ পরিহাসশ্চ ভৃত্যৈস্তে নাত্যর্থং বদতাম্বর। ইত্যাদি। শা ৫৬।৪৮-৬১

করিয়া যদি বিচার করিতে যান, তবে তাহার ফল খুবই খারাপ হয়। যথার্থ হিতৈষী সুহৃৎ পূর্ব্বে সম্মানিত হইয়া পরে মিছামিছি অসম্মানিত হইলে সেই অসম্মান সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং রাজা এইসকল বিষয়েও বিশেষ বিবেচনার সহিত কাজ করিবেন। রাজধর্ম্ম-প্রকরণের 'ব্যাঘ্রগোমায়ু-সংবাদে' উপাখ্যানের মধ্য দিয়া এই উপদেশটি প্রদত্ত হইয়াছে।[১১২]

রাজার সহিত ভৃত্যদের ব্যবহার—রাজার প্রতিও কর্ম্মচারীদের বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। রাজকর্ত্তৃক সমাদৃত বা বন্ধুরূপে পরিগৃহীত হইলেও প্রভুভৃত্য-সম্বন্ধ কখনও ভুলিতে নাই। সকল সময় আপন মর্য্যাদা এবং অধিকারের মাত্রা স্মরণ রাখা উচিত।

পুরোহিত ধৌম্যের উপদেশ—রাজার সভায় বাস করিতে গেলে যে-সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবদিগকে এবং দ্রৌপদীকে অজ্ঞাতবাসের প্রারম্ভে সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। অধ্যায়টি অতি উপাদেয়। "প্রতীহারীর সম্মতি ব্যতীত কখনও রাজসভাতে প্রবেশ করিবে না। যে আসন অন্য কাহারও জন্য নির্দ্দিষ্ট, সেই আসনে বসিতে নাই। অপরের যান, বাহন, পর্য্যঙ্ক এবং আসনে অনুমতি ব্যতীত বসিতে নাই। দ্যূতস্থান, বেশ্যালয় বা সুরাসম্মিলনীতে কখনও যাইতে নাই। ঐরূপ করিলে রাজপ্রেরিত চরেরা চরিত্র সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া রাজাকে নিশ্চয়ই জানাইয়া থাকে। রাজসভায় অপৃষ্ট হইয়া কোন কথা বলিবে না, রাজা কোনও প্রশ্ন করিলে স্থিরভাবে শিষ্টতার সহিত কেবল তাহার উত্তর দিবে। রাজার তোষামোদ করাও উচিত নহে, তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তিগণকে রাজা মনে-মনে ঘৃণা করিয়া থাকেন। রাণীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্যায়; যাহারা অন্তঃপুরের রক্ষক, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিলেও রাজার মনে সন্দেহ জাগিতে পারে। রাজদ্বেষ্য পুরুষ হইতে সতত দূরে থাকিতে হয়। নিপুণভাবে হিতাহিত-বিবেচনা করিয়া যাঁহারা রাজসভায় বাস করেন, তাঁহাদের কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। রাজা বসিবার নিমিত্ত নির্দ্দেশ না করা পর্য্যন্ত আসন গ্রহণ করিতে নাই। অধিকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যে রাজসন্নিধি কামনা করে, সে রাজার পুত্র বা ভ্রাতা হইলেও আদর লাভ করিতে পারে না। অতিশয় নিকটস্থ হইলে রাজা অগ্নির ন্যায় দহন করেন, আবার

১১২ শা ১১১ তম অঃ।

একটু অবজ্ঞাত হইলেই দেববৎ সর্ব্বস্ব হরণ করেন। সুতরাং তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা বিশেষ দক্ষতার বিষয়। রাজসমীপে তথ্য এবং প্রিয়বচন বলিবে; যে বচন অপ্রিয় অথচ অহিত, কদাচ তাহা বলিতে নাই। কিন্তু হিতবচন অপ্রিয় হইলেও বলা উচিত। 'আমি রাজার খুব প্রিয়'—কখনও এরূপ ভাবিতে নাই, বরং 'আমি রাজার প্রিয় নই' এইরূপ চিন্তা করিয়া সেবা করা উচিত। রাজার ডান দিকে বা বাম দিকে অন্য আসনে বসিবে, পশ্চাতে বা ঠিক সম্মুখে বসিবে না। রাজা যদি মিথ্যাও কিছু বলেন, তাহাও অপরের নিকট প্রকাশ করিতে নাই। রাজপ্রসাদ ও ঐশ্বর্য্যের লাভে অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করা ভাল নহে, তাহাতে চপলতা প্রকাশ পায়। রাজসমীপে ওষ্ঠ, ভুজ বা জানুতে হাত দিতে নাই। জৃম্ভন, নিষ্ঠীবন প্রভৃতি বিষয়ে খুব সাবধান থাকা উচিত। রাজার কোন আচরণ যদি একান্তই হাস্যজনক হয়, তথাপি উচ্চহাস্য করিতে নাই। কোনও বিষয়ে তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে নাই। 'রাজা অপেক্ষা আমি বেশী বুদ্ধিমান্' কখনও এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে নাই। অনলস বীরপুরুষের মত নিয়ত আত্মকার্য্যে অবহিত থাকিবে। কাজের জন্য এরূপভাবে প্রস্তুত থাকিবে, রাজাকে যেন আদেশ করিতে হয় না। ধনধান্যাদিরক্ষণে বা শত্রুজয়ে, যে-কোন কাজে আদিষ্ট হইলে ইতস্ততঃ করিতে নাই। তৎক্ষণাৎ সাহসে ভরসা করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত। প্রবাসে থাকিলেও স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে নাই। কখনও উৎকোচাদি গ্রহণ করিবে না। রাজা যান, বাহন, বস্ত্র বা অন্য কিছু প্রসাদরূপে দান করিলে তাহার অনাদর করিতে নাই। যাঁহারা রাজসভাতে বাস করিবার সময় এইসকল বিষয়ে নিপুণভাবে লক্ষ্য রাখেন, তাঁহারা সুখে-সম্মানে কাল কাটাইয়া রাজার বিশেষ সুহৃদ্‌রূপে পরিগণিত হইতে পারেন।"[১১৩]

বিদুরের উপদেশ—মহামতি বিদুরের নীতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়া অতন্দ্রিতভাবে যিনি কাজ করিয়া থাকেন, তিনিই রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া সুখে অবস্থান করেন।[১১৪]

বাহুবলাদি পঞ্চবিধ বল—বাহুবল, অমাত্যবল, ধনবল, অভিজাতবল (পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত সামাজিক প্রতিপত্তি) এবং প্রজ্ঞাবল—এই পাঁচ-

১১৩ দৃষ্টদ্বারো লভেদ্ দ্রষ্টুং রহস্যেষু ন বিশ্বসেৎ। ইত্যাদি। বি ৪।১৩-৫০

১১৪ অভিপ্রায়ং যো বিদিত্বা তু ভর্ত্তুঃ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি করোত্যতন্দ্রী। ইত্যাদি। উ ৩৭।২৫

প্রকার বলের মধ্যে বাহুবল সর্ব্বাপেক্ষা নীচে এবং প্রজ্ঞাবল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[১১৫]

কোশবল তৃতীয়—পঞ্চবিধ বলের মধ্যে কোশবলের স্থান তৃতীয়। সাংসারিকের ধন ছাড়া একদিনও চলিতে পারে না। ধনহীন ব্যক্তি কোথাও আদর পান না। লৌকিক কোন কাজই ধন ব্যতীত সম্পন্ন হয় না।

সমাজে ধনের বিশিষ্ট স্থান—রাজা ধন ছাড়া এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারেন না। তাই পঞ্চবলের মধ্যে ধন অন্যতম, সপ্তপ্রকৃতির মধ্যে ধনের বিশিষ্ট স্থান। ধনের মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়াছে।[১১৬]

রাজকোশ প্রজাদের কল্যাণার্থে—প্রথমেই জানা উচিত, রাজকোশের সম্পৎ যদিও রাজারই অধীন, তথাপি নিজের আমোদপ্রমোদ বা খামখেয়ালি-চরিতার্থতার নিমিত্ত ধন ব্যয় করিবার অধিকার রাজাকে দেওয়া হয় নাই। রাজসূয়যজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ প্রভৃতি প্রজাসাধারণের মঙ্গলার্থে করা হইত। তাই দেখিতে পাই, যেখানেই রাজকোশের অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, সেখানেই প্রজামণ্ডলী উপকৃত হইতেছে। ধনের মত্ততা প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের আদর্শ নহে।

অর্থের ফল ভগবানে সমর্পণ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের প্রাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। রাজা তাঁহার অর্থের ফল ভগবানে অর্পণ করিয়াছেন। গীতাতে রাজাকে ভগবানের বিশেষ বিভূতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[১১৭] রাজা ভগবানের প্রতিনিধি। রাজকোশের অর্থ সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত রক্ষা করিতে হয়।

কোশসংগ্রহের আদর্শ—রাজা জিতেন্দ্রিয় হইবেন, এই কথা বার বার বলা হইয়াছে। রাজকোশ রাজার ভোগের উদ্দেশ্যে নহে। রাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত কোশকে পরিপুষ্ট করিতে হয়। এই প্রবন্ধেই অর্থসংগ্রহের উপায় ও ব্যয়পদ্ধতির আলোচনাতে উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইবে।

---

১১৫. বলং পঞ্চবিধং নিত্যং পুরুষাণাং নিবোধ মে। ইত্যাদি। উ ৩৭।৫২-৫৫

১১৬. ধনমাহুঃ পরং ধর্ম্মং ধনে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ইত্যাদি। উ ৭২।২৩-২৭

দারিদ্র্যমিতি যৎ প্রোক্তং পর্য্যায়মরণং হি তৎ। উ ১৩৪।১৩

বিশেষং নাধিগচ্ছামি পতিতস্যাধনস্য চ। শা ৮।১৫

১১৭. নরাণাঞ্চ নরাধিপম্। ভী ৩৪।২৭

ন্যায়পথে অর্থসংগ্রহ—বানপ্রস্থ অবলম্বনের পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি কথা ছিল—"কোশের উপচয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদা ন্যায়তঃ যত্ন করিবে। মহারাজ, অন্যায়ভাবে অর্থবৃদ্ধির চেষ্টা করিও না"।[১১৮]

ন্যায় এবং অন্যায় যে কি, তাহা ভীষ্মের উপদেশ হইতে সম্যক্ জানা যাইবে। এখানে 'মহারাজ' সম্বোধনটির বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয়। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সাবধান করিতে গিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণে তাঁহার দায়িত্ব ও ধর্ম্মপালনের বিষয় যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। 'অপরাপর সাধারণ রাজন্যদের মত চলা তোমার পক্ষে শোভন হইবে না, যেহেতু তুমি মহারাজ'। যুধিষ্ঠির কখনও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ অমান্য করেন নাই।

প্রজার শক্তি-অনুসারে কর নির্দ্ধারণ—ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, "রাজা সতত প্রজার কল্যাণ চিন্তা করিবেন ; প্রজাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিবেন। দেশ, কাল ও পাত্রবিবেচনায় আপনার এবং প্রজার, উভয় পক্ষের মঙ্গল ও প্রতিপাল্যপ্রতিপালক-সম্বন্ধের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেইভাবে অর্থবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়। ভ্রমর যেমন বৃক্ষের কোন ক্ষতি না করিয়াই তাহার ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিতে পারে, তুমিও সেইরূপ প্রজার কোন ক্ষতি না করিয়া উদ্বৃত্ত অংশ হইতে কোশের পুষ্টির ব্যবস্থা করিবে। গাভীকে দোহন করিবার কালে বৎসের যাহাতে অনিষ্ট না হয়, তাহাও যেরূপ লক্ষ্যের বিষয়, রাজ্যদোহনেও প্রজা যেন দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে, তাহা দেখিতে হয়। ব্যাঘ্রী যেমন তাহার শাবককে ঘাড়ে কামড় দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়, অথচ শাবকের তাহাতে একটুও কষ্ট হয় না, ঠিক সেইরূপ প্রজাকে ব্যথা না দিয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থগ্রহণে কোশের উন্নতি সাধন করিবে। এক রকমের ইঁদুর আছে, তাহারা নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলের মাংস মৃদু কামড়ে ছিঁড়িয়া লইয়া যায়, নিদ্রিত ব্যক্তি কোন ব্যথা অনুভব করে না। তুমিও সেইরূপ প্রজাদের কষ্ট না দিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর-গ্রহণপূর্ব্বক তোমার

১১৮. কোশস্য নিচয়ে যত্নং কুর্ব্বীথা ন্যায়তঃ সদা।
বিবিধস্য মহারাজ বিপরীতং বিবর্জ্জয়েঃ। ইত্যাদি। আশ্র ৫।৩৬,৩৭

ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিবে। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যেক বৎসর পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী আদায় করিবে। ইহাতে তাঁহাদের কোন কষ্ট হইবে না। অকালে অস্থানে এবং অন্যায়ভাবে কর-নির্দ্ধারণ করিতে নাই। স্থিরভাবে সদয়-নিপুণতার সহিত কর ধার্য্য করিতে হয়। অসঙ্গত উপায়ে কাহাকেও বশ করা যায় না। বিশেষ বিপদে না পড়িলে কোন প্রজার নিকট কিছুই যাচ্ঞা করিবে না"।[১১৯]

ষষ্ঠাংশ কর-গ্রহণ—প্রজাদের নিকট হইতে উৎপন্ন বস্তুর ষষ্ঠাংশ রাজকোশে খাজানারূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। কৃষক, শিল্পী, বণিক্ বা অন্য বৃত্তিবিশিষ্ট প্রজার বাৎসরিক যে আয় হইত, তাহার ছয় ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিবার নিয়ম ছিল।[১২০]

প্রাচীন কালে দশমাংশ গ্রহণের পদ্ধতি—স্থূলভাজনক-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, উৎসাহসম্পন্ন মহীপতি দশমাংশ কর গ্রহণ করেন।[১২১] বোধ করি, অতি প্রাচীন কালে ইহাই নিয়ম ছিল। মহাভারতের সময়ে ষষ্ঠাংশই গৃহীত হইত, সেই বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে।

অশ্ব-বস্ত্রাদি গ্রহণ—অশ্ব, বস্ত্র, মণিমাণিক্য, ধান্য প্রভৃতি বস্তু করস্বরূপ আদায় করা হইত। অর্থাৎ যে জনপদে যে বস্তু উৎপন্ন হইত এবং যে পরিবার যে ব্যবসা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত, তাহা হইতে সেই দ্রব্যই করস্বরূপ গ্রহণ করা হইত।[১২২]

রাজা-প্রজার মধ্যে চুক্তি ছিল না—এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, তৎকালে 'কর আদায়ের পরিবর্ত্তে রাজ্যরক্ষণ'—এইরূপ কোন চুক্তি রাজা-প্রজার মধ্যে ছিল না। রাজা ধর্ম্মবুদ্ধিতেই প্রজা পালন করিতেন। প্রজাগণও ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই কর দিতেন। সকল শ্রেণীর প্রজা হইতে

১১৯ শা ৮৮ তম অঃ। শা ৮৭।২০-২২

১২০ বলিষড়্ভাগহারিণম্। ইত্যাদি। আদি ২১৩।৯। শা ২৪।১২। শা ৬৯।২৫। শা ১৩৯।১০০ শা ৭১।১০

১২১ যশ্চ রাজা মহোৎসাহঃ ক্ষত্রধর্ম্মরতো ভবেৎ।
স তুষ্যেদ্দশভাগেন ততস্ত্বন্যো দশাবরৈঃ॥ শা ৩২০।১৫৮

১২২ ততো দিব্যানি বস্ত্রাণি দিব্যান্যাভরণানি চ।
ক্ষৌমাজিনানি দিব্যানি তস্য তে প্রদদুঃ করম্॥ ইত্যাদি। সভা ২৮।১৬-১৯

কর গ্রহণের রীতি ছিল না। দরিদ্র, অনাথ, বিধবা, বিপন্ন ব্যক্তি এবং তপস্যানিরত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে কর গ্রহণ করা হইত না।

অধিক কর আদায়ের নিন্দা—অত্যধিক কর আদায়ের পুনঃ পুনঃ নিন্দা করা হইয়াছে। যাঁহার প্রজাগণ করভারে প্রপীড়িত এবং শাসনতন্ত্রের অব্যবস্থায় নিয়ত উদ্বিগ্ন, সেই রাজা শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহার প্রজা সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত নিয়ত প্রফুল্ল, সেই নরপতি নানাবিধ ঐহিক ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গে বাস করেন।[১২৩]

বৃত্তিরক্ষণ—বণিক্ এবং শিল্পীদের উপর যে কর ধার্য্য হইত, তাহা তাঁহাদের ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পদ্রব্য হইতে উৎপন্ন লাভের অনুপাতে ধরা হইত। প্রজারা যাহাতে করভারে অবসন্ন হইয়া না পড়ে, সকল সময় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ভূপতিকে সতর্ক করা হইয়াছে। ধনধান্য এবং কৃষ্যাদির অবস্থা সম্যক্ বিচার করিয়া কর স্থির করা উচিত। অতিরিক্ত করের চাপে জাতীয় বৃত্তিতে যদি মোটেই লাভ না থাকে, তাহা হইলে কেহই সেই বৃত্তির উন্নতির চেষ্টা করে না। সুতরাং লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কর নির্দ্ধারণের অপব্যবস্থায় বৃত্তিটি যেন নষ্ট না হয়।[১২৪]

অর্থক্ষুধিত রাজা অশ্রদ্ধেয়—অতি তৃষ্ণায় যেন আত্মমূল রাষ্ট্রের এবং পরমূল কৃষ্যাদি কর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ না হয়, কর নির্দ্ধারণে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। রাজা লোভপরায়ণ হইলে রাষ্ট্র চলিতে পারে না। রাজার অর্থক্ষুধা প্রবল হইলে প্রজারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না, শ্রদ্ধা ত দূরের কথা।[১২৫]

প্রজামণ্ডলীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে রাজা বাধ্য—শাস্ত্রানুসারে অপরাধীর দণ্ড হইতে প্রাপ্ত ধন, কররূপে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি এবং পথিমধ্যে সুরক্ষিত বণিকদের প্রদত্ত কর, রাজা রাজকোশে জমা দিবেন। এইভাবে

১২৩. নিত্যোদ্বিগ্নাঃ প্রজা যস্য করভারপ্রপীড়িতাঃ।
অনর্থৈর্বিপ্রলুপ্যন্তে স গচ্ছতি পরাভবম্॥ ইত্যাদি। শা ১৩৯।১০৯,১১০

১২৪. যথা যথা ন সীদেরংস্তথা কুর্য্যান্মহীপতিঃ। শা ৮৭।১৩
ফলং কর্ম্ম চ সংপ্রেক্ষ্য ততঃ সর্ব্বং প্রকল্পয়েৎ। ইত্যাদি। শা ৮৭।১৬,১৭

১২৫ সংবেক্ষ্য তু তথা রাজ্ঞা প্রণেয়াঃ সততং করাঃ।
নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাং চাপি তৃষ্ণয়া॥ ইত্যাদি। শা ৮৭।১৮-২০

ধান্যাদির ষষ্ঠাংশ কর দ্বারা রাজ্য রক্ষা করিবেন, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজকোশে খাজানাস্বরূপ দেওয়ার পর অবশিষ্ট ধান্যাদিতে যদি কাহারও সম্বৎসরের জীবিকা না চলে, তবে রাজা সেই প্রজার বার্ষিক খরচ চালাইতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এইবিষয়ে রাজাকে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।[১২৬]

অতি লোভী রাজার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—লোভবশতঃ অশাস্ত্রীয় করগ্রহণে প্রজারই যে শুধু কষ্ট হয়, তাহা নহে; আপনার ধ্বংসের পথও প্রশস্ত হইয়া উঠে। বেশী দুগ্ধ লাভের উদ্দেশ্যে গাভীর স্তন ছেদন করিলে অতিলোভীর অদৃষ্টে যাহা ঘটে, ধনতৃষ্ণায় রাজ্যশোষণেও অজিতেন্দ্রিয় রাজাধমের ভাগ্যে সেইরূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। পয়স্বিনী গাভীর যথোচিত সেবা দ্বারা যেমন স্বাদু দুগ্ধ লাভ এবং শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়, সেইরূপ নির্লোভ রাষ্ট্রসেবায় প্রফুল্ল প্রকৃতিপুঞ্জের সশ্রদ্ধ দানে রাজকোশ আপনিই স্ফীত হইয়া উঠে; রাজারও সুখসৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়।[১২৭]

কোশসঞ্চয়ের ন্যায়পরতায় ঐশ্বর্য্যলাভ—প্রজাগণ যদি সুরক্ষিত হয় এবং কোশসঞ্চয়ে যদি কোনপ্রকার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এই বসুমতী নৃপতির পক্ষে মাতৃবৎ অতুল ঐশ্বর্য্যবিধায়িনী হইয়া থাকেন।[১২৮]

মালাকারের ন্যায় আচরণে শ্রীবৃদ্ধি—ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—"মহারাজ, তুমি মালাকারের মত ব্যবহার করিবে, আঙ্গারিকের মত ব্যবহার করিবে না। আঙ্গারিক অঙ্গারের নিমিত্ত বনজঙ্গল অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলে, আর মালাকার বনকেই উদ্যানে পরিণত করিয়া তাহার শোভায় নিজেও মুগ্ধ হয়, পরকেও মুগ্ধ করে, অধিকন্তু সুগন্ধ কুসুম চয়ন করিয়া উৎকৃষ্ট মাল্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। তুমিও মালাকারবৃত্তিতে রাষ্ট্রের কল্যাণে

১২৬. বলিষষ্ঠেন শুল্কেন দণ্ডেনাথাপরাধিনাম্।
শাস্ত্রানীতেন লিপ্সেথা বেতনেন ধনাগমম্॥ ইত্যাদি। শা ৭১।১০,১১

১২৭ অর্থমূলোঽপি হিংসা চ কুরুতে স্বয়মাত্মনঃ।
করৈরশাস্ত্রদৃষ্টৈর্হি মোহাৎ সম্পীড়য়ন্ প্রজাঃ॥ ইত্যাদি। শা ৭১।১৫-১৮

১২৮ দোগ্ধ্রী ধান্যং হিরণ্যঞ্চ মহী রাজ্ঞা সুরক্ষিতা।
নিত্যং স্বেভ্যঃ পরেভ্যশ্চ তৃপ্তা মাতা যথা পয়ঃ॥ শা ৭১।১৯

আত্মনিয়োগ কর, সুরক্ষিত প্রজার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার আনন্দই তোমার নিকট সুগন্ধি মালার মত লোভনীয় হউক"।[১২৯]

দরিদ্র হইতে করগ্রহণ অনুচিত—আশ্রিত পৌর ও জানপদগণ স্বল্পধন হইলে রাজা সামর্থ্যঅনুসারে তাঁহাদের প্রতি কৃপা করিবেন। কর-নির্দ্ধারণে এই শ্রেণীর লোককে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।[১৩০]

ধনী বৈশ্যের প্রদত্ত করে ব্যয়নির্ব্বাহ—নরপতি প্রাকারনির্ম্মাণ, ভৃত্য-পোষণের ব্যয়, সংগ্রামের ব্যয় এবং অন্যান্য রাজকর্ম্ম পরিচালনের নিমিত্ত সমর্থ বৈশ্যদের আয়ের উপর কর ধার্য্য করিবেন। আরণ্যক গোপালকগণের তত্ত্বাবধান না করিলে তাঁহারা উন্নতি করিতে পারেন না, অতএব তাঁহাদের প্রতি সদয় মৃদু ব্যবহার করা উচিত। বৈশ্যগণ কৃষি, গোপালন এবং বাণিজ্যের দ্বারা রাষ্ট্রের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করেন; সুতরাং বিশেষ সদয়ভাবে তাঁহাদের উপর কর ধার্য্য করিতে হয়।[১৩১]

রক্ষাবিধানের পর করনির্দ্ধারণ—বৃক্ষের কোন অনিষ্ট না করিয়া তাল, খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে যেমন রস গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ প্রজাগণের আয়ব্যয় ও সামর্থ্য-বিচারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সপরিবারে রক্ষা করিয়া পরে কর আদায় করিতে হয়।[১৩২]

করের নিমিত্ত প্রজাপীড়ন পাপ—প্রজাগণের প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহাদেরই কল্যাণের নিমিত্ত অর্থ আহরণ করিতে হয়। প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া বিদ্যুৎসম্পাতের মত তাঁহাদের স্কন্ধে পতিত হওয়া রাজার কর্ম্ম নহে। অতি লোভী হইয়া কখনও অধর্ম্ম-উপায়ে ধন সংগ্রহ করিতে নাই। যিনি শাস্ত্রানুশাসন না মানিয়া স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেন, ধর্ম্ম ও অর্থ তাঁহার নিকট অতি চঞ্চল।[১৩৩]

১২৯ মালাকারোপমো রাজন্ ভব মাঙ্গারিকোপমঃ।
তথাযুক্তশ্চিরং রাজ্যং ভোক্তুং শক্ষ্যসি পালয়ন্॥ শা ৭১।২০

১৩০ পৌরজানপদান্ সর্ব্বান্ সংশ্রিতোপাশ্রিতাংস্তথা।
যথাশক্ত্যনুকম্পেত সর্ব্বান্ স্বল্পধনানপি॥ শা ৮৭।২৪

১৩১ প্রাকারং ভৃত্যভরণং ব্যয়ং সংগ্রামতো ভয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য গোমিনঃ কারয়েৎ করম্॥ ইত্যাদি। শা ৮৭।৩৫-৩৮

১৩২ লোকে চায়ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা বৃহদ্বৃক্ষমিবাস্রবৎ। শা ১২০।৯

১৩৩ তস্মাদ্রাজা প্রগৃহীতঃ প্রজাসু মূলং লক্ষ্ম্যাঃ সর্ব্বশো হ্যাদদীত। শা ১২০।৪৪
মাস্ম লোভেনাধর্ম্মেণ লিপ্সেথাস্ত্বং ধনাগমম্। শা ৭১।১৩

ধর্ম্মের সহিত অর্থশাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান—কেবল অর্থশাস্ত্রের নির্দ্দেশ-মত কাজ করিলে চলিবে না। ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অর্থশাস্ত্রের প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্যথা আহৃত সম্পত্তি সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।[১৩৪]

ধন নষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত ধনী হইতে সংগ্রহ—পররাষ্ট্র-আক্রমণে যদি ধনাগার রিক্ত হইয়া যায়, তবে সাম-প্রয়োগে প্রজা হইতে কিছু কিছু সংগ্রহের চেষ্টা করিবে। কিন্তু সেই সময়ে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণের ধন কখনও গ্রহণ করিতে নাই। এমন কি, অতিশয় বিপদে পড়িলেও ব্রাহ্মণের উপর কর ধার্য্য করা উচিত নহে।[১৩৫]

অর্থবিভাগে পাঁচজন কর্ম্মচারীর নিয়োগ—অর্থবিভাগে পাঁচজন কর্ম্মচারীকে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা আছে। তাঁহাদের বুদ্ধি, বিনয়, সুশোভন প্রকৃতি, তেজ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, শৌচ, অনুরাগ, স্থিতি, ধৃতি এবং কপটরাহিত্য—এই কয়েকটি গুণ থাকা চাই। এইরূপ সাধু লোককে নিযুক্ত করিলে কোথাও অন্যায় বা অবিচারের আশঙ্কা থাকে না।[১৩৬]

খনি প্রভৃতির আয়ের উপর কর-ব্যবস্থা—সুবর্ণাদির খনি, লবণের উৎপত্তিস্থান, ধান্যাদি বিক্রয়ের আড়ত, নদীতে সন্তরণপ্রতিযোগিতা (এক প্রকার জুয়াখেলা কি ?), হাতীর খেদা প্রভৃতির আয়ব্যয় বিচারপূর্ব্বক সেইসকল স্থান হইতেও কর আদায় করিয়া অর্থ বৃদ্ধি করিতে হয়। সেইসকল স্থানে বিশেষ হিতকারী সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করা উচিত।[১৩৭]

লোভী পুরুষকে অর্থসংগ্রহে নিয়োগ করিতে নাই—অর্থ-গ্রহণাদি কর্ম্মে লুব্ধ কর্ম্মচারী নিয়োগ করা উচিত নহে। নির্লোভ, সদয় এবং সুবুদ্ধি পুরুষ এইসব কাজে নিযুক্ত হইলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই কল্যাণ হইয়া

১৩৪ অর্থশাস্ত্রপরো রাজা ধর্ম্মার্থান্নাধিগচ্ছতি।
অস্থানে চাস্য তদ্বিত্তং সর্ব্বমেব বিনশ্যতি ॥ শা ৭১।১৪

১৩৫ পরচক্রাভিযানেন যদি তে স্যাদ্ধনক্ষয়ঃ।
অথ সাম্নৈব লিপ্সেথা ধনমব্রাহ্মণেষু যৎ ॥ ইত্যাদি। শা ৭১।২১-২৩

১৩৬ যেষাং বৈনয়িকী বুদ্ধিঃ প্রকৃতিশ্চৈব শোভনা। ইত্যাদি। শা ৮২।২১-২৩

১৩৭ আকরে লবণে শুল্কে তরে নাগবলে তথা।
ন্যসেদমাত্যান্নৃপতিঃ স্বাপ্তান্ বা পুরুষান্ হিতান্ ॥ শা ৬৯।২৯

থাকে। মূর্খ লোভী ব্যক্তি অযথা প্রজাপীড়নে আমোদ অনুভব করে। যে-সকল নিযুক্ত কর্ম্মচারী প্রজাকে কষ্ট দিয়া অন্যায়ভাবে ধন আদায় করিবে, নৃপতি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবেন।[১৩৮]

অর্থগ্রহণে নিযুক্ত পাঁচ ব্যক্তির কর্ম্মবিভাগ—জিজ্ঞাসাচ্ছলে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে যে রাজধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, জনপদ হইতে কর প্রভৃতি আদায়ের নিমিত্ত পাঁচজন বীর এবং কৃতপ্রজ্ঞ পুরুষকে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহাদের একজন কর আদায় করিবেন, একজন গ্রাম শাসন করিবেন, প্রজা এবং কর-আদায়কারী উভয়েই যেন পরস্পরের বাক্য পালন করিতে পারেন, একব্যক্তি সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। অপর কর্ম্মচারী সমস্ত লিখিয়া লইবেন, আর একব্যক্তি সাক্ষী থাকিবেন।[১৩৯]

কর আদায়ের উদ্দেশ্য প্রজার মঙ্গল—ধর্ম্মসঙ্গতভাবে প্রজাপালন করিতে হয়। কর আদায়ের উদ্দেশ্য প্রজাদেরই কল্যাণ। যে-রাজা কর আদায়ের বেলা খুব পটু, অথচ প্রজার মঙ্গলের চিন্তা করেন না, তাঁহাকে রাজা বলা ত দূরের কথা, তিনি পুরুষও নহেন, পুরুষবেশধারী নপুংসকমাত্র।[১৪০]

প্রজাপীড়নে উদ্ভূত বিদ্রোহ রাজ্যনাশক—প্রজাপীড়নে আপাততঃ ধনবৃদ্ধি হইলেও সেই ধন স্থায়ী হইতে পারে না। প্রজার অশ্রদ্ধা হইতে উদ্ভূত বিদ্রোহাগ্নি রাজাকে ধনেপ্রাণে দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।[১৪১]

রাজকোশ প্রজাদেরই ন্যস্ত সম্পত্তি—যিনি পৌর এবং জানপদ প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজ্যপালন করেন, সেই

১৩৮ মাস্ম লুব্ধাংশ্চ মূর্খাংশ্চ কামার্থে চ প্রযূযুজঃ। ইত্যাদি। শা ৭১।৮,৯
দণ্ড্যাস্তে চ মহারাজ ধনাদানপ্রয়োজকাঃ।
প্রয়োগং কারয়েয়ুস্তান্ যথাবলিকরাংস্তথা॥ শা ৮৮।২৬

১৩৯ কচ্চিচ্ছূরাঃ কৃতপ্রজ্ঞাঃ পঞ্চ পঞ্চস্বনুষ্ঠিতাঃ।
ক্ষেমং কুর্ব্বন্তি সংহত্য রাজন্ জনপদে তব। সভা ৫।৮০ দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

১৪০ বিহীনং কর্ম্মণা ন্যায়ং যঃ প্রগৃহ্ণাতি ভূমিপঃ।
উপায়স্যাবিশেষজ্ঞং তদ্বৈ ক্ষত্রং নপুংসকম্॥ শা ১৪২।৩১

১৪১ দুঃখাদান ইহ হ্যেষ স্যাত্তু পশ্চাৎ ক্ষয়োপমঃ।
অভিগম্যমতীনাং হি সর্ব্বাসামেব নিশ্চয়ঃ॥ শা ১৩০।৯

ভূপতির ঐহিক ও পারত্রিক সুখের অন্ত নাই।[১৪২] সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া প্রজাপীড়ন তৎকালে অত্যন্ত ঘৃণ্য ছিল, প্রজার সুখের নিমিত্তই কর গ্রহণ করা হইত। রাজকোশ যে প্রজাদেরই গচ্ছিত সম্পত্তি, সেই সম্বন্ধে বহু উল্লেখ দেখিতে পাই। যে নরপতি ষড়্ভাগ কর গ্রহণ করেন, অথচ প্রজাদের রক্ষার সুব্যবস্থা করেন না, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'পাপাচার' বলিয়া থাকেন।[১৪৩] যিনি ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করেন, অথচ প্রজাপালনে উদাসীন—রাষ্ট্রের সমস্ত পাপের চতুর্থাংশ তাঁহাকে আশ্রয় করে।[১৪৪] প্রজার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া যে রাজকোশ স্ফীত করা হয়, তাহা প্রজাদেরই রক্ষণের নিমিত্ত একত্র সঞ্চিত ধনমাত্র, রাজার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেই ধন ভোগ করিবার অধিকার নাই।[১৪৫]

অরক্ষক নৃপতি পার্থিবতস্কর—যিনি রাজকোশের অর্থ প্রজার মঙ্গলার্থে ব্যয় না করিয়া সেই অর্থে স্বকীয় ভোগাগ্নির ইন্ধন যোগাইয়া থাকেন, তাঁহাকে বলা হয়—'পার্থিবতস্কর', অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে চোরের কোন প্রভেদ নাই।[১৪৬]

প্রজাশোষণে অনর্থ—প্রজাশোষণে অর্থ বৃদ্ধি হয় না, বরং অনর্থই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে ভূপতি বুদ্ধিমান্ সংযতেন্দ্রিয়, তাঁহার অর্থ নিত্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রজা হইতে সংগৃহীত ধন একমাত্র প্রজার কল্যাণেই ব্যয়িত হওয়া উচিত।[১৪৭]

যাঁহাদের নিকট হইতে করগ্রহণ অনুচিত—অধীনস্থ আত্মীয় রাজন্যবর্গ হইতে কর গ্রহণ করা হইত না। অনাথ, বিধবা, অতি দুর্গতি, দরিদ্র অথচ বৃদ্ধ, এইসকল ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা রাজকোশ হইতে

---

১৪২ যস্ত রঞ্জয়তে রাজা পৌরজানপদান্ গুণৈঃ।
ন তস্য ভ্রমতে রাজ্যং স্বয়ং ধর্ম্মানুপালনাৎ॥ শা ১৩৯।১০৭

১৪৩ অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়্ভাগহারিণম্। ইত্যাদি। আদি ২১৩।৯

১৪৪ প্রতিগৃহ্লাতি তৎ পাপং চতুর্থাংশেন ভূমিপঃ। শা ২৪।২২

১৪৫ স ষড়্ভাগমপি প্রাজ্ঞস্তাসামেবাভিগুপ্তয়ে। শা ৬৯।২৫

১৪৬ বলিষড়্ভাগমুদ্ধৃত্য বলিং সমুপযোজয়েৎ।
ন রক্ষতি প্রজাঃ সম্যগ্ যঃ স পার্থিবতস্করঃ। ইত্যাদি। শা ১৩৯।১০০-১০৩

১৪৭ নিত্যং বুদ্ধিমতোঽপ্যর্থঃ স্বল্পকোঽপি বিবর্দ্ধতে। শা ১৩৯।৮৮
কালং প্রাপ্যানুগৃহ্লীয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। শা ১৩০।১৩

করা হইত। রাজা কখনও অধর্ম্ম উপায়ে বৃদ্ধি কামনা করিবেন না। উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা সৎপথে ব্যয় করিতে হয়। যুদ্ধবিগ্রহাদি উপস্থিত হইলে প্রজারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। পরে জোর করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা অত্যন্ত অন্যায়। ব্রাহ্মণ হইতে সাধারণতঃ কর আদায় করা হইত না। কিন্তু বিশেষ কারণাধীন মহীপতি বিপন্ন হইলে যাঁহারা ব্রাহ্মণের বর্ণগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বৈশ্যাদির বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সেইসকল ব্রাহ্মণ হইতে অগত্যা কর আদায় করিতে পারেন। স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ হইতে কোন অবস্থায়ই কর গ্রহণ করা যাইতে পারে না।[১৪৮]

ত্যক্তাচার পুরুষের সম্পত্তি-গ্রহণ—অসদাচার ব্রাহ্মণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাহার নিকট হইতে কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহারা ত্যক্তাচার ও স্ববৃত্তিবিরোধী, তাহাদের সম্পত্তিতে রাজার অধিকার। কোশসঞ্চয়েও সাধুর পুরস্কার এবং অসাধুর নির্য্যাতন সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ পাইত।

প্রজার জীবিকার নিমিত্ত রাজা দায়ী—বলা হইয়াছে যে, যাঁহার রাজত্বে কোন দ্বিজ চুরি করিতে বাধ্য হন, সেই রাজার অপটুতা অনুমিত হয়। জীবিকার সংস্থান থাকিলে চৌর্য্যাদি পাপকর্ম্মে লিপ্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। প্রজার জীবিকার কৃচ্ছ্রতার জন্য শাসনপদ্ধতি এবং কোশসংগ্রহের পদ্ধতিকেই দায়ী করা হয়।[১৪৯]

---

১৪৮ দ্বৌ করৌ ন প্রযচ্ছেতাং কুন্তীপুত্রায় ভারত।
বৈবাহিকেন পাঞ্চালাঃ সখ্যেনান্ধকবৃষ্ণয়ঃ। সভা ৫২।৪৯
যষ্টব্যং ক্রতুভির্নিত্যং দাতব্যঞ্চাপ্যপীড়য়া। ইত্যাদি। শা ৮৬।২৩,২৪
স্বয়ং বিনাশ্য পৃথিবীং যজ্ঞার্থং দ্বিজসত্তম।
করমাহারয়িষ্যামি কথং শোকপরায়ণঃ॥ অশ্ব ৩।১৪
এতেভ্যো বলিমাদদ্যাদ্ধীনকোশো মহীপতিঃ।
ঋতে ব্রহ্মসমেভ্যশ্চ দেবকল্পেভ্য এব চ॥ শা ৭৬।৯
ক্ষত্রিয়ো বৃত্তিসংরোধে কস্য নাদাতুমর্হতি।
অন্যত্র তাপসস্বাচ্চ ব্রাহ্মণস্বাচ্চ ভারত॥ শা ১৩০।২০

১৪৯ অব্রাহ্মণানাং বিত্তস্য স্বামী রাজেতি বৈদিকম্।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ যে কেচিদ্বিকর্ম্মস্থা ভবন্ত্যুত॥ ইত্যাদি। শা ৭৬।১০-১৩। শা ৭৭।২

দস্যু ও কৃপণের অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক সৎকার্য্যে ব্যয়—দেবস্ব এবং যাজ্ঞিকস্ব কখনও গ্রহণ করিতে নাই। দস্যু এবং অসৎকর্ম্মে লিপ্ত পুরুষদের ধন রাজা গ্রহণ করিতে পারেন। যে নীচাশয় ব্যক্তি ধনসংগ্রহেই আনন্দ অনুভব করে, যাগযজ্ঞ, দান বা কোন লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করে না, তাহার ধন একেবারেই অনর্থক। ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি তাদৃশ কদর্য্যের ধন জোর করিয়া গ্রহণ করিবেন। সেই অর্থ সাধারণের কল্যাণে ব্যয় করিতে হয়, কোশাগারে জমা দিতে নাই।[১৫০]

উন্মত্তাদির অর্থ সাধারণের উপকারার্থ ব্যয়—মত্ত, উন্মত্ত প্রভৃতির অর্থ গ্রহণ করিয়া নরপতি পৌররক্ষণে ব্যয় করিবেন। সেইসকল হৃতস্ব পুরুষের চিকিৎসা এবং জীবিকার সকল-প্রকারের ব্যবস্থাও তাঁহাকেই করিতে হইবে।[১৫১]

বিজিত রাজন্যবর্গ হইতে করগ্রহণ—বিজিত রাজন্যবর্গ হইতে কর গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল।[১৫২]

সতত সঞ্চয়ের আবশ্যকতা—সব সময়ই রাজকোশে ধন সঞ্চিত রাখা উচিত। আয় অধিক এবং ব্যয় অল্প হইলেই সঞ্চয় সম্ভবপর হইতে পারে। অসদ্ব্যয়ের দ্বারা কোশের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। বুদ্ধির কৌশলে এবং কার্য্যদক্ষতায় ধন সঞ্চিত হইয়া থাকে। দরিদ্র ব্যক্তিই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, ধনের বলই প্রকৃত বল। কোশের সুরক্ষা ও সদ্ব্যয়ে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। অতএব ধর্ম্মপথে থাকিয়া কোশের উন্নতির ব্যবস্থা করিবে, কদাচ অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে নাই।[১৫৩]

আপদ্বৃত্তি—আপৎকালে উল্লিখিত নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন

১৫০ ন ধনং যজ্ঞশীলানাং হার্য্যং দেবস্বমেব চ।
দস্যূনাং নিষ্ক্রিয়াণাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো হর্ত্তুমর্হতি॥ ইত্যাদি। শা ১৩৬।২-৬

১৫১ দশধর্ম্মগতেভ্যো যদ্বসু বহ্বল্পমেব চ।
তদাদদীত সহসা পৌরাণাং রক্ষণায় বৈ॥ শা ৬৯।২৬

১৫২ তে নাগপুরসিংহেন পাণ্ডুনা করদীকৃতাঃ। ইত্যাদি। আদি ১১৩।৩৮।
সভা ২৫শ অঃ—৩২ শ অঃ।

১৫৩ সর্ব্বং ধনবতা প্রাপ্যং সর্ব্বং তরতি কোশবান্। ইত্যাদি। শা ১৩০।৪৯, ৫০

সাধিত হইত। বলা হইয়াছে যে, আপৎকালে কোন-কোন অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।[১৫৪]

দুর্ব্বল ব্যতীত সকলের নিকট হইতে করগ্রহণ—আপৎকালে প্রথম কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুকল্পবিধানে জীবন ধারণ করিতে হয়। সুতরাং দুর্ব্বলের পীড়ন না করিয়া আপৎকালে সকলের নিকট হইতেই ধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কোশের শক্তিই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ শক্তি। আপৎকালে অন্যায় উপায়ে কোশবর্দ্ধনের চেষ্টা করিলেও পাপ হইবে না। যজ্ঞাদি কার্য্যে এরূপ অনেক কর্ম্ম করিতে হয়, যাহা আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত অশোভন, কিন্তু যজ্ঞের অঙ্গ বলিয়া যেমন সেইগুলিকে ত্যাগ করা চলে না, সেইরূপ আপৎকালে ধনের প্রয়োজন মিটাইতেও এমন কাজ করিতে হইবে, যাহা আপাততঃ নিতান্ত অশোভন বলিয়া মনে হইতে পারে।[১৫৫]

কোশসঞ্চয়ে বিরোধীদের নিধন—আপৎকালে কোশসঞ্চয়ের পথে যাহারা বিরোধিতা করে, তাহাদিগকে হত্যা না করিয়া উপায় নাই। দেশ এবং কালভেদে কার্য্যাকার্য্যের নিয়ম কিছুটা পরিবর্ত্তন করিতে সকলেই বাধ্য হইয়া থাকেন।[১৫৬]

আপৎকালের নিমিত্ত সঞ্চয়—প্রজামণ্ডলী রাজাকে যে ধন দান করিয়া থাকেন, রাজা আপৎকালে ব্যয় করিবার নিমিত্ত সেই ধনের কিয়দংশ সং করিয়া রাখিবেন।[১৫৭]

সাধু ও অসাধু উপায়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন—আপৎকালে কোশ-সঞ্চয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। স্বরাজ্য এবং পররাজ্য হইতে ধনসংগ্রহ করা উচিত। কোশের উন্নতিতেই রাজ্যের উন্নতি। ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক সযত্নে রক্ষা করিবে এবং বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করিবে। আপৎকালে কেবল সাধু উপায়ের উপর নির্ভর না করিয়া সাধু ও অসাধু উপায়ের মধ্যপন্থা

১৫৪ তস্মাদাপদ্যধর্ম্মোঽপি শ্রূয়তে ধর্ম্মলক্ষণঃ। শা ১৩০।১৬

১৫৫ আপদ্‌গতেন ধর্ম্মাণামন্যায়েনোপজীবনম্। ইত্যাদি। শা ১৩০।২৫, ২৬

রাজ্ঞঃ কোশবলং মূলং কোশমূলং পুনর্ব্বলম্। ইত্যাদি। শা ১৩০।৩৫-৩৭

১৫৬ এবং কোশস্য মহতো যে নরাঃ পরিপন্থিনঃ।

তানহত্বা ন পশ্যামি সিদ্ধিমত্র পরন্তপ॥ ইত্যাদি। শা ১৩০।৪২-৪৪

১৫৭ আপদর্থং চ নির্য্যাতং ধনং ত্বিহ বিবর্দ্ধয়েৎ। শা ৮৭।২৩

অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। দুর্ব্বল নরপতি ধন সংগ্রহ করিতে পারেন না, নির্দ্ধনের রাজ্যরক্ষা দুষ্কর। রাজলক্ষ্মী বীরপুরুষকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। মহৎ ব্যক্তির শ্রীভ্রংশ এবং মরণ উভয়ই সমান। অতএব সর্ব্বতোভাবে ধনবল ও মিত্রবল বৃদ্ধির উপায় করা উচিত।[১৫৮]

হীনকোশ নৃপতি অবজ্ঞার পাত্র—হীনকোশ নরপতি নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র। কর্ম্মচারিগণও তাঁহার কাজে উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। একমাত্র কোশের জন্যই রাজা সম্মানিত হইয়া থাকেন। বস্ত্র দ্বারা যেমন কুৎসিত অবয়বকেও আবৃত রাখা যায়, সেইরূপ রাজাদের সমস্ত কলুষ ধনাগারের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে।[১৫৯]

আপৎকালে করের হার বৃদ্ধি--আপৎকালে খাজানার হার বৃদ্ধি করা অন্যায় নহে। যদিও তাহা শোষণ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, প্রজার মঙ্গলের নিমিত্তই করবৃদ্ধির ব্যবস্থা। কেহ যাহাতে অত্যন্ত পীড়িত না হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।[১৬০]

কোশের শুভানুধ্যায়ীর সম্মান—যে-ব্যক্তি কোশের শুভানুধ্যায়ী, তাঁহাকে সসম্মানে রাজসভায় স্থান দিতে হয়। রাজকোশের কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকিলে, যে-ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট ব্যক্ত করেন, তিনিই প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী। এইসকল অমাত্যের পরামর্শ খুব গোপনে শুনিতে হয়। রাজকোশের রক্ষক অমাত্যকে অপর কর্ম্মচারীরা ঈর্ষা করিয়া থাকেন, রাজা তাঁহাকে সমাদর না করিলে তাঁহার স্থান কোথায়?[১৬১]

আপৎকালে প্রজা হইতে ঋণগ্রহণ—আপৎকালে প্রজা হইতে ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। রাজা ধনী প্রজাগণকে বলিতেন, "বর্ত্তমান সঙ্কটে তোমাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি ঋণ প্রার্থনা করিতেছি, বিপদ কাটিয়া গেলেই আমি সমস্ত প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দিব। তোমরা যদি দস্যু বা তস্করের দ্বারা আক্রান্ত হও, তবে তোমাদের ধনসম্পত্তিও বিনষ্ট

১৫৮ স্বরাষ্ট্রাৎ পররাষ্ট্রাচ্চ কোশং সঞ্জনয়েন্নৃপঃ। ইত্যাদি। শা ১৩৩।১-৫

১৫৯ হীনকোশং হি রাজানমবজানন্তি মানবাঃ। ইত্যাদি। শা ১৩৩।৬, ৭

১৬০ পার্শ্বতঃ করণং প্রাজ্ঞো বিষ্টম্ভিত্বা প্রকারয়েৎ।
জনস্তচ্চরিতং ধর্ম্মং বিজানাত্যন্যথান্যথা। শা ১৪২।৯

১৬১ যঃ কশ্চিজ্জনয়েদর্থং রাজ্ঞা রক্ষ্যঃ সদা নরঃ। ইত্যাদি। শা ৮২।১-৪

হইবে ; আপদ্-বিপদে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তই সঞ্চয় করা হয়। তোমরা আমার সন্তানতুল্য, তোমাদের অর্থসাহায্যে উপস্থিত সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতে চাই"। এইভাবে হিতমধুর বাক্যে ধনী প্রজাগণ হইতে ঋণ গ্রহণ করা যাইতে পারে।[১৬২]

আপদের দোহাই দিয়া ধর্ম্মত্যাগ গর্হিত—আপৎকালেও ধর্ম্মবুদ্ধিকে একেবারে বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না ; মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্মই সকলের উপরে। ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করা উচিত বটে, কিন্তু আপদের দোহাই দিয়া ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেওয়া একান্ত গর্হিত। বলপূর্ব্বক প্রজাকে শোষণ করিতে গেলে নানাবিধ অনর্থের উৎপত্তি হয়। অধার্ম্মিক যথেচ্ছাচারী নরপতি শীঘ্রই সপরিবারে বিনাশ প্রপ্ত হন।[১৬৩]

বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতির ধন অগ্রাহ্য—বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ ও দুর্গতের ধন সতত রক্ষা করিতে হয়। কোন অবস্থায়ই তাহাদের ধন গ্রহণ করিতে নাই। রাজা বিপদে পড়িলেও দরিদ্র শ্রমজীবিগণের ধন গ্রহণ করিতে পারিবেন না। দরিদ্রের কষ্টসঞ্চিত অর্থে রাজার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িলে রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠেন।[১৬৪]

প্রজার অন্নাভাবে রাজার পাপ—দরিদ্র ও অনাথ যদি অন্নাভাবে কষ্ট পায়, তবে সেই রাজার ধনভাণ্ডার নিরর্থক। বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি জীবিকার নিমিত্ত চিন্তা করেন, তবে রাজার থাকিয়াই ফল কি? সেই রাষ্ট্রের রাজা ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন।[১৬৫]

রাষ্ট্রের অবস্থাবিবেচনায় ব্যয়ের বিধান—যে-বৎসর দেশে কৃষি প্রভৃতির অবস্থা ভাল থাকে, সেই বৎসর কোশে সঞ্চিত অর্থের চতুর্থাংশ দ্বারা

---

১৬২ অস্যামাপদি ঘোরায়াং সম্প্রাপ্তে দারুণে ভয়ে।
পরিত্রাণায় ভবতঃ প্রার্থয়িষ্যে ধনানি বঃ ॥ ইত্যাদি। শা ৮৭।২৯-৩৪

১৬৩ অর্থসিদ্ধেঃ পরং ধর্ম্মং মন্যতে যো মহীপতিঃ।
বৃদ্ধ্যাঞ্চ কুরুতে বুদ্ধিং স ধর্ম্মেণ বিরাজতে ॥ ইত্যাদি। শা ৯২।৭-৯

১৬৪ বৃদ্ধবালধনং রক্ষ্যমন্ধস্য কৃপণস্য চ। অনু ৬১।২৫
ন খাতপূর্ব্বং কুর্ব্বীত ন রুদন্তীধনং হরেৎ।
হৃতং কৃপণবিত্তং হি রাষ্ট্রং হন্তি নৃপশ্রিয়ম্। ইত্যাদি। অনু ৬১।২৫, ২৬

১৬৫ যদি তে তাদৃশো রাষ্ট্রে বিদ্বান্ সীদেৎ ক্ষুধা দ্বিজঃ।
ভ্রূণহত্যাঞ্চ গচ্ছেথাঃ কৃত্বা পাপমিবোত্তমম্। ইত্যাদি। অনু ৬১।২৮,২৯

রাষ্ট্রের যাবতীয় খরচ চালান উচিত। যে-বৎসর দেশের অবস্থা মধ্যম, সেই বৎসর কোশের অর্দ্ধেক অর্থ খরচ করিবে, আর যে-বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেই বৎসর চারিভাগের তিনভাগ অর্থ ব্যয় করিবে।[১৬৬]

দুর্ব্বিনীতের রাজৈশ্বর্য্য অমঙ্গলের হেতু—দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি শ্রী, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও সম্পদের যথোচিত ব্যবহার করিতে পারে না। সেইসকল সৌভাগ্যই তাহার পরম দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।[১৬৭]

অরক্ষক নৃপতি বধার্হ—যিনি প্রজাদের অর্থের শোষণে পটু, কিন্তু রক্ষণের বেলা উদাসীন, সেই রাজা নিতান্ত অধম। প্রজাগণ মিলিত হইয়া নির্দ্দয়ভাবে তাঁহাকে হত্যা করিবে।[১৬৮]

রাজধর্ম্ম (গ)

রাজ্য-শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোশ, রাষ্ট্র, দুর্গ এবং বল এই সাতটি অঙ্গের সমষ্টির নাম রাজ্য। কিন্তু সপ্তাঙ্গক রাজ্যের পঞ্চমস্থানীয় রাষ্ট্রশব্দের অর্থ প্রজামণ্ডলী ও তাঁহাদের বাসস্থান—জনপদ। রাজাপ্রজার সম্বন্ধ, প্রজাপালন প্রভৃতি রাষ্ট্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে আলোচ্য হইলেও স্বামী ও অমাত্যের আলোচনাতেই প্রসঙ্গতঃ তাহা বলা হইয়াছে। শত্রু ও মিত্রের পরিচয় এবং তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য, সন্ধিবিগ্রহ, চরনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ও রাষ্ট্রীয় আলোচনার অন্তর্গত। তারপর দুর্গ, রাজপুর এবং শাসনপ্রণালী বিষয়েও এই প্রবন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

মানুষের শত্রু পদে পদে—মানুষের শত্রু পদে পদে—কথাটি অতি সত্য। জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে মানবের শত্রুর শেষ নাই। শত্রুসঙ্কুল পৃথিবীতে বাঘ, ভালুক, কুমীর, সাপ প্রভৃতি প্রাণীকে তাহাদের আকৃতি দ্বারা

১৬৬ কচ্চিদায়স্য চার্দ্ধেন চতুর্ভাগেন বা পুনঃ।
পাদভাগৈস্ত্রিভির্ব্বাপি ব্যয়ঃ সংশোধ্যতে তব॥ সভা ৫।৭০

১৬৭ দুর্ব্বিনীতাঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব বা।
তিষ্ঠন্তি ন চিরং ভদ্রে যথাহং মদগর্ব্বিতঃ॥ বন ২৪৮।১৮

১৬৮ অরক্ষিতারং হর্ত্তারং বিলোপ্তারমনায়কম্।
তং বৈ রাজকলিং হন্যুঃ প্রজাঃ সন্নহ্য নির্ঘৃণম্। ইত্যাদি। অনু ৬১।৩২,৩৩

সহজেই পরিচয় করা যায়, কিন্তু ভদ্রবেশধারী মানুষকে পরিচয় করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। এইহেতু নিপুণভাবে শত্রু ও মিত্র স্থির করিবার নিমিত্ত ভূপতিকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতিও শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছেন, এরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ পুরাণ ও ইতিহাসে আছে।

পরিবারস্থ শত্রু—শত্রু কেবল বাহিরেই নহে। বহু নরপতি প্রিয়তমা মহিষী, পরম স্নেহাস্পদ সহোদর এবং প্রাণোপম পুত্র হইতে প্রাণ হারাইয়াছেন। সুতরাং এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করা ভূপতিদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

কেহই শত্রুহীন নহেন—জগতে শত্রুহীন মানব একজনও নাই, মহাভারতের এই সিদ্ধান্ত। এমন কি, অরণ্যচারী সন্ন্যাসী স্বয়ং কাহারও সহিত শত্রুতা না করিলেও তাঁহার সহিত শত্রুতা করিবার লোকের অভাব হয় না। যে অরণ্যচারী মুনি শুধু আপনার কাজ লইয়াই কালাতিপাত করেন, জগতের কল্যাণই যাঁহার ধ্যান, তাঁহারও শত্রু, মিত্র এবং উদাসীন (শত্রুও নহেন, মিত্রও নহেন), এই তিন শ্রেণীর লোক থাকেন। লুব্ধগণ শুচিস্বভাব পুরুষকে দ্বেষ করিয়া থাকে, কাতর ভীরু পুরুষ তেজস্বী পুরুষকে ঈর্ষা করে, মূর্খেরা পণ্ডিতের সহিত শত্রুতা করে, দরিদ্রেরা ধনীকে শত্রু বলিয়া মনে করে, ধার্ম্মিকগণ অধার্ম্মিক পাপাচারীদের চক্ষুঃশূল, সুন্দর পুরুষ সকল সময়েই বিশ্রী পুরুষের দ্বেষ্য। সুতরাং জগতে শত্রুহীন একজন মানুষও নাই।[১]

শত্রু ও মিত্রের পরিচয় সহজ নহে—শত্রু ও মিত্র বিষয়ে পূর্ব্বেও কিছুটা বলা হইয়াছে। শত্রুমিত্র-পরিজ্ঞানের সাধারণ কয়েকটি নিয়ম আছে বটে, কিন্তু অনেক সময়েই সেইসকল বাহ্যিক লক্ষণের দ্বারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি শত্রুকে ধরা যায় না। তাঁহারা বাহিরে মিত্রের মত আচরণ করিলেও হৃদয়সঞ্চিত হলাহলের তীব্র আক্রোশকে সফল করিবার নিমিত্ত প্রতি মুহূর্ত্তে সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। অতিশয় নিপুণতার সহিত শত্রুমিত্রের পরীক্ষা করিতে হয়। "যিনি আমার সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র, যাঁহার অনুভব বিপরীত, অর্থাৎ যিনি আমার সুখে দুঃখী এবং দুঃখে সুখী হন, তিনিই শত্রু।" এই একটিমাত্র

১ মুনেরপি বনস্থস্য স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতঃ।
উৎপদ্যন্তে ত্রয়ঃ পক্ষা মিত্রোদাসীনশত্রবঃ॥ ইত্যাদি। শা ১১১।৬০-৬২

লক্ষণের দ্বারাই শত্রু ও মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।[২] যাঁহাদের একশ্রেণীর জীবিকা দ্বারা সংসার চালাইতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে শত্রুতা প্রায় লাগিয়াই থাকে। এইজন্যই রাজার শত্রু রাজা, ব্রাহ্মণের শত্রু ব্রাহ্মণ, চিকিৎসকের শত্রু চিকিৎসক। এইরূপে প্রায়ই সমব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি শত্রুতাতে। এই কারণেই বোধ করি, জ্ঞাতিকে 'সহজ শত্রু' আখ্যা দেওয়া হয়।[৩]

ক্ষুদ্র শত্রুও উপেক্ষণীয় নহে—শত্রু অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। অগ্নি এবং বিষের সহিত শত্রুর উপমা দেওয়া হইয়াছে। স্বল্পমাত্র অগ্নিও প্রকাণ্ড গ্রামকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিতে পারে, বিষ পরিমাণে নিতান্ত অল্পমাত্রায় সেবিত হইলেও তাহার পরিণাম অতি ভয়ানক।[৪]

শত্রুতার প্রতীকার—শত্রুতার যথোচিত প্রতীকারের নিমিত্ত নিয়ত পৌরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উদ্যোগবিহীন অলস ব্যক্তি অতি সহজেই শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে।[৫] শত্রুদের অগোচরে নরপতি সর্ব্বদা প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন, খুব ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রুপক্ষের চেষ্টাচরিত্র জানিতে হয়।[৬]

গুপ্তচর দ্বারা শত্রুচেষ্টিত-পরিজ্ঞান—মিত্রকে জানা অপেক্ষাকৃত সহজ। মিত্রলক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ৪০৮তম—৪১১তম পৃঃ) রাজ্যমধ্যে গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া শত্রুদের গতিবিধি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত খবর লইতে হয় এবং তদনুসারে পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হইয়া চলিলে বিপদের বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। (এই প্রবন্ধের শেষাংশে গুপ্তচরনিয়োগ বিষয়ে অভিমতগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে।)

২ আর্ত্তিরার্ত্তে প্রিয়ে প্রীতিরেতাবন্মিত্রলক্ষণম্।
বিপরীতন্তু বোধ্যব্যমরিলক্ষণমেব তৎ॥ শা ১০৩।৫০

৩ নাস্তি বৈ জাতিতঃ শত্রুঃ পুরুষস্য বিশাম্পতে।
যেন সাধারণী বৃত্তিঃ স শত্রুর্নেতরো জনঃ॥ সভা ৫৫।১৫

৪ ন চ শত্রুরবজ্ঞেয়ো দুর্ব্বলোঽপি বলীয়সা।
অল্পোঽপি হি দহত্যগ্নির্বিষমল্পং হিনস্তি চ॥ ইত্যাদি। শা ৫৮।১৭। সভা ৫৫।১৬, ১৭

৫ উত্থানহীনো রাজাপি বুদ্ধিমানপি নিত্যশঃ।
প্রধর্ষণীয়ঃ শত্রূণাং ভুজঙ্গ ইব নির্বিষঃ॥ শা ৫৮।১৬

৬ কচ্চিদ্দ্বিষামবিদিতঃ প্রতিপন্নশ্চ সর্ব্বদা।
নিত্যযুক্তো রিপূন্ সর্ব্বান্ বীক্ষসে রিপুসূদন॥ সভা ৫।৩৯

সামাদির প্রয়োগপদ্ধতি—শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকলকেই সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চারিটি উপায়ের যে-কোন একটি উপায় দ্বারা বশ করিবার চেষ্টা করা উচিত। একটি উপায়ের দ্বারা বশ করা সম্ভবপর না হইলে একাধিক উপায়ের প্রয়োগ করিতে হয়। যাহাকে যে-উপায়ে বশীভূত করা সম্ভবপর, তাহাকে সেই উপায়ে আপনার অনুকূল করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা ভূপতির একান্ত কর্ত্তব্য।[৭]

শত্রুর সহিতও প্রথমে সাম-ব্যবহার—কাহাকেও শত্রু বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানিলেও প্রথমে তাহার সহিত মিলনের চেষ্টা করা উচিত। সাম বা শান্তির মত উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই, সামের প্রয়োগে মিলন সম্ভবপর না হইলে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দানের দ্বারা স্বপক্ষবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়, তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে শত্রুপক্ষের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবন করিয়া ভেদনীতি দ্বারা শত্রুকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত। উল্লিখিত তিনটি উপায়ের ব্যর্থতায় অগত্যা দণ্ড বা যুদ্ধবিগ্রহাদির আশ্রয় লইতে হয়।[৮]

অগত্যা দণ্ডপ্রয়োগ—দণ্ডের দ্বারা শত্রুকে বশে আনা উৎকৃষ্ট উপায় নহে, ঐ পথটি নিতান্ত বালকোচিত। বুদ্ধিমান্ পুরুষ উপায়ান্তরের দ্বারা শত্রুকে বশ করিতে চেষ্টা করিবেন।[৯]

ষড়্‌বর্গচিন্তা—রাজার বিশেষ চিন্তনীয় ছয়টি বিষয়কে ষড়্‌বর্গ বলা হয়। সন্ধি, বিগ্রহ (যুদ্ধ), যান (শত্রুকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা), আসন (শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন), দ্বৈধীভাব (সৈন্যসমূহকে দুইভাগে বিভক্ত করা, একদল যোদ্ধসৈন্য ও অপর দল সংরক্ষক সৈন্য) এবং সংশ্রয় (শৌর্য্য-বীর্য্যশালী সাধু নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ)। এই ছয়টি বিষয়ে বিশেষ নিপুণতার

---

৭ দানেনান্যং বলেনান্যমন্যং সুনৃতয়া গিরা।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ রাজ্যং প্রাপ্যেহ ধার্ম্মিকঃ ॥ শা ৭৫।৩১

৮ সান্ত্বেন তু প্রদানেন ভেদেন চ নরাধিপ। শা ৬৯।২৪
সন্নিপাতো ন মন্তব্যঃ শক্যে সতি কথঞ্চন।
সান্ত্বভেদপ্রদানানাং যুদ্ধমুত্তরমুচ্যতে ॥ শা ১০২।২২
সান্ত্বৈব বর্ত্তয়েঃ পূর্ব্বং প্রযতেথাস্ততো যুধি। শা ১০২।১৬

৯ ন জাতু কলহেনেচ্ছেন্নিয়ন্তুমপকারিণঃ।
বালৈরাসেবিতং হ্যেতদ্ যদমর্ষো যদক্ষমা ॥ শা ১০৩।৭

সহিত চিন্তা করিতে হইবে। যখন যাহা আবশ্যক, তখন তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।[১০]

বাহিরে সরল ব্যবহার—প্রতিপক্ষের বলাবল বিবেচনা করিয়া মহীপতি প্রণিপাত, দান এবং মধুরবচনে প্রথমতঃ তাহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবেন। শত্রুর যাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, এরূপ কোন ব্যবহার বাহিরে প্রকাশ করিতে নাই। যে-সকল শত্রুর মনে আশঙ্কা জাগিয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে, কদাচ তাহাদের নিকটে যাইতে নাই। তাহারা অপমানিত হইলে সকল সময়ই প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজিতে থাকে, তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই। অতএব ভূপতি খুব সাবধানে মিত্রামিত্র বাছিয়া লইবেন।[১১]

সামাদির ক্রমিক প্রয়োগ—শত্রুর প্রতি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড যুগপৎ প্রয়োগ করিতে নাই। সমুদয় উপায়ের প্রয়োগে সমর্থ হইলেও এককালীন প্রয়োগ না করিয়া এক-একটির প্রয়োগ করিতে হয়। এক সঙ্গে বহু শত্রুকে জয় করিবার চেষ্টাও করিতে নাই।[১২]

শত্রুর ক্ষতিসাধন—নৃপতি শত্রুর কীর্ত্তি নাশ করিবেন এবং তাহার ধর্ম্মের হানি ঘটাইবেন। অর্থ বিষয়ে তাহার যাহাতে ক্ষতি হয়, সেইরূপ উপায় করিতে হইবে। রিপু দুর্ব্বলই হউক, আর বলবানই হউক, তাহাকে কখনও উপেক্ষা করিতে নাই।[১৩]

অপরাধের স্থান পরিত্যাগ—যে-ব্যক্তি যে-স্থানে কোন অন্যায় আচরণ করিয়াছে, সেই স্থানে তাহার বাস করাকে পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন না। সেই স্থান ত্যাগ করাই তাহার পক্ষে উত্তম পন্থা।[১৪]

কৃতবৈরে অবিশ্বাস—কৃতবৈর ব্যক্তির মিষ্ট বাক্যে ভুলিতে নাই। যে

---

১০ ষাড়্‌গুণ্যাস্ত বিধানেন যাত্রাযানবিধৌ তথা। শা ৮১।২৮
ষাড়্‌গুণ্যমিতি যৎ প্রোক্তং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির। ইত্যাদি। শা ৬৯।৬৭,৬৮

১১ প্রণিপাতেন দানেন বাচা মধুরয়া ব্রুবন্।
অমিত্রমপি সেবেত ন চ জাতু বিশঙ্কয়েৎ ॥ ইত্যাদি। শা ১০৩।৩০-৩৩

১২ ন বহূনভিযুঞ্জীত যৌগপদ্যেন শাত্রবান্।
সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেন চ পুরন্দর ॥ ইত্যাদি। শা ১০৩।৩৬,৩৭

১৩ হরেৎ কীর্ত্তিং ধর্ম্মমস্যোপরুন্ধ্যাদর্থে দীর্ঘং বীর্য্যমস্যোপহন্যাৎ। ইত্যাদি। শা ১২০।৪০

১৪ সকৃৎ কৃতাপরাধস্য তত্রৈব পরিলম্বতঃ।
ন তদ্ বুধাঃ প্রশংসন্তি শ্রেয়স্তত্রাপসর্পণম্ ॥ শা ১৩৯।২৫

মূঢ় সেই বাক্য বিশ্বাস করে, সে শীঘ্রই বিপন্ন হইয়া থাকে। কৃতবৈর পুরুষকে অবিশ্বাস করাই সর্ব্ববিধ সুখের হেতু। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করিতে নাই। অন্যকে একান্ত বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু নিজে তাহার নিকট বিশ্বস্ত হইতে চেষ্টা করিবে।[১৫]

বৈরভাব কখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না—পরস্পরের মধ্যে একবার বৈরভাব জন্মিলে জীবনে কখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় না। কাহারও অপকার করিয়া পরে যদি তাঁহাকে অর্থদান এবং সম্মানও করা হয়, তথাপি সেই ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত অপকার ভুলিতে পারেন না, তাঁহার মন কখনও সরল হইতে পারে না। 'শত্রু আমাকে সম্মান করিয়াছে বা আমার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে'—ইহা মনে করিয়া শত্রুকে বিশ্বাস করিতে নাই। বিশ্বাসই মানুষকে অনেক সময় বিপন্ন করিয়া থাকে। শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল।[১৬]

বৈর-উৎপত্তির পাঁচটি কারণ—পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, বৈর উৎপত্তির কারণ পাঁচটি—স্ত্রীকৃত, বাস্তকৃত, বাক্‌কৃত, জ্ঞাতিকৃত এবং অপরাধকৃত। কৃষ্ণ ও শিশুপালের মধ্যে বিবাদের কারণ—রুক্মিণীর বিবাহ। কৌরব ও পাণ্ডবদের বিবাদের হেতু—বাস্তু বা সম্পত্তির অধিকার। দ্রুপদ ও দ্রোণাচার্য্যের বিবাদ বাক্‌কৃত। সাপ ও নকুল, বিড়াল ও ইঁদুরের বৈর জন্মগত। অপকারকের প্রত্যপকার করা পঞ্চমপ্রকার বৈরের অন্তর্গত। কাষ্ঠমধ্যে গূঢ় অগ্নির ন্যায় বৈরভাব প্রচ্ছন্নভাবে হৃদয়মধ্যে অবস্থিত থাকে। সাগরকুক্ষিস্থ বাড়বানলের ন্যায় বৈরভাব কিছুতেই অপসৃত হয় না। এক পক্ষের মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত শত্রুতার শেষ হয় না।[১৭]

প্রীতি বিনষ্ট হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না—পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,

১৫ সান্ত্বে প্রযুক্তে সততং কৃতবৈরে ন বিশ্বসেৎ। শা ১৩৯।২৬
সর্ব্বেষাং কৃতবৈরাণামবিশ্বাসঃ সুখোদয়ঃ। ইত্যাদি। শা ১৩৯।২৮,২৯

১৬ অন্যোন্যকৃতবৈরাণাং ন সন্ধিরুপপদ্যতে। ইত্যাদি। শা ১৩৯।৩১,৩২
নাস্তি বৈরমতিক্রান্তং সান্ত্বিতোঽস্মীতি নাশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্বধ্যতে লোকে তস্মাচ্ছ্রেয়োঽপ্যদর্শনম্। শা ১৩৯।৩৮

১৭ বৈরং পঞ্চসমুত্থানং তচ্চ বুধ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
স্ত্রীকৃতং বাস্তুজং বাগ্‌জং সমপত্নাপরাধজম্। ইত্যাদি। শা ১৩৯।৪২-৪৬

মাটির বাসন ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন পুনরায় জোড়া দেওয়া যায় না, সেইরূপ শত্রুতা দ্বারা বিশ্বাস ভঙ্গ হইলে পুনরায় স্থাপন করা যায় না।[১৮]

বংশানুক্রমে শত্রুতা—উশনা প্রহ্লাদকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন যে, যে-ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে শুষ্কতৃণচ্ছন্ন প্রপাতমধ্যে পতিত মধুলোভীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কোন কোন স্থলে বংশপরম্পরায় শত্রুতা চলিতে দেখা যায়। শত্রুদের লোকান্তরগমনের পরেও তাঁহাদের স্থলবর্ত্তীদের নিকট সেই-সেই বংশের অপর প্রাচীন পুরুষগণ পূর্ব্বের বৈর বিবৃত করিয়া থাকেন।[১৯]

সন্ধি করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই—শত্রুতার শান্তির নিমিত্ত যিনি শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, তিনিও সুযোগ বুঝিয়া পাষাণে পতিত পূর্ণ ঘটের ন্যায় শত্রুকে বিনাশ করিবার পথ খুঁজিতে থাকেন।[২০] হৃদয়ে ক্ষুরের ন্যায় বৈরকে জাগরুক রাখিতে হইবে, অথচ বাহিরে আচার ও বাক্যে অতিশয় মিষ্টভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত ভূপতি শত্রুর সহিত সন্ধি করিলেও মনেপ্রাণে তাহাকে বিশ্বাস করিবেন না। কৃতকার্য্য হইলেই তাহার সংস্রব হইতে দূরে থাকা উচিত। বাহিরে মিত্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক মিষ্ট বাক্যে শত্রুকে ভুলাইয়া সসর্প গৃহে বাস করার মত সতত সাবধান থাকিবেন।[২১]

কুটিল রাজধর্ম্ম—শত্রুর সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকগুলি কুটিল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি উপদেশ উদ্ধৃত হইল। আলোচ্য প্রত্যেক কথাই কূটনীতির অন্তর্গত। কুটিল রাজধর্ম্মে কণিকের উপদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সারগর্ভ। (শা ১৪০তম অঃ)

স্বয়ং দুর্ব্বল হইলে কপট বিনয় প্রদর্শন—যতদিন দুর্ব্বল থাকিবেন,

---

১৮ বৈরমন্তিকমাসাদ্য যঃ প্রীতিং কর্ত্তুমিচ্ছতি।
মৃন্ময়স্যেব ভগ্নস্য যথা সন্ধির্ন বিদ্যতে॥ শা ১৩৯।৬৯

১৯ যে বৈরিণঃ শ্রদ্দধতে সত্যে সত্যেতরেঽপি বা।
বধ্যন্তে শ্রদ্দধানাস্তু মধু শুষ্কতৃণৈর্যথা॥ ইত্যাদি। শা ১৩৯।৭১,৭২

২০ উপগৃহ্য তু বৈরাণি সান্ত্বয়ন্তি নরাধিপ।
অথৈনং প্রতিপিংষন্তি পূর্ণং ঘটমিবাশ্মনি॥ শা ১৩৯।৭৩

২১ বাঙ্মাত্রেণ বিনীতঃ স্যাদ্ধৃদয়েন যথা ক্ষুরঃ।
শ্লক্ষ্ণপূর্ব্বাভিভাষী চ কামক্রোধৌ বিবর্জ্জয়েৎ॥ শা ১৪০।১৩
সপত্নসহিতে কার্য্যে কৃত্বা সন্ধিং ন বিশ্বসেৎ॥ ইত্যাদি শা ১৪০।১৪,১৫

ততদিন জোড়হাতে অবনতশিরে কথা বলিবেন, আপনাকে অতিশয় বিনীত-রূপে সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতে চেষ্টা করিবেন। যে পর্য্যন্ত সময়ের পরিবর্ত্তন না হয়, সেই পর্য্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে বহন করিতে হয়, সময় উপস্থিত হইলে পাষাণে নিক্ষিপ্ত মাটির কলসের ন্যায় শত্রুকে বিনাশ করিতে হয়।[২২]

শত্রুকে নিরপেক্ষ করিতে নাই—কৃতঘ্ন শত্রু কৃতকার্য্য হইলেই উপকার ভুলিয়া যায়। অতএব শত্রুর সহিত বাহ্যিক সুব্যবহারকেও সম্পূর্ণ শেষ করিতে নাই। শত্রু যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ না হইতে পারে, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।[২৩]

কুশল-জিজ্ঞাসা—মধ্যে মধ্যে রিপুর গৃহে যাইয়া তাহার সমস্ত পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করা উচিত।[২৪]

স্বচ্ছিদ্র-গোপন—কূর্ম্মের ন্যায় আপনার ছিদ্রসমূহ সযত্নে গোপন রাখিতে হয়, অথচ সতত শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করা উচিত।[২৫]

শত্রুর শেষ রাখিতে নাই—শত্রুকে যিনি সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত না করেন, সেই নরপতি অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হন। শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া যিনি নিশ্চিন্তমনে কাল যাপন করেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে সুখে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া যথোচিত শিক্ষা লাভ করেন।[২৬]

শত্রুর শত্রুর সহিত মিত্রতা বিধেয়—শত্রুর শত্রুদের সহিত মিত্রতা করা উচিত। তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলে শত্রুকে অনায়াসেই বিপন্ন করা যাইতে পারে।[২৭]

২২ অঞ্জলিং শপথং সান্ত্বং প্রণম্য শিরসা বদেৎ।
অশ্রুপ্রমার্জ্জনঞ্চৈব কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা॥ ইত্যাদি। শা ১৪০।১৭,১৮

২৩ নানার্থিকোঽর্থসম্বন্ধং কৃতজ্ঞেন সমাচরেৎ।
অর্থী তু শক্যতে ভোক্তুং কৃতকার্য্যোঽবমন্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ॥ শা ১৪০।২০

২৪ কুশলঞ্চাস্য পৃচ্ছেত যদ্যপ্যকুশলং ভবেৎ। শা ১৪০।২২

২৫ নাস্যচ্ছিদ্রং রিপুর্ব্বিদ্যাদ্বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য তু। শা ১৪০।২৪

২৬ দণ্ডেনোপনতং শত্রুং যো রাজা ন নিযচ্ছতি। ইত্যাদি। শা ১৪০।৩০,৫৮,৫৯
যোঽরিণা সহ সন্ধায় সুখং স্বপিতি বিশ্বসন্।
স বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্তো বা পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে॥ শা ১৪০।৩৭

২৭ যে সপত্নাঃ সপত্নানাং সর্ব্বাংস্তানুপসেবয়েৎ। শা ১৪০।৩৯

কপট বেশভূষায় বিশ্বাস উৎপাদন—ধ্যান, মৌনাবলম্বন এবং গৈরিক বস্ত্র, জটা ও অজিন প্রভৃতি ধারণ করিয়া অরিদের অন্তঃকরণে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হয়। তারপর সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া বৃকের মত অকস্মাৎ আক্রমণ-পূর্ব্বক শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করা বুদ্ধিমানের কাজ।[২৮]

'মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে'—শত্রুর করুণ বাক্যে আর্দ্র হইতে নাই, পূর্ব্বের অপকার স্মরণ করিয়া সতত মনে মনে প্রতিশোধের কল্পনা করা উচিত। নৃপতি শত্রুকে প্রহার করিবার সময় প্রিয় বাক্য বলিবেন, প্রহার করিয়াও প্রিয় কথা বলিবেন, অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়াও তাহার জন্য কৃত্রিম শোক প্রকাশ এবং রোদন করিবেন।[২৯]

সময়বিশেষে অন্ধাদির মত ব্যবহার—সময়বিশেষে ভূপতিগণকে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করিতে হয়। শত্রুদের দোষ দেখিয়াও দেখিতে নাই, শুনিয়াও শুনিতে নাই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অরণ্যচারী মৃগদের মত সতত সতর্ক থাকা উচিত। যখন শত্রুকে বশীভূত করা সম্ভবপর মনে করিবেন, তখন সাম-দানাদি উপায়ের প্রয়োগ করিবেন।[৩০]

শত্রু-বিনাশের কৌশল—সামান্য কণ্টকও ভীষণ ব্যথা জন্মাইতে পারে, সুতরাং শত্রুর স্বল্পমাত্রও অবশেষ রাখিতে নাই। পথঘাট, গৃহ, দুর্গ প্রভৃতির বিনাশ দ্বারা শত্রুর বিনাশসাধনে যত্নপর হইতে হয়।[৩১]

গৃধ্রদৃষ্টি, বকধ্যান ইত্যাদি—গৃধ্রের দৃষ্টি, বকের ধ্যান, কুকুরের চেষ্টা, সিংহের বিক্রম, কাকের শঙ্কা এবং ভুজঙ্গের ক্রূরতার অনুকরণ করা উচিত। ভূপতিচরিত্রে এই কয়েকটি গুণ মিলিত হইলে শত্রু হইতে তাঁহার কোন ভয় থাকে না।[৩২]

২৮ অবধানেন মৌনেন কাষায়েণ জটাজিনৈঃ।
বিশ্বাসয়িত্বা দ্বেষ্টারমবলুম্পেদ্ যথা বৃকঃ॥ শা ১৪০।৪৬

২৯ অমিত্রং নৈব মুঞ্চেত বদন্তং করুণান্যপি। শা ১৪০।৫২
প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহৃত্যৈব প্রিয়োত্তরম্।
অসিনাপি শিরশ্ছিত্ত্বা শোচেত চ রোদেত চ॥ ইত্যাদি। শা ১৪০।৫৪। শা ১০২।৩৪-৪১

৩০ অন্ধঃ স্যাদন্ধবেলায়াং বাধির্য্যমপি সংশ্রয়েৎ। শা ১৪০।২৭

৩১ নাসম্যক্ কৃতকারী স্যাদপ্রমত্তঃ সদা ভবেৎ। ইত্যাদি। শা ১৪০।৬০,৬১

৩২ গৃধ্রদৃষ্টির্বককালীনঃ শ্বচেষ্টঃ সিংহবিক্রমঃ।
অনুদ্বিগ্নঃ কাকশঙ্কী ভুজঙ্গচরিতং চরেৎ॥ শা ১৪০।৬২

বীর, লুব্ধ প্রভৃতির প্রতি ব্যবহার—বীরপুরুষের নিকট বিনীতভাবে অবস্থান করা উচিত। লুব্ধ পুরুষকে অর্থের দ্বারা বশ করা যায়।[৩৩]

দূরে থাকিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই—বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিয়া দূর দেশে অবস্থান করিলেও নিশ্চিন্ত হইতে নাই। বুদ্ধিমান্ পুরুষের নিকট দূর বা সমীপ—সবই সমান। তিনি ইচ্ছা করিলে যে-কোন স্থানে শত্রুতা সাধিতে পারেন।[৩৪]

বিষকন্যার পরীক্ষা—অনেক সময় শত্রুপক্ষ সুন্দরী যুবতীকে উপঢৌকন-স্বরূপ পাঠাইয়া থাকেন। পরিমিত মাত্রায় বিষ হজম করাইয়া সেইসকল কন্যাকে এমনভাবে তৈয়ারী করা হয় যে, তাহাদের স্পর্শমাত্রই অপর প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। সেইসকল কন্যাকে 'বিষকন্যা' বলে। গুপ্তচরের মুখে সমস্ত বার্ত্তা অবগত হইয়া অতিশয় সাবধানে বাস করিবে। এইসকল প্রলোভন হইতে নিজকে রক্ষা করিতে না পারিলে বিনাশ সুনিশ্চিত।[৩৫]

আশা দিয়া দীর্ঘকাল বঞ্চনা—শত্রুকে এরূপ বিষয়ে আশা দিতে হইবে, যাহা দীর্ঘ কালের অপেক্ষা করে। পরে সেই কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় অন্য এক প্রতিবন্ধক দেখাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে হইবে। এইরূপে শুধু আশা দিয়া দীর্ঘ কাল শত্রুকে আশান্বিত রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।[৩৬]

(শান্তিপর্ব্বের ১৪০ তম অধ্যায় এবং আদিপর্ব্বের ১৪০ তম অধ্যায়ের অধিকাংশ শ্লোকেরই পাঠের মিল দেখিতে পাওয়া যায়, সংখ্যার মিল নাই। আদিপর্ব্বের ঐ অধ্যায়কে 'কণিকবাক্য' এবং শান্তিপর্ব্বে 'কণিকোপদেশ'-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উভয় অধ্যায়েই কুটিল রাজধর্ম্মের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। উল্লিখিত সঙ্কলনের প্রায় সকল উদাহরণই শান্তিপর্ব্ব হইতে গৃহীত।)

সাম ও দান—যতক্ষণ যুদ্ধবিগ্রহাদি না করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণই

---

৩৩ শূরমঞ্জলিপাতেন * * *। শা ১৪০।৬৩
লুব্ধমর্থপ্রদানেন * * *। শা ১৪০।৬৩

৩৪ পণ্ডিতেন বিরুদ্ধঃ সন্ দূরস্থোঽস্মীতি নাশ্বসেৎ।
দীর্ঘৌ বুদ্ধিমতো বাহু যাভ্যাং হিংসতি হিংসিতঃ॥ শা ১৪০।৬৮

৩৫ প্রণয়েদ্বাপি তাং ভূমিং প্রণশ্যেদ্ গহনে পুনঃ।
হন্যাৎ ক্রুদ্ধানতিবিষাংস্তান্ জিহ্মগতয়োঽহিতান্॥ শা ১২০।১৫। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

৩৬ আশাং কালবতীং দদ্যাৎ কালং বিঘ্নেন যোজয়েৎ।
বিঘ্নং নিমিত্ততো ব্রুয়ান্নিমিত্তং বাপি হেতুতঃ॥ আদি ১৪০।৮৮

শাস্তি ; এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সামপ্রয়োগে শত্রুকে বশীভূত করিতে না পারিলে দান করিতে হয়।

দানের দ্বারা প্রতিপক্ষের সন্তোষবিধান—বলবান্ প্রতিপক্ষ অধার্ম্মিক পাপাচার হইলে তাহাকে কিছু ধনসম্পদ্ দান করিয়াও সন্ধির চেষ্টা করা উচিত। অধার্ম্মিক ধনদৃপ্ত শত্রু অতি ভীষণ। কখনও তাহার বিরুদ্ধে কোন আচরণ করিতে নাই। ধনসম্পত্তির কিছু ক্ষতি করিয়াও যদি প্রাণ রক্ষা করা যায়, তাহা শ্রেয়ঃ। অন্তঃপুর যাহাতে দুর্দ্দান্ত শত্রুর হস্তে নিপতিত না হয়, সেই বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, কিন্তু রক্ষা করিতে না পারিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে না। বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত সময়ের পরিবর্ত্তনে হৃত সম্পদ্ উদ্ধার করা যাইতে পারে। সুতরাং অবিবেকী বলবান্ শত্রুর সহিত সকল সময় সন্ধি করিয়া চলাই বিবেচকের কার্য্য।[৩৭]

সাম বা সন্ধি—সন্ধি সাধারণতঃ দুইপ্রকার, অবিগ্রহ ও বিগ্রহোত্তর। বিগ্রহে (যুদ্ধে) লিপ্ত না হইয়া প্রথমে শত্রুর সহিত আপস করা প্রথম-প্রকারের সন্ধি, আর যুদ্ধ চলিবার পর কিছু অগ্রসর হইয়া সন্ধি করাকে বিগ্রহোত্তর সন্ধি বলা হয়।

বলবানের সহিত সন্ধি—রাজা বলবান্ শত্রুর নিকট প্রণত হইবেন, বলবানের সহিত সন্ধি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আত্মপক্ষ দুর্ব্বল বা বিপক্ষের সমান হইলেও শত্রুর সহিত সন্ধির চেষ্টা করা উচিত।[৩৮]

হৃত সম্পত্তি কৌশলে উদ্ধারের চেষ্টা—প্রতিপক্ষ বলবান্ হইলেও তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া সামাদিপ্রয়োগে মিষ্ট ব্যবহারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত আপন সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে কৌশলে হস্তগত করিবার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষতঃ প্রতিপক্ষ ধর্ম্মপরায়ণ হইলে তাঁহার সহিত বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া অতিশয় মূর্খতার পরিচায়ক।[৩৯]

---

৩৭ যোঽধর্ম্মবিজিগীষুঃ স্যাদ্বলবান্ পাপনিশ্চয়ঃ।
আত্মনঃ সন্নিরোধেন সন্ধিং তেনাপি রোচয়েৎ॥ ইত্যাদি। শা ১৩১।৫-৮

৩৮ প্রণিপাতং চ গচ্ছেত কালে শত্রোর্বলীয়সঃ। ইত্যাদি। শা ১০৩।২৯। আশ্র৽৬।৮
হীয়মানেন বৈ সন্ধিঃ পর্য্যেষ্টব্যঃ সমেন চ। শল্য ৪।৪৩
যদা তু হীনং নৃপতির্বিদ্যাদাত্মানমাত্মনা। ইত্যাদি। শা ৬৯।১৪,১৫

৩৯ বাহ্যশ্চেদ্বিজিগীষুঃ স্যাদ্ধর্ম্মার্থকুশলঃ শুচিঃ।
জবেন সন্ধিং কুর্ব্বীত পূর্ব্বভুক্তান্ বিমোচয়েৎ॥ শা ১৩১।৪

সন্ধির পর গোপনে শক্তিবর্দ্ধন—সন্ধির পর আপনার শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়। তারপর সুযোগ বুঝিয়া বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা বুদ্ধিমানের কাজ।[৪০]

সন্ধিকাম প্রতিপক্ষের পুত্রকে স্বসমীপে রক্ষণ—দুর্ব্বল প্রতিপক্ষ সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলে তাহার পুত্রকে আপনার নিকটে রাখিতে হইবে। পুত্রস্নেহের আকর্ষণে সেই ব্যক্তি পরে বিপরীত আচরণে সাহসী হইবে না।[৪১]

সন্ধিকাম হইতে উৎকৃষ্ট ভূমি প্রভৃতি গ্রহণ—স্বয়ং বিপক্ষ অপেক্ষা বলবান্ হইলে সন্ধিকালে বিপক্ষ হইতে উর্ব্বরা ভূমি, কৌশলজ্ঞ বলবান্ সেনাদল এবং বিচক্ষণ অমাত্যবৃন্দকে নিজের পক্ষে পাইয়া সন্ধি করা উচিত। বিপক্ষ দুর্ব্বল হইলে এইসকল অসঙ্গত প্রস্তাবেও আপত্তি করিতে পারে না।[৪২]

ভেদ-প্রয়োগ—সুচতুর নরপতি মিত্রসম্পন্ন শত্রুর মিত্রকে হাত করিতে চেষ্টা করিবেন। মিত্রেরা ত্যাগ করিলে শত্রু বলহীন হয়, তখন অল্পায়াসেই তাহাকে পরাভূত করা যাইতে পারে। ভেদনীতির দ্বারা বিপক্ষীয় অমাত্যাদিকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে পারিলে শক্তি বৃদ্ধি হয়। বহু মধুকর মিলিত হইলে মধু-আহরণকারীকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়।[৪৩]

শত্রুর ক্ষতিসাধন—শত্রুদিগের বলাবল যথাযথরূপে অবগত হইয়া ভেদনীতি, উৎকোচ-প্রদান অথবা বিষাদির প্রয়োগে শত্রুবলকে দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।[৪৪]

৪০ দ্রব্যাণাং সঞ্চয়শ্চৈব কর্ত্তব্যঃ সুমহাংস্তথা।
যদা সমর্থো যানায় ন চিরেণেব ভারত। আশ্র ৬।৯

৪১ সন্ধ্যর্থং রাজপুত্রং বা লিপ্সেথা ভরতর্ষভ।
বিপরীতং ন তচ্ছ্রেয়ঃ পুত্র কস্যাঞ্চিদাপদি। আশ্র ৬।১২

৪২ তদা সর্ব্বং বিধেয়ং স্যাৎ স্থানেন স বিচারয়েৎ।
ভূমিরল্পফলা দেয়া বিপরীতস্য ভারত। ইত্যাদি। আশ্র ৬।১০, ১১

৪৩ অমিত্রং মিত্রসম্পন্নং মিত্রৈর্ভিন্দন্তি পণ্ডিতাঃ। বন ৩৩।৬৮
অমিত্রঃ শক্যতে হন্তুং মধুহা ভ্রমরৈরিব। বন ৩৩।৭০

৪৪ বলানি দূষয়েদস্য জানন্নেব প্রমাণতঃ।
ভেদেনোপপ্রদানেন সংসৃজেদৌষধৈস্তথা। শা ১০৩।১৬, ১৭

বিফলতায় দণ্ডপ্রয়োগ—সর্ব্বত্র ক্রমশঃ সাম, দান ও ভেদের প্রয়োগ করিতে হয়। ভেদ-প্রয়োগ বিফল হইলে দণ্ডরূপ বিগ্রহের প্রয়োজন।[৪৫]

শত্রুর মূলোৎপাটন—আশ্রয়ের মূল উৎপাটিত হইলে সকল প্রাণীই বিপন্ন হইয়া থাকে। ছিন্নমূল বনস্পতিতে শাখা থাকিতে পারে না। বুদ্ধিমান্ নরপতি প্রথমতঃ শত্রুপক্ষের মূল কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করিয়া উৎপাটনে যত্নপর হইবেন। অতঃপর তাহার সহায় ও অমাত্যদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিবেন। ভেদনীতি দ্বারা ভীরু পুরুষকে সহজেই আত্মপক্ষে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।[৪৬]

স্থিরপ্রতিজ্ঞ পুরুষে ভেদনীতি বিফল (কর্ণ)—স্থিরপ্রতিজ্ঞ পুরুষকে চালাকি দ্বারা মিত্র হইতে ভিন্ন করা সম্ভবপর হয় না। কর্ণের দৃষ্টান্ত এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কৃষ্ণ বার-বার সেরূপ চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়াছেন। তিনি মহাবীর কর্ণকে দুর্য্যোধনের পক্ষ হইতে কিছুতেই পাণ্ডবপক্ষে আনিতে পারেন নাই।[৪৭]

বুদ্ধিহীন পুরুষে সফল (শল্য)—দুর্য্যোধন শল্যকে একটু সম্মান প্রদর্শন করিয়াই আত্মপক্ষে লইয়া আসিলেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে একটুও বেগ পাইতে হয় নাই। শল্য এরূপ মদান্ধ ও প্রশংসাপ্রিয় ছিলেন যে, দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াও যুধিষ্ঠিরের অন্যায় প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। কর্ণের সারথ্যে নিযুক্ত হইয়া কর্ণকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা পূরণ করিলেন। এরূপ চলচিত্ত স্বল্পবুদ্ধি পুরুষকে ভেদনীতি দ্বারা সংগ্রহ করা অতি সহজ।[৪৮]

বিপক্ষের গৃহবিবাদ প্রার্থনীয়—চালাকি দ্বারা বিপক্ষীয় অমাত্যাদির মধ্যে বিবাদ বাঁধাইতে পারিলেও আপনার উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। খুব সাবধানে গৃহবিবাদ বাঁধাইতে হয়, বিপক্ষীয়েরা যেন উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারে।[৪৯]

৪৫ ভেদশ্চ প্রথমং যুক্তাং। শা ১০৩।২৮

৪৬ ছিন্নমূলে হ্যধিষ্ঠানে সর্ব্বেষাং জীবনং হৃতম্।
কথং হি শাখাস্তিষ্ঠেয়ুশ্ছিন্নমূলে বনস্পতৌ ॥ ইত্যাদি। শা ১৪০।১০, ১১
ভীরুং ভেদেন ভেদয়েৎ। শা ১৪০।৬৩

৪৭ উ ১৪৩ তম অঃ। ভী ৪৩।৯০-৯২

৪৮ উ ৮ম অঃ।

৪৯ অমাত্যবল্লভানাঞ্চ বিবাদাংস্তস্য কারয়েৎ। শা৬৯।২২

ভেদনীতির প্রয়োগ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসাপেক্ষ—ভেদনীতিকে কার্য্যে পরিণত করা ধুরন্ধর বুদ্ধিমানের কাজ। উদ্যোগপর্ব্বের প্রারম্ভে দেখিতে পাই, কুরু-সভায় দৌত্য করিবার নিমিত্ত পাঞ্চালরাজ আপন পুরোহিতকে পাঠাইতেছেন। বৃদ্ধ রাজা পুরোহিতকে বলিলেন, "আপনি কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া এরূপ-ভাবে ধর্ম্মার্থযুক্ত কথা বলিবেন, যাহাতে সকলের মন গলিয়া যায়। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রমুখ বীরদের মধ্যে যাহাতে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়, সেইভাবে বচনবিন্যাস করিবেন"।[৫০] পুরোহিত যথাসাধ্য নির্দ্দোষভাবে দৌত্যকর্ম্মের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণের রসনা ক্ষত্রিয়ের রসনার মত চতুর নহে। ভীষ্ম তাঁহার বাক্য শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি যাহা বলিয়াছেন, সবই সত্য, কিন্তু সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্যের দরুণই আপনার কথাগুলি অতিশয় তীক্ষ্ণ"।[৫১]

ভেদনীতি সম্বন্ধে উপাখ্যান—আদিপর্ব্বের কণিকবাক্যে অত্যন্ত কুটিল ভেদনীতি সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ধূর্ত্ত শৃগাল ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণকে বুদ্ধিবলে নিরস্ত করিয়া প্রচুর মাংস লাভ করিয়াছিল।[৫২]

স্বপক্ষের ভেদে বিনাশ নিশ্চিত—পরপক্ষে ভেদপ্রয়োগ যেমন অভ্যুদয়ের হেতু, সেইরূপ স্বপক্ষে ভেদ ঘটিলে বিনাশ নিশ্চিত। অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষ সতত আত্মপক্ষীয় অমাত্যপ্রমুখ পাত্রমিত্রগণকে সাবধানে রক্ষা করিবেন। আপনার জনকে রক্ষা করিতে হইলে জিতেন্দ্রিয়তা এবং মিষ্ট ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। সময়বিশেষে পাত্রমিত্রের দোষও ক্ষমা করিতে হয়। সদ্ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদিগকে বশীভূত না করিলে বিপক্ষ সহজেই অমাত্যদিগকে হস্তগত করিতে পারে।[৫৩]

নিজেদের মধ্যে কখনও বিবাদ করিতে নাই; বিবাদের সুযোগে শত্রুপক্ষ ভেদনীতি প্রয়োগের অবকাশ পাইয়া থাকে। ক্ষান্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং ত্যাগশীলতা দ্বারা সকলকেই বশীভূত করা যায়। বলের বিনাশক যে-সকল

৫০ মনাংসি তস্য যোধানাং ধ্রুবমাবর্ত্তয়িষ্যতি। ইত্যাদি। উ ৬।৯, ১০

৫১ ভবতা সত্যমুক্তন্তু সর্ব্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
অতিতীক্ষ্ণন্তু তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ॥ উ ২১।৪

৫২ আদি ১৪০ তম অঃ।

৫৩ নামহাপুরুষঃ কশ্চিন্নানাত্মা নাসহায়বান্।
মহতীং ধুরমাধত্তে তামুদ্যম্যোরসা বহ॥ শা ৮১।২৩

কারণ মনীষীরা নির্দ্দেশ করেন, তন্মধ্যে ভেদই মুখ্য। আত্মপক্ষে ভেদের ন্যায় অনিষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে না।[৫৪]

বিগ্রহ—সাম, দান ও ভেদের বিফলতায় অগত্যা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়। শত্রু ব্যসনে পতিত হইলে তাহার সহিত বিগ্রহ করিবার উপযুক্ত কাল উপস্থিত বলিয়া জানিবে। তখন আপনার মন্ত্র, কোশ ও উৎসাহ, এই ত্রিবিধ বলের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করাই শ্রেয়ঃ।[৫৫]

সময়ের প্রতীক্ষা—শত্রু বিনাশ করিবার নিমিত্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। প্রথমতঃ শত্রুর বিশ্বাসভাজন হইতে চেষ্টা করিয়া সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। শত্রুর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার না করিয়া, তাহার মনে যাহাতে আশার সঞ্চার হয়, সেইরূপ কপট ব্যবহার করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, উপযুক্ত সময় যেন উত্তীর্ণ না হয়। সময় অতিবাহিত হইলে শত্রুকে জয় করা সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়ায়।[৫৬]

শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ কর্ত্তব্য—কাম, ক্রোধ এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া অবধানতার সহিত শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করিতে হয়। মৃদুতা, বৃথাদণ্ড, আলস্য এবং প্রমাদ ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সংসারে জয়ী হওয়া যায় না। উক্ত দোষচতুষ্টয় এবং অনবধানতাকে ত্যাগ করিতে পারিলে শত্রুকে সংহার করা কঠিন হয় না।[৫৭]

দূরস্থ শত্রুর উদ্দেশ্যে অভিচারাদি ক্রিয়া—শত্রু যদি দূর দেশে অবস্থিতি করে, তবে ব্রহ্মদণ্ডের (অভিচারাদি ক্রিয়া) প্রয়োগ করিবে ; আর নিকটস্থ হইলে চতুরঙ্গিনী সেনা নিয়োগ করিবে।[৫৮]

৫৪ ভেদাদ্বিনাশঃ সঙ্ঘানাং সঙ্ঘমুখ্যোঽসি কেশব। ইত্যাদি। শা ৮১।২৫-২৭
বলস্য ব্যসনানীহ যান্যুক্তানি মনীষিভিঃ।
মুখ্যো ভেদো হি তেষাস্তু পাপিষ্ঠো বিদুষাং মতঃ॥ বি ৫১।১৩

৫৫ কচ্চিদ্ ব্যসনিনং শত্রুং নিশম্য ভরতর্ষভ।
অভিযাসি জবেনৈব সমীক্ষ্য ত্রিবিধং বলম্॥ ইত্যাদি। সভা ৫।৫৭। আশ্র ৬।৭
বিগ্রহো বর্দ্ধমানেন নীতিরেষা বৃহস্পতেঃ। শল্য ৪।৪৩

৫৬ দীর্ঘকালমপীক্ষেত নিহন্যাদেব শাত্রবান্। ইতাদি। শা ১০৩।১৮-২১

৫৭ বিহায় কামং ক্রোধঞ্চ তথাহঙ্কারমেব চ।
যুক্তো বিবরমন্বিচ্ছেদহিতানাং পুনঃ পুনঃ। ইত্যাদি। শা ১০৩।২৩-২৫

৫৮ ব্রহ্মদণ্ডমদৃষ্টেষু দৃষ্টেষু চতুরঙ্গিনীম্॥ শা ১০৩।২৭

স্বয়ং বলবত্তর না হইলে বিগ্রহ নিষিদ্ধ—যখন রথ, তুরঙ্গ, পদাতি এবং কোশকে বিগ্রহের অনুকূল অর্থাৎ শত্রুপক্ষ হইতে যথেষ্ট প্রবল মনে করিবে, তখন নির্ব্বিচারে প্রকাশ্যে আক্রমণ করা যাইতে পারে।[৫৯]

বালক শত্রুকেও উপেক্ষা করিতে নাই—পুরাতন শত্রু বালক হইলেও তাহাকে অবহেলা করিতে নাই, যেহেতু সে সততই ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকে। বালকও যদি সন্ধিবিগ্রহের কাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হন, তবে তিনিও পার্থিব-শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই।[৬০]

স্থান ও কালের অনুকূলতা আবশ্যক—দেশ এবং কালের সম্যক্ পর্য্যালোচনা না করিয়া বিক্রম প্রকাশ করা উচিত নহে। স্থান এবং কাল অনুকূল না হইলে বিক্রম-প্রদর্শন নিষ্ফল হইয়া থাকে।[৬১]

দুর্ব্বলের বিগ্রহের ফল (পবনশাল্মলি-সংবাদ)—তুল্যবল রিপুর সহিতও অগত্যা বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। বলবানের সহিত কখনও বিগ্রহ করিতে নাই। আত্মপক্ষ যদি দুর্ব্বল হয়, তবে কিঞ্চিৎ ন্যূনতা স্বীকার করিয়াও সন্ধি করা উচিত এবং ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া শত্রুতার প্রতিশোধ লওয়া কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত বিরোধ করিলে পরিণামে যাহা ঘটে, পবনশাল্মলিসংবাদে উপাখ্যানের মধ্য দিয়া ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সেই কথা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়াছেন। প্রবলের সহিত দ্বন্দ্বের নিশ্চিত ফল—আত্মবিনাশ।[৬২]

ভেদাদি-প্রয়োগে শত্রুকে দুর্ব্বল করিয়া পরে বিগ্রহ—উপযুক্ত কালে শত্রুপক্ষকে ভয় প্রদর্শন করিতে হয়। শত্রুকে বিপন্ন করিবার সমস্ত চেষ্টাই করা উচিত। ভেদ-প্রয়োগ, মিত্রাকর্ষণ প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা বিপক্ষকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া পরে যুদ্ধ করিবে।[৬৩]

উৎসাহশক্তি প্রভৃতি পরীক্ষণীয়—আক্রমণের পূর্ব্বে বলাবল বিবেচনা করিতে হয়। উভয় পক্ষের উৎসাহশক্তি, প্রভুশক্তি ও মন্ত্রশক্তির পর্য্যালোচনায়

---

৫৯ যদা স্বাম্নহতী সেনা হয়নাগরথাকুলা। ইত্যাদি। শা ১০৩।৩৮,৩৯

৬০ বালোঽপ্যবালঃ স্থবিরো রিপুর্যঃ সদা প্রমত্তং পুরুষং নিহন্যাৎ। শা ১২০।৩৯

৬১ দেশকালৌ সমাসাদ্য বিক্রমেত বিচক্ষণঃ
দেশকালব্যতীতো হি বিক্রমো নিষ্ফলো ভবেৎ। ইত্যাদি। শা ১৪০।২৮,২৯

৬২ সমং তুল্যেন বিগ্রহঃ। ইত্যাদি। শা ১৪০।৬৩। শা ১৫৭ তম অঃ

৬৩ আমর্দ্দকালে রাজেন্দ্র ব্যপসর্পেত্ততঃ পরম্। ইত্যাদি আশ্র ৭।৩,৪

স্বপক্ষকে বলবান্ মনে করিলেই আক্রমণ করা যাইতে পারে। মিত্রবল, অটবীবল, ভৃত্যবল এবং শ্রেণীবল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। মিত্রবলকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিবেচনা করিবে।[৬৪]

পূর্ব্বোপকারী শত্রু অবধ্য—যে শত্রু পূর্ব্বে কখনও উপকার করিয়াছিল, তাহাকে যুদ্ধে জয় করিয়া হত্যা করিতে নাই, বরং তাহার প্রতি বীরোচিত সসম্মান ব্যবহার করা উচিত। এরূপ না করিলে ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। উপকৃত শত্রু যদি হৃদয়বান্ হন, তবে নিশ্চয়ই প্রত্যুপকারের আশা করা যাইতে পারে।[৬৫]

বিজিত শত্রুকে ক্ষমা করা মহত্ত্ব—বিগ্রহে বিজয়ের পর শত্রুকে ক্ষমা করিলে বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও রাজার যশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; শত্রুরাও সেই রাজার প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ হয়।[৬৬]

গুপ্তচর—চরের সাহায্য ব্যতীত শত্রুমিত্র পরিচয় করা কঠিন ব্যাপার, এইজন্য রাজাদিগকে চারচক্ষু বলা হয়। চরের দ্বারাই নৃপতিগণ শত্রু ও মিত্রের কার্য্যকলাপ অবগত হইয়া থাকেন। শত্রুর অর্থবল, জনবল প্রভৃতি জানা নিতান্ত আবশ্যক, অথচ চর ব্যতীত যথার্থ সংবাদ পাওয়া কঠিন। কেবল শত্রু বা মিত্রের পরিজ্ঞানেই চরের প্রয়োজনীয়তা সীমাবদ্ধ নহে। রাজ্যমধ্যে প্রজাগণ রাজার কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট, তাহাদের অভিপ্রায় কি, এইসকল বিষয়ও নৃপতিদের জানা বিশেষ দরকার। গুপ্তচর ব্যতীত সংবাদ জানা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজকার্য্যে চরও প্রধান সহায়দের মধ্যে অন্যতম। তাহাকে বাদ দিলে রাজ্য রক্ষা করা যায় না। চরকে রাজ্যরক্ষার মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।[৬৭]

চর হইতে খবর জানিয়া কাজ করা—রাষ্ট্রের বাহিরে ও ভিতরে, পুরীতে ও জনপদে, সর্ব্বত্র চর নিয়োগ করা উচিত। চর হইতে সকল বিষয়

---

৬৪ প্রযাস্যমানো নৃপতিস্ত্রিবিধাং পরিচিন্তয়েৎ।
আত্মনশ্চৈব শত্রোশ্চ শক্তিং শাস্ত্রবিশারদঃ॥ ইত্যাদি। আশ্র ৭।৫-৮

৬৫ দ্বিষন্তং কৃতকল্যাণং গৃহীত্বা নৃপতিং রণে।
যো ন মানয়তে দ্বেষাৎ ক্ষত্রধর্ম্মাদপৈতি সঃ॥ ইত্যাদি। শা ৯৩।৬,৮

৬৬ বিজিত্য ক্ষমমাণস্য যশো রাজ্ঞো বিবর্দ্ধতে।
মহাপরাধে হ্যপ্যস্মিন্ বিশ্বসন্ত্যপি শত্রবঃ॥ শা ১২০।৩০

৬৭ রাজ্যং প্রণিধিমূলং হি মন্ত্রসারং প্রচক্ষতে। শা ৮৩।৫১

যথার্থরূপে জানিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হয়। মন্ত্র, কোশ, দণ্ড প্রভৃতি চরের উপর নির্ভর করে। শত্রু, মিত্র এবং উদাসীনের পরিচয়ে ভূপতিগণ সতত চরকেই চক্ষুরূপে ব্যবহার করিবেন। চরমুখে রাষ্ট্রসংবাদ সম্যক্ অবগত না হইয়া কিছুই করা উচিত নহে।[৬৮]

চর হইতে লোকচরিত্রপরিজ্ঞান—স্বরন্ধ্র এবং পররন্ধ্রদর্শনেও চরকে চক্ষুরূপে ব্যবহার করিতে হয়। কোন ব্যক্তি রাজার ছিদ্র অন্বেষণ করে, কে রাজার প্রতি ভক্তিমান্, এইসকল বৃত্তান্ত চর হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। মানুষের চরিত্র বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত শক্ত; কাহার কিরূপ চরিত্র, তাহা বুঝিতে হইলে দীর্ঘকাল সেই ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকিতে হয়। চর নিয়োগ না করিয়া লোকচরিত্র জানা অসম্ভব।[৬৯]

পুত্রাদির উদ্দেশ্যপরিজ্ঞান—অমাত্য, মিত্র, এমন কি, পুত্রের মনোভাব জানিবার নিমিত্তও চর নিযুক্ত করিতে হয়।[৭০]

গুপ্তভাবে চর প্রেরণের বিধি—রাজপুর, জনপদ এবং সামন্ত রাজগণের নিকট এরূপ গুপ্তভাবে চর প্রেরণ করিতে হইবে, যেন চরেরাও পরস্পরকে চিনিতে না পারে।[৭১]

গুপ্তচরের যোগ্যতা—যে-সকল বিচক্ষণ পুরুষ ইচ্ছা করিলেই জড়, অন্ধ এবং বধিরের মত ভান করিতে পারেন, যাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হন না, সেইসকল পরীক্ষিত পুরুষকে গুপ্তচররূপে নিয়োগ করিতে হয়।[৭২]

ভিক্ষুকাদিবেশে চরের সাজ—বিপক্ষগণ যাহাতে প্রেরিত চরকে চিনিতে না পারে, সেইরূপ ছদ্মবেশে সজ্জিত করিয়া চরকে রাষ্ট্রমধ্যে পাঠাইতে

৬৮ বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চৈব পৌরজানপদং তথা।
চারৈঃ সুবিদিতং কৃত্বা ততঃ কর্ম্ম প্রযোজয়েৎ। ইত্যাদি। শা ৮৬।১৯-২২। শা ৯৩।১৯

৬৯ চারৈর্ব্বিদিত্বা শত্রুংশ্চ যে রাজ্ঞামন্তরৈষিণঃ। ইত্যাদি। আশ্র ৫।৩৭-৩৯

৭০ অমাত্যেষু চ সর্ব্বেষু মিত্রেষু বিবিধেষু চ।
পুত্রেষু চ মহারাজ প্রণিদধ্যাৎ সমাহিতঃ॥ শা ৬৯।৯

৭১ পুরে জনপদে চৈব তথা সামন্তরাজসু।
যথা ন বিদুরন্যোন্যং প্রণিধেয়াস্তথা হি তে॥ শা ৬৯।১০

৭২ প্রণিধীংশ্চ ততঃ কুর্য্যাজ্জড়ান্ধবধিরাকৃতীন্।
পুংসঃ পরীক্ষিতান্ প্রাজ্ঞান্ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমক্ষমান্॥ ইত্যাদি।
শা ৬৯।৮। উ ১৯৪।৬২। দ্রো ৭৩।৪

হয়। ভিক্ষুক ও তাপসের বেশে সজ্জিত করিয়া পাঠাইলে ফল ভাল হয়।[৭৩]

উদ্যানাদিতে প্রেরণ—উদ্যান, বিহারভূমি, প্রপা (জলসত্র), পানাগার, তীর্থ এবং সভাসমিতিতে চর পাঠান উচিত। বাণিজ্যকেন্দ্র, দোকান, হাট, মল্লক্রীড়ার স্থান, মহাজনসম্মিলনী, পুরবাটিকা, বহির্ব্বাটিকা, আকরস্থান, চত্বর, রাজসভা এবং অমাত্যাদি প্রধান পুরুষের গৃহে গুপ্তচর নিয়োগ করিতে হয়।[৭৪]

বিপক্ষপ্রেরিত গুপ্তচরকে ধরিবার চেষ্টা—এইসকল স্থানে বিপক্ষের গুপ্তচরকে ধরিবার নিমিত্তও চেষ্টা করা উচিত এবং যথার্থরূপে চিনিতে পারিলে উপযুক্ত শাস্তির বিধান করা উচিত।[৭৫]

স্বকৃত কার্য্যের ফল জানা—"আমি যাহা করিয়াছি, প্রজাগণ তাহাতে সন্তুষ্ট কি না, তাহারা সেই কাজের প্রশংসা করিতেছে কি না, আমার বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতিতে প্রজারা সহানুভূতিসম্পন্ন কি না, রাষ্ট্র ও জনপদে আমার সুখ্যাতি প্রজাদের অভিলষিত কি না", এইসকল বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অনুগত গুপ্তচরদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিতে হয়।[৭৬] যদিও মহাভারতে গুপ্তচরের উপযুক্ত গুণের উল্লেখ পাওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার কাজ হইতে বুঝা যায়, আকারেঙ্গিতজ্ঞ, স্মৃতিমান্, কষ্টসহিষ্ণু, পরচিত্তপরীক্ষক এবং বিশেষ কৌশলজ্ঞ পুরুষই চারকর্ম্মের উপযুক্ত। যে-সে ব্যক্তির দ্বারা এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলিতে পারে না। (মনুসংহিতা ও কামন্দকীয় নীতিসারে এই প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।) রাষ্ট্র এবং দুর্গ বিষয়ে সম্প্রতি আলোচনা করা যাইতেছে।

৭৩ চারস্ববিদিতঃ কার্য্য আত্মনোঽথ পরস্থ চ।
পাষণ্ডাংস্তাপসাদীংশ্চ পররাষ্ট্রে প্রবেশয়েৎ ॥ শা ১৪০।৪০

৭৪ উদ্যানেষু বিহারেষু প্রপাস্বাবসথেষু চ।
পানাগারে প্রবেশেষু তীর্থেষু চ সভাসু চ ॥ ইত্যাদি। শা ১৪০।৪১,৪২
চত্বরেষ্বথ তীর্থেষু সভাস্বাবসথেষু চ। ইত্যাদি। শা ৬৯।৫২,১১,১২

৭৫ এবং বিচিনুয়াদ্ রাজা পরচারং বিচক্ষণঃ। শা ৬৯।১৩
সমাগচ্ছন্তি তান্ বুদ্ধা নিযচ্ছেচ্ছময়ীত চ। শা ১৪০।৪২

৭৬ অতীতদিবসে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ।
গুপ্তৈশ্চারৈরনুমতৈঃ পৃথিবীমনুসারয়েৎ ॥ ইত্যাদি। শা ৮৯।১৫,১৬

রাজধানী—রাজ্যশাসনের কেন্দ্রস্থান বা রাজার বাসের নগরীকে রাজধানী বলা হয়। রাজা অধিকাংশ সময় রাজধানীতে বাস করিতেন।

রাষ্ট্রকে গ্রামে বিভাগ—রাষ্ট্র বা জনপদকে কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত করা হইত। প্রত্যেক গ্রামে এক-একজন অধিপতি নির্ব্বাচিত হইতেন। কতকগুলি গ্রামের অধিপতিদের পরিচালকরূপে আরও একজন কর্ম্মচারীকে নিয়োগ করা হইত। এইভাবে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিয়োগে রাষ্ট্ররক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

গণমুখ্য বা গ্রামশাসক—সকল বিষয়েই প্রজাসাধারণের অভিমত গ্রহণ করা হইত। কিন্তু তাহা এখনকার ভোটের ন্যায় নহে। বিদ্যা, বুদ্ধি এবং চরিত্রের বলে যাঁহারা গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেন, তাঁহারাই গ্রামের প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভ করিতেন। মনোনীত ব্যক্তিকে 'গণমুখ্য' বলা হইত।[৭৭]

গণমুখ্যের সম্মান—গণমুখ্যেরা রাজার সভায় বিশেষ সম্মান পাইতেন। রাজ্যশাসন তাঁহাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিত। সাধারণের হিত-কামনায় কোন কাজ করিতে গণমুখ্যদের সহিত পরামর্শ করা রাজার নিতান্ত প্রয়োজন। গণমুখ্যদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ হইলে রাজাই তাহার সুমীমাংসা করিতেন।[৭৮]

গ্রামাধিপ, দশগ্রামাধিপ প্রভৃতি—প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে একজন অধিপতি নিয়োগের নিয়ম। অতঃপর দশটি গ্রামের অধিপতিগণকে ঠিক পথে চালিত করিবার মত ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তিকে দশ গ্রামের অধিপতিরূপে নিয়োগ করিতে হয়। তারপর শক্তিসামর্থ্য পরীক্ষা করিয়া তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিকে বিশটি গ্রামের আধিপত্য সমর্পণ করিবার নিয়ম। এইরূপে শত গ্রামের আধিপত্য এবং সহস্র গ্রামের আধিপত্য যোগ্যতর ও যোগ্যতম ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে।[৭৯]

৭৭ তস্মান্মানয়িতব্যাস্তে গণমুখ্যাঃ প্রধানতঃ। শা ১০৭।২৩

৭৮ লোকযাত্রা সমায়ত্তা ভূয়সী তেষু পার্থিব। শা ১০৭।২৩
গণমুখ্যৈস্তু সম্ভূয় কার্য্যং গণহিতং মিথঃ। ইত্যাদি। শা ১০৭।২৫-২৭

৭৯ গ্রামস্যাধিপতিঃ কার্য্যো দশগ্রাম্যস্তথা পরঃ।
দ্বিগুণায়াঃ শতস্যৈবং সহস্রস্য চ কারয়েৎ॥ শা ৮৭।৩

অধিপতিগণের কর্ম্মপদ্ধতি—গ্রামে চুরি, ডাকাতি অথবা অন্য কোন দোষ সংঘটিত হইলে গ্রামমুখ্য স্বয়ং তাহার সমাধান করিবেন। তিনি অপারগ হইলে দশগ্রামের অধিপতিকে জানাইবেন। তিনিও সমাধানে অসমর্থ হইলে বিংশতিগ্রামের অধিপতিকে জানাইবেন। এইরূপে উত্তরোত্তর অধিপতিগণের অসামর্থ্যের জন্য বিষয়টি রাজদরবারে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু ক্রমিকতা উল্লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই।[৮০]

নিযুক্তদের বৃত্তিব্যবস্থা—গ্রামে যে-সকল খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হইত, গ্রামাধিপকে সকলেই সেইগুলির কিছু কিছু দিতেন। সেই দানটি রাজারই প্রাপ্য। রাজার ব্যবস্থানুসারে সেইসকল লব্ধ বস্তুতে গ্রামাধিপের অধিকার হইত। গ্রামাধিপগণ দশগ্রামাধিপের ভরণপোষণ করিতেন। তাঁহারা বিংশতি-গ্রামাধিপের বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য ছিলেন। এইরূপে গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য হইতেই গ্রামশাসকদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।[৮১]

শতগ্রামাধিপ প্রভৃতির বৃত্তি—যে-সকল গ্রাম অতিশয় বৃহৎ এবং জন-মানবও যাহাতে বেশী, শতগ্রামাধ্যক্ষ সেইসকল গ্রামের উৎপন্ন বস্তু হইতে সরকারী প্রাপ্য স্বয়ং গ্রহণ করিতেন। যাঁহার ক্ষমতা গ্রামমুখ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী, সেই সহস্রগ্রামাধিপ গ্রামের প্রজামণ্ডলীর সঙ্গে মিলিয়া শাখানগর স্থাপন করিতেন এবং শাখানগরের রাজপ্রাপ্য ধান্য প্রভৃতি ভোগ করিতেন।[৮২]

প্রতি নগরে সর্ব্বার্থচিন্তক সচিবের নিয়োগ—গ্রামমুখ্যের আপন গ্রামে কোন কৃত্য উপস্থিত হইলে বিচক্ষণ কোন সচিব উপস্থিত থাকিয়া সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। আর প্রত্যেক নগরে এক-একজন সর্ব্বার্থ-চিন্তক সচিব উপস্থিত থাকিবেন। নাগরিক সমুদয় বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা তাঁহার কর্ম্ম। যেমন উচ্চস্থানস্থিত গ্রহ নিম্নস্থ গ্রহদের গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন, পৌরসচিবও সেইরূপ গ্রামমুখ্যদের কার্য্যপদ্ধতির দেখাশুনা করিবেন। যিনি সর্ব্বার্থচিন্তক অমাত্য, তিনি সভাসদ্‌গণেরও কাজকর্ম্মের

---

৮০ গ্রামে যান্ গ্রামদোষাংশ্চ গ্রামিকঃ প্রতিভাবয়েৎ।
তান্ ব্রূয়াদ্দশপায়াসৌ স তু বিংশতিপায় বৈ॥ ইত্যাদি। শা ৮৭।৪,৫

৮১ যানি গ্রাম্যাণি ভোজ্যানি গ্রামিকস্তান্যুপাশ্নিয়াৎ।
দশপস্তেন ভর্ত্তব্যস্তেনাপি দ্বিগুণাধিপঃ॥ শা ৮৭।৬

৮২ গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষো ভোক্তুমর্হতি সংকৃতঃ। ইত্যাদি। শা ৮৭।৭-৯

পরিদর্শক। তিনি রাষ্ট্রমধ্যে গুপ্তচর নিয়োগ দ্বারা গ্রামমুখ্য এবং সভাসদ্‌গণের ব্যবহার অবগত হইবেন। জিঘাংসু, পাপাত্মা ও পরস্বাপহারী কর্ম্মচারী বা গ্রামমুখ্য হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান কাজ। এই সচিবের দায়িত্ব রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইঁহার সাধুতা এবং কর্ম্মপটুতার উপরেই সমগ্র রাষ্ট্রের মঙ্গল নির্ভর করে। সুতরাং নৃপতি স্বয়ং বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে কাহাকেও নিযুক্ত করিবেন না।[৮৩]

কর্ম্মচারীদের কার্য্যপ্রণালী-পরিদর্শন—রাষ্ট্রমধ্যে কোন অন্যায় অবিচার হইলে রাজাই তজ্জন্য দায়ী। সুতরাং কর্ম্মচারিনিয়োগে তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। কেবল কর্ম্মচারিনিয়োগেই তাঁহার দায়িত্ব শেষ হয় না। কর্ম্মচারিগণ কিভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, তাহাও রাজার লক্ষ্যের বিষয়। প্রজার সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল রাজাকেও ভোগ করিতে হয়, এই কথা বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। সেইজন্য রাজা নিয়ত এরূপভাবে শাসন করিবেন, যাহাতে রাষ্ট্রে দুষ্কর্ম্মা পুরুষ একেবারেই না থাকে। যে-রাজার নিকট সুশাসন উপেক্ষিত হইয়া থাকে, তিনি দীর্ঘকাল রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে সমর্থ হন না।[৮৪]

গ্রামের উন্নতিবিধান—কেবল রাজধানীর বা নগরের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের উন্নতিও করিতে হইবে। নারদীয় রাজধর্ম্মে দেখিতে পাই, দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি গ্রামগুলিকে নগরের মত এবং আরণ্যক ব্যক্তিদের বাসস্থানকে গ্রামের মত প্রস্তুত করিয়াছ"? সাধারণতঃ কৃষিই যেখানে জীবিকার প্রধান উপায়, তাহাকে গ্রাম বলা হইত। গ্রামের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, 'শূদ্রজনবহুল জনপদ'। কিন্তু নারদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জিজ্ঞাসাগুলি কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে। তাহাতেই মনে হয়, নীলকণ্ঠের সংজ্ঞা অপেক্ষা কৃষিপ্রধান জনপদরূপ অর্থই ভাল।

গ্রামের উন্নতিতে নগরের উন্নতি—গ্রামকে উন্নত করার উদ্দেশ্য

৮৩ ধর্ম্মজ্ঞঃ সচিবঃ কশ্চিত্তত্তং পশ্যেদতন্দ্রিতঃ।
নগরে নগরে বা স্যাদেকঃ সর্ব্বার্থচিন্তকঃ॥ ইত্যাদি। শা ৮৭।১০-১৩

৮৪ ভোক্তা তস্য তু পাপস্য সুকৃতস্য যথা তথা।
নিয়ন্তব্যাঃ সদা রাজ্ঞা পাপা যে স্যুর্নরাধিপ। ইত্যাদি। শা ৮৮।১৯,২০

সম্বন্ধে নারদ বলিয়াছেন, গ্রামের উন্নতিতে নগরের উন্নতি। কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে গ্রামগুলি উন্নত না হইলে নগরও টিকিতে পারে না।

আরণ্যক-বসতির উন্নতিবিধান—আরণ্যকগণ গ্রামের বাহিরে ছোট ছোট পাড়ার মত বসতিতে বাস করিত। তাহাদের বসতির নাম 'প্রান্ত'। নারদ বলিয়াছেন, প্রান্তগুলিকে গ্রামের মত গড়িয়া তুলিবে। আরণ্যক বা পাহাড়িয়া প্রজারাও যাহাতে গ্রামের সুযোগ-সুবিধা পায়, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের বসতিকে উন্নত করিতে হইবে। সকলজাতীয় প্রজা লইয়াই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, কাহাকেও বাদ দেওয়া বা হীন মনে করিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে।[৮৫]

কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিবিধান—নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তোমার রাজত্বে চোর, লুব্ধ বা দুষ্ট কর্ত্তৃক কোন উৎপাতের সৃষ্টি হয় না ত? কৃষককুল তোমার উপর সন্তুষ্ট কি? রাষ্ট্রে কৃষিকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত স্থানে-স্থানে তড়াগাদি খনন করিয়াছ কি? কৃষিজীবীদের গৃহে অন্নাভাব নাই ত? তাঁহাদের ফসলের বীজের প্রাচুর্য্য আছে কি? কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন এবং কুসীদবৃত্তির সুব্যবস্থার দিকে তোমার দৃষ্টি আছে ত"?[৮৬]

খাজানা আদায়ে কৃতপ্রজ্ঞের নিয়োগ—নারদ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জনপদে খাজানা প্রভৃতি আদায়ের নিমিত্ত কৃতপ্রজ্ঞ বীর পুরুষকে নিযুক্ত করিবে। গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতির নিমিত্ত যে প্রভূত চেষ্টা করা হইত, এইসকল উক্তি তাহার প্রমাণ।[৮৭]

নানাবিধ দান ও ফলশ্রুতি—রাষ্ট্রমধ্যে স্বচ্ছ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, দরিদ্রকে অন্নদান, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমিদান প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নানাবিধ পুণ্যফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইসকল কাজে রাজাকে প্ররোচিত করিতে অনেক কিছুই বলা হইয়াছে। অনুশাসনপর্ব্বের দানধর্ম্ম নানাবিধ দানের পুণ্যফলকীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। সর্ব্বসাধারণের উপকারের দিক্ দিয়া লক্ষ্য করিলে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের তুলনা নাই। অর্থক্ষতি এবং

---

৮৫ কচ্চিন্নগরগুপ্ত্যর্থং গ্রামা নগরবৎ কৃতাঃ।
গ্রামবচ্চ কৃতাঃ প্রান্তাস্তে চ সর্ব্বে ত্বদর্পণাঃ॥ সভা ৫।৮১

৮৬ কচ্চিন্ন চৌরৈর্ল্লুব্ধৈর্ব্বা কুমারৈঃ স্ত্রীবলেন বা।
ত্বয়া বা পীড্যতে রাষ্ট্রং কচ্চিত্তুষ্টাঃ কৃষীবলাঃ॥ ইত্যাদি। সভা ৫।৭৬-৭৯

৮৭ ক্ষেমং কুর্ব্বন্তি সংহত্য রাজন্ জনপদে তব। সভা ৫।৮০

শারীরিক কষ্টের ভয়ে যে কাজে প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক নয়, সেই কাজের পরিণামফল অনন্তকাল স্বর্গভোগ, অথবা এইরকমের কিছু শাস্ত্র হইতে জানা গেলে, শাস্ত্রবিশ্বাসী আস্তিক ব্যক্তি ক্ষমতা থাকিলে সেই কাজে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। সেই কারণেই সম্ভবতঃ অনুশাসনপর্ব্বের দানধর্ম্মে নানাবিধ ফলশ্রুতি কীর্ত্তিত হইয়াছে।[৮৮]

দুর্গপ্রকৃতি বা রাজপুর—ধনী পুরুষের পক্ষে সম্পত্তি রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা। চোর ও দস্যুদের হাত হইতে ধন-দৌলত রক্ষা করিতে হইলে সেইরূপ নিরাপদ স্থানে রাখিতে হয়। সাধারণ লোক শীতাতপ নিবারণের উপযোগী গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে, কিন্তু ধনী ব্যক্তির বাসগৃহ সম্বন্ধে অনেক-কিছু বিবেচনা করিতে হয়। ধনবানের শত্রুর অভাব নাই, সুতরাং সতত তাঁহাকে সাবধান হইয়া চলিতে হয়। নৃপতিদের ত কথাই নাই, শত্রুভয় তাঁহাদের চিরসঙ্গী। শত্রুপক্ষ যাহাতে আক্রমণে সফলতা লাভ করিতে না পারে, সেই নিমিত্ত আবাসপুর এবং কোশশালা প্রভৃতি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত হওয়া উচিত। এইগুলির নির্ম্মাণ-কৌশলও অনন্যসাধারণ হওয়া উচিত। অতএব দুর্গপ্রকৃতি বা রাজপুর সপ্তাঙ্গ রাজ্যের অন্যতম অঙ্গ। শাস্ত্রকারেরা দুর্গাদিনির্ম্মাণ বিষয়েও নানাবিধ বিধিনিষেধ-সম্বলিত পদ্ধতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। মনুসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, কামন্দকীয় এবং শুক্রনীতিতে এই সম্বন্ধে বহু আলোচনা দেখিতে পাই। মহাভারতের অভিমতই আমাদের আলোচ্য।

ধন্বাদিভেদে দুর্গ ছয়প্রকার—ধন্বদুর্গ (মরুবেষ্টিত), মহীদুর্গ (পাষাণ বা ইষ্টকবেষ্টিত), অব্দুর্গ (জলবেষ্টিত), বার্ক্ষদুর্গ (মহাবৃক্ষ, কণ্টক ও গুল্মাদিবেষ্টিত), নৃদুর্গ (সেনাপরিবেষ্টিত) ও গিরিদুর্গ-(পর্ব্বতের উপরিভাগে স্থিত, নিভৃত ও দুর্গম) ভেদে দুর্গ ছয়প্রকার।[৮৯] (এই বচনটি মনুসংহিতার, মহাভারতে অব্দুর্গের পরিবর্ত্তে মৃদ্দুর্গের উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ

৮৮ পানীয়ং পরমং দানং দানানাং মনুরব্রবীৎ।
তস্মাৎ কূপাংশ্চ বাপীশ্চ তড়াগানি চ খানয়েৎ॥ অনু ৬৫।৩

৮৯ ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্। মনু ৭।৭০
ষড়্‌বিধং দুর্গমাস্থায় পুরাণ্যথ নিবেশয়েৎ। ইত্যাদি। শা ৮৬।৪,৫

মহাভারতের পাঠটি সমীচীন নহে, কারণ মহীদুর্গ ও মৃদ্‌দুর্গ একই বস্তু, তাহাতে ছয়প্রকার দুর্গের সামঞ্জস্য হয় না।)

দুর্গাদিযুক্ত পুরীই রাজার বাসোপযোগী—যে পুর দুর্গযুক্ত, ধান্য ও আয়ুধ-সমন্বিত, সুদৃঢ় প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, হস্তী, অশ্ব ও রথসমন্বিত, বিদ্বান্ শিল্পিগণের আবাসস্থল, যে পুর ধান্যাদি সম্পদে সমৃদ্ধ, দক্ষ ও ধার্ম্মিক পুরুষগণ যেখানে বসবাস করেন, বলবান্ মনুষ্য এবং হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যে পুরের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে, যে পুর চত্বর ও আপণাবলীতে সুশোভিত, প্রশান্ত, অকুতোভয়, সুন্দরপ্রভাযুক্ত, গীতবাদিত্র-মুখরিত ও প্রশস্তহর্ম্ম্যশোভিত, যে পুরীতে শূর ও আঢ্য পুরুষগণ সানন্দে বাস করিয়া থাকেন, যে পুর বেদধ্বনিতে নিত্য পূত, সামাজিক নানাবিধ উৎসবে প্রফুল্ল, যে পুরে সতত দেব-দ্বিজের অর্চ্চনা হইয়া থাকে, সেই পুরীতে অনুগত পাত্রমিত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া ভূপতি আনন্দের সহিত বাস করিবেন।[৯০]

রাজপুরে রক্ষণীয় দ্রব্যাদি—রাজা তাদৃশ পুরীতে বাস করিয়া কোশ, বল ও মিত্রাদি বর্দ্ধনে যত্ন করিবেন। ধনাগার, আয়ুধাগার ও ধান্যাদি সম্পদের বৃদ্ধির নিমিত্ত মনোযোগী হইবেন। কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, দেবদারু, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, স্নেহ, বসা, মধু, ঔষধ, শণ, সর্জ্জরস (ধূনা), ধান্য, শর, আয়ুধ, চর্ম্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জ, বল্বজ (উলুখড় ইত্যাদি), বন্ধন (রজ্জু, নিগড়, শৃঙ্খল প্রভৃতি), কূপ, জলাশয়, ক্ষীরবৃক্ষ (যে-সকল বৃক্ষে ক্ষীরের মত আঠা আছে ; বট, অশ্বত্থ, কাঁঠাল প্রভৃতি) প্রভৃতি দ্রব্য সতত রাজপুরে রাখা প্রয়োজন।[৯১]

যাগাদির অনুষ্ঠান—সতত পুরীমধ্যে যাগ-যজ্ঞ ও দানাদির অনুষ্ঠান করা উচিত, তাহাতে প্রজাগণ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে।[৯২]

৯০ যং পুরং দুর্গসম্পন্নং ধান্যায়ুধসমন্বিতম্।
দৃঢ়প্রাকারপরিখং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলম্॥ ইত্যাদি। শা ৮৬।৬-১০

৯১ অর্থসন্নিচয়ং কুর্য্যাদ্ রাজা পরবলার্দ্দিতঃ। ইত্যাদি। শা ৬৯।৫৬-৫৯
তত্র কোশং বলং মিত্রং ব্যবহারঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ।
পুরে জনপদে চৈব সর্ব্বদোষান্নিবর্ত্তয়েৎ॥ ইত্যাদি। শা ৮৬।১১-১৫

৯২ যষ্টব্যং ক্রতুভির্নিত্যং দাতব্যং চাপ্যপীড়য়া। শা ৮৬।২৩

দুর্গের বৃহত্ত্ব—দুর্গ কখনও ক্ষুদ্র করিতে নাই। কারণ ক্ষুদ্র দুর্গকে শত্রুপক্ষ অনায়াসে অধিকার করিতে পারে। পুরমধ্যস্থিত ছোট ছোট বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়, বড়গুলির ডালপালা কাটিয়া দিতে হয়।[৯৩]

দুর্গনির্ম্মাণ-পদ্ধতি—দুর্গের প্রাকার খুব উচ্চ করিতে হয়। দুর্গপ্রাকারের ভিত্তিতে যাহাতে অনেক লোক বসিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। বহিঃপ্রাকারের ভিত্তিতে আরোহণ করিয়া মিত্রগণ বহু দূরের বস্তুও দেখিতে পারেন। দুর্গের মধ্য হইতে বাহিরের শত্রুদিগকে দেখিবার নিমিত্ত এবং দুর্গাভ্যন্তরে বায়ু-চলাচলের নিমিত্ত ভিত্তিতে মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিতে হয়। আবশ্যকমত এইসকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া বহিঃস্থ শত্রুপক্ষের উপর আগ্নেয় গুলিকা প্রক্ষেপ করা যাইতে পারে। চতুর্দ্দিকে গভীর পরিখা খনন করাইতে হয়। পরিখাতে কুমীর এবং জীবজন্তুভোজী নানাজাতীয় বড় বড় মাছ পোষিতে হয়। যে-সকল গাছ জলে জন্মে, পরিখায় সেই জাতীয় গাছকে ডালপালা শূন্য করিয়া তদুপরি তীক্ষ্ণাগ্র শূল প্রোথিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা। প্রাকার হইতে লাফ দিয়া পলাইবার কালে শত্রুগণ সেইসকল শূলে বিদ্ধ হইতে পারে, আর পরিখার জলে পড়িয়া গেলে মাছ ও কুমীর দ্বারা আক্রান্ত হয়।

দ্বারের উপরে মারণাস্ত্রস্থাপন—পুরী হইতে বাহিরে যাইবার নিমিত্ত ছোট ছোট দ্বার রাখিতে হয়, সেইগুলির নাম সঙ্কটদ্বার। সঙ্কটদ্বারে খুব বিচক্ষণ পুরুষদিগকে পাহারায় রাখিবার নিয়ম। সকল দ্বারের উপরেই বৃহৎ বৃহৎ মারণযন্ত্র রাখা উচিত। আবশ্যকমত সত্বর ক্ষেপণ করা যায়, এরূপভাবে শতঘ্নী-যন্ত্র (দ্রঃ—'যুদ্ধ' প্রবন্ধ) স্থাপন করিতে হয়।[৯৪]

কূপাদি-খনন—ভূপতি পুরীমধ্যে প্রভূত কাষ্ঠ সংগৃহীত রাখিবেন। স্থানে-স্থানে নূতন কূপ খনন করাইবেন এবং পুরাতন জলাশয় ও কূপসমূহের সংস্কার করাইবেন।

অগ্নিভয়-নিবারণ—চৈত্রমাসে অগ্নিভয় নিবারণের নিমিত্ত তৃণাচ্ছাদিত গৃহগুলিকে পঙ্কলিপ্ত করাইবেন এবং অপর জায়গায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তৃণসমূহ

৯৩ দুর্গানাকাঙ্ক্ষিতো রাজা মূলচ্ছেদং প্রকারয়েৎ। ইত্যাদি। শা ৬৯।৪১,৪২

৯৪ প্রগণ্ডীঃ কারয়েৎ সম্যগাকাশজননীস্তথা।
আপূরয়েচ্চ পরিখাং স্থাণুনক্রঝষাকুলাম্॥ ইত্যাদি। শা ৬৯।৪৩-৪৫

একত্র করাইয়া অগ্নিভয় হইতে সাবধানে রক্ষা করিবেন। পুরীমধ্যে অগ্নিহোত্র ব্যতীত দিবামানে কাহাকেও অগ্নি জ্বালিতে দিবেন না, রাত্রিতেই পাকের ব্যবস্থা হইবে। কামারের কর্ম্মশালা এবং সূতিকাগৃহের অগ্নিকে পাত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিবার আদেশ দিবেন। চৈত্রমাসে দিবাভাগে যে-ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে, তাহার সমুচিত দণ্ড ঘোষণা করিবেন। সেই সময় ভিক্ষুক, গাড়োয়ান, ক্লীব, উন্মত্ত এবং নৃত্যগীত-ব্যবসায়িগণকে পুরী হইতে বাহির করিয়া দিবেন। এইসকল ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধি কম থাকে।[৯৫]

রক্ষিনিয়োগ—দুর্গে, রাজপুরীতে, পুরীর বহির্ভাগে, রাজ্যের সীমায়, নগরে, উপবনে, অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে, চতুষ্পথে এবং রাজনিবেশনে পদাতি রক্ষিগণকে স্থাপন করা কর্ত্তব্য।[৯৬]

নট-নর্ত্তকাদির স্থান—নট, নর্ত্তক, মল্ল এবং ঐন্দ্রজালিক পুরুষকে পুরীমধ্যে স্থান দিতে হয়।[৯৭]

রাজমার্গ, পানীয়শালা প্রভৃতি—নরপতি সুবিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ করাইবেন। পানীয়শালা ও ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ভাণ্ডার ও কোশগৃহ, আয়ুধাগার, যোধাগার, অশ্বশালা, গজশালা, স্কন্ধাবার, পরিখা, অভ্যন্তরের পথ, অন্তঃপুরস্থ উদ্যান প্রভৃতি এরূপ স্থানে নির্ম্মাণ করাইবেন, কোন আগন্তুক ব্যক্তি সহসা যেন ঐগুলি না জানিতে পারেন।[৯৮]

ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ণনা—আদিপর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থপুরীর যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই, ভীষ্মদেবের উল্লিখিত উপদেশ যেন বর্ণে-বর্ণে পালিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকের পরিখাগুলি সাগরতুল্য, প্রাকার-সমূহ আকাশচুম্বী, নানাবিধ গোপুরের দ্বারা পুরীটি সুরক্ষিত। হস্তক্ষেপ্য লৌহযষ্টি, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, শতঘ্নী প্রভৃতি প্রাকারের উপরে সুসজ্জিত। অন্তঃস্থিত পথগুলি প্রশস্ত এবং পদাতি রক্ষীর দ্বারা সুরক্ষিত। নগরের চতুর্দ্দিকে আম্র, আম্রাতক, পনস,

৯৫ কাষ্ঠানি চাভিহার্য্যাণি তথা কূপাংশ্চ খানয়েৎ। ইত্যাদি। শা ৬৯।৪৬-৫১

৯৬ ন্যসেত গুল্মান্ দুর্গেষু সন্ধৌ চ কুরুনন্দন। ইত্যাদি। শা ৬৯।৬,৭

৯৭ নটাংশ্চ নর্ত্তকাংশ্চৈব মল্লান্ মায়াবিনস্তথা।
শোভয়েয়ুঃ পুরবরং মোদয়েয়ুশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ শা ৬৯।৬০

৯৮ বিশালান্ রাজমার্গাংশ্চ কারয়েত নরাধিপঃ। ইত্যাদি। শা ৬৯।৫৩-৫৫

অশোক, চম্পক, জম্বু, লোধ্র প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী সুশোভিত। বাপী সরোবর, কূপ এবং তড়াগের অভাব নাই। বেদবিৎ, বিভিন্নভাষাবিৎ পণ্ডিত বণিক্, শিল্পী, স্থপতি ও বৈশ্যমণ্ডলীতে রাজপুরী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।[৯৯]

অতঃপর দণ্ডনীতি বা বিচারপদ্ধতির আলোচনা করা যাইতেছে। দণ্ডনীতি বলপ্রকৃতির অন্তর্গত। বলপ্রকৃতি সপ্তাঙ্গক রাজ্যের সপ্তম অঙ্গ। বল-শব্দের মুখ্য অর্থ—সেনা। 'যুদ্ধ'-প্রবন্ধে সেনা-নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে মহাভারতের অভিমত প্রদর্শিত হইবে।

দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য লোকস্থিতি—প্রজাই রাজ্যের মূল। সুতরাং প্রজারক্ষণই রাজার প্রধান কর্ম্ম। মানুষমাত্রই কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় সময়-সময় অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং লোকস্থিতির নিমিত্ত শাসনের আবশ্যক। শাসনের উদ্দেশ্য রাষ্ট্ররক্ষা। দণ্ডনীতির অপর নাম পালনবিদ্যা বিদ্যাস্থানের নির্দ্দেশে দণ্ডনীতিও গৃহীত হইয়াছে।[১০০]

ব্যবহার, প্রাগ্বচন প্রভৃতি পর্য্যায়-শব্দ—দণ্ডনীতি দ্বারা জগতে পুরুষার্থফল প্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং দণ্ডনীতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতান্তর থাকিতে পারে না।[১০১] দণ্ড সুপ্রযুক্ত হইলে প্রজাগণ রক্ষিত হয়। দণ্ডের উদ্দেশ্য রক্ষণ, শুধু আধিপত্য-বিস্তার নহে। দণ্ডকে ধর্ম্মও বলা হয়, আবার ব্যবহার এবং প্রাগ্বচন শব্দও দণ্ড-অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দণ্ড পরম দৈবত। দণ্ড অগ্নির মত অতিশয় তেজস্বী।[১০২]

দণ্ডাধিষ্ঠাত্রী দেবতা—দণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী একজন দেবতার উল্লেখ করিয়া তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, দণ্ড নীলোৎপলদলের মত শ্যামবর্ণ, চতুর্দ্দংষ্ট্র, চতুর্ভুজ, অষ্টপাদ, বহুনেত্র, শঙ্কুকর্ণ, ঊর্দ্ধরোমবান্, জটী, দ্বিজিহ্ব, তাম্রাস্য ও মৃগারাজতনুচ্ছদ।

দণ্ডধর্ম্ম বা ব্যবহার—টীকাকার নীলকণ্ঠ রূপকমুখে প্রযুক্ত শব্দগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৯৯ সাগরপ্রতিরূপাভিঃ পরিখাভিরলঙ্কৃতম্। ইত্যাদি। আদি ২০৭।৩০-৫১

১০০ দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ। শা ৫৯।৩৩

১০১ দণ্ডেন নীয়তে চেদং দণ্ডং নয়তি বা পুনঃ।
দণ্ডনীতিরিতি খ্যাতা ত্রীন্ লোকানভিবর্ত্ততে॥ শা ৫৯।৭৮

১০২ সুপ্রণীতেন দণ্ডেন প্রিয়াপ্রিয়সমাত্মনা।
প্রজা রক্ষতি যঃ সম্যগ্ ধর্ম্ম এব স কেবলঃ। ইত্যাদি। শা ১২১।১১-১৪

"শব্দগুলির দ্বারা যদি লৌকিক দণ্ডধর্ম্ম ব্যবহারকে (বিচারপ্রণালী) লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, দণ্ড সংহারের মূর্ত্তি। যে ব্যক্তি দণ্ডনীয়, সে রাজার বিদ্বেষের পাত্র, তাহার ধন রাজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব দ্বেষের মালিন্য এবং গ্রহণের রক্তিমা দণ্ডে মিলিত হইয়া তাহাকে নীললোহিত-বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেয়। দণ্ড দ্বারা অপরাধীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা চারিটি দংষ্ট্রার সহিত উপমিত হইতে পারে। যথা—মানভঙ্গ, ধনহরণ, অঙ্গবৈকল্য ও প্রাণনাশ। প্রজা এবং সামন্তরাজ হইতে কর গ্রহণ, রাজদ্বারে বিচারার্থী মিথ্যাবাদী হইতে প্রার্থনার দ্বিগুণ ধনগ্রহণ, মিথ্যাবাদী প্রত্যর্থী (বিবাদী) হইতে ধনগ্রহণ, ধনবান্ কদর্য্য বিপ্র হইতে সমস্ত সম্পত্তির গ্রহণ, এই চারিটি কর্ম্মের জন্য চারিখানি হাতের কল্পনা। ব্যবহার বা বিচারপ্রণালীকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত 'অষ্টপাদ' ইত্যাদি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আবেদন, ভাষা, মিথ্যোত্তর, কারণোত্তর, প্রাঙ্ন্যায়, প্রতিভূ, ক্রিয়া এবং ফলসিদ্ধি—ব্যবহারের এই আটটি পাদ। এইসকল পাদকে অবলম্বন করিয়া দণ্ড চলিতে পারে। অর্থাৎ বিচার বিষয়ে এই আটটি অবস্থার সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করিতে হয়। এইহেতু আবেদনাদিকে 'পাদ' বলা হয়। বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া বিচার প্রার্থনার নাম 'আবেদন'। প্রত্যর্থী ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে তাহার সম্মুখে পুনরায় আবেদন লিখার নাম 'ভাষা'। প্রত্যর্থী যদি অর্থীর আবেদনের সকল কথা স্বীকার করেন, তবে কাহারও দণ্ড হয় না। এই স্বীকৃতির নাম 'সম্প্রতিপত্তি'। আবেদনের বিষয় সর্ব্বথা অস্বীকার করার নাম 'মিথ্যোত্তর'। আবেদনের একাংশকে স্বীকার করিয়া অপরাংশকে অস্বীকার করার নাম 'কারণোত্তর'। অর্থী পূর্ব্বে কখনও বিচার্য্য বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করিয়া যদি পরাজিত হইয়া থাকেন এবং দ্বিতীয়বার আবেদনের পর প্রত্যর্থী যদি অর্থীর পূর্ব্বপরাজয়ের কথা ধর্ম্মাধিকরণে নিবেদন করেন, তবে সেই নিবেদনকে বলা হয় 'প্রাঙ্ন্যায়োত্তর'। অর্থী ও প্রত্যর্থীকে আপন-আপন পক্ষে জামিন দিতে হইলে সেই জামিনের নাম 'প্রতিভূ'। "আমি যদি এই বিচারে পরাজিত হই, তবে অমুক বস্তু দিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞার নাম 'ক্রিয়া'। স্বপক্ষের অনুকূলে সাক্ষ্য, লেখ্যপত্র (দলিলপত্র), ভোগ-দখল এবং শপথাদি প্রদর্শনের পর সেইগুলির সত্যতা ধর্ম্মাধিকরণে স্বীকৃত হইলেই বিচারে জয় হইয়া থাকে। অষ্টপাদ বিচারের পর অপরাধীকে দণ্ড দিবার নিয়ম। রাজা, অমাত্য, পুরোহিত ও পার্ষদপ্রমুখ পুরুষগণ দণ্ডের চক্ষু।

ইঁহাদের বিচারের পর দণ্ডের ব্যবস্থা। শঙ্কুকর্ণ শব্দের অর্থ তীক্ষ্ণকর্ণ, সকল বিষয় ভালরূপে শুনিয়া দণ্ডের বিধান করিতে হয় এবং দণ্ডিতকে দণ্ডের বিষয় সম্যক্ জানাইতে হয়। ঊর্দ্ধরোমবান্ শব্দটি প্রফুল্লতার প্রকাশক, যথাযথ প্রয়োগে দণ্ডের ধর্ম্ম প্রসন্ন হইয়া থাকে, কোন গ্লানি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। নানাবিধ সন্দেহের জটিলতা দণ্ডে বিদ্যমান। বিশেষ বিচার না করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করিতে নাই। অর্থী এবং প্রত্যর্থীর বাক্য প্রায়ই একরূপ হয় না, অধিকাংশ বিচারেই সম্প্রতিপত্তি ঘটে না ; সুতরাং দণ্ড দ্বিজিহ্ব। আহবনীয়াদি বহ্নি দণ্ডের আস্য, অর্থাৎ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া দণ্ড দিতে হয়। এইহেতু তাহাকে তাম্রাস্য বলা হইয়াছে। কৃষ্ণমৃগের চর্ম্মে দণ্ডের তনু আচ্ছাদিত, অর্থাৎ দণ্ডও দীক্ষাপ্রধান যজ্ঞরূপে পরিগণিত। ক্ষত্রিয়ের দান, উপবাস এবং হোম সকলই দণ্ডের বিশুদ্ধির নিমিত্ত।[১০৩]

দণ্ড ঈশ্বরের পালনী শক্তির প্রতীক—দণ্ডকে ভগবানের পালনী শক্তির মূর্ত্ত-প্রকাশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, দণ্ড ভগবান্ নারায়ণের স্বরূপ। মহৎ রূপ ধারণ করে বলিয়া তাহাকে 'মহান্ পুরুষ' বলা হয়।[১০৪]

দণ্ডনীতির প্রশংসা—দণ্ডনীতি ব্রহ্মার দুহিতা, তিনিই বৃত্তি, তিনিই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী, তিনিই জগদ্ধাত্রী। সমাজে বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য ও বীর্য্য সকলই দণ্ডনীতির সুপ্রয়োগের অধীন। উচ্ছৃঙ্খল মাৎস্য-ন্যায়ের তাণ্ডব-লীলাকে লক্ষ্মী-সরস্বতী-প্রমুখ দেবীরা ভয় করিয়া থাকেন। সুতরাং দণ্ড-নীতিতে সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত।[১০৫]

দণ্ড বৈদিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—দণ্ড বৈদিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদে যে-সকল আচরণের নিষিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেইসকল আচরণে শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রায়শ্চিত্ত এবং দণ্ডের উল্লেখ আছে। বেদোল্লিখিত

১০৩ নীলোৎপলদলশ্যামশ্চতুর্দ্দংষ্ট্রশ্চতুর্ভুজঃ।
অষ্টপান্নৈকনয়নঃ শঙ্কুকর্ণোর্দ্ধরোমবান্ ॥ ইত্যাদি। শা ১২১।১৫,১৬। দ্রঃ নীলকণ্ঠ

১০৪ দণ্ডো হি ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্দণ্ডো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
শশ্বদ্রূপং মহদ্বিভ্রন্ মহান্ পুরুষ উচ্যতে ॥ শা ১২১।২৩

১০৫ তথোক্তা ব্রহ্মকন্যেতি লক্ষ্মীর্বৃত্তিঃ সরস্বতী।
দণ্ডনীতির্জগদ্ধাত্রী দণ্ডো হি বহুবিগ্রহঃ ॥ শা ১২১।২৪

বিধিনিষেধ, শাস্ত্রবেত্তাদের অনুশাসন এবং ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিদের ব্যবহার দেখিয়া দণ্ডবিধির প্রয়োগ করা উচিত।[১০৬]

দণ্ডোৎপত্তির উপাখ্যান—দণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। নৃপতি মান্ধাতা অঙ্গরাজ বসুহোম সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্, আপনি বার্হস্পত্য ও ঔশনস রাজধর্ম্মে প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন, আমি আপনার শিষ্য, অনুগ্রহপূর্ব্বক দণ্ডের উৎপত্তিবিবরণ আমাকে উপদেশ দিন"। বসুহোম বলিতে লাগিলেন, "প্রজার বিনয় রক্ষার উদ্দেশ্যেই দণ্ডের সৃষ্টি। যজ্ঞসম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প ব্রহ্মা উপযুক্ত ঋত্বিক্ খুঁজিয়া না পাওয়ায় বহু বৎসর শিরে এক গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। হাজার বৎসর পরে সেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইল। সেই সন্তান প্রজাপতি ক্ষুপ-নামে পরিচিত। তিনি ব্রহ্মার যজ্ঞে ঋত্বিক্‌পদে বৃত হইলেন। প্রজানিয়ন্তা ব্রহ্মা যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায় লোকনিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত দণ্ড সহসা অন্তর্হিত হইলেন। সমাজে ঘোর দুর্নীতি দেখা দিল। মারামারি, কাটাকাটি এবং বর্ণসঙ্করের অন্ত রহিল না। উপস্থিত বিপদে ব্রহ্মা শূলপাণির শরণাপন্ন হইলেন। শূলপাণি দণ্ডের উৎপত্তির ব্যবস্থা করিলেন এবং দেবী সরস্বতী দণ্ডনীতির সৃষ্টি করিলেন। তারপর ভগবান্ শূলপাণি সর্ব্বত্র এক-একজন শক্তিশালী পুরুষকে শাসক এবং পালকরূপে নিযুক্ত করিলেন। ইন্দ্রকে দেবলোকের, যমকে পিতৃলোকের এবং কুবেরকে রাক্ষসলোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন। এইরূপে প্রত্যেক বিভাগে এক-একজন অধিপতি নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মার যজ্ঞসমাপ্তির পর মহাদেব ধর্ম্মগোপ্তা বিষ্ণুর হাতে দণ্ডটি প্রদান করিলেন। বিষ্ণু অঙ্গিরাকে, অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিকে, মরীচি ভৃগুকে দান করেন। এইরূপে ক্রমশঃ মনুর পুত্রদের হাতে পৌছিল। মনুর উপদেশে দণ্ডের কর্ত্তব্য যথারীতি পালিত হইতে লাগিল। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল"।[১০৭]

দণ্ডের কল্যাণরূপ ও রুদ্ররূপ—উপাখ্যানের রূপক অংশ বাদ দিয়া আমরা এই বুঝিতে পারি যে, সৃষ্টিকর্ত্তা লোকস্থিতির চিন্তা করিয়া শিব

১০৬ ব্যবহারস্তু বেদাত্মা বেদপ্রত্যয় উচ্যতে।
মৌনশ্চ নরশার্দ্দূল শাস্ত্রোক্তশ্চ তথাপরঃ ইত্যাদি। শা ১২১।৫১-৫৭

১০৭ শা ১২২তম অঃ।

অথচ রুদ্র মহাদেবের দ্বারা দণ্ডের উৎপত্তির ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ দণ্ড সৃষ্টিরক্ষার এবং সর্ব্ববিধ উন্নতির একটি প্রধান সহায়। সাধু পুরুষদের নিকট দণ্ডের রূপ অতি প্রসন্ন ও কল্যাণময়, কিন্তু অসাধুদের পক্ষে তাহাই অতি ভয়ঙ্কর, অতিশয় রুদ্র। রাজাদের মধ্যেও খুব ধর্ম্মনিষ্ঠ ও উৎসাহী ভিন্ন অপর কেহ শিবনির্ম্মিত এই দণ্ডের ধারণে অধিকারী নহেন।

দণ্ডমাহাত্ম্য—বহু স্থানে দণ্ডনীতির প্রশংসা করা হইয়াছে। দণ্ডনীতির প্রবর্ত্তনের ফলে সমস্ত সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়; দণ্ডনীতির অভাবে মাৎস্য-ন্যায়েরই জয়জয়কার। চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্ম এবং অন্যান্য মঙ্গলজনক রীতিনীতি দণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ভূপতি কখনও দণ্ডনীতির মর্য্যাদা অতিক্রম করিবেন না।[১০৮]

দণ্ডনীতির সাধু প্রয়োগে শুভফল—দণ্ডনীতির যথাযথ প্রয়োগে রাজা ও প্রজার সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। দণ্ডনীতি চারি বর্ণকে স্ব-স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করে। চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্থিতিতে বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির আশঙ্কা থাকে না। সকলেই আপন-আপন কর্ম্মে উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাতে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়। রাজাই কালের কারণ। তিনি যখন দণ্ডনীতির মর্য্যাদা সম্যক্ রক্ষা করিতে পারেন, তখনই সমাজে ধর্ম্মপ্রধান সত্যযুগের উৎপত্তি, এইরূপে রাজসেবিত দণ্ডনীতির অপপ্রয়োগে ত্রেতাদি যুগের উৎপত্তি। অতএব দণ্ডনীতির সুপ্রয়োগ সর্ব্ববিধ কল্যাণের মূল।[১০৯]

বিচারে রাজার সহায়—অর্থী ও প্রত্যর্থীর প্রার্থনাদি শুনিয়া যথোচিত বিচার করিবার নিমিত্ত সদ্বংশজ, সুপণ্ডিত, জিতেন্দ্রিয়, সুবুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণ, সর্ব্বার্থদর্শী পুরুষদিগকে বিচরাসনে বসান হইত। রাজা একা কোন বিচার করিতেন না।[১১০]

পক্ষপাতিত্বে মহাপাপ—বিচারাসনে বসিয়া পক্ষপাতপ্রদর্শনে মহাপাপ হয়। তাদৃশ বিচারককে কখনও স্থান দিতে নাই।[১১১]

১০৮ দণ্ডনীত্যাং প্রণীতায়াং সর্ব্বে সিদ্ধ্যুপক্রমাঃ। ইত্যাদি। শা ১৫।২৯-৩৫

১০৯ মহাভাগ্যং দণ্ডনীত্যাঃ সিদ্ধৈঃ শব্দৈঃ সহেতুকৈঃ। ইত্যাদি। শা ৬৯।৭৫-৯৮
দণ্ডনীত্যাং যদা রাজা সম্যক্ কাৎস্ন্যে‍ন বর্ত্ততে।
তদা কৃতযুগং নাম কালঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রবর্ত্ততে। ইত্যাদি। উ ১৩২।১৫-২০

১১০ ব্যবহারেষু ধর্ম্মেষু যোক্তব্যাশ্চ বহুশ্রুতাঃ। শা ২৪।১৮

১১১ ভক্তিশ্চৈষাং ন কর্ত্তব্যা ব্যবহারে প্রদর্শিতে। শা ৬৯।২৭

আইন ঋষিপ্রণীত—মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ প্রমুখ মুনিঋষিগণ আইন প্রণয়ন করিতেন। তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া বিচার করিতে হইত। আবশ্যকমত আইনের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধনের ক্ষমতাও রাজাদের হাতে ছিল না, প্রণেতৃগণই এইসকল বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন।[১১২]

জুরীর বিচার—বিশেষ-বিশেষ জটিল বিচারে জুরীদের সাহায্য গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। মহাভারতে এই বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা নাই। মনু-সংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে বিশদভাবে বলা হইয়াছে।[১১৩]

শাসন ও বিচারবিভাগ পৃথক্—উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, রাজা অপরাপর সুপণ্ডিত সভাসদ্ সহ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইতেন। বিচারে গ্রামমুখ্যদের অধিকার ছিল না। তাঁহারা শুধু গ্রাম-শাসনের অধিকারী ছিলেন। ইহা হইতে আরও বুঝিতে পারি যে, একই বিভাগের দ্বারা শাসন এবং বিচার চলিত না। দুই বিষয়ে স্বতন্ত্র দুইটি বিভাগ ছিল।

সাক্ষ্যবিধি—সাক্ষ্যবিধান সম্বন্ধেও বিশেষ উল্লেখ করা হয় নাই। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিষ্ণুস্মৃতি পাঠ করিলে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়।

ধর্ম্মাসনের মহিমা—বিচারাসনের অপর নাম ছিল 'ধর্ম্মাসন'। উক্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া যে নৃপতি বা অমাত্য ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা রক্ষা করেন না, তিনি অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন।[১১৪]

সাক্ষ্যহীন বিচার—যাঁহারা অনাথ এবং দরিদ্র, তাঁহারা প্রবল প্রতি-পক্ষের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে সাক্ষী বা অন্য কিছু সংগ্রহ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। একমাত্র রাজাই তাহাদের গতি। সেরূপ স্থলে রাজা বিশেষ অনুসন্ধানে তথ্য সংগ্রহ করিবেন।[১১৫]

---

১১২ কচ্চিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভৃশমুদ্বিজসে প্রজাঃ। ইত্যাদি। সভা ৫।৪৪

১১৩ শ্রোতুঞ্চৈব ন্যসেদ্ রাজা প্রাজ্ঞান্ সর্ব্বার্থদর্শিনঃ। ইত্যাদি শা ৬৯।২৮
যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয়ঃ। ইত্যাদি। মনু ৮।১০

১১৪ অথ যোহধর্ম্মতঃ পাতি রাজামাত্যোহথবাত্মজঃ।
ধর্ম্মাসনে সন্নিযুক্তো ধর্ম্মমূলে নরর্ষভ। ইত্যাদি। শা ৮৫।১৬,১৭

১১৫ বলাৎকৃতানাং বলিভিঃ কৃপণং বহুজল্পতাম্।
নাথো বৈ ভূমিপো নিত্যমনাথানাং নৃণাং ভবেৎ। শা ৮৫।১৮

লেখ্যাদি (দলিলপত্র)—সম্ভবপর হইলে উভয় পক্ষের বক্তব্যের সমর্থক সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং লেখ্যপত্রাদি গ্রহণ করিতে হয়।

অগ্নি, তুলা প্রভৃতি দিব্যবিধান—সাক্ষ্য এবং লেখ্যাদির দ্বারাও স্থিররূপে সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে প্রত্যর্থীকে দিব্যবিধানে পরীক্ষা দিতে হইত। অগ্নিপ্রবেশ, বিষভক্ষণ, তুলাদণ্ডে আরোহণ প্রভৃতি দিব্যপরীক্ষার বিধান ছিল। (যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিতে বর্ণিত, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-প্রণীত 'দিব্যতত্ত্বে' বিস্তৃত পদ্ধতি পাওয়া যায়।) পরীক্ষার পর জয়-পরাজয় নির্ণীত হইত। ধর্ম্মের সহিত বিচারপদ্ধতির বিশেষ যোগ না থাকিলে অগ্নিপরীক্ষাদি দিব্যবিধির প্রচলন হইতে পারিত না।[১১৬]

সামুদ্রিক প্রভৃতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য—সাক্ষ্যদানেও সকলের অধিকার ছিল না। সামুদ্রিক (হস্তরেখাদি পরীক্ষার দ্বারা যাঁহারা ভাগ্য গণনা করিয়া থাকেন), চোরবণিক্ (যে বণিকের তুলাদণ্ড যথার্থ নহে), শলাকধূর্ত্ত (শলাকা বা দড়ির দ্বারা নানাবিধ গণনার ভান করিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক যাহারা অর্থোপার্জ্জন করে), শত্রু, মিত্র, নর্ত্তকীর দাস, লম্পট প্রভৃতি দুঃশীল ব্যক্তি এবং চিকিৎসক—ইহারা সাক্ষ্যে অনধিকারী।[১১৭]

মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানে পাপ—যে সাক্ষী জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা কথা বলেন, তিনি আপনার ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষ এবং অধস্তন সাত পুরুষকে নরকগামী করিয়া থাকেন। সব-সময় যথার্থ ভাষণকে সত্য বলা যায় না। সময়বিশেষে পরহিতের নিমিত্ত কথিত অযথার্থ বাক্যকেও সত্য বলা হয়। (দ্রঃ ২৯৪তম পৃঃ)

যথার্থ সাক্ষ্য না দেওয়াও পাপ—যথার্থ ঘটনা জানিয়াও যে-ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইলে কোন উত্তর দেন না, তিনিও পূর্ব্বোক্ত পাপে লিপ্ত হন।[১১৮]

অপরাধীর দণ্ড-বিধান—যথাযথ বিচারের পর অপরাধীর দণ্ডের বিধান। কঠোর বাক্য, ধনগ্রহণ, কারাগারে আবদ্ধ রাখা, শরীরব্যঙ্গতা, প্রহার ও

১১৬ ততঃ সাক্ষিবলং সাধু দ্বৈবপক্ষাত্তথা কৃতম্।
অসাক্ষিকমনাথং বা পরীক্ষ্যং তদ্বিশেষতঃ। শা ৮৫।১৯

১১৭ সামুদ্রিকং বাণিজং চোরপূর্ব্বং শলাকধূর্ত্তঞ্চ চিকিৎসকঞ্চ।
অরিঞ্চ মিত্রঞ্চ কুশীলবঞ্চ নৈতান্ সাক্ষ্যে ত্বধিকুর্ব্বীত সপ্ত॥ উ ৩৫।৪৪

১১৮ পৃষ্টো হি সাক্ষী যঃ সাক্ষ্যং জানানোঽপ্যন্যথা বদেৎ।
স পূর্ব্বানাত্মনঃ সপ্ত কুলে হন্যাৎ তথা পরান্॥ ইত্যাদি। আদি ৭।৩,৪। অনু ৯৩।১২০

হনন প্রভৃতি দণ্ডের প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে ধনী পুরুষের অর্থদণ্ড এবং দরিদ্রের কারাদণ্ডের ব্যবস্থাই বেশী হইত। গুরুতর অপরাধ ব্যতীত কাহারও প্রাণদণ্ড হইত না।[১১৯]

শূলদণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর—শূলে চড়াইয়া বধ করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর দণ্ডরূপে বিবেচিত হইত।[১২০]

ন্যায়বিচারে পুত্রও দণ্ডনীয়—ন্যায়বিচারে পুত্রকে দণ্ড দিতেও ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতিগণ ইতস্ততঃ করিতেন না। পুরবাসী দুর্ব্বল শিশুগণকে নদীজলে বিসর্জ্জন দেওয়ার অপরাধে রাজা সগর তাঁহার পুত্র অসমঞ্জকে নির্ব্বাসিত করেন।[১২১]

অপরাধী গুরুও দণ্ডনীয়—এমন কি, গুরুও যদি অপরাধ করেন, তাঁহাকেও দণ্ড দেওয়া উচিত।[১২২]

ব্রাহ্মণের নির্ব্বাসনদণ্ডই চরম—অপরাধ গুরুতর হইলেও ব্রাহ্মণের বধদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী বা রাজবিদ্বেষী ব্রাহ্মণকে রাজ্য হইতে দূরে নির্ব্বাসিত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। শারীর দণ্ড ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযোজ্য নহে।[১২৩]

পাপের বিচারক ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ—নৈতিক পাপ এবং সামাজিক অপরাধ উভয়ের বিচারই রাজসভায় হইত। নৈতিক পাপের বিচারে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিচারকের আসন গ্রহণ করিতেন। তাহাতে যে প্রতীকারের ব্যবস্থা হইত, তাহার নাম 'প্রায়শ্চিত্ত'। অপরাধীর প্রতি প্রযুক্ত রাজার আজ্ঞার নাম 'দণ্ড'।

১১৯ দুর্ব্বাচা নিগ্রহো দণ্ডো হিরণ্যবহুলস্তথা।
ব্যঙ্গতা চ শরীরস্য বধো বানল্পকারণাৎ ॥ ইত্যাদি। শা ১৬৬।৭০,৭১
অপরাধানুরূপঞ্চ দণ্ডং পাপেষু ধারয়েৎ।
বিযোজয়েদ্ধনৈশ্বর্দ্ধানধনানথ বন্ধনৈঃ ॥ ইত্যাদি। শা ৮৫।২০,২১। আশ্র ৫।৩১

১২০ জীবন্ স শূলমারোহেৎ স্বয়ং কৃত্বা সবান্ধবঃ। মৌ ১।৩০

১২১ পুত্রস্যাপি ন মৃষ্যেচ্চ স রাজ্ঞো ধর্ম্ম উচ্যতে। শা ৯১।৩২
অসমঞ্জাঃ পুরাদদ্য সুতো মে বিপ্রবাস্যতাম্। ইত্যাদি। বন ১০৭।৪৩। শা ৫৭।৮

১২২ গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য দণ্ডো ভবতি শাশ্বতঃ ॥ ইত্যাদি। শা ৫৭।৭। শা ১৪০।৪৮। উ ১৭৯।২৫

১২৩ সাপরাধানপি হি তান্ বিষয়ান্তে সমুৎসৃজেৎ। ইত্যাদি। শা ৫৬।৩১-৩৩

গুরুতর পাপে যুগপৎ দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত—গুরুতর পাপে দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়েরই ব্যবস্থা দেওয়া হইত। চান্দ্রায়ণাদি-ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি এবং অর্থাদি দণ্ডের বিধান একই সঙ্গে প্রযুক্ত হইত।

পূতচরিতের স্বয়ং দণ্ডগ্রহণ (শঙ্খলিখিতোপাখ্যান)—পূতচরিত পুরুষ কোন পাপকর্ম করিলে প্রায়শ্চিত্তাচরণ এবং দণ্ডগ্রহণের নিমিত্ত স্বয়ং ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। শঙ্খলিখিতের উপাখ্যান বোধ করি, অনেকেই জানেন। সংশিতব্রত লিখিত-ঋষি স্বয়ং রাজা সুদ্যুম্ন-সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রাজন্, আমি না বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রমের ফল ভক্ষণ করিয়াছি, সুতরাং সত্বর আমার শাস্তি বিধান করুন"। রাজা এরূপ সত্যনিষ্ঠ সরলপ্রাণ তপস্বী ব্রাহ্মণকে শাস্তি দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন নাই, কিন্তু অপরাধীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে অগত্যা তাঁহাকে শাস্তি দিতে হইল। রাজার আজ্ঞায় হাত দুখানি ছিন্ন হইলে লিখিত পরম শান্তি অনুভব করিলেন। সুদ্যুম্নও উপযুক্ত দণ্ডদানের ফলে পরম পবিত্রতা লাভ করিলেন। ভ্রাতার আদেশে বাহুদা-নদীতে তর্পণ করিয়া লিখিত-ঋষি হাত পাইয়াছিলেন।[১২৪]

বিচারপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য—সেই কালের বিচার ও দণ্ডবিধানের আলোচনায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই ধরা পড়ে। অর্থী ও প্রত্যর্থীকে কোন খরচ বহন করিতে হইত না। ব্যবহারজীবীদের মধ্যস্থতায় রাজদ্বারে উপস্থিতির আবশ্যক হইত না। বাদী ও প্রতিবাদী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আপন-আপন মুখেই বক্তব্য নিবেদনের অধিকার পাইতেন। বিচার খুব শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পন্ন হইত। এইজন্য দীর্ঘকাল অশান্তি ও উৎকণ্ঠায় কাটাইতে হইত না। আইন প্রণয়নের দায়িত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনরূপ স্বার্থের সম্পর্ক তাঁহাদের ছিল না। একমাত্র সমাজের হিতকামনায়ই তাঁহারা ধর্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। বিচারাদি রাজ্যশাসন ধর্ম্মের অঙ্গরূপে বিবেচিত হওয়ায় সমাজগঠনে আইন বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

রাজধর্ম্ম ও রাজনীতি এক নহে—উপসংহারে রাজধর্ম বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। মনে রাখিতে হইবে যে, মহাভারতের 'রাজধর্ম' 'রাজনীতি' নহে। রাজার কৃত্যকে ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া দেখা হয় নাই। মহাভারতের রাজাকে ধর্ম্মের সহিত যতটা যুক্ত করা হইয়াছে,

১২৪ শা ২৩শ অঃ।

তাহাতে রাজধর্ম্মের উপদেশ না দিয়া শুধু রাজনীতির উপদেশ দিলে তেমন যুক্তিযুক্ত হইত না।

রাজধর্ম্মের শ্রোতাই মোক্ষধর্ম্মের শ্রোতা—রাজধর্ম্মের শ্রোতা যুধিষ্ঠিরই মোক্ষধর্ম্মের শ্রোতা। রাজধর্ম্মের উপদেশের পরেই মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ। অতএব দেখা যাইতেছে, মহাভারতের রাজধর্ম্ম মোক্ষধর্ম্মের কাছাকাছি। কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। রাজার কর্ত্তব্য যথাযথরূপে পালিত হইলে রাজা মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন। মোক্ষধর্ম্মের প্রারম্ভে নীলকণ্ঠের টীকাতেও ইহাই ধ্বনিত হইয়াছে।

ঈশ্বরত্ব ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ গুণ—রাজধর্ম্মের পরিচালক ক্ষত্রিয় শুধু মানুষ নহেন, তিনি সমাজের শৃঙ্খলা বিধান করেন বলিয়া তাঁহাতে ঈশ্বরত্বও বিদ্যমান। নিয়মন-শক্তিরই অপর নাম ঈশ্বরত্ব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে যে, শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান এবং সুব্যবস্থাপন ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম।[১২৫] এই কারণে তাঁহার শাসনের বিধি-ব্যবস্থার নাম 'রাজধর্ম্ম'।

রাজশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—লোকহিতকর সকল অনুষ্ঠানেই রাজাকে অগ্রণী হইতে হইত। রাজার উৎসাহ হইতে প্রজাগণ অনুপ্রেরণা লাভ করিত। প্রজার মনোরঞ্জন করেন বলিয়া প্রজাপালককে 'রাজা' বলা হয়।[১২৬]

রাজার প্রসাদে সুখশান্তি—যাঁহার অভাবে জীবজগৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, যাঁহার সত্তায় জীবজগতের সত্তা, সেই পুরুষকে পূজা না করিয়া কে পারে? অগ্নিদগ্ধ বস্তুর শেষ পরিণতি ভস্মে, কিন্তু রাজরোষ-দগ্ধের শেষ কিছুই থাকে না। মহীপতির প্রসাদেই মানবসমাজ সুখশান্তিতে বাস করিতে পারে। রাজা সুশাসক না হইলে তাঁহার অধীনে বাস করা উচিত নহে। নিত্য অশান্তি ভোগ করিতে হয়।[১২৭]

---

১২৫ শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্। গী ৪২।৪৩

১২৬ রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্ব্বাস্তেন রাজেতি শব্দ্যতে। ইত্যাদি। শা ৫৯।১২৫। শা ৫৭।১১

১২৭ যস্যাভাবেন ভূতানামভাবঃ স্যাৎ সমন্ততঃ।
ভাবে চ ভাবো নিত্যং স্যাৎ কস্তং ন প্রতিপূজয়েৎ॥ শা ৬৮।৩৭
কুর্য্যাৎ কৃষ্ণগতিঃ শেষং জ্বলিতোঽনিলসারথিঃ। ইত্যাদি। শা ৬৮।৫০-৫২, ৫৫
কুরাজ্যে নিবৃতির্নাস্তি কুদেশে নাস্তি জীবিকা। শা ১৩৯।৭৪

রাজাপ্রজার প্রাণের যোগ—রাজা এবং প্রজার মধ্যে লোক-দেখান তথাকথিত শ্রদ্ধা ও স্নেহের আকর্ষণ ছিল না; উভয়ের ব্যবহারের মধ্যে প্রাণের যোগ ছিল। রাজাও যেমন অকপটে রাষ্ট্রের কল্যাণ চিন্তা করিতেন, প্রজারাও ঠিক সেইরূপ রাজাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রমুখ কুরুরাজদের সহিত প্রজাদের কতকগুলি ব্যবহারের বর্ণনা দেখিলেই এই উক্তির যথার্থতা সপ্রমাণ হইবে।

ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি—গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ গ্রহণের সময় ধৃতরাষ্ট্র প্রজাগণকে আহ্বান করেন। প্রজামণ্ডলী উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "পুরুষানুক্রমে কুরুবংশের নৃপতিদের সহিত আপনাদের সৌহৃদ্য। আমরা চিরদিন পরস্পরের মঙ্গল কামনা করিয়া আসিতেছি। আমাদের মধ্যে যে প্রীতির সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে, রাজাপ্রজার মধ্যে এরূপ প্রীতি অন্য দেশে আছে বলিয়া মনে করি না। আমি যথাশক্তি আপনাদের সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি হইলেও আপনাদের সেবায় কখনও শিথিলতা প্রদর্শন করে নাই। আমি যদি কখনও অনবধানতাবশতঃ কোন ত্রুটি করিয়া থাকি, আজ তাহার জন্য করজোড়ে আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা আপনাদের প্রাচীন রাজবংশের উত্তরাধিকারী বলিয়া আমাকে অবশ্যই ক্ষমা করিবেন, বিশেষতঃ এক্ষণে আমি অতি বৃদ্ধ, অপটু এবং পুত্রশোকে সন্তপ্ত। আমার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীও আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। আপনারা প্রসন্নচিত্তে অনুমতি করুন, আমরা বানপ্রস্থ গ্রহণ করিতে চাই। আপনাদের রাজা যুধিষ্ঠিরকে আপনাদেরই হাতে সমর্পণ করিতেছি। আপনারা তাঁহাকে সুপথে পরিচালিত করিলে নিশ্চয়ই তিনি যথাযথরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন"।

প্রজাদের প্রত্যুত্তর—ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য-শ্রবণে সমবেত প্রজামণ্ডলীর চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল। প্রজাদের মধ্যে মুখপাত্রস্বরূপ 'সাম্ব'-নামে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ, উপস্থিত আপনার প্রজাবৃন্দ আমাকে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন। আপনি আমাদের মধ্যে যে সৌহৃদ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতি সত্য কথা। কুরুবংশীয় রাজাদের প্রজাপ্রীতি চিরপ্রসিদ্ধ; আপনারাই আমাদের পিতা, আপনারাই মাতা। আপনাদের নিকট হইতে চিরকাল প্রজামণ্ডলী

মাতৃপিতৃস্নেহ লাভ করিয়া আসিতেছে। যুবরাজ দুর্য্যোধন আমাদের প্রতি কখনও কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নাই। আপনার বংশে যে-সকল ভূপতি রাজ্যশাসন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই করুণহৃদয় এবং ন্যায়বান্। আপনার গার্হস্থ্য-পরিত্যাগের সঙ্কল্পে আমরা বাধা দিতে চাই না। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির যে সঙ্কল্পের অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই কল্যাণকর। আপনি মুনিধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শান্তি লাভ করুন, ইহাই আমাদের কামনা"।[১২৮]

পাণ্ডবদের বনযাত্রা-কালে প্রজাদের ব্যথা—সপত্নীক পাণ্ডবগণের অরণ্যযাত্রাকালে দুঃখার্ত্ত প্রজাদের ক্রন্দনের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাও রাজা এবং প্রজার পরম সৌহৃদ্যের পরিচায়ক। অনেক প্রজা অরণ্য পর্য্যন্ত পাণ্ডবদের অনুগমন করিয়াছিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের বিশেষ অনুরোধে তাঁহারা বন হইতে ফিরিয়া আসেন।[১২৯]

প্রজাগণের রাজসমীপে গমন—প্রয়োজনবোধে প্রজাগণ স্বয়ং রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব বক্তব্য নিবেদন করিতে পারিতেন। এই বিষয়ে কাহারও মধ্যস্থতার আবশ্যক হইত না। প্রথমতঃ দ্বারপাল সমাগত ব্যক্তির উপস্থিতি নৃপতিকে জ্ঞাপন করিত, তারপর নৃপতির অনুমতিক্রমে নিকটে যাইতে আর কোন বাধা থাকিত না।[১৩০]

নৃপতি প্রার্থীকে বিমুখ করিতেন না—নৃপতি কখনও কোন প্রার্থীকে বিমুখ করিতেন না। সকলের জীবনযাত্রা যাহাতে অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাই রাজার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় ছিল। প্রজাগণকে পুত্রের মত মনে করা রাজচরিত্রের আদর্শ।[১৩১]

দুর্গতাদির ভরণপোষণ—দুর্গত, বৃদ্ধ, দরিদ্র এবং বিধবাদের ভরণপোষণ রীতিমত চলে কি না, সেই বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত নৃপতিকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অঙ্গহীন, অতি দরিদ্র, বামন, অন্ধ, স্থবির, অনাথ,

---

১২৮. আশ্র ৮ম-১০ম অঃ।

১২৯ ইতি পৌরাঃ সুদুঃখার্ত্তাঃ ক্রোশন্তি স্ম পুনঃ পুনঃ। ইত্যাদি। সভা ৮০।২৬। বন ১ম অঃ।

১৩০ স তত্র বারিতো দ্বাঃস্থৈঃ প্রবিশন্ দ্বিজসত্তমঃ। ইত্যাদি। আদি ৫৪।২৯। আদি ১২৩।৬

১৩১ আত্মনশ্চ পরেষাঞ্চ বৃত্তিং সংরক্ষ ভারত
পুত্রবচ্চাপি ভৃত্যান্ স্বান্ প্রজাশ্চ পরিপালয়। ইত্যাদি। অনু ৬১।১৭,১৮

কুব্জ এবং খঞ্জ প্রজাগণ রাজকোশ হইতে নিয়মিত বৃত্তি পাইয়া সুখেই কালাতিপাত করিতেন। এইসকল বিপন্নের প্রতি নৃপতির স্বয়ং দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। আশ্রিত পুরুষের বৃত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজাকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা হইয়াছে।[১৩২]

প্রবন্ধান্তরে রাজধর্ম্মের আলোচনা—শিক্ষা, বৃত্তিব্যবস্থা, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি প্রবন্ধেও রাজধর্ম্মের কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। প্রজাকে রক্ষা করাই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। বৃত্তিদান, নিষ্কর ভূমিদান, ঋণদান প্রভৃতি বিষয়েও সেইসকল প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে রাজনির্ব্বাচনে প্রজার অনুমোদন—অতি প্রাচীন কালে রাজার নির্ব্বাচনে প্রজার অধিকারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (দ্রঃ ৩৭৩তম পৃঃ।) মহাভারতের কালের অনেক পূর্ব্বে রাজা যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজসিংহাসনের অধিকার দিতে রাজ্যের ব্রাহ্মণ এবং প্রজাসাধারণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।[১৩৩] কিন্তু মহাভারতের সময়ে সেই নিয়ম ছিল না। কারণ পাণ্ডবগণের অরণ্যযাত্রার সময় প্রজাবৃন্দ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেও প্রকাশ্যে দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে সাহস পান নাই। অনেকে পাণ্ডবদের অনুগমন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দুর্য্যোধনকে সিংহাসনচ্যুত করিতে কেহই সাহসী হন নাই। পরে সম্ভবতঃ দুর্য্যোধনের শাসনে তাঁহারাও সন্তুষ্টই ছিলেন।

সাধারণ নীতি

নীতিশাস্ত্রে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক—সমাজে বাস করিতে হইলে প্রত্যেককেই নৈতিক ব্যবহারপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে হয়। নিজের প্রতি, পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি এবং বৃহৎ সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরই অসংখ্য কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সেই কর্ত্তব্য পালন করিবার

১৩২ কৃপণানাথবৃদ্ধানাং বিধবানাঞ্চ যোষিতাম্।
যোগক্ষেমঞ্চ বৃত্তিঞ্চ নিত্যমেব প্রকল্পয়েৎ॥ শা ৮৬।২৪
তদাশ্রয়া বহবঃ কুব্জখঞ্জাঃ। ইত্যাদি। উ ৩০।৩৯,৪০। সভা ৫।৯২

১৩৩ আদি ৮৫তম অঃ।

নিমিত্ত সকলকেই নীতিশাস্ত্রের উপদেশগুলি জানিতে হইবে। পুঁথি পড়িয়া জানা অপেক্ষা আদর্শচরিত্র ব্যক্তির সংসর্গে থাকিয়া জানা এবং মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজন হইতে জানার মূল্য বেশী। অনেক সময় ঠেকিয়াও শিখা যায়, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে বড় ঠেকিতে হয় না।

নীতিশাস্ত্রে মহাভারত উপজীব্য—মহাভারতে অসংখ্য নৈতিক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার সঙ্কলনে প্রকাণ্ড একখানি গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশের বহু শ্লোক মহাভারত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সকল গ্রন্থকারই মহাভারত হইতে প্রয়োজনানুসারে আপন-আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভার্গবনীতির প্রাচীনতা—অতি প্রাচীন কালে জগতের হিতের নিমিত্ত ভার্গবমুনি নীতিশাস্ত্র প্রচার করেন।[১]

বৃদ্ধবচনের গুরুত্ব—নৈতিক আচার-ব্যবহার জানিবার পক্ষে বৃদ্ধসাহচর্য্য প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা মহাভারতের উপদেশ। বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষদের কাছে বসিলে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, দুই চারিটি উপদেশ লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে। বৃদ্ধের সাহচর্য্য ব্যতীত মানুষ কখনও পাকা জ্ঞানী হইতে পারে না। বৃদ্ধসেবার ফলে মানুষ যত সত্বর নানাবিধ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে। পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, শ্রেয়স্কাম পুরুষ সুযোগ পাইলে বৃদ্ধের সাহচর্য্যে কাল যাপন করিবেন।[২] অনুশাসনপর্ব্বের উপদেশ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, সম্ভবপর হইলে প্রত্যহই বৃদ্ধের বচন শোনা উচিত। দুইবেলা বৃদ্ধদের সহিত কিছুসময় বাস করিলে প্রচুর লাভবান্ হওয়া যায়।[৩]

১ ভার্গবো নীতিশাস্ত্রং তু জগাদ জগতো হিতম্। শা ২১০।২০

২ চলচ্চিত্তস্য বৈ পুংসো বৃদ্ধাননুপসেবতঃ। ইত্যাদি। উ ৩৬।৩৯। সভা ৫৫।৫। বন ৩১২।৪৮

ন বৈ শ্রুতিমবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য বা।
ধর্ম্মার্থৌ বেদিতুং শক্যৌ বৃহস্পতিসমৈরপি। উ ৩৯।৩০,৭৫।
উ ৪০।২৩। উ ৬৪।১২। শা ৫৯।১৪২। শা ২২২।৩৪। অনু ১৬৩।১২

৩ সায়ং প্রাতশ্চ বৃদ্ধানাং শৃণুয়াৎ পুষ্কলা গিরঃ।
শ্রুতমাপ্নোতি হি নরঃ সততং বৃদ্ধসেবয়া॥ অনু ১৬২।৪৯

নৈতিক উপদেশবহুল অধ্যায়—যযাত্যুপাখ্যান, আদি ৮৫তম ও ৮৯তম অঃ। নারদপ্রশ্ন, সভা ৫ম অঃ। দুর্যোধনসন্তাপ, সভা ৫৫শ অঃ। বিদুরহিতবাক্য, সভা ৬২তম ও ৬৪তম অঃ। যুধিষ্ঠিরশৌনকসংবাদ, বন ২য় অঃ। দ্রৌপদীযুধিষ্ঠিরসংবাদ, বন ২৯শ ও ৩০শ অঃ। অজগরপর্ব্ব, বন ১৮১তম অঃ। মার্কণ্ডেয়-সমাস্যা, বন ১৯৩তম ও ১৯৯তম অঃ। দ্বিজব্যাধসংবাদ, বন ২০৬তম—২০৮তম অঃ। যক্ষযুধিষ্ঠিরসংবাদ, বন ৩১২তম অঃ। বিদুরবাক্য, উ ৩৩শ-৪১শ অঃ ও ৬৪তম অঃ। যুধিষ্ঠির-বাক্য, উ ৭২তম অঃ। বিদুর-শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদ, উ ৯২তম অঃ। শ্রীকৃষ্ণবাক্য, উ ৯৫তম অঃ। বিদুলাবাক্য, উ ১৩৩তম ও ১৩৪তম অঃ। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ, কর্ণ ৬৯তম অঃ। ধৃতরাষ্ট্রাশ্বাসন, স্ত্রী ২য় অঃ। ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদন, স্ত্রী ৩য় ও ৭ম অঃ। বিদুরবাক্য, স্ত্রী ৯ম অঃ। অর্জ্জুনবাক্য, শা৷ ৮ম ও ১৫শ অঃ। ভীমবাক্য, শা৷ ১৬শ অঃ। দেবস্থানবাক্য, শা৷ ২১শ অঃ। ব্যাসবাক্য, শা৷ ২৩শ অঃ। সেনজিদুপাখ্যান, শা৷ ২৫শ অঃ। যুধিষ্ঠিরবাক্য, শা৷ ২৬শ অঃ। ব্যাসবাক্য, শা৷ ২৭শ অঃ ২৮শ অঃ। সত্যানৃতবিভাগ, শা৷ ১০৯তম অঃ। দুর্গাতিতরণ, শা৷ ১১০তম অঃ। ব্যাঘ্র-গোমায়ুসংবাদ, শা৷ ১১১তম অঃ। উষ্ট্রগ্রীবোপাখ্যান, শা৷ ১১২তম অঃ। সরিৎসাগরসংবাদ, শা৷ ১১৩তম অঃ। ঋষিসংবাদ, শা৷ ১১৬তম ও ১১৭তম অঃ। শীলবর্ণন, শা৷ ১২৪তম অঃ। শাকুলোপাখ্যান, শা৷ ১৩৭তম অঃ। মার্জ্জারমুষিক-সংবাদ, শা৷ ১৩৮তম অঃ। ব্রহ্মদত্তপূজনীসংবাদ, শা৷ ১৩৯তম অঃ। পবনশাল্মলি-সংবাদ, শা৷ ১৫৭ তম অঃ। সত্যপ্রশংসা, শা৷ ১৬২ তম অঃ। কৃতঘ্নোপাখ্যান, শা৷ ১৭২ তম অঃ। ব্রাহ্মণসেনজিৎসংবাদ, শা৷ ১৭৪ তম অঃ। পিতাপুত্র-সংবাদ, শা৷ ১৭৫ তম অঃ। শম্পাকগীতা, শা৷ ১৭৬ তম অঃ। বোধ্যগীতা, শা৷ ১৭৮ তম অঃ। শৃগালকাশ্যপসংবাদ, শা৷ ১৮০ তম অঃ। ভীষ্মযুধিষ্ঠির-সংবাদ, শা৷ ১৯৩ তম অঃ। বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম্য, শা৷ ২১৪ তম অঃ। অমৃতপ্রাশ্নিক, শা৷ ২২১ তম অঃ। শ্রীবাসবসংবাদ, শা৷ ২২৮ তম অঃ। শুকানুপ্রশ্ন, শা৷ ২৪২ তম অঃ। চিরকারিকোপাখ্যান, শা৷ ২৬৫ তম অঃ। শ্রেয়োবাচিক, শা৷ ২৮৭ তম অঃ। পরাশরগীতা, শা৷ ২৯২ তম ও ২৯৮ তম অঃ। শা৷ ৩২৯ তম অঃ। কর্ম্মফলিকোপাখ্যান, অনু ৭ম অঃ। শ্রীরুক্মিণীসংবাদ, অনু ১১শ অঃ। বহুপ্রাশ্নিক, অনু ২২শ অঃ। বিসস্তৈন্যোপাখ্যান, অনু ৯৩ তম অঃ। শপথবিধি, অনু ৯৪ তম অঃ। আয়ুষাখ্যান, অনু ১০৪ তম অঃ। উমামহেশ্বরসংবাদ, অনু ১৪১ তম—১৪৫ তম অঃ। গুরুশিষ্যসংবাদ, অশ্ব ৪৩শ অঃ।

যুদ্ধ

'মহাভারত' মহাযুদ্ধের ইতিহাস—বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ বলেন, ভরতবংশীয় বীরগণের মহাযুদ্ধের ইতিহাস যে গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই নাম 'মহাভারত'। গ্রন্থকর্ত্তা ব্যাসদেবের অভিমত অন্যরূপ। তিনি মহাভারতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব (গুরুত্ব) বুঝাইবার নিমিত্ত 'মহাভারত'-সংজ্ঞা প্রয়োগ করিয়াছেন।[১] যাহাই হউক না কেন, মহাযুদ্ধের ঘটনাকে সূত্ররূপে ধরিয়াই মহাভারতের অধ্যায়সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'[২] এই মূলসূত্রের বৃত্তি, ভাষ্য ও বার্ত্তিকরূপে এই মহাগ্রন্থের প্রকাশ। অধর্ম্ম পথের শেষ পরিণাম 'সমূলস্তু বিনশ্যতি'।[৩]

যে মহাসংগ্রামের ইতিহাসরূপে মহাভারতের রচনা, সেই সংগ্রামের নিয়ম-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে ক্ষত্রিয়জাতি দেশের শাসক ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন সমাজের বাহুস্বরূপ। দেশ-রক্ষা করা ও আপদবিপদ হইতে সমাজকে রক্ষা করা রাজধর্ম্মের অন্তর্গত। শৌর্য্যবীর্য্যে বলীয়ান্ ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় আবশ্যক হইলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শস্ত্রহস্তে দাঁড়াইতে লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ বাধ্য ছিলেন।

সাম্রাজ্যলিপ্সায় যুদ্ধ—যুদ্ধবিগ্রহ সমাজ এবং ধর্ম্মস্থিতির পক্ষে অনেক সময়েই অপরিহার্য্য। কিন্তু এমনও অনেক যুদ্ধ বাঁধিত, যেগুলির উদ্ভব কেবল সাম্রাজ্য-লিপ্সা হইতে। পুরুরবার দিগ্বিজয়, পাণ্ডুর দিগ্বিজয় এবং পাণ্ডব ও কর্ণের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য ধর্ম্মরক্ষা বা সমাজশাসন নহে, শুধু রাজ্যবিস্তার ও ধনরত্ন আহরণের নিমিত্তই সেইসকল অভিযান। যে মহাযুদ্ধের ইতিহাস মহাভারতে বর্ণিত, সেই যুদ্ধের মূলেও স্পর্দ্ধিত দুর্য্যোধনের অন্যায় সাম্রাজ্যলিপ্সা। দুর্য্যোধনের অন্যায় ভোগলিপ্সা না থাকিলে কিছুতেই সেই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইত না।[৪]

---

১ সংগ্রামে প্রয়োজনযোদ্ধৃভ্যঃ। পাণিনি ৪।২।৫৬। দ্রঃ কাশিকাবৃত্তি।
মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে। আদি ১।২৭৪

২ উ ৩৯।৯। ভী ২১।১১। স্ত্রী ১৪।৯

৩ মনু ৪।১৭৪

৪ আদি ১১৩ তম অঃ। সভা ২৫শ—৩২শ অঃ। বন ২৫৩ তম অঃ। শা ৫ম অঃ।

ধর্ম্ম্য যুদ্ধ—যুদ্ধে সাধারণতঃ এক পক্ষ অন্যায়-পথেই থাকেন। উভয় পক্ষ ন্যায়পথে চলিলে যুদ্ধই ঘটিতে পারে না। যদি শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ-কল্পে কোন পক্ষ যুদ্ধে উপস্থিত হইতে বাধ্য হন, তবে সেই যুদ্ধকেই ধর্ম্ম্য যুদ্ধ বলা যাইতে পারে।

পাণ্ডবদের ন্যায়ানুবর্ত্তিতা—মহাভারতের মহাযুদ্ধেও পাণ্ডবগণ ন্যায়-পথে ছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াও তাঁহারা অগত্যা পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গর্ব্বিত দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র-মাত্র ভূমিও প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হওয়ায় কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়।

যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর—ধর্ম্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়জাতিকে প্রোৎসাহিত করিবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে, বিছানায় পড়িয়া নিতান্ত দুর্গত রোগীর মত মারা গেলে ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্ম হইবে। ক্ষত্রিয়কে বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তবেই তাঁহার জীবন সার্থক।[৫]

অনন্যোপায় হইলে যুদ্ধ কর্ত্তব্য—অন্যায়কারী প্রতিপক্ষকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আপনার শক্তিসামর্থ্যের বিবেচনা করিয়া সুনিপুণ পাত্রমিত্রের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয়।[৬]

যুদ্ধবিদ্যায় ভরদ্বাজের জ্ঞান—অতি প্রাচীন কালে ভরদ্বাজমুনি যুদ্ধবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন।[৭]

যুদ্ধ অপেক্ষা সামাদির শ্রেষ্ঠতা—ভীষ্মপর্ব্বের নিমিত্তাখ্যান-অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, মেধাবী পুরুষ চতুরঙ্গ সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ সামের দ্বারা অথবা দানের দ্বারা প্রতিপক্ষকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে শত্রুদের মধ্যে পরস্পর ভেদের সৃষ্টি করিয়া শত্রুকে পরাভূত করিবেন। যুদ্ধ দ্বারা জয় করা অতিশয় জঘন্য। কারণ, প্রথমতঃ যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। দ্বিতীয়তঃ, জয় হইলেও যে ক্ষতি হয়, তাহা পূরণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যুদ্ধের জয়ও ক্ষয়েরই নামান্তর।

৫ অধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্যৈষ যচ্ছয্যামরণং ভবেৎ।
বিসৃজন্ শ্লেষ্মমূত্রাণি কৃপণং পরিদেবয়ন্। ইত্যাদি। শা ৯৭।২৩-২৫

৬ মন্ত্রোঽয়ং মন্ত্রিতো রাজন্ কুলৈরষ্টাদশাবরৈঃ। ইত্যাদি। সভা ১৪।৩৫। উ ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ অঃ।

৭ ভরদ্বাজো ধনুর্গ্রহম্। শা ২১০।২১

সেনানীতি-প্রকরণে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, "সামাদি উপায়ের মধ্যে যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। যুদ্ধে অনেক সময় দৈবের উপর নির্ভর করিতে হয়। যাঁহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান্, তাঁহারা কখনও উপায়ান্তর থাকিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষেরও অপরিসীম ক্ষতি হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, পাঁচ-সাতজন সংহত কৃতপ্রজ্ঞ পুরুষ অসংখ্যসেনা-বিশিষ্ট শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করিয়া ফেলেন। সুতরাং সাম, দান অথবা ভেদনীতির দ্বারা যদি অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে কখনও যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না"।[৮]

যুদ্ধপ্রারম্ভে উভয় পক্ষের সরলতা—যুদ্ধের প্রারম্ভেই দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠির যোদ্ধবেশ ত্যাগ করিয়া নগ্নপদে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ গুরুজনের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পাদবন্দনাপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। গুরুগণ আশীর্ব্বাদ করিয়া একবাক্যে বলিতেছেন, "রাজন্, আমরা দুর্য্যোধনের অর্থের দাসত্ব করিতেছি, এই কারণে তাঁহার পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য। কিন্তু হরি তোমার মন্ত্রী, জয় ত সুনিশ্চিত। ধর্ম্ম যেখানে, কৃষ্ণ সেখানে, আর কৃষ্ণ যেখানে জয় সেখানে"। দুই পক্ষের প্রধান পুরুষদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া আর্য্য, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সমাগত যোদ্ধগণ সকলেই সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদের ধর্ম্মপ্রবণতা উপলব্ধি করিয়া শত্রুপক্ষেরও চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়াছিল।[৯]

ধর্ম্ম্য যুদ্ধের নিয়ম—যুদ্ধের সময়ও সাধারণতঃ কোন শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘন করা অন্যায় বিবেচিত হইত। কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্যদল সমুপস্থিত। কুরুক্ষেত্র যেন ক্ষুভিত সাগরের মত গর্জ্জন করিতেছে। ঠিক সেই সময় কুরু, পাণ্ডব ও সোমকগণ মিলিত হইয়া যুদ্ধ সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। (ক) প্রত্যহ যুদ্ধের যখন নিবৃত্তি হইবে, তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতিভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। (খ) তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। (গ) যে কেবল বাগ্‌যুদ্ধ করিবে, তাহার সহিত বাক্য দ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে। (ঘ) যাহারা সেনাদল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে,

৮ সংকৃত্য মহতীং সেনাং চতুরঙ্গাং মহীপতে।
উপায়পূর্ব্বং মেধাবী যতেত সততোত্থিতঃ॥ ইত্যাদি। ভী ৩।৮০-৮৫
সম্ভৃত্য মহতীং সেনাং চতুরঙ্গাং যুধিষ্ঠির
সাম্নৈব বর্ত্তয়েঃ পূর্ব্বং প্রযতেথাস্ততঃ যুধি॥ ইত্যাদি। শা ১০২।১৬-২২

৯ ভী ৪৩ শ অঃ।

তাহাদিগকে কখনও বধ করিব না। (ঙ) রথীর সহিত রথী, গজারোহীর সহিত গজারোহী, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহী এবং পদাতির সহিত পদাতিকে যুদ্ধ করিতে হইবে। কখনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। (চ) প্রতিপক্ষের যোগ্যতা, উৎসাহ, বল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। এইসকল বিষয়ে যেন কোন অবিবেচনা না হয়। (ছ) প্রহারের সময় প্রতিপক্ষকে সম্বোধন করিয়া প্রহার করিতে হইবে। কার্য্যান্তরে লিপ্ত ব্যক্তিকে প্রহার করিতে নাই। (জ) বিশ্বস্ত বা বিহ্বল প্রতিপক্ষকে প্রহার করিতে নাই। (ঝ) অন্যের সহিত যুদ্ধে রত, প্রপন্ন, যুদ্ধবিমুখ, ক্ষীণশস্ত্র অথবা বিবর্ম্ম পুরুষকে প্রহার করিতে নাই। (ঞ) সূত, ধুর্য্য (হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি বাহন), শস্ত্রবাহী অথবা রণবাদককে কখনও প্রহার করিতে নাই।[১০] শান্তিপর্ব্বে আরও কতকগুলি নিয়ম কথিত হইয়াছে। (ক) যাহার শরীরে কবচ নাই, তাহার সহিত যুদ্ধ করা গর্হিত। (খ) এক-একজন করিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিতে হইবে। (গ) 'এই বাণ নিক্ষেপ করিলাম, এখন তুমি নিক্ষেপ কর' ইত্যাদি অবধান-বাক্য বলিয়া যুদ্ধ করিতে হয়। (ঘ) সন্নদ্ধের (বর্ম্মাদি দ্বারা সজ্জিত বা শ্রেণীবদ্ধ) সহিত সন্নদ্ধ এবং সসৈন্যের সহিত সসৈন্য পুরুষ যুদ্ধ করিবে। (ঙ) ধর্ম্মযোদ্ধার সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিবে, কূটযোদ্ধার সহিত কূটযুদ্ধ করিবে। (চ) বিভিন্নপ্রকারের যানে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে না। যুধ্যমান উভয়ের যান একজাতীয় হওয়া আবশ্যক। (ছ) বিষলিপ্ত অথবা বিপরীতমুখ বাণের দ্বারা যুদ্ধ করিতে নাই। (জ) দুর্ব্বলকে প্রহার করিতে নাই। (ঝ) অনপত্য ব্যক্তি বধার্হ নহে। (ঞ) ভগ্নশস্ত্র, ন্যস্তশস্ত্র, বিপন্ন, কৃত্তজ্য এবং হতবাহন ব্যক্তিকে বধ করিতে নাই। পরন্তু এরূপ বিপন্ন ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে স্বগৃহে প্রেরণ করা উচিত। (ট) যাহারা অভিজ্ঞ নহে, তাহাদের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রক্ষেপ করিতে নাই। ইহাই ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়ম। ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুও ভাল, কিন্তু পাপযুদ্ধে জয়ও শ্লাঘ্য নহে। যে ক্ষত্রিয় এইসকল রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্ম-উপায়ে জয়লাভ করে, সে নিজেই নিজেকে বধ করে, অর্থাৎ তাহার পরলোক নিতান্তই অন্ধকার।[১১]

১০ ততস্তে সময়ঞ্চক্রুঃ কুরুপাণ্ডবসোমকাঃ। ইত্যাদি। ভী ১।২৬-৩২

১১ নৈবাসন্নদ্ধকবচো যোদ্ধব্যঃ ক্ষত্রিয়ো রণে।

এক একেন বাচ্যশ্চ বিসৃজেতি ক্ষিপামি চ। ইত্যাদি। শা ৯৫।৭-১৭

সর্ব্বাবস্থায় অবধ্য—যুদ্ধে যাহাদিগকে বধ করা অনুচিত, বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধনীতির বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাহাদের বিষয় বলা হইয়াছে। যে-ব্যক্তি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করে, কখনও তাহাকে হত্যা করিতে নাই। বিরথ, বিপ্রকীর্ণ, এবং যাহার শস্ত্রাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে অবধ্য। স্ত্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধ যুদ্ধে অবধ্য।[১২] 'আমি তোমার দাস'—প্রতিপক্ষকে সর্ব্বসমক্ষে এই কথা যে বলিবে, তাহাকে অবশ্যই আশ্রয় দিতে হয়।[১৩] যে একমাত্র সন্তানের পিতা অথবা অপুত্রক তাহাকে বধ করিতে নাই।[১৪] ভীত, শরণাগত বা কৃতাঞ্জলি প্রতিপক্ষকে বধ করা রাক্ষসী নীতির অন্তর্গত।[১৫] কাহাকেও পশ্চাৎ দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া বধ করা উচিত নহে। যে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া অতিশয় বিনীতভাবে প্রতিপক্ষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাকে হনন করা অনুচিত।[১৬] প্রসুপ্ত, তৃষিত, শ্রান্ত, ভীত এবং যোদ্ধাদের পানভোজনাদির ব্যবস্থাপক কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে কখনও প্রহার করিতে নাই। ইহাদিগকে হনন করিলে কঠোর পাপের উৎপত্তি হয়।[১৭]

বিপন্নকে ক্ষমা করাই মহত্ত্ব—শ্রান্ত, ভীত, ভ্রষ্টশস্ত্র, বিপন্ন, কৃতাঞ্জলি প্রতিপক্ষকে আশ্রয় দেওয়াই বীর পুরুষের কাজ। বিপন্ন শত্রুকে হাতের

ব্রহ্মাস্ত্রেণ ত্বয়া দগ্ধা অনস্ত্রজ্ঞা নরা ভুবি।
যদেতদীদৃশং বিপ্র কৃতং কর্ম্ম ন সাধু তৎ ॥ দ্রো ১৮৯।৩৯

১২ যো বা নিপতিতং হন্তি তবাস্মীতি চ বাদিনম্।
তথা স্ত্রিয়ঞ্চ যো হন্তি বালং বৃদ্ধং তথৈবচ ॥ ইত্যাদি। বন ১৮।১৩, ১৪
অযুধ্যমানস্য বধস্তথা শত্রোশ্চ ভারত। ইত্যাদি। কর্ণ ৬৯।২৫, ২৬।
কর্ণ ৯০।১০৫, ১০৬

১৩ দাসোঽস্মীতি ত্বয়া বাচ্যং সংসৎসু চ সভাসু চ।
এবং তে জীবিতং দদ্যামেষ যুদ্ধজিতো বিধিঃ ॥ বন ২৭১।১১

১৪ নিক্ষিপ্তশস্ত্রে পতিতে বিমুক্তকবচধ্বজে। ইত্যাদি। ভী ১০৭।৭৭-৭৯

১৫ ন চাত্র শূরান্ মোক্ষ্যামি ন ভীতান্ন কৃতাঞ্জলীন্।
সর্ব্বানেব বধিষ্যামি রাক্ষসং ধর্ম্মমাস্থিতঃ ॥ দ্রো ১৭১।৬৫

১৬ বৃদ্ধবালৌ ন হন্তব্যৌ ন চ স্ত্রী নৈব পৃষ্ঠতঃ।
তৃণপূর্ণমুখশ্চৈব তবাস্মীতি চ যো বদেৎ ॥ শা ৯৮।৪৯

১৭ প্রসুপ্তাংস্তৃষিতান্ শ্রান্তান্ প্রকীর্ণান্নাভিঘাতয়েৎ। ইত্যাদি। শা ১০০।২৬-২৯

কাছে পাইয়াও যিনি ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ। বিজিত শত্রু শরণাগত হইলে তাহাকে পুত্রবৎ রক্ষা করা যথার্থ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম।।[১৮]

বিপক্ষকে উপযুক্ত শস্ত্রাদি-দান—নিরস্ত্রের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। বিপক্ষকে উপযুক্ত অস্ত্রাদি দিয়া পরে তাহার সহিত যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুমোদিত।[১৯]

সমান যানে থাকিয়া যুদ্ধ—একজাতীয় যান-বাহনে থাকিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ করার আদর্শ সর্ব্বত্র অনুসৃত না হইলেও বীর পুরুষদের মধ্যে মাঝে মাঝে তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রথারোহী যোদ্ধা পদাতির সহিত যুদ্ধ করাকে অসঙ্গত মনে করিতেন।[২০]

বিপরীত দৃষ্টান্ত (গজ ও রথ)—এক পক্ষ গজস্কন্ধে ও অপর পক্ষ রথোপরি থাকিয়া যুদ্ধ করার উদাহরণ দেখা যায়। অর্জ্জুন ও ভগদত্তের মধ্যে সেইরূপ যুদ্ধ চলিতেছিল। ভগদত্তের হাতী খুব ইঙ্গিতজ্ঞ এবং অসাধারণ চতুর ছিল।[২১] অপর পক্ষে সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে। সেই কারণেও বিভিন্ন প্রকারের যানে থাকিয়া যুদ্ধ করা অসম্ভব নহে। প্রত্যেকেই হয়ত আপন-আপন অভ্যাস ও সুবিধা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বোধ করি, হাতীর প্রাচুর্য্য ছিল। অশ্বমেধপর্ব্বে যজ্ঞাশ্বরক্ষক অর্জ্জুনের সঙ্গে ভগদত্ততনয় বজ্রদত্তের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। সেখানেও বজ্রদত্তের হাতীটির চতুরতা ও রণকৌশল বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[২২]

সঙ্কুল-যুদ্ধে নিয়ম-উল্লঙ্ঘন—পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলীর মধ্যে একটি নিয়ম আছে—'বাহন ও সারথিকে বধ করিতে নাই'। কিন্তু এই নিয়ম প্রায়ই

১৮ শ্রান্তং ভীতং ভ্রষ্টশস্ত্রম্। ইত্যাদি। শা ২৯৭।৪
বিশীর্ণকবচঞ্চৈব তবাস্মীতি চ বাদিনম্।
কৃতাঞ্জলিং ন্যস্তশস্ত্রং গৃহীত্বা ন বিহিংসয়েৎ। ইত্যাদি। শা ৯৬।৩। শা ২২৭।২৩।
সভা ৫।৫৫

১৯ আমুঞ্চ কবচং বীর মূর্দ্ধজান্ যময়স্ব চ।
যচ্চান্যদপি তে নাস্তি তদপ্যাদৎস্ব ভারত। ইত্যাদি। শল্য ৩২।৬০। সভা ২১।২৪

২০ ভূমিষ্ঠং নোৎসহে যোদ্ধুং ভবন্তং রথমাস্থিতঃ। উ ১৮১।২

২১ ভগদত্তো গজস্কন্ধাৎ কৃষ্ণয়োঃ স্যন্দনস্থয়োঃ। দ্রো ২৮।৩
তমাপতন্তং দ্বিরদং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধমিবান্তকম্। ইত্যাদি। দ্রো ২৭।২৮। দ্রো ২৫ শ অঃ।

২২ অশ্ব ৭৫ তম অঃ।

প্রতিপালিত হয় নাই। অর্জ্জুনের মত বীর পুরুষও ভগদত্ত এবং বজ্রদত্তের সহিত যুদ্ধে প্রথমতঃ তাঁহাদের বাহনকে বধ করিয়াছিলেন। সারথিহত্যার উদাহরণ সঙ্কুলযুদ্ধে অসংখ্য। সঙ্কুলযুদ্ধে উল্লিখিত নিয়মের অনেকগুলিই লঙ্ঘিত হইয়াছে। যখন দুইপক্ষে অসংখ্য যোদ্ধা সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন, তখন প্রত্যেকের পরিচয় লইয়া বা সম্বোধন করিয়া অস্ত্রক্ষেপ কখনও সম্ভবপর হয় না।

রাত্রিতে যুদ্ধ—আবশ্যকবোধে রাত্রিকালেও যুদ্ধ করা হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৩]

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দুর্নীতি—সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামার পৈশাচিক প্রতিহিংসা-সাধন, সপ্তরথিপরিবেষ্টিত অভিমন্যুর বধ, ছলপূর্ব্বক কূটনীতির আশ্রয় লইয়া অন্যায় উপায়ে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের বধ প্রভৃতি স্থূল ঘটনাগুলি উল্লিখিত নিয়মাবলীর অত্যন্ত প্রতিকূল। ধর্ম্মযুদ্ধের কোন নিয়মের দ্বারা এইসকল অন্যায়ের সমর্থন করা চলে না। এতদ্ব্যতীত ছোটখাট অন্যায়ের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। দুর্য্যোধন, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ প্রভৃতির বধেও সাধুতা সম্যক্ রক্ষিত হয় নাই।

আদর্শস্খলন—সকল যুগেই দেখিতে পাই, মানুষের আদর্শ ও ব্যবহারে যেন সম্পূর্ণ মিল থাকে না। যে উচ্চ চিন্তা হইতে আদর্শের সৃষ্টি, কার্য্যকালে সেই চিন্তাকে স্থান দেওয়া দুষ্কর। অনেক আদর্শ পুরুষও সকল সময় অবিচলিত থাকিতে পারেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরপুরুষগণও সময়-সময় দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। তথাপি এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে, যুদ্ধের আরম্ভে স্থিরীকৃত নিয়মগুলি কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধাদের যথার্থ বীরত্ব ও উদারতার পরিচায়ক এবং সেইকালের সমাজ-সভ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন। অধিকাংশ স্থলেই আদর্শ রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষের আক্রমণে সময়-সময় স্খলন ঘটিয়াছে।

প্রাত্যহিক যুদ্ধের শেষে পরস্পরের মিত্রতা হয় নাই—প্রাত্যহিক যুদ্ধ বিরামের পর পরস্পরের মধ্যে প্রীতিভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইত, এরূপ উদাহরণ পাই নাই, বরং তাহার বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টম দিনের যুদ্ধাবসানে দুর্য্যোধন বিশেষ পরামর্শের নিমিত্ত ভীষ্মের শিবিরে যাত্রা

২৩ দ্রো ১৫২ তম ও ১৬০ তম অঃ।

করেন। প্রসিদ্ধ বীরপুরুষগণ তাঁহার রক্ষকরূপে অনুগমন করিয়াছিলেন।[২৪] এই বর্ণনা হইতে অনুমিত হয়, প্রীতি ত দূরের কথা, একটু অসতর্ক হইলেই গুপ্ত শত্রুর হাতে প্রাণনাশের ভয় ছিল।

তিন বৎসর-ব্যাপক যুদ্ধ (চিত্রাঙ্গদ ও গন্ধর্ব্ব)—যে-সকল যুদ্ধের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে শান্তনুপুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং গন্ধর্ব্ব চিত্রাঙ্গদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল-ব্যাপক। তিন বৎসর কাল সেই যুদ্ধ চলিয়াছিল।[২৫]

যুদ্ধযাত্রায় শুভ মুহূর্ত্ত—শুভ তিথি ও নক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রার বিধান। 'সেনা-নীতিকথন'-প্রকরণে ভীষ্ম বলিয়াছেন, যিনি সেনানীতি সম্যক্ অবগত হইয়া প্রশস্ত তিথি-নক্ষত্রে ব্রাহ্মণাদি গুরুজনের আশিস্ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে যাত্রা করেন, তাঁহার জয় সুনিশ্চিত।[২৬]

জয়িনী সেনার লক্ষণ—বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ ব্যক্তি দৈব প্রকুপিত হইলে অথবা মনুষ্য হইতে ভয়ের আশঙ্কা থাকিলে পূর্ব্বেই অশুভ লক্ষণাদির দ্বারা বুঝিতে পারেন। এই নিমিত্ত বিচক্ষণ দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতের প্রয়োজন। ভাবী দুরদৃষ্ট নাশের নিমিত্ত জপ, হোম এবং নানাবিধ মঙ্গল অনুষ্ঠান করা উচিত। যে সেনাদলে যোদ্ধগণের অন্তঃকরণ খুব প্রফুল্ল থাকে এবং বাহন-গুলিকেও প্রসন্ন দেখায়, সেই পক্ষে নিশ্চয়ই জয় হইয়া থাকে। বায়ু যদি অনুকূল হয় এবং ইন্দ্রধনু, সূর্য্যরশ্মি ও মেঘ যদি পিছনের দিকে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, লক্ষণ শুভ। শৃগাল ও গৃধ্রগণ আনন্দের সহিত বিচরণ করিতে থাকিলে জয়ের সূচক চিহ্ন বলিয়া জানিবে। আহুতির মেধ্য গন্ধ এবং শঙ্খাদির গম্ভীর নিনাদ জয়ের সূচক। শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাদির অনুকূলতা জয়ের সূচক। বলবান্ অপেক্ষাও কৃতী পুরুষেরই জয়ের আশা বেশী। সপ্তর্ষি-

২৪ আত্তশস্ত্রাশ্চ সুহৃদো রক্ষণার্থং মহীপতেঃ। ভী ৯৭।২৫

২৫ তয়োর্ব্বলবতোস্তত্র গন্ধর্ব্বকুরুমুখ্যয়োঃ।
নদ্যাস্তীরে সরস্বত্যাঃ সমাস্তিস্রোঽভবদ্রণঃ॥ আদি ১০১।৮

২৬ এবং সঞ্চিন্ত্য যো যাতি তিথিনক্ষত্রপূজিতঃ।
বিজয়ং লভতে নিত্যং সেনাং সম্যক্ প্রযোজয়ন্॥ শা ১০০।২৫
নির্যযৌ চ মহেষ্বাসো নক্ষত্রে শুভদৈবতে।
শুভে তিথৌ মুহূর্ত্তে চ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ॥ ইত্যাদি। বন ২৫২।২৮, ২৯

মণ্ডলকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া যুদ্ধ করা ভাল। বায়ু, সূর্য্য এবং শুক্র গ্রহের আনুকূল্য জয়ের সূচনা করে।[২৭]

যুদ্ধের উৎকৃষ্ট কাল—চৈত্র এবং অগ্রহায়ণ মাস যুদ্ধযাত্রায় প্রশস্ত। শস্য তখন পরিপক্ক হয়, জলেরও অভাব থাকে না (?), বিশেষতঃ সেই সময় নাতিশীতোষ্ণ।[২৮]

মহাভারতের যুদ্ধের সময়—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অগ্রহায়ণ মাসে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কার্ত্তিকমাসে রেবতীনক্ষত্রে দৌত্যকর্ম্মে হস্তিনায় যাত্রা করেন।[২৯] সেখান হইতে ফিরিবার সময় কর্ণকে বলিলেন, "তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে বলিবে, এই মাসে তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি ভাল পাওয়া যায়, মাসটি সৌম্য, এই শিশিরকাল নাত্যুষ্ণ এবং নিষ্পঙ্ক, জল এই সময়ে রসবৎ ও নির্ম্মল, লতাগুল্মে বনরাজি পরিপূর্ণ, সর্ব্বপ্রকারের ফল, ফুল ও ওষধি এই সময়ে প্রচুর পাওয়া যায়। আজ হইতে সপ্তম দিবসে অমাবস্যাতিথি, সেই শক্রদেবতার তিথিতেই যুদ্ধ আরম্ভ হউক"।[৩০]

যুদ্ধের আয়োজন—প্রথমতঃ উভয় পক্ষ মিলিতভাবে যুদ্ধের স্থান নির্ব্বাচন করিতেন। নির্ব্বাচিত স্থানে দুইপক্ষের সৈন্য, যান, বাহন, অস্ত্রশস্ত্র এবং অপরাপর রণসম্ভার সংগ্রহ করা হইত। প্রত্যেক প্রসিদ্ধ বীর পুরুষের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ শিবির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী জমা করা হইত। কোন জিনিষের যেন অভাব না হয়, এমনভাবে আয়োজন করিতে প্রত্যেক পক্ষেরই সতর্ক দৃষ্টি থাকিত।

যুদ্ধশিবিরে শিল্পীর স্থান—উপযুক্ত শিল্পিগণকে বেতন দিয়া সেখানে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইত। শিবির প্রভৃতির কাজে শিল্পীরা সকল সময়ে ব্যস্ত থাকিতেন।

বৈদ্য—শাস্ত্রবিশারদ চিকিৎসকগণ যাহাতে নিরুদ্বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত

---

২৭ দৈবে পূর্ব্বং প্রকুপিতে মানুষে কালচোদিতে। ইত্যাদি। শা ১০২।৩-১৫
সপ্তর্ষীন্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা যুধ্যেয়ুরচলা ইব। ইত্যাদি। শা ১০০।১৯, ২০
কৃত্তী রাজন্ বিশিষ্যতে। শল্য ৩৩।৮

২৮ চৈত্র্যাং বা মার্গশীর্ষ্যাং বা সেনাযোগঃ প্রশস্যতে। ইত্যাদি। শা ১০০।১০-১২

২৯ কৌমুদে মাসি রেবত্যাং শরদন্তে হিমাগমে। উ ৮৩।৭

৩০ ব্রূয়াঃ কর্ণ ইতো গত্বা দ্রোণং শান্তনবং কৃপম্।
সৌম্যোঽয়ং বর্ত্ততে মাসঃ সুপ্রাপযবসেন্ধনঃ। ইত্যাদি। উ ১৪২।১৬-১৮

এবং পীড়িতদের চিকিৎসা করিতে পারেন, সেইউদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক বিচক্ষণ চিকিৎসককে যুদ্ধভূমির নিকটেই বাস করিবার স্থান দেওয়া হইত। তাঁহারা উপযুক্ত অর্থ পাইয়া রণক্ষেত্রে চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিতেন।[৩১]

সূত-মাগধাদির স্থান—সূত, মাগধ, চারণ, গণিকা, গুপ্তচর প্রভৃতিকেও যুদ্ধভূমির নিকটেই স্থান দেওয়া হইত। পক্ষের প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের দেখাশোনা করিতেন।[৩২]

সংগৃহীত দ্রব্য—রণক্ষেত্রে যে-সব বস্তুর আমদানি করা হইত, তাহারও একটা সংক্ষিপ্ত ফর্দ্দ উদ্যোগপর্ব্বে পাওয়া যায়। দুরাধর্ষ প্রভৃত কাষ্ঠ, নানা-প্রকারের ভক্ষ্য ও পেয় অন্নপানাদি, মধু, ঘৃত, পর্ব্বতপ্রমাণ সর্জ্জরসমিশ্রিত পাংশু, ঘাস তুষ অঙ্গার প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেক শিবিরেই প্রচুর পরিমাণে রাখা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া রথ, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি বাহন এবং যতপ্রকারের বর্ম্ম ও শস্ত্র সেই সময়ে ব্যবহৃত হইত, তাহার আয়োজনে একটুও ত্রুটি ছিল না।[৩৩]

যাত্রাকালে ব্রাহ্মণের পূজা প্রভৃতি—অর্চ্চনাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে গো, নিষ্ক প্রভৃতি দ্রব্য দান করিয়া বীরেরা যুদ্ধযাত্রা করিতেন। যাত্রার সময় সমাগত ব্রাহ্মণগণ জয় এবং আশিস্‌সূচক মন্ত্র পাঠ করিতেন।[৩৪]

স্বস্ত্যয়ন—ঋত্বিক্‌গণ যজমানের যুদ্ধযাত্রার সময় নানাবিধ জপ্যমন্ত্র এবং মহৌষধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিতেন। যজমান নৃপতিও ব্রাহ্মণগণকে ফল, পুষ্প, বস্ত্র, গো ও নিষ্ক দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন।[৩৫]

অর্জ্জুনপঠিত দুর্গাস্তব—যুদ্ধের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন ভগবতী শ্রীদুর্গার স্তোত্র পাঠ করেন। অর্জ্জুনের স্তবে প্রসন্ন হইয়া ভগবতী অন্তরীক্ষ হইতে তাঁহাকে শত্রুজয়ের বর দিয়া অন্তর্হিতা হন।[৩৬]

৩১ উ ১৫১ তম ও ১৯৭ তম অঃ।

৩২ যে চান্যেঽনুগতাস্তত্র সূতমাগধবন্দিনঃ।
বণিজো গণিকাশ্চারা যে চৈব প্রেক্ষকা জনাঃ॥ ইত্যাদি। উ ১৯৭।১৮, ১৯

৩৩ জ্যাধনুর্ব্বর্ম্মশস্ত্রাণাং তথৈব মধুসর্পিষোঃ। ইত্যাদি। উ ১৫১।৮৪-৮৭

৩৪ বাচয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ গোভির্নিষ্কৈশ্চ ভূরিশঃ। উ ১৫৫।৩২

৩৫ জপ্যৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ মহৌষধীভিঃ সমন্ততঃ স্বস্ত্যয়নং ব্রুবন্তঃ। ইত্যাদি। ভী ২২।৭,৮

৩৬ ভী ২৩ শ অঃ।

অস্ত্রাধিবাস—যুদ্ধ-প্রারম্ভে গন্ধাদি দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রের অধিবাসন করা হইত, বীরগণ রক্ষাবন্ধন-পূর্ব্বক স্বস্তিমন্ত্র পাঠ করিতেন।[৩৭]

ত্রৈয়ম্বক-বলি—বিশেষ শক্ত প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রিতে 'ত্রৈয়ম্বকবলি'-নামে একপ্রকার উপহার দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইত। সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায়, ত্র্যম্বকের (মহাদেবের) উদ্দেশেই বলি নিবেদন করা হইত। জয়দ্রথের সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে অর্জ্জুন এই অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া সেই নৈশ উপহারটি তাঁহাকেই নিবেদন করিয়াছিলেন।[৩৮]

রথাভিমন্ত্রণ—বিশেষ-বিশেষ যুদ্ধে রথকেও অভিমন্ত্রিত করা হইত। মন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলেও বলা হইয়াছে যে, অভিমন্ত্রণের মন্ত্র ছিল—জৈত্র সাংগ্রামিক, অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পক্ষে অনুকূল।[৩৯]

শঙ্খনিনাদ ও রণবাদ্য—সজ্জিত বীর পুরুষগণ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই শঙ্খধ্বনি করিতেন। ভীষণ শঙ্খধ্বনিতে স্বপক্ষের আনন্দ হইলেও বিপক্ষের ত্রাসের সঞ্চার করিত। ভেরী, পণব, আনক, মৃদঙ্গ, দুন্দুভী, ক্রকচ (ক্রকচ) মহানক, ঝর্ঝর, পেশী, গোবিষাণ, পুষ্কর, মুরজ, ডিণ্ডিম প্রভৃতি তাৎকালিক রণবাদ্য। প্রত্যেক সেনাদলের সঙ্গে-সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড চলিত। সূত, মাগধ, বন্দী, গায়ক ও বাদকগণ উপযুক্ত বেতন পাইয়া রণভূমিকে গীত-বাদ্যে মুখরিত করিয়া তুলিতেন। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে রণবাদ্য অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত।[৪০]

শূরগণের শঙ্খপ্রীতি—উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে শঙ্খই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে তাহার রূপ শান্ত ও কল্যাণ, আবার রণক্ষেত্রে বীরের হাতে পড়িলে তাহার মূর্ত্তি রুদ্রভৈরব। প্রত্যেক শূর পুরুষ শঙ্খবাদ্যে উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে বোধ হয়, তাঁহারা

৩৭ অধিবাসিতশস্ত্রাশ্চ কৃতকৌতুকমঙ্গলাঃ। উ ১৫১।৩৮
গন্ধমাল্যার্চ্চিতং শরম্। দ্রো ১৪৪।১১২

৩৮ ত্রৈয়ম্বকং বলিম্। ইত্যাদি। দ্রো ৭৭।৩,৪

৩৯ জৈত্রৈঃ সাংগ্রামিকৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পূর্ব্বমেব রথোত্তমম্।
অভিমন্ত্রিতমর্চ্চিষ্মানুদয়ং ভাস্করো যথা॥ দ্রো ৮২।১৬

৪০ আদি ২২০।১১। ভী ২৪।৬। ভী ৪৩।৮,১০৩। ভী ৫১।২৩। ভী ৫৮।৪৬।
ভী ৯৯।১৭-১৯। দ্রো ৬৮।৩১। কর্ণ ১১।৩৬। শা ১০২।৯

বিশেষ উত্তেজনা অনুভব করিতেন। অনেকেরই শঙ্খের এক-একটা সংজ্ঞা ছিল। কৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয়ের দেবদত্ত, বৃকোদরের পৌণ্ড্র, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, নকুলের সুঘোষ, সহদেবের মণিপুষ্পক। ভীষ্ম, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রমুখ বীরপুরুষদের শঙ্খরুচিও যথেষ্ট ছিল। কুরুক্ষেত্রের রণভূমি মুহুর্মুহুঃ শঙ্খনাদে প্রকম্পিত।[৪১]

যুদ্ধের পরিচ্ছদ—বীরদের পোশাকপরিচ্ছদের বিস্তৃত বর্ণনা না থাকিলেও পরিধানে ধুতিই থাকিত এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু সেই ধুতির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বা অন্য কোন নমুনার সন্ধান পাওয়া যায় না। বিরাটপুরীতে কৌরবদের সহিত যুদ্ধের সময় অর্জ্জুনের পরিধানে লাল রংএর একজোড়া কাপড় ছিল।[৪২]

মাল্যচন্দন—শূরগণ মাল্যচন্দনে বিভূষিত হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিতেন। তাঁহাদের মাল্যচন্দনের সুগন্ধ রণভূমিকে আমোদিত করিয়া রাখিত।[৪৩]

গোধাঙ্গুলিত্রাণ—জ্যার আঘাত বারণের নিমিত্ত যোদ্ধৃগণ অঙ্গুলিত্রাণ ব্যবহার করিতেন। সম্ভবতঃ প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত ঢাকা থাকিত, কারণ বাণ নিক্ষেপের সময় প্রকোষ্ঠেই জ্যার আঘাত বেশী লাগিবার আশঙ্কা। গোধার চামড়া দিয়া সেই অঙ্গুলিত্রাণ প্রস্তুত করা হইত।[৪৪]

তনুত্রাণ বা কবচ—সকল যোদ্ধাই তনুত্রাণ ব্যবহার করিতেন। শরীর কবচে আবৃত না করিয়া শস্ত্রযুদ্ধে কখনও উপস্থিত হইতেন না। বহু স্থানে কবচের উল্লেখ করা হইয়াছে। বিরাটের রণযাত্রাবর্ণনায় বহুবিধ তনুত্রাণের কথা শুনিতে পাই। কবচগুলি অতিশয় উজ্জ্বল, বিচিত্র এবং বজ্রায়সগর্ভ,

৪১ তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্। ইত্যাদি। ভী ২৫।১২-১৯।
ভী ৫১।২২-২৯
ততঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ স দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্। বি ৫৩।২৩

৪২ বস্ত্রাণ্যুপাদায় মহারথানাং তূর্ণং পুনস্তত্রথমারুরোহ। ইত্যাদি। বি ৬৬।১৫। বি ৬৯।১০,১৭
রক্তে চ বাসসী। বি ৩৮।৩১

৪৩ স্রজঃ সমাঃ সুগন্ধানামুত্তমাত্র সমুদ্ভবঃ। ভী ২৪।৪
আদায় রোচনাং মাল্যম্। ইত্যাদি। সভা ২৩।৪

৪৪ বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ কালিন্দীমভিতো যযুঃ। ইত্যাদি। বি ৫।১। আদি ১৩৪।২৩

উপরে সোণার কাজ করা। কোন কোন কবচের উপর ছোট ছোট স্বর্ণবিন্দু ঝলমল করিতেছে। কোন কোন কবচের উপর নানারকমের ছবি আঁকা।[৪৫]

লৌহবর্ম্মের বর্ণনা—কোন কোন বর্ম্ম লোহার নির্ম্মিত হইলেও সূর্য্য-কিরণের মত উজ্জ্বল ও সাদা-রংএর ছিল। বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, লোহার বর্ম্মই বেশী ব্যবহার করা হইত।[৪৬]

কবচধারণে মন্ত্রপাঠ—কেহ কেহ আচমনাদি দ্বারা শুচি হইয়া যথাবিধি মন্ত্র জপপূর্ব্বক কবচ ধারণ করিতেন। এইসকল কাজের সহিতও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মকে অচ্ছেদ্যরূপে দেখা বোধ হয়, তখনকার সমাজের আদর্শরূপে পরিগণিত ছিল।[৪৭]

অস্ত্রাদিপূর্ণ গরুর গাড়ী—বড় বড় যোদ্ধারা আপন-আপন সঙ্গে যে-সকল অস্ত্রাদি রাখিতেন, তাহা ছাড়াও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ অনেকগুলি গরুর গাড়ী তাঁহাদের অনতিদূরে রাখা হইত।[৪৮]

ধনুর্ব্বেদ চতুষ্পাদ ও দশাঙ্গ—যুদ্ধের বাহিনী, স্থান ও কালবিশেষে তাহার বিশেষ বিধান ইত্যাদি বিষয়ে মহাভারতের আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত। (কৌটিল্য, শুক্রনীতি, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়।) ধনুর্ব্বেদ চতুষ্পাদ এবং দশাঙ্গ। মূলে এই উক্তির কোন বিস্তৃতি নাই। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, দীক্ষা, শিক্ষা, আত্মরক্ষা এবং এই তিনের সাধন, ইহাই ধনুর্ব্বেদের পাদ। ব্রত, প্রাপ্তি, ধৃতি, পুষ্টি, স্মৃতি, ক্ষেপ, অরিভেদন, চিকিৎসা, উদ্দীপন এবং কৃষ্টি—এই দশটি তাহার অঙ্গ।[৪৯]

চতুরঙ্গ বাহিনী—যুদ্ধযাত্রায় চতুরঙ্গ বাহিনী সংগ্রহ করিতে হয়। রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি—এই চারিশ্রেণীর সেনাসমষ্টির পারিভাষিক সংজ্ঞা 'চতুরঙ্গ'। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে রথের প্রাধান্য ছিল। প্রত্যেক রথের সঙ্গে দশটি গজ, প্রত্যেক গজের সহিত দশটি অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের

---

৪৫ রাজানো রাজপুত্রাশ্চ তনুত্রাণাথ ভেজিরে। ইত্যাদি। বি ৩১।১০-১৪
অথ বর্ম্মাণি চিত্রাণি কাঞ্চনানি বহূনি চ। উ ১৫২।২১

৪৬ সুবর্ণপৃষ্ঠং সূর্য্যাভম্। ইত্যাদি। বি ৩১।১৫। কর্ণ ৮১।২৭

৪৭ আববন্ধাদ্ভুততমং জপন্মন্ত্রং যথাবিধি। দ্রো ৯২।৩৯

৪৮ অষ্টাগবামষ্টশতানি বাণান্ ময়া প্রযুদ্ধস্য বহন্তি তস্য। কর্ণ ৬৭।৬
অস্ত্যায়ুধং পাণ্ডবেয়াবশিষ্টং ন যদ্বহেচ্ছকটং ষড়্গবীয়ম্। কর্ণ ৭৬।১৫

৪৯ দশাঙ্গং যশ্চতুষ্পাদমিষ্বস্ত্রং বেদ তত্ত্বতঃ। শল্য ৬।১৪

সহিত দশজন পদাতি রক্ষকরূপে থাকিতেন। তাঁহাদের সংজ্ঞা 'পাদরক্ষক'। একখানি রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পঞ্চাশটি হাতী, প্রত্যেক হাতীর রক্ষার উদ্দেশ্যে একশত ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার রক্ষার নিমিত্ত সাতজন পদাতি থাকিতেন। পঞ্চাশজন সেনা একত্রিত হইলে, তাহাকে 'পত্তি' বলা হয়। (অমরকোষাদিতে এই গণনার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।) তিন পত্তিতে এক 'সেনামুখ', তিন সেনামুখে এক 'গুল্ম', তিন গুল্মে এক 'গণ'।[৫০]

সেনাপতি—এক-একজন সেনাপতির অধীনে এক-একটি সৈন্যদল গঠিত হইত। সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না। সেনাপতি না থাকিলে উৎকৃষ্ট সৈন্যেরাও জয়লাভ করিতে পারে না। যুদ্ধকুশল, শাস্ত্রজ্ঞ, শূর, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং দীর্ঘদর্শী পুরুষকে সেনাপতিত্বে বরণ করিতে হয়।[৫১]

সেনাপতিপতি—কয়েকজন সেনাপতির উপরে একজন বিচক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতে হয়, তাঁহার সংজ্ঞা "সেনাপতিপতি"।[৫২]

দলে দলে সেনাপতি—অন্যত্র বলা হইয়াছে, প্রত্যেক দশজন সৈন্যের অধ্যক্ষ হিসাবে এক-একজন সেনাপতি নিয়োগ করিতে হয়। এইরূপে একশত এবং এক হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষরূপে পুনরায় অপর সেনাপতি নিয়োগ করিতে হইবে। সাধারণ সেনাপতির বেতনের দ্বিগুণ বেতন তাঁহাকে দিতে হইবে।[৫৩]

রথের সারথি—রথের সারথি-নিয়োগও বিশেষ বিবেচনার কাজ। অনেক সময় আরোহী অপেক্ষা সারথির অধিকতর পটুতার আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে পাওয়ায় অর্জ্জুনের যে কত সুবিধা ঘটিয়াছিল, তাহা রণক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্রের মাতলি, কৃষ্ণের দারুক এবং অর্জ্জুনের কৃষ্ণের কথা সকলেই জানেন।

---

৫০ উ ১৫৪তম অঃ।

৫১ তাসাং যে পতয়ঃ সপ্ত বিখ্যাতাস্তান্নিবোধত। ইত্যাদি। উ ১৫১।৩। সভা ৫।৪৬। উ ১৫৫।১০

এতৈরেব গুণৈর্যুক্তস্তথা সেনাপতির্ভবেৎ। ইত্যাদি। শা ৮৫।৩১,৩২

৫২ সর্বেষামেব তেষান্তু সমস্তানাং মহাত্মনাম্।
সেনাপতিপতিঞ্চক্রে গুড়াকেশং ধনঞ্জয়ম্। উ ১৫৬।১৪

৫৩ দশাধিপতয়ঃ কার্য্যাঃ শতাধিপতয়স্তথা। ইত্যাদি। শা ১০০।৩১,৩২

সারথির গুরুপরম্পরা—সারথ্যকর্ম্মও গুরুপরম্পরায় শিক্ষণীয়। উত্তর অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "আমি গুরুর নিকট হইতে সারথ্য শিক্ষা করিয়াছি"।[৫৪]

সারথিকৃত যমকাদি মণ্ডল—কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধের সময় উত্তরের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শত্রুনিরোধক 'যমকমণ্ডল' দ্বারা হঠাৎ রথের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।[৫৫]

যাত্রা ও দুর্গবিধান—জলপূর্ণ এবং তৃণাচ্ছাদিত পথে সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী দুর্গে লইয়া যাইতে হয়, পথ বন্ধুর না হইয়া সমান হইলেই ভাল। যাত্রার পূর্ব্বে বনের পথঘাট বিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন চর সংগ্রহ করিবে। এক-একদল সেনার পুরোভাগে এক-একজন পথপ্রদর্শক থাকিবেন। দুর্গের নিকটে প্রচুর জল থাকা প্রয়োজন। বনভূমির নিকটস্থ উন্মুক্ত প্রান্তরে সেনানিবাস নির্ম্মাণ করা অনেকাংশে নিরাপদ।[৫৬]

স্থানবিশেষে সেনাযোগ—অকর্দ্দম, জলশূন্য এবং সেতুপ্রাকারাদিবিহীন শুষ্ক ভূমিতে অশ্বারোহী যোদ্ধাদের সুবিধা হয়। অকর্দ্দম এবং সমান ভূমি রথচালনায় প্রশস্ত। যে ভূমিতে ছোট ছোট গাছ এবং জল আছে, সেই ভূমিতে যুদ্ধ করা গজারোহীদের পক্ষে আরামপ্রদ। বেণুবেত্র-সমাকুল এবং বন্ধুর রণক্ষেত্র পদাতি সৈন্যের পক্ষে ভাল।[৫৭]

সময়বিশেষে সেনাযোগ—যে বাহিনীতে পদাতির সংখ্যা বেশী, সেই বাহিনী প্রশস্ত। কারণ রৌদ্র বা বৃষ্টিতে বাহনাদির অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিলেও সাহসী পদাতির ভয়ের কারণ নাই। বৃষ্টি না হইলে রথ এবং অশ্ববহুল বাহিনী পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ চালাইতে পারে। বর্ষাকালে গজবহুল বাহিনী প্রশস্ত।[৫৮]

---

৫৪ শিক্ষিতো হ্যস্মি সারথ্যে তীর্থতঃ পুরুষর্ষভ। বি ৪৫।১৮

৫৫ যমকং মণ্ডলং কৃত্বা তান্ যোধান্ প্রত্যবারয়ৎ। বি ৫৭।৪২

৫৬ জলবাংস্তৃণবান্মার্গঃ সমগমাঃ প্রশস্যতে। ইত্যাদি। শা ১০০।১৩-১৭

৫৭ অকর্দ্দমামনুদকামমর্য্যাদামলোষ্টকাম্। ইত্যাদি। শা ১০০।২১-২৩
তৃণাশ্মানং বাজিরথপ্রবাহাং ধ্বজদ্রুমৈঃ সংবৃতকূলরোধসম্।
পদাতিনাগৈর্বহুকর্দ্দমাং নদীং সপত্নাশে নৃপতিঃ প্রযোজয়েৎ॥ আশ্র ৭।১৪

৫৮ পদাতিবহুলা সেনা দৃঢ়া ভবতি ভারত। ইত্যাদি। শা ১০০।২৪,২৫

আক্রমণ-পদ্ধতি—অসিচর্ম্মযুক্ত পদাতি সেনাকে বাহিনীর পুরোভাগে স্থাপন করিবে, রথগুলি পশ্চাতে থাকিবে। যাঁহারা খুব শক্তিশালী, তাঁহারাই পদাতিরক্ষণে নিযুক্ত থাকিবেন। স্ত্রীলোকেরা পদাতি ও রথের মাঝখানে থাকিবেন। (এইরূপ উক্তির সার্থকতা ঠিক বুঝা গেল না, মহিলা সৈন্যবাহিনী ত কোথাও বর্ণিত হয় নাই।)[৫৯]

গুরুর সহিত যুদ্ধ—প্রয়োজন হইলে অস্ত্রবিদ্যার গুরুর সহিতও ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করিতেন। ভীষ্ম পরশুরামের সহিত[৬০] এবং অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আচার্য্য প্রথম বাণ নিক্ষেপ করিলে অর্জ্জুন প্রতিযুদ্ধ করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল। অর্জ্জুন সর্ব্বত্র আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন।[৬১] গুরুর সহিত ভীষ্ম এবং অর্জ্জুনের যুদ্ধে কোনপ্রকার অশিষ্টতা প্রকাশ পায় নাই।

আততায়ীর বধে পাপ হয় না—অর্থশাস্ত্রের অনুশাসনে দেখা যায়, আততায়ীকে বধ করিলে পাপ নাই। অগ্নিদ, গরদ, শস্ত্রপাণি, ধনাপহ, ক্ষেত্রাপহারী ও দারাপহারী, এই ছয়প্রকার ভীষণ শত্রুকে বলা হয় 'আততায়ী'। আততায়ী যদি নানাগুণে বিভূষিত বৃদ্ধ এবং সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠও হন, তথাপি তিনি বধ্য। যিনি শস্ত্রপাণি ক্ষত্রবন্ধু আততায়ী ব্রাহ্মণকে হত্যা করেন, তাঁহার কিছুমাত্র পাপ হয় না, ইহা ধার্ম্মিকদের অভিমত। ভার্য্যাহরণকারী এবং রাজ্যহর্ত্তা শত্রু শরণাগত হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিতে নাই। আততায়ী ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মাণসন্তান এবং বেদান্তবেত্তাও হন, তথাপি তিনি শস্ত্র লইয়া আক্রমণ করিলে তাঁহাকে ক্ষমা করিতে নাই। তাঁহাকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না।[৬২]

অর্জ্জুনের আশঙ্কা—আততায়ী বধের অনুকূলে এতগুলি বচন মহাভারতে

৫৯ অগ্রতঃ পুরুষানীকমসিচর্ম্মবতাং ভবেৎ। ইত্যাদি। শা ১০০।৪৩-৪৫

৬০ উ ১৮১ তম অঃ।

৬১ বি ৫৮ শ অঃ। দ্রো ৮৯ তম অঃ।

৬২ জ্যায়াংসমপি চেদ্ বৃদ্ধং গুণৈরপি সমন্বিতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদ্ ঘাতকমাত্মনঃ॥ ইত্যাদি। ভী ১০৭।১০১। বন ২৭০।৪৬। উ ১৭৯।২৮,২৯
প্রগৃহ্য শস্ত্রমায়ান্তমপি বেদান্তগং রণে।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ॥ ইত্যাদি। শা ৩৪।১৭-১৯

থাকিলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভে বিষণ্ণ অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, "এইসকল আততায়ীকে হনন করিলে আমাদের পাপই হইবে"।[৬৩]

সমাধান—ঐ বচনের টীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—আততায়িবধ অর্থ-শাস্ত্রের অনুমোদিত, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র তাহার প্রতিকূলে। সেইহেতু অর্জ্জুন পাপের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত শূলপাণি প্রায়শ্চিত্তবিবেকে কাত্যায়নের এক বচন উদ্ধৃত করিয়া অর্জ্জুনের বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। বচনের তাৎপর্য্য এই যে, হন্তা পুরুষ অপেক্ষা বিদ্যা, জাতি, কুল ইত্যাদিতে আততায়ী যদি শ্রেষ্ঠ হন, তবে তিনি বধার্হ নহেন।[৬৪]

অশ্বত্থামার মুক্তি—মহাভারতেরও ইহাই অভিপ্রায় বলিয়া অনুমিত হয়। সৌপ্তিকপর্ব্বে দেখিতে পাই, পৈশাচিক হত্যাকারী ব্রহ্মবন্ধু অশ্বত্থামাও একমাত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিয়াই বাঁচিয়া গেলেন।[৬৫]

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ—ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজন এবং দুর্য্যোধনাদি জ্ঞাতিকুলের বধে পাপের আশঙ্কা করিয়াই যুধিষ্ঠির কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উপদেশে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন।[৬৬]

জয় অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা প্রধান—যুদ্ধে জয়লাভ করাই পরম লাভ নহে। ধর্ম্মরক্ষাই যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আততায়ীর অবধ্যতাও তাহাই সমর্থন করে।[৬৭]

যুদ্ধকালে উপাসনাদি—যুদ্ধের সময়েও বীরপুরুষগণ উপাসনাদি অনুষ্ঠান যথানিয়মে পালন করিতেন। উপাসনার কাল উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষ কিছুক্ষণ যুদ্ধে বিরত থাকিয়া উপাসনা সারিয়া লইতেন।[৬৮]

শান্তিকাম ব্রাহ্মণ মধ্যস্থ হইলে যুদ্ধবিরতি—যুধ্যমান উভয় পক্ষের মাঝখানে কোন শান্তিকাম ব্রাহ্মণ আসিয়া দাঁড়াইলে তখনই যুদ্ধ বন্ধ

---

৬৩ পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ। ভী ২৫।৩৬

৬৪ আততায়িনি চোৎকৃষ্টে তপঃস্বাধ্যায়জন্মতঃ।
বধস্তত্র তু নৈব স্যাৎ পাপে হীনে বধো ভৃগুঃ॥ কাত্যায়ন-সংহিতা

৬৫ জিত্বা মুক্তো দ্রোণপুত্রো ব্রাহ্মণ্যাদ্ গৌরবেণ চ॥ সৌ ১৬।৩২

৬৬ অশ্ব ৬৯ অঃ।

৬৭ ধর্ম্মলাভাদ্ধি বিজয়াল্লাভঃ কোঽভ্যধিকো ভবেৎ। শা ৯৬।১১

৬৮ দিবাকরস্যাভিমুখং জপন্তঃ সন্ধ্যাগতাঃ প্রাঞ্জলয়ো বভূবুঃ॥ ইত্যাদি। দ্রো ১৮৫।৪৫,
দ্রো ১৮৬।১

করিতে হইত। ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিলে ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদার হানি ঘটে।[৬৯]

অস্ত্র-শস্ত্র—যুদ্ধে যে-সকল অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত, অনেক স্থানেই সেইগুলির নাম গৃহীত হইয়াছে। বিরাট, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্ব্বেই যুদ্ধের বর্ণনা। যে-সকল স্থানে বিশেষভাবে অস্ত্রাদির নাম গৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সূচী প্রদত্ত হইল।

আদি ১৯।১২-১৭। আদি ৩২।১২-১৪। আদি ১৩৯।৬। আদি ২২৭। ২৫। বন ১৫।৬-১০। বন ২০।৩৩,৩৪। বন ২১।২,২৫। বন ৪২।৪,৫। বন ১৬৯।১৫,১৬। বি ৩২।১০। বি ৪২ শ অঃ। উ ১৯।৩,৪। উ ১৫৪।৩-১২। ভী ১৬।৯। ভী ১৮।১৭। ভী ৪৬।১৩,১৪। ভী ৫৮।৩। ভী ৬১।২২। ভী ৭৬।৪-৬। দ্রো ১৩৬ তম ও ১৭৭ তম অঃ।

যে-সকল অস্ত্র-শস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, অকারাদিক্রমে সেইগুলির বিষয়ে আলোচনা করা হইতেছে।

অঙ্কুশ—লৌহময় অস্ত্রবিশেষ। হাতীকে চালাইবার নিমিত্ত ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধেও প্রয়োগ দেখা যায়।

অশ্মগুড়ক—বর্ত্তুলীকৃত পাষাণ। শত্রুর উপরে প্রক্ষেপ করা হয়।

অসির উৎপত্তি বিবরণ—শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত আছে যে, নকুল খড়্গযুদ্ধে বিশারদ ছিলেন। তিনি শরতল্পগত পিতামহকে খড়্গের উৎপত্তিবিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে ভীষ্ম বলিলেন, "ব্রহ্মা সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে নীলোৎপলাভ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, দুর্দ্ধর্ষতর অসির উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা সেই অসি ভগবান্ রুদ্রকে দান করিলেন। রুদ্র রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই অসি দ্বারা দানবকুল সংহারপূর্ব্বক পুনরায় শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন তিনি বিষ্ণুর হাতে অসিখানি তুলিয়া দেন। বিষ্ণু মরীচিকে, মরীচি ঋষিগণকে, ঋষিগণ বাসবকে, বাসব লোকপালগণকে, লোকপালগণ মনুকে, মনু ক্ষুপকে, এবং ক্ষুপ ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। এইভাবে গুরুপরম্পরায় দ্রোণাচার্য্য পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। আচার্য্য হইতে তোমরা তাহা পাইয়াছ"। অসির জন্মনক্ষত্র কৃত্তিকা, অধিপতি-দেবতা অগ্নি, গোত্র রোহিণী এবং গুরু

৬৯. অনীকয়োঃ সংহতয়োর্যদীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽন্তরা।
শান্তিমিচ্ছন্ন্ উভয়তো ন যোদ্ধব্যং তদা ভবেৎ॥ ইত্যাদি। শা ৯৬।৮-১০

রুদ্র। অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় এবং ধর্ম্মপাল—অসির এই আটটি নাম। অসির অপর নাম 'নিস্ত্রিংশ', অর্থাৎ অসির দীর্ঘতা ত্রিশ অঙ্গুলির অধিক।[৭০]

একুশ-প্রকার অসিসঞ্চালন—একুশপ্রকার সঞ্চালনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, সৃত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ। শুধু এই কয়েকটি সঞ্চালনের নাম গৃহীত হইয়াছে।[৭১] অন্যত্র খড়্গযুদ্ধের বর্ণনায় চতুর্দ্দশ মণ্ডলের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানেও ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত প্রভৃতি আটটি মণ্ডলের নামমাত্র দেখিতে পাই।[৭২]

অসির কোষ—গোচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম অথবা স্বর্ণাদিনির্ম্মিত কোষে অসি রাখা হইত। কোন কোন অসিতে সোণার কাজ করা থাকিত। পঞ্চনখ প্রাণীর চর্ম্মে নির্ম্মিত কোষে অসিস্থাপনের কথাও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গণ্ডার বা গোধার চামড়ায় কোষ নির্ম্মিত হইত।[৭৩]

ঋষ্টি—কাষ্ঠনির্ম্মিত দণ্ডবিশেষ।[৭৪] যে খড়্গের দুইপাশ ধারাল, তাহার নাম 'ঋষ্টি'; এইরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়। (দ্রঃ বাচস্পত্য-অভিধান।)

কচগ্রহ-বিক্ষেপ—যে শস্ত্রের দ্বারা নিকটস্থ শত্রুর চুল আকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করা যায়। শস্ত্রটি দণ্ডের মত। অগ্রভাগে আঠার মত চট্‌চটে বস্তু লেপন করা হয়।[৭৫]

কণপ—যে লৌহযন্ত্রের গর্ভস্থ গুলিকা আগ্নেয় দ্রব্যের শক্তিতে তারকার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।[৭৬]

কর্ণি ও কম্পন (?)—(কর্ণ ৮১।১২। ভী ৭৬।৬)

কুলিশ—বজ্রাকৃতি অস্ত্রবিশেষ।

ক্ষুর—পার্শ্বধার, তীক্ষ্ণাগ্র, ঋজু।[৭৭]

---

৭০ বি ৪২।১৬, নীলকণ্ঠ। শা ১৬৬ তম অঃ।

৭১ স তদা বিবিধান্ মার্গান্ প্রবরাংশ্চৈকবিংশতিম্। ইত্যাদি। দ্রো ১৯০।৩৭-৪০

৭২ চতুর্দ্দশ মহারাজ শিক্ষাবলসমন্বিতঃ। ইত্যাদি। কর্ণ ২৫।৩১,৩২

৭৩ বি ৪২ শ ও ৪৩ শ অঃ।

৭৪ বন ২০।৩৪। উ ১৫৪।২ নীলকণ্ঠ।

৭৫ উ ১৫৪।৫ নীলকণ্ঠ।

৭৬ আদি ২২৭।২৫ নীলকণ্ঠ।

৭৭ আদি ১৩৯।৬ নীলকণ্ঠ।

ক্ষুরপ্র—ক্ষুরতুল্য তীক্ষ্ণ বাণবিশেষ। সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রের দ্বারা খড়্গকেও ছেদন করা যায়।[৭৮]

গদা—গদ-নামক অসুরের অস্থিনির্ম্মিত মুদ্গরকেই মুখ্যতঃ বুঝায়। (বায়ুপুরাণ, গয়ামাহাত্ম্য) পরে তৎসাদৃশ্যবশতঃ মুদ্গরমাত্রকেই গদাশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যুদ্ধের গদাগুলি সাধারণতঃ লৌহনির্ম্মিত। বহুস্থানে গদার উল্লেখ পাওয়া যায়। বলরাম, ভীমসেন ও দুর্য্যোধন তৎকালে গদাযুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভীমের গদার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তাঁহার গদা ছিল আটকোণ-বিশিষ্ট, বৃহৎ এবং স্বর্ণ-ভূষিত।[৭৯]

গদাযুদ্ধের মণ্ডলাদি—ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে বিভিন্ন মণ্ডলের বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করার নাম 'মণ্ডল'। প্রতিপক্ষের সম্মুখস্থ হওয়ার নাম 'গত'। প্রতিপক্ষের অভিমুখে থাকিয়াই সামান্য হটিয়া যওয়াকে বলা হয় 'প্রত্যাগত'। প্রতিপক্ষের মর্ম্মদেশে প্রহার করিয়া তাহাকে যদি শূন্যে তুলিয়া ফেলা যায়, অথবা ভূপাতিত করা যায়, তবে সেই মণ্ডলকে বলা হয় 'অস্ত্রযন্ত্র'। 'প্রহার-পরিমোক্ষ' ও 'প্রহার-বর্জ্জন' মণ্ডলের মধ্যে পরিগণিত। প্রহারের উপযুক্ত সময় স্থির করিয়া প্রহার করিতে হয়, অন্যথা প্রহার করিলে বিপক্ষেরই জয় হয়। খুব বেগে ডান ও বাম দিকে যাতায়াত করার নাম 'পরিধাবন'। তড়িদ্‌বেগে প্রতিপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নাম 'অভিদ্রবণ'। চলার সময় বা গতি-পরিবর্ত্তনের সময় যদি প্রতিপক্ষকে ভূপাতিত করা যায়, তবে সেই মণ্ডলের নাম 'আক্ষেপ'।

চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করাকে বলা হয় 'অবস্থান'। ভূপাতিত বিপক্ষ উত্থিত হইলে পুনরায় তাহার সহিত যুদ্ধ করার নাম 'সবিগ্রহ'। বিপক্ষকে প্রহার করিবার নিমিত্ত তাহার চতুর্দ্দিকে খুব সাবধান হইয়া চলার নাম 'পরিবর্ত্তন'। শত্রুর প্রসরণকে অবরোধ করার নাম 'সংবর্ত্ত'। প্রতিপক্ষের প্রহার বিফল করিবার উদ্দেশ্যে শরীরকে একটু নত করার নাম 'অবপ্লুত'। উপরের দিকে লাফ দিয়া প্রতিপক্ষের প্রহার বিফল করাকে বলা হয় 'উপপ্লুত'। শত্রুর ছিদ্র বুঝিয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রহার করার নাম 'উপন্যস্ত'। একটু ঘুরিয়া শত্রুর পিঠে চাপড় দেওয়াকে বলা হয়

৭৮. ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন খড়্গাঞ্চিচ্ছেদ সুপ্রভম্। কর্ণ ২৫।৩৬

৭৯. অষ্টাস্রিমায়সীং ঘোরাং গদাং কাঞ্চনভূষণাম্। উ ৫১।৮

'অপন্যস্ত'।[৮০] গদাযুদ্ধে 'গোমূত্রিক'-নামে আরও একটি মণ্ডলের উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়।[৮১]

নাভির অধোদেশে প্রহার করিতে নাই—গদাযুদ্ধে নাভির অধোভাগে প্রহার করা অনুচিত। ভীমের অধর্ম্ম আচরণে তাঁহার গুরু বলদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনাবাক্যে পরে প্রকৃতিস্থ হন।[৮২]

চক্র—গোলাকার ধারাল অস্ত্র। কৃষ্ণের সুদর্শনচক্র সুপ্রসিদ্ধ।

চক্রাশ্ম—নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, যাহার ভ্রমিবলে বড় বড় পাষাণকেও অতি দূরে নিক্ষেপ করা যায়, সেই কাষ্ঠময় যন্ত্রের নাম চক্রাশ্ম।[৮৩]

তুলাগুড়—ভাণ্ডগোলক। নালবন্দুক (?), যন্ত্রযুক্ত বায়ুস্ফোট, সনির্ঘাত, মহামেঘস্বন। বস্তুটির আকৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা গেল না।[৮৪]

তোমর—হস্তক্ষেপ্য দীর্ঘদণ্ড অস্ত্রবিশেষ। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, লাটদেশে (দক্ষিণ-গুজরাট) তোমরকে 'ইটা' বলা হয়।[৮৫]

ধনু—কাঠ, বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা ধনু প্রস্তুত করা হইত। শৃঙ্গ দ্বারাও ধনু প্রস্তুত করার কথা পাওয়া যায়।[৮৬]

নখর—নখের ন্যায় ধারাল অস্ত্রবিশেষ।(?)[৮৭]

নারাচ—লৌহময় বাণ, পার্শ্বদেশ ধারাল, তীক্ষ্ণাগ্র ও ঋজু। ধনুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়।[৮৮]

নালীক—বাণবিশেষ।(?) অন্তশ্ছিদ্র শরবিশেষ। (বাচস্পত্য)

পট্টিশ—খড়্গবিশেষ। দুইদিকই ধারাল, তীক্ষ্ণাগ্র, 'পটা' নামে প্রসিদ্ধ।[৮৯]

পরশ্বধ—পরশু।

৮০ শল্য ৫৭।১৭-২০ নীলকণ্ঠ।

৮১ দক্ষিণং মণ্ডলং সব্যং গোমূত্রিকমথাপি চ। শল্য ৫৮।২২

৮২ অধো নাভ্যা ন হন্তব্যমিতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ। ইত্যাদি। শল্য ৬০।৬-২৫

৮৩ আদি ২২৭।২৫ নীলকণ্ঠ।

৮৪ বন ৪২।৫ নীলকণ্ঠ।

৮৫ আদি ১৯।১২ নীলকণ্ঠ।

৮৬ শার্ঙ্গং ধনুঃ শ্রেষ্ঠম্। বন ২১।২৫

৮৭ ভী ১৮।১৭

৮৮ আদি ১৩৯।৬ নীলকণ্ঠ।

৮৯ আদি ১৯।১৪ নীলকণ্ঠ।

পরিঘ—সর্ব্বতঃ কণ্টকিত লৌহদণ্ড।[৯০]

পাশ—রজ্জু। সমীপাগত শত্রুর গলে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে ব্যবহৃত হয়।[৯১]

প্রাস—হস্তক্ষেপ্য ক্ষুদ্র ভল্ল। বিন্ধ্যদেশে 'করকাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ।[৯২]

বিপাঠ—স্থূলমুখ বাণবিশেষ। দধিমন্থনের দণ্ডের মত।[৯৩]

ভল্ল—লম্বা, অগ্রভাগ বক্র। পেটে বিদ্ধ করিয়া টানিয়া বাহির করিবার সময় বড়শির মত অন্ত্রাদি আকর্ষণ করে।[৯৪]

ভিন্দিপাল—হস্তপ্রমাণ শর বা হস্তক্ষেপ্য লগুড়।[৯৫]

ভুশুণ্ডী—চর্ম্ম ও রজ্জুর দ্বারা নির্ম্মিত শস্ত্রবিশেষ।[৯৬] ইহা দ্বারা পাষাণ নিক্ষেপ করা যায়।[৯৭]

মুদ্গর—গদা।

মুষ(স)ল—মুষল লইয়া পরস্পর হানাহানি করিয়াই যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

যমদংষ্ট্রা—নীলকণ্ঠ বলেন, এই শস্ত্রটি 'জমধড়' নামে প্রসিদ্ধ।[৯৮] কিছুই অনুমান করা যায় না।

যষ্টি—অতি প্রসিদ্ধ।

রথচক্র—বিশেষ বিপদে পড়িলে অগত্যা রথচক্রকেও শস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হইত।[৯৯]

শক্তি—হস্তক্ষেপ্য লৌহদণ্ড, নিম্নাংশ স্থূল।[১০০]

শতঘ্নী—আগ্নেয় ঔষধির বলে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা যে শস্ত্র যুগপৎ

৯০ আদি ১৯।১৭ নীলকণ্ঠ।

৯১ উ ১৫৪।৪ নীলকণ্ঠ।

৯২ আদি ১৯।১২ নীলকণ্ঠ। বন ৪২।৪

৯৩, ৯৪ আদি ১৩৯।৬ নীলকণ্ঠ।

৯৫ উ ১৫৪।৬ নীলকণ্ঠ।

৯৬, ৯৭ আদি ২২৭।২৫ নীলকণ্ঠ।

৯৮ আদি ১৯।১২ নীলকণ্ঠ।

৯৯ বন ১৬৯।১৫

১০০ আদি ১৯।১৩ নীলকণ্ঠ।

শত সহস্র মানুষকে হত্যা করিতে পারে, তাহার নাম শতঘ্নী।[১০১] বহুস্থানে শতঘ্নীর উল্লেখ আছে। শব্দকল্পদ্রুমে দেখা যায়, লৌহকণ্টকসমাচ্ছন্ন বৃহৎ শিলা-খণ্ডের নাম শতঘ্নী। শতঘ্নীকে দুর্গপ্রাকারে স্থাপন করার কথা মহাভারতেও আছে। শব্দকল্পদ্রুমের অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয়, শত্রুপক্ষ প্রাকারে উঠিবার চেষ্টা করিলে সেই কণ্টকিত শিলাখণ্ডকে ঠেলিয়া তাহাদের উপর ফেলিয়া দেওয়া হইত এবং একসঙ্গে বহুলোককে একেবারে পিষিয়া মারা যাইত। উল্লিখিত আছে যে, চক্রের উপরে স্থাপন করিয়া শতঘ্নীকে রণভূমিতে লইয়া যাওয়া হইত।[১০২] কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন, শতঘ্নী সম্ভবতঃ কামানেরই প্রাচীন রূপ, কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ বা আভিধানিকদের মতে তাহা বলা যায় না। তৎকালে বন্দুক এবং কামান ছিল কি না, তাহাও বলা সুকঠিন। টীকাকার বন্দুক এবং কামান শব্দ ব্যবহার করিলেও ইহা তাঁহারই কল্পিত কি না, ভাবিবার বিষয়।[১০৩]

শর—লৌহনির্ম্মিত শরের উল্লেখই বেশী পাওয়া যায়। শর-(গুল্মবিশেষ) দণ্ড নির্ম্মিত শরের উল্লেখ স্পষ্টতঃ না থাকিলেও অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। কূপে পতিত বীটা (কাষ্ঠখণ্ড ?) উদ্ধার করিতে দ্রোণাচার্য্য মন্ত্রপূত ইষীকা ব্যবহার করেন। অশ্বত্থামার ঐষীকাস্ত্র ত্যাগের বর্ণনা হইতেও বুঝা যায়, শর দ্বারা একজাতীয় শস্ত্র প্রস্তুত করা হইত। সম্ভবতঃ তাহা বাণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।[১০৪] বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত বাণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বাণের পুঙ্খে (মূলে) পাখীর পালক লাগান হইত। স্বর্ণমণ্ডিত পুঙ্খের বর্ণনাও দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ গৃধ্রের পালকই বেশী লাগান হইত। কারণ, বাণের বিশেষণরূপে 'গার্দ্ধপত্র' শব্দটি প্রায়ই প্রযুক্ত হইয়াছে।[১০৫]

বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণের শর—বীরগণ রুচি-অনুসারে নানা বর্ণের শর ব্যবহার করিতেন। আকৃতিও বিভিন্নরকমের। অগ্রভাগ অর্দ্ধচন্দ্রের মত বক্র করিয়া একপ্রকার বাণ প্রস্তুত করা হইত।[১০৬] ভীমসেন অর্দ্ধচন্দ্রবাণে

১০১ আদি ২০৭।৩৪ নীলকণ্ঠ।

১০২ দ্রো ১৭৭।৪৬

১০৩ বন ১৫।৫ নীলকণ্ঠ।

১০৪ আদি ১৩১।২৭। সৌ ১৩।৩২

১০৫ দ্রো ৯৭।৮। আদি ১০২।২৭। দ্রো ১২৩।৪৭। বি ৪২।৭ নীলকণ্ঠ।

১০৬ বন ২৭০।১৩। বি ৪৩।১৪। দ্রো ৯৭।৭। বি ৪২।৭ নীলকণ্ঠ।

জয়দ্রথকে পাঁচচুলা করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, বাণের অগ্রভাগ ক্ষুরের ন্যায় ধারাল থাকিত।[১০৭]

নামাঙ্কিত শর—কোন কোন বীরপুরুষ সখ করিয়া বাণের মধ্যে আপন-আপন নাম লিখিয়া রাখিতেন।[১০৮]

তূণীরে শর-স্থাপন—তূণীরের ভিতরে শরকে রাখিতে হয়। শরের ন্যায় নালীক, নারাচ প্রভৃতিও ধনু দ্বারা প্রক্ষেপ করিতে হয়।

লৌহশরাদির তৈলধৌতি—লোহা বা ইস্পাত-নির্ম্মিত বাণ, খড়্গ প্রভৃতিতে যাহাতে মরিচা না ধরে, সেই উদ্দেশ্যে তৈলধৌত করিবার নিয়ম ছিল।[১০৯]

শূল—লৌহনির্ম্মিত, ত্রিশূলাকৃতি।

হল—লাঙ্গল। বলরামের লাঙ্গলাস্ত্র অতি প্রসিদ্ধ।

অস্ত্রাদিতে কারুকার্য্য—অস্ত্রশস্ত্রে যে-সকল কারুকার্য্য করা হইত, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বিবাটপর্ব্বের অস্ত্রদর্শনাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ধনঞ্জয় সুবর্ণখচিত, বিভিন্ন-বর্ণে চিত্রিত, সুখস্পর্শ, আয়ত এবং অব্রণ গাণ্ডীব ধারণ করিতেন। যুধিষ্ঠিরের ধনু ছিল ইন্দ্রগোপকচিত্র ও চারুদর্শন। নকুলের ধনুতে স্বর্ণসূর্য্য অঙ্কিত ছিল। সহদেবের কার্ম্মুক ছিল সৌবর্ণশলভচিত্রিত। বাণ এবং কোষের বহু বর্ণনাও সেই অধ্যায়ে করা হইয়াছে।[১১০]

সমীপে ও দূরে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ—উল্লিখিত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে শতঘ্নী, শর প্রভৃতি কিছু দূর হইতেও নিক্ষেপ করার যোগ্য। প্রতিপক্ষকে নিকটে পাইলেই অন্যগুলি কাজে লাগান যায়। ধনুর্ব্বিদ্যা সম্ভবতঃ দূরস্থ শত্রুকে আক্রমণ করিবার প্রথম আবিষ্কৃত কৌশল। শরাভ্যাস ও লক্ষ্যবেধ অতিশয় শ্রমসাধ্য এবং গুরুগম্য। অর্জ্জুনের ধনুর্ব্বিদ্যাপটুতা নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ধনুর প্রস্তুতপ্রণালী বা যোদ্ধসম্প্রদায়ের কৌশলের কোন বর্ণনা মহাভারতে পাওয়া যায় না। (অগ্নিপুরাণের ধনুর্ব্বেদ-প্রকরণে এইসকল বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।)

১০৭ অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন কিঞ্চিদক্রুবতস্তদা। বন ২৭১।৯

১০৮ আত্মনামাঙ্কিতাঃ। ইত্যাদি। দ্রো ৯৭।৭। দ্রো ১২৩।৪৭। দ্রো ১৩৬।৫। দ্রো ১৫৭।৩৭। শল্য ২৪।৫৬

১০৯ রুক্মপুঙ্খৈস্তৈলধৌতৈঃ। ইত্যাদি। শল্য ২৪।৫৬। উ ১৯।৪। দ্রো ১৭৭।২৬

১১০ বি ৪৩শ অঃ।

অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ—বর্ণিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত যুদ্ধে আরও বহু বস্তুর প্রয়োজন হইত। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের আয়োজনে সেইসকল বস্তুরও একটা তালিকা পাওয়া যায়। বাণকোষ বা তূণীর, বরূথ (রথরক্ষণের নিমিত্ত ব্যাঘ্রাদির চর্ম্মে নির্ম্মিত), উপাসঙ্গ (অশ্ব বা গজের দ্বারা বাহিত তূণ), ধ্বজ, নিষঙ্গ (পত্তিবাহ্য তূণ), পতাকা, প্রতপ্ত তৈল, প্রতপ্ত গুড়, তপ্ত বালুকা (শত্রুর শরীরে প্রক্ষেপের নিমিত্ত), সসর্প কুম্ভ, সর্জ্জরস (অগ্ন্যুদ্দীপনের নিমিত্ত), চর্ম্ম, ঘণ্টা, তপ্ত গুড়জল, উপলখণ্ড (যন্ত্রক্ষেপ্য), মোম (দ্রব করিয়া শত্রুর উপর প্রক্ষেপ্য), কণ্টকদণ্ড, বিষ (প্রয়োজনবোধে তোমরাদি শস্ত্রে মাখাইবার নিমিত্ত), শূর্প (তপ্ত গুড়াদি প্রক্ষেপের উদ্দেশ্যে), পিটক, দাত্র, পরশু, কীল, ক্রকচ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, শৃঙ্গ (গদার আঘাতে জমাটবাঁধা রক্ত মোক্ষণের নিমিত্ত), তৈলসিক্ত ক্ষৌমবস্ত্র (ভস্ম করিয়া প্রহারস্থলে প্রযোজ্য), পুরাণ ঘৃত (প্রহারস্থলে প্রলেপের উদ্দেশ্যে) অশুভহর ঔষধি ইত্যাদি।[১১১]

দিব্যাস্ত্র ও প্রয়োগবিধি—কতকগুলি অস্ত্রকে দিব্যাস্ত্র বলা হইত। সেই-সকল অস্ত্রের অসামান্য ক্ষমতা দেখিয়া বোধ করি, 'দিব্য' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। দিব্যাস্ত্রের সৃষ্টি ও প্রয়োগপ্রণালী অত্যন্ত গোপনীয়। শস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ গুরুপরম্পরায় সেইসকল অস্ত্রের সৃষ্টি ও সংহরণবিধি জানিতে হইত। সেইসকল অস্ত্রের প্রয়োগে দেবতা ও গুরুপঙ্‌ক্তিকে মনে মনে ভক্তিভরে স্মরণ করিবার নিয়ম ছিল। প্রত্যেক অস্ত্রই এক-একজন দেবতার নামে প্রসিদ্ধ। যেমন— বায়ব্য, পর্জ্জন্য, আগ্নেয়, গুহ্যক ইত্যাদি। বায়ব্য অস্ত্রের দ্বারা বায়ুমণ্ডলে বায়ুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাইত, পর্জ্জন্যাস্ত্রে মেঘ সৃষ্টি করিয়া বর্ষণ করান চলিত এবং মাটির নীচ হইতে জল আকর্ষণ করা যাইত। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগে অগ্নিবর্ষণ হইত। এইরূপে বরুণাস্ত্র, সম্মোহনাস্ত্র প্রভৃতির দ্বারাও অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করা যাইত। নামের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেই অস্ত্রের প্রয়োগ ও ফল সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝিতে পারা যায়। দিব্যাস্ত্রের বিনিয়োগে মন্ত্রপাঠের বিধান ছিল। অশুচিতা বা মন্ত্রভ্রংশের ফলে দিব্যাস্ত্রের বিস্মৃতি বহুস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। খুব অল্পসংখ্যক যোদ্ধাই দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ জানিতেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন প্রমুখ চারিপাঁচজন দিব্যাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। কর্ণ গুরুর শাপবশতঃ অন্তিমকালে অস্ত্র-

---

১১১ উ ১৫৪ তম অঃ।

বিনিয়োগ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অশ্বত্থামা বিনিয়োগ জানিলেও সংহরণ জানিতেন না। ঐকান্তিক নিষ্ঠা না থাকিলে দিব্যাস্ত্র প্রতিভাত হয় না। দিব্যাস্ত্রের দ্বারা যখন যুদ্ধ করা হইত, তখন প্রতিপক্ষ বিপরীত অস্ত্রের প্রয়োগ করিতেন। যেমন—এক পক্ষ যদি আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করেন, তবে অপর পক্ষ তাহার প্রশমনের নিমিত্ত বারুণাস্ত্রের শরণ লইতেন। এইরূপে বায়ব্যাস্ত্রের বিপরীত গুহ্যকাস্ত্র, সম্মোহনাস্ত্রের বিপরীত প্রজ্ঞাস্ত্র। নাম শুনিয়াই সাধারণতঃ প্রতিকূল অস্ত্র কি হইবে, তাহা অনেকটা বুঝা যায়।[১১২]

ত্বাষ্ট্রাস্ত্রের শক্তি—'ত্বাষ্ট্র'-নামে একপ্রকার পরমাস্ত্রের (দিব্যাস্ত্র কি?) বর্ণনা পাওয়া যায়। রণক্ষেত্রে অর্জ্জুন সেই অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই অস্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, প্রতিপক্ষের উপরে নিক্ষেপ্তার প্রতিবিম্ব পড়ে। তাহাতে সকলের মধ্যেই নিক্ষেপ্তার আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অর্জ্জুন সেই অস্ত্র ব্যবহার করায় প্রতিপক্ষ সেনাদল পরস্পরকে অর্জ্জুন মনে করিয়া নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হন। যদিও সেই অস্ত্রকে পরমাস্ত্র বলা হইয়াছে, তথাপি মনে হয়, তাহা যেন একপ্রকার মায়ামাত্র।[১১৩]

মায়াযুদ্ধ—দিব্যাস্ত্রের যুদ্ধ ছাড়াও একপ্রকার অলৌকিক যুদ্ধ ছিল, তাহাকে মায়াযুদ্ধ বলা হইত। মায়াযুদ্ধ যেন ইন্দ্রজালের মত। অস্ত্রের বাস্তবিকতা নাই, অথচ তাহার প্রয়োগ অসংখ্য। ইন্দ্রজালসৃষ্টিতে বস্তুটি সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা ঐন্দ্রজালিকের চালাকি ছাড়া আর কিছুই নহে। রাক্ষস ও অসুরগণ মায়াযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন।[১১৪] ঘটোৎকচের মায়াযুদ্ধে বিব্রত হইয়া মহাবীর কর্ণ ইন্দ্র হইতে প্রাপ্ত একবীরহন্ত্রী শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[১১৫]

১১২ পার্জ্জন্যাস্ত্রেণ সংযোজ্য সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ। ইত্যাদি। ভী ১২১।২৩। বন ১৭১।৮-১০। ভী ৭৭।৫৩। সভা ২৭।২৬

আগ্নেয়ং বারুণং সৌম্যং বায়ব্যমথ বৈষ্ণবম্।

ঐন্দ্রং পাশুপতং ব্রাহ্মং পারমেষ্ঠ্যং প্রজাপতেঃ॥ ইত্যাদি। ভী ১২১।৪০-৪২।

উ ১৮২।১১, ১২

১১৩ অথাস্ত্রমরিসন্ত্রাসং ত্বাষ্ট্রমভ্যস্যদর্জ্জুনঃ। ইত্যাদি। দ্রো ১৮।১১-১৪

১১৪ অঙ্গারপাংশুবর্ষঞ্চ শরবর্ষঞ্চ ভারত।

এবং মায়াং প্রকুর্ব্বাণো যোধয়ামাস মাং রিপুঃ। ইত্যাদি। বন ২০।৩৭.১৭,২৬। ভী ৯৩।৫

১১৫ সা তাং মায়াং ভস্ম কৃত্বা জ্বলন্তী ভিত্ত্বা গাঢ়ং হৃদয়ং রাক্ষসস্য। দ্রো ১৭৭।৫৭

দেশ এবং জাতিবিশেষে যুদ্ধবৈশিষ্ট্য—দিব্যাস্ত্র ও মায়িকাস্ত্র ব্যতীত অপর সকল অস্ত্রই মানুষাস্ত্র। সকল দেশে বা সকল সমাজে অস্ত্রের প্রয়োগ একরূপ ছিল না। কোন-কোন দেশ বা জাতিবিশেষে বিশেষ-বিশেষ অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি সবিশেষ জানা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। গান্ধার, সিন্ধু ও সৌবির দেশের যোদ্ধগণ নখর ও প্রাসযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। উশীনরগণ সর্ব্বশাস্ত্রে কুশল ও সত্ত্ববান্। প্রাচ্যদেশীয়গণ কূটযোদ্ধা এবং মাতঙ্গযুদ্ধে কুশল। যবন, কাম্বোজ এবং মাথুরগণ নিযুদ্ধে (বাহুযুদ্ধে) কুশল। দাক্ষিণাত্যনিবাসী যোদ্ধগণ অসিযুদ্ধে কুশল। পার্ব্বত্যদেশীয় যোদ্ধারা নিযুদ্ধে ও পাষাণযুদ্ধে কুশল, তাহা যুদ্ধের বর্ণনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।[১১৬]

নিবাতকবচগণের জলযুদ্ধ—নিবাতকবচগণ উৎকৃষ্ট জলযোদ্ধা ছিলেন। তাঁহারা সমুদ্রের মাঝখানে দুর্গে বাস করিতেন।[১১৭]

ব্যূহরচনা ও ব্যূহভেদ—স্বপক্ষের ব্যূহরচনায় এবং পরপক্ষীয় ব্যূহেব ভেদ করায় বিশেষভাবে সংগ্রামনৈপুণ্য প্রকাশিত হইত।

প্রাচীন অভিজ্ঞ বৃহস্পতি—বৃহস্পতি এই বিদ্যায় খুব পটু ছিলেন।[১১৮]

ভীষ্ম ও দ্রোণের কুশলতা—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম ও দ্রোণের ন্যায় কেহই এই বিষয়ে নিপুণ ছিলেন না। তাঁহারা নানাবিধ আসুর ও পৈশাচ ব্যূহের নির্ম্মাণকৌশল অবগত ছিলেন। তাঁহাদের পরেই অর্জ্জুনের স্থান।[১১৯]

ব্যূহরচনা প্রভৃতি বিষয়ে মহাভারতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। যেসকল ব্যূহের নাম গৃহীত হইয়াছে, সেইগুলি সঙ্কলিত হইল। (শুক্রনীতি, কৌটিল্য, কামন্দক ও অগ্নিপুরাণে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।)

অর্দ্ধচন্দ্র—দক্ষিণ কোটিতে খুব প্রসিদ্ধ একজন বীরকে থাকিতে হইবে। বামভাগে বহু বীর থাকার প্রয়োজন। মধ্যে একদল গজারোহী থাকিবেন। এই ব্যূহ গরুড়ব্যূহ বা ক্রৌঞ্চব্যূহের প্রতিদ্বন্দ্বী।[১২০]

---

১১৬ গান্ধারাঃ সিন্ধুসৌবিরা নখরপ্রাসযোধিনঃ। ইত্যাদি। শা ১০১।৩-৫
পাষাণযোধিনঃ শূরান্ পার্ব্বতীয়ানচোদয়ৎ। ইত্যাদি। দ্রো ১১৯।২৯-৪৪

১১৭ সমুদ্রকুক্ষিমাশ্রিত্য দুর্গে প্রতিবসন্ত্যত। বন ১৬৮।৭২

১১৮ যথা বেদ বৃহস্পতিঃ। ইত্যাদি। উ ১৬৪।৯। ভী ১৯।৪। ভী ৫০।৪০

১১৯ আসুরানকরোদ্ ব্যূহান্ পৈশাচানথ রাক্ষসান্। ইত্যাদি। ভী ১০৮।২৬। উ ১৬১।১০

১২০ অর্দ্ধচন্দ্রেণ ব্যূহেন ব্যূহং তমতিদারুণম্। ভী ৫৬।১১-১৮

ক্রৌঞ্চ (ক্রৌঞ্চারুণ)—ক্রৌঞ্চপক্ষীর মত আকৃতিতে সেনাসন্নিবেশ। সর্ব্বাগ্রে প্রসিদ্ধ যোদ্ধাকে থাকিতে হয়, কল্পিত মস্তকে একদল সেনা সঙ্গে লইয়া অন্য বীরপুরুষ থাকিবেন। এইরূপে কল্পিত চক্ষু, গ্রীবা, পাখা, পিঠ, পুচ্ছ প্রভৃতি স্থানে এক-একজন যোদ্ধার অধীনে এক-একদল সেনা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিবে।[১২১]

গরুড় (সুপর্ণ)—এই ব্যূহেও ক্রৌঞ্চব্যূহের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মস্তকে দুইদল সেনা সহ দুইজন বীর থাকিবেন। পুচ্ছ এবং পৃষ্ঠদেশে সৈন্যসমাবেশ কিছু বেশী হইবে। পক্ষ দুইটি আয়ত ও লম্বা হইবে।[১২২]

চক্র—অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিবার সময় দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করেন। অভিমন্যু ব্যূহভেদ করিবার কৌশল পিতার নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ক্রমণের উপায় না জানায় সপ্তরথীর হাতে প্রাণ হারান।[১২৩]

বজ্র—ইন্দ্র এই ব্যূহের আদি-গুরু।[১২৪]

মকর—সর্ব্বাগ্রে সসৈন্য বীর, পশ্চাতে যথাক্রমে রথী, পত্তি ও দন্তী। ক্রৌঞ্চব্যূহ মকরের প্রতিদ্বন্দ্বী।[১২৫]

মণ্ডলার্দ্ধ—সুপর্ণব্যূহের প্রতিদ্বন্দ্বী।[১২৬]

শকট বা চক্রশকট—অভিমন্যুর বধের পর ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে আচার্য্য দ্রোণ শকটব্যূহ নির্ম্মাণ করেন। এই ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ পদ্মের মত।[১২৭]

শৃঙ্গাটক—শিঙ্গাড়া বা পানিফলের মত ত্রিকোণাকৃতি। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, চতুষ্পথের মত।[১২৮]

১২১ ভী ৫০।৪০-৫৮। দ্রো ৬।১৫

১২২ ভী ৭৫।১৫-২৬। দ্রো ১৯।৪

১২৩ চক্রব্যূহো মহারাজ আচার্য্যেণাভিকল্পিতঃ। দ্রো ৩৩।১৩

১২৪ অচলং নাম বজ্রাখ্যং বিহিতং বজ্রপাণিনা। ভী ১৯।৭

১২৫ অকরোন্মকরব্যূহং ভীষ্মো রাজন্ সমন্ততঃ। ভী ৬৯।৪-৬। ভী ৭৫।৪-১২

১২৬ দ্রো ১৯।৪

১২৭ অস্মাকং শকটব্যূহো দ্রোণেন বিহিতোঽভবৎ। ইত্যাদি। দ্রো ৬।১৫। দ্রো ৭৩।২৭। দ্রো ৮৫।২১

১২৮ ভী ৮৭।১৭

শ্যেন—এই ব্যূহ অনেকাংশে গরুড়ব্যূহের মত। মকরব্যূহের প্রতিরোধক।[১২৯]

সর্ব্বতোভদ্র—এই ব্যূহের আকার গোল। মধ্যে সৈন্য ও সাধারণ যোদ্ধগণ থাকিবেন। প্রসিদ্ধ বীরগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া থাকিবেন।[১৩০]

সাগর—সাগরসদৃশ বিস্তৃত ব্যূহবিশেষ।[১৩১]

সূচীমুখ—প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যায় বেশী থাকিলে এই ব্যূহ রচনা করিতে হয়, মহর্ষি বৃহস্পতি এই উপদেশ দিয়াছেন।[১৩২]

যমকাদি মণ্ডল—বীরপুরুষগণ ব্যূহরচনা ব্যতীত নানাবিধ মণ্ডলের দ্বারাও প্রতিপক্ষকে বিত্রস্ত করিয়া তুলিতেন। শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া রথাদির গতি পরিবর্ত্তন করাকে মণ্ডল বলে।[১৩৩]

নিযুদ্ধ—যে যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের আবশ্যক হয় না, মল্লগণ কুস্তি দ্বারা আপন-আপন বাহুবল প্রকাশ করেন, তাহাই নিযুদ্ধ। কুস্তি বা মল্লযুদ্ধই নিযুদ্ধের মধ্যে প্রধান। মুষ্টিযুদ্ধ বা ঘুসি স্বতন্ত্রভাবে গণিত হইত না, তাহাও কুস্তির অন্যতম কৌশলমাত্র। প্রথমতঃ রণক্ষেত্রে উপস্থিত উভয় পক্ষকে সর্ব্বসমক্ষে আপন-আপন নাম এবং বংশপরিচয় প্রকাশ করিতে হইত। রাজারা সাধারণতঃ রাজা ছাড়া অপর কাহারও সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেন না।[১৩৪]

নিযুদ্ধের কৌশল—যুদ্ধের আরম্ভে পরস্পর নমস্কার এবং করগ্রহণের নিয়ম। তারপর কক্ষাস্ফোটন, স্কন্ধতাড়ন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা শরীরের জড়তা নাশ করিয়া উভয় বীর মুখামুখি দাঁড়াইবেন। সজোরে হাতের ও পায়ের আকুঞ্চন এবং প্রসারণের দ্বারা পেশীগুলিকে সঞ্চালিত করিতে হয়। অতঃপর পরস্পর আলিঙ্গিত হইয়া পরস্পরের কক্ষে দৃঢ়হস্তে বন্ধন করিবেন। এইপ্রকার

১২৯ ভী ৬৯।৭-১২

১৩০ ভী ৯৯।১-৮

১৩১ ভী ৮৭।৫

১৩২ সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পানাং বহুভিঃ সহ। ইত্যাদি। ভী ১৯।৫। ভী ৭৭।৫৯। শা ১০০।৪০

১৩৩ মণ্ডলানি বিচিত্রাণি যমকানীতরাণি চ। দ্রো ১২১।৬০

১৩৪ অয়ং পৃথায়াস্তনয়ঃ কনীয়ান্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কৌরবো ভবতা সার্দ্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধং করিষ্যতি। ইত্যাদি। আদি ১৩৬।৩১-৩৩

বন্ধনের নাম 'কক্ষাবন্ধ'। তারপর প্রতিপক্ষের গলদেশে আপন গণ্ড ও কপালের দ্বারা আঘাত করিবেন। সুযোগ বুঝিয়া প্রতিপক্ষের বাহু বা পদ হস্তদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক স্নায়ুমণ্ডলীকে শক্তভাবে পীড়ন করিবেন। বক্ষঃস্থলে দৃঢ়মুষ্টি-প্রহারের নিমিত্ত ছিদ্রান্বেষণ করিতে হয়। দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি সংহত করিয়া শত্রুর মস্তকে আঘাত করিলে শত্রু শীঘ্রই অবসন্ন হয়। ঐরূপ পীড়নের নাম 'পূর্ণকুম্ভ-প্রয়োগ'। সুযোগমত চপেটাঘাত করিতে হয়। পাশ ফিরিয়া প্রতিপক্ষের জত্রুদেশে (কণ্ঠে) পৃষ্ঠঘর্ষণ করিতে করিতে দৃঢ়হস্তে উদরের ব্যথা উৎপাদন করিলে ভূপাতিত করা সহজ হয়। সহসা বায়ুর রেচকক্রিয়া দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদনপূর্ব্বক শত্রুর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া প্রচণ্ডবেগে তাহাকে আঘাত করিবেন। এইরূপ কৌশলে প্রতিপক্ষের পৃষ্ঠদেশ ভূসংলগ্ন করিতে পারিলেই মল্লযুদ্ধে বিজয় হইল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।[১৩৫]

বাহুকণ্টক নিযুদ্ধ—উভয় পায়ের দ্বারা শত্রুর একখানি জঙ্ঘা জোরে চাপিয়া ধরিয়া অন্য জঙ্ঘাখানি দুইহাতে আকর্ষণপূর্ব্বক শরীরগ্রন্থি পাটন করাকে বলা হয় 'বাহুকণ্টক'। বাহুকণ্টক শব্দের অর্থ 'কেতকী-পাতা'। বলবান্ বীর যদি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের শরীর কেতকীপাতার মত দীর্ণ করিতে উদ্যত হন, তবে সেই মল্লযুদ্ধই বাহুকণ্টক-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কর্ণ এবং জরাসন্ধের মধ্যে বাহুকণ্টক নিযুদ্ধ হইয়া পরে সন্ধি স্থাপিত হয়।[১৩৬]

মল্লযুদ্ধের পরিভাষা—বিরাটপুরীতে মল্ল জীমূতের সহিত ভীমসেনের নিযুদ্ধের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। নীলকণ্ঠের টীকাতে সেইগুলির ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। অকস্মাৎ বিপক্ষের শরীরের যে-কোন স্থান নিপীড়ন করাকে বলা হয় 'কৃত'। কৃতমোচনের নাম 'প্রতিকৃত'। মুষ্টি দৃঢ়ীকরণের নাম 'সুসঙ্কট'। অঙ্গসঙ্ঘট্টকে বলা হয় 'সন্নিপাত'। সবলে শত্রুকে দূরে নিক্ষেপ করার নাম 'অবধূত'। ভূপাতিত করিয়া জোরে পেষণ করার নাম 'প্রমাথ'। প্রমথিত শত্রুকে তুলিয়া তাহার অঙ্গমথন করাকে বলা হয় 'উন্মথন'। অকস্মাৎ শত্রুকে স্থান হইতে প্রচ্যুত করার নাম 'ক্ষেপণ'। দৃঢ়মুষ্টিপ্রহারে বক্ষঃপীড়নের নাম 'মুষ্টি'। শত্রুকে

১৩৫ সভা ২৩শ অঃ। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

১৩৬ বাহুকণ্টকযুদ্ধেন তস্য কর্ণোঽথ যুধ্যতঃ। ইত্যাদি। শা ৫।৪-৬। দ্রঃ নীলকণ্ঠ

হঠাৎ স্কন্ধে তুলিয়া তাহার মাথা নীচ দিকে রাখিয়া ভ্রামণ করিতে করিতে দূরে নিক্ষেপ করিলে যে শব্দ হয়, তাহার নাম 'বরাহোদ্ধৃতনিঃস্বন'। অসংহত অঙ্গুলির দ্বারা চাপড় মারার নাম 'প্রসৃষ্ট'। একটি অঙ্গুলিকে অতিশয় দৃঢ় করিয়া সোজাভাবে হঠাৎ শত্রুর শরীরে আঘাত করার নাম 'শলাকা'। হাঁটু ও মাথা দ্বারা পীড়ন করার নাম 'অবঘট্টন'। পরিশ্রান্ত প্রতিপক্ষকে অনায়াসে টানিয়া আনাকে 'আকর্ষণ' বলে। আকৃষ্ট শত্রুকে ক্রোড়ে করিয়া যথেচ্ছ পীড়ন করার নাম 'প্রকর্ষণ'। শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ করিতে তাহার সম্মুখে, পশ্চাৎ ও পার্শ্বে ভ্রমণ করার নাম 'অভ্যাকর্ষ'। সুযোগ বুঝিয়া অকস্মাৎ শত্রুকে ধরিয়া জোরে ভূপাতিত করাকে 'বিকর্ষণ' বলা হয়।[১৩৭]

মল্লযুদ্ধ অপ্রশস্ত—নীলকণ্ঠের টীকাতে মল্লযুদ্ধের যে অনুশাসনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, মল্লযুদ্ধে নিহত পুরুষগণ স্বর্গগমনের অধিকারী নহেন এবং ইহলোকেও তাঁহারা যশস্বী হন না।[১৩৮]

উৎসবাদিতে মল্লযুদ্ধ—উৎসবাদিতেও তৎকালে মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করা হইত। বিরাটপুরীতে জীমূত ও ভীমের মল্লযুদ্ধও উৎসব উপলক্ষ্যে সঙ্ঘটিত। শরৎকালে নূতন ধান্য পাকার পর সেই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

উৎসবের নিযুদ্ধে প্রাণহানি—এইজাতীয় মল্লযুদ্ধ উৎসবের অঙ্গ হইলেও এক পক্ষের প্রাণহানি পর্য্যন্ত নিযুদ্ধ চালানের কোন সার্থকতা বুঝা যায় না। সেই নীতির সমর্থনও করা চলে না। বিরাটের আদেশে ভীমসেনকে বাঘ, সিংহ এবং হাতীর সহিতও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সেই অদ্ভুত খেয়ালেরও কোন অর্থ হয় না।[১৩৯]

বিজয়ী শূরের নগরপ্রবেশ—যুদ্ধবিজয়ী বীরগণ নগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দূতমুখে বিজয়বার্ত্তা পাঠাইতেন। তখন পুরীতে বিজয়োৎসবে সমুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় রাজপথসমূহ দিবালোকের মত পরিশোভিত হইত। সুগন্ধি-কুসুমসজ্জিত পতাকাগুলি পথের দুইধারে উড্ডীয়মান, চন্দনাগুরুর গন্ধে সমস্ত পুরী আমোদিত।[১৪০]

১৩৭ বি ১৩শ অঃ। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

১৩৮ মৃতস্য তস্য ন স্বর্গো যশো নেহাপি বিদ্যতে। বি ১৩।৩০। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

১৩৯ বি ১৩শ অঃ।

১৪০ বি ৩৪শ ও ৬৮ তম অঃ।

বিজয়ে প্রাপ্ত ধনরত্নাদির ভোগ—যুদ্ধজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বিজিত প্রতি-পক্ষ হইতে প্রাপ্ত ধনরত্নাদি-ভোগেরও কিছুটা নিয়ম ছিল। বিজেতা যদি প্রতিপক্ষকে আপন পুরীতে লইয়া আসেন, তবে তাহাকে দাসত্ব স্বীকার করাইয়া এক বৎসরকাল প্রতিপালন করিবেন। তারপর যদি বিজিত প্রতিপক্ষের কোন সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তানকে পিতৃবিজয়ীর অধীনতা স্বীকার করিয়া চিরদিন থাকিতে হইবে। বিজিতের কন্যা যদি স্বেচ্ছায় বিজেতাকে বিবাহ না করেন, তবে বিজেতা তাহার ইচ্ছামত তাহাকে যাইতে দিবেন, তাহার উপর কোনপ্রকার জোর চলিবে না। এইরূপে জয়ের সময় দাসদাসী বা অপরাপর ধনরত্ন যাহা পাওয়া যায়, তাহাও এক বৎসরের পর বিজিত প্রতিপক্ষকে স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ করা উচিত। কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি দস্যু বা চোর হয়, তবে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন প্রত্যর্পণ করিতে নাই। রাজা ভিন্ন সাধারণ লোকের সহিত নৃপতি কখনও বিগ্রহে লিপ্ত হইবেন না।[১৪১]

যুদ্ধে বিপন্ন পরিবারের বৃত্তির ব্যবস্থা—যুদ্ধের দরুণ যে-সকল পরিবার বিপন্ন হইত, রাজা সেইসকল পরিবারের ভার গ্রহণ করিতেন।[১৪২]

১৪১ বলেন বিজিতো যশ্চ ন তং যুধ্যেত ভূমিপঃ।
সম্বৎসরং বিপ্রণয়েত্তস্মাজ্জাতঃ পুনর্ভবেৎ॥ ইত্যাদি। শা ৯৬।৪-৭

১৪২ কচ্চিদ্দারান্ মনুষ্যাণাং তবার্থে মৃত্যুমীয়ুষাম্।
ব্যসনং চাভ্যুপেতানাং বিভর্ষি ভরতর্ষভ। ইত্যাদি। সভা ৫।৫৪। অনু ১৬৭।২

মহাভারতের সমাজ

চতুর্থ খণ্ড

রাজসভায় আয়ুর্ব্বেদবেত্তার সম্মান—অষ্টাঙ্গ-(নিদান, পূর্ব্বলিঙ্গ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি, ঔষধি, রোগী ও পরিচারক) আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রাজসভায় একটি বিশেষ সম্মানের আসন পাইতেন। রাজার চেষ্টায় এবং সর্ব্ববিধ অনুকূলতায় আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যা উন্নত হইয়াছিল।[১]

কৃষ্ণাত্রেয়ের চিকিৎসাজ্ঞান—অতি প্রাচীন কালে কৃষ্ণাত্রেয়-মুনির নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র প্রতিভাত হয়।[২]

ত্রিধাতুর সমতাই স্বাস্থ্য—শরীর ও মনের সুস্থতায় চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি ধাতু শরীরে নিত্য অবস্থিত। শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফের যুদ্ধ চলিতেছে। (ভী ৮৪।৪১) এই ত্রিধাতুর সমতার নামই স্বাস্থ্য। আবার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি মনের গুণ। ঐ তিনটির সমতার নাম মানসিক স্বস্থতা। শরীর ও মন উভয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই সুস্থতার লক্ষণ।[৩]

'ত্রিধাতু' ঈশ্বরেরও নাম—পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ুর সমষ্টিকে 'সঙ্ঘাত' বলা হয়। এই সঙ্ঘাতের সমতাতেই প্রাণিগণ সুস্থ থাকে। আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ ভগবানকে 'ত্রিধাতু'-সংজ্ঞায় অভিহিত করেন।[৪]

শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—ব্যাধির জন্ম শরীরে এবং আধির জন্ম মনে। শরীর অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ হইয়া পড়ে, আবার মনের অস্বস্তি শরীরকে অসুস্থ করিয়া ফেলে।[৫]

চিকিৎসার উদ্দেশ্য—শারীরিক ধাতুবৈষম্য বা মানসিক গুণবৈষম্য উপস্থিত হইলে তাহার সমতাসাধনই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। পিত্তের বৃদ্ধিতে

---

১ কচ্চিদ্বৈদ্যাশ্চিকিৎসায়ামষ্টাঙ্গায়াং বিশারদাঃ।
সুহৃদশ্চানুরক্তাশ্চ শরীরে তে হিতাঃ সদা॥ সভা ৫।৯০

২ কৃষ্ণাত্রেয়শ্চিকিৎসিতম্। শা ২১০।২১

৩ শীতোষ্ণে চৈব বায়ুশ্চ ত্রয়ঃ শারীরজা গুণাঃ।
তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্॥ ইত্যাদি। শা ১৬।১১-১৩

৪ আয়ুর্ব্বেদবিদস্তস্মাত্রিধাতুং মাং প্রচক্ষতে। শা ৩৪২।৮৭

৫ দ্বিবিধো জায়তে ব্যাধিঃ শারীরো মানসস্তথা
পরস্পরং তয়োর্জ্জন্ম নির্দ্বন্দ্বং নোপলভ্যতে॥ ইত্যাদি। শা ১৬।৮,৯। অশ্ব ১২।১-৩

কফের হ্রাস, কফের বৃদ্ধিতে পিত্তের হ্রাস, এই নিয়মে একের হ্রাস হইলে অপরটিকে বাড়াইয়া সমতাসাধন করা চিকিৎসকের কার্য্য। মানসিক আধির বেলায়ও ঠিক সেইরূপ হর্ষ দ্বারা শোকের উপশম হয়। এইভাবে সত্ত্বাদি গুণের মধ্যেও একের বৃদ্ধিতে অপরের হ্রাস হয়। শরীর বা মনের চিকিৎসা করিতে প্রথমেই বৈষম্যের কারণনির্ণয় এবং তাহার সমতাবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।[৬]

সাধারণতঃ রোগের কারণ—রোগের কতকগুলি স্থূল কারণের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—অতিভোজন, অভোজন, দুষ্ট অন্ন আমিষ এবং পানীয়ের গ্রহণ, পরস্পরবিরোধী খাদ্যগ্রহণ, অতি ব্যায়াম, অতি কামুকতা, মলমূত্রের বেগধারণ, রসবহুল দ্রব্যের ভোজন, দিবানিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক রোগের হেতু।[৭]

স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল ব্যবস্থা—স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ কতকগুলি নিয়ম নানা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাতরুত্থান, দিবাভাগে নিদ্রা না যাওয়া, পরিমিত ব্যায়ামচর্চ্চা প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই অনুকূল। প্রত্যহ উত্তমরূপে স্নান করা উচিত। প্রত্যহ স্নান করিলে বল, রূপ, স্বরপ্রশুদ্ধি, স্পষ্ট উচ্চারণশক্তি, দেহের কোমলতা, উত্তম গন্ধ, লাবণ্য, উত্তম কান্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভ হয়। নগ্ন হইয়া স্নান করিতে নাই। রাত্রিতে স্নান করা উচিত নহে।[৮]

মিতাহার ও প্রসাধনাদি—পরিমিত ভোজনের ছয়টি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—আরোগ্য, আয়ু, বল, সুখ, অনিন্দ্যতা, সুসন্তানজনকতা। স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত প্রসাধনাদি ব্যবহার করিলে ভাল হয়। কেশপ্রসাধন, অঞ্জনব্যবহার, দন্তধাবন প্রভৃতি কাজ পূর্ব্বাহ্নেই সমাপন করা উচিত। শুক্ল পুষ্পের মাল্য ধারণ করিলে মনের প্রফুল্লতা জন্মে। কমল এবং কুবলয়ের

৬ তেষামন্যতমোদ্রেকে বিধানমুপদিশ্যতে।
উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণং প্রবাধ্যতে॥ ইত্যাদি। শা ১৬।১২-১৫

৭ অত্যর্থমপি বা ভুঙ্‌ক্তে ন বা ভুঙ্‌ক্তে কদাচন। ইত্যাদি। অশ্ব ১৭।৯-১২

৮ ন চাভ্যুদিতশায়ী স্যাৎ। ইত্যাদি। অনু ১০৪।৪৩,৫১। অনু ৯৩।১২। অনু ১২
আদি ১০৯।১৮। শা ১১০।৬। উ ৩৭।৩৩

মাল্য কদাচ ধারণ করিতে নাই। রক্তমাল্যও নিষিদ্ধ। বটজটা এবং প্রিয়ঙ্গু একত্র পেষণ করিয়া অনুলেপন করিলে ভাল হয়।[৯]

পথ্যাশন—সর্ব্বদা স্বাস্থ্যের অনুকূল ভোজন বিধেয়। পথ্য বস্তু ত্যাগ করিয়া যে-ব্যক্তি অহিত বস্তু আহার করে, তাহার বিপদ উপস্থিত হয়। যিনি প্রত্যহ তিক্ত, কষায়, মধুর প্রভৃতি রস গ্রহণ করেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পথ্যাশন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়।[১০]

ভোজনের নিয়মাবলী—ভোজনকালে মৌন থাকার বিধান।[১১] স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহার উপযোগিতা বিচার করা সম্ভবতঃ শক্ত ব্যাপার। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভোজ্য-বস্তুর প্রতি অধিকতর মনঃসংযোগের নিমিত্ত এই নিয়মপ্রবর্ত্তন অসম্ভব নহে। ভোজনের আদিতে এবং অন্তে কতকগুলি নিয়ম পালনের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইগুলিও স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্তই উপদিষ্ট। আহারের পূর্ব্বে উত্তমরূপে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া তিনবার আচমন করিতে হয়। উত্তম আসনে উপবেশন করিয়া প্রসন্নমনে ভোজন করিবে। ভোজনের পাত্রগুলিও মনোরম হওয়া চাই। একখানিমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া আহার করিতে নাই। ভোজনের পরে তিনবার আচমন এবং দুইবার মুখমার্জ্জন করিতে হয়[১২]

বালবৎসার দুগ্ধ অপেয়—বালবৎসা গাভীকে দোহন করিতে নাই। বালবৎসার দুগ্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় অপকারী।[১৩]

অর্কপত্রের অভক্ষ্যতা—আকন্দপাতা খাইলে মানুষ অন্ধ হইয়া যায়।

---

৯ গুণাশ্চ যগ্নিতভুক্তং ভজন্তে। ইত্যাদি। উ ৩৭।৩৪। অনু ১০৪।২৩। অনু ৯৮।১০
রক্তমাল্যং ন ধার্য্যং স্যাচ্ছুক্লং ধার্য্যন্তু পণ্ডিতৈঃ।
বর্জ্জয়িত্বা তু কমলং তথা কুবলয়ং প্রভো॥ অনু ১০৪।৮৩
ঘৃষ্টো বটকষায়েণ অনুলিপ্তঃ প্রিয়ঙ্গুনা। অনু ১২৫।৫২

১০ পথ্যং মুক্ত্বা তু যো মোহাদ্দুষ্টমশ্নাতি ভোজনম্।
পরিণামমবিজ্ঞায় তদন্তং তস্য জীবিতম্॥ ইত্যাদি। শা ১৩৯।৮১,৮০

১১ ন শব্দবৎ। অনু ১০৪।৯৬

১২ অন্নং বুভুক্ষমাণস্তু ত্রির্ম্মুখেন স্পৃশেদপঃ।
ভুক্ত্বা চান্নং তথৈব ত্রির্দ্বিঃ পুনঃ পরিমার্জ্জয়েৎ॥ ইত্যাদি। অনু ১০৪।৫৫-৬০,৬১,৬৬

১৩ বালবৎসাঞ্চ যে ধেনুং দুহন্তি ক্ষীরকারণাৎ।
তেষাং দোষান্ প্রবক্ষ্যামি তান্নিবোধ শচীপতে॥ অনু ১২৫।৬১

আকন্দপাতার ক্ষার, তিক্ত, কটু, রূক্ষ, এবং তীক্ষ্ণবিপাক গুণ চক্ষুর উপঘাতক।[১৪]

শ্লেষ্মাতক ভক্ষণের দোষ—শ্লেষ্মাতক-(চালতে) ফল ভোজন করিলে বুদ্ধিমান্দ্য ঘটে।[১৫]

নস্যকর্ম্ম—প্রয়োজন হইলে নাকের দ্বারা ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়। তাহাকে নস্যকর্ম্ম বলে।[১৬]

বর্জ্জনীয় কর্ম্ম—স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত সায়ংকালে ও রাত্রিতে বর্জ্জনীয় কতকগুলি কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে শয়ন করা অনুচিত, ঐ সময়ে বিদ্যাভাস করিতে নাই। সায়ংকালে ভোজন করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়। রাত্রিতে পিত্র্য কর্ম্ম করিতে নাই, রাত্রিতে স্নান করা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। ভোজনের পর প্রসাধন করিতে নাই। রাত্রির খাদ্য যথাসম্ভব লঘুপাক হওয়া উচিত এবং রাত্রিতে আকণ্ঠ ভোজন করিতে নাই। হাত বা পা ভিজা অবস্থায় নিদ্রা যাইবে না।[১৭]

জ্বরোৎপত্তির বিবরণ—এক অধ্যায় ব্যাপিয়া জ্বরের উৎপত্তিবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। জ্বরে পীড়িত হইয়া বৃত্রাসুর অতিমাত্রায় বলহীন হইয়া পড়িলে ইন্দ্র তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। মেরুপর্ব্বতের একটি শৃঙ্গের নাম ছিল 'জ্যোতিষ্ক'। সেই শৃঙ্গটি সর্ব্বরত্নবিভূষিত এবং অতিশয় পূজিত। একদা হরপার্ব্বতী সেই শৃঙ্গের তটদেশে সুখাসীন হইয়া নানাবিধ বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন, এমন সময় অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কুবের প্রমুখ দেবগণ এবং উশনা, সনৎকুমার, অঙ্গিরা প্রমুখ ঋষিগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেবতা ও ঋষিগণ গঙ্গাদ্বারে দক্ষের অশ্বমেধযজ্ঞে চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতীর প্রশ্নে মহাদেব দেবতা ও ঋষিদের গমনের কারণ বিস্তৃতভাবে বলিলেন। মহাদেবের নিমন্ত্রণ হয় নাই জানিয়া

---

১৪ স তৈরর্কপত্রৈর্ভক্ষিতৈঃ ক্ষারতিক্তকটুরূক্ষৈস্তীক্ষ্ণবিপাকৈ-
শ্চক্ষুষ্যুপহতোঽন্ধো বভূব। আদি ৩।৫১

১৫ শ্লেষ্মাতকী ক্ষীণবর্চ্চাঃ শৃণোষি। বন ১৩৪।২৮

১৬ নস্যকর্ম্মভিরেব চ। ভেষজৈঃ স চিকিৎস্যঃ স্যাৎ। শা ১৪।৩৪

১৭ সন্ধ্যায়াং ন স্বপেদ্রাজন্ বিদ্যাং ন চ সমাচরেৎ
ন ভুঞ্জীত চ মেধাবী তথায়ুর্বিন্দতে মহৎ॥ ইত্যাদি। অনু ১০৪।১১৯-১২২, ৬১।
অনু ১৬২।৬৩

পার্ব্বতী অতিশয় দুঃখিতা হইয়া মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয় যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। মহাদেব পার্ব্বতীর মনোদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত নন্দী প্রভৃতি ভীষণকায় অনুচরগণের দ্বারা যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দিলেন। অতিশয় ক্রোধে শঙ্করের ললাট হইতে স্বেদবিন্দু ভূতলে পতিত হইল। সেই ভূপতিত বিন্দু হইতে কালানলের মত মহান্ অগ্নির উদ্ভব হইল। সেই অগ্নি হইতে হ্রস্ব, রক্তাক্ষ, ঊর্দ্ধকেশ, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবাস এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তখন ব্রহ্মা মহাদেবকে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া এবং যজ্ঞে তাঁহার বিশেষ একটি আহুতির প্রতিশ্রুতি দিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করেন। ব্রহ্মাই রুদ্রের ক্রোধাগ্নিসম্ভূত সেই অতিকায় পুরুষটির নাম রাখিলেন 'জ্বর'। দেবতাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব জ্বরকে সর্ব্বত্র আধিপত্যের আদেশ দিলেন। তদবধি জ্বরের প্রভাব সর্ব্বত্র।

প্রাণিভেদে জ্বরের প্রকাশ—বৃক্ষের শীর্ষতাপকে জ্বর বলে, পর্ব্বতের জ্বর শিলাজতু, জলের শৈবাল, সাপের খোলস, গরুর পাদরোগ, পৃথিবীর উষরতা, পশুদের দৃষ্টিহীনতা, অশ্বের গলরন্ধ্রগত মাংসখণ্ড, ময়ূরের শিখোদ্ভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা, ব্যাঘ্রের শ্রম—এইগুলিই জ্বরের লক্ষণ। প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম ও মৃত্যুর সময় জ্বর থাকে।[১৮]

ইন্দ্রিয়ের অসংযমে যক্ষ্মারোগ—যাহারা অতিশয় অজিতেন্দ্রিয়, যক্ষ্মারোগ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। বিচিত্রবীর্য্য এবং ব্যুষিতাশ্ব অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গের ফলে অকালে যক্ষ্মারোগে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।[১৯]

রোগে শুশ্রূষা—রোগ হইলেই চিকিৎসা এবং যথোচিত সেবাশুশ্রূষা চালাইতে হয়। সুহৃদ্‌ব্যক্তিগণ শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিবেন।[২০]

শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি—রোগ সারাইবার নিমিত্ত সুহৃদ্‌বর্গ শান্তিস্বস্ত্যয়ন, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি দৈব অনুষ্ঠানও করিতেন।[২১]

১৮ শা ১৮২ তম অঃ।

১৯ তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহরন্ পৃথিবীপতিঃ।
বিচিত্রবীর্য্যস্তরুণো যক্ষ্মণা সমগৃহ্যত। ইত্যাদি। আদি ১০২।৭০। আদি ১২১।১৮

২০ সুহৃদাং যতমানানামাপ্তৈঃ সহ চিকিৎসকৈঃ। আদি ১০২।৭১

২১ রক্ষোঘ্নাংশ্চ তথা মন্ত্রান্ জেপুশ্চক্রুশ্চ তে ক্রিয়াঃ। বন ১৪৪।১৬

মূর্চ্ছারোগে চন্দনোদক—মূৰ্চ্ছিত ব্যক্তির মাথায় চন্দনোদক সেচনের দৃশ্য দেখা যায়।[২২]

বিষের দ্বারা বিষনাশ—বিষপ্রয়োগে ভীমসেনকে চেতনাহীন করিয়া দুর্য্যোধন নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেন। ভীম ক্রমশঃ রসাতলে উপস্থিত হইলেন। রসাতলে ভীষণ বিষধর সর্পগণ ভীমসেনকে দংশন করিল, তাহতেই ভীমের চৈতন্যের সঞ্চার হইল। সর্পবিষের ক্রিয়া দ্বারা স্থাবর বিষ বিনষ্ট হয়।[২৩]

রসায়ন—বাসুকির সুরক্ষিত কুণ্ডের রসায়ন পান করায় ভীমসেনের এমন শক্তি জন্মিয়াছিল যে, তিনি কালকূট বিষও হজম করিতে পারিতেন।[২৪]

বিশল্যকরণী প্রভৃতি—যুদ্ধবিগ্রহাদির সময়েও চিকিৎসকগণকে শিবিরে রাখা হইত। বীর পুরুষগণ বিশল্যকরণী প্রভৃতি বীর্য্যবতী ওষধি সঙ্গে রাখিতেন। ভীষ্মদেব ষষ্ঠদিবসীয় যুদ্ধের পর দুর্য্যোধনের শিবিরে যাইয়া তাঁহাকে বিশল্যকরণী দিয়াছিলেন।[২৫]

শল্য-চিকিৎসা—শরশতাচিত ভীষ্মদেবকে বিশল্য করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধন সমস্ত উপকরণের সহিত শল্যোদ্ধারে অতিশয় নিপুণ কয়েকজন চিকিৎসককে পিতামহ সমীপে উপস্থিত করিলেন। পিতামহ শল্যের উদ্ধারে অসম্মতি জানাইয়া বৈদ্যগণকে বিদায় দিতে আদেশ করিয়াছিলেন।[২৬]

অরিষ্টলক্ষণ—অনেকগুলি অরিষ্টলক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে মানুষ গাছপালাকে সোণালি-রংএর বলিয়া মনে করে। তাহার ইন্দ্রিয় অধিকাংশ বস্তুকেই অযথার্থরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।[২৭] মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ অরিষ্টলক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকে। অরুন্ধতী, ধ্রুব-নক্ষত্র, পূর্ণচন্দ্র এবং প্রদীপ যাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় না, তাঁহার আয়ুষ্কাল এক বৎসরের বেশী নহে। অপরের নেত্রতারকায় যিনি আপনার প্রতিকৃতি দেখিতে পান না, তিনিও সম্বৎসরের অধিককাল জীবিত থাকিবেন

২২ কুন্তীমাবাসয়ামাস প্রেক্ষাভিশ্চন্দনোদকৈঃ। আদি ১৩৬।২৮

২৩ ততোঽস্য দশ্যমানস্য তদ্বিষং কালকূটকম্।
হতং সর্পবিষেণৈব স্থাবরং জঙ্গমেন তু। আদি ১২৮।৫৭

২৪ তচ্চাপি ভুক্ত্বাঽজরয়দবিকারঃ বৃকোদরঃ। আদি ১২৯।৩৮,২২

২৫ এবমুক্ত্বা দদৌ চাস্মৈ বিশল্যকরণীং শুভাম্। ভী ৮১।১০

২৬ উপতিষ্ঠন্নথো বৈদ্যাঃ শল্যোদ্ধরণকোবিদাঃ। ভী ১২০।৫৬-৬০

২৭ মুমূর্ষুর্হি নরঃ সর্ব্বান্ বৃক্ষান্ পশ্যতি কাঞ্চনান্। ভী ৯৮।১৭

না, ইহা নিশ্চিত। শরীরের কান্তি যদি হঠাৎ অত্যন্ত বর্দ্ধিত কিংবা অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তাহা হইলে ছয় মাসের বেশী দেরী নাই। প্রজ্ঞার অতিশয় হ্রাসবৃদ্ধিও মাত্র ছয়মাস-কাল জীবনের সূচক। দেবতাকে অবজ্ঞা করা, ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করা, এইগুলিও মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া জানিবে। আপন ছায়াকে যদি ধূসরবর্ণ বলিয়া মনে হয়, তবে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু সুনিশ্চিত। সূর্য্য এবং চন্দ্রকে দেখিতে যদি তাঁহাদের ভিতর মাকড়শার চক্রের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের অনুভূতি হয়, তবে মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি আছে বুঝিতে হইবে। দেবগৃহে থাকিয়া সুরভি-দ্রব্যের গন্ধকে যে-ব্যক্তি শবগন্ধ বলিয়া অনুভব করে, তাহার আয়ু এক সপ্তাহের বেশী নহে। কাণ এবং নাকের অবনমন, দাঁত ও চোখের স্বাভাবিক বর্ণের নাশ, সংজ্ঞাহীনতা এবং শরীরের উত্তাপনাশ অতি শীঘ্র মৃত্যুর লক্ষণ। অকস্মাৎ যাঁহার বাম চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে এবং যাঁহার মাথা হইতে ধূম নির্গত হয়, তাঁহার মৃত্যু অতি সন্নিকট বলিয়া জানিবে।[২৮]

মন্ত্রাদিপ্রয়োগে রোগবিনাশ—রোগে ঔষধপ্রয়োগের মত মন্ত্রাদি-প্রয়োগেরও নিয়ম ছিল, রোগ ছাড়াও বহু বিষয়ে মন্ত্রশক্তির শরণ লওয়া হইত। (দুর্য্যোধন মায়াপ্রয়োগে হ্রদবারির স্তম্ভন করিয়াছিলেন।)[২৯]

বিষনাশক মন্ত্র—ব্রাহ্মণ কাশ্যপ তক্ষকদষ্ট অশ্বত্থের ভস্মরাশি সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রবলে পুনরায় তাহাতে জীবন-সঞ্চার করিয়াছিলেন।[৩০] (আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অগদতন্ত্রীয় কাশ্যপসংহিতা কি এই কাশ্যপেরই রচিত?)

সর্পাদির বিষহারক ঔষধ—সর্পবিষের বিনাশে পটু মন্ত্রবিৎ বহু ব্রাহ্মণ মহারাজ পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সর্পবিষবিনাশক নানাবিধ ঔষধও গৃহে স্থাপিত হইয়াছিল।[৩১]

মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা—আচার্য্য শুক্রের সঞ্জীবনীবিদ্যার প্রভাব প্রসিদ্ধ।

২৮ অরিষ্টানি প্রবক্ষ্যামি বিহিতানি মনীষিভিঃ।
সম্বৎসরবিয়োগস্য সম্ভবন্তি শরীরিণঃ॥ ইত্যাদি। শা ৩১৭।৮-১৭

২৯ অস্তম্ভয়ত তোয়ঞ্চ মায়য়া মনুজাধিপঃ। শল্য ২৯।৫২

৩০ ভস্মরাশিকৃতং বৃক্ষং বিদ্যয়া সমজীবয়ৎ। আদি ৪৩।৯

৩১ রক্ষাঞ্চ বিদধে তত্র ভিষজশ্চৌষধানি চ।
ব্রাহ্মণান্ মন্ত্রসিদ্ধাংশ্চ সর্ব্বতো বৈ ন্যযোজয়ৎ। আদি ৪২।৩০

এই বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতিনন্দন কচ দেবতাদের দ্বারা শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।[৩২]

ভবিতব্যের অবশ্যম্ভাবিতা—সংসারের অনিত্যতা এবং ভবিতব্যের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বহু উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে এক স্থানে বলিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হইয়াও বৈদ্যগণ রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। বিবিধ কষায়, ঘৃত প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াও তাঁহারা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পান না। রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ রসায়ন পান করিয়াও জরাগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পান।[৩৩]

জন্মতত্ত্ব—রাজর্ষি অষ্টকের প্রশ্নের উত্তরে যযাতি বলিয়াছেন, মানুষ আপন পুণ্যবলে স্বর্গলোকে বাস করে। পুণ্য ক্ষয় হইলেই বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গলোক হইতে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে পতিত হয়। পতনের সময় পথিমধ্যে নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। স্বর্গপ্রচ্যুতিকালে মেঘজালে প্রবেশ করিয়া দেহ জলময় হইয়া যায়। সেই জলীয় দেহ পুষ্প, ফল, বনস্পতি, ওষধি প্রভৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। গৃহস্থ-পুরুষ সেইসকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে তাহার সারভাগ রসাদি ধাতুতে পরিণত হয়। ক্রমশঃ রসাদি ধাতুই চরম ধাতু অর্থাৎ শুক্ররূপে পরিণত হইয়া কালক্রমে স্ত্রীগর্ভে নিষিক্ত হইলে জন্মান্তরীয় অদৃষ্টবলে জীব তাহাতে জন্মলাভ করে। বায়ু শুক্রকে আকর্ষণ করে, শুক্র আর্ত্তবের সহিত মিলিত হইলে দেহের সৃষ্টি হয়। অনন্তর জন্মান্তরীয় সংস্কারের সহিত সেই ক্ষুদ্র দেহ পূর্ণতা লাভ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। সকল জরায়ুজ প্রাণীরই এই নিয়ম। জীব যদি শুক্রের সহিত সংসৃষ্ট না হয়, তবে সেই শুক্র নিষিক্ত হইলেও গর্ভোৎপত্তি হয় না। জীবযুক্ত শুক্রশোণিত ক্রমশঃ বায়ুর দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। শুক্রের আধিক্যে পুরুষ, শোণিতের আধিক্যে স্ত্রী এবং উভয়ের সমতায় ক্লীবের উৎপত্তি হয়। বায়ুতাড়িত শুক্র ভিন্ন-ভিন্ন পথে জরায়ুতে প্রবিষ্ট হইলে যমজ-সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মানব-দম্পতির শুক্র ও শোণিতের মিলনে ভ্রূণ প্রথম দিনে কলল, পাঁচদিনে বুদ্বুদ্, সাতদিনে পেশী, একপক্ষে অর্ব্বুদ, পঁচিশ দিনে ঘন

৩২ আদি ৭৬ তম অঃ।

৩৩ আয়ুর্ব্বেদমধীয়ানাঃ কেবলং সপরিগ্রহাঃ।
দৃশ্যন্তে বহবো বৈদ্যা ব্যাধিভিঃ সমভিপ্লুতাঃ॥ ইত্যাদি। শা ২৮।৪৫-৪৭

এবং এক মাসে কঠিন আকার ধারণ করে। দুই মাসে মাথা, তিন মাসে গ্রীবাপর্য্যন্ত, চারিমাসে ত্বক্, পাঁচ মাসে নখ ও রোম, ছয় মাসে মুখ, নাক, চোখ ও কাণের সৃষ্টি হয়। সপ্তম-মাসীয় ভ্রূণ স্পন্দিত হয়, অষ্টম মাসে বুদ্ধির যোগ হয় এবং নবম মাসে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে। জন্মের পরক্ষণেই শিশু ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের অনুভব করিয়া থাকে। সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া কালপ্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর পর পুনরায় আপন-আপন কর্ম্মফল অনুসারে জন্মলাভ করে।[৩৪]

শুক্রের উৎপত্তি—শরীরের উপাদান ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত এবং মন আহার্য্য দ্রব্যের পরিপাকে পরিপুষ্ট হয়। এইগুলির পুষ্টিতে শরীরে শুক্রের উৎপত্তি হয়। জীব পঞ্চভূতের সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুর প্রভাবে প্রথমতঃ মেঘরূপে, অতঃপর বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া ওষধি প্রভৃতিতে পরিণত হয়। গৃহস্থ-পুরুষ কর্ত্তৃক ভুক্ত সেই-সেই দ্রব্য ক্রমশঃ রেতোরূপে পরিণত হইয়া যথাকালে গর্ভস্থ হইয়া থাকে। সংসারচক্র-বর্ণনে বৃহস্পতির উক্তি হইতে এইটুকু জানা যায়।[৩৫] জন্মান্তরীয় শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত জীবই মেঘাদির মধ্য দিয়া ক্রমশঃ রেতস্ত্ব প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে গর্ভে নিষিক্ত হইলে দেহ ধারণ করিয়া ফলভোগ করিতে থাকে। শুক্রের স্থান কফবর্গে এবং শোণিতের স্থান পিত্তবর্গে।[৩৬]

নারদ-দেবমত-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, শুক্র গর্ভকোষে প্রবেশ করার পরেই প্রাণবায়ু তাহাতে সংক্রমিত হয়। প্রাণের দ্বারা খাঁটি শুক্রের বিকৃতি ঘটিলে তাহাতে আপান-বায়ুর আবির্ভাব হয়, তখন স্থূলদেহের উৎপত্তি হইতে থাকে। পরমাত্মা সেই স্থূল-শরীর ও তাহার কারণের মধ্যে লিপ্ত

---

৩৪ আদি ৯০ তম অঃ। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

বিন্দুন্যাসাদয়োঽবস্থাঃ শুক্রশোণিতসম্ভবাঃ। ইত্যাদি। শা ৩২০।১১৫-১২০

পূর্ব্বমেবেহ কললে বসতে কিঞ্চিদন্তরম্॥ ইত্যাদি। স্ত্রী ৪।২-৮। অশ্ব ১৭।১৯-২১

৩৫ অন্নমশ্নন্তি যদ্দেবাঃ শরীরস্থা নরেশ্বর।

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতির্মনস্তথা॥ ইত্যাদি। অনু ১১১।২৮-৩০

৩৬ জীবঃ কর্ম্মসমাযুক্তঃ শীঘ্রং রেতস্ত্বমাগতঃ।

স্ত্রীণাং পুষ্পং সমাসাদ্য সূতে কালেন ভারত। অনু ১১১।৩৫

মেধ্যেষূর্দ্ধ্বং সন্নিধত্তে প্রাণানাং পবনঃ পতিঃ। ইত্যাদি। অনু ৬৩।৩৬-৪০

কফবর্গেঽভবচ্ছুক্রং পিত্তবর্গে চ শোণিতম্। হরি ৪১ শ অঃ।

না হইয়া সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন। কামনা দ্বারা শুক্র কেন্দ্রীভূত হয়। সমান এবং ব্যান-বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা শুক্রশোণিতের সৃষ্টি।[৩৭]

মনোবহা-নাড়ীর কাজ শুক্রাকর্ষণ—ভুক্ত দ্রব্যের রস শিরাজালের দ্বারা বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, ত্বক্‌, মাংস, স্নায়ু ও অস্থিকে বর্দ্ধিত করে। বাতাদিবাহিনী দশটি ধমনী মনুষ্যদেহে বর্ত্তমান। এই নাড়ীগুলি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের আপন-আপন বিষয়গ্রহণের পটুতা জন্মাইয়া থাকে। সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ধমনী উক্ত প্রধান দশটি ধমনীর ক্রিয়া দ্বারা সঞ্চালিত হয়। অসংখ্য ক্ষুদ্র নদী সাগরে মিলিত হইয়া যেরূপ সাগরের অস্তিত্ব বজায় রাখে, সেইরূপ মনুষ্যদেহের নাড়ীগুলি রসসঞ্চারের দ্বারা দেহসাগরকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। হৃদয়ের মধ্যস্থলে যে ধমনীটি অবস্থিত, তাহার নাম 'মনোবহা'। সঙ্কল্পজ শুক্রকে সর্ব্বশরীর হইতে আকর্ষণ করিয়া উপস্থের দিকে আকর্ষণ করা তাহার কাজ। সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত অপর শিরাগুলি চক্ষুর সহিত সম্বদ্ধ। এইকারণে সেইগুলি তৈজস গুণের দ্বারা দর্শনাদি ক্রিয়ার সহায়তা করে। মন্থনদণ্ডের মন্থনে যেরূপ দুগ্ধ হইতে নবনীত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সময়বিশেষে ইন্দ্রিয়সমূহ উত্তেজিত হইয়া থাকে। তখন আকর্ষণের দ্বারা মনোবহা-নাড়ী সঞ্চিত শুক্রকে বহির্গত করে। অন্নরস, মনোবহা-নাড়ী এবং সঙ্কল্প এই তিনটিই শুক্রের বীজ।[৩৮]

সন্তানদেহে মাতাপিতার দেহের উপাদান—অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা পিতা হইতে এবং ত্বক্‌, মাংস ও শোণিত মাতা হইতে পাওয়া যায়। সমস্ত শাস্ত্রে এইরূপই উক্ত হইয়াছে।[৩৯]

স্ত্রীলোকের জননীত্ব এবং পুরুষের প্রজাপতিত্ব—ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী প্রাণিগণের জনিত্রী, স্ত্রীলোকগণও তদ্রূপ। পুরুষ প্রজাপতি এবং শুক্র তেজোময়। ভগবান্‌ ব্রহ্মা স্ত্রীপুরুষ হইতে প্রজাবর্দ্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাণিগণ আপন-আপন কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ সংসারে

৩৭ শুক্রাচ্ছোণিতসংসৃষ্টাৎ পূর্ব্বং প্রাণঃ প্রবর্ত্ততে। ইত্যাদি। অশ্ব ২৪।৬-৯

৩৮ বাতপিত্তকফান্‌ রক্তং ত্বঙ্‌মাংসং স্নায়ুমস্থি চ। ইত্যাদি। শা ২১৪।১৬-২৩

৩৯ অস্থি স্নায়ুশ্চ মজ্জা চ জানীমঃ পিতৃতো দ্বিজ।
ত্বঙ্‌মাংসং শোণিতঞ্চেতি মাতৃজান্যপি শুশ্রুম। শা ৩০৫।৫

যাতায়াত করিয়া থাকে। যথাকালে ভোগের অভাবে স্ত্রীলোকদের অকালবার্দ্ধক্য দেখা দেয়।[৪০]

সন্তানজননে জননীর আনন্দাধিক্য—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না থাকিলে সন্তান সুস্থ ও তেজস্বী হইতে পারে না। উভয়েরই স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতার প্রয়োজন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আনন্দ অধিক হইয়া থাকে।[৪১]

দ্রোণাচার্য্যাদির অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তান্ত—অনেকগুলি অপ্রাকৃতিক জন্মবিবরণ দেখিতে পাই। দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী, মৎস্যরাজ,[৪২] মৎস্যগন্ধা,[৪৩] ঔর্ব্ব[৪৪] প্রমুখ পুরুষ ও মহিলাগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক-একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও বা মন্ত্রশক্তি, আর কোথাও বা অস্বাভাবিক কোন কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সূতিকাগারের চিত্র—সূতিকাগারের একটিমাত্র চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দেখা গেল, শরীরে কোন স্পন্দন নাই। অশ্বত্থামার ইষীকাস্ত্রে মাতৃগর্ভেই তাঁহার চৈতন্য লোপ পাইয়াছিল। কুন্তী ও সুভদ্রার কাতর ক্রন্দনে শ্রীকৃষ্ণ সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, চতুর্দ্দিকে জলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে, ঘরখানি শ্বেতমাল্যের দ্বারা সুশোভিত। ঘৃতের প্রদীপ, সর্ষপ এবং বিমল অস্ত্রাদি সজ্জিত রহিয়াছে। ঘরে আগুন জ্বলিতেছে। বৃদ্ধা রমণীগণ এবং সুদক্ষ চিকিৎসকগণ আপন-আপন কাজে ব্যস্ত। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা গৃহমধ্যে নানাবিধ ওষধি ও মাঙ্গলিক দ্রব্য স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সূতিকাগৃহের এইরূপ পরিপাটি দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।[৪৫]

পার্থিব দেহে অগ্ন্যাদির অবস্থিতি—পার্থিব দেহে অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি ভূতগণ কিরূপে অবস্থান করে, ভরদ্বাজের এই প্রশ্নে ভৃগু বলিয়াছেন,

---

৪০ পৃথিবী সর্ব্বভূতানাং জনিত্রী তদ্বিধাঃ স্ত্রিয়ঃ। ইত্যাদি। শা ১৯০।১৫,১৬
অসম্ভোগে জরা স্ত্রীণাম্। উ ৩৯।৭৯

৪১ অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনো ন প্রবর্দ্ধতে। অনু ৪৬।৪
স্ত্রিয়াঃ পুরুষসংযোগে প্রীতিরভ্যধিকা সদা। অনু ১২।৫২

৪২ স মৎস্যো নাম রাজাসীদ্ধার্ম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ। আদি ৬৩।৬৩

৪৩ সা কন্যা দুহিতা তস্যা মৎস্যা মৎস্যসগন্ধিনী। আদি ৬৩।৬৭

৪৪ ত্বদায়মূরুণা গর্ভো ময়া বর্ষশতং ধৃতঃ। আদি ১৭৯।৩

৪৫ ততঃ স প্রাবিশত্তূর্ণং জন্মবেশ্ম পিতুস্তব। ইত্যাদি। অশ্ব ৬৮।৩-৭

বিজ্ঞানাত্মা অগ্নি সহস্রারে অবস্থিত হইয়া সমস্ত শরীরকে পালন করিয়া থাকেন। প্রাণনামক বায়ু মূৰ্দ্ধায় এবং অগ্নিতে থাকিয়া শরীরকে বাঁচাইয়া রাখে। চিৎ, বিজ্ঞান এবং প্রাণের সঙ্ঘাতকেই জীব বলা হয়। সেই জীব নিখিল কার্য্যকারণের কর্ত্তা এবং সনাতন। জীব বিষয়ভেদে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ভূতসমুদয়রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

বায়ুপঞ্চকের কাজ—প্রাণের দ্বারা সর্ব্ব শরীর পরিচালিত। জাঠরাগ্নির সাহায্যে সমান-বায়ু মূত্রাশয় এবং পুরীষাশয়কে শোধন করিয়া থাকে। ভুক্ত দ্রব্যের পরিণতির কাজে জাঠরাগ্নি ও সমান-বায়ুর শক্তিই কাজ করিয়া থাকে। আপন-বায়ু মূত্রপুরীষাদির নিঃসারক। গমনাদির প্রযত্ন, উদান-বায়ুর কাজ। দেহের নিখিল সন্ধিস্থানে বর্ত্তমান বায়ুর নাম ব্যান। সমান-বায়ুর দ্বারা সমীরিত জাঠরাগ্নি ভুক্তদ্রব্য, ত্বক্ প্রভৃতি ধাতু এবং পিত্তাদিতে ব্যাপিয়া অবস্থান করে। নাভিমণ্ডলে সমান-বায়ুর অধিষ্ঠান, সেখানে থাকিয়া জাঠরাগ্নির যোগে ভুক্ত-দ্রব্যকে রসাদিতে পরিণত করে।

জাঠরাগ্নির নিয়ন্ত্রণে যোগসাধন—মুখবিবর হইতে পায়ু পর্য্যন্ত প্রাণপ্রবহণ-মার্গ অবস্থিত। অগ্নির বেগবহনকারী প্রাণবায়ু গুহ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া প্রতিহত হয়। পুনরায় উর্দ্ধদেশে প্রবাহিত হইয়া দেহস্থ অগ্নিকে সমুদ্দীপিত করিয়া তোলে। নাভির নীচে পাকাশয় এবং উপরে আমাশয় অবস্থিত। নাভিমণ্ডলে সকল বায়ুরই যাতায়াত আছে। সমস্ত রস হৃদয়স্থ হইয়া প্রাণাদি পঞ্চবায়ু এবং নাগাদি পঞ্চবায়ু, এই দশ বায়ুর সহায়তায় ধমনীদ্বারা সর্ব্বশরীরে প্রসৃত হয়। তাহাতেই মানুষের জীবন রক্ষা পায়। প্রাণকে নিরোধ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ এবং বশীভূত হয়। জাঠরাগ্নির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিলে যোগসাধন অনেকখানি অগ্রসর হয়।[৪৬]

পশু ও বৃক্ষাদির চিকিৎসা

দীর্ঘতমার গোধর্ম্ম-শিক্ষা—দীর্ঘতমামুনি গো-ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। (টীকাকার নীলকণ্ঠ গো-ধর্ম্ম শব্দের 'প্রকাশমৈথুন' অর্থ করিলেও গোধর্ম্ম-শব্দে

৪৬ শা ১৮৫ তম অঃ। বন ২১২।৩-১৬

গো-চিকিৎসাদিও বুঝা যাইতে পারে।) এই কারণে অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন না।[১]

অশ্বচিকিৎসায় নকুলের পটুতা—নকুল অশ্বচিকিৎসায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বিরাটপুরীতে অজ্ঞাতবাসকালে অশ্বচিকিৎসকরূপেই তিনি আপন পরিচয় প্রদান করেন।[২]

নল ও শালিহোত্রের পটুতা—নৃপতি নল অশ্বপরিচালনে এবং অশ্বের স্বভাবপরিজ্ঞানে অতিশয় বিচক্ষণ ছিলেন। আচার্য্য শালিহোত্র অশ্বশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।[৩]

গো-চিকিৎসায় সহদেবের প্রবীণতা—সহদেব গোচিকিৎসা-শাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন। বিরাটপুরীতে প্রবেশের সময় বলিয়াছেন, "আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গো-পরীক্ষক ছিলাম। আমার তত্ত্বাবধানে অতি শীঘ্রই গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। যে-সকল বৃষের সহিত সঙ্গত হইলে বন্ধ্যা বৎসতরীও বৎস প্রসব করে, মূত্রের ঘ্রাণ লইয়াই আমি সেইসকল বৃষকে চিনিতে পারি"।[৪]

সর্ব্বত্র প্রাণের স্পন্দন—সংসারে সর্ব্বত্রই প্রাণের স্পন্দন। জলেই হউক, আর স্থলেই হউক, প্রাণছাড়া কিছুই নাই। ফল-ফুলের ভিতরেও প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। যে-সকল প্রাণী অতিশয় সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহাদের দর্শন-স্পর্শন হয় না, তাহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অরণ্যচারী মুনিগণও প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত হিংসা করিতে বাধ্য হন, প্রাণ ব্যতীত কিছুই নাই।[৫]

বৃক্ষলতাদির শ্রবণস্পর্শনাদি-শক্তি—বৃক্ষলতাদির দেহ পাঞ্চভৌতিক

---

১ গোধর্ম্মং সোরভেয়াচ্চ সোঽধীত্য নিখিলং মুনিঃ।
প্রাবর্ত্তত তদা কর্ত্তুং শ্রদ্ধাবাংস্তমশঙ্কয়া॥ ইত্যাদি। আদি ১০৪।২৬-২৮

২ অশ্বানাং প্রকৃতিং বেদ্মি বিনয়ঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
দুষ্টানাং প্রতিপত্তিঞ্চ কৃৎস্নঞ্চৈব চিকিৎসিতম্॥ বি ১২।৭

৩ শালিহোত্রোঽথ কিন্নু স্যাদ্ধয়ানাং কুলতত্ত্ববিৎ। বন ৭১।২৭

৪ ক্ষিপ্রং হি গাবো বহুলা ভবন্তি, ন তাসু রোগো ভবতীহ কশ্চন। ইত্যাদি। বি ১০।১৩,১৪

৫ উদকে বহবঃ প্রাণাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ফলেষু চ। ইত্যাদি। শা ১৬।২৫-২৮
বৃক্ষাংস্তথৌষধীশ্চাপি ছিন্দন্তি পুরুষা দ্বিজ।
জীবা হি বহবো ব্রহ্মন্ বৃক্ষেষু চ ফলেষু চ। ইত্যাদি। বন ২০৭।২৬-৩৯

কি না, মহর্ষি-ভরদ্বাজ মহর্ষি-ভৃগুকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বৃক্ষলতাদির দেহে তেজ, বায়ু এবং আকাশের কোন কার্য্য না বুঝিতে পারায় ভরদ্বাজের সন্দেহ উপস্থিত হয়। বৃক্ষাদির শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন এবং রসগন্ধাদির অনুভূতি নাই, সুতরাং ইহাদের দেহ কিরূপে পাঞ্চভৌতিক হইবে, ইহাই সন্দেহের কারণ। প্রশ্নের উত্তরে ভৃগু বলিয়াছেন, বৃক্ষের শরীরের সূক্ষ্ম অবয়বগুলি (পরমাণু) যদিও ঘনসন্নিবিষ্ট, তথাপি তাহার মধ্যে আকাশ আছে, সন্দেহ নাই। আকাশ বা অবকাশ না থাকিলে পুষ্প এবং ফল জন্মিতে পারিত না। পাতা, ত্বক্, ফল, ফুল সবই সময়বিশেষে ম্লান হইয়া যায়, অতএব বুঝিতে হইবে যে, বৃক্ষাদিতেও তেজঃপদার্থ বিদ্যমান। ম্লানতা ও শীর্ণতা দেখিয়া স্পর্শানুভূতির অনুমান করিতে পারা যায়। বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির তাপ, এবং বজ্রের নির্ঘোষে ফল ও পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং অনুমিত হয় যে, বৃক্ষাদির শুনিবার সামর্থ্য আছে। দূরস্থ লতাও তাহার অবলম্ব্য বৃক্ষটির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ইহাতে তাহার দৃষ্টিশক্তির অনুমান করা যাইতে পারে। নানাবিধ গন্ধদ্রব্য এবং ধূপের সুবাসে বৃক্ষাদির রোগ নাশ হয়। অতএব গন্ধ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই তাহাদের আছে। শিকড়ের দ্বারা জলগ্রহণ করিবার সামর্থ্যও বৃক্ষাদির আছে। কোন-কোন বৃক্ষলতা জল পাইলে মরিয়া যায়, আবার কোন কোন বৃক্ষলতা জল পাইলে বাঁচিয়া উঠে। সুতরাং বৃক্ষাদিরও রসনেন্দ্রিয় আছে। পদ্মের নাল মুখে দিয়া যেরূপ জল পান করা যায়, সেইরূপ বৃক্ষাদিও বাতাসের সহায়তায় শিকড় দিয়া জলগ্রহণ করিতে পারে।

বৃক্ষাদির জীবন ও পুষ্টি প্রভৃতি—সুখ-দুঃখের অনুভূতি এবং ছিন্ন শাখাদির পুনঃ প্ররোহণ দেখিয়া বৃক্ষাদির জীবনের অনুমান করিতে পারা যায়। অগ্নি এবং বায়ু বৃক্ষাদির গৃহীত জল প্রভৃতি খাদ্যকে রসাদিতে পরিণত করে। এইহেতু তাহাদের পুষ্টিও সাধিত হয়। জঙ্গম প্রাণীদের দেহে যেরূপ পঞ্চভূতের অনুভব করিতে পারা যায়, স্থাবর প্রাণিদেহেও তদ্রূপ পঞ্চভূতের লীলা চলিতেছে।[৬]

বিষপ্রয়োগে বৃক্ষাদির মূর্চ্ছা—তীব্র বিষ প্রয়োগ করিলে বৃক্ষাদির

[৬] শা ১৮৪ তম অঃ।

মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। তাহার প্রতীকার করিলে পুনরায় সুস্থতা লাভ করে।[৭]

বৃক্ষাদিও পুত্রবৎ পরিপালনীয়—স্থাবর প্রাণী ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, ত্বক্‌সার ও তৃণ। ইহাদের রোপণে ও পরিবর্দ্ধনে অসংখ্য পুণ্যফল কীর্ত্তিত হইয়াছে।[৮] বৃক্ষাদিকেও পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবার উপদেশ দেখিতে পাই।[৯] এইসকল উক্তি হইতে প্রতীত হয় যে, তৎকালে বৃক্ষের রোপণ ও পালন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত।

করঞ্জকবৃক্ষে দীপদান—সুবর্চ্চলা-নামক বল্লীর মূলদেশ স্পর্শ করিয়া যে-ব্যক্তি এক বৎসর ব্যাপিয়া করঞ্জকবৃক্ষে দীপ দান করেন, তাঁহার সন্ততি বর্দ্ধিত হয়।[১০] এই কাজের দ্বারা উল্লিখিত বৃক্ষ ও বল্লীর সম্ভবতঃ কোন উপকার হয়।

সকল প্রাণীরই ভাষা আছে—জগতে সকল প্রাণীরই আপন-আপন মনোভাব প্রকাশ করিবার ভাষা আছে।[১১]

গান্ধর্ব্ব

গন্ধর্ব্বগণের আচার্য্যত্ব—মহাভারতে 'সঙ্গীত'-শব্দের প্রয়োগ নাই। 'গান্ধর্ব্ব'শব্দে সঙ্গীতবিদ্যাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। গন্ধর্ব্বগণ এই বিদ্যার আচার্য্য। নারদ-নামে একজন দেবগন্ধর্ব্বও ছিলেন।[১] অতিবাহু, হাহা, হূহু এবং তুম্বুরু গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা কশ্যপপত্নী কপিলার সন্তান।[২]

---

৭ স তীক্ষ্ণবিষদিগ্ধেন শরেণাতিবলাৎ ক্ষতঃ।
উৎসৃজ্য ফলপত্রাণি পাদপঃ শোষমাগতঃ॥ অনু ৫।৬
ভস্মরাশিকৃতং বৃক্ষং বিদ্যয়া সমজীবয়ৎ। আদি ৪৩।৯

৮ অত ঊর্দ্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি বৃক্ষাণামবরোপণম্। ইত্যাদি। অনু ৫৮।২২-২৬

৯ তস্য পুত্রা ভবন্ত্যেতে পাদপা নাত্র সংশয়ঃ। অনু ৫৮।২৭

১০ যস্তু সম্বৎসরং পূর্ণং দদ্যাদ্দীপং করঞ্জকে।
সুবর্চ্চলামূলহস্তঃ প্রজা তস্য বিবর্দ্ধতে॥ অনু ১২৭।৮

১১ ভাষাজ্ঞশ্চ শরীরিণাম্। অনু ১১৭।৮

১ কলিঃ পঞ্চদশস্তেষাং নারদশ্চৈব ষোড়শঃ। আদি ৬৫।৪৪

২ সুপ্রিয়া চাতিবাহুশ্চ বিখ্যাতৌ চ হাহা হুহুঃ।
তুম্বুরুশ্চেতি চত্বারঃ স্মৃতা গন্ধর্ব্বসত্তমাঃ॥ ইত্যাদি। আদি ৬৫।৫১, ৫২

মার্কণ্ডেয়পুরাণে নাগরাজ অশ্বতর ও কম্বলের গান্ধর্ব্ববিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ আছে। মহাভারতেও ইঁহাদের নাম গৃহীত হইয়াছে।[৩]

দেবর্ষি নারদের অভিজ্ঞতা—দেবগন্ধর্ব্ব নারদ এবং দেবর্ষি নারদ সম্ভবতঃ এক ব্যক্তি নহেন। দেবর্ষির হাতে চমৎকার একটি বীণা থাকিত, তিনি নৃত্য ও গীতে কুশল ছিলেন। গান্ধর্ব্ববিদ্যায় তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা নানাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।[৪]

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ—গন্ধর্ব্ব-চিত্রসেন হইতে অর্জ্জুন গীত, বাদিত্র ও নৃত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে তিনি গান্ধর্ব্ব-বিদ্যায় মনোযোগ দেন। শ্রীকৃষ্ণও গান্ধর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ ছিলেন।[৫]

কচ—শুক্রাচার্য্যের শিষ্য বৃহস্পতিনন্দন কচ নৃত্য, গীত ও বাদিত্রে বিশেষ পটু ছিলেন। ইহাও দেবযানীর আকর্ষণের অন্যতম কারণ।[৬]

মহিলাগণের গান্ধর্ব্বশিক্ষা—মহিলাসমাজেও গান্ধর্ব্ববিদ্যার কম প্রসার ছিল না। বড়লোকের বাড়ীতে সঙ্গীতের শিক্ষক রাখা হইত। অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জ্জুন বিরাটদুহিতা উত্তরার সঙ্গীতশিক্ষকরূপেই নিযুক্ত হন। উত্তরার সহচরীরাও অর্জ্জুনকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন।[৭] শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী সঙ্গীতবিদ্যায় অভিজ্ঞা ছিলেন।[৮] যযাতির কন্যা মাধবী গান্ধর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন।[৯] শান্তনুর পত্নী গঙ্গাদেবী নৃত্য করিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিতেন।[১০]

অপ্সরাগণ—বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা, উর্ব্বশী প্রমুখ

৩ কম্বলাশ্বতরৌ চাপি * * * *। আদি ৩৫।১০

৪ কচ্ছপীং সুখশব্দাং তাং গৃহ্য বীণাং মনোরমাম্।
নৃত্যে গীতে চ কুশলো দেবব্রাহ্মণপূজিতঃ। ইত্যাদি। শল্য ৫৪।১৮। শা ২১০।২১
বল্লকীবাদ্যমাত্মন্ সপ্তস্বরবিমূর্চ্ছনাং। ইত্যাদি। হরি, বিষ্ণু ৮৫ তম অঃ।

৫ নৃত্যং গীতঞ্চ কৌন্তেয় চিত্রসেনাদবাপ্নুহি। ইত্যাদি। বন ৪৪।৬-১০।
হরি, বিষ্ণু ১৪৮ তম অঃ।

৬ গায়ন্ নৃত্যন্ বাদয়ংশ্চ দেবযানীমতোষয়ৎ। আদি ৭৬।২৪

৭ বি ১১ শ অঃ।

৮ গায়ন্তী চ ললন্তী চ রহঃ পর্য্যচরত্তথা। আদি ৭৬।২৬

৯ বহুগন্ধর্ব্বদর্শনা। উ ১১৬।২

১০ সম্ভোগস্নেহচাতুর্য্যৈর্হাবলাস্যমনোহরৈঃ। আদি ৯৮।১০

অপ্সরাগণ স্বর্গলোকে ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত করেন, এই বর্ণনা বহু স্থানে পাওয়া যায়।

উৎসবাদিতে সঙ্গীতের স্থান—নৃত্য, গীত এবং বাদ্য নির্দ্দোষ আমোদের মধ্যে পরিগণিত ছিল।[১১] সকলপ্রকার উৎসবেই নৃত্যগীতাদি অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। বিবাহসভায় সর্ব্বত্র নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বাড়াবাড়ি দেখিতে পাই।[১২] পরীক্ষিতের জন্মদিবসে নৃত্যগীতের অবধি ছিল না। রৈবতকে বৃষ্ণ্যন্ধককুলের মহোৎসব উপলক্ষ্যে সঙ্গীতের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা বিশেষ জাঁকজমকের। যুদ্ধে জয় লাভ হইলে বীরগণ শঙ্খ ও ভেরীর নিনাদে আকাশপাতাল মুখরিত করিয়া তুলিতেন।[১৩] কোন মহৎ ব্যক্তির যাত্রাকালে নানাপ্রকার বাদ্য করার নিয়ম ছিল।[১৪] কুরুপাণ্ডবের শস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষার সময় যে সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হয়, তাহাতেও একদল বাদককে সমাদরে স্থান দেওয়া হইয়াছে।[১৫]

নৃপতিদের নিদ্রাকালে ও নিদ্রাভঙ্গে বৈতালিক—রাত্রিতে রাজাদের নিদ্রা যাইবার সময় এবং প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের সময় নির্দ্দিষ্ট স্তাবকগণ সুমধুর গীতি ও বীণাবাদ্যে তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতেন।[১৬]

যাগযজ্ঞে সঙ্গীত—যাগযজ্ঞাদিতেও গান্ধর্ব্ববিদ্যার বিশেষ আদর ছিল। নট-নর্ত্তক প্রমুখ গুণিগণ যজ্ঞমণ্ডপের নিকটেই সসম্মানে স্থান পাইতেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে নারদ, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন প্রমুখ গান্ধর্ব্ববিশারদ সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অবকাশমত উপস্থিত যাজ্ঞিক ও দর্শকগণকে নৃত্যগীতের দ্বারা আপ্যায়িত করিতেন।[১৭]

রাজসভায় বিশেষ সমাদর—সঙ্গীতজ্ঞ গুণিজন রাজসভায় বিশেষভাবে

১১ শা ১৯১।১৬

১২ সূতমাগধসঙ্ঘাশ্চাপ্যস্তুবংস্তত্র সুস্বরাঃ। আদি ১৮৮।২৪

১৩ অশ্ব ৭০।১৮। আদি ২১৯।৪। আদি ১১৩।৪৫। বি ৬৮।২৭

১৪ ততঃ প্রযাতে দাশার্হে প্রাবাদ্যন্তৈকপুষ্করাঃ। উ ৯৪।২১

১৫ প্রাবাদ্যন্ত চ বাদ্যানি সশঙ্খানি সমন্ততঃ। আদি ১৩৫।১০

১৬ সভা ৫৮।৩৬। আদি ২১৮।১৪। শা ৫৩।৩-৬

১৭ কথয়ন্তঃ কথা বহ্বীঃ পশ্যন্তো নটনর্ত্তকান্। ইত্যাদি। সভা ৩৩।৪৯। অশ্ব ৮৫।৩৭
নারদশ্চ বভূবাত্র তুম্বুরুশ্চ মহাদ্যুতিঃ। ইত্যাদি। অশ্ব ৮৮।৩৯, ৪০

সংস্কৃত হইতেন ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য্যের বর্ণনায় সঙ্গীতের কথাও বলা হইয়াছে।[১৮]

বাদ্যযন্ত্র—শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, বাঁশি, বীণা, ঝল্লীষক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যন্ত্রসঙ্গীত-অনুশীলনের বর্ণনাও করা হইয়াছে।[১৯]

শতাঙ্গ তূর্য্য—নখ, অঙ্গুলি, দণ্ড, ধনু, জ্যা, মুখ প্রভৃতি দ্বারা নানা উপায়ে তূর্য্য বাদ্যের বিষয় বলা হইয়াছে। এই কারণে তূর্য্য-বাদ্যকে 'শতাঙ্গ' বলা হইত।[২০]

মাঙ্গলিক কার্য্যে ও যুদ্ধভূমিতে শঙ্খধ্বনি—সর্ব্ববিধ মাঙ্গলিক কার্য্যেই শঙ্খধ্বনি বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়াছিল।[২১] যুদ্ধে শঙ্খধ্বনি বিষয়ে 'যুদ্ধ-প্রবন্ধে' আলোচনা করা হইয়াছে।

ছালিক্য-গান—হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বে ছালিক্যগান-নামে একপ্রকার যন্ত্রসঙ্গীতের উল্লেখ করা হইয়াছে। বীণা, ঝল্লীষক, বাঁশি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্রযোগে পাঁচজন গান্ধর্ব্ববিৎ একত্র হইয়া যে বৈঠকী গান করেন, তাহাই সম্ভবতঃ ছালিক্যগান। বর্ণনা দেখিলে সেইরূপই মনে হয়।[২২]

ষড়্জাদি সপ্তস্বর—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এবং নিষাদ এই সাতটি স্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বর শব্দবিশেষ, সুতরাং আকাশ হইতে তাহার উৎপত্তি।[২৩]

গান্ধর্ব্বে অত্যাসক্তি নিন্দনীয়—সঙ্গীত-আলোচনার বহু উদাহরণ

১৮ গন্ধর্ব্বাস্তম্বুরুঃশ্রেষ্ঠাঃ কুশলা গীতসামসু। ইত্যাদি। বন ৪৩।২৮-৩২
গীতবাদিত্রকুশলাঃ সম্যক্ তালবিশারদাঃ। ইত্যাদি। সভা ৪।৩৮, ৩৯

১৯ শঙ্খানপ মৃদঙ্গাংশ্চ প্রবাদ্যন্তি সহস্রশঃ।
বীণাপণববেণূনাং স্বনশ্চাতিমনোরমঃ॥ ইত্যাদি। শা ৫৩।৪। শা ১২০।২৪।
হরি, বিষ্ণু ১৪৮ তম অঃ।

২০ শতাঙ্গানি চ তূর্য্যাণি বাদকাঃ সমবাদয়ন্। আদি ১৮১।২৪

২১ তত্র স্ম দধ্মুঃ শতশঃ শঙ্খান্ মঙ্গলকারকান্। ইত্যাদি। সভা ৫৩।১৭। বি ৭২।২৭

২২ ছালিক্যগানং বহুসংবিধানং তদ্দেবগন্ধর্ব্বমুদাহরন্তি। ইত্যাদি। হরি, বিষ্ণু ১৪৮ তম অঃ

২৩ ষড়্জ ঋষভগান্ধারৌ মধ্যমো ধৈবতস্তথা।
পঞ্চমশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্॥ ইত্যাদি। শা ১৮৪।৩৯, ৪০।
হরি, বিষ্ণু ৮৫ তম অঃ।

থাকিলেও একস্থানে বলা হইয়াছে যে, নৃত্যগীতাদিতে অতিমাত্রায় আসক্তি থাকা ভাল নয়, তাহাতে নানাবিধ দোষ ঘটে।[২৪] যদিও রাজধর্ম্মপ্রকরণে এই উক্তি শুনিতে পাই, তথাপি সর্ব্বত্র এই উপদেশ না খাটিবার কোন কারণ নাই। অবশ্য গান্ধর্ব্ববিদ্যাই যাঁহাদের জীবিকার উপায় অথবা উপাসনার অঙ্গ, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

ব্যাকরণ ও নিরুক্তাদি

ব্যাকরণ অবশ্য-পঠনীয়—মহর্ষি বৃহস্পতি গুরু প্রজাপতিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভগবন, আমি ঋক্, সাম, যজুঃ, ছন্দঃ, নক্ষত্রগতি, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, কল্প এবং শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, কিন্তু আত্মতত্ত্ব বিষয়ে কিছুমাত্র অবগত নহি। দয়া করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন"।[১] (ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭।১) নারদ-সনৎকুমার সংবাদেও এইরূপ কথা আছে।)

বৈয়াকরণ-শব্দের অর্থ—সনৎসুজাতীয়-প্রকরণে বলা হইয়াছে, যিনি শব্দগত অর্থ, ব্যুৎপত্তি প্রভৃতির ব্যাক্রিয়া অর্থাৎ তত্ত্বার্থ বুঝেন, তাঁহাকে বৈয়াকরণ বলে। শুধু শব্দশাস্ত্রবেত্তা প্রকৃত বৈয়াকরণ নহেন, যিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ সম্যক্ অবগত আছেন, তিনিই যথার্থ বৈয়াকরণ।[২]

শিক্ষাদি ষড়ঙ্গপাঠে শ্রেয়োলাভ—পরাশরগীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষশাস্ত্ররূপ বেদের ষড়ঙ্গ মানবের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।[৩] ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গশাস্ত্র স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্গত। জাপকোপাখ্যানে বলা হইয়াছে, যাঁহারা

২৪ পানমক্ষাস্তথা নার্য্যো মৃগয়া গীতবাদিতম্।
এতানি যুক্ত্যা সেবেত প্রসঙ্গো হ্যত্র দোষবান্॥ শা ১৪০।২৬

১ ঋক্ সামসঙ্ঘাংশ্চ যজূংষি চাপি ছন্দাংসি নক্ষত্রগতিং নিরুক্তম্।
অধীত্য চ ব্যাকরণং সকল্পং শিক্ষাঞ্চ ভূতপ্রকৃতিং ন বেদ্মি॥ ইত্যাদি। শা ২০১।৮,৯

২ সর্ব্বার্থানং ব্যাকরণাদ্বৈয়াকরণ উচ্যতে। উ ৪৩।৬১

৩ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি বেদাশ্চ ষড়ঙ্গানি নরাধিপ।
শ্রেয়সোহর্থে বিধীয়ন্তে নরস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥ শা ২৯৭।৪০

ষড়ঙ্গ এবং মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হন।[৪]

আর্ষ প্রয়োগ—কোন্ ব্যাকরণ তৎকালে প্রচলিত ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। মহাভারতে এরূপ অসংখ্য শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে যেগুলির সাধুত্ব রক্ষিত হয় না। অগত্যা আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া নমস্কার করিতে হয়। সন্ধি এবং ধাতুরূপেই আর্ষপ্রয়োগের বাহুল্য, শব্দসাধনে আর্ষপ্রয়োগ কম। অধ্যাপকপরম্পরায় জানা যায়, তৎকালে 'মাহেশ'-নামে প্রকাণ্ড এক ব্যাকরণ ছিল। সেই ব্যাকরণসাগরের তুলনায় পাণিনি নাকি গোষ্পদমাত্র।[৫]

ষড়ঙ্গের কথা—ষড়ঙ্গের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ ব্যাকরণ, শিক্ষা, ছন্দঃ ও নিরুক্তের নামমাত্র গৃহীত হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে কল্পের কথা পাওয়া যায়। জ্যোতিষের আলোচনাও অতি সংক্ষিপ্ত।

যাস্কের নিরুক্ত—যাস্কাচার্য্যের নিরুক্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। নারায়ণীয়-প্রকরণে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "উদারধী ঋষি যাস্ক 'শিপিবিষ্ট'-নামে আমার স্তুতি করিয়াছিলেন, আমার প্রসাদেই নিরুক্তশাস্ত্র তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়। পাতাল হইতে তিনি নিরুক্তকে উদ্ধার করেন"।[৬]

নির্ঘণ্টু—নির্ঘণ্টু-(নিঘণ্টু) প্রক্রিয়া দ্বারা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ-গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে।[৭]

মূল কারণ শ্রীভগবান্—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "বেদের বিভিন্ন শাখা, শাখাভেদে স্বরাদির উচ্চারণ এবং গীতিসমূহ আমাহইতেই উৎপন্ন হইয়াছে"।[৮]

৪ মহাস্মৃতিং পঠেদ্ যস্তু তথৈবানুস্মৃতিং শুভাম্।
তাবপোতেন বিধিনা গচ্ছেতাং মৎসলোকতাম্॥ শা ২০০।৩০। দ্রঃ নীলকণ্ঠ

৫ যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥ (প্রাচীন উক্তি)

৬ স্তুত্বা মাং শিপিবিষ্টেতি যাস্ক ঋষিরুদারধীঃ।
মৎপ্রসাদাদধো নষ্টং নিরুক্তমভিজগ্মিবান্॥ শা ৩৪২।৭৩

৭ নির্ঘণ্টুকপদাখ্যানে বিদ্ধি মাং বৃষমুত্তমম্। শা ৩৪২।৮৮

৮ স্বরবর্ণসমুচ্চারাঃ সর্ব্বাংস্তান্ বিদ্ধি মৎকৃতান্। শা ৩৪২।১০০

গাবল-মুনির ক্রম (কল্প)ও শিক্ষাপ্রণয়ন—ঋষি বামদেবের আদিষ্ট ধ্যানপথ অবলম্বন করিয়া বাভ্রব্যগোত্র পাঞ্চাল গালবমুনি নারায়ণের উপাসনা করেন। নারায়ণের প্রসাদে তিনি ক্রম ও শিক্ষাশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।[৯]

জ্যোতিষ

গণিত, ফলিত ও শাকুনবিদ্যা—নানাপ্রসঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন-কোন বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাভারতের জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে গণিত, ফলিত এবং শাকুনবিদ্যা-নামে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। গণিতজ্যোতিষের উল্লেখ কম। যেগুলি আছে, তাহারও অধিকাংশ আধুনিক জ্যোতিষের মতবাদের সহিত মিলিবে না।

সূর্য্য গতিশীল—সূর্য্যকে গতিশীল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মধ্যাহ্ন-সময়ে নিমেষার্দ্ধ-কাল সূর্য্য স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন।[১]

সূর্য্যকিরণের পাপনাশকতা—সূর্য্যের কিরণে পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।[২] সূর্য্যরশ্মি-সেবনে বহুবিধ রোগের নাশ হয়, এই কথা চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন।

চন্দ্র রসাত্মক—চন্দ্রকিরণে ওষধিসমূহ পুষ্টি লাভ করে, বৃক্ষলতাদিতে অভিনব প্রাণরসের সঞ্চার হয়। চন্দ্র স্বয়ং রসস্বরূপ।[৩]

সকল প্রাণীর উপর চন্দ্রের প্রভাব—জগতের সকল প্রাণীই চন্দ্রের স্নেহশীতল স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। চন্দ্র প্রাণিবর্গের আনন্দের হেতু।

৯ বামাদেশিতমার্গেণ মৎপ্রসাদান্মহাত্মনা।

* * * *

ক্রমং প্রাণীয় শিক্ষাঞ্চ প্রণয়িত্বা স গালবঃ॥ শা ৩৪২।১০২-১০৪

১ চলং নিমিত্তং বিপ্রর্ষে সদা সূর্য্যস্য গচ্ছতঃ।

কথং চলং ভেৎস্যসি ত্বং সদা যান্তং দিবাকরম্॥ অনু ৯৬।৪

মধ্যাহ্নে বৈ নিমেষার্দ্ধং তিষ্ঠসি ত্বং দিবাকর। অনু ৯৬।৬

২ রশ্মিভিস্তাপিতোঽর্কস্য সর্ব্বপাপমপোহতি। অনু ১২৫।৫৬

৩ পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ। ভী ৩৯।১৩

পুষ্পের বিকাশে কৌমুদীর প্রয়োজনীয়তা আছে। চন্দ্র হইতেই পুষ্পের উৎপত্তি। (এই উক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝা গেল না।)[৪]

মহাপ্রলয়ে সপ্তগ্রহ কর্তৃক চন্দ্রের বেষ্টন—মহাপ্রলয়ের সময় সাতটি গ্রহ (?) চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকে। গ্রহপরিবেষ্টিত চন্দ্রের জ্যোতি ক্রমশঃ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলেই প্রলয়কাল সমুপস্থিত বলিয়া জানিবে।[৫]

গ্রহগণ নক্ষত্রমণ্ডলের ঊর্দ্ধে—গ্রহগণ নক্ষত্রমণ্ডল হইতে উচ্চস্থানে অবস্থিত।[৬]

পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের নক্ষত্রতাপ্রাপ্তি—যে-সকল পুণ্যাত্মা ইহলোকে নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দেহত্যাগের পর নক্ষত্রের রূপ গ্রহণপূর্ব্বক নক্ষত্রমণ্ডলে বিরাজ করেন।[৭] ত্যক্তদেহ আত্মার নক্ষত্রলোকপ্রাপ্তি পুণ্যসাপেক্ষ, ইহা প্রকাশ করাই বোধ করি, এই রূপকের তাৎপর্য্য।

অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র—অশ্বিন্যাদি সাতাইশটি নক্ষত্রের নাম গৃহীত হইয়াছে।[৮]

তিথি ও নক্ষত্রের নাম—প্রসঙ্গতঃ নানাস্থানে অনেকগুলি তিথি ও নক্ষত্রের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে।[৯]

শ্বেতগ্রহ (ধূমকেতু?)—এক জায়গায় 'শ্বেতগ্রহ'-নামে একটি উপগ্রহের কথা পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠ তাহাকে 'ধূমকেতু' বলিয়াছেন।[১০]

তিথিনক্ষত্রের কথন অন্যায়—তিথি এবং নক্ষত্র নির্দ্দেশ করা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত।[১১] (কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি এখনও প্রতিপদ্-তিথির নাম গ্রহণ করেন না—শুনিয়াছি।)

---

৪ সোমস্ত্বাত্মা চ বহুধা সম্ভূতঃ পৃথিবীতলে। অনু ৯৮।১৭

৫ প্রজাসংহরণে রাজন্ সোমং সপ্তগ্রহা ইব। দ্রো ১৩৫।২২

৬ উচ্চৈঃস্থানে ঘোররূপো নক্ষত্রাণামিব গ্রহঃ। শা ৮৭।১১

৭ এতে সুকৃতিনো পার্থ স্বেষু ধিষ্ণ্যেষ্ববস্থিতাঃ।
যান্ দৃষ্টবানসি বিভো তারারূপাণি ভূতলে॥ বন ৪২।৩৮

৮ অনু ১১০ তম অঃ।

৯ আদি ১৩৪।৯। বন ১৮২।১৬। শা ১০০।২৫। অনু ১০৪।৩৮

১০ শ্বেতো গ্রহস্তির্য্যগিবাপতন্ খে। উ ৩৭।৪৩

১১ ন ব্রাহ্মণান্ পরিবদেন্নক্ষত্রাণি ন নির্দ্দিশেৎ।
তিথিং পক্ষস্য ন ব্রুয়াত্তথাস্যায়ুর্ন রিষ্যতে। অনু ১০৪।৩৮

নক্ষত্রের সাহায্যে দিক্‌নির্ণয়—দিক্‌ভ্রম হইলে নক্ষত্র দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল।[১২]

ব্রাহ্ম দিন ও রাত্রি—মানুষের এক বৎসরে দেবতাদের এক দিন, দেবতাদের গণনায় বার হাজার বৎসরে চারি যুগ। চারি যুগের সহস্রগুণ সময়ে এক কল্প। কল্পের অপর নাম ব্রাহ্ম দিন। ব্রাহ্ম রাত্রিও ব্রাহ্ম দিনের সমান।[১৩]

চতুর্যুগ—সত্যাদি চতুর্যুগের বর্ষমান কথিত হইয়াছে। সত্যযুগের প্রকাশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যখন একই রাশিস্থিত সূর্য্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি একসঙ্গে পুষ্যানক্ষত্রে মিলিত হইবেন, তখনই সত্যযুগের আরম্ভ হইবে।[১৪]

অধিমাস-গণনা—বিরাটপর্ব্বে মলমাসের গণনাপদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন 'অর্দ্ধমাস, মাস, নক্ষত্র, ঋতু, সম্বৎসর প্রভৃতি দ্বারা কালের বিভাগ কল্পিত হয়। সূর্য্য ও চন্দ্রের গতির তারতম্যবশতঃ প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের মধ্যে দুইটি চান্দ্রমাস অধিক হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে একটি মাসের বৃদ্ধি হয়। সেই মাসকেই 'অধিমাস' বা 'মলমাস' বলে।[১৫]

মানুষের উপর গ্রহের আধিপত্য—আমিষ দেখিবামাত্র কুকুরেরা যেরূপ তৎপ্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গ্রহগণ তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করে।[১৬]

জাতপত্রিকা (যুধিষ্ঠিরাদির)—জাত শিশুর জন্মকালে গ্রহাদির সংস্থান অথবা জাতপত্রিকা তৎকালেও লিখিয়া রাখা হইত। যুধিষ্ঠিরের জন্মসময়ের বর্ণনায় বলা হইয়াছে, 'শুক্লপক্ষের পূর্ণাতিথিতে, জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে দিনের অষ্টম মুহূর্ত্তে যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হন'। সাধারণতঃ আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমীতে এইপ্রকার

---

১২ নক্ষত্রৈর্বিন্দতে দিশঃ। ইত্যাদি। আদি ১৪৫।২৬। আদি ১৫০।২১

১৩ যুগং দ্বাদশসাহস্রং কল্পং বিদ্ধি চতুর্যুগম্। ইত্যাদি। শা ৩০২।১৪,১৫। শা ১৮৩।৬

১৪ যদা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি প্রপৎস্যতি তদা কৃতম্। ইত্যাদি। বন ১৯০।৯০। শা ২৩১তম অঃ।
বন ১৮৮।২২-২৯

১৫ কলাকাষ্ঠাশ্চ যুজ্যন্তে মুহূর্ত্তাশ্চ দিনানি চ। ইত্যাদি। বি ৫২।১-৪

১৬ তস্মান্মুক্তঃ স সংসারাদস্তান্ পঞ্চত্বাপত্রবান্।
গ্রহাস্তমুপগচ্ছন্তি সারমেয়া ইবামিষম্॥ স্ত্রী ৪।৫

নক্ষত্রাদির যোগ হয়, ইহা নীলকণ্ঠের অভিমত। কেহ কেহ বলেন, জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে এরূপ যোগ হয়।[১৭]

বিবাহাদিতে শুভদিন—বিবাহাদি শুভ কর্ম্মে তিথিনক্ষত্রের শুভাশুভ বিচার করা হইত। দ্রৌপদীর বিবাহে দ্রুপদরাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, 'আজ পুণ্যদিন, চন্দ্র শুভ নক্ষত্রের সহিত যুক্ত। সুতরাং আজ তুমি প্রথমতঃ কৃষ্ণার পাণি গ্রহণ কর'।[১৮]

যাত্রায় দিন-ক্ষণের বিচার—বিশেষ-বিশেষ উদ্দেশ্যে বিদেশে যাত্রা করিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুমোদিত শুভ তিথি ও শুভ নক্ষত্রের বিচার করা হইত। বহু স্থানে এই বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়। তিথি অপেক্ষাও নক্ষত্রের বিশুদ্ধির উপরই বেশী জোর দেওয়া হইত। কারণ কোন-কোন বর্ণনায় কেবল নক্ষত্রের নাম গৃহীত হইয়াছে, তিথির উল্লেখ করা হয় নাই।[১৯]

মঘানক্ষত্রে যাত্রার কুফল—পৌরুষমদে মত্ত অসুরগণ দিন-ক্ষণের বড় ধার ধারিতেন না। সুন্দ ও উপসুন্দ 'মঘা'-নক্ষত্রেই যাত্রা করিয়াছিলেন।[২০]

ভাগ্যগণনা ও সামুদ্রিকাদির নিন্দা—হস্তপদাদির রেখা, মুখমণ্ডলের আকৃতি, কণ্ঠস্বর প্রভৃতির সাহায্যে মানুষের ভাগ্যগণনার রীতি তখনও প্রচলিত ছিল।[২১] যে-সকল পণ্ডিত এইসকল গণনা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা লোকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের সংজ্ঞা ছিল 'সামুদ্রিক'। একশ্রেণীর পণ্ডিত শলাকা দ্বারা মাটিতে অঙ্কপাত করিয়া গণনা করিতেন, সমাজে তাঁহাদেরও স্থান ভাল ছিল না। সেইসকল গণককে বলা হইত 'শলাকধূর্ত্ত'।[২২]

উৎপাত বা দুর্নিমিত্ত—গ্রহনক্ষত্রাদির গতির ব্যতিক্রম, যে ঋতুতে যাহা

১৭ ঐন্দ্রে চন্দ্রসমাযুক্তে মুহূর্ত্তেঽভিজিতেঽষ্টমে।
দিবা মধ্যগতে সূর্য্যে তিথৌ পূর্ণেঽতিপূজিতে॥ আদি ১২৩।৬

১৮ ততোঽব্রবীদ্ ভগবান্ ধর্ম্মরাজমদ্যৈব পুণ্যাহমুত বঃ পাণ্ডবেয়াঃ। ইত্যাদি। আদি ১৯৮।৫

১৯ আদি ১৪৫।৩৪। সভা ২।১০-১৫। সভা ২১।৪। বন ৯৩।২৬। বন ২৫২।২৮। উ ৬।১৭। উ ৮৩।৬। উ ১৫০।৩।

২০ মঘাসু যযতুস্তদা। আদি ২১০।২। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

২১ নোচ্চগুল্ফা সংহতোরুস্ত্রিগম্ভীরা ষড়ুন্নতা। ইত্যাদি। বি ৯।১০। উ ১১৬।২
ঊর্দ্ধরেখতলৌ পাদৌ পার্থস্য শুভলক্ষণৌ। উ ৫৯।৯

২২ সামুদ্রিকং বণিজং চোরপূর্ব্বং শলাকধূর্ত্তঞ্চ চিকিৎসকঞ্চ। ইত্যাদি। উ ৩৫।৪৪

স্বাভাবিক নহে, সেই ঋতুতে তাহার উৎপত্তি, অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কোন কিছুর সংঘটন, অচিন্তিত বস্তুর আকস্মিক উদ্ভব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অস্বাভাবিক স্পন্দনাদি, এইসকল প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খল ভাবকে দুর্নিমিত্ত বা উৎপাত বলা হয়।

শুভ-নিমিত্ত—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির স্পন্দন, ঋতুভেদে পুষ্পলতাদির স্বাভাবিক প্রফুল্লতা প্রভৃতি কতকগুলি সূচনাকে শুভ নিমিত্ত বলা হয়।

শাকুন-বিদ্যা—সমস্ত অবস্থা দেখিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিতে যে ভূয়োদর্শন সহায়তা করিয়া থাকে, তাহারই নাম 'শাকুন-বিদ্যা'। পশুপক্ষীর চলাফেরা এবং কণ্ঠস্বরাদিও ভবিষ্যৎ শুভাশুভ-নির্ণয়ে সহায় হয় বলিয়াই বোধ করি—এই জ্ঞানের নাম 'শাকুনবিদ্যা'।

অশুভসূচক বর্ণনার বাহুল্য—অশুভসূচক বর্ণনার বাহুল্য দেখা যায়, শুভসূচক বর্ণনা কদাচিৎ দেখিতে পাই।

দুর্নিমিত্ত, দিনে শৃগালের চীৎকার প্রভৃতি—কুরুকুললক্ষ্মী পাঞ্চালীকে যখন প্রকাশ্য সভামধ্যে অপমানিতা করা হয়, তখন ধৃতরাষ্ট্রের গৃহাগ্নি সমীপে দিনের বেলায়ই শৃগাল চীৎকার করিয়া উঠিল। অনেকগুলি গাধা সেই চীৎকার শুনিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। ভীষণস্বভাব পক্ষিগণও সেই চীৎকারের অনুকরণে মুখর হইয়া উঠিল। বিদুর, গান্ধারী, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং গৌতম সেই ঘোর শব্দ শুনিয়া বিপদ যে আসন্ন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তারপর আরও নানা দুর্নিমিত্ত দেখা দিয়াছিল। বায়ু প্রচণ্ড বেগে বহিতে আরম্ভ করিল, বজ্রনির্ঘোষ, উল্কাপাত প্রভৃতি হইতে লাগিল। পর্ব্ব (অমাবস্যা) নয়, তথাপি রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া বসিল। রথশালাতে হঠাৎ অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ধ্বজসমূহ আপনা-আপনি বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। দুর্য্যোধনের অগ্নিহোত্র সমীপে শিবাকুল বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। গর্দ্দভগুলি যেন সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনিস্বরূপ দশদিক্ কম্পিত করিয়া তুলিল।[২৩]

পশুপক্ষীদের দারুণ আচরণ—অজগররূপী নহুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীমসেন বনমধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন, এদিকে যুধিষ্ঠির নানাবিধ উৎপাতদর্শনে

২৩ ততো রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য গেহে, গোমায়ুরুচ্চৈর্ব্যাহরদগ্নিহোত্রে। ইত্যাদি। সভা ৭১।১২। সভা ৮১।২২-২৫

বিচলিত হইয়া পড়িলেন। দিনের বেলা আশ্রমে শিবাগণ বিকট চীৎকার করিয়া যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণ দিকে বিত্রস্তভাবে ধাবিত হইল। একখানি পাখা, একটি চক্ষু ও একখানি চরণযুক্ত ঘোরদর্শন বর্ত্তিকাপক্ষী রক্ত বমন করিতে করিতে সূর্য্যের অভিমুখে উড়িতে লাগিল। অতিশয় রূক্ষ বায়ু যেন ধূলাবর্ষণ করিতে করিতে প্রবল বেগে বহিতেছিল। সকল পশুপক্ষী দক্ষিণ দিকে বিকট চীৎকার করিতেছিল। পশ্চাৎ দিক্ হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বায়স 'যাহি' 'যাহি' শব্দ করিতেছিল। যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণ বাহু মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল (অনিষ্টপ্রশমনের সূচক)। হৃদয় এবং বামপদ যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। এইসকল দুর্নিমিত্তদর্শনে ধর্ম্মরাজ ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছিলেন।[২৪]

গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিবেষের ঘোরত্ব—যুদ্ধ-বিগ্রহাদির পূর্ব্বে যে ভীষণ উৎপাত লক্ষিত হয়, স্কন্দোৎপত্তিপ্রকরণে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তখন সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিবেষ অতিশয় ঘোর আকৃতি ধারণ করে। নদ-নদী উজান বহিতে থাকে, জল যেন রক্তে পরিণত হয়। অগ্নিবক্ত্র শিবা আদিত্যের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিতে থাকে। সোম, বহ্নি ও সূর্য্যের অদ্ভুত সমাগম অতিশয় ভয়ের কারণ।[২৫]

রূক্ষ বায়ু প্রভৃতি—ক্লীবরূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য সঙ্গে সঙ্গে যে-সকল দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন, গো-হরণপর্ব্বে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ধূলিকণাবর্ষী রূক্ষ প্রচণ্ড বায়ু প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। ভস্মবর্ণ অন্ধকারে দশদিক্ আচ্ছন্ন। অদ্ভুতদর্শন মেঘমালা আকাশ ছাইয়া ফেলিল। কোষসমূহ হইতে বিবিধ শস্ত্র নির্গত হইতে লাগিল। দিবাভাগে শিবাকুল নৃত্য করিতে লাগিল। অশ্বগুলি অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। অকম্পিত ধ্বজসমূহও পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইল।[২৬]

অশ্বাদির উদ্দীপনারাহিত্য প্রভৃতি—গো-হরণপর্ব্বে আরও এক-জায়গায় কতকগুলি উৎপাতের বর্ণনা করা হইয়াছে। শস্ত্রগুলিকে যেন মলিন বলিয়া বোধ হইতেছে। অশ্বসমূহ উদ্দীপনাহীন। অগ্নি দীপ্তিহীন। মৃগগণ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বিকট চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে।

২৪ দারুণং হ্যশিবং নাদং শিবা দক্ষিণতঃ স্থিতাঃ। ইত্যাদি। বন ১৭৯।৪১-৪৫

২৫ সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্ঘোরং দৃশ্যতে পরিবেষণম্। ইত্যাদি। বন ২২৩।১৭-১৯

২৬ চণ্ডাশ্চ বাতাঃ সংবান্তি রূক্ষাঃ শর্করবর্ষিণঃ। ইত্যাদি। বি ৩৯।৪-৭

কাকগুলি ধ্বজের উপরে বসিয়া রহিয়াছে। কতকগুলি শকুনি দক্ষিণদিকে উড়িয়া অত্যন্ত ভয়ের সূচনা করিতেছে। শিবাকুল ঘোরতর শব্দ করিয়া সৈন্যমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। সূর্য্যের কিরণ অতিশয় মলিন। পশুপক্ষীদের এইপ্রকার অস্বাভাবিক উগ্রতা অতিশয় ভয়ের সঞ্চার করিতেছে। দ্রোণাচার্য্য বলিয়াছেন, এইসকল দুর্নিমিত্ত দেখিয়া মনে হইতেছে, ক্ষত্রকুল নাশের সময় যেন আসন্ন।[২৭] দৌত্যকর্ম্মে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কতকগুলি দুর্নিমিত্ত দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার মধ্যস্থতায় কোন সুফল হইবে না। আকাশে মেঘের চিহ্নও নাই, কিন্তু বজ্রনির্ঘোষ এবং বিদ্যুতের অভাব ছিল না। আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু বর্ষণের বিরাম নাই। নদনদীর জল স্রোতের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতেছিল। দিক্-বিদিক্ বুঝিবার উপায় ছিল না। চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাসে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। দশদিক্ ধূলিতে সমাচ্ছন্ন।[২৮]

শুভাশুভের সূচক লক্ষণাবলী—শ্রীকৃষ্ণ বহু কৌশল প্রয়োগ করিয়াও কর্ণকে দুর্য্যোধনের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। কর্ণ কৃষ্ণকে বলিলেন, "সকল কথা জানিয়া-শুনিয়াও তুমি কেন আমাকে মোহগ্রস্ত করিতে চাও? নিশ্চয়ই সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশের ধ্বংসের সময় উপস্থিত হইয়াছে। নানাপ্রকার ঘোর স্বপ্ন দেখিতেছি। দারুণ উৎপাত এবং ঘোরতর দুর্লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রজাপত্য-নক্ষত্রকে তীক্ষ্ণ গ্রহ শনৈশ্চর পীড়া দিতেছে। মঙ্গল-গ্রহ জ্যেষ্ঠানক্ষত্রকে প্রাপ্ত না হইয়াই বক্রীভাব ধারণ করিয়াছে। কুরুবংশের সমূহ বিপদ উপস্থিত বলিয়া মনে হইতেছে। মহাপাত-গ্রহ চিত্রানক্ষত্রকে পীড়া দিতেছে। চন্দ্র অতিশয় ক্ষীণ বলিয়া মনে হয়। রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ভীষণ শব্দে উল্কাপাত হইতেছে। হাতীগুলি অতিশয় অবসন্ন, ঘোড়াগুলি অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। তাহারা পানীয় ও খাদ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহে। অল্প খাদ্য গ্রহণ করিয়াও সকল প্রাণীই যেন প্রভূত পরিমাণে পুরীষ ত্যাগ করিতেছে।

২৭ শস্ত্রাণি ন প্রকাশন্তে ন প্রহৃষ্যন্তি বাজিনঃ।
অগ্নয়শ্চ ন ভাসন্তে সমিদ্ধাস্তন্ন শোভনম্ ॥ ইত্যাদি। বি ৪৬।২৫-৩৩

২৮ মৃগাঃ শকুন্তাশ্চ বদন্তি ঘোরং, হস্ত্যশ্বমুখ্যেষু নিশামুখেষু ॥ ইত্যাদি। উ ৭৩।৩৯। উ ৮৪।৫-৯

দুর্য্যোধনের সৈন্য ও বাহনাদির এই অবস্থা। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, এইসকল উৎপাত পরাভবেরই লক্ষণ। পাণ্ডবপক্ষের বাহনগুলি প্রহৃষ্ট, তাঁহাদের মৃগগুলি প্রদক্ষিণ-ক্রমে বিচরণ করিতেছে। ইহা নিশ্চিতই জয়ের লক্ষণ। দুর্য্যোধনের মৃগগুলি বাম দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং নানাবিধ অশরীরী বাক্য শোনা যাইতেছে। ময়ূর, হাঁস, চাতক, সারস, জীবঞ্জীবক প্রভৃতি পাখী পাণ্ডবদের অনুগমন করিতেছে" (শুভ)।

"গৃধ্র, কঙ্ক, বক, শ্যেন, যাতুধান, বৃক এবং মক্ষিকাকুল ধার্ত্তরাষ্ট্রের অনুগামী। দুর্য্যোধনের পক্ষের ভেরীনিনাদ শোনা যায় না, কিন্তু পাণ্ডবদের পটহ অনাহত হইলেও শব্দায়মান। জলাশয়ের জল উচ্ছ্বসিত। লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে, দুর্য্যোধনের পক্ষে ভীষণ অকল্যাণ উপস্থিত। মাংস এবং শোণিত বর্ষিত হইতেছে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল অতিশয় ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া যেন উপস্থিত হয়। শিবাকুলের ঘোর নিনাদ নিশ্চিতই পরাভবের লক্ষণ। একপক্ষ, একাক্ষি ও একপাদ পক্ষিগণ বিকট চীৎকার করিয়া উড়িতেছে। কৃষ্ণগ্রীব রক্তপাদ ভয়ানক শকুনিগণ সন্ধ্যাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, গুরু এবং ভক্তিমান্ কর্ম্মচারিগণকে দ্বেষ করা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাও পরাভবের অন্যতম লক্ষণ। পূর্ব্বদিক্ লোহিতবর্ণ, দক্ষিণদিক্ শ্বেতবর্ণ, পশ্চিমদিক্ শ্যামবর্ণ এবং উত্তরদিক্ শঙ্খরত্নের বর্ণ ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। ধার্ত্তরাষ্ট্রের নিকটস্থ সকল দিক্ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইসকল উৎপাত ভাবী ভয়ের সূচনা করিতেছে"।

স্বপ্নদর্শনে দুর্নিমিত্তপরিজ্ঞান—"স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ সহস্রস্তম্ভ প্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন। সকলের মাথায় শুভ্র উষ্ণীষ, সকলেই শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং সকলেরই আসন শুভ্রবর্ণের। স্বপ্নে আরও দেখিয়াছি যে, তোমার শরীর রুধিরাবিল অস্ত্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। অমিততেজা যুধিষ্ঠির অস্থিস্তূপের উপর বসিয়া সুবর্ণপাত্রে ঘৃতপায়স খাইতেছেন। তোমার প্রদত্ত নিখিল বসুন্ধরা মহারাজ যুধিষ্ঠির একাই ভোগ করিতেছেন। গদাপাণি বৃকোদর উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক বসুন্ধরাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। মনে হয়, নিশ্চয়ই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্য্যোধনপক্ষীয় বীরগণকে গদার আঘাতে পিষিয়া ফেলিবেন। শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড গজে আরোহণ করিয়া ধনঞ্জয় উজ্জ্বল রূপে শোভিত এবং তোমারই সহিত বিরাজিত। নকুল, সহদেব, সাত্যকি প্রমুখ বীরগণ শুক্ল

কেয়ূর এবং শুভ্র কণ্ঠাভরণে পরিশোভিত হইয়া শুভ্র মাল্যাম্বর-ধারণপূর্ব্বক নরবাহনে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের মস্তকোপরি শ্বেত উষ্ণীষ ও পাণ্ডুর ছত্র শোভিত হইতেছে। আরও দেখিলাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা রক্তোষ্ণীষ ধারণ করিয়া অন্যান্য রক্তোষ্ণীষধারী নৃপতিদের সহিত ভ্রমণ করিতেছেন। উষ্ট্রযানে আরোহণ করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও আমি দক্ষিণদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিতেছি"।[২৯]

অশুভ লক্ষণ—যুদ্ধের উদ্যোগ শেষ হইলে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে কতকগুলি দুর্নিমিত্ত দেখাইয়া অনাগত ভয়ের আশঙ্কা করিতেছিলেন। শ্যেন, গৃধ্র, কাক, কঙ্ক এবং বক একসঙ্গে মিলিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বৃক্ষাগ্রে পতিত হইতেছে। শৃগাল, কাক প্রভৃতি মাংসাশী পশুপক্ষীরা নিকটেই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। মাংসাশী পশুপক্ষিগণ হাতী ও ঘোড়াগুলির মাংসের লোভে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে। অতিশয় কঠোর উচ্চ রব করিয়া কঙ্কগুলি মানুষের মধ্য দিয়া দক্ষিণমুখে চলিয়াছে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সূর্য্যকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন কবন্ধ দ্বারা পরিবারিত। শ্বেতলোহিত কৃষ্ণগ্রীব ত্রিবর্ণ বিদ্যুৎ পরিবেষসন্ধিতে সূর্য্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যোদয়াস্পর্শিনী ক্ষয়তিথি-যুক্ত নক্ষত্রে পাপগ্রহের অবস্থান দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতেও রক্তবর্ণ নভস্তলে প্রভাহীন অলক্ষ্য অগ্নিবর্ণ চন্দ্রের আভা পরিদৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যহ রাত্রিতে অন্তরীক্ষে যুধ্যমান শূকর ও বিড়ালের তীব্র চীৎকার শুনিতে পাই। দেবতার প্রতিমা কখনও কম্পিত, কখনও হাস্যযুক্ত, কখনও বা রুধির বমন করিতেছেন, কখনও বা পড়িয়া যাইতেছেন। অনাহত হইয়াও দুন্দুভিগুলি বাজিয়া উঠে। অশ্বছাড়াও কখন কখন রথগুলি আপনা-আপনিই চলিতে থাকে। কোকিল, শতপত্র, চাষ, ভাষ, শুক, সারস, ময়ূর প্রভৃতি শুভসূচক পাখীরাও ভীষণ চীৎকার করিয়া অশুভেরই সূচনা করিতেছে। অরুণোদয়ে শত-শত কৃষ্ণ শলভ অশ্বপৃষ্ঠে সঞ্চরণ করিতে থাকে। উভয় সন্ধিকালে দিগ্‌দাহ উপস্থিত হয়। মেঘমালা ধূলি ও মাংস বর্ষণ করে। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের আগে আগে চলিয়াছেন। মন্দগ্রহ রোহিণীনক্ষত্রকে পীড়া দিতেছে। চন্দ্রের কলঙ্ক দেখা যাইতেছে না। আকাশ পরিষ্কার,

---

২৯. প্রাজাপত্যং হি নক্ষত্রং গ্রহস্তীক্ষ্ণো মহাদ্যুতিঃ। ইত্যাদি উ ১৪৩।৮-৪৫

তথাপি ভীষণ মেঘগর্জ্জন শোনা যাইতেছে। বাহনগুলির চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রু ঝরিতেছে।[৩০]

ব্যাসদেব পরের অধ্যায়ে আরও অনেকগুলি দুর্লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেও ভৌম, দিব্য ও আন্তরীক্ষ উৎপাতের বর্ণনা দেখিতে পাই। গরু গর্দ্দভশিশু প্রসব করিতেছে। অসময়ে বনদ্রুম পুষ্পফলে বিভূষিত হইতেছে। রাজমহিষীগণ ভীষণাকৃতি সন্তান প্রসব করিতেছেন। মাংসভুক্ পশু এবং পক্ষিগণ একই স্থানে পরস্পর মিত্রভাবে আহার করিতেছে। ত্রিবিষাণ, চতুর্নেত্র, পঞ্চপাদ, দ্বিমেহন, দ্বিশীর্ষ এবং দ্বিপুচ্ছ অশিব দংষ্ট্রিগণের অশুভ চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত। ব্রহ্মবাদীদের পত্নীগণ পাখী প্রসব করিতেছেন। অশ্ব হইতে গোবৎস, কুকুর হইতে শৃগাল, করভ হইতে কুক্কুট এবং শুক হইতে অশুভ পক্ষিশাবকরা জন্ম গ্রহণ করিতেছে। কোন-কোন স্ত্রীলোক একসময়েই চারি-পাঁচটি কন্যা প্রসব করিতেছেন, আর সেইসকল কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াই হাস্য, লাস্য ও গীতে সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছে। চণ্ডালাদি হইতে জাত কাণ-কুব্জাদি শিশুগণ হাস্য, নৃত্য ও গীতে সকলের ভয়ের উদ্রেক করিতেছে। সশস্ত্র দণ্ডপাণি শিশুগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিতে ব্যস্ত। যুযুৎসু শিশুগণ পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে। পদ্ম, উৎপল, কুমুদ প্রভৃতি স্থলে প্রস্ফুটিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে বায়ুর তাণ্ডবলীলা, ধূলার শেষ নাই। দাবানল নিত্য প্রজ্বলিত।

গ্রহনক্ষত্রাদির বিপর্য্যস্তভাব—রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতেছে। রাহু এবং কেতু একই রাশিতে অবস্থিত। উপগ্রহ ধূমকেতু পুষ্যানক্ষত্রে অবস্থান করিতেছে। মঘাতে বক্রী মঙ্গল এবং শ্রবণাতে বৃহস্পতি অবস্থিত। শনৈশ্চর উত্তরফল্গুনীতে এবং শুক্র পূর্ব্বভাদ্রপদে আরোহণ করিয়া পরিঘনামক উপদ্রবের সহিত মিলিত হইয়া উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রকে আক্রমণ করিতে চাহিতেছে। শ্বেত উপগ্রহ (ধূমকেতু) সধূম প্রজ্বলিত বহ্নির মত তেজস্বী জ্যেষ্ঠানক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিত। এক নক্ষত্রে অবস্থিত সূর্য্য ও চন্দ্র রাহুকর্ত্তৃক আক্রান্ত। সর্ব্বদা বক্রী হইয়া সর্ব্বতোভদ্রচক্রে বেধপূর্ব্বক স্বাতীনক্ষত্রে স্থিত রাহু রোহিণীনক্ষত্রের পীড়া উৎপাদন করিতেছে। মঘাস্থ মঙ্গল পুনঃ পুনঃ বক্রীভাব ধারণপূর্ব্বক বৃহস্পতি দ্বারা আক্রান্ত রাশি এবং শ্রবণানক্ষত্রকে পূর্ণ

---

৩০. ইহ যুদ্ধে মহারাজ ভবিষ্যতি মহান্ ক্ষয়ঃ। ইত্যাদি। ভী ২।১৬-৩৩

দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছে। পৃথিবী শস্যপরিপূর্ণা, পঞ্চশীর্ষ যব এবং শত-শীর্ষ শালি দ্বারা ভূমি আচ্ছাদিত। প্রসবের পর গাভীদের পালান হইতে শোণিত ক্ষরিত হইতেছে। খড়্গ ও ধনু অতিশয় উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ সমুপস্থিত। শস্ত্র, ধ্বজ, কবচ প্রভৃতির অগ্নিবর্ণ প্রভা দেখিয়া অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইতেছে। কুরুপাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধে পৃথিবীতে রক্তের নদী প্রবাহিত হইবে। পশুপক্ষিগণ যেন প্রজ্বলিত মুখ বিস্তার করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। শকুনি ভীষণ শব্দ করিয়া আকাশ হইতে যেন রক্ত বমন করিতেছে। বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর-গ্রহ বিশাখাসমীপস্থ হইয়া একবৎসর অবস্থান করিবেন। ত্রয়োদশী-তিথিতেই চন্দ্রাদিত্য যুগপৎ রাহুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। সর্ব্বতোভদ্র-চক্রস্থিত গ্রহ চিত্রা ও স্বাতীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া রোহিণীকে পীড়িত করিতেছে। গ্রহাদির অবস্থানে মনে হইতেছে, নিখিল সংসারই যেন ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়া যাইবে। একই চান্দ্র মাসে দুইটি রাহুগ্রাস দেখা যাইতেছে। ইহা অতীব দুর্য্যোগ, সন্দেহ নাই।

প্রকৃতির বিপর্য্যয়—কৈলাস, মন্দর, হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতমালা হইতে অনবরত শৃঙ্গসমূহ মহাশব্দে খসিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রের জল বেলাভূমিকে অতিক্রম করিয়া প্লাবিত হইতেছে। প্রবল ঝড়ে বৃক্ষগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দ্বিজগণের আহুত অগ্নি নীল, লোহিত এবং পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। অগ্নির জিহ্বা বামদিকে, হুত ঘৃতাদি বস্তু হইতে পূতিগন্ধ নির্গত হইতেছে। সকল বস্তুরই রস, স্পর্শ এবং গন্ধ বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে। রথধ্বজ হইতে ধূম এবং ভেরী-পটহাদি হইতে অঙ্গার নির্গত হইতেছে। বায়সকুল বামমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া শিখরদেশ হইতে উগ্রস্বরে চীৎকার করিতেছে।[৩১]

নানাবিধ উৎপাত—যুদ্ধের নবম দিবসে যুদ্ধযাত্রাকালে ভীষ্মও অনেকগুলি দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন।[৩২] দশমদিবসীয় যুদ্ধে আচার্য্য দ্রোণও অগণিত উৎপাত দর্শন করিয়া অশ্বত্থামাকে ভাবী অশুভের কথা বলিয়াছিলেন।[৩৩]

---

৩১ খরা গোষু প্রজায়ন্তে রমন্তে মাতৃভিঃ সুতাঃ। ইত্যাদি। ভী ৩।১-৪৬

৩২ পক্ষিণশ্চ মহাঘোরং ব্যাহরন্তো বিবভ্রমুঃ। ইত্যাদি। ভী ৯৯।২২-২৮

৩৩ দিক্ষ্ণশান্তানি ঘোরাণি ব্যাহরন্তি মৃগদ্বিজাঃ। ইত্যাদি। ভী ১১২।৬-১৬। দ্রো ৬।২৪-৩০

কর্ণের মৃত্যুর পরে নদীস্তম্ভন, ভূকম্পন প্রভৃতি অনেকগুলি উৎপাতের বর্ণনা করা হইয়াছে।[৩৪] হৃত রাজ্য উদ্ধারের পর যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পরে ছত্রিশ বৎসরের প্রারম্ভেই তিনি অনেকগুলি দুর্লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন।[৩৫] পরস্পর যুদ্ধে রত বৃষ্ণ্যন্ধককুল যে-সকল উৎপাত দেখিয়াছিলেন, সেইগুলি একটু নূতন রকমের। পথে-ঘাটে ইঁদুরেরা নির্ভয়ে বিচরণ করিত, রাত্রিতে সুপ্ত পুরুষদের কেশ, নখ প্রভৃতি ছিঁড়িয়া লইয়া যাইত। গৃহসারিকাগণ দিবা-রাত্রি চীচীকূচী শব্দ করিতে থাকিত। সারসেরা পেচকের চীৎকারের অনুকরণ করিত। মেষ, ছাগল প্রভৃতি শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিত। পথে-ঘাটে নানাবিধ মৃৎপাত্র প্রায়ই চোখে পড়িত। পশুপক্ষীদের ভিন্নজাতীয় শাবকপ্রসব, অগ্নির বর্ণবৈচিত্র্য, গর্দ্দভদের পাঞ্চজন্যনিনাদের অনুকরণ ইত্যাদি অসংখ্য দুর্লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশীয়গণ স্বপ্নে দেখিলেন যে, কৃষ্ণবর্ণা একজন স্ত্রীলোক শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে দ্বারকায় ভ্রমণ করিতেছেন। অগ্নিহোত্রগৃহে এবং শয়নগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক গৃধ্রগণ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের পুরুষদিগকে খাইয়া ফেলিতেছে। ভীষণাকৃতি নিশাচরগণ অলঙ্কার, ছত্র, ধ্বজ এবং কবচ সবলে কাড়িয়া লইতেছে। অগ্নি-প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের চক্রটি সকলের সম্মুখেই দ্যুলোকে অন্তর্হিত হইল। সারথি দারুকের সম্মুখেই অশ্বচতুষ্টয় কৃষ্ণের রথ লইয়া সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। তাল এবং সুপর্ণচিহ্নিত মহাধ্বজদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক পূজিত হইয়া অন্তর্হিত হইল।[৩৬]

শুভ লক্ষণ, আহুতির মিষ্ট গন্ধ প্রভৃতি—শুভসূচক নিমিত্ত কি কি, এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন, "প্রসন্নকান্তি উর্দ্ধরশ্মি পাবক যদি ধূমবিহীন হইয়া দক্ষিণাবর্ত্তে শিখা বিস্তার করে, তবে তাহা শুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। আহুতির মিষ্ট পবিত্র গন্ধ ভাবী জয়ের সূচনা করিয়া থাকে। গম্ভীরনাদী শঙ্খ এবং মৃদঙ্গ যদি গম্ভীর শব্দে বাজিয়া উঠে, তপন

৩৪ হতে কর্ণে সরিতো ন প্রসস্রুর্জগাম চাস্তং কলুষো দিবাকরঃ। ইত্যাদি। কর্ণ ৯৪।৪৭-৫০

৩৫ ববুর্ব্বাতাশ্চ নির্ঘাতা রূক্ষাঃ শর্করবর্ষিণঃ। ইত্যাদি। মৌ ১।২-৭

৩৬ উৎপেদিরে মহাবাতা দারুণাশ্চ দিনে দিনে। মৌ ২।৪-১৭

কালী স্ত্রী পাণ্ডুরৈর্দ্দন্তৈঃ প্রবিশ্য হসতী নিশি। ইত্যাদি। মৌ ৩।১-৬

এবং শশীর রশ্মি যদি বিশুদ্ধ থাকে, তবে মঙ্গলের সূচনা বলিয়া জানিবে। প্রস্থিত এবং গমনশীল কাকের স্বর যদি শুভসূচক হয়, পাছের দিক্ হইতে কাক যদি যাত্রার জন্য তাগিদ দিতে থাকে এবং সম্মুখস্থ কাক যদি ধীরভাবে শব্দ করিয়া যাত্রায় নিষেধের সূচনা করে, তাহা হইলে মঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া মনে করিবে। রাজহংস, শুক, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র প্রভৃতি পাখী যদি কল্যাণসূচক শব্দ করিতে করিতে প্রদক্ষিণক্রমে বিচরণ করে, তবে জয় সুনিশ্চিত। অলঙ্কার, ধ্বজ, কবচ প্রভৃতির মনোজ্ঞ শোভা, হাতী ঘোড়া প্রভৃতি বাহনের স্বাভাবিক শব্দ ও হর্ষকে জয়ের লক্ষণ বলিয়া মনে করিবে। যেখানে বীরদের কণ্ঠস্বর হৃষ্ট, মাল্য অম্লান, চলনভঙ্গী নির্ভয়, সেখানে জয় নিশ্চিত"।[৩৭]

গণিত-জ্যোতিষে কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়—মহাভারতে গণিত জ্যোতিষের এরূপ অনেক কিছুর উল্লেখ দেখা যায়, যেগুলি বর্ত্তমান জ্যোতিঃসিদ্ধান্তে প্রায়ই চলে না। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে সেইগুলির কিছু কিছু প্রয়োগ পাওয়া যায়। পাঁচ বৎসরে এক যুগ—এরূপ একটি সিদ্ধান্তও প্রচলিত ছিল।[৩৮] মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) হইতে বৎসরের গণনা আরম্ভ হইত, মার্গশীর্ষই বৎসরের প্রথম মাস।[৩৯] শ্রবণানক্ষত্রে উত্তরায়ণের আরম্ভ হইত।[৪০] শিশিরকে ঋতুর আদিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।[৪১] চৈত্র এবং বৈশাখকে বসন্ত ঋতু বলিয়া ধরা হইত।[৪২] পক্ষ দুইটি, শুক্ল এবং কৃষ্ণ। শুক্লপক্ষ হইতে মাসের গণনার নিয়ম।[৪৩] কৃত্তিকা হইতে, শ্রবণা হইতে এবং ধনিষ্ঠা হইতে নক্ষত্রগণনার উদাহরণ পাওয়া যায়।[৪৪] কালভেদে তিনপ্রকার গণনাই প্রচলিত ছিল। মৃগশিরানক্ষত্রের আকৃতি মৃগের শিরের ন্যায়, নক্ষত্রের পশ্চাতে ধনুর্দ্ধারী রুদ্রের চিত্র কল্পনা করা হইয়াছে।[৪৫] পুনর্ব্বসুনামে দুইটি নক্ষত্র

৩৭ প্রসন্নভাঃ পাবক ঊর্দ্ধরশ্মিঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখো বিধূমঃ। ইত্যাদি। ভী ৩।৬৫-৭৪

৩৮ পাণ্ডুপুত্রা ব্যরাজন্ত পঞ্চ সম্বৎসরা ইব। আদি ১২৪।২২

৩৯ অনু ১০৯ তম ও ১১০ তম অঃ।

৪০ প্রতিশ্রবণপূর্ব্বাণি নক্ষত্রাণি চকার যঃ। আদি ৭১।৩৪

৪১ ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ। অশ্ব ৪৪।২

৪২ সুপুষ্পিতবনে কালে কদাচিন্মধুমাধবে। আদি ১২৫।২

৪৩ মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ। অশ্ব ৪৪।২

৪৪ অনু ৬৪ তম ও ৮৯ তম অঃ। অশ্ব ৪৪।২। বন ২২৯।১০

৪৫ বন ২৭৭।২০। সৌ ১৮।১৪। অশ্ব ৭৮।৪৭

চন্দ্রের দুই দিকে অবস্থান করে।[৪৬] হস্তানক্ষত্র পাঁচটি তারার সমষ্টি।[৪৭] বিশাখানামেও দুইটি নক্ষত্র চন্দ্রের দুইদিকে থাকে।[৪৮] সৌর চৌদ্দ দিনে, পনর দিনে এবং ষোল দিনেও এক পক্ষ হয়, কিন্তু তের দিনের পক্ষ বিশেষ দুর্য্যোগেরই সূচক। ভীষ্মের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়।[৪৯] উল্লিখিত সকল ব্যাখ্যা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কোন কোন প্রখ্যাত পণ্ডিত এইরূপেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। উদ্যোগপর্ব্বের গালবোপাখ্যানের গালব, যযাতি, বিশ্বামিত্র, মাধবী প্রভৃতি শব্দকে বিশেষ-বিশেষ নক্ষত্ররূপেও কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছেন।

বেদ ও পুরাণ

শাস্ত্রসমূহের বেদমূলকতা—বেদ ও পরলোকে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সকল শাস্ত্রই বেদমূলক। বেদকে অবলম্বন করিয়াই পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শনের সৃষ্টি। বেদের সহিত অপর কোন শাস্ত্রবচনের বিরোধ ঘটিলে আস্তিকসম্প্রদায়ের নিকট বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র অপ্রমাণ। সকল শাস্ত্রকারই বেদের সর্ব্বাতিগ প্রামাণ্য একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।[১]

বেদ ও বেদাঙ্গের নিত্যতা—বেদ ও বেদাঙ্গ নিত্য, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা রচিত নহে। ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট বেদ ও বৃহস্পতির নিকট বেদাঙ্গগুলি প্রতিভাত হইয়াছিল। পরে গুরুপরম্পরায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।[২]

আর্ষ শাস্ত্রে অবজ্ঞায় ক্ষতি—বেদমূলক আর্ষ শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া শুধু লৌকিক বুদ্ধিতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে নাই। বেদ এবং বেদমূলক মন্বাদিশাস্ত্রে অবিশ্বাস করিলে মুক্তি লাভ করা যায় না।[৩]

---

৪৬ চন্দ্রস্যেব পুনর্ব্বসূ। কর্ণ ৪৯।২৬

৪৭ পঞ্চতারেণ সংযুক্তঃ সাবিত্রেণেব চন্দ্রমাঃ। আদি ১৩৫।৩০

৪৮ বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশী যথা। কর্ণ ২০।৪৮

৪৯ ইমাস্তু নাভিজানেঽহমমাবাস্যাং ত্রয়োদশীম্। ভী ৩।৩২

১ নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রম্। অনু ১০৬।৬৫

২ বেদবিদ্ বেদ ভগবান্ বেদাঙ্গানি বৃহস্পতিঃ। শা ২১০।২০

৩ আর্ষং প্রমাণমুৎক্রম্য ধর্ম্মং ন প্রতিপালয়ন্।
সর্ব্বশাস্ত্রাতিগো মূঢ়ঃ শং জন্মসু ন বিন্দতি॥ ইত্যাদি। বন ৩১।২১,৮

বেদবিরোধী শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে—বেদমূলক শাস্ত্র ব্যতীত অপর শাস্ত্রকে বলা হইয়াছে 'অশাস্ত্র'। বেদবিরোধী শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে। আস্তিকগণ বেদ এবং বৈদিক শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবেন, ইহাই মহাভারতের অভিপ্রায়।[৪]

শাস্ত্রীয় নিয়ম-পালনে শ্রেয়োলাভ—বেদাদি শাস্ত্র মানুষের হিতের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালন করা আপনারই উপকারের নিমিত্ত। শ্রুতিবিহিত ধর্ম্মই সত্য, তাহাই একমাত্র প্রমাণ।[৫]

বেদ ও আরণ্যকে বিশ্বাস—বেদবচন এবং আরণ্যক শাস্ত্রকে (উপনিষদাদি) যাঁহারা অবহেলা করেন, তাঁহারা কোথাও গ্রহণযোগ্য কোন উপদেশ লাভ করিতে পারেন না। কলাগাছের খোলস ছাড়াইলে যেমন তাহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সেইরূপ বেদবিরোধী শাস্ত্রেও কোন সার দেখিতে পাওয়া যায় না।[৬]

শব্দব্রহ্ম-তত্ত্বের জ্ঞানে পরব্রহ্ম-লাভ—বেদকে বলা হয়, শব্দব্রহ্ম। যাহারা শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত, তাঁহারা পরব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। বেদের মত মানুষের হিতকারী আর কোন শাস্ত্র নাই। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে বেদের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে যত্নপর হন, তিনি নিশ্চিতই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।[৭]

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ঐক্য—কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড-নামে যদিও শ্রুতি দ্বিবিধ, তথাপি কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডেরই অংশবিশেষ। কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করা যায় না। সুতরাং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের

৪ ন প্রবৃত্তির্ঋতে শাস্ত্রাং কাচিদস্তীতি নিশ্চয়ঃ।
যদন্যদ্বেদবাদেভ্যস্তদশাস্ত্রমিতি শ্রুতিঃ। শা ২৬৮।৫৮

৫ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি বেদাশ্চ ষড়ঙ্গানি নরাধিপ।
শ্রেয়সোঽর্থে বিধীয়ন্তে নরস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥ ইত্যাদি। শা ২৯৭।৪০,৩৩

৬ বেদবাদানতিক্রম্য শাস্ত্রাণ্যারণ্যকানি চ।
বিপাট্য কদলীস্তম্ভং সারং দদৃশিরে ন তে॥ শা ১৯।১৭

৭ বেদাঃ প্রমাণং লোকানাং ন বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃতাঃ।
দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ॥ ইত্যাদি। শা ২৬৯।১,২

উপদেষ্টা শাস্ত্রও জ্ঞানের সহায়ক বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডেরই অংশরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। টীকাকার নীলকণ্ঠ ইহা বিশদভাবে বিচার করিয়াছেন।[৮]

মহাভারতের সর্ব্বশাস্ত্রময়তা—মহাভারত একাধারে কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদ। মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। পৌরাণিক বহু তথ্য এবং বংশানুচরিত প্রভৃতির বর্ণনায়ও মহাভারত সমৃদ্ধ।[৯]

ইতিহাস ও পুরাণের প্রয়োজনীয়তা—যাঁহারা বৈদিক সাহিত্য পাঠের অধিকারী নহেন এবং যাঁহারা পাঠ করিয়াও যথাযথ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহাদের নিমিত্ত ঋষিগণ পুরাণশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। পুরাণে উপাখ্যানের মধ্য দিয়া বৈদিক তাৎপর্য্য রূপকচ্ছলে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইতিহাস ও পুরাণ বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে।[১০]

পুরাণবক্তা ঋষিদের সর্ব্বজ্ঞতা—দ্রৌপদীযুধিষ্ঠির-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বদর্শী ঋষিগণই পুরাণের বক্তা। তাঁহাদের উক্তিতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যাঁহারা আর্ষ প্রমাণকে অবিশ্বাস করেন, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারে শাস্ত্রের কোন ধার ধারেন না, তাঁহারা জীবনে কখনও কল্যাণের মুখ দেখিতে পান না।[১১]

রামায়ণ ও বায়ুপুরাণের প্রাচীনতা—মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে বায়ুপুরাণের নাম গৃহীত হইয়াছে। অপর কোন পুরাণের নাম কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। রামায়ণের কথা বহু স্থানে কীর্ত্তিত হইয়াছে।[১২]

---

৮ নাস্তিক্যমন্যথা চ স্যাদ্ বেদানাং পৃষ্ঠতঃ ক্রিয়া।
এতস্থানন্তমিচ্ছামি ভগবন্ শ্রোতুমঞ্জসা॥ ইত্যাদি। শা ২৬৮।৬৭,৬৮
কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ পার্থগর্থ্যে বেদস্যৈকস্মিন্নর্থে পর্য্যবসানাভাবাদ্বাক্যভেদঃ স্যাৎ। ইত্যাদি। নীলকণ্ঠ। শা ২৬৮।৬৭

৯ কার্ষ্ণং বেদমিমং বিদ্বান্ শ্রাবয়িত্বার্থমশ্নুতে। আদি ১।২৬৮
অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং মহৎ। ইত্যাদি। আদি ২।৩৮৩-৩৮৫

১০ ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥ আদি ১।২৬৭
পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ। আদি ১।৮৬

১১ পুরাণমৃষিভিঃ প্রোক্তং সর্ব্বজ্ঞৈঃ সর্ব্বদর্শিভিঃ। বন ৩১।২৩
সর্ব্বশাস্ত্রাতিগো মূঢ়ঃ শং জন্মসু ন বিন্দতি। বন ৩১।২১

১২ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমতীতানাগতং ময়া।
বায়ুপ্রোক্তমনুস্মৃত্য পুরাণমৃষিসংস্তুতম্॥ বন ১৯১।১৬

চরিত্যাখ্যানে গার্গ্যের পাণ্ডিত্য—মুনিঋষিসমাজে দেবতা এবং ঋষিগণের চরিতকথা-বর্ণনায় গার্গ্যমুনির অসাধারণ পটুতার উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৩]

পুরাণের আদর ও প্রচার—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক তত্ত্ব প্রচারের উপযোগিতা সেইকালের সমাজ ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। এইহেতু দেখিতে পাই, প্রচারকের পুণ্যশ্রুতি নানাস্থানে কীর্ত্তিত। পুরাণকথার ভিতর দিয়া ধর্ম্মের সারমর্ম্মগুলি সকলেই জানিতে পারিতেন। পণ্ডিত-মূর্খনির্ব্বিশেষে সকলেই সহজভাবে আখ্যায়িকা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করিতেন। দার্শনিক সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের ধারণা করা শিক্ষাসাপেক্ষ, কিন্তু পৌরাণিক আখ্যান শুনিয়া তাহার মর্ম্মকথা বুঝিতে কোনও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। এইকারণেই কৃত্তিবাসের ও তুলসীদাসের রামায়ণ এবং কাশীদাসের মহাভারতের সমাদর ঘরে ঘরে।[১৪]

দার্শনিক মতবাদ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সনৎসুজাতীয় এবং শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্ম দার্শনিক আলোচনায় পরিপূর্ণ। সকল দর্শনেই কতকগুলি সিদ্ধান্ত সমান, দার্শনিকদের সেইসকল বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। প্রত্যেক দর্শনের বিশেষ-বিশেষ কথা পরে আলোচিত হইবে। দার্শনিক একরূপ সিদ্ধান্তগুলি সঙ্কলিত হইতেছে।

জন্ম ও মৃত্যু—জন্ম ও মৃত্যু সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা সত্য ঘটনা। যাহার জন্ম আছে, তাহারই মৃত্যু আছে। প্রাণীদের জীবন অনিত্য, কোন্ মুহূর্ত্তে মৃত্যু উপস্থিত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই।[১]

সংসারারণ্যের বর্ণনা—জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে মহামতি বিদুর

১৩ দেবর্ষিচরিতং গার্গ্যঃ। শা ২১০।২১

১৪ ইদং নরঃ স্বচরিতং সমবায়েষু কীর্ত্তয়ন্।
অর্থভাগী চ ভবতি ন চ দুর্গাণ্যবাপ্নুতে। ইত্যাদি। অনু ৯৩।১৪৮

১ জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ। ইত্যাদি। ভী ২৬।২৭,২৮। স্ত্রী ২।৬। শা ২৭।৩১। অশ্ব ৪৪।২০

একটি চমৎকার রূপকের কল্পনা করিয়াছেন। বাঘ, ভালুক, সাপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ কোনও ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পথভ্রষ্ট একজন পথিক ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। বনে প্রবেশের পরেই দেখিতে পাইল যে, বনকে অচ্ছেদ্য জাল দিয়া ঘেরা হইয়াছে। অতি ঘোরাকৃতি একজন নারী দুই হাতে সেই বন ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন। বাহিরের শক্ত আবরণে প্রতারিত হইয়া তৃণলতাসমাচ্ছন্ন একটি কূপে পতিত হইয়া সেই পথিকটি তৃণলতার মধ্যে আটকাইয়া গেল। তাহার পা উপরের দিকে এবং মাথা নীচের দিকে ঝুলিতে লাগিল। কূপের মধ্যে একটি ভীষণ সর্প গর্জ্জন করিতেছে। কূপের উপরে তৃণলতাদির পাশে বারখানি পা ও ছয়খানি মুখযুক্ত সাদা ও কালবর্ণে চিত্রিত একটি ভীষণাকৃতি মহাগজ দেখা গেল। সেও বৃক্ষলতাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশঃ কূপের দিকে আসিতেছে। একটি বৃক্ষের প্রশাখাতে ঘোরাকৃতি অনেক মধুমক্ষিকা মধু আগলাইয়া বসিয়া আছে। সেই মৌচাক হইতে ক্ষরিত বিন্দু বিন্দু মধু পান করিয়া পথিকটি জীবন ধারণ করিতে লাগিল। উপস্থিত মহাসঙ্কটেও তাহার দৃকপাত নাই, মধুপানের নিমিত্ত তাহার ব্যস্ততা অপরিসীম। কতকগুলি ইঁদুর সেই বৃক্ষটিকে ক্রমশঃ কাটিয়া ফেলিতেছে। পথিক সমস্ত ভীষণতার মধ্যেও নিশ্চিন্ত মনে মধুপানের নিমিত্ত লালায়িত। সংসারারণ্যে আমরা সকলই সেই পথিক। আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। বর্ণিত বনটি হইতেছে—সংসার। হিংস্র জন্তুগুলি ব্যাধি, অতিকায় ভীষণা নারীমূর্ত্তি জরা, কূপটি মানুষের দেহ, কূপমধ্যস্থিত মহাসর্প সাক্ষাৎ কালস্বরূপ। লতাগুল্মাদি মানুষের বাঁচিবার আশা, ষড়্‌বক্ত্র হাতীটি সম্বৎসর, ইঁদুরগুলি রাত্রি ও দিন, মক্ষিকাগুলি বাসনাস্বরূপ এবং মধুধারা কামরস। মানুষ এই রসের ক্ষণিক আনন্দে এত বড় বিপদকেও গ্রাহ্য করে না। বিবেকী পুরুষ সংসারচক্রে আবদ্ধ থাকিতে চান না। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা জীবনের অনিত্যতা বুঝিতে পারিলেই মধুর লোভ ত্যাগ করিয়া মুক্তির সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া উঠেন।[২]

আসক্তি-পরিত্যাগ—যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসঞ্চয়, আরোগ্য, প্রিয়জন-সমাগম সবই অনিত্য। সুতরাং সংসারে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া থাকা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে শোভন নহে। শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ প্রত্যেকেরই

২ স্ত্রী ৫ম ও ৬ষ্ঠ অঃ।

মৃত্যু হইয়া থাকে। সেইজন্য অনেকটা প্রস্তুত থাকাই পণ্ডিতের কাজ। স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব সকলের সহিতই একদিন না একদিন ছাড়াছাড়ি হইবে। সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গসজ্ঘর্ষে যেমন দুই খণ্ড কাষ্ঠ একত্র হইয়া পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, পরিবার-পরিজনের সহিত সংসারের সম্পর্কও সেইরূপ।[৩] সংসারের অনিত্যতা, বিষয়তৃষ্ণার ক্রমবর্দ্ধমান দুস্পূরতা, ধন-সম্পত্তির অতি তুচ্ছতা প্রভৃতি বৈরাগ্যানুকূল বর্ণনায় মহাভারতের অধ্যাত্ম-অংশ ভরপূর।

ভোগ্যবস্তুর অনিত্যতা—ভোগ্যবস্তুর উপভোগে বিষয়তৃষ্ণা ক্ষীণ হয় না, বরং প্রজ্বলিত বহ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বাড়িয়াই চলে। জগতের সমস্ত ভোগ্য বস্তু যদি এক ব্যক্তির যথেচ্ছ উপভোগে ইন্ধন যোগাইতে থাকে, তথাপি উপভোক্তার তৃষ্ণার উপশম হইবে না। সুতরাং ভোগাসক্তি যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া চলিতে পারিলেই সংসারে শান্তি আসিতে পারে।[৪] সুপ্রসিদ্ধ পিঙ্গলার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগের সুখ যে কতখানি, তাহা বলা হইয়াছে।[৫] মোক্ষধর্ম্মের অনেক অধ্যায়েই বৈষয়িক অতিস্পৃহা পরিত্যাগ ও তাহার ফল কীর্ত্তন করা হইয়াছে। কামনার পূরণে যে সুখ হয়, তাহা অপেক্ষা কামনার বর্জ্জনে সুখ অনেক বেশী।[৬]

৩ স্ত্রী ২য় ও ৩য় অঃ। শা ১৭৪ তম অঃ।
পথি সঙ্গতমেবেদং দারৈরন্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ।
নায়মত্যন্তসংবাসো লব্ধপূর্ব্বো হি কেনচিৎ॥ ইত্যাদি। শা ৩১৯।১০। শা ২৮।৩৬-৩৯

৪ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ ইত্যাদি। আদি ৭৫।৫০,৫১
কামং কাময়মানস্য যদা কামঃ সমৃধ্যতে।
অথৈনমপরঃ কামস্তৃষ্ণা বিধ্যতি বাণবৎ॥ ইত্যাদি। অনু ৯৩।৪৭। উ ৩৯।৮৫

৫ সুখং নিরাশঃ স্বপিতি নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
আশামনাশাং কৃত্বা হি সুখং স্বপিতি পিঙ্গলা॥ শা ১৭৪।৬২

৬ শা ১৭৬ তম—১৭৮ তম অঃ।
যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥ শা ১৭৪।৪৬। শা ১৭৭।৫১
অন্তো নাস্তি পিপাসায়াস্তুষ্টিস্তু পরমং সুখম্। ইত্যাদি। শা ৩৩০।২১। বন ২।৩৫,৪৬

রাজর্ষি জনকের নির্লিপ্ততা—সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াও সাধনার বলে মানুষ সংসারে থাকিয়াই নির্লিপ্তভাবে কাজ করিতে পারে। রাজর্ষি জনক নিষ্কাম কর্ম্মযোগীদের অগ্রগণ্য। তিনি বলিয়াছেন "আমার কিছুই নাই, এই কারণেই আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। মিথিলানগরী দগ্ধ হইলেও আমার কিছুই ক্ষতি হয় না"।[৭]

প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন—শুধু ত্যাগই যে মুক্তির অনুকূল, তাহা নহে। মনের নির্ম্মলতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। মনই মানুষের সুখ এবং দুঃখের কারণ। মন শুদ্ধ থাকিলে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের ভিতরে থাকিয়াও মানুষ নির্লিপ্ত থাকিতে পারে। মন শুদ্ধ না হইলে আচার-অনুষ্ঠান, তীর্থস্নান প্রভৃতি কেবল ভণ্ডামির নামান্তরমাত্র। মনই মানবের যজ্ঞভূমি, মনকে স্থির ও প্রসন্ন করিতে পারিলে সকল সাধনাই অগ্রসর হয়। মন পবিত্র থাকিলে সকল নদীই সরস্বতী, আর সকল প্রস্তরখণ্ডই পবিত্র দেবতা।[৮] অগাধ বিমল সত্যস্বরূপ-জলযুক্ত ধৃতিরূপ হ্রদে স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হয়। নির্ম্মল মানসতীর্থে স্নান করিলে মানুষের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। ত্যাগী সত্ত্বগুণবিশিষ্ট সমদর্শী পুরুষের নিকট সমস্তই পবিত্র, সকলই তাঁহার তীর্থ।[৯]

সুখ ও দুঃখ—একই বস্তু কাহারও সুখের, কাহারও বা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সুখ-দুঃখের অনুভূতিও সর্ব্বত্র একরূপ নহে। সমান অবস্থার ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও সুখী আবার কাহাকেও দুঃখী দেখিতে পাই। ইহাতে বুঝা যায়, সুখ-দুঃখের অনুভূতি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন-রকমের। সংসারে আপন-আপন অবস্থায় কোন প্রাণীই সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে বিশেষ একটি গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। তবে ইহা অতি সত্য যে, আপন-আপন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা

৭ অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন॥ শা ১৭।২৯। শা ২৭৫।৪

৮ আকিঞ্চন্যে ন মোক্ষোঽস্তি কিঞ্চন্যে নাস্তি বন্ধনম্। শা ৩২০।৫০
সর্ব্বা নদ্যঃ সরস্বত্যঃ সর্ব্বে পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
জাজলে তীর্থমাত্মৈব মাস্ম দেশাতিথির্ভব॥ শা ২৬২।৪০

৯ অগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতোয়ে ধৃতিহ্রদে।
স্নাতব্যং মানসে তীর্থে সত্ত্বমালম্ব্য শাশ্বতম্॥ ইত্যাদি। অনু ১০৮।৩-৯

প্রত্যেক প্রাণীরই আছে। এইজন্য সুখ এবং দুঃখ শুধু অনুভূতির উপর নির্ভর করে এবং এইগুলির অনুভূতিও বিচিত্র।[১০]

সুখদুঃখ নিত্যপরিবর্ত্তনশীল—কোন প্রাণী কেবল সুখ বা কেবল দুঃখ ভোগ করে না। সুখ এবং দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল; একটির পরে অপরটি আসিয়া উপস্থিত হয়। সুখে অত্যন্ত হর্ষ এবং দুঃখে অত্যন্ত বিমূঢ়তা—এই উভয়ের কোনটিই ভাল নহে। দুঃখকে সহ্য করা অপেক্ষা শান্তভাবে সুখকে বরণ করিয়া লওয়া কঠিন।[১১]

অর্থের লোভ-ত্যাগ—ধনদৌলত, গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতির সহিত মালিকের যে স্বামিত্ব-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, আসলে তাহা কল্পিত। লৌকিক প্রয়োজন নির্ব্বাহের দিক্ হইতে দৃষ্টি করিলে এই সকল ঋদ্ধিকে উড়াইয়া দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। গৃহস্থের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পক্ষে অর্থের স্থান সকলের উপরে। কিন্তু সংসারের নশ্বরতা চিন্তার সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, সংসার হইতে বিদায় লইবার সময় মানুষকে একেবারে রিক্ত হাতেই যাইতে হয়। মর্ত্ত্যলোকের সকল উপকরণই শুধু লৌকিক প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত সংগৃহীত। এই বস্তুটি আমার—এইপ্রকার স্বামিত্বজ্ঞানেরও বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই। উপনিষদের 'মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্'—এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া মহাভারতকার বলিয়াছেন, 'সর্ব্বে লাভাঃ সাভিমানাঃ'। বাস্তবিকপক্ষে ধনের সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনের কোন উপযোগিতা নাই, সেই ধনে শুধু লোভের বৃদ্ধি হয়। যে-ব্যক্তি গাভীর দুধ পান করেন, তিনিই গাভীর মালিক, এইরূপ একটি কথা মহাভারতে বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রয়োজনীয় ধন অপেক্ষা অধিক লাভের নিমিত্ত বৃথা সময়ক্ষেপ এবং উদ্বেগ সহ্য করা সঙ্গত

১০ সর্ব্বত্র নিরতো জীব ইতশ্চাপি সুখং মম। ইত্যাদি। অনু ১১৭।১৭,১৮
যদিষ্টং তৎ সুখং প্রাহুর্দ্বেষ্যং দুঃখমিহেষ্যতে। শা ২৯৫।২৭

১১ অহান্যস্তময়ান্তানি উদয়ান্তা চ শর্ব্বরী।
সুখস্যান্তং সদা দুঃখং দুঃখস্যান্তং সদা সুখম্। ইত্যাদি। অশ্ব ৪৪।১৮। বন ২৬০।৪৫
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্॥ ভী ২৯।২০
আকিঞ্চন্যং সুসন্তোষো নিরাশিত্বমচাপলম্। ইত্যাদি। বন ২১২।৩৫, ৩৬। অশ্ব ৩২শ অঃ।

নহে।[১২] আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষের পক্ষে ধনের প্রলোভন হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। রাজ্য অপেক্ষাও দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য্য বেশী। ধনী ব্যক্তি সর্ব্বদা ধনের বর্দ্ধন এবং রক্ষণে ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তাঁহার উদ্বেগের সীমা নাই। রাজা, অগ্নি, জল, চোর, দস্যু প্রভৃতি হইতে ধনী ব্যক্তির সর্ব্বদা আতঙ্ক, আর দরিদ্র নিরুপদ্রবে আত্মোন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন। ধর্ম্মকৃত্যের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন হয় না। মুক্তিকাম পুরুষের লৌকিক সঞ্চয়বুদ্ধি অনিষ্টকারিণী। এরূপ কোন সঞ্চয়ী পুরুষ দেখা যায় না, যিনি সম্পূর্ণ শান্তভাবে কাল যাপন করিতে পারেন। সুতরাং প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃ।[১৩]

স্নেহ বা অনুরাগ-পরিত্যাগ—মানসিক সমস্ত অশান্তির মূল স্নেহ বা অনুরাগ। আত্মচিন্তন এবং জ্ঞানের দ্বারা মনকে স্থির করিতে হয়। দুঃখ, ভয়, হর্ষ, শোক, আয়াস প্রভৃতি সবই স্নেহ বা অনুরাগ হইতে উৎপন্ন। বিষয়ানুরাগ মুক্তিকামীর পক্ষে উৎকট ব্যাধিবিশেষ। ইহার উপশম না হইলে মানুষ পুনঃ পুনঃ বিবিধ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া নানা দুঃখের মধ্যে জড়িত থাকে। ভোগ্য বিষয় না থাকিলেই কেহ ত্যাগী হইতে পারে না, ভোগ্য বিষয় উপস্থিত থাকিলেও তাহার উপাদেয়তা চিন্তা না করিয়া যিনি হেয়ত্ব চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী। গৃহস্থের পক্ষে একান্ত অনাসক্তি অসম্ভব। তাই বিষয়বৈরাগ্য বলিলে বুঝিতে হইবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ্য বস্তুতে অনাসক্তি বা উদাসীনতা। রম্য বস্তুর শ্রবণ, দর্শন কিংবা মননে চিত্তের প্রফুল্লতা উপস্থিত হয়, অতঃপর সেই বস্তু বিশেষভাবে উপভোগের নিমিত্ত কামনা বা ইচ্ছা হইয়া থাকে। ইচ্ছার উৎপত্তি হইলে বিষয়তৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং প্রথম হইতেই অতিস্পৃহাকে সংযত করিতে হয়।[১৪]

১২ সর্ব্বে লাভাঃ সাভিমানা ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ। ইত্যাদি। শা ১৮০।১০। শা ১৭৪।৪৪। শা ২৭৫ তম অঃ।
ধেনুর্ব্বৎসস্য গোপস্য স্বামিনস্তস্করস্য চ।
পয়ঃ পিবতি যস্তস্যা ধেনুস্তস্যেতি নিশ্চয়ঃ। শা ১৭৪।৩২

১৩ আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ম্।
অত্যরিচ্যত দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকম্। ইত্যাদি। শা ১৭৬।১০-১৩
ন হি সঞ্চয়বান্ কশ্চিদ্দৃশ্যতে নিরুপদ্রবঃ। ইত্যাদি। বন ২।৪৮,৪৯,৩৯-৪৫

১৪ স্নেহাত্তাবোঽনুরাগশ্চ প্রজজ্ঞে বিষয়ে তথা। ইত্যাদি। বন ২।২৯-৩৪

কামনার স্বরূপ—স্রক্‌-চন্দনাদির স্পর্শ কিংবা অর্থাদির লোভে যে প্রীতি জন্মে, তাহা হইতেই কামনার উদ্ভব। কাম চিত্তের সঙ্কল্পস্বরূপ। তাহার কোন শরীর নাই, কিন্তু ক্ষমতা অসীম।[১৫] দ্রব্যার্থসংযোগজনিত প্রীতিকে কোনও দর্শন কামনা-শব্দে প্রকাশ করেন নাই। সঙ্কল্প বা ইচ্ছা কামনারই নামান্তর—ইহা ন্যায়াদি দর্শনের সিদ্ধান্ত।

জীবলোক স্বার্থের অধীন—সংসারে মানুষের মধ্যে পরস্পর প্রীতিভাবও একেবারে স্বার্থলেশশূন্য নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার প্রীতির নিমিত্ত অপরকে ভালবাসিয়া থাকে। বিচারপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, সকলেই আপন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অপরকে তুষ্ট করিতে ব্যাকুল। সংসার আপন প্রয়োজনের অধীন। বৃহদারণ্যকের 'আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' এই শ্রুতিটি উক্ত মতবাদের মূল।[১৬]

সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ—সত্যনিষ্ঠা, আচারপালন, ক্রোধাদি-সংযম প্রভৃতি গুণ না থাকিলে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। শ্রদ্ধা এবং সত্যনিষ্ঠাই সকল শুভ কার্য্যের মূল। মনকে স্থির করিতে হইলে গুরুপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে হইবে। সেই পথ অধিকারিভেদে বিভিন্ন হইলেও উল্লিখিত সদ্‌বৃত্তিগুলিকে সকলের পক্ষেই সাধারণ গুণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।[১৭]

প্রকৃত শান্তি—অপরকে সুখী মনে করিয়া তাহার মত সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল হইতে নাই, অনাগত লাভের বিষয় চিন্তা করিয়া বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করা অনুচিত। বিপুল অর্থের লাভে অতিহর্ষ কিংবা প্রভূত ক্ষতিতে অতিবিষাদ সঙ্গত নহে। এইগুলি চিত্তস্থৈর্য্যের একান্ত প্রতিকূল। শমদমাদিরূপ শীল মানুষকে প্রকৃত শান্তির পথ দেখাইতে পারে। বিদ্যা, বিভব, বান্ধব প্রভৃতি কখনও প্রকৃত শান্তিদানে সমর্থ হয় না।[১৮]

---

১৫ দ্রব্যার্থস্পর্শসংযোগে যা প্রীতিরুপজায়তে।
স কামশ্চিত্তসঙ্কল্পঃ শরীরং নাস্য দৃশ্যতে ॥ বন ৩৩।৩০

১৬ অর্থার্থী জীবলোকোঽয়ং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ প্রিয়ঃ। ইত্যাদি। শা ১৩৮।১৫২, ১৫৩

১৭ কামলোভগ্রহাকীর্ণাং পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং নদীম্।
নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্মদুর্গাণি সন্তর ॥ ইত্যাদি। বন ২০৬।৭২,৬৩-৭০

১৮ সমাহিতো ন স্পৃহয়েৎ পরেষাং, নানাগতং চাভিনন্দেচ্চ লাভম্ ॥ ইত্যাদি। বন ২৮৬।১৪,১৫

চিত্তের স্থিরতা-সাধন—মনকে স্থির করিবার কতকগুলি উপায় শান্তি-পর্ব্বের 'শ্রেয়োবাচিক'-অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। বৈদিকশাস্ত্রে অবিচলিত শ্রদ্ধা, সর্ব্বভূতে দয়া, পাপকর্ম্মে নিবৃত্তি, সৎসঙ্গ, সরল ব্যবহার, প্রাণিহিতকর বচন, অহঙ্কারপরিত্যাগ, প্রমাদনিগ্রহ, সন্তোষ, বেদ-বেদান্তের অধ্যয়ন, মিতাহার, জ্ঞানজিজ্ঞাসা, পরনিন্দা-পরিত্যাগ, রাত্রিজাগরণ-ত্যাগ, দিবানিদ্রা-পরিত্যাগ, নিষ্কাম কর্ম্মলিপ্তত্তা, বাক্‌সংযম (কেহ কোন জিজ্ঞাসা না করিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কথা বলিতে নাই। বৃথা-বিতণ্ডা, অন্যায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রভৃতি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।), ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুসরণ, কুদেশ-পরিত্যাগ, অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন প্রভৃতি মনকে স্থির করিবার উপায়। সকল প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহার চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায়। সর্ব্বভূতে পরমাত্মা বিরাজিত, এই বুদ্ধিতে কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে নাই। এইভাবে চিত্তপ্রসারণের দ্বারা চিত্তের সকল মালিন্য বিদূরিত হয়।[১৯]

সন্তোষ—সন্তোষ সকল সুখের মূল। যখন যে অবস্থায় থাকা যায় না কেন, সেই অবস্থাকেই যদি আপন অনুকূল মনে করিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক দুঃখের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হয়। যিনি অল্প কিছু পাইলেই তৃপ্তি বোধ করেন, সেই স্বল্পতুষ্ট পুরুষ কিছুতেই অবসন্ন হন না। তৃপ্তিই মানুষকে আনন্দের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। পর্য্যঙ্কশয্যা এবং ভূমিশয্যা উভয়ের মধ্যে যিনি পার্থক্য মনে করেন না, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। এইরূপ স্বল্পসন্তুষ্ট পুরুষকে অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত কখনও বিব্রত হইতে হয় না। চেষ্টার ফলে যে-সকল ভোগ্য বস্তু সংগৃহীত হয়, তাহাতেই ব্যবস্থা করিয়া লওয়া সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা। গার্হস্থ্যজীবনেও অতি-স্পৃহা জীবনযাত্রার পথে পরম শত্রু।[২০]

অহিংসা—অহিংসার সাধনে চিত্তবৃত্তি উন্নত হয়। হিংসা মানুষের মনকে নিতান্ত সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। সংসারে থাকিতে গেলে জীবনধারণের

১৯ শা ২৮৭ তম অঃ।

নির্গুণঃ পরমাত্মা তু দেহং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে।

তমহং জ্ঞানবিজ্ঞেয়ং নাবমন্যে ন লঙ্ঘয়ে ॥ বন ১৪৭।৮

২০ পর্য্যঙ্কশয্যা ভূমিশ্চ সমানে যস্য দেহিনঃ।

শালয়শ্চ কদন্নঞ্চ যস্য স্যান্মুক্ত এব সঃ। ইত্যাদি। শা ২৮৮।৩৪, ৩৫, ৩২

নিমিত্ত প্রত্যেককেই বাধ্য হইয়া কতকগুলি বিষয়ে হিংসা করিতে হয়। যাগযজ্ঞাদিতে যে-সকল হিংসা বিধিবোধিত, সেইগুলি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠাতাদের পক্ষে অনিবার্য্য। বৈধ হিংসায় পাপ নাই, ইহা মহাভারতের অভিপ্রায়। সম্পূর্ণরূপে হিংসা বর্জ্জন একপ্রকার যোগের অন্তর্গত। মুমুক্ষু-মানব চিত্তের পূর্ণ বিশুদ্ধির নিমিত্ত হিংসা ত্যাগ করিয়া সকল প্রাণীকে মিত্রবৎ মনে করিবেন। অনৃশংসতা সকল ধর্ম্মের উপরে। হিংসাবৃত্তির মত এত নীচ আর কিছুই নাই। এক শব্দে ধর্ম্মের সার তত্ত্ব প্রকাশ করিতে হইলে শুধু 'অহিংসা' শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দেব, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ পুনঃ পুনঃ অহিংসার প্রশংসা করিয়াছেন। হিংসাকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; মনোজ, বাক্যজ, কর্ম্মজ ও ভক্ষণজ। এই চারিপ্রকার হিংসা হইতে যিনি বিরত, তিনিই প্রকৃত অহিংসার উপাসক। এই অভিমত অনুসারে দেখা যায়, ভক্ষ্যরূপেও যাঁহারা পশুপক্ষী প্রভৃতি হনন না করিয়া শুধু শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাহার বেশী প্রাণী হনন করেন না, তাঁহারাই যথার্থ অহিংসক। অপরের যাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহাই হিংসা। আত্মরক্ষার নিমিত্ত যে-সকল হিংসা করিতে হয়, তাহা না করিলেই বরং পাপ। আত্মরক্ষা সকল ধর্ম্মের উপরে। এই কারণেই আততায়ীর হনন শাস্ত্রকারগণ সমর্থন করেন। অহিংসাধর্ম্ম যে-সকল মহাপুরুষের চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগকে তপস্বী বলা হয়। অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর কিছুই হইতে পারে না। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ দম, উৎকৃষ্ট দান এবং পরম যজ্ঞ। অহিংসা অপেক্ষা মানবের অকৃত্রিম অপর মিত্র নাই। অহিংসা পরম সত্য, অহিংসা সর্ব্বশাস্ত্রের সার। যজ্ঞ, তীর্থসেবন, দান প্রভৃতি মানুষের চিত্তশুদ্ধিতে যতখানি উপযোগী, অহিংসা তদপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নহে। অহিংস্র পুরুষ সর্ব্বভূতের মাতৃপিতৃস্থানীয়। নিখিল প্রাণিজগৎ অহিংস্র পুরুষের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ; কেহই তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে না।'[২১]

২১ ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।
নেদং জীবিতমাসাদ্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥ ইত্যাদি। বন ২১২।৩৪,৩০
চতুর্ব্বিধেয়ং নির্দ্দিষ্টা হ্যহিংসা ব্রহ্মবাদিভিঃ।
একৈকতোঽপি বিভ্রষ্টা ন ভবত্যরিসূদন ॥ ইত্যাদি। অনু ১১৪।৪—১০, ২
অনু ১১৩ তম ও ১১৬ তম অঃ।

অহিংসা-প্রতিষ্ঠায় মানব দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া থাকেন। হিংসায় যাহার চরিত্র কলুষিত, সে কাহারও বিশ্বাসভাজন হইতে পারে না এবং সুস্থ দীর্ঘ জীবন লাভ করা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।[২২]

জীবসেবা—সেবার দ্বারা মনের পবিত্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ সমস্ত প্রাণীর শরীরে বিরাজ করিতেছেন। শ্রদ্ধার সহিত যে-কোন প্রাণীর সেবাই ভগবানের উপাসনা। কায়মনোবাক্যে প্রাণীর সেবা করিলে সর্ব্ব-ব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণু সেই সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন।[২৩]

তপস্যা ও বিশুদ্ধ কর্ম্ম—মন স্থির করার শ্রেষ্ঠ উপায় তপস্যা। হিত এবং মিত আহারবিহারাদির দ্বারা শরীরকে নীরোগ রাখিতে হইবে। শরীরকে উপেক্ষা করিয়া তপস্যা চলে না। সময়-সময় উপবাস উপকার করিয়া থাকে, এইজন্য উপবাসকেও শ্রেষ্ঠ তপস্যারূপে স্বীকার করা হইয়াছে।[২৪] বিশুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা, কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা প্রভৃতিও তপস্যার মধ্যে গণ্য। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের অনুদ্বেগকর সত্য, প্রিয় ও হিতবচনরূপ বাঙ্ময় তপস্যা করিবার অধিকারী। মনঃপ্রসাদ, সৌম্যত্ব, স্থৈর্য্য, জিতেন্দ্রিয়তা, ভাবশুদ্ধি প্রভৃতিকে মানস তপস্যা-নামে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। চরিত্রে যে-কোন সাধু আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে গেলে তপস্যার প্রয়োজন। লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গেলেই তপস্যা হয় না। কর্ম্মের ভিতর দিয়া মানুষের তপস্যা সত্য ও সার্থক হইয়া থাকে। মনুষ্যত্বের তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সমস্ত মহৎবস্তুর প্রাপ্তি তপস্যার অধীন। ইহলোকে যেমন তপস্যা ব্যতীত কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ পরলোকেরও প্রধান পাথেয় তপস্যা। যিনি সেই পরম পুরুষকে জানিবার নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে ব্রত, যোগ প্রভৃতি তপস্যায় নিরত থাকেন, তাঁহার নিকটই সেই পরমজ্যোতি প্রকাশিত হন।

---

২২ অহিংসয়া চ দীর্ঘায়ুরিতি প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ অনু ১৬৩।১২
পাপেন কর্ম্মণা দেবি বদ্ধো হিংসারতির্নরঃ।
অপ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতানাং হীনায়ুরুপজায়তে ॥ অনু ১৪৪।৫৪, ৫২

২৩ যে যজন্তি পিতৄন্ দেবান্ গুরূংশ্চৈবাতিথীংস্তথা।
গাংশ্চৈব দ্বিজমুখ্যাংশ্চ পৃথিবীং মাতরং তথা ॥ ইত্যাদি। শা ৩৪৫।২৬-২৮

২৪ তপো নানশনাৎ পরম্। ইত্যাদি। অনু ১০৬।৬৫। অনু ১০৭ তম অঃ। উ ৪৩।২০। বন ১৯৯।১০০

সেই তপস্বী পুরুষই বীতশোক ও বিমুক্ত হইতে পারেন। তপস্বী ব্যতীত আর কেহ ঈশ্বরের বিরাট সত্তার অনুভবের যোগ্য নহেন। ঈশ্বর একমাত্র তপোজ্ঞেয়।[২৫]

তপস্যার শেষ ফল মুক্তিলাভ—পারলৌকিক শান্তির উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতে মানুষ স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয় না। বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সেই স্পৃহা জাগিয়া থাকে। রাজস ও তামসভাবে বিভোর মানব গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ সেইগুলির মধ্যেই ডুবিয়া থাকে। সেইসকল বস্তুর অনিত্যতা চিন্তা না করায় মানুষের রাগদ্বেষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাগদ্বেষ হইতে মোহ এবং মোহ হইতে রতির উৎপত্তি হয়। তখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব গ্রাম্য সুখকে খুবই আনন্দপ্রদ মনে করে। বিষয়ভোগে কখনও বাসনা বা রতির ক্ষয় হয় না। কালক্রমে স্নেহভাজনের বিয়োগ, প্রেমাস্পদের চিরবিচ্ছেদ, ধনের একান্ত নাশ প্রভৃতি কারণে মোহগ্রস্ত মানবেরও নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। নির্ব্বেদ হইতে আত্মসংবোধ, সংবোধ হইতে শাস্ত্রদর্শন, শাস্ত্রার্থদর্শনের পর তপস্যার ইচ্ছা উপস্থিত হয়। বিবেকী তপস্বী পুরুষের সংখ্যা খুব কম। জিতেন্দ্রিয় শান্ত দান্ত তপস্বী ব্যক্তি অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন।[২৬]

ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, "রাজন, তুমি শোকে অধীর হইও না। তপস্যা দ্বারা পুনরায় তোমার হৃত রাজ্য উদ্ধার করিতে পারিবে"।[২৭] তপস্যায় সিদ্ধ হয় না, এমন কোন কিছু জগতে নাই। যাহাকে দুরাপ বা দুরাধর্ষ বলিয়া মনে হয়, তপস্যার বলে তাহাও হস্তস্থিত বস্তুর ন্যায় উপস্থিত হয়। মনুষ্য, পিতৃগণ, পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেরই সিদ্ধি তপস্যার অধীন।[২৮] যাহা কিছু সশ্রদ্ধ তপস্যার দ্বারা কৃত হয়, তাহারই শক্তি অসীম। যাবতীয় ভোগ্য বস্তু, এমন কি, মুক্তি পর্য্যন্ত তপস্যালভ্য।

---

২৫ তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ।, ইত্যাদি। বন ৯১।১৯। শা ১৯।২৬
স চেন্নিবৃত্তবন্ধস্তু বিশুদ্ধশ্চাপি কর্ম্মভিঃ।
তপোযোগসমারম্ভং কুরুতে দ্বিজসত্তম। ইত্যাদি। বন ২০৮।৩৮-৫৩। বন ১৮৬।২৭-৩০

২৬ শা ৯৫ তম অঃ।

২৭ রাজ্যাৎ স্ফীতাৎ পরিভ্রষ্টস্তপসা তদবাপ্স্যসি। বন ২৬০।৪৪

২৮ তপোমূলং হি সাধনম্। ইত্যাদি। অশ্ব ৫১।১৬-২৪

ভগবান্ সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে তপোমাহাত্ম্য বিশদরূপে বুঝাইয়াছিলেন[২৯] যে-কোন মহৎ কাজে প্রবৃত্ত হইলে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিও তপস্যার বলে জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।[৩০] তপস্যার এরূপ মাহাত্ম্য যে, দেবতারাও তপস্বীকে ভয় করিয়া থাকেন। তপস্বীর ইচ্ছার প্রতিকূলে দাঁড়াইবার মত সাহস এই পৃথিবীতে কাহারও নাই।[৩১]

বিষয়াসক্তি আধ্যাত্মিক তপস্যার প্রতিবন্ধক—আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিতে হইলে পার্থিব সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে আপনাকে একেবারে মুক্ত রাখিতে হইবে। পুত্রকলত্রাদির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া অতীব দুষ্কর। বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার সময়ও সংসারের মায়া মানুষকে আকর্ষণ করিতে থাকে।[৩২]

ইন্দ্রিয়জয়ের ফল—দমপ্রশংসা-প্রকরণে ইন্দ্রিয়বিজয়ের বহুবিধ ফল কীর্ত্তন করা হইয়াছে। দান্ত পুরুষ সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় শান্তিতে থাকেন। তাঁহার প্রার্থনা কখনও বিফল হয় না। দানের দ্বারাও চিত্তবৃত্তি উদার এবং প্রসন্ন হয়, কিন্তু দমের মহিমা তদপেক্ষা অনেক বেশী। দমপ্রভাবে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন।[৩৩]

কর্ম্মের দ্বারা মানুষের প্রকাশ—মানুষকে তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা বিচার করিতে হয়। কর্ম্মের মধ্য দিয়া মানুষ আপনাকে প্রকাশ করে।[৩৪]

মানুষ সকলের উপরে—যথার্থ মানুষ হইবার তপস্যাই যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, এই কথা মহাভারতে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 'মানুষ অপেক্ষা

২৯ তপোমূলমিদং সর্ব্বং যন্মাং পৃচ্ছসি ক্ষত্রিয়।
তপসা বেদবিদ্বাংসঃ পরং ত্বমৃতমাপ্নুয়ুঃ॥ উ ৪৩।১৩

৩০ প্রজাপতিঃ প্রজাঃ পূর্ব্বমসৃজত্তপসা বিভুঃ। ইত্যাদি। শা ২৯৫।১৫-১৮

৩১ স তং ঘোরেণ তপসা যুক্তং দৃষ্ট্বা পুরন্দরঃ।
প্রাবেপত সুসন্ত্রস্তঃ শাপভীতস্তদা বিভো॥ অনু ৪১।১৮

৩২ উপরোধো ভবেদেবমস্মাকং তপসঃ কৃতে।
ত্বৎস্নেহপাশবদ্ধা চ হীয়েয়ং তপসঃ পরাৎ॥ আশ্র ৩৬।৪১

৩৩ দমস্য তু ফলং রাজন্ শৃণু ত্বং বিস্তরেণ মে।
দান্তাঃ সর্ব্বত্র সুখিনো দান্তাঃ সর্ব্বত্র নির্বৃতাঃ॥ ইত্যাদি। অনু ৭৫।১১-১৭

৩৪ মনুষ্যাঃ কর্ম্মলক্ষণাঃ। অশ্ব ৪৩।২১
আত্মানমাখ্যাতি হি কর্ম্মভির্নরঃ। অনু ৪৮।৪৯

শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, ইহাই মহৎ এবং অতিশয় গুহ্য তত্ত্ব'।[৩৫] এই সাধনার অনুকূলে যে-সকল সদ্‌বৃত্তিকে চেষ্টার দ্বারা জীবন্ত করিয়া তুলিতে হয়, তাহাই তপস্যা এবং সেই চেষ্টাও তপস্যারই অঙ্গ। শম, দম প্রভৃতি তপস্যারই ফল। যিনি সাধু পথে একাগ্রভাবে অগ্রসর হন, তাঁহাকে তপস্বী বলা যাইতে পারে। সকল সাধু প্রয়াসের মূলেই তপস্যা বিদ্যমান।

আত্মতত্ত্ব-শ্রবণের অধিকারী—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধান—এই পাঁচটি বিষয় যাঁহার আয়ত্তাধীন নহে, তিনি আত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিবারই অধিকারী নহেন। আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু শান্ত ও দান্ত হইয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইবেন।[৩৬]

জন্মান্তরীয় কর্ম্মের ফল বা দৈব—কর্ম্মফল, অদৃষ্ট, দৈব এইসকল শব্দ সমানার্থক। মহাভারতে জন্মান্তরবাদ এবং অদৃষ্টবাদ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একটিকে স্বীকার করিলেই অপরটি স্বীকার করিতে হয়। ভারতীয় আস্তিকদর্শন উভয়কেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন, সুতরাং জগতে বৈষম্যের কারণ—প্রাণিগণের আপন-আপন অদৃষ্ট বা জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল-জনিত পাপ এবং পুণ্য। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্তই প্রাণিগণ জন্ম গ্রহণ করে। আদি সৃষ্টিতে বৈষম্যের কারণ কি ছিল, এই প্রশ্নকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে জন্মান্তরবাদী দার্শনিকগণ সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলের স্বীকারে শোকদুঃখে যে সাময়িক সান্ত্বনা লাভ হয়, তাহা অস্বীকার করিবার নহে। দেখিতে পাই, কোন দুঃখে সান্ত্বনা দিতে গেলেই উপদেষ্টা কর্ম্মফল, দৈব, জন্মান্তর, কালমাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয়ে নানাপ্রকার যুক্তি-বচনবিন্যাসপূর্ব্বক উপদেশ দিয়াছেন। প্রাণীদের সুখ বা দুঃখের যতগুলি কারণ উপস্থিত হইতে পারে, সবই যে জন্মান্তরীয় কর্ম্মের ফল, তাহা নহে। যেখানে ইহজন্মের কোন শুভ বা অশুভ চেষ্টা ব্যতীত হঠাৎ কোন শুভ বা অশুভ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানেই বাধ্য হইয়া প্রাক্তন কর্ম্মফল স্বীকার করিতে হয়। বলা হইয়াছে যে, মানুষ জীবনের যে অবস্থায় যে-জাতীয় কাজ করে, সে পরজন্মে মানুষ হইলে সেই

৩৫ গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ। শা ২৯৯।২০

৩৬ দিষ্ট্যা পঞ্চসু রক্তোঽহসি। বন ৩১৩।৯

অবস্থায় সেই কাজের ফল ভোগ করিয়া থাকে। কোন দর্শনে এতটা জোরের সহিত এইভাবের কর্ম্মফল-ভোগের কোন বর্ণনা নাই।[৩৭] ভগবান্ তাঁহার খামখেয়ালিমত প্রাণিগণকে সুখদুঃখ ভোগ করান না। প্রাণী জন্মান্তরীয় কর্ম্মবীজ অনুসারে ইহলোকে ফল ভোগ করিয়া থাকে। এই কথাই বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে।[৩৮] উত্তম কুলে জন্ম, বীরত্ব, আরোগ্য, রূপ, সৌভাগ্য প্রভৃতি জন্মান্তরীয় শুভ কর্ম্মের ফল। সংসারের বিচিত্র বিধানে জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলের শক্তি অপরিমিত। সেই ফলকে ফাঁকি দিবার মত শক্তি কাহারও নাই। প্রারব্ধ ফল ভোগ করিবার নিমিত্তই মানুষের জন্ম হয়। কর্ম্মফলের নিকট সকলকেই হার মানিতে হয়।[৩৯] পূর্ব্বজন্মের শুভ কার্য্যের ফলে মানুষ দেবত্বে উন্নীত হইতে পারে, শুভ এবং অশুভ কাজের মিশ্রণে মনুষ্যকুলে জন্মলাভ করে, আর অবিমিশ্র অশুভ কার্য্যের দ্বারা মানুষের অধোগতি হয়, এবং হীনযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে।[৪০] সহস্র ধেনুর মধ্যে বৎস যেমন আপন জননীকে চিনিয়া তাহারই অনুসরণ করে, ঠিক সেইরূপ জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল অনুষ্ঠাতার পর-পর জন্মেও তাহাকেই অনুসরণ করিয়া থাকে।[৪১] সংসারে মিলিতভাবে একই পরিবারে পুত্রকলত্রাদির সহিত বাস করিলেও কেহ কাহারও কাজের জন্য দায়ী হয় না। আপন-আপন কর্ম্মফল প্রত্যেককেই পৃথক্-পৃথক্ভাবে ভোগ করিতে হয়। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে যদিও সকলের ভাগ্যকেই যেন সমানভাবে উন্নত বা অবনত

৩৭ যস্যাং যস্যামবস্থায়াং যদ্ যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তৎফলং সমবাপ্নুয়াৎ॥ ইত্যাদি। সভা ২২।১৩। শা ১৮১।১৫

৩৮ দধাতি সর্ব্বমীশানঃ পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরন্। বন ৩০।২২
ধাতাপি হি স্বকর্ম্মৈব তৈস্তৈর্হেতুভিরীশ্বরঃ।
বিদধাতি বিভজ্যেহ ফলং পূর্ব্বকৃতং নৃণাম্॥ ইত্যাদি। বন ৩২।২১। অশ্ব ১৮।১২

৩৯ কুলে জন্ম তথা বীর্য্যমারোগ্যং রূপমেব চ।
সৌভাগ্যমুপভোগশ্চ ভবিতব্যেন লভ্যতে॥ ইত্যাদি। শা ২৮।২৩-২৯। বন ২০৮।২৪। শা ১৯০।১৬

৪০ শুভৈর্লভতি দেবত্বং ব্যামিশ্রৈর্জন্ম মানুষম্।
অশুভৈশ্চাপ্যধো জন্ম কর্ম্মভির্লভতেঽবশঃ॥ শা ৩২৯।২৫

৪১ যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি। শা ১৮১।১৬। অনু ৭।২২

হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহার পশ্চাতে স্ব-স্ব কর্ম্মফল ব্যতীত অপরের কর্ম্মফল কারণ নহে। বুঝিতে হইবে, সেইরূপ সুখদুঃখের ভোক্তা সকলেই জন্মান্তরে সেই-সেই সুখদুঃখ ভোগের অনুকূল কাজ করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে এক পরিবারে বাস করিতে হইত না। প্রিয় কিংবা অপ্রিয়, যাহাই জীবনে উপস্থিত হয় না কেন, তাহারই মূলে জন্মান্তরীয় কর্ম্ম। কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার শক্তি কাহারও নাই।[৪২] অনুশাসনপর্ব্বে গৌতমীর উপাখ্যানে কর্ম্মফলবর্ণন-প্রসঙ্গে অনেক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সমস্ত অধ্যায়ের সারসঙ্কলনে এই দাঁড়ায় যে, প্রত্যেকেই আপন-আপন কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। যাহা যখন ঘটিবে, তাহা প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে-কোন উপলক্ষ্যে সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে।[৪৩] কাহারও স্বভাবতঃ পাপকর্ম্মে, আর কাহারও স্বভাবতঃ পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে, ইহার মূলেও দৈবের লীলা। চেষ্টা ব্যতীত শৈশব হইতে যে-সকল রুচিবৈচিত্র্য মানবস্বভাবে দেখা দেয়, তাহারও মূলে অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যথেষ্ট অর্থপ্রাপ্তিতে আনন্দের এবং প্রচুর ক্ষতিতেও দুঃখের কোন কারণ নাই। যেহেতু লাভ ও ক্ষতি উভয়ই দৈবায়ত্ত। অদৃষ্টকে বলবৎ মনে করিয়া কোন অবস্থাতেই অতিশয় আনন্দিত কিংবা দুঃখিত হইবে না। যখন যে-ভাবে থাকিতে হয়, সেই অবস্থাকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিবে। আপন শক্তিতে দৈবাধীন ঘটনার প্রতীকার করা যায় না।[৪৪] সমস্ত ভোগ্য বস্তু জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলবশে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাঁহার যতটুকু প্রাপ্য, তিনি তাহাই ভোগ করিয়া থাকেন, তদতিরিক্ত ভোগে মানুষের অধিকার নাই। কাঠের পুতুল যেমন চালকের ইচ্ছায় নড়াচড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ম্মফলের নিকট মানুষের স্বাতন্ত্র্যও মন্দীভূত হইয়া পড়ে। মানুষের শক্তি অত্যন্ত পরিমিত। দৈবকে অতিক্রম

৪২ স্বয়ংকৃতানি কর্ম্মাণি জাতো জন্তুঃ প্রপদ্যতে।
নাকৃত্বা লভতে কশ্চিৎ কিঞ্চিদত্র প্রিয়াপ্রিয়ম্॥ শা২৯৮।৩০
সর্ব্বঃ স্বানি শুভাশুভানি নিয়তং কর্ম্মাণি জন্তুঃ স্বয়ম্
গর্ভাৎ সম্প্রতিপদ্যতে তদুভয়ং যত্তেন পূর্ব্বং কৃতম্॥ শা ২৯৮।৪৫

৪৩ অনু ১ম অঃ।

৪৪ ন জাতু হৃষ্যেন্মহতা ধনেন। ইত্যাদি ৮৯।৭-১২। আদি ১২৩।২১

করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।[৪৫] প্রাপ্তব্য বস্তুর প্রাপ্তি সুনিশ্চিত, যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা অবশ্যই ফলিবে, এইপ্রকার চিন্তা করিলে মানুষ বিপদের সময়েও নিতান্ত অধীর হইয়া পড়ে না। 'আমার কৃত কার্য্যের জন্যই এরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছি', যাঁহার এইপ্রকার কর্তৃত্বাভিমান হয়, দুঃখ তাহাকেই অভিভূত করে। দেবতা, ঋষি, মহাপুরুষ, এমন কি, বনবাসী মুনিগণও সময়-সময় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। ঐহিক কোন দুষ্কৃত না করিয়াও তাঁহাদের কেন দুঃখ ভোগ করিতে হয়—এই প্রশ্নের উত্তরে জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট স্বীকার না করিয়া চলে না। প্রকৃত পণ্ডিতব্যক্তি আপদ্‌বিপদেও হিমাচলের ন্যায় অটল থাকেন। সুখ এবং দুঃখকে যিনি অদৃষ্টের দানরূপে সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। মন্ত্র, বল, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, শীল, বৃত্ত, অর্থ, সম্পৎ প্রভৃতি কিছুই অলভ্যকে লাভ করাইতে সমর্থ হয় না। যাঁহার ভাগ্যে যতটুকু প্রাপ্য, তাঁহার ততটুকুই উপস্থিত হয়।[৪৬] পুণ্যকর্ম্মের ফল কল্যাণ এবং পাপের ফল অকল্যাণ। জন্ম সব-সময়ই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে হইয়া থাকে। শুভকৃৎ শুভযোনিতে এবং পাপকৃৎ পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুখ এবং দুঃখের কারণ অনেক সময় প্রত্যক্ষ হয় না, তখন বাধ্য হইয়া অদৃষ্টকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বহ্নির উষ্ণতা এবং জলের শীতলতার মত সুখ ও দুঃখের পর্য্যায়ক্রমে উপভোগ স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে অপর কোন কারণের কল্পনা না করাই উচিত, এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা হইয়াছে যে, কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ না করা এবং অকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করা নিতান্তই অস্বাভাবিক; কোনও যুক্তিবলে তাহা সমর্থিত হয় না। অতএব প্রত্যেকের ভোগের কারণরূপে ঐহিক কর্ম্ম যদি না দেখা যায়, তবে অদৃষ্টের কারণতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেহই অপরের কাজের জন্য দায়ী হন না। আপন-আপন কর্ম্মফল ভোগ করাই সংসারের নিয়ম।[৪৭]

মনের দ্বারা যে-সকল পাপ করা যায়, জন্মান্তরে মনের দ্বারাই তাহার ফল ভোগ হইয়া থাকে। এইরূপে কায়িক কর্ম্মের ফল কায়ের

৪৫ বন ৩০।২২-৪৩

৪৬ শা ২২৬ তম অঃ।

৪৭ শা ২৯০ তম অঃ।

দ্বারা ভোগ করিতে হয়। বাল্য যৌবনাদিভেদে যে-সকল কর্ম্ম করা হয়, তাহার ফলও বাল্যাদি অবস্থাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃত কর্ম্ম ফল প্রদান না করিয়া বিরত হয় না। সেই ফল ইহজন্মে ভোগ না হইলে পরজন্মে ভোগ করিতেই হইবে। বৃক্ষ যেমন যথাকালে ফুল এবং ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, কর্ম্মফলও ঠিক সেইরূপ যথাকালে মানুষের উপভোগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয়। হঠাৎ সুখ এবং হঠাৎ দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইসকল সুখ-দুঃখের ভোগের নিমিত্ত মানুষকে সব সময়ই প্রস্তুত থাকিতে শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রারব্ধ কর্ম্ম না থাকিলে জন্মই হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, জীবনে অনেক দুঃখ এবং সুখ ভোগের নিমিত্ত আমরা সংসারে আসিয়াছি।[৪৮] প্রবল প্রতিকূল দৈবকে প্রতিহত করিবার কোন উপায় নাই। বুদ্ধি, বিক্রম, বিদ্যা প্রভৃতি সকলই প্রবল দৈবের নিকট পরাস্ত। পৌরুষবলে মানুষ কাজ করিতে পারে বটে, কিন্তু দৈব প্রতিকূল হইলে কাজের ফল লাভ হয় না। মানুষ দৈবচালিত হইয়াই সাধু কিংবা অসাধু কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কাজের ফল মানুষকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়; ভোগ ব্যতীত কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। সুতরাং জন্মান্তরে যে-সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার শুভাশুভ ফল অভুক্ত থাকিলে পর-পর জন্মে ভোগ করিতেই হইবে। বিশেষ তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিয়াও যদি কোন কাজের অভিলষিত ফল লাভ না হয়, তখন বুঝিতে হইবে, প্রবল প্রতিকূল দৈব দ্বারা পৌরুষ ব্যর্থ হইয়াছে। বিশেষ পৌরুষ ব্যতীত অনুষ্ঠিত কোন কর্ম্মের ফল যদি আশাতিরিক্তভাবে পাওয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে, অনুকূল প্রবল দৈবের দ্বারা সেই ফল পাওয়া গেল। অদৃষ্টবিশ্বাসী দৈববাদী পণ্ডিতগণের এই প্রকার সিদ্ধান্ত।[৪৯]

চেষ্টা, উদ্যোগ বা পুরুষকার—দৈবের উপর ভার দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে কালযাপন করা অতিশয় গর্হিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দৈবকে স্বীকার করিবার পক্ষে একদিকে যেমন প্রবল যুক্তি দেখান হইয়াছে, সেইরূপ পুরুষকারের প্রশংসাচ্ছলে দৈবকে অতিশয় নিষ্প্রভ করিয়া চিত্রিত করা

---

৪৮ যেন যেন শরীরেণ যদ্ যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমুপাশ্নুতে॥ ইত্যাদি। অনু ৭।৩-৫

৪৯ দৈবদিষ্টেঽন্যথাভাবো ন মন্যে বিদ্যতে ক্বচিৎ। ইত্যাদি। দ্রো ১৫০।২২,২৪-৩০
দৈবং প্রজ্ঞাবিশেষেণ কো নিবর্ত্তিতুমর্হতি। ইত্যাদি। আদি ১।২৪৬। ভী ১২২।২৭
দৈবমেব পরং মন্যে পুরুষার্থো নিরর্থকঃ। ইত্যাদি। বন ১৭৯।২৭। উ ৪০।৩২

হইয়াছে। পুরুষকারহীন ব্যক্তি শুধু দৈবের জোরে কোন কাজে সফলতা লাভ করিতে পারেন না। দৈব ও পুরুষকার একে অন্যের সহায়তা চায়, উভয়ে মিলিত হইলে মণিকাঞ্চন যোগ হয়। যাঁহারা তেজস্বী, তাঁহারা যখন যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, দৈবের দিকে না তাকাইয়া সেই কাজে পূর্ণ উদ্যমে ব্রতী হন। সুফল লাভ করিলেও খুব আনন্দিত হন না, দৈবের দ্বারা বিড়ম্বিত হইলেও একেবারে হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া হতাশ হইয়া পড়েন না; কর্ত্তব্যবোধেই তাঁহারা পৌরুষসেবায় আনন্দ পান। পক্ষান্তরে যাহারা নিতান্ত হীনবীর্য্য, তাহারাই অদৃষ্ট-সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। এই প্রকার উৎকট দৈববিশ্বাসীকে 'ক্লীব' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[৫০] পুরুষকার মানুষকে কাজে প্রেরণা দেয়, আর দৈবচিন্তন অলসতা আনয়ন করে। কাজ সোজা হউক, কিংবা কঠিন হউক, সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাহাতে লাগিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। যাহা অদৃষ্টে আছে তাহাই হইবে, এই বলিয়া বসিয়া থাকিলে লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হন। সুতরাং দৈব অপেক্ষা পৌরুষের মূল্য অনেক বেশী। অদৃষ্টকে দূরে রাখিয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক কাজে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সকল মহাপুরুষই উপদেশ দিয়াছেন। মহাভারতের উপদেশও সেইরূপ।[৫১]

দৈব ও পৌরুষের মিলনে কার্য্যসিদ্ধি—যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অতি প্রাচীন কালে মহর্ষি বশিষ্ঠ ভগবান্ পিতামহকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মহর্ষির উত্তরে পিতামহ বলিলেন, বীজ এবং ক্ষেত্র উভয়ের যোগ ব্যতীত যেরূপ কোন বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না, সেইরূপ দৈব ও পৌরুষ উভয়ের যোগ না হইলে কোন কর্ম্মই ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না। পুরুষকার ক্ষেত্রস্বরূপ এবং দৈব বীজস্বরূপ।

পৌরুষের প্রাধান্য—দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে পুরুষকারই প্রধান। অকৃতকর্ম্মা পুরুষ শুধু দৈবশক্তি দ্বারা কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি

---

৫০ হীনঃ পুরুষকারেণ শস্তং নৈবাশ্নুতে ততঃ। শা ১৩৯।৭৬
দৈবং পুরুষকারশ্চ স্থিতাবন্যোন্যসংশ্রয়াৎ।
উদারাণান্তু সৎকর্ম্ম দৈবং ক্লীবা উপাসতে॥ শা ১৩৯।৮২

৫১ কর্ম্ম চাত্মহিতং কার্য্যং তীক্ষ্ণং বা যদি বা মৃদু।
গ্রস্যতেঽকর্ম্মশীলস্তু সদানর্থৈরকিঞ্চনঃ॥ ইত্যাদি। শা ১৩৯।৮৩,৮৪

ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটাইতে পারেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকেও তপস্যা করিতে হয়। কর্ম্ম যদি কিছুই ফল প্রদান না করিত, তাহা হইলে সকল লোকই অদৃষ্টের উপর ভার দিয়া নিতান্ত অলসভাবে জীবন কাটাইত। কাজ না করিয়া যে শুধু 'অদৃষ্ট অদৃষ্ট' বলিয়া দৈবের দোহাই দেয়, তাহার জীবনই বৃথা। দৈব সবসময় পুরুষকারের অনুসরণ করে। অত্যন্ত নিশ্চেষ্ট নিষ্কর্ম্মা পুরুষ শুধু অদৃষ্টের জোরে সফলতা লাভ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও নাই। জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল অনুকূল হইলে ক্ষুদ্র কাজও মহৎ ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গও পবনের অনুকূলতায় বিস্তৃত হইয়া উঠে। তৈল না থাকিলে প্রদীপের ক্ষীণ দীপ্তি অত্যন্ত অল্পায়ু, সেইরূপ কর্ম্ম বিনা দৈবের শক্তিও অতিশয় ক্ষীণ। দৈবপ্রভাবে মহৎ বংশ, বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং নানাবিধ ভোগ্যসামগ্রীর মধ্যে জন্ম হইলেও পৌরুষ ব্যতীত কেহই তাহা ভোগ করিতে পারেন না, বরং অল্পদিন মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য এবং অনুকূলতা হইতে ভ্রংশ হইয়া নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখে বিড়ম্বিত জীবন যাপন করেন। অন্যত্র দেখা যায়, জন্ম হইতে অনুকূল অবস্থায় না পড়িয়াও অনেক কর্ম্মী কেবল আপন পৌরুষের সামর্থ্যে সকল প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। দৈবের কোন প্রভুত্ব নাই; পুরুষকারের সহায়রূপে তাহার একটা স্থান ও উপযোগিতা আছে, কিন্তু কর্ম্মই তাহার পথপ্রদর্শক গুরু। ছোট ছোট দৈবপ্রতিকূলতাকে শুধু ঐকান্তিক কর্ম্ম দ্বারাই নিরস্ত করা যায়, কিন্তু দৈব কখনও পৌরুষ ব্যতীত আপন শক্তি দেখাইতে পারে না। কৃষি প্রভৃতিতে অদৃষ্টের প্রতীক্ষা করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকা কাপুরুষের কাজ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেচনাদির দ্বারাও ফললাভ করা যাইতে পারে। অতএব পুরুষকারই একমাত্র অবলম্বনীয়, দৈবের উপর নির্ভর করা অত্যন্ত অন্যায়।[৫২]

দৈববাদে শোকদুঃখে সান্ত্বনা—কতকগুলি উক্তি হইতে বুঝা যায়, পুরুষকার অপেক্ষা দৈবের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, আবার কতকগুলিতে পুরুষকারকে দৈব অপেক্ষা অনেক উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়াছে। উভয়ের স্বীকৃতি সম্বন্ধে মহাভারতে কোন মতদ্বৈধ স্থান পায় নাই। যে-সকল অধ্যায়ে

৫২. অনু ৬ষ্ঠ অঃ।

দৈবকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, সেইসকল অধ্যায় প্রায়ই কোন-না-কোন শোকদুঃখের সান্ত্বনাচ্ছলে কথিত। দুঃখী ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিতে অদৃষ্টকে স্মরণ করা অপেক্ষা সহজ আর কোন পথ নাই। অজ্ঞানাচ্ছন্ন শোকদুঃখ-জর্জ্জরিত সংসারীকে যদি মনে করাইয়া দেওয়া হয় যে, 'তোমার এই দুঃখভোগ জন্মান্তরীয় দুষ্কৃতের ফল, ইহাতে তোমার কোন হাত নাই, ইহা অখণ্ডনীয়,' তখন তাহার মনে কিছুটা শান্তি আসে, সন্দেহ নাই। দৈব এবং পুরুষকার উভয়ই প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি হেতু, কিন্তু পৌরুষের ক্ষমতা বেশী।[৫৩] যথোচিত যত্ন ও শ্রমের সহিত কার্য্য করিলেও যদি ফল না পাওয়া যায়, তখন কাজেকাজেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে হয়। বলিতে হয়, প্রাক্তন কর্ম্মফল বদলাইবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডবগণকে এই কথাই বলিয়াছিলেন।[৫৪]

কার্য্যারম্ভে দৈবকে স্মরণ করিতে নাই—কাজ না করিলে ফল কখনও পাওয়া যায় না। অকৃতকার্য্য হইলেও বার বার যত্ন করিতে হয়। কিছুতেই যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তখন বুঝিতে হইবে, প্রতিকূল প্রবল অদৃষ্টশক্তিতে কাজের ফলটি প্রতিহত হইতেছে। সেই অদৃষ্টকে অনুকূল করা সাধ্যের অতীত, তজ্জন্য অনুশোচনা করিয়া কোন ফল হয় না। পুরুষকারে কখনও ত্রুটি করিতে নাই। কাজ করিবার সময় দৈবকে স্মরণ করা উচিত নহে। অদৃষ্টচিন্তা মনকে একেবারে পঙ্গু করিয়া রাখে। পৌরুষ হইতেই আনন্দ ও উৎসাহ পাওয়া যায়।[৫৫]

জন্মান্তরবাদ—দৈববাদ এবং জন্মান্তরবাদ পরস্পর সম্বদ্ধ। একটির স্বীকৃতিতে অপরটি আপনা-আপনি স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্ম ফল প্রদান না করিয়া বিরত হয় না, এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও মানিতে হইবে যে, যদি প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল সেই জন্মেই ভোগ না হইয়া থাকে, তবে সেই ফল ভোগের নিমিত্ত পুনরায় জন্মগ্রহণ অনিবার্য্য ; যেহেতু ভোগ ছাড়া কর্ম্মের ক্ষয় হইবে না। মহাভারতে অদৃষ্টবাদ এবং জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে

৫৩ দৈবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোককারণম্। উ ৭৯।৫

৫৪ দৈবন্তু ন ময়া শক্যং কর্ম্ম কর্ত্তুং কথঞ্চন। উ ৭৯।৬

৫৫ অনারম্ভাত্তু কার্য্যাণাং নার্থঃ সম্পদ্যতে কচিৎ।
কৃতে পুরুষকারে চ যেষাং কার্য্যং ন সিধ্যতি।
দৈবেনোপহতাস্তে তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ইত্যাদি। সৌ ২।৩৩,৩৪

কোন সন্দেহই উঠে নাই। অনেকটা স্বতঃসিদ্ধের মত এইসকল সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া হইয়াছে। অংশাবতরণাধ্যায়ে কুরুপাণ্ডবদের পূর্ব্বজন্মের সকল কথা বিবৃত হইয়াছে।[৫৬] অবিদ্যাজনিত ভোগস্পৃহার ফলে প্রাণী কর্ম্মানুরূপ বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। বাসনার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণের শেষ নাই। পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন শরীর গ্রহণ করিতেই হইবে।[৫৭] পূর্ব্বজন্ম স্বীকৃত হইলে একই যুক্তিবলে পরজন্মও স্বীকার করিতে হয়। এই মতে সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব স্বীকার ব্যতীত গতি নাই। কারণ, যদি আদিসৃষ্টি নামে কোন কিছু মানা হয়, তাহা হইলেই প্রশ্ন উঠিবে, সেই সৃষ্টিতে বৈষম্যের কি কারণ ছিল? তখন ত জন্মান্তরীয় অদৃষ্ট ছিল না, বিশেষতঃ ভগবান্ ত পক্ষপাতী নহেন। এই সমস্যার হাত হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত ভারতীয় আস্তিক দার্শনিকগণ সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অজগরপর্ব্বে জন্মান্তর সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করা হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে সর্পরূপী নহুষ বলিয়াছেন, কর্ম্মফলের দ্বারা মানুষের তিনপ্রকার গতি হইয়া থাকে—মনুষ্যত্ব, স্বর্গবাস এবং তির্য্যক্‌ত্বপ্রাপ্তি। উৎকৃষ্ট কর্ম্মের ফল স্বর্গভোগ, মধ্যম কর্ম্মের ফলে মানুষরূপে জন্ম এবং কুকর্ম্মের ফলে কীট-পতঙ্গাদির শরীরপরিগ্রহ। পশু প্রভৃতিও যজ্ঞাদিকর্ম্মে হত হইলে উচ্চতর যোনি প্রাপ্ত হয়, উত্থান ও পতন কর্ম্মফলের অধীন।[৫৮] প্রত্যেক প্রাণীর স্বকৃত কর্ম্ম তাহার আত্মাকে ছায়ার মত অনুবর্ত্তন করে। সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ দেহধারণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কর্ম্মফল কিংবা অদৃষ্টকে যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে জন্মান্তর স্বীকারেরও কোন যুক্তি নাই।[৫৯] বীজ দগ্ধ হইলে যেরূপ অঙ্কুর-উৎপত্তির ক্ষমতা থাকে না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাদি বিনষ্ট হইলে পুনরায় দেহপরিগ্রহের

---

৫৬ আদি ৬৭ তম অঃ।

৫৭ এবং পতন্তি সংসারে তাস্থ তাস্বিহ যোনিষু।
অবিদ্যাকর্ম্মতৃষ্ণাভির্ভ্রাম্যমাণোঽথ চক্রবৎ॥ ইত্যাদি। বন ২।৭১,৭২

৫৮ তিস্রো বৈ গতয়ো রাজন্ পরিদৃষ্টাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
মানুষ্যং স্বর্গবাসশ্চ তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ তত্রিধা॥ ইত্যাদি। বন ১৮১।৯-১৫

৫৯ তত্রাস্য স্বকৃতং কর্ম্ম ছায়েবানুগতং সদা।
ফলত্যথ সুখার্হো বা দুঃখার্হো বাথ জায়তে॥ ইত্যাদি। বন ১৮৩।৭৮-৮৬

কোন কারণ থাকে না। জীবের মৃত্যু নাই, জীব সনাতন। শরীরের সহিত বিশেষ একটা সম্বন্ধকে জন্ম এবং সেই সম্বন্ধের নাশকে মৃত্যু বলা হয়। শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ শেষ হইলেই জীব কর্ম্মানুরূপ অপর দেহ ধারণ করিয়া থাকে, তাহারই নাম পুনর্জ্জন্ম।[৬০]

শুভকৃৎ পুরুষ শুভযোনিতে এবং পাপকৃৎ পুরুষ পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। অবিমিশ্র শুভকর্ম্মের ফলে দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। অসৎ কর্ম্মের ফলে নরক ভোগ করিতে হয় এবং পুনঃ পুনঃ তির্য্যক্-যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পুনরায় শুভাদৃষ্টবশে পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমোন্নতি সম্ভবপর হয়। ক্রমিক উন্নতিতে পুনরায় দেবত্বপ্রাপ্তিও হইতে পারে। শুভ কর্ম্মের চরম ফল মুক্তি। কর্ম্মফলে আসক্তিরহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম কখনও বন্ধনের হেতু হয় না।[৬১]

প্রসিদ্ধ উপদেষ্টা ধর্ম্মব্যাধ আপনার পূর্ব্বজন্ম-বর্ণনায় বলিয়াছেন, "আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছিলাম। কোন এক মৃগয়াবিলাসী রাজা আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে ধনুর্ব্বিদ্যায় আমারও প্রবল অনুরাগ জন্মে। একদা এক ঋষি আমার শরে আহত হন, সেই পাপেই আমি ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রংশ হইলাম এবং এই জন্মে ব্যাধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।"[৬২] জন্ম ও মৃত্যু পর্য্যায়ক্রমে সকল প্রাণীর নিকটেই উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করা নিরর্থক।[৬৩] মৃত্যু ও জন্মান্তর বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক কথাও বলা হইয়াছে। গীতাতে আছে, মানুষ যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করেন।[৬৪] অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, জীর্ণই হউক কিংবা অজীর্ণই হউক,

৬০ বীজানি হ্যগ্নিদগ্ধানি ন রোহন্তি পুনর্যথা।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সংযুজ্যতে পুনঃ ॥ বন ১৯৯।১০৮
যথাশ্রুতিরিয়ং ব্রহ্মন্ জীবঃ কিল সনাতনঃ।
শরীরমধ্রুবং লোকে সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥ ইত্যাদি। বন ২০৮।২৩-২৮

৬১ শুভকৃচ্ছুভযোনিষু পাপকৃৎ পাপযোনিষু। ইত্যাদি। বন ২০৮।৩১-৪৩
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। ইত্যাদি। ভী ৩০।৪১-৪৩

৬২ শৃণু সর্ব্বমিদং বৃত্তং পূর্ব্বদেহে মমানঘ। ইত্যাদি। বন ২১৪।২১-৩১

৬৩ পুনর্নরো ম্রিয়তে জায়তে চ। ইত্যাদি। উ ৩৬।৪৬,৪৭
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। ইত্যাদি। ভী ২৬।২৭। স্ত্রী ৩।১৬

৬৪ বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়। ইত্যাদি। ভী ২৬।২২

মানুষ ইচ্ছা করিলেই তাহা ত্যাগ করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান করিতে পারে, নূতন দেহ ধারণ করাও সেইরূপ স্বকৃত কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ মুক্তির অনুকূল কাজ করিলে জন্মগ্রহণের প্রয়োজন হয় না। মুক্ত আত্মা জন্ম গ্রহণ করেন না।[৬৫] দেহকে গৃহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মানুষ যেমন এক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অপর গৃহে প্রবেশ করে, জীবও তদ্রূপ এক শরীর পরিত্যাগ করিয়া অপর শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। মৃত্যু আর কিছুই নহে, পুরাণ দেহের পরিত্যাগ-মাত্র। জীবের তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না।[৬৬] মানুষ প্রিয় কিংবা অপ্রিয় যাহাই লাভ করুক না কেন, জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল তাহার মূলে। প্রাজ্ঞ, মূঢ় কিংবা অতিশয় শৌর্য্যবীর্য্যশালী পুরুষও জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলের হাত হইতে নিস্তার পান না। জন্মে জন্মে একই অবিনশ্বর জীব পরিবর্ত্তনশীল দেহের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। যিনি পুনঃ পুনঃ সংসার-যাতায়াতের এই তত্ত্ব সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন এবং বিষয়বাসনা ত্যাগ করেন, তাঁহারই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।[৬৭]

কোনও এক শূদ্র তাপস মৃত্যুর পর রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এক ঋষি সেই তাপস শূদ্রের পৌরোহিত্যে বৃত থাকায় পরজন্মেও তাঁহার পৌরোহিত্যপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।[৬৮]

ইহজন্মের কর্ম্মের দ্বারা কিরূপে পরজন্ম অনুমিত হয় এবং কি-জাতীয় কর্ম্মের ফলে কিরূপ জন্ম লাভ হয়, তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ সংসার-চক্রকথনাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।[৬৯] মানুষ যে-অবস্থায় যে-শরীরে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে সেই অবস্থায় সেইরূপ শরীরে সেই-সেই কর্ম্মের

---

৬৫ যথা জীর্ণমজীর্ণং বা বস্ত্রং ত্যক্ত্বা তু পুরুষঃ।
অন্যদ্রোচয়তে বস্ত্রমেবং দেহাঃ শরীরণাম্॥ স্ত্রী ৩।৮

৬৬ যথা হি পুরুষঃ শালাং পুনঃ সম্প্রবিশেন্নবাং।
এবং জীবঃ শরীরাণি তানি তানি প্রপদ্যতে॥ ইত্যাদি। শা ১৫।৫৭,৫৮। শা ২৭৪।৩৩

৬৭ পূর্ব্বদেহকৃতং কর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভম্।
প্রাজ্ঞং মূঢ়ং তথা শূরং ভজতে যাদৃশং কৃতম্। ইত্যাদি। শা ১৭৪।৪৭-৪৯। শা ২৭৪।৩৬

৬৮ অথ দীর্ঘস্য কালস্য স তপ্যান্ শূদ্রতাপসঃ।
বনে পঞ্চত্বমগমৎ সুকৃতেন চ তেন বৈ॥ ইত্যাদি। অনু ১০।৩৪-৩৬

৬৯ অনু ১১১ তম অঃ।

ফল ভোগ করিয়া থাকে।[৭০] এই উক্তি খুব যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না; কারণ পরবর্ত্তী জীবনে সেইপ্রকার দেহপ্রাপ্তি সম্ভবপর না-ও হইতে পারে। অসৎ কর্ম্ম হইতে সতত নিবৃত্ত থাকিবার নিমিত্ত এই উপদেশের উপযোগিতা স্বীকার করা যাইতে পারে। অসৎ কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত কিরূপ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে একটি কীটের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কীট বলিতেছে, "আমি পূর্ব্বজন্মে নৃশংস সুদখোর কদর্য্যপ্রকৃতি লোক ছিলাম। পরস্বহরণ, ভৃত্য এবং অতিথিবর্গের অনাদর, দেবতা ও পিতৃলোকের প্রতি অশ্রদ্ধা, এইগুলি আমার চরিত্রে অতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এইসকল কারণে বর্ত্তমান জীবনে আমার অবস্থা এরূপ শোচনীয়"।[৭১]

স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট পুরুষ জন্মান্তরে ক্রমশঃ নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন, আর স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি উত্তরোত্তর উত্তমত্ব প্রাপ্ত হন। শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্তই যে পুনরায় জন্ম হয়, তাহা উমা-মহেশ্বরসংবাদে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।[৭২] অল্পপ্রজ্ঞ, জন্মান্ধ, ক্লীব প্রভৃতির জন্মের কারণও পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি বলা হয় যে, মাতাপিতার শরীরের বা মনের কোন বিকৃতির জন্যই ঐরূপ হইতে পারে, তাহাতে জন্মান্তর ও অদৃষ্টবাদীরা উত্তর দিবেন, তেমন মাতাপিতার বীজের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের কারণও নিশ্চয়ই জন্মান্তরীয় অসাধু অনুষ্ঠান। সংসারে কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না।[৭৩] অনুগীতাপর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমাদের জন্ম এবং মরণ পুনঃ পুনঃ চলিতেছে, বিভিন্ন জন্মে নানাপ্রকার আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছি, অনেক জননীর স্তন্যের স্বাদ পাইয়াছি, বিচিত্র সুখ-দুঃখের অনুভব করিতে হইয়াছে। প্রিয় এবং অপ্রিয় বহু ঘটনা প্রত্যেক জীবনে সহ্য করিতে হইয়াছে।[৭৪]

---

৭০ যেন যেন শরীরেণ যদ্ যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমুপাশ্নুতে। অনু ১১৬।৩৭

৭১ অহমাসং মনুষ্যো বৈ শূদ্রো বহুধনঃ প্রভো।
অব্রহ্মণ্যো নৃশংসশ্চ কদর্য্যো বৃদ্ধিজীবনঃ। ইত্যাদি। অনু ১১৭।১৯-২৩

৭২ অনু ১৪৩ তম অঃ।

৭৩ অনু ১৪৫ তম অঃ।

৭৪ পুনঃ পুনশ্চ মরণং জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ। ইত্যাদি। অশ্ব ১৬।৩২-৩৭

কাল-তত্ত্ব—বিশ্বরূপদর্শনাধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন "আমিই লোক-ক্ষয়কারী মহাকাল"।[৭৫] এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারি, কাল ভগবৎস্বরূপ, পৃথক্‌ভাবে কালের নির্ণয় করা অসম্ভব। কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শনে নানাপ্রকার বিচারপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বজনসিদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। এই বিষয়ে মতভেদ প্রচুর। প্রাচীন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকাচার্য্যগণ কালকে অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও তার্কিকাচার্য্য রঘুনাথ শিরোমণি দিক্ ও কাল ঈশ্বরের অন্তর্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মীমাংসক আচার্য্যগণও কালকে দ্রব্যরূপে স্বীকার করেন। কাল সম্বন্ধে বিচারের অন্ত নাই। মহাভারতে উল্লিখিত একটিমাত্র উক্তি ব্যতীত আর কোথাও কালের স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নাই, কিন্তু তাহার সর্ব্বাতিশায়িনী শক্তির বর্ণনা বহু জায়গায় করা হইয়াছে। কালের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লীন হইয়া আছে, কালেই উদ্ভব, কালেই ক্ষয়, কালের বিশ্রাম নাই। তাহার গতি অপ্রতিহত। সকল বস্তুরই জরা আছে, কিন্তু কাল নিত্য-নূতন। তাহার মধ্যে থাকিয়া তাহারই ইঙ্গিতে সকল বস্তু উঠিতেছে এবং পড়িতেছে, তাহার কোন বিকৃতি নাই। কালের নিকট প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই, কালকে অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই, কাল নিরন্তর সকলকে আকর্ষণ করিতেছে। তৃণসমূহ যেরূপ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে, নিখিল জগৎ সেইরূপ কালের বশে পরিচালিত হয়।[৭৬] সুগম্ভীর কাল আপন তেজে সকল বস্তুকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অনন্ত কালের গর্ভে প্রাণিগণ ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে লীলা করিতেছে। কালই স্রষ্টা, কালই সংহারক। কালের শক্তি অপ্রমেয়, কাল আদিঅন্ত-হীন। অগ্নি, প্রজাপতি, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, ক্ষণ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ইত্যাদি সংজ্ঞায় একই অখণ্ডস্বরূপ মহাকালকে আপন-আপন সুবিধার নিমিত্ত খণ্ডরূপে অভিহিত করা হয়।[৭৭]

---

৭৫ কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ। ভী ৩৫।৩২

৭৬ কালঃ কর্ষতি ভূতানি সর্ব্বাণি বিবিধান্যুত।
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম। ইত্যাদি। স্ত্রী ২।১৪, ১৫

৭৭ সর্ব্বং কালঃ সমাদত্তে গম্ভীরঃ স্বেন তেজসা। ইত্যাদি। শা ২২৪।১৯, ২০
কালঃ সর্ব্বং সমাদত্তে কালঃ সর্ব্বং প্রযচ্ছতি।
কালেন বিহিতং সর্ব্বং মা কৃথাঃ শক্র পৌরুষম্। ইত্যাদি। শা ২২৪।২৫-৩০

কালের দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার শক্তি অন্য কাহারও নাই। যুগে যুগে কত প্রাণী এবং অপ্রাণী কালে উদ্বুদ্ধ হইয়া কালেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। মানুষের সুখ এবং দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে কালেরই অধীন। কাল অপেক্ষা শক্তিশালী আর কেহ নাই। যিনি কালের সর্ব্বাতিশায়িনী শক্তির মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত আছেন, তিনি কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না।[৭৮] বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি প্রভৃতি সকলই কালের অধীন। অর্জ্জুনের মত বীরপুরুষও দস্যুহস্ত হইতে যাদবমহিলাগণকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। শস্ত্রবিস্মৃতিতে তাঁহার সমস্ত তেজস্বিতা মূঢ়তায় পরিণত হইয়াছিল। অর্জ্জুনের বিলাপশ্রবণে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "হে অর্জ্জুন, জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলই কালমূলক। কাল যদৃচ্ছাক্রমে সংহারলীলার অভিনয় করিয়া থাকে। আজ যিনি প্রচণ্ড শক্তিশালী বলিয়া খ্যাত, কালক্রমে তিনি অত্যন্ত দীন এবং অবজ্ঞার পাত্রও হইতে পারেন। কালের সামর্থ্য অবর্ণনীয়"।[৭৯] দিনরাত্রিভেদে প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং ঋতুভেদে স্বভাবের নিত্যনূতন খেলা সকলেরই প্রত্যক্ষের বিষয়। সেইরূপ এক-একটি কল্পিত সাঙ্কেতিক স্থূল কালের অবসানে সমস্ত জগতের বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দেয়, তাহার নাম যুগসন্ধি। যুগসন্ধির পরেই পরবর্ত্তী যুগের আরম্ভ। প্রত্যেক যুগের আপন-আপন প্রাকৃতিক অবস্থা স্বতন্ত্র। পুরাণাদিতে যুগবর্ণন-প্রসঙ্গে প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়-সমাস্যাপর্ব্বে অনেক বর্ণনাই দেখিতে পাই। যুগে যুগে মানুষের বুদ্ধি, প্রকৃতি, হাব-ভাব ইত্যাদির পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। অবিনশ্বর কাল এক-একটা সূক্ষ্ম এবং এক-একটা স্থূল বিভাগে স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তগুলি বিচিত্র। কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। কালের এই অসাধারণ শক্তি উপলব্ধি করিয়াই ঋষিগণ তাহাকে 'সর্ব্বক্ষয়কৃৎ' 'অনাদিনিধন' 'স্বতন্ত্র' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।[৮০]

স্বর্গ, নরক ও পরলোক—স্বর্গ, নরক এবং পরলোক সম্বন্ধে পুরাণাদিতে

৭৮ শা ২২৭ তম অঃ।

৭৯ কালমূলমিদং সর্ব্বং জগদ্বীজং ধনঞ্জয়।
কাল এব সমাদত্তে পুনরেব যদৃচ্ছয়া। ইত্যাদি। মৌ ৮।৩৩-৩৬

৮০ বন ১৯০ তম অঃ। শা ২৩৭।১৪-২১

বহু চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সেইসকল চিত্র হইতে এরূপ ধারণা হয় যে, স্বর্গ শুধু সুখসম্ভোগ করিবার মত একটি স্থান, আর নরক কুকর্ম্মা পাপিগণকে অসহ্য শাস্তি দিবার মত নানাবিধ উপকরণে ভারাক্রান্ত পূতিগন্ধময় একটি বীভৎস স্থান। পরলোকের কথা মনে হইলেও এইপ্রকারই একটি সুখদুঃখ-জড়িত ছবি যেন মনে পড়ে। পৌরাণিক কতকগুলি চিত্রকে ছাড়াইয়া আমাদের কল্পনা যেন আর অগ্রসর হইতে চায় না। মহাভারতে বলা হইয়াছে, স্বর্গ হইতেছে—নিত্যসুখ, অর্থাৎ যে অবিমিশ্র সুখের সঙ্গে দুঃখের মাখামাখি নাই, সেই সুখেরই নামান্তর স্বর্গ। অতিশয় পুণ্যের জোরে মানুষ স্বর্গ ভোগ করিতে পারে। স্বর্গ নিত্যসুখ বলিয়া যে স্থানে মানুষ বিশুদ্ধ সুখকে উপভোগ করিতে পারে, তাহাই স্বর্গনামে খ্যাত। মর্ত্ত্যলোকের সুখ দুঃখমিশ্রিত, ক্রমান্বয়ে এই সুখ-দুঃখের ভোগ করিতেই হইবে। কাহারও ভাগ্যে কেবল সুখ কিংবা কেবল দুঃখ ভোগ করিবার বিধান নাই। কেবলমাত্র দুঃখের নাম নরক। যে লোকে পাপাত্মা মানব শুধু দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে, তাহারও নাম নরক। স্বর্গ প্রকাশময়, আর নরক তমোময়। প্রকাশ ও তমঃ উভয়ের মিশ্রিত অবস্থাকে বলা হয় 'সত্যানৃত'। ইহলোকে সকলেই সত্যানৃত ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সৎকার্য্যতৎপর, তাঁহারা অবিমিশ্র সত্য বা প্রকাশের সন্ধান পান এবং তাহাই তাঁহাদের স্বর্গভোগ। কুকার্য্যরত ব্যক্তিগণ যে অবিমিশ্র দুঃখ ভোগ করেন, তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে 'নরক'। সত্যই ধর্ম্ম, ধর্ম্মই প্রকাশরূপ এবং প্রকাশই সুখ। প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির দিকে। অনুকূল চেষ্টা ব্যতীত বাসনার পূরণ হয় না, সেইনিমিত্ত সুখপ্রাপ্তির অনুকূল কাজ করা চাই। সেই কার্য্যপদ্ধতি শ্রুতি ও স্মৃতিতে নানাভাবে পরিস্ফুট আছে। রাহুগ্রস্ত শশধরের নিষ্প্রভতা যেমন কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না, সেইরূপ তমোভিভূত পুরুষের সুখ-শান্তির তিরোভাবও আপনার এবং অপরের কাছে পরিস্ফুট হইয়া থাকে।[৮১]

---

৮১ নিত্যমেব সুখং স্বর্গঃ সুখং দুঃখমিহোভয়ম্।
নরকে দুঃখমেবাহুঃ সুখং তৎ পরমং পদম্॥ শা ১৯০।১৪
স্বর্গঃ প্রকাশ ইত্যাহুর্নরকং তম এব চ।
সত্যানৃতং তদুভয়ং প্রাপ্যতে জগতীচরৈঃ॥ ইত্যাদি। শা ১৯০।৩;৮
তমোঽপ্রকাশো ভূতানাং নরকোঽয়ং প্রদৃশ্যতে। উ ৪২।১৪

সুখ দুইপ্রকার, শারীর ও মানস। যদিও সুখ মনের দ্বারাই অনুভূত হয়, তথাপি শরীরের স্বাস্থ্যে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় যে সুখের উদ্ভব, তাহাকে 'শারীর'-নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[৮২] সুকৃত সুখের এবং দুষ্কৃত দুঃখের হেতু।[৮৩]

স্বর্গলোকের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, স্বর্লোক মর্ত্ত্যলোকের উপরে অবস্থিত। যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারাই দেবযানমার্গে সেখানে প্রবেশ করিতে পারেন। সেখানকার সকলেরই দিব্যদেহ এবং দিব্যভাব। ক্ষুধাতৃষ্ণার কোন তাড়না সেখানে নাই। স্বর্লোকবাসিগণ সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখদুঃখের ঊর্দ্ধে থাকিয়া অপার্থিব পরম সুখে নিমগ্ন থাকেন। স্বর্লোকে অশুভ বা বীভৎস কোন কিছু নাই। সেখানকার গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি সকলই মনোজ্ঞ। শোক, জরা, আয়াস, পরিদেবনা, অতৃপ্তি প্রভৃতি কিছুই সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানকার সকলেরই শরীর তেজোদীপ্ত।[৮৪] কিন্তু এত সুখের স্থানও মুক্তিকামীর পক্ষে সুখের নহে, তিনি আরও ঊর্দ্ধে পরম-পুরুষে মিলিত হইতে চান। স্বর্গই যে সকলের অভিলষিত, তাহা বলা যায় না। কারণ স্বর্গ হইতে ভ্রংশের আশঙ্কা আছে। ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। এইজন্যই স্বর্গের সুখও নিষ্কাম পুরুষের নিকট অকিঞ্চিৎকর। পরিণাম বিবেচনা করিলে তাহার প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ হয় না।[৮৫] একমাত্র মুক্তিই যে-জীবের লক্ষ্য, তাঁহার পক্ষে স্বর্গ সোণার শিকল ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বর্গ এবং নরকের মধ্যে তিনি বেশী পার্থক্য দেখিতে পান না। স্বর্গ কোন বিশেষ স্থান কি না, এই বিষয়ে স্থির কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। উল্লিখিত দুইপ্রকারের বর্ণনাই দেখিতে পাই। অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকগমনের বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে, হিমালয়-পর্ব্বতের ঊর্দ্ধে দিব্য এক পুরী আছে, তাহাই স্বর্গপুরী। সেই পুরী সিদ্ধচারণসেবিত,

---

৮২ তৎ খলু দ্বিবিধং সুখমুচ্যতে, শারীরং মানসঞ্চ। শা ১৯০।৯

৮৩ সুকৃতাৎ সুখমবাপ্যতে দুষ্কৃতাদ্দুঃখমিতি। শা ১৯০।১০

৮৪ উপরিষ্টাচ্চ স্বর্লোকো যোঽয়ং স্বরিতি সংজ্ঞিতঃ। ইত্যাদি। বন ২৬০।২-১৫

৮৫ পতনান্তে মহদ্দুঃখং পরিতাপং সুদারুণম্। বন ২৬০।৩৯
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। ইত্যাদি। ভী ৩৩।২১। আদি ৯০।২
সুখং হ্যনিত্যং ভূতানামিহ লোকে পরত্র চ। শা ১৯০।৭

সকল ঋতুর কুসুমে উজ্জ্বল, পুণ্যপাদপশোভিত ইত্যাদি। অপুণ্যবান্ পুরুষের গতি সেখানে সম্ভবপর হয় না। ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী প্রমুখ অপ্সরাগণ সেখানকার নর্ত্তকী। সেখানে চিত্তপ্রসাদনের আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই।[৮৬] মানুষের মন যাহাতে পুণ্যকর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই উদ্দেশ্যেই বোধ করি, স্বর্গের এইসকল বিচিত্র ছবি আঁকা হইয়াছে।

স্বর্গ যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখেরই নামান্তর হয়, তবে স্থানবিশেষের নাম স্বর্গ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে স্থানবিশেষকে স্বর্গনামে অভিহিত করিলে অবিমিশ্র সুখকে কিরূপে স্বর্গ বলা যায়? স্বর্গারোহণপর্ব্বে পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে, স্বর্গ শুধু স্থানবিশেষ। সেখানকার ত্রৈলোক্যপাবনী দেবনদীর বর্ণনা এবং অপরাপর ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক বর্ণনা হইতে উৎকৃষ্ট একটি পুরীর কল্পনা করা যায়। স্বর্গের নিকটেই অপর একটি স্থান আছে, সেই স্থানটি তমঃসংবৃত, ঘোর, পূতিগন্ধময়। তাহারই নাম নরক। এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, স্বর্গ ও নরক খুব পাশাপাশি স্থান। যুধিষ্ঠির স্বর্গের পথেই নরক দর্শন করিয়াছিলেন।[৮৭] অন্যত্র এই মর্ত্ত্যলোককেই 'ভৌম-নরক' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক তাপত্রয়যুক্ত পৃথিবীকে নরকের সহিত তুলনা করিতে গিয়া এই অত্যুক্তি করা হইয়াছে। নরক দুঃখময়, মোক্ষার্থীর দৃষ্টিতে সংসারও দুঃখময়; তাই বোধ করি, সংসারই 'ভৌম-নরক'।[৮৮]

শুভ কাজের ফলে স্বর্গলাভ এবং অশুভ কাজের ফলে নরকে গমন, এই কথা বহু স্থানে বলা হইয়াছে।[৮৯] হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর দিক্‌কে পরলোক-নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[৯০] এই কল্পনার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে কি না, বিবেচ্য। কিন্তু বর্ণনা দেখিলে বুঝা যায়, স্থানটি পবিত্র, মঙ্গলময় ও মনোজ্ঞ। সেই স্থানের প্রতি স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ

৮৬ বন ৪৩শ অঃ।

৮৭ স্বর্গা ২য় ও ৩য় অঃ।

৮৮ ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি। আদি ৯০।৪

৮৯ বন ১৮১।২। অনু ১৩০।৩৯। অনু ১৪৪।৫-১৭, ৫২

৯০ উত্তরে হিমবৎপার্শ্বে পুণ্যে সর্ব্বগুণান্বিতে।
পুণ্যঃ ক্ষেম্যশ্চ কাম্যশ্চ স পরো লোক উচ্যতে॥ ইত্যাদি। শা ১৯২।৮-১০

থাকা অসম্ভব নহে। পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়েও অনেক কিছুই বলা হইয়াছে।[২১]

নাস্তিকের লক্ষণ—পারলৌকিক কার্য্যে যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারাই নাস্তিক।[২২]

আন্বীক্ষিকী

আন্বীক্ষিকীর উপাদেয়তা—আন্বীক্ষিকী কিংবা তর্কবিদ্যার নাম বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিচারে আন্বীক্ষিকী-বিদ্যার উপযোগিতা এবং প্রশস্ততা বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। শাস্ত্রানুমোদিত বাদ-বিচারকে মহাভারতে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, "বিচারের মধ্যে আমি বাদস্বরূপ"।[১] বাদ-বিচারের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হইয়া থাকে, তাই বাদের প্রশস্ততা।

জনকযাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে, বেদান্তবিৎ গন্ধর্ব্ব-বিশ্বাবসু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদ বিষয়ে চব্বিশটি এবং আন্বীক্ষিকী বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেন। যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষণকাল দেবী সরস্বতীর ধ্যান করিয়া শ্রুতিদর্শিত পরা-আন্বীক্ষিকীর সাহায্যে উপনিষৎ এবং তাহার পরিশেষ তর্ককে মনের দ্বারা সবিশেষ আলোচনা করিয়া উত্তর প্রদান করেন।[২] মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি-জনককে বলিয়াছেন, "হে রাজশার্দ্দূল, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি হইতে এই আন্বীক্ষিকী-বিদ্যা মোক্ষ বিষয়ে সমধিক উপযোগী। আমি এই বিদ্যা তোমাকে বলিয়াছি"।[৩]

বিশ্বাবসুর পঞ্চবিংশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও

---

২১ উ ৩৫।৬৮। শা ২৮।৪২। অনু ৭৩ তম ও ১০২ তম অঃ।

২২ পারলৌকিককার্য্যেষু প্রসুপ্তা ভৃশনাস্তিকাঃ। শা ৩২১।১০

১ বাদঃ প্রবদতামহম্। ভী ৩৪।৩২

২ বিশ্বাবসুস্ততো রাজন্ বেদান্তজ্ঞান-কোবিদঃ।
চতুর্বিংশাংস্ততোঽপৃচ্ছৎ প্রশ্নান্ বেদস্য পার্থিবঃ॥ ইত্যাদি। শা ৩২৮।২৭-৩১
তত্ত্রোপনিষদঞ্চৈব পরিশেষঞ্চ পার্থিব।
মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাম্॥ শা ৩১৮।৩৪

৩ চতুর্থী রাজশার্দ্দূল বিদ্যৈষা সাম্পরায়িকী।
উদীরিতা ময়া তুভ্যং পঞ্চবিংশাদধিষ্ঠিতা॥ শা ৩১৮।৩৫

গোতমমত-সিদ্ধ। ঐশ্বর্য্যকে মুক্তি বলা যায় না, কারণ তাহাও দুঃখস্বরূপ।[৪] যুক্তিতর্কের সহিত বেদবিদ্যার শ্রবণ ও মননের দ্বারা বিশেষরূপে ধারণা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।[৫] বেদবিদ্যার দ্বারা পরম পুরুষের শ্রবণ এবং আন্বীক্ষিকীর দ্বারা মনন করিতে হয়, ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যবচনের তাৎপর্য্য। সমগ্র বেদশাস্ত্র পড়িয়াও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্যক্‌রূপে না বুঝিলে সেই পাঠক নিতান্ত করুণার পাত্র। ন্যায় অর্থাৎ যুক্তিশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল বেদবাদের শ্রবণে মুক্তি লাভ হয় না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, মোক্ষ-নামক বস্তুর অস্তিত্ব আছে। বেদার্থের শ্রবণ এবং তর্কসাহায্যে মননের উপযোগিতা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে।[৬]

তর্কবিদ্যা বা যুক্তিশাস্ত্রের জ্ঞান রাজাদের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। এই কারণে যুক্তিশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যরক্ষায় সুবিচারের প্রয়োজন। যুক্তিশাস্ত্রের জ্ঞান না থাকিলে বিচার-পদ্ধতির সহিত ভালরূপে পরিচিত হওয়া যায় না। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম প্রমুখ ঋষিগণও যুক্তিশাস্ত্রের উপাদেয়তার কথা বলিয়াছেন। তর্ক দ্বারা বিচার না করিলে ধর্ম্মের নির্ণয় হয় না।[৭] মনীষিগণ নানাবিধ ন্যায়তন্ত্রের উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে যে-সকল মতবাদ হেতু ও আগমের অর্থাৎ স্মৃতি ও শ্রুতির বিরুদ্ধ নহে, সেইগুলিরই আলোচনা করিতে হয়। টীকাকার নীলকণ্ঠ তর্ক, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জলকে ন্যায়তন্ত্র-নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়তন্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্র বলিলে সাধারণতঃ গোতমোক্ত আন্বীক্ষিকী-বিদ্যাকেই বুঝাইয়া থাকে, এইহেতু আন্বীক্ষিকী, ন্যায় প্রভৃতি শব্দ যোগরূঢ়।[৮]

অসাধু তর্কের নিন্দা—কতকগুলি বচনে তর্কবিদ্যার নিন্দা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেইসকল নিন্দা আর্ষশাস্ত্রবিরোধী অসাধু তর্কবিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া।

৪ অক্ষয়ত্বাৎ প্রজননে অজমত্রাহুরব্যয়ম্॥ শা ৩১৮।৪৬

৫ বিদ্যোপেতং ধনং কৃত্বা কর্ম্মণা নিত্যকর্ম্মণি।
একান্তদর্শনা বেদাঃ সর্ব্বে বিশ্বাবসো স্মৃতাঃ॥ শা ৩১৮।৪৮

৬ বেদবাদং ব্যপাশ্রিত্য মোক্ষাঽস্তীতি প্রভাষিতুম্।
অপেতন্যায়শাস্ত্রেণ সর্ব্বলোকবিগর্হিণা॥ শা ২৬৮।৬৪

৭ যুক্তিশাস্ত্রঞ্চ তে জ্ঞেয়ম্। ইত্যাদি। অনু ১০৪।১০৮। অনু ১২।১-৫

৮ ন্যায়তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ।
হেত্বাগমসমাচারৈর্যদুক্তং তদুপাস্যতাম্॥ শা ২১০।২২। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

নাস্তিক-তর্কবিদ্যা অতিশয় নিন্দিত। মনু প্রমুখ শাস্ত্রকারগণও বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রের নিন্দাই করিয়াছেন। ইন্দ্রকাশ্যপসংবাদে যে-আন্বীক্ষিকীকে 'নিরর্থিকা' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, যে তর্কবিদ্যাজনিত মদান্ধতায় পরুষবাক্ বেদপ্রামাণ্য-সংশয়ী হৈতুক পণ্ডিতককে পরজন্মে শৃগালরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই আর্ষশাস্ত্রানুগ তর্কবিদ্যা নহে, সেই বেদবিরুদ্ধ তর্কবিদ্যা আর্ষ-শাস্ত্রের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়।[৯]

পাত্রপরীক্ষাপ্রকরণেও উক্ত হইয়াছে যে, "বেদের অপ্রামাণ্যজ্ঞান, আর্ষ-শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘন এবং সর্ব্বত্র সংশয় ও অব্যবস্থা, নাশের কারণ। যে পণ্ডিতম্মন্য গর্ব্বিত ব্যক্তি নিরর্থক আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যাতে অনুরক্ত হইয়া বেদের নিন্দা করিয়া বেড়ান, যিনি পণ্ডিতপরিষদে অসাধু হেতুর সাহায্যে শাস্ত্রবিরোধী সিদ্ধান্ত স্থাপনে প্রয়াসী, যিনি নিতান্ত উদ্ধত ও পরুষবক্তা, সেই সর্ব্বাভিশঙ্কী মূঢ়কে কুকুরের ন্যায় জ্ঞান করিবে। কুকুর যেরূপ নিঃশঙ্ক পথিককে আক্রমণ করিয়া আপন পৌরুষ প্রদর্শন করে, সেইরূপ গর্ব্বিত হৈতুকও বৃথাভাষণ এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্তের ভৎসনাকেই পাণ্ডিত্য ও পৌরুষ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।[১০]

প্রাচীন কালে আচার্য্যগণ অধিকারি-বিবেচনা না করিয়া কোন উপদেশই দিতেন না। শ্রদ্ধালু, গুরুভক্ত, অমৎসর শিষ্যগণই শাস্ত্রতত্ত্ব উপদেশের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন। শাস্ত্রশ্রবণে অনধিকারীদের তালিকায় হেতুদুষ্টেরও নাম দেখিতে পাই।[১১] যাঁহারা অসাধু হেতুর সাহায্যে সকল বিষয়েই বিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই 'হেতুদুষ্ট'। অন্যত্র আচার্য্যগণকে সাবধান করা হইয়াছে যে, তর্কদগ্ধ এবং খলপ্রকৃতি জিজ্ঞাসুকে কোন উপদেশ দিতে নাই। বেদবিরোধী অসাধু তর্কবাদের আলোচনায় যাঁহাদের বুদ্ধি দগ্ধ, অর্থাৎ সাধু বিষয়ের ধারণায় বিমুখ, তাঁহাদিগকেই তর্কদগ্ধ বলা হইয়াছে।[১২] শ্রুতি এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণের মধ্যে

---

৯ অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্॥ ইত্যাদি। শা ১৮০।৪৭-৪৯

১০ অপ্রামাণ্যঞ্চ বেদানাং শাস্ত্রাণাং চাভিলঙ্ঘনম্।
অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র এতন্নাশনমাত্মনঃ॥ ইত্যাদি। অনু ৩৭।১১-১৫

১১ ন হেতুদুষ্টায় গুরুদ্বিষে বা। অনু ১৩৪।১৭

১২ ন তর্কশাস্ত্রদগ্ধায় তথৈব পিশুনায় চ। শা ২৪৫।১৮

কোনটি বলবান্—এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব প্রথমেই বলিয়াছেন, "প্রাজ্ঞমানী হৈতুকগণ বাক্য-মনের অগোচর কোন অবাধিত সত্যকে স্বীকার করিতে চান না"।[১৩] গোতমোপদিষ্ট ন্যায়শাস্ত্রে শ্রুতিপ্রমাণের প্রবলতা সর্ব্বত্র স্বীকার করা হইয়াছে। যেখানে অন্য-প্রকারে মীমাংসা করা সম্ভবপর হয় নাই, সেখানেই শ্রুতির উপর ভার দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রুত্যনুগ মীমাংসার দিকেই সাধারণতঃ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, এই হৈতুকগণ কেবল প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্যবাদী চার্ব্বাকমতাবলম্বী। অসাধু হেতুবাদকে শুষ্কতর্ক-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শুষ্কতর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণের নিমিত্তও উপদেশ দেখিতে পাই।[১৪]

এইসকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, শ্রুতি এবং স্মৃতির সিদ্ধান্তের অনুকূলে যে-সকল তর্ক প্রযুক্ত হয়, সেইগুলি শুষ্ক-তর্ক নহে। আর্ষশাস্ত্রবিরোধী তর্কই শুষ্ক-তর্ক বা নাস্তিক-হেতুবাদ নামে প্রসিদ্ধ। রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্রের উক্তিতে দেখিতে পাই, মুখ্য ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অনর্থকুশল পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ আন্বীক্ষিকী-জ্ঞানের বলে অনর্থক বিবাদ করিয়া থাকেন।[১৫] এইস্থলে আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ 'নাস্তিক-লোকায়তবিদ্যা'। কারণ, প্রকৃত ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা করা বাল্মীকির উদ্দেশ্য হইলে উত্তরকাণ্ডে হৈতুক পণ্ডিতগণকে তিনি বিশিষ্ট সভাসদের মধ্যে নিশ্চয়ই গণ্য করিতেন না।[১৬] আলোচনায় পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, গোতমের প্রচারিত ন্যায়-দর্শনের নিন্দা করা মহাভারতের উদ্দেশ্য নহে। শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধী অসাধু তর্ককেই নিন্দা করা হইয়াছে।

টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, যে-পণ্ডিতসম্প্রদায় অনারব্ধদ্রব্যত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বারা আকাশাদির নিত্যত্ব সাধন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিতক', অর্থাৎ নিন্দিত পণ্ডিত। একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন সমস্ত বস্তুই অনিত্য, ইহাই বৈদিক

---

১৩ প্রত্যক্ষং কারণং দৃষ্ট্বা হৈতুকাঃ প্রাজ্ঞমানিনঃ।
নাস্তীত্যেবং ব্যবস্যন্তি সত্যং সংশয়মেব চ ॥ অনু ১৬২।৫

১৪ শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিং স্মৃতিম্। বন ১৯৯।১১৪

১৫ ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্ব্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে ॥ অযোধ্যাকাণ্ড ১০০।৩৯

১৬ হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্। উত্তরকাণ্ড ১০৭।৮

সিদ্ধান্ত। আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি দ্রব্যের নিত্যত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহারা ত বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী, সুতরাং তাঁহারাই ত বেদনিন্দক। অতঃপর তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, কণভক্ষ এবং অক্ষচরণাদির প্রণীত বৈশেষিক এবং ন্যায়াদি শাস্ত্রই অনুমানপ্রধান তর্কবিদ্যা। সেই বিদ্যা শ্রুতিমাত্রগম্য বস্তুতত্ত্ব নির্ণয়ের অনুপযোগিনী বলিয়া তাহাকে নিরর্থিকা বলা হইয়াছে। স্বর্গ এবং অদৃষ্টাদি বিষয়ে যাঁহাদের আশঙ্কা আছে, তাঁহারা সর্ব্বশঙ্কী। সর্ব্বশঙ্কী নাস্তিকের একই পঙ্‌ক্তিতে নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকাচার্য্যদের স্থান। নীলকণ্ঠের লিপিভঙ্গীতে বুঝা যায়, বৈদিক সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে অনুমানাদির সাহায্যে মনন করা হয়, সেই মননাংশেই ন্যায় ও বৈশেষিক-শাস্ত্রের উপযোগিতা। যে-সকল বেদবিরোধী সিদ্ধান্ত যুক্তিশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে, সেইসকল সিদ্ধান্ত নাস্তিকদর্শনেরই সমান। বৈদিক শাস্ত্রপঙ্‌ক্তিতে তাহাদের স্থান নাই। ন্যায়শাস্ত্রে বস্তু-স্বীকৃতির লাঘব-গৌরব বিচার করিয়া লাঘববশতঃ বহু পদার্থের নিত্যত্ববাদ এবং অপরাপর অনেক শ্রুতিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তও স্থান পাইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, যুক্তিশাস্ত্রের সকল অংশই আস্তিকদর্শন নহে। দর্শনের প্রকৃতিগত যুক্তিস্বাতন্ত্র্য বা বিচারশৈলীর বৈশিষ্ট্য রক্ষার নিমিত্ত যে-সকল অবান্তর তর্ক তন্মধ্যে স্থান পাইয়াছে, সেইগুলি যদি শ্রুতির অনুসরণ না করে, তবে তাহা 'নিরর্থিকা আন্বীক্ষিকীর' অন্তর্ভুক্ত। টীকাকারের ইহাই বোধ করি, অভিপ্রায়। এরূপ সামঞ্জস্য ব্যতীত একই শাস্ত্রের নিন্দা এবং প্রশংসার কোন অর্থ হয় না।[১৭]

যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়-উপদেশ—কোন কোন স্থানে পদার্থবিচারে ন্যায় ও বৈশেষিকের পদ্ধতি গৃহীত হইলেও 'ইহা ন্যায়সিদ্ধান্ত', 'ইহা বৈশেষিকসিদ্ধান্ত' —এরূপ উক্তি কোথাও নাই। বেদান্তবিৎ বিশ্বাবসুর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য যুক্তি ও শ্রুতির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর যুক্তিপ্রধান বলিয়া তাহাকে আন্বীক্ষিকী-সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শ্রুতির সাহায্যেই মহর্ষি উপদেশ দিয়াছেন।[১৮]

স্থলবিশেষে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা—তর্কের গতি সীমাবদ্ধ। জগতে এরূপ

১৭ হৈতুকোঽনারব্ধদ্রব্যত্বাদিত্যাদিভির্হেতুভিরাকাশাদেরপি নিত্যত্বসাধনপরঃ। নীলকণ্ঠ, শা ১৮০।৪৭

১৮ পঞ্চবিংশতিমং প্রশ্নং পপ্রচ্ছান্বীক্ষিকীং তদা। ইত্যাদি। শা ৩১৮।২৮-৩৫

অনেক বিষয় আছে, যাহাদের সম্বন্ধে কোন তর্ক চলে না। মনের অগোচর অচিন্ত্য তত্ত্ব বিষয়ে একমাত্র শ্রুতিই পথপ্রদর্শক।[১৯]

শাস্ত্রের স্রষ্টা স্বয়ং ভগবান্—মহর্ষি গোতম ন্যায়শাস্ত্রের প্রণেতা নহেন, তিনি প্রচারকমাত্র। সকল আস্তিক শাস্ত্রেরই রচয়িতা স্বয়ং ভগবান্। উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণের প্রার্থনায় স্বয়ম্ভূ একলক্ষ অধ্যায় প্রকাশ করেন। তাহাতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রচার হয়। ভগবানের উক্তিতেই কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, বার্ত্তারূপ জীবিকাকাণ্ড এবং দণ্ডনীতিরূপ পালনকাণ্ড বিবৃত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। আন্বীক্ষিকী জ্ঞানকাণ্ডস্বরূপ।[২০]

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই প্রমাণচতুষ্টয়ের দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়।[২১] যেখানে প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তুর জ্ঞান হয় না, সেইখানে অনুমানের আশ্রয় হইতে হয়।[২২] এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণই বলবান্।

সুখ প্রভৃতি জীবাত্মার ধর্ম্ম—আজগরপর্ব্বে কতকগুলি নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুখ এবং জ্ঞান জীবাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, উভয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য আছে।

মনের ইন্দ্রিয়ত্ব ও অণুত্ব—একই কালে অনেকগুলি জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না, এইকারণে মন-নামে ইন্দ্রিয় এবং তাহার অণুপরিমাণতা স্বীকার করিতে হয়।[২৩]

বুদ্ধি ও আত্মার ভেদ—জীবাত্মাতে যে জ্ঞান থাকে, তাহা অনিত্য,

১৯ অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ন তর্কেণ সাধয়েৎ
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ ভী ৫।১২

২০ ত্রয়ী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্ত্তা চ ভরতর্ষভ।
দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ॥ শা ৫৯।৩৩। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

২১ প্রত্যক্ষেণানুমানেন তথোপম্যাগমৈরপি।
পরীক্ষ্যাস্তে মহারাজ স্বে পরে চৈব নিত্যশঃ॥ শা ৫৬।৪১

২২ প্রত্যক্ষেণ পরোক্ষং তদনুমানেন সিধ্যতি। শা ১৯৪।৫০

২৩ কিন্ন গৃহ্ণাসি বিষয়ান্ যুগপত্ত্বং মহামতে।
এতাবদুচ্যতাং চোক্তং সর্ব্বং পন্নগসত্তম॥ ইত্যাদি। বন ১৮১।১৭-২১

অর্থাৎ সেই জ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে। সুতরাং বুদ্ধিতে কর্ত্তৃত্ব আছে, ইহা বলা যায় না। পণ্ডিতগণ যুক্তি ও অনুভবের দ্বারা বুদ্ধি ও আত্মার প্রভেদ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন। বুদ্ধি এবং জীবের অভেদ স্বীকার করিলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ ঘটে।

বুদ্ধি এবং মন এই উভয়ের যে-কোন একটির করণত্ব কিংবা কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে চলিতে পারে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, উভয়ের কার্য্য বিভিন্ন-রকমের, সুতরাং একটিকে মানিলে কিছুতেই চলিতে পারে না। বুদ্ধি অতিশয় আত্মানুগা। বুদ্ধির কাজ অনেকসময় 'জলচন্দ্র-ন্যায়' অনুসারে আত্মাতেও প্রতিফলিত হয়। এই-প্রকারে বুদ্ধি ও আত্মার অন্যোন্যাধ্যাস প্রদর্শিত হইয়াছে। তার্কিকগণ উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব স্বীকার করেন। সমবায়-সম্বন্ধে বুদ্ধি জীবে প্রতিষ্ঠিত। এই অন্যোন্যাধ্যাস সম্ভবতঃ ধর্ম্মধর্ম্মিভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হইয়াছে। বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।[২৪]

পঞ্চ ভূত ও ইন্দ্রিয়—পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে আকাশের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পঞ্চ মহাভূতই অনিত্য। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, এই এগারটি ইন্দ্রিয় স্বীকার করা হইয়াছে। আকাশ প্রথম মহাভূত, শ্রোত্র অধ্যাত্ম, শব্দ অধিভূত, দিক্ অধিদৈবত। দ্বিতীয় মহাভূত বায়ু, ত্বক্ অধ্যাত্ম, স্প্রষ্টব্য বস্তু অধিভূত, বিদ্যুৎ অধিদৈবত। তৃতীয় জ্যোতি (তেজঃ), চক্ষু অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, সূর্য্য অধিদৈবত। চতুর্থ ভূত জল, জিহ্বা অধ্যাত্ম, রস অধিভূত, সোম অধিদৈবত। পৃথিবী পঞ্চম ভূত, ঘ্রাণ অধ্যাত্ম, গন্ধ অধিভূত, বায়ু অধিদৈবত।[২৫] ইন্দ্রিয়কে অধ্যাত্ম, গ্রাহ্য বিষয়কে অধিভূত এবং ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহিকা দেবতাকে অধিদৈবত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এইসকল পারিভাষিক শব্দ ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত হয় নাই, অধিদৈবতবাদও দর্শনে গৃহীত হয় নাই। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্বন্ধে যে-সকল মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি যুক্তিশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তেরও অবিরোধী। আকাশাদির লক্ষণ করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে, আকাশ শব্দলক্ষণ, বায়ু স্পর্শলক্ষণ ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতের যাহা কার্য্য, তাহার সাহায্যেই লক্ষণ করা হইয়াছে। গন্ধ, রস প্রভৃতির কোন্‌টি কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়, সেই বিষয়ে মূল দর্শনের

২৪ বুদ্ধেরুত্তরকালা চ বেদনা দৃশ্যতে বুধৈঃ। ইত্যাদি। বন ১৮১।২৩-২৬

২৫ অশ্ব ৪২শ অঃ। শা২১০ তম অঃ।

সহিত কোন মতভেদ নাই। কিন্তু ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যে-সকল গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, বৈশেষিকদর্শনে তদপেক্ষা বেশী আরও কতকগুলি গুণের নাম পাওয়া যায়। তথাপি বলিতে হইবে, এই অংশ বৈশেষিক-সিদ্ধান্তেরই আংশিক প্রকাশমাত্র। বলা হইয়াছে যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটি গুণ ভূমিতে থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চারিটি জলের গুণ। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তেজের গুণ। শব্দ ও স্পর্শ বায়ুর এবং কেবল শব্দ আকাশের গুণ।[২৬] আকাশাদির গুণ নির্ণয়ের পর গুণগুলির বিভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত গন্ধই পার্থিব, গন্ধ দশপ্রকার; যথা—ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, অম্ল, কটু, নির্হারী, সংহত, স্নিগ্ধ, রূক্ষ ও বিশদ। গুরুশিষ্যসংবাদে জলের যে-সকল গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'দ্রব' একটি। পূর্ব্বোল্লিখিত গুণবিবেকে এই গুণটির নাম গৃহীত হয় নাই। রস ছয়প্রকার। মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায়, এবং লবণ। তেজের মধ্যে বার-রকমের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, স্থূল, চতুরস্র এবং বৃত্তবৎ। স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুর স্পর্শও নানাপ্রকার—রূক্ষ, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, দারুণ ও মৃদু। শব্দ বিষয়েও নানারূপ অনুভূতি হইয়া থাকে। ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, ধৈবত, ইষ্ট, অনিষ্ট ও সংহত প্রভৃতি শব্দেরই প্রকারভেদ-মাত্র। ন্যায় বা বৈশেষিকে যদিও এইরূপ বিভাগ করা হয় নাই, তথাপি এইগুলি ন্যায়াদির বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে।[২৭]

পরদেহে জীবাত্মার অনুমান—সুখ এবং দুঃখ জীবেতেই আশ্রিত। সুখদুঃখের দ্বারা জীবাত্মার অনুমান করা যায়। পুণ্য এবং পাপের আশ্রয়

পদার্থ-নিরূপণ—বৈশেষিকাচার্য্যদের স্বীকৃত দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ মহাভারতে স্থান পায় নাই। শুকানুপ্রশ্নে কথিত হইয়াছে যে, পঞ্চ ভূত ছাড়া আর কোন পদার্থ নাই। দেহী বা আত্মাকে পৃথক্‌রূপে স্বীকার করিতে

---

২৬ শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ। ইত্যাদি। অশ্ব ৪৩।২২-৩৫
ভূমিঃ পঞ্চগুণা ব্রহ্মন্নুদকঞ্চ চতুর্গুণম্। ইত্যাদি। বন ২১০।৪-৮। ভী ৫।৩-৮। শা ২৫১ তম অঃ।

২৭ অশ্ব ৫০।৩৮-৫৪। শা ১৮৪ তম অঃ।

২৮ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ম্মনো ব্যাকরণাত্মকম্।
কর্ম্মানুমানাদ্বিজ্ঞেয়ঃ স জীবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ। শা ২৫১।১১

হইবে, অপর যাবতীয় পদার্থ পঞ্চ ভূতেরই অন্তর্গত। নূতনত্ব, পুরাতনত্ব প্রভৃতির মত দ্রব্যগত অতীতত্ব, বর্ত্তমানত্ব এবং ভাবিত্ব ব্যবহারের দ্বারা কালের জ্ঞান হয়। ইহাও দ্রব্যমাত্র। দিক্ নামে পৃথক পদার্থ স্বীকার না করিলেও চলে। আকাশে তেজোময় সূর্য্যের অবস্থিতিতে সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়াই পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রভৃতি ব্যবহার হইয়া থাকে। অর্থাৎ আকাশের যে কল্পিত অংশে সূর্য্য উদিত হন, সেই কল্পিত অংশকে পূর্ব্ব, যে অংশে অস্তমিত হন, সেই অংশকে পশ্চিম, এইভাবে দিক্ শুধু সূর্য্যের অবস্থানের দ্বারা আকাশের কল্পিত অংশমাত্র। (রঘুনাথ শিরোমণিও পৃথক্ দিক্‌পদার্থ স্বীকার করেন নাই।) মনকেও পৃথক্ দ্রব্যরূপে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। মন ইন্দ্রিয়, সেইজন্য যে-গুণকে সে গ্রহণ করিবে, সেই গুণেরই আশ্রয় হইবে। আর সেইসকল শব্দাদি ভৌতিক গুণপঞ্চকের আশ্রয় পঞ্চ ভূত ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সুতরাং মনও ভূতাত্মক পদার্থ। ভূতাত্মক দ্রব্যের স্বভাব-প্রচ্যুতি ঘটিলেই তাহাতে স্পন্দনাদি ক্রিয়া (কর্ম্ম) উপস্থিত হয়, সেই ক্রিয়াও ভূতাতিরিক্ত অপর বস্তু নহে। 'বস্তুটি সৎ' এই ব্যবহারের উপপত্তির নিমিত্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম-পদার্থে 'সত্তা' অথবা 'সামান্য'-পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। আধার বা অধিষ্ঠানের সত্তাতেই বস্তুর সত্তা স্থাপিত হইতে পারে, তজ্জন্য অপর পদার্থের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন।

বিশেষ, সমবায় ও অভাবের পদার্থত্ব-খণ্ডন—নিত্যদ্রব্যবৃত্তি অনন্ত বিশেষ-পদার্থ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, একমাত্র আত্মা ব্যতীত আর কোন বস্তুকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা শ্রুতির অনুমোদিত নহে। অতএব 'বিশেষ'-পদার্থ সহজেই খণ্ডন করা যায়। সমবায়ের অঙ্গীকার না করিলেও সমবায়বিশিষ্ট রূপাদি বস্তু দ্রব্যে থাকার পক্ষে কোন বাধা নাই, আর শ্রুতিবিরুদ্ধ নিত্য আরও একটি সম্বন্ধরূপ পদার্থ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই। অভাব-পদার্থও অধিকরণস্বরূপ। বিশেষতঃ প্রাগভাব এবং ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী অসৎ-পদার্থ। অসৎপ্রতিযোগিক অভাব-পদার্থ স্বীকার করা সঙ্গত নহে। অতএব অভাবের পৃথক্ পদার্থত্ব খণ্ডিত হইল।[২৯]

---

২৯ আকাশং মারুতো জ্যোতিরাপঃ পৃথ্বী চ পঞ্চমী।
ভাবাভাবৌ চ কালশ্চ সর্ব্বভূতেষু পঞ্চসু। শা ২৫১।২
পঞ্চসু পঞ্চাত্মকেষু। এতেন ভাবাভাবকালানামপি ভৌতিকত্বমুক্তম্। ইত্যাদি।
নীলকণ্ঠ। শা ২৫১।২

সংশয় ও নিষ্ঠা—জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চকের বিষয় আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মনের কাজ সংশয়, আর বুদ্ধির কাজ নিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ ব্যতীত কোন অনুভূতি জন্মিতে পারে না।[৩০] মনের ও বুদ্ধির যে যে কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে। তাঁহাদের মতে সংশয় এবং নিষ্ঠা (নিশ্চয়) বুদ্ধিরই প্রকারভেদ-মাত্র।

ইন্দ্রিয়ের বিষয়-গ্রহণ—ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মন প্রধান। মনের সহিত সংযুক্ত না হইয়া কোনও ইন্দ্রিয় বিষয়বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। মন যদি সুস্থ না থাকে, তবে অপর ইন্দ্রিয়গুলি স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না।[৩১] অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে, মনই মানুষের প্রবৃত্তির মূল কারণ। মন যে-ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় যে-বিষয় উপভোগ করিতে উন্মুখ হয়, সেই বিষয় ভোগ করিবার নিমিত্ত জীবের ঔৎসুক্য উপস্থিত হয়, অতঃপর প্রাণী মন ও সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগে বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে।[৩২] এই মতের সহিত যুক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের অবিকল মিল না থাকিলেও প্রক্রিয়া প্রায় একই রকমের। বিষয়-গ্রহণে জীবাত্মারই ঔৎসুক্য বা প্রবৃত্তি জন্মে, মনের নহে। এই স্থলে মন শব্দটি বোধ করি, জীব-অর্থেই প্রযুক্ত।

মিথ্যাজ্ঞান, মুক্তি প্রভৃতি—বিষয়বাসনা সকল কর্ম্মের মূল, আবার প্রারব্ধ কর্ম্ম বিষয়বাসনার মূল। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চক্রনেমি-ক্রমে এই উভয়ের মধ্যে ক্রমিক পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিবেই। যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতেই হইবে। মিথ্যাজ্ঞানের নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের মুক্তি হয় না।[৩৩] শরীরই জীবের দুঃখের কারণ, শরীরের হেতু কর্ম্ম। কর্ম্ম না করিলে প্রারব্ধ কর্ম্মফল

৩০ অশ্ব ২২শ অঃ।

৩১ মনশ্চরতি রাজেন্দ্র বারিতং সর্ব্বমিন্দ্রিয়ৈঃ।
ন চেন্দ্রিয়াণি পশ্যন্তি মন এবানুপশ্যতি॥ ইত্যাদি। শা ৩১১।১৬-২১

৩২ যদিন্দ্রিয়াণি বিষয়ং সমাগচ্ছন্তি বৈ যদা।
তদা প্রাদুর্ভবত্যেষাং পূর্ব্বসঙ্কল্পজং মনঃ॥ ইত্যাদি। বন ২।৬৭-৭০

৩৩ তৎকারণৈর্হি সংযুক্তং কার্য্যসংগ্রহকারকম্।
যেনৈতদ্ বর্ত্ততে চক্রমনাদিনিধনং মহৎ॥ শা ২১১।৭
বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥ শা ২১১।১৭

ভোগের নিমিত্ত শরীর গ্রহণ করিতে হয় না। রাগাদি দোষের দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে এবং প্রবর্ত্তক অনুরাগাদি মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং সংসারের মূল কারণ—মিথ্যাজ্ঞান।[৩৪] এই অংশে ন্যায়দর্শনের সহিত সম্পূর্ণ মিল দেখিতে পাই। "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ", "দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কল্পকৃতাঃ" এই দুইটি অক্ষপাদসূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান হইতে সঙ্কল্প জন্মে, সঙ্কল্প হইতে ভোগ্য বিষয়, তারপর বিষয়ে প্রীতি, অতঃপর প্রীতিলাভের নিমিত্ত প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি থাকিলেই জন্ম বা শরীরগ্রহণ, শরীর থাকিলে সুখ এবং দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, সুখ-দুঃখ হইতে রাগ, দ্বেষ, বাসনা ইত্যাদি, তারপর পুনরায় সঙ্কল্প—এইভাবে মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জন্মজন্মান্তরে জীবের ভোগ চলিতেছে। সমস্ত বিষয়ের মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত এই-প্রকার কার্য্যকারণ-পরম্পরার সমাপ্তি ঘটিবে না, রথচক্রের গতির ন্যায় চলিতেই থাকিবে। যুধিষ্ঠিরশৌনকসংবাদে এই তত্ত্বটি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। বিষয়বৈরাগ্য ব্যতীত এই দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই।[৩৫]

পরমাণুবাদ—পরমাণুবাদ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোন উল্লেখ নাই। অশ্বমেধ-পর্ব্বের গুরুশিষ্যসংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, "কেহ কেহ জগৎকারণের বহুত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।" নীলকণ্ঠ পরমাণুবাদীকেই বহুত্ববাদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৬]

পঞ্চ অবয়ব—দেবর্ষি নারদের যে-সকল বিশেষণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি শব্দ 'ন্যায়বিৎ'। ইহা হইতে বুঝা যায়, তিনি ন্যায়বৈশেষিক-শাস্ত্র এবং মীমাংসার পঞ্চাঙ্গ অধিকরণে অভিজ্ঞ ছিলেন।[৩৭] সেখানে আরও বলা হইয়াছে যে, দেবর্ষি পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্যের গুণদোষের বিচারে পটু ও যুক্তিপ্রমাণাদি বিষয়ে নিপুণ। এই উক্তি হইতে মনে হয়, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি ন্যায়-অবয়বের কথাই বলা হইয়াছে।[৩৮]

---

৩৪ নোপপত্ত্যা ন বা যুক্ত্যা ত্বসদ্ব্রূয়াদসংশয়ম্। শা ২৭৪।৭

৩৫ স্নেহাত্তাবোঽনুরাগশ্চ প্রজজ্ঞে বিষয়ে তথা।
অশ্রেয়স্কাবুভাবেতৌ পূর্ব্বস্তত্র গুরুঃ স্মৃতঃ। ইত্যাদি। বন ২।২৯-৩১

৩৬ বহুত্বমিতি চাপরে। অশ্ব ৪৯।৪। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

৩৭ ন্যায়বিদ্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞঃ ষড়ঙ্গবিদনুত্তমঃ। সভা ৫।৩

৩৮ পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ। সভা ৫।৫

মহাভারতে সাংখ্যদর্শনের আলোচনা অতিশয় বিস্তৃত, যথাসম্ভব সংক্ষেপে সার সঙ্কলন করা যাইতেছে।

সাংখ্যবিদ্ আচার্য্যগণ—জৈগীষব্য, অসিত, দেবল, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, বার্ষগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুকদেব, গৌতম, আর্ষ্টিষেণ, গর্গ, আসুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার, শুক্র, কশ্যপ, জনক, রুদ্র, ও বিশ্বরূপ প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য।[১]

যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠতা—এই আচার্য্যগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রে কপিলের পাণ্ডিত্যের কথা সর্ব্বত্র সুবিদিত। মহাভারতে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশই বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে।[২]

সাংখ্যের প্রচার—মহর্ষি কপিল প্রথমতঃ আসুরিকে সাংখ্যবিদ্যা দান করেন। ঈশ্বরকৃষ্ণও সাংখ্যকারিকার পরিশেষে লিখিয়াছেন, মহামুনি কপিলই সাংখ্যবিদ্যার আদি প্রচারক। তিনি কৃপা করিয়া এই জ্ঞান আসুরিকে প্রদান করেন। আচার্য্য আসুরি পঞ্চশিখের গুরু। পঞ্চশিখাচার্য্য এই শাস্ত্রকে সমধিক প্রচার করিয়াছেন। আচার্য্য পঞ্চশিখ কত পরিশ্রমে এই শাস্ত্র শিষ্যপরম্পরায় বিতরণ করিয়াছেন, তাহা রাজর্ষি জনকের উক্তি হইতেও জানা যায়।[৩]

সাংখ্যের বিস্তৃতি—প্রাচীন কালে এক সময়ে সাংখ্যদর্শনই সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রমাণ—পুরাণ, ইতিহাস ও তন্ত্রে সাংখ্যেরই মত প্রধানভাবে গৃহীত হইয়াছে। পুরাণাদিতে প্রসঙ্গতঃ যে-সকল দার্শনিক মতবাদের আলোচনা দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশ সাংখ্যদর্শনকে অবলম্বন করিয়া। 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ' গীতার এই ভগবদুক্তিতে মহর্ষি কপিলের মাহাত্ম্য অতি উজ্জ্বলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং, নাস্তি যোগসমং বলম্" এই প্রাচীন প্রবাদবাক্যও সাংখ্যদর্শদের মাহাত্ম্য

১ জৈগীষব্যস্যাসিতস্য দেবলস্য ময়া শ্রুতম্। ইত্যাদি। শা ৩১৮।৫৯-৬৬

২ সাংখ্যজ্ঞানং ত্বয়া ব্রহ্মন্নবাপ্তং কৃৎস্নমেব চ।
তথৈব যোগশাস্ত্রঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্য বিশেষতঃ॥ ইত্যাদি। শা ৩১৮।৬৭, ৬৮

৩ এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্॥ সাংখ্যকারিকা ৭০
যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্। ইত্যাদি। শা ২১৮।৯, ১০

কীর্ত্তন করিতেছে। মরীচি, বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিদের উদ্দেশে হিন্দুকে প্রত্যহ তর্পণ করিতে হয়; আর কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ প্রমুখ সাংখ্যাচার্য্যগণকেও তর্পণ না করিয়া কোন হিন্দুর জলগ্রহণ করিবার অধিকার নাই। এইসকল ব্যবহার হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, সাংখ্যাচার্য্যগণ হিন্দুসমাজে কত বড় শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত আচার্য্যদের মধ্যে কপিলের সূত্র গ্রন্থাকারেই পাওয়া যায়, আর ব্যাসভাষ্যে মাঝে মাঝে পঞ্চশিখাচার্য্যের সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। অপর আচার্য্যদের উপদেশ কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে সাংখ্যদর্শনেরই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়তা, গ্রন্থের একান্ত অভাব। সাংখ্যশাস্ত্র মহাজ্ঞান-স্বরূপ। ভীষ্মদেব বলিয়াছেন, বেদ, যোগ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে যে-সমস্ত জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে সাংখ্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। সংসারের সকল উৎকৃষ্ট জ্ঞানের আকর সাংখ্যশাস্ত্র।[৪]

ধর্ম্মধ্বজ জনকের সাংখ্যাদি জ্ঞান—রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজ জনক স্বয়ং পরম তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। একাধারে এইরূপ বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী যোগী গৃহী পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার সিংহাসনকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজর্ষি সংসারে থাকিয়াও মুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মচারিণী সুলভার সহিত কথোপকথনের সময়ে তিনি বলিয়াছেন, "পরাশরগোত্র সুমহান্ বৃদ্ধ ভিক্ষু পঞ্চশিখ আমার গুরু, আমি তাঁহার পরম প্রিয় শিষ্য। সাংখ্যজ্ঞান, যোগবিধি এবং রাজধর্ম্মশাস্ত্রে তিনি অসামান্য পণ্ডিত; বিশেষতঃ জ্ঞান, উপাসনা এবং কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহার জ্ঞানের তুলনা হয় না। তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ছিন্নসংশয় মহাপুরুষ। একদা তিনি পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে দয়া করিয়া আমার পুরীতে চারি মাস কাল অবস্থান করেন। তৎকালে অনুগ্রহপূর্ব্বক তিনিই আমাকে সাংখ্যাদি মোক্ষশাস্ত্রের তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন"।[৫]

৪ বৃহচ্চৈবমিদং শাস্ত্রমিত্যাহুর্ব্বিদুষো জনাঃ। শা ৩০৭।৪৬
জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্, বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥ ইত্যাদি। শা ৩০১।১০৮,১০৯

৫ পরাশরসগোত্রস্য বৃদ্ধস্য সুমহাত্মনঃ।
ভিক্ষোঃ পঞ্চশিখস্যাহং শিষ্যঃ পরমসম্মতঃ॥ ইত্যাদি। শা ৩২০।২৪-২৮

করাল জনকের সাংখ্যজ্ঞান—জনকবংশীয় করাল-রাজর্ষি বশিষ্ঠ হইতে সাংখ্যাদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।[৬]

বসুমান্ জনকের বিদ্যাপ্রাপ্তি—বসুমান্ জনক ভৃগুবংশীয় একজন ঋষির পাদমূলে বসিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন।[৭]

দৈবরাতি জনকের জ্ঞান—দৈবরাতি জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পদসেবা করিয়া সাংখ্যতত্ত্বে অধিকার লাভ করেন।[৮]

সাংখ্যের উপদেশ—মিথিলার এই রাজর্ষিবংশের মত পূতচরিত্র শাস্ত্রনিষ্ঠ যোগিরাজবংশ আর কোথাও ছিল বলিয়া জানা যায় না। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের নৃপতিদের গুণগাথা তাঁহার অমর লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কোন মহাকবি মিথিলার এই জনকবংশকে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা না করিলেও মহাভারতের কবি এই রাজর্ষিবংশের বিদ্যাবত্তা ও ত্যাগের যে মহৎ আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি উজ্জ্বল। উল্লিখিত কয়েকজন রাজর্ষি-শিষ্য এবং মহর্ষি-অধ্যাপকের মুখে যাহা বিবৃত হইয়াছে, মহাভারতীয় সাংখ্যদর্শনের তাহাই মূলভিত্তি। প্রসঙ্গতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অনুগীতা, অশ্বমেধপর্ব্বের গুরুশিষ্যসংবাদ প্রভৃতি অধ্যায়েও কিছু কিছু সাংখ্যমত ব্যক্ত হইয়াছে।

পদার্থ-নিরূপণ—সাংখ্যীয় পদার্থনিরূপণে বলা হইয়াছে যে, আটটি পদার্থ প্রকৃতি এবং ষোলটি পদার্থ বিকৃতি। অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ্ ও জ্যোতি এই আটটি প্রকৃতি-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মূলা প্রকৃতি এবং মহদাদি প্রকৃতিবিকৃতিকেও শুধু প্রকৃতিই বলা হইয়াছে। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন এই ষোলটি পদার্থ—বিকৃতি। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্য অবস্থাকেই বলা হয় অব্যক্ত। অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ভূতগুণযুক্ত মনের সৃষ্টি, মন হইতে পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি। ভূতসমুদয় হইতে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের উদ্ভব। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণেরও মন হইতেই উৎপত্তি। প্রাণ, অপান,

৬ শা ৩০২তম-৩০৮তম অঃ।

৭ শা ৩০৯তম অঃ।

৮ শা ৩১০তম-৩১৮তম অঃ।

সমান, উদান ও ব্যান-নামে বায়ুপঞ্চক ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই পরিগণিত। সুতরাং অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও মন এই চারিটি, পঞ্চ ভূত, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—মোট চব্বিশটি পদার্থ বা চব্বিশটি তত্ত্ব সাংখ্যমতে প্রসিদ্ধ।[৯]

সাংখ্যসম্মত এই চতুর্বিবংশতি তত্ত্বের কথা বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। মহত্তত্ত্বকে সূত্র এবং অহঙ্কারকে বিরাট্ নামেও বলা হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্বের অপর সংজ্ঞা হিরণ্যগর্ভ। আকাশাদি ভূতের সৃষ্টিতে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি ক্রমিকত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এখানে তাহা স্বীকার করা হয় নাই। বলা হইয়াছে যে, পঞ্চ মহাভূতের একই সময়ে সৃষ্টি হয়। অব্যক্ত অবস্থা হইতে একই সময়ে ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চতুর্বিবশতি তত্ত্ব সাংখ্যসম্মত।[১০] এই চব্বিশটির উপরে আরও একটি পদার্থ আছে, তাহার নিগুর্ণত্বপ্রযুক্ত তাহাকে তত্ত্ব বলা যাইতে পারে না। তাহাতে কারণত্ব এবং কার্য্যত্ব নাই, ইহাও তত্ত্বস্বীকৃতির পক্ষে বাধক বটে, তথাপি সমস্ত তত্ত্বের চরম অধিষ্ঠানরূপে তাহাকেও তত্ত্ব আখ্যা দেওয়া হয়। তাহার নাম পুরুষতত্ত্ব বা অমূর্ত্ততত্ত্ব। পুরুষ অমূর্ত্ত এবং অসঙ্গ। সেইজন্য তিনি কাহারও অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। তিনি চেতন এবং উপাধিরহিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি অমূর্ত্ত হইলেও সৃষ্টিপ্রলয়-বিধায়িনী প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখের ন্যায় তিনি মূর্ত্তিমান্।[১১] দৃশ্যমান জগৎ বিনশ্বর, তাহা প্রকৃতিরই পরিণাম, প্রকৃতির আর এক নাম ‘প্রধান’।[১২]

পুরুষের দেহধারণ—পুরুষ আপনার স্বরূপ বুঝিতে না পারায় অজ্ঞানতাবশতঃ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহাতেই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর

৯ শা ৩১০তম অঃ। অশ্ব ৪১শ ও ৪২শ অঃ।

১০ শা ৩০২তম অঃ।

মহানাত্মা তথাব্যক্তমহঙ্কারস্তথৈব চ। ইত্যাদি। অশ্ব ৩৫।৪৭-৫০

চতুর্বিবংশক ইত্যেষ ব্যক্তাব্যক্তময়ো গণঃ। বন ২০৯।২১

১১ পঞ্চবিংশতিমো বিষ্ণুর্নিস্তত্ত্বস্তত্ত্বসংজ্ঞিতঃ।

তত্ত্বসংশ্রয়ণাদেতত্তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ॥ শা ৩০২।৩৮

চতুর্বিবংশতিমোঽব্যক্তো হ্যমূর্ত্তঃ পঞ্চবিংশকঃ। ইত্যাদি। শা ৩০২।৩৯-৪২

১২ যন্মর্ত্ত্যমসৃজদ্ ব্যক্তং তত্তন্মূর্ত্ত্যধিতিষ্ঠতি। শা ৩০২।৩৯

প্রকৃতিঃ কুরুতে দেবী ভবং প্রলয়মেব চ। শা ৩০৩।৩১

ভিতর দিয়া সহস্র সহস্র দেহের সহিত সম্বন্ধ ঘটে। অবশ্য, এই সম্বন্ধও প্রকৃত নহে, আভিমানিক মাত্র।[১৩]

ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব এবং মুক্তি—মহাভারতীয় সাংখ্যবিদ্যায় ঈশ্বর বা পরমব্রহ্মেরও স্থান আছে। মহাভারতের সাংখ্যীয় মুক্তি ঈশ্বরকে বাদ দিয়া নহে। এই বিষয় পরে ব্যক্ত হইবে। ঈশ্বরকে পুরুষরূপ পঞ্চবিংশ তত্ত্বের উপরে ষড়্‌বিংশ তত্ত্বরূপে স্থান দেওয়া হইয়াছে। জীবাত্মা বা পুরুষের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান হইলেও আত্মজ্ঞান হয় না। অপ্রমেয় সনাতন ষড়্‌বিংশ তত্ত্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ পুরুষের মুক্তি হইয়া থাকে। জীব যখন প্রকৃতিকে জয় করিতে পারেন, তখনই শুদ্ধব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধি তাঁহাতে উদ্ভূত হয়। পরাবিদ্যার উদয়ে ষড়্‌বিংশ তত্ত্বের জ্ঞান এবং প্রকৃতিবিজয় একসঙ্গেই হইয়া থাকে। অব্যক্তা প্রকৃতির সহিত আপনার যথার্থ ভেদ বুঝিতে পারিলে জীব কেবলধর্ম্মা বলিয়া খ্যাত হন; জীব তখন আপনাকে ষড়্‌বিংশ মনে করিয়া ষড়্‌বিংশরূপ পরব্রহ্মের সহিত সমত্ব প্রাপ্ত হন এবং প্রাজ্ঞ, নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র, কেবলাত্মা প্রভৃতি সংজ্ঞার বিষয় হইয়া থাকেন। এই ষড়্‌বিংশ-তত্ত্বতা-প্রাপ্তিই জীবের মুক্তি, শুধু তত্ত্বজ্ঞানমাত্র মুক্তি নহে। বাশিষ্ঠ সাংখ্যবিদ্যার ইহাই অভিনব সিদ্ধান্ত।[১৪]

ব্রহ্মবিদ্যা ও সাংখ্যবিদ্যার ঐক্য—নারদমুনি এই বিদ্যা বশিষ্ঠ হইতে লাভ করেন। নারদ হইতে ভীষ্ম এবং ভীষ্ম হইতে যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ হইতে এই সাংখ্যতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। ভীষ্মদেব বলিয়াছেন যে, ষড়্‌বিংশ তত্ত্বের স্বরূপ জানিলে মুক্তিলাভ হয়, পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ পুরুষ আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারেন। সেই জ্ঞানের আস্বাদ পাইলে মানুষের মৃত্যুভয় থাকে না, তাহার মৃতত্ব তখন দেবত্বে পরিণত হয়। এই বিদ্যা অতিশয় শ্রদ্ধালু, গুরুভক্ত, বিনীত, ক্রিয়াবান্ পবিত্রচেতা শিষ্যকে দান করিতে হয়। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার সহিত সাংখ্যবিদ্যার এইপ্রকার অভিনব সামঞ্জস্য-বিধান সাংখ্য কিংবা বেদান্তের অপর কোন গ্রন্থে করা হইয়াছে বলিয়া জানি না। সমস্ত অধ্যায় জুড়িয়া সাংখ্যবিদ্যার সহিত ব্রহ্মবিদ্যাকে মিলিত করিয়া মোক্ষের স্বরূপ বর্ণনা করা

---

১৩ এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধমনুবর্ত্ততে।
দেহাদ্দেহসহস্রাণি তথা সমভিপদ্যতে॥ শা ৩০৩।১

১৪ শা ৩০৮তম অঃ।

হইয়াছে। কেবলাত্মা স্বতন্ত্র পুরুষ, কেবল স্বতন্ত্রস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া স্বতন্ত্রত্ব প্রাপ্ত হন। এইপ্রকার মুক্তিলক্ষণ কোন সাংখ্যগ্রন্থে নাই।[১৫]

জাতিনির্ব্বেদাদির উপদেশ—সমস্ত আস্তিক দর্শনেরই আরম্ভ দুঃখবাদে এবং পরিসমাপ্তি দুঃখের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পথপ্রদর্শনে। দুঃখ প্রাণিমাত্রেরই অপ্রিয় বলিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সকলেই চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই চেষ্টার চরম সার্থকতা মুক্তিতে। মহাভারতীয় বাশিষ্ঠ সাংখ্যে একটি অধ্যায় ব্যাপিয়া সেই কথাই বলা হইয়াছে।[১৬] আচার্য্য পঞ্চশিখও জনক-রাজাকে প্রথমতঃ জাতিনির্ব্বেদ (জন্মই দুঃখের হেতু), তারপর কর্ম্মনির্ব্বেদ (যাগযজ্ঞাদির ফল চিরস্থায়ী নহে, পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় দুঃখভোগ করিতে হয়), তারপর সর্ব্বনির্ব্বেদ (মুক্তির উপায়) সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।[১৭]

প্রকৃতি বা প্রধান—যে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ করা হইল, তাহার প্রথম তত্ত্বের নাম প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্য অবস্থার নাম প্রকৃতি। গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, পরন্তু প্রকৃতি হইতে অভিন্ন। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের স্বরূপ জানিতে পারিলেই প্রকৃতির স্বরূপ জানা হয়। সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে গীতায় 'প্রকৃতিসম্ভব' বলা হইয়াছে। 'প্রকৃতি হইতে জাত' এই অর্থে প্রকৃতিসম্ভব শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। অভেদে ভেদ কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গুণত্রয় এবং প্রকৃতি একই বস্তু। যে প্রকৃষ্টভাবে করে, তাহার নাম 'প্রকৃতি', এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা প্রকৃতি শব্দের যোগরূঢ়তা বর্ণিত হইয়াছে।[১৮] চৈতন্যে যাহার ছায়া পতিত হয়, তাহাই 'প্রধান'।[১৯] সত্ত্বগুণ হইতে আনন্দ, উদ্রেক, প্রীতি, প্রকাশময়তা, সুখ, শুদ্ধিতা, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্দধানতা, অকার্পণ্য, ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, মৃদুতা, হ্রী, অচাপল্য, শৌচ, সরলতা, আচার, হৃদ্যতা, সম্ভ্রম, অবিকত্থনা, অস্পৃহতা,

---

১৫ কেবলাত্মা তথা চৈব কেবলেন সমেত্য বৈ।
স্বতন্ত্রশ্চ স্বতন্ত্রেণ স্বতন্ত্রত্বমবাপ্নুতে॥ শা ৩০৮।৩০

১৬ শা ৩০৩ তম অঃ।

১৭ জাতিনির্ব্বেদমুক্ত্বা স কর্ম্মনির্ব্বেদমব্রবীৎ। ইত্যাদি। শা ২১৮।২১

১৮ প্রকৃতির্গুণান্ বিকুরুতে স্বচ্ছন্দেনাত্মকাম্যয়া।
ক্রীড়ার্থে তু মহারাজ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ শা ৩১৩।১৫

১৯ অনেন প্রতিবোধেন প্রধানং প্রবদন্তি তৎ। শা ৩১৮।৭১। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

পরার্থতা, সর্ব্বভূতে দয়া, দান প্রভৃতির প্রকাশ হয়। রজোগুণ হইতে রূপ, ঐশ্বর্য্য, অত্যাগিত্ব, অকারুণ্য, সুখদুঃখোপসেবন, পরাপবাদরতি, বিবাদ, অহঙ্কার, অসৎকার, বৈরভাব, পরিতাপ, নির্ল্লজ্জতা, অনার্জ্জব, ভেদ, পরুষতা, কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, মদ, দর্প, দ্বেষ প্রভৃতির প্রকাশ; আর তমোগুণ হইতে মোহ, অপ্রকাশ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, অতিভোজন, আলস্য, দিবা-নিদ্রা, প্রমাদরতি, ধর্ম্মদ্বেষ, নৃত্যগীতে অত্যাসক্তি প্রভৃতির উৎপত্তি।[২০] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়েও ঠিক এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আরও নানাস্থানে গুণত্রয়ের কার্য্য ও প্রভাব অনুরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[২১] সত্ত্বগুণ দেবত্বের দ্যোতক, অপর দুইটি গুণকে 'আসুর' বলা হইয়াছে।[২২]

প্রকৃতি অলিঙ্গা অর্থাৎ অনুমেয়া, কখনও প্রত্যক্ষ হয় না, হেতু দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য দেখিয়া তাহার অনুমান করিতে হয়।[২৩]

সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, জড় হইলেও প্রকৃতিই কর্ত্রী, পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কিন্তু চেতন। পঙ্গু-অন্ধ ন্যায়ে, উভয়ের মিলনে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চলিতে পারে। জৈব সৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী উভয়েরই যেরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে, জগতের সৃষ্টিতেও সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বাশিষ্ঠ সাংখ্যে বলা হইয়াছে যে, দৃশ্যমান জৈব সৃষ্টির সহিত বিশাল সৃষ্টির পার্থক্য আছে। মাতৃশরীর ছাড়াও যেরূপ দ্রোণাচার্য্য, অগস্ত্য প্রমুখ ব্যক্তির জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল, মাতাপিতা উভয়ের অভাবেও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং কৃষ্ণার জন্ম হইয়াছিল, সেইরূপ কেবল প্রকৃতি হইতেও সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব মানিতেই হইবে।[২৪] পুরুষ নিমিত্তকারণ-

---

২০ সত্ত্বমানন্দ উদ্রেকঃ প্রীতিঃ প্রাকাশ্যমেব চ। ইত্যাদি। শা ৩১৩।১৭-২৮।
শা ২১২।২২-২৪। শা ২১৯।২৬-৩১

২১ সত্ত্বং দশগুণং জ্ঞাত্বা রজো নবগুণং তথা।
তমশ্চাষ্টগুণং জ্ঞাত্বা বুদ্ধিং সপ্তগুণাং তথা॥ ইত্যাদি। শা ৩০১।১৪-১৭। অশ্ব ৩১।১,২
অশ্ব ৩৬শ-৩৮শ অঃ। শা ২৮৫ তম অঃ। শা ৩০২তম অঃ।

২২ সত্ত্বং দেবগুণং বিদ্যাদিতরাবাসুরৌ গুণৌ। শা ২১৬।১৮

২৩ অলিঙ্গাং প্রকৃতিং ত্বাহুর্লিঙ্গৈরনুমিমীমহে। শা ৩০৩।৪৭

২৪ শা ৩০৫তম অঃ। অশ্ব ১৮।২৫-২৮
অচেতনা চৈব মতা প্রকৃতিশ্চাপি পার্থিব।
এতেনাধিষ্ঠিতা চৈব সৃজতে সংহরত্যপি॥ শা ৩১৪।১২
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। ভী ৩৩।১০

মাত্র, উপাদান নহে। প্রকৃতির অনুমেয়তা সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, কালস্বরূপ ঋতু যদিও প্রত্যক্ষের গোচর নহে, তথাপি বিভিন্ন ঋতুজ পুষ্প-ফলাদির প্রকাশের দ্বারা ঋতুর অনুমান করা চলে, সেইরূপ মহদাদি তত্ত্বের দ্বারা প্রকৃতিরও অনুমান করা যায়।[২৫] সৃষ্টিতে ঈশ্বরেরও নিমিত্তকারণতা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছায়ই প্রকৃতির পরিণাম ঘটে। প্রকৃতির বহুমুখী পরিণতির নামই সৃষ্টি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় বহুভাবে ব্যক্ত বস্তুগুলি আপন-আপন কারণে লয় প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে এক প্রকৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকে। সর্ব্বশেষে প্রকৃতিও নিষ্কল পুরুষে লীন হইয়া যায়। প্রকৃতির লয়ের পরে একমাত্র পুরুষই পরমার্থসত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। প্রকৃতির লয়ের বর্ণনাও মহাভারতীয় সাংখ্যের বিশেষত্ব।[২৬]

প্রকৃতি হইতে মহদাদির অভিব্যক্তি এবং তত্ত্বসমূহের প্রতিলোম-ক্রমে আপন-আপন কারণে প্রলয়, ঠিক যেন সাগরের ঢেউএর মত। সাগর হইতে ঢেউএর পৃথক্ কোন সত্তা না থাকিলেও ব্যবহারের বেলায় আমরা বলিয়া থাকি—'সাগরের তরঙ্গ'; সেইরূপ লীলাময়ী প্রকৃতির লীলা বা বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তিকেই আচার্য্যগণ পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়া শিষ্যগণকে বুঝাইয়াছিলেন। সেই সত্তা লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদনের নিমিত্ত কল্পিত। বাস্তবিক সেইসকল পদার্থ শুধু নামের দ্বারা পৃথক্ হইয়া যায় না।[২৭]

প্রকৃতি হইতে পরিণত কল্পিত পদার্থসমূহ প্রকৃতিতেই অধিষ্ঠিত, এই সিদ্ধান্তও নির্ভুল নহে। আপাতদৃষ্টিতে সেইরূপ মনে হইলেও আসলে চিদাত্মাই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠাতা। তাঁহার অধিষ্ঠাতৃতাই মুখ্য, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত্বকল্পনা গৌণ। পুরুষই প্রকৃতিকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া মহদাদি তত্ত্বের সৃষ্টি করেন। সূর্য্যকান্ত-মণি কি তৃণকে দগ্ধ করিতে পারে? তাহার মধ্য দিয়া সংহত সূর্য্যরশ্মির দাহিকা শক্তিকেই মণির শক্তি বলিয়া আমরা ভুল করিয়া থাকি। কাষ্ঠের ভিতরে অগ্নি থাকিলেও ঘর্ষণ ব্যতীত তাহার উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ভগবৎসত্তা থাকিলেও

২৫ যথা পুষ্পফলৈর্নিত্যমৃতবোঽমূর্ত্তয়স্তথা।
এবমপ্যনুমানেন হ্যলিঙ্গমুপলভ্যতে॥ শা ৩০৫।২৬

২৬ যস্মাদ্ যদভিজায়েত তত্তত্রৈব প্রলীয়তে। ইত্যাদি। শা ৩০৬।৩২। শা ৩৪৭।১৩-১৬
জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে। ইত্যাদি। শা ৩৩৯।২৯-৩১

২৭ গুণা গুণেষু সততং সাগরস্যোর্ম্ময়ো যথা। শা ৩০৬।৩২

আমাদের মলিন চিত্তে তাহা ধরা পড়ে না। ঈশ্বরই সকল পদার্থের অধিষ্ঠাতা এবং অভিব্যঞ্জক। প্রকৃতি মধ্যবর্ত্তী নিমিত্তমাত্র।[২৮]

পুরুষ—পুরুষ বা জীবাত্মা নিগুর্ণ, তাঁহার স্বভাবের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। অজ্ঞানতাবশতঃ প্রকৃতির ধর্ম্ম নিজের মধ্যে আরোপ করিয়া সুখদুঃখের ভোক্তৃরূপে তাঁহার অভিমান হইয়া থাকে। আপনার সাক্ষিস্বরূপত্ব বুঝিতে পারেন না বলিয়াই এত দুঃখ।[২৯] বহুপুরুষবাদ নিরীশ্বর-সাংখ্যসম্মত, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যপ্রোক্ত সাংখ্যবিদ্যায় কথিত হইয়াছে। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং সেই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ কেবল জ্ঞানবাদিগণ অব্যক্তের একত্ব এবং পুরুষের নানাত্ব সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। তাঁহার মতে অব্যক্তাদি তত্ত্বগুলি পুরুষেরই বহিঃপ্রকাশ, মুঞ্জ ও ইষীকার শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থারূপ সংসার হইতে পুরুষের নির্লিপ্ততাকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার নিমিত্ত জলমৎস্য-ন্যায়, পুষ্করোদক-ন্যায়, মশকোডুম্বর-ন্যায় এবং উখাগ্নি-ন্যায়ের প্রয়োগ করা হইয়াছে।[৩০]

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে পুরুষের একত্ব যে ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বেদান্তদর্শনের জীবনিরূপণের মত। নীলকণ্ঠ এই অধ্যায়ের টীকার পরিসমাপ্তিতে "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া পুরুষ যতদিন আপনার আনন্দময়ত্ব ও নির্লেপত্ব অনুভব করিতে পারেন না, ততদিন পর্য্যন্ত দেহাদিতে অহংবুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না এবং পুরুষ প্রকৃতির ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করিয়া তাহারই সুখে ও দুঃখে বিমূঢ় হইয়া থাকেন। অসঙ্গ হইয়াও অহঙ্কারবশে তিনি সংসারে লিপ্ত, শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ, ত্রিগুণা প্রকৃতির অনুগতরূপে আপনাকে মনে করেন, এইহেতু তিনি ত্রিগুণ। অবিদ্যা-পদার্থটিও

২৮ সর্গপ্রলয় এতাবান্ প্রকৃতের্নৃপসত্তম।
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ তদাসৃজং॥ ইত্যাদি। শা ৩০৬।৩৩-৩৮

২৯ ন শক্যো নিগুর্ণস্তাত গুণীকর্ত্তুং বিশাম্পতে।
গুণবাংশ্চাপ্যগুণবান্ যথাতত্ত্বং নিবোধ মে॥ ইত্যাদি। শা ৩১৫।১-১০

৩০ অব্যক্তৈকত্বমিত্যাহুর্নানাত্বং পুরুষাস্তথা।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তঃ কেবলং জ্ঞানমাস্থিতাঃ॥ ইত্যাদি। শা ৩১৫।১১-২০

পুরুষের ধর্ম্ম নহে, তাহাও প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। কিন্তু পুরুষ এতই বিমূঢ় হইয়া পড়েন যে, সব কিছুকেই নিজের বলিয়া মনে করেন।[৩১]

কল্পিত মহদাদি তত্ত্বগুলি প্রকৃতিতে লয় হইলে যেমন একমাত্র প্রকৃতিই অবশিষ্ট থাকেন, সেইরূপ পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ অক্ষর পুরুষও আপনার স্বরূপ-জ্ঞানের দ্বারা ষড়্‌বিংশ-তত্ত্বতা প্রাপ্ত হন। অবিদ্যার নাশই তাঁহার এই স্বরূপ-জ্ঞানের হেতু। বাস্তবিক পক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সাক্ষী এবং নির্গুণ। প্রকৃতির সান্নিধ্যেই তাঁহার বন্ধন। প্রকৃতি হইতে আপনার পৃথকৃত্ব বুঝিতে পারিলেই তিনি বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হন। অবিদ্যা যখন পুরুষের নিকট ধরা পড়ে, তখন পুরুষ নিজেই নিজের পূর্ব্ব-অজ্ঞানতার জন্য অতিশয় লজ্জিত হইয়া উঠেন। পুরুষের সেই সময়কার নানাবিধ খেদোক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।[৩২] প্রকৃতি অপ্রতিবুদ্ধ, অর্থাৎ জড়স্বভাব। পুরুষ বুধ্যমান, অর্থাৎ আপনার স্বরূপ বুঝিবার মত যোগ্যতা তাঁহার আছে। অবিদ্যানাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বুদ্ধত্বস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ পায়। বুধ্যমানের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি মুক্তিরই নামান্তর।[৩৩]

মুক্তি—প্রকৃতির কাজকে অবিদ্যাবশতঃ পুরুষ তাঁহার নিজের কাজ বলিয়া মনে করেন। এই কর্ত্তৃত্বের অভিমান চলিয়া গেলেই মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা কিংবা কপিলসূত্রের মুক্তির সহিত মহাভারতের সাংখ্যীয় মুক্তির সম্পূর্ণ মিল নাই। কাপিল সাংখ্যের মতে পুরুষ ও বুদ্ধি—এই দুই-এর ঔদাসীন্য, অসম্বন্ধ বা পৃথক্‌ভাবে অবস্থানকে মুক্তি কহে। অথবা কেবল পুরুষের ঔদাসীন্যকেও অপবর্গ বলা হয়। মুক্তি পুরুষের নিত্যসিদ্ধ বস্তু, অবিবেকের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় মুক্ত আত্মাতে সুখদুঃখাদির অভিমান জন্মে, তাহাই বন্ধন। বন্ধন মুক্ত হইলেই মুক্তির স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাই সূত্রকার বলিয়াছেন 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ'। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই তন্মতে মুক্তি-পদার্থ। মহাভারত বলিতেছেন,

৩১ তদেব ষোড়শকলং দেহমব্যক্তসংজ্ঞকম্।
মমায়মিতি মন্বানস্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে॥ ইত্যাদি। শা ৩০৪।৮-১১

৩২ গুণা গুণেষু লীয়ন্তে তদৈকা প্রকৃতির্ভবেৎ
ক্ষেত্রজ্ঞোঽপি যদা তাত তৎক্ষেত্রে সম্প্রলীয়তে॥ ইত্যাদি। শা ৩০৭।১৬-৪২

৩৩ বুদ্ধশ্চোক্তো যথাতত্ত্বং ময়া শ্রুতিনিদর্শনাৎ। শা ৩১৮।৮১
যদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি।
তদা স সর্ব্ববিদ্ বিদ্বান্ ন পুনর্জ্জন্ম বিন্দতি। ইত্যাদি। শা ৩১৮।৮০। শা ৩০৪।৭

ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য এবং প্রকৃতিরূপ কারণকে জীব ভিন্ন অপর পদার্থরূপে জানিয়া অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক নির্দ্বন্দ্ব নারায়ণে প্রবিষ্ট হওয়া অর্থাৎ আপনাকে পরমব্রহ্মের সহিত এক বলিয়া জ্ঞান করা মুক্তির লক্ষণ।[৩৪]

সৃষ্টি অথবা অপবর্গের নিমিত্ত সাংখ্যসূত্রাদিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের কোন উপযোগিতা অনুভূত হয় নাই। কিন্তু মহাভারতীয় সাংখ্যবিচারে সৃষ্টিতত্ত্বপ্রসঙ্গে এবং মুক্তির বেলায় তাঁহার নাম গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতীয় মুক্তি ঈশ্বরনিরপেক্ষ না হওয়ায় বৈদান্তিক মুক্তির প্রায় কাছাকাছি। বেদান্তের মুক্তি নিত্যপদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ, আর মহাভারতীয় সাংখ্যের মুক্তিও নিত্যস্বরূপ। ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হইলে জীব আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারেন, তারপর ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়।[৩৫] জীবন্মুক্তি এবং বিদেহ-কৈবল্যমুক্তি—এই দুইপ্রকার সাংখ্যীয় মুক্তি মহাভারতেরও অভিপ্রেত। অবিদ্যার নাশ হইলেও তাহার কার্য্য দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির তৎক্ষণাৎ বিলোপ হয় না, সুতরাং মুক্ত জীবকেও কিছুক্ষণ সংসারে থাকিতে হয়, সেই অবস্থাই জীবন্মুক্তি।[৩৬]

মহাভারতীয় সাংখ্যের বৈশিষ্ট্য—বশিষ্ঠ এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট সাংখ্যবিদ্যা কপিলের সাংখ্যবিদ্যার সহিত সর্ব্বাংশে এক নহে। পুরুষের একত্ব, এবং বুধ্যমান পুরুষের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত শুধু মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারত বলিতেছেন, সাংখ্যদর্শনে চিদাত্মা পরব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চের লয়ের উপদেশ পাওয়া যায়। সাংখ্যশব্দের অর্থ—জ্ঞান। সাংখ্য অমূর্ত্ত পুরুষের মূর্ত্তি। জীব এবং পরমব্রহ্ম ব্যতীত চব্বিশটি তত্ত্ব সাংখ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।[৩৭]

প্রকৃতির সৃষ্টিরূপে পরিণামের আসল কারণ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। ঈশ্বরের

৩৪ প্রকৃতিং চাপ্যতিক্রম্য গচ্ছত্যাত্মানমব্যয়ম্।
পরং নারায়ণাত্মানং নির্দ্বন্দ্বং প্রকৃতেঃ পরম্। ইত্যাদি। শা ৩৭১।৯৬, ৯৭

৩৫ সোঽয়মেবং বিমুচ্যেত নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ।
পরশ্চ পরধর্ম্মা চ ভবত্যেব সমেত্য বৈ॥ ইত্যাদি। শা ৩০৮।২৬,৩০। শা ৩০১ তম অঃ।

৩৬ গুণা গুণবতঃ সন্তি নির্গুণস্য কুতো গুণাঃ।
তস্মাদেবং বিজানন্তি যে জনা গুণদর্শিনঃ॥ শা ৩০৫।২৯

৩৭ অমূর্ত্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্ত্তিরিতি শ্রুতিঃ। শা ৩০১।১০৬
সাংখ্যদর্শনমেতাবৎ পরিসংখ্যানুদর্শনম্। ইত্যাদি শা ৩০৬।৪২, ৪৩

ইচ্ছাতেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে এবং প্রকৃতি পরিণত হয়। ইহাই গীতার মতে প্রকৃতির গর্ভাধান। ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন। প্রকৃতি জগতের জননীস্বরূপা এবং ঈশ্বরই পিতৃস্বরূপ।[৩৮] সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু মহাভারতের মত অন্যরূপ। মহাভারত এই পরিণামের মূলেও ঈশ্বরকেই স্বীকার করেন।[৩৯]

তত্ত্বসমাস কিংবা সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। প্রবচন-সূত্রে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু সৃষ্টি বা মুক্তির কারণরূপে তিনি স্থান পান নাই। বাচস্পতি মিশ্র, মাধবাচার্য্য প্রমুখ মনীষীদের মতে কাপিল-দর্শন নিরীশ্বর, কিন্তু মহাভারতের সাংখ্যজ্ঞান ঈশ্বরের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা ও সংহারক। মহাভারতের মতে ঈশ্বরেরই অপরা প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত প্রধান এবং পরা প্রকৃতিই পুরুষ। পুরুষ ও প্রকৃতি বস্তুতঃ ঈশ্বরেরই অবস্থান্তর মাত্র। জীব বা পুরুষ যখন পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ অবগত হন, তখনই ইন্দ্রজালের মত সমস্ত তত্ত্বের অযথার্থতা তাঁহার নিকট ধরা পড়ে। সেই অবস্থায় ষড়্‌বিংশ-তত্ত্বরূপ পরম ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদবুদ্ধি জাগ্রত হয়। ষড়্‌বিংশ তত্ত্বের কখনও কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। ইহা সনাতন সত্যস্বরূপ।[৪০] কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ ঈশ্বরপরতন্ত্র। অপরা প্রকৃতিকে ক্ষর-পুরুষ এবং পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জীবকে অক্ষর-পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞও বলা হয়।[৪১]

মহাভারতীয় সাংখ্যবিদ্যা বেদান্তবিদ্যার খুব কাছাকাছি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়, মহর্ষি কপিলের এই অভিমতের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের সাংখ্যের প্রভেদ এই যে, জ্ঞানের সহিত ভগবানে আত্মসমর্পণরূপ ভক্তিকেও সহকারী কারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।[৪২]

---

৩৮. মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। ইত্যাদি। ভী ৩৮।৩, ৪

৩৯ যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী। ভী ৩৯।৪

৪০ ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

* * * * * *

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ভী ৩১।৪-৭

স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ। শা ৩০১।১১৫

পঞ্চবিংশতিনিষ্ঠোঽয়ং যদা সম্যক্ প্রবর্ত্ততে। ইত্যাদি। শা ৩০৫।৩৭-৩৯

৪১. দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ইত্যাদি। ভী ৩৯।১৬-১৮

৪২. জ্ঞানান্মোক্ষো জায়তে রাজসিংহ। ইত্যাদি। শা ৩১৮।৮৭, অশ্ব ৩৫।৫০

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ভী ৪২।৫৫

বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের নানামুখী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাংখ্যবিদ্যায় স্থান পাইয়াছে। সাংখ্যকে জ্ঞানকাণ্ডও বলা হয়।[৪৩] মহাভারতে বর্ণিতা প্রকৃতি পুরুষোত্তমের লীলার সহায়কমাত্র, প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য মহাভারত স্বীকার করেন না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে। আমিই আপন প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতেছি"।[৪৪] ষড়্বিংশ তত্ত্ব অথবা পুরুষোত্তমরূপে মহাভারতের সাংখ্যবিদ্যায় ঈশ্বরের স্থান সর্ব্বোপরি। শুধু ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির স্বরূপ জানাই পুরুষ বা জীবের পক্ষে বড় সত্য নহে, পুরুষোত্তম ও পুরুষের অভেদ-জ্ঞানই পুরুষের চরম লক্ষ্য। এইসকল আলোচনা হইতে বুঝা যায়, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত না হইলে সাংখ্য ও অদ্বৈতবেদান্তের কোন পার্থক্য থাকিত না।[৪৫]

সাংখ্য ও যোগের একত্ব—যোগদর্শন বলিতে ভগবান্ পতঞ্জলির প্রকাশিত যোগসূত্রকেই আমরা বুঝিয়া থাকি। সমাধি, সাধন, বিভূতি ও কৈবল্য-পাদে যোগবিদ্যা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ প্রভৃতি উপনিষদেও যোগমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতিসিদ্ধ নিদিধ্যাসনই যোগ বা চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায়। যোগবিদ্যাও অনেকাংশে সাংখ্যবিদ্যারই সমান। সাংখ্যীয় পদার্থগুলি যোগেও স্বীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলি এই কথা আপন মুখে কোথাও প্রকাশ করেন নাই। কপিলের সাংখ্যদর্শনকে যাঁহারা নিরীশ্বরবাদ বলেন, তাঁহারা যোগদর্শনকে সেশ্বর-সাংখ্য নামে অভিহিত করেন। মহাভারতের মতে তাহা নহে। কারণ মহাভারতীয় সাংখ্যেও পুরুষোত্তমরূপে ঈশ্বরকে সকলের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্য ও যোগ একই, একই উদ্দেশ্যে উভয়ের উপদেশ।[৪৬] বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, সাংখ্য ও যোগ উভয় শাস্ত্রই আমি বিবৃত করিলাম। উভয়ের সাধনপ্রণালী ও কৈবল্যরূপ চরম ফল একই। তথাপি দুই শাস্ত্র উপদেশের প্রয়োজন এই যে, যাঁহারা আত্মতত্ত্ব শ্রবণের পরেই উপাসনায় মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের অর্থ বিচার না করিয়াই যোগের অনুষ্ঠান

৪৩ সাংখ্যযোগবিধিশব্দৈঃ ক্রমেণ জ্ঞানোপাস্তিকর্ম্মকাণ্ডার্থা জ্ঞেয়াঃ। শা ৩২০।২৫, নীলকণ্ঠ।

৪৪ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ইত্যাদি। ভী ৩৩।৮, ৬। ভী ৩৪।৮

৪৫ তন্ত্রং শাস্ত্রং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা ব্রবীমি, সর্ব্বং বিশ্বং ব্রহ্ম চৈতৎ সমস্তম্। শা ৩১৮।৮৯

৪৬ সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। ইত্যাদি। ভী ২৯।৪,৫। শা ৩০৫।১৯

করিয়া থাকেন। যোগের জ্ঞান তাঁহাদের কাছে গৌণ, সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনাই প্রধান। আর যাঁহারা উপাসনা করেন নাই, শুধু আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপাসনা-সম্পাদনের নিমিত্ত যৌগিক প্রণালীই মুখ্য-ভাবে অবলম্বনীয়, সাংখ্য-বিদ্যা তাঁহাদের নিকট গৌণ। এই কারণে উভয়েরই প্রয়োজন আছে।[৪৭] যোগানুষ্ঠানের ফল ক্রমে ক্রমে অনুভব করা যায়, এই কারণে যোগশাস্ত্র প্রত্যক্ষ। সাংখ্যজ্ঞান শাস্ত্রগম্য, স্বল্পানুষ্ঠানে কিছুই ধরা পড়ে না। সাংখ্যজ্ঞানের সহিত যৌগিক অনুষ্ঠানের মিলন হইলে শীঘ্র শীঘ্র পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। সাংখ্যজ্ঞানের সহিত মিলিত হইলে যোগের শক্তি বৃদ্ধি পায়।[৪৮]

যোগ শব্দের অর্থ—পতঞ্জলি বলিয়াছেন, চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। মহাভারতকার বলেন, ঈশ্বরের সহিত মিলন এবং সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তার উপলব্ধিকে যোগ বলে। উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা হইতেও যোগবিদ্যা পৃথক্ নহে। এইকারণেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে উপনিষৎ, ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্র বলা হয়।[৪৯]

যোগের মহিমা—মহাভারতে যোগের প্রশংসা খুব বেশী। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "যোগী পুরুষ তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও"। রাজর্ষি অলর্কের গাথাতেও বলা হইয়াছে, "যোগ হইতে পরম সুখ আর কিছুতেই নাই"।[৫০]

তপোমহিমা—ঈশ্বরের সহিত যোগসাধনের নিমিত্ত যে-সকল পথ অবলম্বন করা হয়, তাহারও নাম যোগ। এইকারণে তপস্যাকেও যোগনামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তপস্যা ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তপোবলে যে-কোন কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে। তপস্যা বা যোগসাধন, সমস্তই নির্ভর করে মনের স্থিরতার উপর। এইনিমিত্ত চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য মনঃস্থৈর্য্যের উপায়। অসংযত পুরুষের যোগসাধনা

৪৭. সাংখ্যযোগৌ ময়া প্রোক্তৌ শাস্ত্রদ্বয়নিদর্শনাৎ।
যদেব শাস্ত্রং সাংখ্যোক্তং যোগদর্শনমেব তৎ ॥ ইত্যাদি। শা ৩০৭।৪৪-৪৮। শা ৩০০।৭

৪৮. তুল্যং শৌচং তপোযুক্তং দয়া ভূতেষু চানঘ। ইত্যাদি। শা ৩০০।৯-১১

৪৯. যোগ এষ হি যোগানাং কিমন্যদ্ যোগলক্ষণম্। ইত্যাদি। শা ৩০৬।২৫

৫০. তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ইত্যাদি। ভী ৩০।৪৬। অশ্ব ৩০।৩১

হইতে পারে না বলিয়া সংযমের দ্বারা প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়কে বশ করিতে হয়। বশ্যেন্দ্রিয় পুরুষের কোন কাজই কঠিন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তপস্যায় মনোনিবেশ করা যোগবিদ্যার উপদেশ।[৫১] তপস্যা এবং যোগানুষ্ঠান যে একই, তাহা সনৎসুজাতীয়-প্রকরণ হইতে বিশেষরূপে জানা যায়। সনৎকুমার বলিয়াছেন, তপস্যা যদি অনুরাগাদি কল্মষ-বর্জ্জিত হয়, তবে সেই বিশুদ্ধ তপস্যাই সমৃদ্ধ অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তির পরম সহায় হইয়া থাকে। জগতে ভোগ্য বস্তুর উপভোগও তপঃসাপেক্ষ। অমৃতত্ব-লাভ তপস্যার অধীন। কাম-ক্রোধাদি জয় করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত তপস্যা করিলে সেই তপস্যা শুদ্ধতর ও বীর্য্যবত্তর হয় এবং সাধকের কৈবল্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।[৫২] তপস্যার মত যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানেও সকল অশ্রেয়ঃ বা অকল্যাণ দূরীভূত হয়। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যাই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড় অকল্যাণ। তাহার নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কৈবল্য-মুক্তি সম্ভবপর হয় না। অষ্টাঙ্গ রাজযোগ যথারীতি অবলম্বিত হইলে তাহা হইতে যে তেজঃপ্রকর্ষ উদ্ভূত হয়, সেই তেজঃপ্রভাবে অবিদ্যা বিদূরিত হয়। তপস্বী না হইলে যোগসিদ্ধি হয় না। অনাদিকাল হইতে বিষয়বাসনায় মানুষের চিত্ত কলুষিত। তপস্যা ব্যতীত বাসনার ক্ষয় হয় না, আর যতদিন বাসনার প্রভাব থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যোগের আশা নাই। কাজেই বাসনার বিনাশের নিমিত্ত তপস্যার আবশ্যকতা আছে।[৫৩]

মহাভারতের যোগবিদ্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সাধন-পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয়তঃ বিভূতি-পরিচ্ছেদ, তৃতীয়তঃ কৈবল্য-পরিচ্ছেদ। সমাধিপাদের বিষয়গুলি সাধনেরই অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। পাতঞ্জলসূত্রের বাঙ্গালা-ব্যাখ্যার ভূমিকায় ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় যোগশব্দের সতের-প্রকার প্রচলিত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কৈবল্য-

৫১ তপসা প্রাপ্যতে স্বর্গস্তপসা প্রাপ্যতে যশঃ। ইত্যাদি। অনু ৫৭।৮-১০।
অনু ১১৮।২। শা ২০০।২৩
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ভী ৩০।৩৬

৫২ নিষ্কল্মষং তপস্ত্বেতৎ কেবলং পরিচক্ষতে।
এতৎ সমৃদ্ধমপ্যৃদ্ধং তপো ভবতি কেবলম্॥ ইত্যাদি। উ ৪৩।১২,১৩,৩৯

৫৩ অষ্টাঙ্গাং বুদ্ধিমাহুর্যাং সর্ব্বাশ্রেয়োবিঘাতিনীম্। ইত্যাদি। বন ২।১৮

মুক্তিরূপ মহাভারতীয় অর্থটিকে তিনিও যেন গ্রহণ করেন নাই। চতুর্দ্দশ লক্ষণে 'আত্মায় আত্মায় সংযোগের নাম যোগ'—এইমাত্র বলিয়াছেন।

সাধন-পরিচ্ছেদ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ধ্যানযোগের বিস্তৃত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আসন-প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগের কথাই বলা হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন। শ্রীভগবান্ সন্ন্যাস ও যোগের অভেদ প্রদর্শন করিয়া যোগমার্গেও ত্যাগের আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। নিত্যনূতন বাসনার উদয়ে চিত্ত ভারাক্রান্ত হইলে যোগসাধন চলিতে পারে না।[৫৪]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে তিনপ্রকার যোগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটি প্রধান বিষয়ে তত্ত্বনির্দ্ধারণই গীতার মুখ্য বিষয়। তিন অধ্যায়ে এই তিনটি বর্ণিত হইলেও নানা কথার প্রসঙ্গে সমস্ত গীতা জুড়িয়াই এই যোগত্রয়ের বর্ণনা।

জ্ঞানযোগ—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'দ্রব্যময় যজ্ঞাদি হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানেই সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি।[৫৫] আত্মজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত মানুষের সকল ব্যাকুলতা। জ্ঞানের চরম সার্থকতাও সেইখানে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করিয়া ফেলে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও সেইরূপ সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে।[৫৬] তপস্যা, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কিছুই জ্ঞানযোগের মত চিত্তশুদ্ধিকর নহে। বহুকাল কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে সহজেই সেই বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মতত্ত্ব প্রতিফলিত হয়। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এবং ভক্তিযোগ এই উভয়ই জ্ঞানযোগের পরিপূরক। আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি গুরূপদিষ্ট পথে অগ্রসর হইলে নিশ্চিতই সেই পরম তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারেন। কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্য দিয়া জ্ঞানযোগ যখন দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, তখন যোগী পুরুষ ইচ্ছা করিলেই সুসংযত চিত্তকে পরমাত্মাভিমুখী করিতে পারেন। কূর্ম্ম যেমন ইচ্ছা করিলে

৫৪ যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। ইত্যাদি। ভী ৩০।১০-১৪
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব। ইত্যাদি। ভী ৩০।২

৫৫ শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। ভী ২৮।৩৩

৫৬ যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। ইত্যাদি। ভী ২৮।৩৭-৩৯

আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইতে পারে, যোগী পুরুষও ঠিক সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে অনায়াসে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তখন তাঁহার জ্ঞান একমাত্র পরমেশ্বরে স্থিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৫৭] এইপ্রকার জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং ইন্দ্রিয়সংযমের আবশ্যক। শ্রদ্ধা ও সংযম শুধু চাহিলেই হয় না, যথোচিত সাধনার দ্বারা এই দুইটি লাভ করিতে হয়। সেই সাধনা হইতেছে— সভক্তি কর্ম্মযোগ।

কর্ম্মযোগ—কর্ম্মকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দণ্ডকমণ্ডলু বা কৌপীন-ধারণ মহাভারতের উপদেশ নহে। কর্ম্ম না করিয়া কেহ একমুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না, মানুষ স্বভাবতঃই কর্ম্ম করিয়া থাকে। কর্ম্মেই মানুষের পরিচয়। আরও বলা হইয়াছে যে, মানুষ কাজের দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে।[৫৯] মহাভারতকার কর্ম্ম শব্দ দ্বারা কি বুঝাইতে চান, তাহাও গীতাতে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। মানুষ যদিও প্রতি মুহূর্ত্তেই কর্ম্ম করিয়া চলিতেছে, তথাপি তাহা কর্ম্ম না-ও হইতে পারে। আমাদের সমস্ত কৃত্য—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই তিনভাগে বিভক্ত। এই তিনটিরই তত্ত্ব জানা প্রয়োজন। কর্ম্ম শব্দে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ বলা হইয়াছে যে, কার্য্য ও অকার্য্য স্থির করিতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ, শাস্ত্রের বিধান জ্ঞাত হইয়া কর্ম্ম করা উচিত। শাস্ত্রবিধান পরিত্যাগ করিয়া যিনি যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সেই কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান, শান্তি কিংবা মোক্ষের অনুকূল হয় না।[৬০] সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করার নাম 'অকর্ম্ম', আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মের নাম 'বিকর্ম্ম'। কর্ম্মকেই চরম বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিতে কর্ম্ম একটি উপায়মাত্র। কর্ম্ম

৫৭ যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ভী ২৬।৫৮

৫৮ শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। ভী ২৮।৩৯

৫৯ ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। ভী ২৭।৫
মনুষ্যাঃ কর্ম্মলক্ষণাঃ। ইত্যাদি। অশ্ব ৪৩।২১। অনু ৪৮।৪৯

৬০ যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ইত্যাদি। ভী ৪০।২৩,২৪

চিত্তের স্থিরতা-সাধনে প্রধান সহায়।[৬১] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূলে এই কর্ম্ম-প্রেরণা। যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পরেই অর্জ্জুনের বিষাদ উপস্থিত হইল। জ্ঞাতি, বান্ধব ও সুহৃদ্গণকে বধ করিয়া রাজ্য ভোগ করিতে হইবে, তদপেক্ষা অন্যায় আর কি হইতে পারে? অর্জ্জুন অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে প্রকৃত পথে চালাইবার নিমিত্ত, তাঁহার অজ্ঞানসম্মোহ নাশের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের এমনই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, যাহা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়।

গীতার ভাষায়, বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ একপ্রকার ক্লৈব্য এবং হৃদয়দৌর্ব্বল্য। কর্ম্মত্যাগে জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়ে। জ্ঞানভূমিতে অনারূঢ় পুরুষ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মকেই আশ্রয় করিবেন।[৬২] কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান জন্মিতে পারে না। নিষ্কাম অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধীকৃত না হইলে কেবলমাত্র সন্ন্যাসের দ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে না। ফলাভিলাষরহিত পুরুষ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম্মরূপ যোগের অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার সেই যোগই বীর্য্যবত্তর। ঈশ্বরে সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে কর্ম্ম বিশুদ্ধ হইবে, কর্ম্মত্যাগের দ্বারা কর্ম্মের শুদ্ধি হয় না। অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গেলেই প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস হয়, ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগ।[৬৩] যে-ব্যক্তির পক্ষে যাহা কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই তাঁহার পালনীয়। শ্রদ্ধার সহিত সেই ধর্ম্ম পালনের উদ্দেশ্যে যিনি কর্ম্মের ফলে আসক্তি না রাখিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই যোগী। গীতায়, সনৎসুজাতীয়ে, বন-পর্ব্বের ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যানে এবং শান্তিপর্ব্বের তুলাধারজাজলিসংবাদে এই বিশুদ্ধ কর্ম্মযোগের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। গীতা বলেন, যাহা কিছু করিবে, তাহাই ঈশ্বরে সমর্পণ কর। এইভাবে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম

৬১ কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ভী ২৮।১৭
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। ভী ৩০।৩

৬২ কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। ভী ২৭।৩

৬৩ যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ইত্যাদি। ২৬।৪৮, ৪৭। ভী ৬।১

করিতে পারিলে সেই যোগীর পাপ-পুণ্যের বন্ধন থাকিতে পারে না।[৬৪] অনাসক্ত কর্ম্মযোগের অভ্যাস করিয়া কর্ম্মবন্ধনের সুদৃঢ় পাশ হইতে মুক্তিলাভ করা যোগের প্রাথমিক সোপান। স্নান, ভোজন, নিদ্রা প্রভৃতিতে যত কৃচ্ছ্রাচার অভ্যাস করা যায়, ততই যোগ-সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায়, এইরূপ একটি ভাব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। মহাভারতেও অর্জ্জুনের কঠোর তপস্যা (বন), অম্বার তপস্যা (উদ্যোগ), সূর্য্যকিরণমাত্র-সেবী বালখিল্য-মুনিগণের কঠোর তপস্যা (আদি ৩০), এইসকল কৃচ্ছ্রসাধনের উদাহরণ দেখিয়া স্বভাবতঃ সেই ধারণাই পুষ্টি লাভ করে। কিন্তু এইগুলির উদ্দেশ্য অন্যরূপ। কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইতে গেলে অনেক কিছু সহ্য করিতে হয়, এই উপদেশটিই বোধ করি, ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। কষ্টসাধ্য সাধনার বিপরীত উপদেশই গীতাতে আছে। শরীরপীড়ন যে ঐহিক ধর্ম্মভাব-বৃদ্ধির কিংবা পারলৌকিক কল্যাণের হেতু, এরূপ কোন উপদেশ কোথাও নাই। গীতা বলিয়াছেন, জোর করিয়া শরীর বা ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু অভিলাষ ত নিবৃত্ত হয় না। বিষয়বাসনার নিবৃত্তি না হইলে বাহ্যিক নিবৃত্তিরূপ মিথ্যাচার অতিশয় ভণ্ডামি। একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বাসনা জয় করিতে পারেন। চিত্তজয়ই লক্ষ্য হওয়া উচিত, শরীর-নিগ্রহ পাপের মধ্যে গণ্য। উপবাস, ব্রত প্রভৃতির দ্বারা শরীরকে ক্ষয় করা ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না, ইন্দ্রিয়বিজয় অন্য বস্তু। যাঁহারা শরীরের পীড়ন করিয়া ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চান, তাঁহাদিগকে বলে 'আসুরনিশ্চয়'। গীতায় ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, "এইরূপ আসুরনিশ্চয় ব্যক্তিগণ শরীরমধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমাকেও কষ্ট দিয়া থাকে"।[৬৫]

শরীরের পীড়ন অধর্ম্ম, ইহা যোগেরও প্রতিকূল, কিন্তু অতিরিক্ত ভোজন,

৬৪ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ভী ৩৩।২৭
বিমুক্তাত্মা তথা যোগী গুণদোষৈর্ন লিপ্যতে॥ শা ২৪৭।১৭

৬৫ বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ভী ২৬।৫৯
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ভী ৪১।৬

অনিয়মিত ভোজন প্রভৃতি আরও অনিষ্টকর। আহার-বিহারাদিতে বিশেষ সংযত থাকা চাই। মিতাচার ও মিতাহার কর্ম্মযোগীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। অনাহার, অত্যাহার, অতিনিদ্রা, অনিদ্রা প্রভৃতি যোগের অন্তরায়। যুক্তাহার, যুক্তবিহার, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র এবং যুক্তাববোধ পুরুষেরই যোগের দ্বারা দুঃখ নাশ হয়।[৬৬]

উল্লিখিত নিয়মগুলি প্রত্যেক পুরুষেরই পালনীয়। সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই যোগের সহায়। অর্থাৎ এরূপ করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে, কর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ হয় এবং কর্ম্মে আনন্দ পাওয়া যায়। ঈশ্বরে সকল কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাওয়াই প্রকৃত কর্ম্মযোগ। সংযম এবং ধ্যানধারণার ফলে যাঁহার রজোগুণ ক্ষীণ হইয়া যায়, সেই প্রশান্তমনা যোগী অনায়াসে সমাধিসুখ প্রাপ্ত হন। সমাধিসুখ হইতে ব্রহ্মসংস্পর্শ বা ব্রহ্মের সহিত একত্বের অনুভূতি জাগিয়া থাকে। যোগের দ্বারা সমাহিতচিত্ত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী পুরুষ সমস্ত ভূতে আপনাকে এবং আপনাতে নিখিল ভূতজগতের অনুভব করিয়া থাকেন। এইভাবে তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা ও দূরদৃষ্টি এত ব্যাপক হইয়া উঠে যে, তিনি সর্ব্বত্র ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে থাকেন। সর্ব্বভূতে যিনি ভগবৎসত্তা দেখিতে পান, তিনি কর্ম্মত্যাগ করিলেও ভগবানেরই শান্তিশীতল ক্রোড়ে অবস্থান করেন। যে প্রশস্তমনা যোগী সকলের সুখদুঃখকে আপন সুখদুঃখরূপে চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহারই যোগসাধনা ধন্য। কর্ম্মযোগের অনুশীলনে যে-ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারেন না, মধ্যপথেই যাঁহার গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, যোগসংসিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলেও তাঁহার অধোগতি হয় না। কল্যাণ কর্ম্মে রত পুরুষ কখনও দুর্গতিতে পড়েন না। শুভকর্ম্মকারী যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যকৃৎ ব্যক্তিদের মত স্বর্গসুখাদি উপভোগের পর শুচি শ্রীমন্ত পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। দীর্ঘকাল যোগাভ্যাসের পর যোগভ্রষ্ট হইলে জন্মান্তরে তিনি ধীমান্ যোগনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষের বংশেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এইপ্রকার জন্ম জগতে অতি দুর্লভ। যাঁহারা অসাধারণ কর্ম্মী, আমরা তাঁহাদিগকে যোগভ্রষ্ট-নামে অভিহিত করিয়া থাকি। উল্লিখিত দুইপ্রকার যোগভ্রষ্ট পুরুষই জন্মান্তরীয় বুদ্ধিবৈভবের অধিকারী হইয়া মর্ত্ত্যলোককে কৃতার্থ

৬৬ নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ। ইত্যাদি। ভী ৩০।১৬, ১৭

করিয়া থাকেন। তাঁহারা মুক্তির নিমিত্ত পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া থাকেন। জন্মান্তরীয় অভ্যাসবশে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি স্বভাবতঃই ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়। বেদোক্ত কর্ম্মফল তাঁহাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না। যে যোগী জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, তিনি যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্থিরচিত্ততা লাভের নিমিত্ত সাধনার বিশেষ প্রয়োজন। গুরূপদিষ্ট পথে ধ্যান, ধারণা, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির অনুশীলনে মনকে বশীভূত করা যাইতে পারে। ক্রমিক অগ্রগতির ফলে সাধক সমাধিরূপ একান্ত-স্থিরতা প্রাপ্ত হন। সেই অবস্থায় যে-প্রকার আনন্দ তাঁহার অন্তরে উপস্থিত হয়, তাহা অবর্ণনীয়। ধ্যানযোগের চরম ফলও কৈবল্যপ্রাপ্তি। এই বিষয়ে সময়ের কোন স্থিরতা নাই। কে কত দিনে সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাহা বলা যায় না। সিদ্ধি সাধকের শ্রমসাপেক্ষ।[৬৭]

দারুদ্বয়ের মন্থনের পর তদন্তর্গত অগ্নির প্রাদুর্ভাব হয়। যদিও দারুতেই অগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তথাপি তাহার প্রকাশনের নিমিত্ত মন্থনের আবশ্যক। আমাদের দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাও অবিদ্যাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইতে পারেন না। বুদ্ধির মলিনতা-নাশের নিমিত্ত যৌগিক কতকগুলি উপায়কে অবলম্বন করিতে হয়। যোগের দ্বারা বুদ্ধি বিমল হইলে আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুদ্ধিতেই প্রকাশ পায়। যৌগিক অবান্তর উপায়ের ইহাই চরম উদ্দেশ্য।[৬৮] লোহা এবং সোণা একত্র মিশিয়া থাকিলে সোণার স্বভাবিক উজ্জ্বলতা প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা এবং বুদ্ধিবৃত্তি এরূপভাবে মিশিয়া থাকে যে, বুদ্ধির বিশুদ্ধ স্বরূপ নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, তাহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশের নিমিত্ত যোগ-সাধনার প্রয়োজন।[৬৯] ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি সাধনার কথা মোক্ষধর্ম্মের

---

৬৭ শা ১৯৫ তম অঃ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোগশাস্ত্রমনুত্তমম্।
যুঞ্জতঃ সিদ্ধমাত্মানং যথা পশ্যন্তি যোগিনঃ॥ ইত্যাদি। অশ্ব ১৯।১৫-৩৭

৬৮ অগ্নির্যথা হ্যুপায়েন মথিত্বা দারু দৃশ্যতে।
তথৈবাত্মা শরীরস্থো যোগেনৈবাত্র দৃশ্যতে॥ শা ২১০।৪২

৬৯ লোহযুক্তং যথা হেম বিপক্বং ন বিরাজতে।
তথা পক্বকষায়াখ্যং বিজ্ঞানং ন প্রকাশতে॥ শা ২১২।৬

শুকানুপ্রশ্নে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে যোগসূত্রের অনুমোদিত। চিত্তবৃত্তির নিরোধে ক্রমশঃ অজ্ঞানরাশি বিলুপ্ত হয় এবং যোগীর চিত্তে অভূতপূর্ব্ব প্রসাদ ও দীপ্তি উপস্থিত হয়, তাহার বলেই তিনি দ্বন্দ্বরহিত হইয়া পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।[৭০]

বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের একতানতা যোগের প্রাথমিক সোপান। শুচি, শ্রদ্ধালু-পুরুষ গুরু হইতে যোগতত্ত্ব অবগত হইবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় এবং অতিনিদ্রা, এই পাঁচটি যৌগিক সাধনার পরম শত্রু। যোগসেবক পুরুষ শমের দ্বারা ক্রোধকে, সঙ্কল্পবর্জ্জন করিয়া কামকে এবং বিষয়বস্তুর স্বরূপনির্ণয়ের চিন্তা দ্বারা নিদ্রাকে জয় করিবেন। ধৃতি দ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষুর দ্বারা পাণি ও পাদ, মনের দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং কর্ম্মের দ্বারা মন ও বাক্যকে সংযত করিবেন। অপ্রমাদের দ্বারা ভয়, ত্যাগের দ্বারা লোভ এবং প্রাজ্ঞসেবনের দ্বারা দম্ভকে পরিহার করিবেন।[৭১] অসৎ পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই। ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, দান, সত্যবচন, হ্রী, আর্জ্জব, ক্ষমা, শৌচ, আচার, সংশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি তেজোবর্দ্ধক এবং পাপনাশক। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যোগী কাম ও ক্রোধকে জয় করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। গভীর রাত্রি সাধনার উপযুক্ত সময়। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করিয়া মনের সহিত বুদ্ধিতে লীন করিয়া পরম পুরুষের চিন্তা করিতে হইবে। একান্তভাবে ভগবচ্চরণে মন-প্রাণ সমর্পণ করাকেই যোগ বলে। যে-সকল উপায়ের দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে স্থির করা যায়, সেইসকল উপায় শিক্ষা করাও সাধনার প্রথম সোপান। গিরিগুহা, দেবতায়তন এবং শূন্য গৃহে স্থিরচিত্তে বাস করিতে হইবে। নির্জ্জনতা যোগাভ্যাসের পক্ষে পরম উপযোগী। নিষ্ঠার সহিত ছয়মাস কাল যোগাভ্যাস করিলেই তাহার ফল উপলব্ধি করা যায়। স্ত্রীলোক এবং শূদ্রও যোগাভ্যাসে অধিকারী। সশ্রদ্ধভাবে যিনিই গুরুর নিকট উপস্থিত হউন না কেন, তিনিই এই সাধনায় অগ্রসর হইতে পারেন। যোগের চরম ফল— কৈবল্যপ্রাপ্তি, ইহা শ্রুতি-স্মৃতিতে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে।[৭২] নিন্দা এবং প্রশংসা মানুষের ধীরতা বিনাশ করে, বিশেষতঃ যোগমার্গে গমনেচ্ছু পুরুষ

৭০ শা ২৩৫ তম অঃ।

৭১ শা ২৩৯ তম অঃ। শা ২৭৩ তম অঃ। বন ২১০ তম অঃ।
নাহং শক্যোঽনুপায়েন হন্তুং ভূতেন কেনচিৎ। ইত্যাদি। অশ্ব ১৩।১২-১৯

৭২ শা ২৩৯ তম অঃ। শা ২৫২ তম অঃ। শা ২৭৫ তম অঃ।

অপরের নিন্দা-প্রশংসায় কাণ দিলে আপনার অশেষ অবনতি ঘটাইবেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে এই উভয়ের উপরে উঠিতে হইবে। আহার-বিহারে সংযমের কথা বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে। কণ, পিণ্যাক (তিলের খইল) প্রভৃতি খাদ্য যোগীর পক্ষে হিতকর। স্নেহপদার্থ বর্জ্জনে বলবৃদ্ধি হয়।[৭৩] শাস্ত্রীয় নিয়মে যোগাভ্যাস করিলে সাধক মহাবীর্য্য লাভ করেন, তিনি মর্ত্ত্যজগতের সকলকে অতিক্রম করিয়া সঙ্কল্পমাত্র ভূতজগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। অধিক কি, তিনি নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া আনন্দস্বরূপে অবস্থান করেন।[৭৪] যৌগিক উপায়সমূহের মধ্যে ধ্যানকে শ্রেষ্ঠরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। বাশিষ্ঠ যোগবিধিতে বলা হইয়াছে যে, ধ্যান দুইপ্রকার; ভাবনা ও প্রণিধান। উভয়প্রকার ধ্যানই অবিদ্যাবিজয়ে প্রধান অবলম্বন। মনের একাগ্রতা ধ্যানের সাধারণ লক্ষণ। প্রাণায়াম দ্বিতীয় স্থানীয়। প্রাণায়ামও দ্বিবিধ, সগুণ এবং নির্গুণ। ভাবনা বস্তুতত্ত্বের অপেক্ষা করে না, শালগ্রামে বিষ্ণুর ভাবনা করা যায়; কিন্তু প্রণিধান বস্তুতত্ত্ব-সাপেক্ষ। প্রাণায়ামের সঙ্গে সঙ্গে জপ এবং ধ্যানও চলিতে পারে; এইপ্রকার প্রাণায়ামের নাম সগর্ভ বা সগুণ, আর যে-প্রাণায়াম শুধু প্রাণবায়ুর ক্রিয়া, তাহাকে বলা হয় নির্গুণ। যোগী স্থাণুর মত অকম্প্য এবং গিরির ন্যায় নিশ্চল হইবেন। সকল সময়েই তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে ভগবানের দিকে। পরম পুরুষে লক্ষ্য স্থির হইলে সেই পরম পুরুষই যোগীর অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে পরম জ্যোতির্ম্ময়-স্বরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যোগী তখন বাক্য ও মনের অগোচর অচিন্ত্য অবস্থায় উন্নীত হন। তাহাই প্রকৃত যোগ। যোগীর সাধনের চরিতার্থতা সেইখানেই।[৭৫] নদী, নির্ঝর, নিকুঞ্জ, পর্ব্বতসানু প্রভৃতিতে বাস করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য চিত্তের স্থিরতাসম্পাদন। বন্য জীবজন্তুদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তাহাদের সহিত একত্র বাস করিলে চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। অরণ্য শুধু বৃক্ষলতার সমষ্টি নয়, তাহার

৭৩ কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত।
স্নেহানাং বর্জ্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ইত্যাদি। শা ৩০০।৪৩,৪৪। শা ২৭৭ তম অঃ।

৭৪ কথা চ যেয়ং নৃপতে প্রসক্তা, দেবে মহাবীর্য্যমতৌ শুভেয়ম্।
যোগী স সর্ব্বানভিভূয় মর্ত্ত্যান্নারায়ণাত্মা কুরুতে মহাত্মা ॥ শা ৩০০।৬২

৭৫ শা ৩০৬ তম অঃ।

বিনম্র শান্ত স্নিগ্ধ সম্পদ্ সাধকের আকর্ষণের বস্তু। এইহেতু উমামহেশ্বর-সংবাদে অরণ্যকে গুরুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।[৭৬]

যোগজ বিভূতি—যোগসিদ্ধ ব্যক্তির শরীরের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। ভুক্ত দ্রব্যের স্বাভাবিক পরিণতি যোগিশরীরে বাধা প্রাপ্ত হয়। তীর্থোপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, মঙ্কণক-নামে এক সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। একদা তাঁহার শরীরের এক স্থান কুশাগ্র দ্বারা ক্ষত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, রক্ত ক্ষরণ না হইয়া ক্ষতস্থান হইতে একপ্রকার শাকরস ক্ষরিত হইতেছে। ইহাতে তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। দেহের ক্ষয়বৃদ্ধি না হওয়া একপ্রকার মহতী যোগসিদ্ধি।[৭৭] তাপসের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে না। জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি ভূতজগৎ তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন। তিনি ঐগুলিকে যথেচ্ছরূপে ব্যবহার করিতে পারেন। জলের শীতলতা, অগ্নির উষ্ণতা এবং বায়ুর চঞ্চলতা তাঁহার ইচ্ছামত অন্যভাব ধারণ করিয়া থাকে। প্রাণিসমূহের উপর যোগীর যেরূপ প্রভাব, জড়ের উপরও সেইরূপ প্রভাব।[৭৮] বরের প্রভাবে শ্রেয়ঃসাধন এবং অভিসম্পাতের ফলে অপরের অকল্যাণ-সাধন, এই দুইটির উদাহরণই মহাভারতে প্রচুর। ইহাদের উদ্ভবও যোগজ বিভূতি হইতে। কিন্তু যোগী পুরুষ বর বা অভিসম্পাত প্রদান করিলে তাঁহার মনের শক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। সংযত মনের অমিত শক্তিতেই তাঁহার সকল কথা এবং আকাঙ্ক্ষা সত্যে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু যত্র-তত্র এই বিভূতির মাহাত্ম্য প্রকাশ করা সঙ্গত নহে।[৭৯] যোগবলে অপরের চিন্তিত বিষয় জানিতে পারা যায়। ব্যাসদেব, নারদ, সনৎকুমার প্রমুখ ঋষিগণ অন্যের স্মরণমাত্র উপস্থিত হইয়াছেন, এরূপ উদাহরণ মহাভারতে অসংখ্য। শীঘ্র এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইবার প্রয়োজন হইলে যোগিগণ আকাশমার্গে যাতায়াত করিতে পারেন। নারদ, সনৎকুমার প্রমুখ সিদ্ধ পুরুষদের এইসকল বিভূতি নানাস্থানে

৭৬ বননিত্যৈর্ব্বনচরৈর্ব্বনস্থৈর্ব্বনগোচরৈঃ।
বনং গুরুমিবাসাদ্য বস্তব্যং বনজীবিভিঃ॥ অনু ১৪২।১৩

৭৭ পুরা মঙ্কণকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেণেতি বিশ্রুতম্।
ক্ষতঃ কিল করে রাজংস্তস্য শাকরসোঽস্রবৎ। শল্য ৩৮।৩৯

৭৮ নৈব মৃত্যুরনিষ্টো নো নিঃসৃতানাং গৃহাৎ স্বয়ম্। ইত্যাদি। আশ্র ৩৭।২৭,২৮

৭৯ ন চ তে তপসো নাশমিচ্ছামি তপতাং বর। ইত্যাদি। অশ্ব ৫৩।২৫,২৬

বর্ণিত হইয়াছে। আকাশবাণী বস্তুটাও বোধ হয় আকাশচারী যোগিগণের ভবিষ্যকথন।[৮০]

ইন্দ্রিয়ের সহযোগে আন্তর তেজের দ্বারা অন্যকে অভিভূত করাও একপ্রকার যোগবিভূতি। ব্রহ্মচারিণী সুলভা রাজর্ষি জনকের শক্তিসামর্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহার শরীরে যোগবলে আপন ইন্দ্রিয়-তেজ সঞ্চালিত করেন। তিনি আপনার অন্তঃকরণকে রাজর্ষির অন্তঃকরণে প্রবেশ করাইয়া তাঁহার সমস্ত জ্ঞানগরিমা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সুলভার যোগবিভূতি রাজর্ষির বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।[৮১] বিপুল-নামে একজন ব্রহ্মচারী অজিতেন্দ্রিয়া গুরুপত্নীকে এই যোগের দ্বারা লম্পটের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি গুরুপত্নীর ইন্দ্রিয়গুলিকে আপন তেজস্বিতায় এরূপভাবে শিথিল করিয়া দিলেন যে, গুরুপত্নীর নড়িবারও শক্তি রহিল না।[৮২] বিদুর যোগক্রিয়ায় যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন।[৮৩] যোগবিভূতির প্রভাবে ইচ্ছা করিলে রূপ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। ব্রহ্মচারিণী সুলভা যোগবলে আপনার রূপ পরিত্যাগ করিয়া অনবদ্য রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।[৮৪]

আরও একটি চমৎকার যোগবিভূতির বর্ণনা করা হইয়াছে। সকলের নিকটই ইহা সমধিক বিস্ময়ের বিষয়। ব্যাসদেব যোগবলে কুরুক্ষেত্রে নিহত বীরগণকে পরলোক হইতে আনিয়া ধৃতরাষ্ট্রাদিকে দেখাইয়াছিলেন।[৮৫] তপঃপ্রভাবে মানস পুত্র উৎপাদনের বর্ণনাও দেখিতে পাই।[৮৬] যদিও বলা

---

৮০ বাগুবাচাশরীরিণী। আদি ৭৪।১০৯

৮১ সুলভা ত্বস্য ধর্ম্মেষু মুক্তো নেতি সসংশয়া।
সত্ত্বং সত্ত্বেন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহীপতেঃ। ইত্যাদি। শা ৩২০।১৬-১৮

৮২ নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্যা রশ্মিং সংযোজ্য রশ্মিভিঃ।
বিবেশ বিপুলঃ কায়মাকাশং পবনো যথা॥ অনু ৪০।৫৭

৮৩ ততঃ সোঽনিমিষো ভূত্বা রাজানং তমুদৈক্ষত।
সংযোজ্য বিদুরস্তস্মিন্ দৃষ্টিং দৃষ্ট্যা সমাহিতঃ॥ ইত্যাদি। আশ্র ২৬।২৫-৩০

৮৪ তত্র সা বিপ্রহায়াথ পূর্ব্বরূপং হি যোগতঃ।
অবিভ্রদনবদ্যাঙ্গী রূপমন্যদনুত্তমম্॥ শা ৩২০।১০

৮৫ আশ্র ৩২ শ অঃ।

৮৬ সা তেন সুষুবে দেবী শবেন ভরতর্ষভ। আদি ১২১।৩৬

হইয়াছে যে, মৃত পতি হইতে পুত্রের জন্ম হইয়াছিল, তথাপি তাহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ বলিয়াই মনে হয়।

যোগের চরম ফল লাভ করিতে দীর্ঘকাল তপস্যার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই পথে কিছু অগ্রসর হইলেই সাধকের শক্তিতে নানাপ্রকার বিভূতির সঞ্চার সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। সাধক ইচ্ছা করিলে বহুবিধ যোগশক্তি দেখাইয়া দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিতে পারেন। হঠযোগীরা অনেক সময় সেইসকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যোগমার্গে যাঁহারা অগ্রসর হইতে চান, তাঁহারা যদি সেইসকল বিভূতি প্রকাশ করেন এবং তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া অর্দ্ধপথে যাত্রা সমাপ্ত করেন, তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। সাংসারিক লোকের পক্ষে সেইসকল সিদ্ধির প্রলোভন যদিও কম নহে, তথাপি যোগী সেইরূপ ক্ষুদ্র বিষয়ে বদ্ধ হইবেন কেন? অসমাপ্ত-সাধন অনেক যোগী আপন যোগবিভূতিতে সন্তুষ্টি লাভ করিয়া সেই বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া পড়েন। যোগীর ঐরূপ হঠকারিতা আত্মহত্যার সামিল। আংশিক সিদ্ধিতে নানাপ্রকার যোগবিভূতি আয়ত্ত হইয়া থাকে। স্থান ও কালের ব্যবধান যোগীর প্রত্যক্ষকে বাধা দিতে পারে না।[৮৭]

যুক্ত ও যুঞ্জান যোগী—যোগী দুইরকমের, যুক্ত ও যুঞ্জান। যুক্ত-যোগী নিয়ত আত্মসমাহিত। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই তাঁহার নির্ম্মল অন্তরে প্রতিফলিত হয়। তাঁহার চিত্ত ঈশ্বরের সহিত এরূপভাবে সম্বদ্ধ যে, বাহিরের কোন কোলাহল তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিতে পারে না। খড়্গপাণি পুরুষের তাড়নায় ভীত হইয়া যদি কোন পুরুষ দুই হাতে তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে থাকেন, তখন তৈল রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার যতটুকু স্থিরতা বা সংযত দৃষ্টির প্রয়োজন, যুঞ্জান-যোগীরও কোন বস্তুতে মনঃসংযোগ করিতে ততটুকু স্থিরতার প্রয়োজন। যিনি ধ্যানস্থ হইয়া বস্তুর তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হন, পরন্তু ধ্যান ব্যতীত সর্ব্বদা আত্মস্থ হইতে অভ্যস্ত হন নাই, সেই যোগীকে 'যুঞ্জান' বলা হয়।[৮৮]

যোগীর মৃত্যুভয় নাই—যোগী মৃত্যুভয়ে কদাচ ভীত হন না। জন্মমৃত্যুর গূঢ় রহস্য তাঁহার নিকট অতি স্বচ্ছ। অজ্ঞানতাকেই তিনি যথার্থ

৮৭ অশ্ব ৪২ শ অঃ।

৮৮ শা ৩১৬ তম অঃ। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

মৃত্যু বলিয়া জ্ঞান করেন এবং অজ্ঞানের নিবৃত্তিই তাঁহার দৃষ্টিতে অমৃতত্বপ্রাপ্তি। সনৎকুমারের উপদেশে এই তত্ত্বটি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।[৮৯]

কৈবল্য-পরিচ্ছেদ—উদ্যোগপর্ব্বে সনৎকুমারের উপদেশে যোগবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে উপদেষ্টা ভগবান্ সনৎকুমার এবং শ্রোতা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। যোগবিদ্যাকে সেখানে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। একমাত্র পরমপুরুষকে জানিলেই মানুষ জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, আর কোন পন্থা নাই। সকল বিদ্যা এবং উপাসনার চরম সার্থকতাও সেইখানে। অযোগী পুরুষ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন না। অকৃতাত্মা পুরুষ কিরূপে কৃতাত্মা জনার্দ্দনের তত্ত্ব অবগত হইবেন? যিনি পরম শান্তিস্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে যোগ। ভগবান্ সনৎকুমার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "সনাতন পরম পুরুষকে একমাত্র যোগীরাই জানিতে পারেন"।[৯০] এই জানাই সমস্ত যোগসাধনার পরম উপেয় বা কৈবল্য।

মহাভারতীয় যোগের বৈশিষ্ট্য—ভগবান্ পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন যে, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান অষ্টাঙ্গ যোগের বহিরঙ্গ-নিয়ম। ইহাতে দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরপ্রণিধান পাঁচটি নিয়মের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং ঈশ্বরকে বাদ দিয়াও এইমতে যোগসিদ্ধি হইতে পারে। নানা উপায়ের মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধানও একটি উপায়মাত্র। যোগী যদি ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ করেন, তবে ঈশ্বরের প্রসাদে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয় না, ইহাই পাতঞ্জলের সিদ্ধান্ত। মহাভারতের যোগদর্শনে পাওয়া যাইতেছে, ঈশ্বর বলিতেছেন যে, "আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, এইরূপে একান্তভাবে আমার উপর নির্ভর করিয়া

---

৮৯ প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, তথাঽপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি। ইত্যাদি। উ ৪২।৪-১১
ভূয়ো ভূয়ো জন্মনোঽভ্যাসযোগাদ্ যোগী যোগং সারমার্গং বিচিন্ত্য। ইত্যাদি।
অশ্ব ১৩।১০

৯০ নাকৃতাত্মা কৃতাত্মানং জাতু বিদ্যাজ্জনার্দ্দনম্। ইত্যাদি। উ ৬৯।১৭-২১
আগমাধিগতাদ্ যোগাদ্বশী তত্ত্বে প্রসীদতি। ইত্যাদি। উ ৬৯।২১। উ ৩৬।৫২
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্। উ ৪৬ শ অঃ।

আমাতে আত্মাকে যোগ করিলে আমার সহিত মিলিত হইবে।[৯১] ইহাতে জানা যাইতেছে, যোগের দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যোগী আত্মাকে সমাহিত করিয়া ঈশ্বরে স্থিতিরূপ মুক্তি বা শান্তি লাভ করেন। ইহাই যোগের চরম লক্ষ্য। ঈশ্বরের সহিত জীবের যোগকেই মহাভারতে যোগশব্দে প্রকাশ করা হইয়াছে।[৯২]

পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসা

পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসার একত্ব—মহাভারত হইতে জানা যায়, মীমাংসা-সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি ব্যাসদেবেরই শিষ্য।[১] গুরুর আদেশানুসারে তিনি মীমাংসাসূত্র প্রণয়ন করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড লইয়াই সাধারণতঃ মীমাংসাদর্শনের আলোচনা। মহাভারতে মীমাংসোক্ত প্রমাণ বা বিধি প্রভৃতির কোন আলোচনা নাই, প্রসঙ্গতঃ কতকগুলি যাগযজ্ঞের ফল এবং ইতিকর্ত্তব্যতার উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাভারতের মতে ধর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড পৃথক্ শাস্ত্র নহে, পরন্তু মীমাংসারূপে উভয়ই এক শাস্ত্র। কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল না হইলে জ্ঞানকাণ্ডের উপদেশ ধারণা করা যায় না। শাস্ত্রবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, স্বর্গাদি ফল আনুষঙ্গিকমাত্র। কাম্য কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি কাম্য বস্তুর প্রাপ্তি। যথাযথরূপে বিহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞানের প্রয়োজন। এই হেতু বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের যথেষ্ট সমাদর।[২]

কর্ম্মকাণ্ডের উপযোগিতা—নানাভাবে বেদের মহিমা কীর্ত্তন করা

৯১ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। ইত্যাদি। ভী ৩৩।৩৪

৯২ যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ভী ৩০।১৫

১ বিবিক্তে পর্ব্বততটে পারাশর্য্যো মহাতপাঃ।
বেদানধ্যাপয়ামাস ব্যাসঃ শিষ্যান্মহাতপাঃ। ইত্যাদি। শা ৩২৭।২৬,২৭

২ নাস্তিক্যমন্যথা চ স্যাদ্বেদানাং পৃষ্ঠতঃ ক্রিয়া।
এতন্মানন্তমিচ্ছামি ভগবন্ শ্রোতুমঞ্জসা॥ শা ২৬৮।৬৭। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

হইয়াছে। শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়েরই তত্ত্ব জানিতে হইবে।[৩] শব্দব্রহ্মকে জানিতে হইলে কর্ম্মকাণ্ডে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি কৃত্য পর্য্যন্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মন্ত্রের বিশেষ স্থান আছে। বিশুদ্ধরূপে অনুষ্ঠানগুলি নির্ব্বাহ না হইলে সংস্কার সম্পন্ন হয় না। সংস্কারচ্যুত ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার লাভ করিতে পারেন না। সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডই জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার জন্মাইবার উপদেশ দিয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া মোক্ষপথের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্ম্মকাণ্ডের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারে অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।[৪] এইসকল উক্তি হইতে মীমাংসাদর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

কর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ—সরলস্বভাব সত্যনিষ্ঠ স্বধর্ম্মনিরত পুরুষের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই তাঁহার বন্ধনমুক্তির কারণ হইয়া থাকে।[৫] বাহিরের অনুষ্ঠানই সব নহে, যাগযজ্ঞেরও মূল লক্ষ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে, কেবল বাহিরের বাঁধাধরা কতকগুলি অনুষ্ঠানকেই যাঁহারা প্রধান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। যাঁহারা বৈদিক প্রশংসাবাদে আকৃষ্ট হইয়া কাম্য কর্ম্মে মাতিয়া উঠেন, স্বর্গলাভই যাঁহাদের নিকট পরম পুরুষার্থ, তাঁহারা শুধু ভোগৈশ্বর্য্য লাভের সূচক বৈদিক বাক্যের প্রশংসায় অপর কিছু ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান না। ফলতঃ একমাত্র ভোগের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে কখনও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয় না। তাঁহারা যজ্ঞাদি সম্পাদন করিলেও যজ্ঞপুরুষ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়েন।[৬] মহাভারতের যজ্ঞতত্ত্ব গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকাশক। সমস্ত অনুষ্ঠান এবং জ্ঞানকাণ্ডের শেষ উপেয় একই পরম পুরুষ। সুতরাং যতদিন না সেই পুরুষতত্ত্বের জ্ঞান হয়, ততদিন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।

৩ বেদাঃ প্রমাণং লোকানাং ন বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃতাঃ।
দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ॥ ইত্যাদি। শা ২৬৯।১, ২

৪ কৃতশুদ্ধশরীরো হি পাত্রং ভবতি ব্রাহ্মণঃ।
আনন্ত্যমত্র বুদ্ধ্যেদং কর্ম্মণাং তদ্ ব্রবীমি তে॥ শা ২৬৯।৩

৫ ঋজূনাং সমনিত্যানাং স্বেষু কর্ম্মসু বর্ত্ততাম্।
সর্ব্বমানন্ত্যমেবাসীদিতি নঃ শাশ্বতী শ্রুতিঃ॥ শা ২৬৯।১৮

৬ যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ইত্যাদি। ভী ২৬।৪২-৪৪

গীতাতে বলা হইয়াছে যে, মহাহ্রদ বর্ত্তমান থাকিতে ক্ষুদ্র কূপের জলের যেমন কোন প্রয়োজন নাই, সেইরূপ ভক্তিমান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকটও বেদাদি শাস্ত্রের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।[৭] যে অনুষ্ঠানই করা হউক না কেন, তাহার আসল লক্ষ্য হইবে ভগবৎপ্রাপ্তি। আমাদের খাওয়াদাওয়া প্রভৃতি নিতান্ত শারীর প্রয়োজনগুলিও তাঁহারই উদ্দেশ্যে করিয়া যাইতে হইবে। যাগযজ্ঞাদির অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্বও তাহাই। আমাদের সকল অনুষ্ঠানই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইবে, অন্যথা সেই কর্ম্ম পূর্ণ হইবে না।[৮]

যাগযজ্ঞাদিতে অর্পিত আহুতি তাঁহার উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই মহাভারতের অভিমত। ভক্তিভাবে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু নিবেদিত হয় না কেন, তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়া ভক্তের অনুষ্ঠানকে সার্থক করিয়া তোলেন।[৯] ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই প্রীতিকামনায় যদি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হয়, তবে তাহা বন্ধনের কারণ হয় না। কর্ম্মমাত্রই যে বন্ধনের হেতু, এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত যাহাই করা হউক না কেন, তাহা বন্ধনের হেতু হয় না।[১০] শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় যজ্ঞের সৃষ্টি এবং প্রসারের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের আভ্যন্তরিক সত্য, অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্মে ভগবদুপলব্ধি ক্রিয়াকাণ্ডের মূল রহস্য। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞ এবং যজ্ঞাধিকারী প্রজার সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি কহিলেন, "এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ করুক। তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে আপ্যায়িত কর, দেবতারাও অন্নাদির পুষ্টিসাধন করিয়া তোমাদের কল্যাণ সাধন করুন। যে-ব্যক্তি দেবতাদত্ত অন্নাদি তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া ভোগ

৭ যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ভী ২৬।৪৬

৮ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ॥
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ভী ৩৩।২৭

৯ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ভী ৩৩।২৬

১০ যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ভী ২৭।৯

করেন, তিনি চোর। যিনি যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নাদি ভোজন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন, আর যিনি শুধু আপনার উদ্দেশ্যে পাক করেন, সেই পাপাচার ব্যক্তি পাপকেই আহার করেন। অন্ন হইতে ভূতজগতের উৎপত্তি, মেঘ হইতে অন্নের উৎপত্তি, আর সেই মেঘ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যজ্ঞ যাজ্ঞিক অনুষ্ঠাতাদের কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। কর্ম্মের উৎপত্তি বেদ হইতে, বেদের প্রকাশ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে। অতএব পরব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও নিয়ত এই যজ্ঞেতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন"।[১১] যজ্ঞ যে কত বড়, তাহার পরিচয় এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে সুস্পষ্ট। এইপ্রকার যজ্ঞ হইতে পরার্থপরতার উদ্ভব। জীবন শুধু আপনার সুখের নিমিত্ত নহে; যে কাজই করি না কেন, তাহা দ্বারা অনেকের যাহাতে উপকার হয়, সেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আপনাকে সকলের নিকট উৎসর্গ করার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞ শুধু কথার কথা নহে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ হিন্দুর নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত। তাহার উদার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যজ্ঞাদি সম্পাদন করিলে যাজ্ঞিক পুরুষের চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। কাম্য যজ্ঞাদির দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে পতনের ভয় আছে। সুতরাং কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষা নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির পক্ষে প্রশস্ত। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে যে বস্তুতঃ কোন বিবাদ বা অসামঞ্জস্য নাই, তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের শেষ বা অংশরূপে (পরিপূরক) বর্ণনা করা হইয়াছে।

যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রশংসা—যথাযথরূপে যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সেই অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম্ম হইতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ কখনও মানুষকে নিরাশ করে না।[১২] যজ্ঞাদি নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য-জ্ঞানে সম্পাদন করিতে হয়। কর্ম্মে শিথিলতা জন্মিলে ফল পাওয়া যায় না। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে যাঁহারা শ্রদ্ধাবিহীন, তাঁহাদের ইহলোক এবং পরলোক, দুইই অন্ধকার।[১৩] জগতে অর্থসঞ্চয়ের মাপকাঠি নাই। গৃহীর পক্ষে সঞ্চয়স্পৃহা

১১। সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ইত্যাদি। ভী ২৭।১০-১৫
বভূব যজ্ঞো দেবেভ্যো যজ্ঞঃ প্রীণাতি দেবতাঃ ॥ ইত্যাদি। শা ১২১।৩৭-৩৯

১২ যেষাং ধর্ম্মে চ বিস্পর্দ্ধা তেষাং তজ্জ্ঞানসাধনম্। উ ৪২।২৮

১৩ শা ২৬৭ তম অঃ।

যদিও অন্যায় নহে, তথাপি অতি সঞ্চয় একান্ত গর্হিত। মহাভারত বলেন, যাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাহাতে তোমার কোন অধিকার নাই, সেই সম্পদে অধিকার দেবতাদের। তাহা যজ্ঞে উৎসর্গ করিতে হয়। বাসনার চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে সেই ধন ব্যয় করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। বিধাতা ধন দান করেন উৎসর্গের নিমিত্ত, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ না করিলে ধনী ব্যক্তি আর চোরের মধ্যে প্রভেদ কি? লব্ধ ধনের ত্যাগই একমাত্র সদ্‌ব্যয়। বাজে কাজে অর্থব্যয় এবং সৎকাজে ব্যয়কুণ্ঠতা, উভয়ই দূষণীয়। এইসকল বাক্য 'মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্' এই উপনিষদ্‌বচনেরই ছায়া।[১৪] দ্রোণপর্ব্বের এবং শান্তিপর্ব্বের ষোড়শরাজিক-প্রকরণে যাগযজ্ঞের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। "তৎকালে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞাদির কিঞ্চিৎ শিথিলতা ঘটিয়াছিল, সেইহেতু বর্ণিত রাজাদের প্রত্যেকের চরিত্রকেই বড় করিয়া দেখান হইয়াছে", ইহা একশ্রেণীর পণ্ডিতের অভিমত। কিন্তু তাঁহাদিগকে সমর্থন করিবার কোন হেতু মহাভারতে পাওয়া যায় না।

যজ্ঞিয় উপকরণ ও পদ্ধতি—দেবতাদের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দেওয়াকেই সাধারণতঃ যজ্ঞ বলে। মহাভারতে রূপকমুখে দুইটি যুদ্ধবৃত্তান্তের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে যজ্ঞের অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। যজ্ঞের মধ্যে অধ্বর্য্যুর স্থান সর্ব্বোপরি, হোতার স্থান দ্বিতীয়। উদ্‌গাতা এবং ঋত্বিকের স্থান তার পরে। স্রুক্, আজ্য, বিশুদ্ধ মন্ত্র, কপাল, পুরোডাশ, ইধ্মা, শামিত্র, যূপ, সোম, চমস প্রভৃতি যজ্ঞের সাধন। যজ্ঞশেষে পুনশ্চিতি, অবভৃত-স্নান প্রভৃতি উদীচ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়।[১৫] যজ্ঞে চষাল, চমস, স্থালী, পাত্রী, স্রুচ্, শ্রুব, স্ফ্য, হবির্দ্ধান, ইড়া, বেদি, পত্নীশালা প্রভৃতি আরও নানাবস্তুর প্রয়োজন আছে।[১৬] অগ্নি-উৎপাদনের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রীকে অরণী (অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ) সঙ্গে রাখিতে হইত। নির্ম্মন্থনের নিমিত্ত একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত দণ্ডও রাখা হইত। তাহার নাম মন্থ।[১৭] যুধিষ্ঠিরের

১৪ তত্র গাথাং যজ্ঞগীতাং কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
ত্রয়ীমুপাশ্রিতাং লোকে যজ্ঞসংস্তরকারিকাম্। ইত্যাদি। শা ২৬।২৪-৩১

১৫ অস্য যজ্ঞস্য নেত্তা ত্বং ভবিষ্যসি জনার্দ্দন। ইত্যাদি। উ ১৪১।২৯-৫১। শা ৯৮।১৫-৪১

১৬ চষালযূপচমসাঃ স্থাল্যঃ পাত্র্যঃ স্রুচঃ স্রুবাঃ।
তেঙ্গেব চাস্য যজ্ঞেষু প্রয়োগাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ। বন ১২১।৫

১৭ অরণীসহিতং মন্থং সমাসক্তং বনস্পতৌ। বন ৩১০।১২

অশ্বমেধ-যজ্ঞে কাঠের দ্বারা একুশটি যূপ তৈয়ার করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ছয়টি বিল্বের, ছয়টি পলাশের, ছয়টি খদিরের, দেবদারুর দুইটি, শ্লেষ্মাতকের (চাল্তে) একটি। সোণার দ্বারাও কয়েকটি যূপ তৈয়ার করা হইয়াছিল।[১৮]

নিত্যযজ্ঞ—নিত্যযজ্ঞের মধ্যে কেবল অগ্নিহোত্রের নাম দেখিতে পাই। পঞ্চ মহাযজ্ঞ যজ্ঞ হইলেও সকল মহাযজ্ঞে আহুতি নাই, শুধু দৈবযজ্ঞ হোমস্বরূপ।

অশ্বমেধ—যে-সকল কাম্য যজ্ঞের বর্ণনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে অশ্বমেধই প্রধান। অশ্বমেধের প্রশংসা বহু জায়গায়। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ অশ্বমেধপর্ব্বে দেখিতে পাই। সেখানে যজ্ঞিয় দ্রব্যাদিরও একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইয়াছে।[১৯] ধৃতরাষ্ট্রও পাণ্ডুর বিক্রমার্জ্জিত ধনে বহু অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।[২০] অশ্বানুসরণ প্রভৃতি ক্রিয়া শাস্ত্রীয় হইলেও অশ্বমেধ-অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে সমস্ত দেশের মধ্যে আপনাকে একচ্ছত্রাধিপতি বলিয়া প্রচার করা দীক্ষিতদের নিয়ম ছিল। সেই নিয়ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত দিকে দিকে বিশিষ্ট যোদ্ধবর্গ সহ অশ্ব প্রেরিত হইত। যে-সকল নৃপতি নির্ব্বিবাদে অশ্বটিকে ছাড়িয়া দিতেন, তাঁহারা যে আনুগত্য স্বীকার করিতেন, ইহা সহজেই অনুমেয়, আর যাঁহারা বীরত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অশ্বটিকে আবদ্ধ রাখিতেন, তাঁহাদের সহিত অশ্বরক্ষকগণের বিবাদ উপস্থিত হইত, ফলে দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিত। যাজ্ঞিক পক্ষের জয় হইলেই বুঝিতে হইবে যে, নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে। যুধিষ্ঠিরের অশ্ব লইয়া স্বয়ং অর্জ্জুন বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বহু বিপক্ষদলের সম্মুখীন হইতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছিল।

রাজসূয়—রাজসূয়-যজ্ঞে একমাত্র ক্ষত্রিয়ের অধিকার। আরও একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, যে-বংশে রাজসূয়-যজ্ঞকারী জীবিত থাকিবেন, সেই বংশের অপর কোন ব্যক্তি ঐ যজ্ঞ করিতে পারিবেন না।[২১] যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ অতি প্রসিদ্ধ। সভাপর্ব্বে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

সর্ব্বমেধ ও নরমেধ—নরমেধ-যজ্ঞেরও প্রচলন ছিল। ব্যাসদেব

১৮ ততো যূপোচ্ছ্রয়ে প্রাপ্তে ষড়্ বৈল্বান্ ভরতর্ষভ।
খাদিরান্ বিল্বসমিতাংস্তাবতঃ সর্ব্ববর্ণিনঃ॥ ইত্যাদি। অশ্ব ৮৮।২৭-২৯

১৯ স্ফ্যাশ্চ কূর্চ্চশ্চ সৌবর্ণো যচ্চান্যদপি কৌরব। ইত্যাদি। অশ্ব ৭২।১০, ১১

২০ অশ্বমেধশতৈরীজে ধৃতরাষ্ট্রো মহামখৈঃ। আদি ১১৪।৫

২১ ন স শক্যঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠো জীবমানে যুধিষ্ঠিরে। বন ২৫৪।১৩

যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, "হে নৃপতে, তুমি রাজসূয়, অশ্বমেধ, সর্ব্বমেধ এবং নরমেধ-যজ্ঞ কর"।[২২]

শম্যাক্ষেপ—'শম্যাক্ষেপ'-নামে একটি যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার নিয়ম এই ছিল যে, যজমান একটি লাঠিকে ঢিলের ন্যায় প্রক্ষেপ করিবেন, সেই লাঠিটি যত দূরে যাইবে, ততখানি স্থান জুড়িয়া যজ্ঞমণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে।[২৩]

সাত্ত্বস্ক—'সাত্ত্বস্ক'-যাগের শুধু নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। রাজর্ষিগণই সাত্ত্বস্ক-যাগের অধিকারী। যুধিষ্ঠির অরণ্যবাসের কালে এই যজ্ঞ করেন।[২৪]

জ্যোতিষ্টোম—'জ্যোতিষ্টোম'-যজ্ঞ বহুপ্রকার, এইমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিষয়েও আর কোন বিস্তৃত বর্ণনা করা হয় নাই।[২৫]

রাক্ষস—পরাশর-ঋষি পিতৃহত্যার প্রতিশোধস্বরূপ 'রাক্ষস'-যজ্ঞ করিয়াছিলেন।[২৬]

সর্পসত্র—জনমেজয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত 'সর্পযজ্ঞের' অনুষ্ঠান করেন।[২৭]

পুত্রেষ্টি—সৃষ্টি-প্রক্রিয়া একপ্রকার যজ্ঞ। প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রকামনায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পুত্রকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান প্রাচীন কালে অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার ছিল। দীর্ঘকাল অপুত্রক থাকিলে অনেকেই যজ্ঞ করিতেন।[২৮]

বৈষ্ণব—'বৈষ্ণব'-যজ্ঞ রাজসূয়-যজ্ঞের সমান। দুর্য্যোধন এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন।[২৯]

২২ রাজসূয়াশ্বমেধৌ চ সর্ব্বমেধঞ্চ ভারত।
নরমেধঞ্চ নৃপতে ত্বমাহর যুধিষ্ঠির ॥ অশ্ব ৩।৮

২৩ সহদেবোঽযজদ্ যত্র শম্যাক্ষেপেণ ভারত। ইত্যাদি। বন ৯০।৫। অনু ১০৩।২৮

২৪ ঈজে রাজর্ষিযজ্ঞেন সাত্ত্বস্কেন বিশাম্পতে। ইত্যাদি। বন ২৩৯।১৬। অনু ১০৩।২৮

২৫ বহুধা নিঃসৃতঃ কায়াজ্জ্যোতিষ্টোমঃ ক্রতুর্যথা। বন ২২১।৩২

২৬ ঈজে চ স মহাতেজাঃ সর্ব্ববেদবিদাম্বর।
ঋষী রাক্ষসসত্রেণ শাক্তেয়োঽথ পরাশরঃ ॥ আদি ১৮১।২

২৭ আদি ৫১ শ অঃ।

২৮ যজতঃ পুত্রকামস্ত কশ্যপস্ত প্রজাপতেঃ। ইত্যাদি। আদি ৩১।৫। সভা ১৭।২১

২৯ এষ তে বৈষ্ণবো নাম যজ্ঞঃ সৎপুরুষোচিতঃ। বন ২৫৪।১৯

অভিচারাদি—শত্রুর অনিষ্ট-সাধনের নিমিত্ত অনেকে অভিচার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতির নাম অভিচার। রক্তপুষ্প, নানাপ্রকার ওষধি, কটুক ও কণ্টকান্বিত বিবিধ ফলমূল প্রভৃতি অভিচার-ক্রিয়ায় প্রয়োজন হইত। অথর্ব্ববেদে বিধিব্যবস্থা পাওয়া যায়।[৩০]

যজ্ঞমণ্ডপ—যজ্ঞের মণ্ডপ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেই শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে ভূমি মাপিবার নিয়ম ছিল। ভূমির মাপের দ্বারা যজ্ঞের ফল শুভ হইবে বা অশুভ হইবে, তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইত।[৩১]

যজ্ঞে পশুহননে মতদ্বৈধ—যজ্ঞে পশু বধ করা উচিত কি না, এই বিষয়ে তৎকালেও বিচার চলিতেছিল। মোক্ষপর্ব্বের নারায়ণীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, একদা যাজ্ঞিক ঋষিগণ এবং দেবতাগণের মধ্যে এই বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। ঋষিগণ পশুহত্যার বিপক্ষে, আর দেবতাগণ পক্ষে। এই বিচারে নৃপশ্রেষ্ঠ উপরিচর-বসুকে মধ্যস্থ মানা হইল। বসু দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অন্তরীক্ষে চলাফেরা করিবার শক্তি প্রভৃতি নানাবিধ যোগপ্রভাব তাঁহার ছিল, ঋষিদের শাপে সেইসকল শক্তি নষ্ট হইয়া গেল। শাপের প্রভাবে তিনি এক গর্ত্তে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন। দেবগণ এই ব্যাপারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাজাকে বর দিলেন। তাঁহাদের বরে ভূগর্ভে থাকিয়াও যাজ্ঞিক-দের প্রদত্ত ঘৃতধারাতে তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল পরে নারায়ণের প্রসাদে তিনি মুক্তি লাভ করেন।[৩২] এই উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, পশুবধ বৈধ হিংসা হইলেও একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া যেন স্বীকার করা হইত না। তাহাতেও হিংসাজনিত পাপের আশঙ্কা করা হইত। উপরিচর-বসু পক্ষপাতিতাদোষে এই দুঃখ ভোগ করেন। (কাপিল সাংখ্যেরও এইরূপ অভিমত।)

পশুহননের পক্ষই প্রবল—বৈধ হিংসাকে পাপজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত করায় এইসকল অংশে বৌদ্ধপ্রভাব আছে, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সাংখ্যদর্শনের মতেও হিংসামাত্রই

৩০ ওষধ্যো রক্তপুষ্পাশ্চ কটুকাঃ কণ্টকান্বিতাঃ।
শত্রূণামভিচারার্থমথর্ব্বেষু নিদর্শিতাঃ॥ অনু ৯৮।৩০

৩১ আদি ৫১ শ অঃ।

৩২ শা ৩৩৭ তম অঃ। অনু ১১৫।৫৬-৫৮

পাপজনক। যজ্ঞাদিতে পশুহিংসায় পাপ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে পুণ্য, উভয়ই যুগপৎ উৎপন্ন হয়, এই তাঁহাদের সমাধান। ব্রাহ্মণগীতাতে বলা হইয়াছে, হিংসা ব্যতীত মানুষ প্রাণধারণ করিতে পারে না। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদিগকে হিংসা করিতে হইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে যজ্ঞাদিতে হিংসা করিলে কোন পাপ নাই।[৩৩]

পশুর শিরে তক্ষার অধিকার—যূপনির্ম্মাতা ছুতার পশুর শিরের অধিকারী, এই ব্যবস্থা স্বয়ং দেবেন্দ্রের কৃত। বৃত্রাসুর-নিধনের সময় হইতে এই বিধান প্রবর্ত্তিত হয়।[৩৪]

মন্ত্রশক্তি—যজ্ঞাগ্নি হইতে মন্ত্রবলে পুত্রকন্যাদিরও উৎপত্তি হইত। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত এই বিষয়ে উদাহরণ। পরবর্ত্তী অনেক দার্শনিক উপনিষদুক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যার আলোচনায় এই দুইটিকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কেবল রূপক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত কি না, বিবেচ্য। যাগযজ্ঞের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণের নিমিত্ত এইসকল উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, ইহাও সম্প্রদায়বিশেষের অভিমত। যাহাই হউক না কেন, এইসকল ঘটনা হইতে যজ্ঞাদিতে মন্ত্রশক্তির বিশেষ প্রাধান্য অনুমিত হইয়া থাকে।[৩৫]

দক্ষিণা—যজ্ঞাদির সমাপ্তিতে ঋত্বিক্‌দিগকে যথাবিধানে দক্ষিণা দিতে হয়। যাহাতে বৃত পুরুষদের তৃপ্তি সাধন হয়, সেইভাবে দক্ষিণা দিবার নিয়ম। দক্ষিণা ব্যতীত যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হয় না। প্রাচীন কালে শিবি-পুত্র যজ্ঞসমাপনান্তে আপন পুত্রকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন।[৩৬]

অর্ঘ্য-প্রদান—যজ্ঞসভায় উপস্থিতদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অর্ঘ্য দেওয়া যজমানের কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। ভীষ্মের উক্তি হইতে জানা যায় যে, আচার্য্য, ঋত্বিক্, শ্বশুরাদি আত্মীয়, মিত্র, স্নাতক এবং নৃপতি—এই ছয় জন অর্ঘ্যের প্রাপক। কৃষ্ণের

৩৩ অশ্ব ২৮ শ অঃ। ভী ৪০।২৪

৩৪ শিরঃ পশোস্তে দাস্যন্তি ভাগং যজ্ঞেষু মানবাঃ।
এষ তেঽনুগ্রহস্তক্ষন্ ক্ষিপ্রং কুরু মম প্রিয়ম্ ॥ উ ৯।৩৭

৩৫ উত্তস্থৌ পাবকাত্তস্মাৎ কুমারো দেবসন্নিভঃ। ইত্যাদি। আদি ১৬৭।৩৯, ৪৪

৩৬ কস্মিংশ্চিচ্চ পুরা যজ্ঞে শৈব্যেন শিবিসূনুনা।
দক্ষিণার্থেঽথ ঋত্বিগ্‌ভ্যো দত্তঃ পুত্রঃ পুরা কিল ॥ অনু ৯৩।২৫

মধ্যে ছয়টি ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল, সেই সভায় তদপেক্ষা গুণবান্ কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। সেইহেতু তাঁহাকেই অর্ঘ্য প্রদান করা হয়।[৩৭]

অন্নদান—যজ্ঞে উপস্থিত সকলকেই অন্নপানাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে হয়, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দ্বারা অর্চ্চনা করিবার ব্যবস্থা আছে। এই-সকল বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের বর্ণনায় অনেক কিছু কথিত হইয়াছে।[৩৮]

অবভৃত স্নান—যজ্ঞের পরিসমাপ্তিতে দীক্ষিত যজমান শাস্ত্রবিধান অনুসারে অবভৃত-স্নান করিবেন, এই নিয়ম। এই স্নানও যজ্ঞিয় উদীচ্য কৃত্যের অন্তর্গত।[৩৯]

সোম-সংগ্রহের নিয়ম—সোমযাগে সোম-সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সোমের ক্রয়-বিক্রয় ছিল না। অপর বস্তুর বিনিময়ে অথবা দান গ্রহণ-পূর্ব্বক সোম সংগ্রহ করিতে হইত। সোমের বিক্রয় অতিশয় নিন্দনীয়। সোমবিক্রয়ে পাতিত্য জন্মে।[৪০]

সোমপায়ী—সোমপানে সকলের অধিকার স্বীকৃত হইত না। খুব ধনী ব্যতীত অপর কেহ সোমরস পান করিতে পারিতেন না। অন্ততঃ তিন বৎসর চলিবার উপযোগী অন্নাদি যাঁহার গৃহে সুরক্ষিত, তিনিই সোমপানের অধিকারী। দরিদ্র ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়া হয় নাই।[৪১]

হোমাগ্নি—কাষ্ঠপ্রজ্বলিত মন্ত্রসংস্কৃত অগ্নিতেই হোম করিতে হয়। অন্যান্য অগ্নিতে হোম নিষিদ্ধ।[৪২]

যাগযজ্ঞের লৌকিক উপকারিতা—প্রাচীন কালের যজ্ঞমণ্ডপগুলি জ্ঞান-চর্চ্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল, তাহা স্থানান্তরে ('শিক্ষা' প্রবন্ধ) আলোচিত হইয়াছে। যাগযজ্ঞের শাস্ত্রীয় মহদুদ্দেশ্য ছাড়াও কতকগুলি লৌকিক

---

৩৭ আচার্য্যমৃত্বিজঞ্চৈব সংযুজঞ্চ যুধিষ্ঠির।
স্নাতকঞ্চ প্রিয়ং প্রাহুঃ ষড়র্ঘ্যার্হান্ নৃপং তথা॥ ইত্যাদি। সভা ৩৬।২৩। সভা ৩৮।২২

৩৮ যথা দেবাস্তথা বিপ্রা দক্ষিণান্নমহাধনৈঃ।
ততৃপুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ তস্মিন্ যজ্ঞে মুদান্বিতাঃ॥ সভা ৩৫।১৯

৩৯ ততশ্চকারাবভৃথং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ আদি ৫৮।১৪

৪০ বিক্রীণাতু তথা সোমম্। অনু ৯৩।১২৬

৪১ যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং চাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি॥ শা ১৬৫।৫

৪২ জুহোতু চ স কক্ষাগ্নৌ। অনু ৯৩।১২৩

উপকারিতা ছিল। বহু লোক যজ্ঞাদিতে খাইতে পাইত। যজ্ঞমণ্ডপে শাস্ত্রীয় বিচারাদির ব্যবস্থাও করা হইত; তাহাতে উপস্থিত সকলেই আপন-আপন অধীত শাস্ত্রের আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেন।[৪৩] সকল শ্রেণীর লোকই যজ্ঞ উপলক্ষ্যে নানা বিষয়ে উপকৃত হইত। সামাজিক কল্যাণের পক্ষে যজ্ঞের উপযোগিতা যথেষ্টই ছিল। নানাদেশ হইতে সমাগত অতিথি-অভ্যাগতের পরস্পর পরিচয়প্রসঙ্গ, দেশভ্রমণ প্রভৃতি ব্যাপারেও যজ্ঞানুষ্ঠানের সহায়তা কম নহে।

মহাভারতীয় কর্ম্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্য—সর্ব্বত্যাগরূপ ব্যাপক অর্থেও যজ্ঞ-শব্দ পরিগৃহীত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলা হইয়াছে, যজ্ঞ দ্বারাই প্রজাপতির প্রজাসৃষ্টি, যজ্ঞের হবিঃশেষ ভোজনে সকল পাপ দূরীভূত হয়, যজ্ঞের অবশিষ্টই অমৃত, অমৃতভোজনের ফল সনাতন ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞের কালবিচার নাই, আমাদের সমস্ত জীবন এক-একটা মহাযজ্ঞস্বরূপ। যজ্ঞরূপ ত্যাগের মধ্য দিয়া মানব সমস্ত জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে এবং পরিশেষে অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হয়। ত্যাগ, তপস্যা, যোগ, বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানার্জ্জন প্রভৃতি সকলই যজ্ঞ; যাঁহার যে যজ্ঞে রুচি, তিনি সেই যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকেন।[৪৪] এই সংসার কর্ম্মভূমি, কর্ম্ম করিবার নিমিত্তই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ফলের দিকে তাকাইবার কোন প্রয়োজন নাই। পরলোক আমাদের ফলভূমি। সুতরাং কামনা ত্যাগ করিয়া শুধু কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।[৪৫] ব্রাহ্মণ, সংহিতা এবং উপনিষৎ একই মহাযজ্ঞ বা মহাজ্ঞানের পথপ্রদর্শক। বেদপন্থীরা কর্ম্মমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসার সহায়তায় সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। এইকারণে তাঁহাদের সকল কর্ম্ম ও সকল তপস্যার চরম লক্ষ্য সেই পরম পুরুষ।[৪৬] সকাম যজ্ঞ মহাভারতের মতে প্রশস্ত নহে। মহাভারতের

৪৩ তস্মিন্ যজ্ঞে প্রবৃত্তে তু বাগ্মিনো হেতুবাদিনঃ।
হেতুবাদান্ বহূনাহুঃ পরস্পরজিগীষবঃ॥ অশ্ব ৮৫।২৭

৪৪ দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ভী ২৮।২৮

৪৫ কর্ম্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন্ ফলভূমিরসৌ মতা। ইত্যাদি। বন ২৬০।৩৫। ভী ২৭।৮
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। ইত্যাদি। ভী ২৬।৪৭। ভী ২৭।১৯

৪৬ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ভী ২৮।২৪

কর্ম্মযোগ কর্ম্মকাণ্ডের অপূর্ব্ব উপদেশ। কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্তৃত্বের অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হয়। 'সমস্তই ঈশ্বরে অর্পণ করিতেছি,' এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না।[৪৭]

কর্ম্মের স্বরূপ একান্ত দুজ্ঞের্য়। তাই কবি শিহ্লন মিশ্র বলিয়াছেন, 'নমস্তৎ-কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি'। শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন, 'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ' (ভী২৮।১৭)। তথাপি নিষ্কাম, সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, আত্মবশ্য এবং ঈশ্বরের তৃপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মরত যোগী পুরুষের কর্ম্মই যথার্থ কর্ম্ম।[৪৮] সেইরূপ কর্ম্মে রত থাকিয়াই জনকাদি কর্ম্মবীরগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।[৪৯] মহাভারতের কর্ম্মকাণ্ডে ঈশ্বরের স্থানই প্রধান, গৌণ নহে। ইহাই কর্ম্মমীমাংসা হইতে তাহার বিশেষত্ব।[৫০]

বেদান্তের অধিকারী—উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তের আলোচনা মহাভারতে প্রচুর। মোক্ষধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা এবং সনৎসুজাতীয়-প্রকরণে বেদান্তের অনেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এইসকল প্রকরণকে উপনিষদের ভাষ্য এবং বার্ত্তিকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কর্ম্মকাণ্ডের প্রাথমিক উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে ভগবানের স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা হয়, তখনই জিজ্ঞাসু বেদান্তশ্রবণের অধিকার লাভ করেন।

শিষ্য বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত হইয়াছেন কি না, ইহা নিপুণভাবে পরীক্ষা না করিয়া কোন আচার্য্য উপদেশ দিতেন না। শ্রদ্ধাবান্, সংযত, আগ্রহশীল, গুরু ও শাস্ত্রে ভক্তিমান্, জিজ্ঞাসু শিষ্যই ব্রহ্মবিদ্যা-উপদেশের প্রকৃত পাত্র। যাঁহার চিত্ত ক্ষুদ্রতা ও কলুষতা হইতে নির্ম্মুক্ত, যিনি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের দ্বারা আপনাকে সমধিক পবিত্র করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী, সদ্‌গুরুর উপদেশ তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।[৫১] ব্রহ্মবিদ্যা-গ্রহণ গুরুকুলে বাস ব্যতীত হইবার নহে। যথেচ্ছ চলাফেরা করিয়া অবসর বিনোদনের

৪৭ যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। ইত্যাদি। ভী ২৮।১৯-২১

৪৮ ভী ৩০।৪। ভী ৪২।১১,১৭,৫৭। ভী ২৬।৭১। ভী ২৯।১০

৪৯ কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। ভী ২৭।২০

৫০ ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। ইত্যাদি। ভী ২৭।৩০। ভী ৩৩।২৭, ২৮

৫১ যুক্তৌ বিলীনে মনসি প্রচিন্ত্যা, বিদ্যা হি সা ব্রহ্মচর্য্যেণ লভ্যা। ইত্যাদি। উ ৪৪।২। উ ৪২।৪৬

নিমিত্ত বিদ্যাচর্চ্চা করিলে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার জন্মে না, মহাত্মা সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ দিয়াছেন।[৫২]

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—অধ্যাত্মতত্ত্ব জানিতে হইলে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। আত্মার স্বরূপ অতিশয় গূঢ়, ধ্যানের দ্বারা বুদ্ধি বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে আত্মতত্ত্ব প্রতিফলিত হয় না। শ্রবণ এবং মননের পরে ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির করিতে পারিলেই যোগী পরম জ্যোতি দর্শন করিতে পারেন। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত নিশ্চল চিত্তই নিদিধ্যাসনের উপযুক্ত। চিত্তের প্রসাদ ও স্থিরতা না থাকিলে ধ্যান করা চলে না।[৫৩]

অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি—অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রমুখ সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণই মহাভারতকে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বেদান্তশাস্ত্রের স্মৃতিপ্রস্থানরূপে পরম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেকেই আপন-আপন অভিমতের অনুকূলে মহাভারতের সেই সেই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং মহাভারতের কিরূপ অভিমত, তাহা স্পষ্টরূপে বলা চলে না। সনৎসুজাত-প্রকরণে অদ্বৈত-প্রতিপাদক কথাই বেশী পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়াছেন, জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, শরীরের সহিত যোগবশতঃ ঘটাকাশ-ন্যায়ে এবং জলচন্দ্রাদি-ন্যায়ে পৃথক্ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। জীবের সহিত যেরূপ অভেদ, সেইরূপ দৃশ্যমান প্রপঞ্চের সহিতও ঈশ্বরের অভেদই যথার্থ। বিশ্বসৃষ্টি যেন ইন্দ্রজালের মত, বিকার-(মায়া) যোগে জগদীশ্বর জগৎকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। মায়া যদিও তাঁহার শক্তি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোন ভেদ নাই।[৫৪]

ভোগ্য বিষয়সমূহে দরিদ্র হইলেও পারলৌকিক বিত্তে (ঈশ্বরোপাসনায়) যাঁহারা আঢ্য, তাঁহারাই যথার্থ দুর্দ্ধর্ষ এবং দুষ্প্রকম্প্য, তাঁহারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ

৫২ আচার্য্যযোনিমিহ যে প্রবিশ্য। ইত্যাদি। উ ৪৪।৬। শা ৩২৫ তম অঃ। শা ২৪৫।১৬-২০

৫৩ এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ইত্যাদি। শা ২৪৫।৫-১২

৫৪ দোষো মহানত্র বিভেদযোগে, হ্যনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যাঃ।
তথাস্য নাধিক্যমুপৈতি কিঞ্চিদনাদিযোগেন ভবন্তি পুংসঃ॥ ইত্যাদি। উ ৪২।২০, ২১

কৈবল্যমুক্তির অধিকারী।[৫৫] ব্রহ্মই এইজগতের প্রতিষ্ঠা, তিনিই জগতের উপাদান-কারণ, প্রলয়কালে নিখিল জগৎ তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। তিনি নির্দ্বৈত, অনাময় এবং জগদাকারে বিবর্ত্তিত। যাঁহারা তাঁহার এইপ্রকার স্বরূপ জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।[৫৬] বনপর্ব্বের অষ্টাবক্রবন্দি-সংবাদেও অদ্বৈতবাদের সমর্থক আলোচনাই সমধিক। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই প্রকরণের উপসংহারে যে সংগ্রহশ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাহার শেষ শব্দটি 'অদ্বৈতভাগষ্টাবক্রঃ'।[৫৭]

ব্রহ্ম ও জীব—বৃহৎ, ব্রহ্ম, মহৎ প্রভৃতি পর্য্যায়-শব্দ। সর্ব্বাপেক্ষা যিনি মহৎ, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহা হইতে মহত্তর আর কিছুই নাই।[৫৮] ঈশ্বর, বিরাট, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি শব্দ কোনও পারিভাষিক অর্থে মহাভারতে প্রযুক্ত হয় নাই, শব্দগুলি ব্রহ্মেরই বাচক। যাঁহাকে জানিলে আর কিছুই জানিবার বাকি থাকে না, তিনিই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম।[৫৯] যিনি সুখ এবং দুঃখের অতীত, যাঁহাকে জানিতে পারিলে জীবকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তিনিই পরম ব্রহ্ম, তিনিই একমাত্র বেদ্য।[৬০] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনায় দেখা যায়, জীবই অজ্ঞানতামুক্ত হইলে পরমত্ব প্রাপ্ত হন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই বলিলেই চলে। জীব ভগবানেরই অংশ। ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত গুণের সহিত যতক্ষণ যোগ থাকে, ততক্ষণই জীবের জীবত্ব, আর সেইসকল গুণবিযুক্ত জীবই শিবত্ব বা পরমত্ব প্রাপ্ত হন। জীবের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। শুধু কর্ম্মফলের ভোগের নিমিত্ত দেহের সহিত তাঁহার যে সংযোগ হইয়া থাকে, তাহাই জন্ম, আর সেই সংযোগের নাশই মৃত্যু।[৬১]

৫৫ অনাঢ্যা মানুষে বিত্তে আঢ্যা দৈবে তথা ক্রতৌ।
তে দুর্দ্ধর্ষা দুষ্প্রকম্প্যাস্তান্ বিদ্যাদ্ ব্রহ্মণস্তনুম্॥ উ ৪২।৩৯

৫৬ সা প্রতিষ্ঠা তদমৃতং লোকাস্তদ্ ব্রহ্ম তদ্‌যশঃ।
ভূতানি যজ্ঞিরে তস্মাৎ প্রলয়ং যান্তি তত্র হি॥ ইত্যাদি। উ ৪৪।৩০,৩১

৫৭ বন ১৩৪ তম অঃ।

৫৮ বৃহদ্ ব্রহ্ম মহচ্চেতি শব্দাঃ পর্য্যায়বাচকাঃ। শা ৩৩৬।২
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ভী ৩১।৭

৫৯ যো বেদ বেদং স চ বেদ বেদ্যম্। উ ৪৩।৫৩

৬০ বেদ্যং সর্ব পরং ব্রহ্ম নির্দ্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ। ইত্যাদি। বন ১৮০।২২

৬১ আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব তু বিনির্ম্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ॥ ইত্যাদি। শা ১৮৭।২৩-২৭

শুভ এবং অশুভ কৃতকর্মের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত আত্মা শরীরের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন।[৬২] শরীর ও শরীরীর মধ্যে যে পরস্পর অত্যন্ত ভেদ, তাহা মনুবৃহস্পতিসংবাদে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।[৬৩]

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে মৃত্যুতে ফলভেদ—জ্ঞানী পুরুষ যখনই দেহ ত্যাগ করেন না কেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে তাঁহার কোন বাধা থাকে না, ইহাই বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। মহাভারতের সিদ্ধান্ত অনুরূপ। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে দেখিয়া হংসরূপী মহর্ষিগণ পরস্পর বলিতেছিলেন, "ভীষ্ম মহাত্মা পুরুষ, তিনি দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিবেন কেন?" ভীষ্মও তাঁহাদের কথা শুনিয়া উত্তরায়ণের অপেক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন।[৬৪] ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যে বলা হইয়াছে, ভীষ্ম পিতার বরে ইচ্ছামৃত্যু-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করিয়াছিলেন।[৬৫] দেবযান ও পিতৃযান-মার্গে লোকান্তরগমনের বর্ণনাও পাওয়া যায়।[৬৬]

গীতা

ষোলখানি গীতা—মহাভারতে ষোলখানি গীতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২৫ শ অঃ—৪২ শ অঃ। শান্তিপর্ব্বে উতথ্যগীতা, ৯০ তম ও ৯১ তম অঃ। বামদেবগীতা, ৯২ তম—৯৪ তম অঃ। ঋষভগীতা, ১২৫ তম—১২৮ তম অঃ। ব্রহ্মগীতা-গাথা, ১৩৬ তম অঃ। ষড়্জগীতা, ১৬৭ তম অঃ। শম্পাকগীতা, ১৭৬ তম অঃ। মঙ্কিগীতা, ১৭৭ তম অঃ। বোধ্যগীতা, ১৭৮ তম অঃ। বিচখ্নুগীতা, ২৬৪ তম অঃ। হারীতগীতা, ২৭৭ তম অঃ। বৃত্রগীতা, ২৭৮ তম ও ২৭৯ তম অঃ। পরাশরগীতা, ২৯০ তম—২৯৮ তম অঃ। হংসগীতা, ২৯৯ তম অঃ। অশ্বমেধপর্ব্বে অনুগীতা, ১৬শ-১৯শ অঃ। ব্রাহ্মণগীতা, ২০শ-৩৪ শ অঃ।

৬২ শুভাশুভং কর্ম্মফলং ভুনক্তি। শা ২০১।২৩

৬৩ শা ২০২ তম অঃ—২০৬ তম অঃ।

৬৪ ভী ১১৯ তম অঃ।

৬৫ ব্রহ্মসূত্র ৪।২।২০

৬৬ ভী ৩২ শ অঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও অনুগীতা একই। রাজ্যপ্রাপ্তির অনেক দিন পরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "ভগবন্, তুমি যুদ্ধের পূর্ব্বে আমাকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলে, সেইগুলি আমার মনে নাই। কৃপা করিয়া পুনরায় বল"। অর্জ্জুনের বাক্য শুনিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাঁহার অন্যমনস্কতার জন্য মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশই দিয়াছেন। তাহাই অনুগীতা। পাণ্ডবগীতা বা প্রপন্নগীতা, ভগবতীগীতা প্রভৃতি পৌরাণিক সংগ্রহ-গ্রন্থ, ভক্তজনের প্রাণের প্রার্থনা।

গীতা বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান—শুধু 'গীতা' বলিলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেই বুঝায়। গীতা মহাভারতরূপ রত্নহারের মধ্যমণি। গীতা ছাড়াও বনপর্ব্বের অষ্টাবক্রবন্দিসংবাদ, দ্বিজব্যাধসংবাদ, যক্ষযুধিষ্ঠিরসংবাদ, উদ্যোগপর্ব্বের সনৎ-সুজাতীয়-প্রকরণ, শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্ম এবং অশ্বমেধপর্ব্বের গুরুশিষ্যসংবাদ অধ্যাত্মশাস্ত্ররূপে প্রখ্যাত। কিন্তু গীতার মাহাত্ম্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। উপনিষদের দার্শনিক তথ্যগুলি সংক্ষিপ্তভাবে গীতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উপনিষৎ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তের এই তিনটি প্রস্থান। উপনিষৎ শ্রুতিপ্রস্থান, গীতা স্মৃতিপ্রস্থান এবং ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান। গীতাকে উপনিষৎ, ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রও বলা হয়। গীতার প্রতি-অধ্যায়ের সমাপ্তিতে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে" ইত্যাদি বলা হয়। "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ—(গী ৩৭।৪) গীতার এই শ্লোকে 'ব্রহ্মসূত্রপদ' শব্দ দেখিয়া কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতা ব্রহ্মসূত্র রচনার পরে বিরচিত। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রেও এরূপ সূত্র পাওয়া যায়, যাহাতে গীতার বচনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। (দ্রঃ ব্রহ্মসূত্র ৪।২।২০,২১) ইহাতে মনে হয়, উভয় গ্রন্থই এক সময়ে রচিত, কারণ একই গ্রন্থকার উভয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

গীতার প্রক্ষিপ্তবাদ-(?) খণ্ডন—পাশ্চাত্ত্য অনেক পণ্ডিত এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, গীতা মহর্ষি বেদব্যাসের লিখিত নহে। অপর কোন শক্তিশালী পণ্ডিত মহাভারতের ভিতরে এই গ্রন্থকে প্রক্ষেপ করিয়াছেন। সুতরাং গীতা প্রক্ষিপ্ত। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যুদ্ধের প্রারম্ভে অষ্টাদশ অধ্যায়ে দার্শনিক উপদেশ দেওয়া কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না, ইহা নিতান্ত বিসদৃশ এবং অযৌক্তিক। আমাদের মনে হয়, এই যুক্তিটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। গীতা প্রচারের পক্ষে সেই স্থান এবং কালই ছিল অনুকূল।

ভক্তসখা বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন গীতার শ্রোতা এবং বক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং সেইরূপ ভীষণ সময়ে জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের উপদেশ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক হয় নাই। যোগপ্রভাবে যুদ্ধারম্ভের কোলাহলের মধ্যেও বক্তা এবং শ্রোতা শান্তিতে আপন-আপন কাজ করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করেন নাই। অর্জ্জুনের যখন বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখনও যুদ্ধের আরম্ভ হয় নাই। শঙ্খনিনাদ, ব্যূহরচনা প্রভৃতি কার্য্য চলিতেছিল। কৃষ্ণার্জ্জুনের কথাবার্ত্তার পরেও যুধিষ্ঠির ভীষ্ম-দ্রোণাদি গুরুজনের পাদবন্দনা করিয়া যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার অনেক পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র গীতা উপদেশ দিতে তিন ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবার কথা নহে। সুতরাং তৎকালে গীতার উপদেশের কোন অসঙ্গতি থাকিতে পারে না। অর্জ্জুন তো যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুতই ছিলেন। কার্য্যকালে কেন তাঁহার এই বিষাদ? ইহার উত্তরে বলা যায়, কার্য্যক্ষেত্রে এই দুর্ব্বলতা অস্বাভাবিক নহে। মহাভারতের নানাস্থানে গীতার অনুরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়। আদিপর্ব্বের গোড়াতেই ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতেও দেখিতে পাই, ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-প্রদর্শনের সংবাদ শুনিয়াই জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া সঞ্জয়কে বলিয়াছেন।[১] অনুগীতাপর্ব্বের প্রারম্ভে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়া তোমাকে পরম গুহ্য তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলাম। গুরুশিষ্যসংবাদে উপদেশের উপসংহারে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "আমি মহাযুদ্ধের আরম্ভেও তোমাকে এই তত্ত্বেরই উপদেশ দিয়াছি। নারায়ণীয়-প্রকরণেও শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার নাম গ্রহণ করা হইয়াছে।[২] গীতার সম্বন্ধে এইসকল উক্তি এত স্পষ্ট যে, গীতা মহাভারতে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা বলিবার উপায় নাই। বলিতে গেলে অনুগীতাপর্ব্বকে এবং গুরুশিষ্য-সংবাদকেও প্রক্ষিপ্তই বলিতে হয়। আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে

---

১ যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥ আদি ১।১৮১

২ পূর্ব্বমপ্যেতদেবোক্তং যুদ্ধকাল উপস্থিতে।
ময়া তব মহাবাহো তস্মাদত্র মনঃ কুরু ॥ অশ্ব ৫১।৪৯
সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্মৃধে
অর্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্। শা ৩৪৮।৮

আরও বলা যাইতে পারে যে, গীতার যে স্থান ভীষ্মপর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কোনও মহাভারত-সংস্করণে তাহা অন্যরূপ দেখা যায় না, সকল গ্রন্থে একই জায়গায় গীতার সন্নিবেশ। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়েও গীতার নাম করা হইয়াছে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

গীতার উপদেশ—পরবর্ত্তী সকল শ্রেণীর গ্রন্থকারই গীতাকে সশ্রদ্ধ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। গীতা শুধু দার্শনিক মীমাংসার গ্রন্থমাত্র নহে, একজন মানুষ কোন আদর্শে তাঁহার জীবন চালাইলে শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের স্বরূপ জানিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করিতে পারিবেন, গীতা তাহারই পথপ্রদর্শক। গীতাতে অনেক উপনিষদ্‌বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, উপনিষদের সহিত শব্দসাদৃশ্য বিশেষতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সকল আস্তিক দর্শনের পরস্পরবিরোধী মতবাদের উৎকৃষ্ট সামঞ্জস্য গীতায় প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া শ্রৌতমার্গাবলম্বী মনীষীদের নিকট তাহা সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিপ্রস্থান-গ্রন্থ। গীতায় প্রধানতঃ তিনটি যোগের আলোচনা করা হইয়াছে—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। এই তিন যোগের পরিপূরকরূপে অন্যান্য উপদেশগুলি প্রদত্ত হইয়াছে।

কর্ম্মযোগ—গীতা কর্ম্মের উপদেশে শতমুখ। গীতার আরম্ভই কর্ম্মযোগে। নির্ব্বিণ্ণ অর্জ্জুনকে স্বকর্ম্মে উদ্‌বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গীতার উপদেশ। কর্ম্ম ব্যতীত কোন প্রাণী এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না। রাজর্ষি জনকাদি কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কর্ম্ম করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত শরীরযাত্রাই নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং মানুষ সকলসময়ই কর্ম্ম করিতে বাধ্য। কর্ম্ম না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি না হইলে কেবল সন্ন্যাস অবলম্বনে মুক্তি হয় না।[৩] কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কিন্তু ভাল বা মন্দ কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ। সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া শাস্ত্রবিধান অনুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা চাই। 'যাহা করিতেছি, তাহা তাঁহারই উদ্দেশে', এইপ্রকার নির্ভর থাকিলে কর্ম্ম কখনও বন্ধনের হেতু হয় না, মুক্তিরই অনুকূলতা করে। অনাসক্তচিত্তে কর্ম্ম করাই কর্ম্মসন্ন্যাস।[৪]

৩. ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। ইত্যাদি। ভী ২৭।৫,৪,৮

৪. যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ইত্যাদি। ভী ২৭।৯। ভী ২৬।৪৭। ভী ৩০।১। ভী ৪০।২৪

'আমি যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার ফল কি হইবে,' সেই চিন্তা করিতে নাই। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, কর্ম্মটি আমার কর্ত্তব্য কি না, এই বিষয়ে শাস্ত্র কি বলেন, কর্ম্মটি আমার পক্ষে ধর্ম্মানুকূল কি না; যদি তাহা হয়, তবে আর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয় সব সমান মনে করিয়া কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে। এইরূপ কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহাতে পাপের আশঙ্কা করিতে নাই।[৫] কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি না রাখিয়া শরীরযাত্রা-মাত্র নির্ব্বাহের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সেই কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না। যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদি সহনশীল এবং বৈররহিত, হর্ষের কারণ উপস্থিত থাকিলেও যিনি অতিমাত্রায় আনন্দ বোধ করেন না এবং বিষাদেও যাঁহাকে অতিশয় ক্লিষ্ট দেখায় না, তাঁহার কৃত কোনও কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না। তিনি প্রফুল্লচিত্তে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। ভগবানের উপাসনাবুদ্ধিতে যে-সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করা হয়, সেইগুলি মুক্তিরই হেতু। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশেষ সাত্ত্বিক-প্রকৃতি লোকই ফলাসক্তি ত্যাগ করিতে পারেন।[৬] কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, এই উভয়ের মধ্যে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগের প্রশস্ততা কীর্ত্তিত হইয়াছে। রাগদ্বেষাদিমুক্ত যে-ব্যক্তি শুধু ভগবানের তৃপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মে লিপ্ত থাকেন, তিনি কর্ম্মী হইলেও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কারণ, দ্বন্দ্বশূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ পৃথক্ বস্তু নহে, পণ্ডিতগণ দুইকেই এক বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। যেহেতু উভয়ের মধ্যে যে-কোন একটির উপাসক উভয়েরই ফল লাভ করিতে পারেন।[৭] কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই যোগী হওয়া যায় না। কর্ম্মফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই যথার্থ সন্ন্যাস বা যোগ সম্পন্ন হয়।

---

৫ সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
তত্তো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ইত্যাদি। ভী ২৬।৩৮,৫১। ভী ২৭।৩০। ভী ২৮।১৯

৬ ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ইত্যাদি। ভী ২৮।২০-২৩

৭ সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ইত্যাদি। ভী ২৯।২-৪

যে যোগী জ্ঞানযোগে উন্নীত হইতে চান, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে নিষ্কামভাবে কর্ম্মের উপাসনা করিতে হইবে। আর জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত চিত্তবিক্ষেপক কর্ম্মসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি এবং তাহাদের ভোগের অনুকূল কর্ম্মে যিনি প্রবৃত্ত হন না, তাঁহার কর্ম্মযোগই নির্ম্মল এবং পরিশুদ্ধ।[৮] কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত শরীরকে পীড়া দেওয়া একান্ত গর্হিত। উপবাসাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের অত্যাবশ্যক অঙ্গ, এমন কিছু নহে। কর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। মন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সেইভাবে বিষয়োপভোগ করা নিন্দনীয় নহে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত না করিয়া একেবারে নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা, তাহাতে বিপরীত ফলই ফলে। জোর করিয়া উপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছ্রাচারের দ্বারা যাঁহারা প্রকৃতিকে নিগ্রহ করেন, গীতার ভাষায় তাঁহারা 'আসুরনিশ্চয়'। এইজাতীয় উৎকট নিরোধ গীতায় অতিশয় নিন্দিত। আহার-বিহার প্রভৃতি শারীর ব্যাপারের নিয়ম এবং সংযতভাব যোগীর পক্ষে অবলম্বনীয়। এইভাবে সুচারুরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই গীতার কর্ম্মযোগের উপদেশ।[৯] ফলে অনাসক্ত হইয়া যে কাজই করা যায় না কেন, তাহা সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিক কর্ম্ম কর্ম্মক্ষয়ের হেতু। নবমাধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন, "হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু কর, যে-কোন দ্রব্য আহার কর, যে-কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা করিয়া থাক, সমস্তই আমাতে সমর্পণ কর। এইরূপ করিলে কর্ম্মজনিত ইষ্টানিষ্ট ফল হইতে মুক্ত হইবে, কর্ম্ম তোমার সংসারবন্ধনের কারণ হইবে না, যুক্তাত্মা হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে"।[১০] গীতার উপসংহারে ভগবান্ বলিয়াছেন, "আমাতে চিত্ত অর্পণ করিলে আমার প্রসাদলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত

৮ অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ইত্যাদি। ভী ৩০।১-৪

৯ কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ইত্যাদি। ভী ৪১।৬। ভী ৩০।১৬,১৭। ভী ২৭।৩৩

১০ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম॥ ইত্যাদি। ভী ৩৩।২৭,২৮

হইবে, আমার শরণাপন্ন হইলে আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব"।[১১]

জ্ঞানযোগ—সাত্ত্বিক কর্ম্মযোগের বিশুদ্ধিতে জ্ঞানযোগের উৎপত্তি। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম দিকেই তাহা বলা হইয়াছে। অতএব কর্ম্মযোগের পরেই জ্ঞানযোগ আলোচ্য। জ্ঞানযোগের পরিণতি আত্মজ্ঞানে। নির্ব্বিণ্ণ অর্জ্জুনকে ভগবান্ সাংখ্যযোগের উপদেশস্বরূপ আত্মতত্ত্বেরই উপদেশ দিয়াছেন। জীবাত্মার নিত্যত্বের উপদেশে বলিয়াছেন, আত্মা শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হন না, অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জলের দ্বারা তিনি ক্লিন্ন হন না, মারুত তাঁহাকে শোষণ করিতে পারে না। তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকার্য্য। তিনি জন্ম এবং মৃত্যুর অতীত, শরীরের বিনাশে তাঁহার বিনাশ নাই। আত্মার এবম্বিধ যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিলে শোকের কোন কারণ থাকে না।[১২] আত্মাকে জানিলেই বিশ্বকে জানিতে পারা যায়, সুতরাং আত্মজ্ঞানের উদ্দেশ্যে সাধনা জ্ঞানযোগের প্রাথমিক সোপান। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে যোগী স্বভাবতঃই শান্ত, বিমৎসর, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বরহিত এবং সমচিত্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানযোগে এইপ্রকার প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধক জ্ঞানযজ্ঞের অধিকার লাভ করেন। দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞাদি অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ সকল যজ্ঞেরই চরম লক্ষ্য জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানে সকলেরই অন্তর্ভাব। জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে কর্ম্মযোগই কারণ।[১৩] আত্মজ্ঞান লাভ করিতে গুরুর উপদেশ অত্যাবশ্যক। শ্রদ্ধা, গুরুভক্তি, জিজ্ঞাসা এবং গুরু-শুশ্রূষা ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, এইজন্য ভগবান্ প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে গুরুশুশ্রূষার উপদেশ দিয়াছেন। অর্জ্জুনও সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারই পাদমূলে প্রপন্ন হইয়া ভক্তজনবাঞ্ছিত পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।[১৪]

---

১১ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ইত্যাদি। ভী ৪২।৬৫, ৬৬

১২ নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ইত্যাদি। ভী ২৬।২৩-২৫

১৩ শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ইত্যাদি। ভী ২৮।৩৩-৩৯

১৪ তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ইত্যাদি। ভী ২৮।৩৪, ৩। ভী ২৬।৭

তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মানব সর্ব্বপ্রকার মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। সমস্ত জগৎকে তিনি স্বীয় আত্মায় দর্শন করেন এবং পরিশেষে পরমাত্মার সহিত সকল বস্তুর অভেদ জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হন।[১৫] প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠস্তূপকে ভস্মরাশিতে পরিণত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নি সেইরূপ সকল কর্ম্মকে ভস্ম করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রারব্ধ-কর্ম্মফল ব্যতীত অপর কোন কৃত কর্ম্ম জ্ঞানীর নিকট সুখ বা দুঃখের ভোগরূপ ফল উপস্থিত করিতে পারে না। তপস্যা বল, আর যাগযজ্ঞই বল, কোন যজ্ঞই জ্ঞানযজ্ঞের ন্যায় চিত্তশুদ্ধিকর নহে। বহুকাল কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে সহজেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এক-প্রকার ভক্তিযোগেরই মত, তাহার অনুষ্ঠান ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান হয় না। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি গুরুর উপদেশমত নিষ্ঠার সহিত সাধনা করিলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তত্ত্বজ্ঞানী জ্ঞানলাভের পর অচিরে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।[১৬]

উল্লিখিত কয়েকটি বচনে জ্ঞানযোগের অধিকারী নির্ণয় করা হইয়াছে। অতঃপর অনধিকারী সম্বন্ধেও দুই-চারিটি কথা বলা হইয়াছে। যিনি আচার্য্যের উপদেশ শোনেন নাই এবং কোনপ্রকারে সেই বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেও তাহাতে শ্রদ্ধাহীন, আর কোন-উপায়ে শ্রদ্ধা জন্মিলেও সংশয়ান্বিত, তিনি আপন প্রাপ্তব্য লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন। সংশয়াপন্নের নিকট ইহলোকের মত পরলোকও অন্ধকার।[১৭] দেহাদিতে যাঁহার আত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, এরূপ তত্ত্বজ্ঞ সাধুপুরুষ লোকশিক্ষার নিমিত্ত কিংবা দেহধারণের নিমিত্ত যে-সকল শারীর কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেইসকল কর্ম্ম তাঁহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় না।[১৮] পরবর্ত্তী প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই অল্পবিস্তর জ্ঞানযোগের আলোচনা

১৫ যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ইত্যাদি। গী ২৮।৩৫, ৩৬

১৬ যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ইত্যাদি। গী ২৮।৩৭-৩৯

১৭ অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ গী ২৮।৪০

১৮ যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ গী ২৮।৪১

করা হইয়াছে। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ, আবার কোন কোন ভাষ্যকার ভক্তিকেও সহকারী কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রথমতঃ গুরুর উপদেশ এবং পরে ভগবানে একান্ত নির্ভর না থাকিলে যখন মুক্তিলাভ অসম্ভব, তখন ভক্তিকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে কি না, ইহা বিবেচ্য। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মযোগ যে একমাত্র জ্ঞানযোগেরই উপায়, তাহা গীতায় স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। 'জ্ঞানের ন্যায় চিত্তশুদ্ধিকর আর কিছুই নাই।'[১৯]

ভক্তিযোগ—নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত চিত্তে আত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে ভক্তিও তাহাতে আপনিই বাসা বাঁধিয়া থাকে। শুধু জ্ঞানযোগের উপাসনাতেই যাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়, তিনি এক অনির্ব্বচনীয় অপার্থিব আস্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, "যাঁহারা আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই যুক্ততম। যাঁহারা মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যভক্তিযোগে আমাকে উপাসনা করিয়া থাকেন, সেইসকল ভক্তকে আমি জরামরণক্লিষ্ট সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। যিনি নিয়ত সন্তুষ্ট, প্রমাদশূন্য, সংযতস্বভাব ও মদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতে যিনি মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, সেই ভক্তই আমার পরম প্রিয়। যিনি নিঃস্পৃহ, শুচি, দক্ষ ও অপক্ষপাতী, যাঁহার মন কখনও ব্যথিত হয় না, আর যিনি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি প্রিয়লাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় ঘটিলেও দ্বেষ করেন না, যাঁহার শোকও নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই, যিনি পুণ্য ও পাপের অতীত, সেই ভক্তই আমার পরম প্রিয়পাত্র। নিন্দা এবং স্তুতি যাঁহার নিকট তুল্য, যিনি সংযতবাক্, যিনি যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সেই স্থিরবুদ্ধি ভক্তই আমার প্রিয়। যে-সকল ভক্ত উল্লিখিত সাধনধর্ম্মে রত, শ্রদ্ধালু এবং মদেকচিত্ত, তাঁহারা আমার অতিশয় প্রিয়"।[২০] গীতার উপসংহারে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "যিনি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত, তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক করেন না এবং কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না। এরূপ সমদর্শী পুরুষ সর্ব্বভূতে আমাকে অনুভব করিতে পারেন, ইহাই পরা ভক্তি। তিনি সেই

১৯ ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। ভী ২৮।৩৮

২০ ভী ৩৬শ অঃ।

পরা ভক্তির প্রসাদে আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপিত্ব তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। পরে সেই পরম ভক্ত আমাতেই প্রবেশ করেন"।[২১]

ভক্তিভরে একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করা ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই, ইহাও তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। "যিনি আমাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্য সমাধা করেন, আমারই প্রসাদে তিনি শাশ্বত অব্যয়-পদ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি মন দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া যোগ আশ্রয়পূর্ব্বক সতত মচ্চিত্ত হও।"[২২] একান্তচিত্তে ভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন সাধনা সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা ভগবানের উপদেশ। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "হে ভারত, তুমি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামীর শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে"।[২৩] যাঁহারা নিয়ত ভগবানের ভজনা করেন, তাঁহারা ভগবৎ-প্রসাদে এরূপ বিমল বুদ্ধি লাভ করেন যে, সেই বুদ্ধির সহায়তায় তাঁহাদের নিকট ভগবৎস্বরূপ প্রকাশিত হয়। ভজনের ফলে আত্মাতে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়।[২৪] আমাদের গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থও তাহাই। যিনি আমাদের শুভ বুদ্ধির প্রেরণা দিয়া থাকেন, তাঁহার ভজনা করাই গায়ত্রীর তাৎপর্য্য।

গীতোক্ত ভক্তিযোগের আলোচনায় দেখা যায়, যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তি-যোগকে চরম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। জ্ঞানের পরে শুদ্ধা বা পরা ভক্তি। আর তাহার চরম উপেয় পরমেশ্বর। সুতরাং দেখিতেছি যে, শুধু জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরানুভূতির সিদ্ধান্ত গীতার অভিপ্রেত নহে। 'ভক্তি ছাড়া মুক্তি নাই,' ইহাই গীতার গীতি।

২১ ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ইত্যাদি। গী ৪২।৫৪,৫৫

২২ চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ইত্যাদি। গী ৪২।৫৭,৫৮

২৩ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ গী ৪২।৬২

২৪ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গী ৩৪।১০

গীতার দার্শনিক মত—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাচক কয়েকটি বচন আছে বটে,[২৫] কিন্তু কোন ভাষ্যকারের দিকে না তাকাইলে বলিতে পারা যায় যে, দ্বৈতবোধক বচনই গীতায় অতি স্পষ্ট। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, গীতায় অদ্বৈতগর্ভ দ্বৈতবাদ প্রচার করা হইয়াছে। জীবাত্মা নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানযোগে উন্নীত হইয়া পরে ভক্তির প্রভাবে এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহার নিজের কোন ইচ্ছাই তখন থাকে না। ঈশ্বরের-ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করিয়া তাঁহারই আদেশে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যান। এইপ্রকার অদ্বৈতগর্ভ দ্বৈতভাবই জীবের চরম উন্নতি। ইহাই তাঁহাদের অভিমত।[২৬]

মহাভারতের অনেক স্থানেই দ্বৈতবাদ সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ নমস্কার-শ্লোকে দেখিতে পাই, নারায়ণ এবং নরোত্তম নরকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করা হইয়াছে। বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণের তপস্যার কথা বহু স্থানে বর্ণিত। এই বর্ণনা হইতেও দ্বৈতবাদের আভাস পাওয়া যায়। আদর্শ-মানুষ নর, নারায়ণকে পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল, আর নারায়ণও নরের অর্থাৎ সমগ্র জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তপস্যায় মগ্ন। ফলে নর নারায়ণকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে সখারূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ঈপ্সিত মানবকল্যাণের সহায়তা করিলেন; কিন্তু কখনও তিনি 'নারায়ণ' হইয়া যান নাই। নর ও নারায়ণ চিরদিন উপাসক ও উপাস্যরূপেই ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "হে পার্থ, সেই পরম পুরুষকে একমাত্র ভক্তির বলে লাভ করা যায়, এই ভূতসকল তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত, তিনিই সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন"।[২৭] এই বচনে দেখা যাইতেছে যে, ভূতজগৎ ঈশ্বরেতে অবস্থিত হইলেও ঈশ্বর স্বয়ং ভূতজগতে বিবর্ত্তিত বা পরিণত হন নাই। এই দ্বৈতভাবটি আরও কতকগুলি বচনে শ্রীকৃষ্ণ পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগে বলা হইয়াছে যে, "পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া প্রকৃতিজ সুখ-

২৫ বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। ইত্যাদি। ভী ৩১।১৯। ভী ৩৩।২৯। ভী ৩৪।৮। ভী ৩৫।১৩। ভী ৩৯।৭

২৬ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতার ভূমিকা।

২৭ পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্। ভী ৩২।২২

দুঃখাদি গুণ ভোগ করিয়া থাকেন। এই গুণসঙ্গই সদসদ্-যোনিতে জন্ম-গ্রহণের হেতু। এই দেহেই আরও এক পুরুষ প্রতিষ্ঠিত। তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্ম-সংজ্ঞায় কথিত হইয়া থাকেন। যিনি এই পুরুষ ও সগুণা প্রকৃতিকে জানেন, তিনি যে-কোন ভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও মুক্ত হইতে পারেন। তাঁহাকে অনুভব করিবার নিমিত্ত কেহ ধ্যানযোগ, কেহ জ্ঞানযোগ, কেহ সাংখ্যযোগ, কেহ বা কর্ম্মযোগকে অবলম্বন করিয়া থাকেন"।[২৮]

পঞ্চদশ অধ্যায়ে (পুরুষোত্তম-যোগ) ভগবান্ অতি পরিষ্কাররূপে জীব ও ঈশ্বরের দ্বৈতভাব প্রকাশ করিয়াছেন। "দুইপ্রকার পুরুষের প্রসিদ্ধি আছে, একজন ক্ষর এবং অন্যজন অক্ষর। সমস্ত ভূতশরীর ক্ষরের অন্তর্ভূত, আর কূটস্থ পুরুষ (জীবাত্মা) অক্ষর-নামে খ্যাত। এই ক্ষর এবং অক্ষর হইতে যিনি ভিন্ন তিনি উত্তম পুরুষ বা পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। সেই নির্ব্বিকার পরমাত্মা লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া পালন করিয়া থাকেন। যেহেতু আমি ক্ষরকে অতিক্রম করিয়াছি এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, এই জন্য লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া আমি প্রথিত।"[২৯] "শরীরের নাম ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব)"—এই কথা বলিয়াই ভগবান্ বলিলেন, "হে অর্জ্জুন, সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান"।[৩০] গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার যে-সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা পরমাত্মার সহিত তাঁহার অভিন্নতাই প্রতিপাদিত হয়। পুরুষোত্তমযোগের গোড়ার দিকে পরমপদ বা পরমধামের মহিমার বর্ণনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান্ বলিয়াছেন, "এই সনাতন জীব আমারই অংশ"।[৩১]

এইসকল বচনের পর্য্যালোচনা করিলে গীতায় অদ্বৈত সিদ্ধান্তের কথাই বেশী

২৮. পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু। ইত্যাদি। গী ৩৭।২১-২৪

২৯. দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ইত্যাদি। গী ৩৯।১৬-১৮

৩০. ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥ গী ৩৭।২

৩১. মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥ গী ৩৯।২

পাওয়া যায়। গীতার সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মতভেদের অন্ত নাই। কিন্তু বচনগুলি শোনামাত্রই মনে হয়, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ যেন গীতায় প্রতিপাদিত হয় নাই। দ্বিতীয়াধ্যায়ের অবিনাশিত্ব প্রভৃতি গুণের বর্ণনে জীবের সহিত পরব্রহ্মের অভেদই যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। কারণ, একটু পরেই ভগবান্ বলিয়াছেন, "আমি যে কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, তুমি যে ছিলে না, তাহাও নহে এবং এইসকল রাজা যে ছিলেন না, তাহাও নহে। অতঃপর আমরা সকলে যে আর হইব না, তাহাও নহে"।[৩২] এই উক্তি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়, জীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন। পুরুষোত্তমযোগেও ক্ষরাক্ষর পুরুষ হইতে পরমাত্মার যথার্থ প্রভেদ প্রদিপাদিত হইয়াছে।[৩৩] নিরবয়ব পরমাত্মার অংশ সম্ভবপর হয় না, অংশ বলিতে খণ্ড বা অবয়ব বুঝায়। এইজন্য 'মমৈবাংশঃ' ইত্যাদি[৩৪] বচনের তাৎপর্য্য অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ"—(২।৩।৪৩) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও উল্লিখিত আশঙ্কায় 'অংশ' শব্দের গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অংশ-শব্দের অর্থ অংশতুল্য। সুতরাং গীতার এই বচনেও অংশ-শব্দে 'অংশতুল্য' এই গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই জীব যে পরমেশ্বর হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, তাহা প্রতিপাদিত হয় না, বরং সেব্য-সেবকভাবই প্রকাশিত হয়। সমস্ত জীব তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছে, তাঁহারই ইচ্ছায় জীবের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অতএব জীব তাঁহার অংশের মত। গুণত্রয়বিভাগযোগের প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমি সকল জ্ঞানের উত্তম জ্ঞান তোমাকে প্রদান করিতেছি, যাহা জানিয়া মুনিগণ দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সকলেই এই জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়েও ব্যথিত হন না"।[৩৫] এই স্থলে বলা হইয়াছে যে, মুক্ত জীব পরমাত্মার সাধর্ম্ম্য লাভ করেন।

৩২ ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥ গী ২৬।১২

৩৩ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। গী ৩৯।১৭

৩৪ গী ৩৯।৭

৩৫ পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ইত্যাদি। গী ৩৮।১,২

দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ যে-সকল বচনের দ্বৈতবাদ-সমর্থক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অদ্বৈতবাদিগণ সেইসকল বচনকেই অদ্বৈতবাদের সমর্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন্ মতটি গীতা, তথা সমগ্র মহাভারতের অভিপ্রেত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। তবে শ্লোকের সরল ব্যাখ্যা দ্বারা দ্বৈতমতই যেন প্রতিপন্ন হয়। এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। মনীষিগণ আপন-আপন বুদ্ধি অনুসারে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলই আমাদের নমস্য, আমাদের নিকট কাহারও অভিমত উপেক্ষণীয় নহে।

জগৎ ও ব্রহ্ম—ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন হইলেও তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ বিধৃত। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তকে বলিয়াছেন, "হে পার্থ, আমাকে সর্ব্বভূতের চিরন্তন বীজ বলিয়া জানিবে। আমিই সকলের প্রবর্ত্তক। আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্টির নিয়ন্তা। প্রকৃতি আমার অধিষ্ঠানে এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করিতেছে এবং আমারই অধিষ্ঠাতৃত্বে এই জগৎ নিত্যই নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। গ্রথিত মণিসমূহ যেমন সূত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বিশ্ব আমাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে"।[৩৬] শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন, "ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আটটি আমার প্রকৃতি, ইহারা অপরা প্রকৃতি। জীবস্বরূপ যে প্রকৃতি, তাহা এতদপেক্ষা প্রকৃষ্ট ও ভিন্ন, তাহা দ্বারাই জগতের স্থিতি সাধিত হইতেছে। হে অর্জ্জুন, সমস্ত ভূতজগৎ এই অপরা ও পরা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে। এই দুই প্রকৃতি আমাহইতে প্রাদুর্ভূত, সুতরাং আমিই নিখিল জগতের সৃষ্টি ও সংহারের কারণ"।[৩৭] সর্ব্বত্রগ বায়ু যেমন নিরন্তর আকাশে থাকে, অথচ তাহার সহিত আকাশের লিপ্ততা নাই, চরাচর বিশ্বও সেইরূপ ঈশ্বরেই বিধৃত। তিনি সমস্ত বিশ্ব ধারণ করিয়া নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিতি করেন। পরস্পর অসংশ্লিষ্ট হইলেও আধার-আধেয়ভাবের কোন বাধা নাই।[৩৮] প্রলয়-

৩৬ বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। ইত্যাদি। ভী ৩১।১০,৭। ভী ৩৩।১০

৩৭ ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ইত্যাদি। ভী ৩১।৪-৬

৩৮ যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ভী ৩৩।৬

কালে সমস্ত জগৎ ঈশ্বরেরই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আবার সৃষ্টিকালে তাঁহা হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। ভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া কর্ম্মবশবর্ত্তী এই ভূতসকলকে পুনঃ পুনঃ সংসারে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তিনি যদিও বিশ্বসৃষ্টির বিধায়ক, তথাপি বিশ্ব তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না; তিনি সকল কার্য্যেই অনাসক্ত উদাসীনের মত।[৩৯] ভগবান্ এই বিশ্বচরাচর এক অংশমাত্রে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই বিশ্ব যে তাঁহার তুলনায় কত ক্ষুদ্র, তাহা স্থির করা যায় না। বিভূতিযোগের প্রত্যেকটি কথা দ্বারা বুঝা যায়, তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই বিশ্বধাত্রী। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তাঁহারই কাজ। তিনি জগতের উপাদানস্বরূপ, এরূপ স্পষ্টতঃ কোন উক্তি পাওয়া যায় না, কিন্তু তিনিই যে নিমিত্তকারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গীতায় সেই সিদ্ধান্ত অতি পরিষ্কার।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ—ভূতজগৎ যদিও পরমাত্মাতে বিধৃত, তথাপি তদপেক্ষা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ নিকটতর। জগতের তিনি নিয়ন্তা, কিন্তু জীবাত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অতীব মধুর। পিতার সহিত পুত্রের, সখার সহিত সখার, প্রিয়জনের সহিত প্রিয়জনের যে সম্পর্ক, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মারও সেই সম্বন্ধ। তাই দেখিতে পাই, বিশ্বরূপ-দর্শনে স্তম্ভিত অর্জ্জুন প্রার্থনা করিতেছেন, "হে দেব, আমার অপরাধ সহ্য কর"।[৪০] জীবাত্মা পরমাত্মাকে অতিশয় ঘনিষ্ঠরূপে পাইতে চান। এইজন্যই তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হন। এই ব্যাকুলতার দ্বারা যোগসাধন হয় বলিয়া গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ে যোগের কথা পাওয়া যায়।

মুক্তি—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের সাধনায় জীবাত্মা নিষ্কলুষ হইয়া বিমল শান্তি উপভোগ করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতে সমদর্শন, সর্ব্বত্র ঐশী-বিভূতির অনুভূতি প্রভৃতি তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি তাঁহাকে অজ্ঞানে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। শুধু ভগবৎ-প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মই সাধককে মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে। গীতার মতে ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ

৩৯ সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ইত্যাদি। ভী ৩৩।৭-৯

৪০ পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ভী ৩৫।৪৪

এবং ভগবানের মধ্যে বাস করার নামই মুক্তি বা পরমপদ-প্রাপ্তি।[৪১] যাঁহার মনে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি ইহলোকেই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, সমদর্শী ব্যক্তি ব্রহ্মেই স্থিত। যতদিন পর্য্যন্ত জীব পরমপদ লাভ করিতে না পারেন, ততদিন পৃথিবী ছাড়িবার উপায় নাই। যতই উৎকর্ষ লাভ করুন না কেন, পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে যাতায়াত করা তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য। কিন্তু ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।[৪২] ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত শাশ্বত অব্যয়পদ লাভ করা জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাঁহাকে সমস্ত মন-প্রাণ অর্পণ করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি। তাঁহার চরণে পরা ভক্তি সমর্পণ করিলে তিনিই দয়া করিয়া তাঁহার মধ্যে জীবকে স্থান দেন, জীব তাঁহারই সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়া চিরশান্তি উপভোগ করে, ইহাই গীতার মোক্ষ।[৪৩]

পঞ্চরাত্র

পঞ্চরাত্রের পরিচয়—পঞ্চরাত্রশাস্ত্রকে ভাগবতশাস্ত্র, ভক্তিমার্গ এবং সাত্বত-দর্শন নামেও বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মপুরাণে (জন্মখণ্ড ১৩২ তম অঃ) পঞ্চরাত্র শব্দের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। যে-শাস্ত্রে সাত্ত্বিক, নৈর্গুণ্য, সর্ব্বতৎপর, রাজসিক এবং তামসিক এই পাঁচপ্রকার রাত্র বা জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহারই নাম পঞ্চরাত্র।[১] ঈশ্বর-সংহিতায় (২১শ অঃ) বলা হইয়াছে যে, শাণ্ডিল্য, ঔপগায়ন, মৌঞ্জায়ন, কৌশিক এবং ভারদ্বাজ এই পাঁচজন ঋষি দীর্ঘকাল বাসুদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তপস্যায়

৪১ জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্। গী ২৬।৫১
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ। গী ২৮।১০
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি। ইত্যাদি। গী ২৯।৬,১৭,২০,২৪,২৯

৪২ ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ গী ২৯।১৯
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ গী ৩২।১৬

৪৩ মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ইত্যাদি। গী ৪২।৫৬-৬৮

১ বাচস্পত্য অভিধান ৪১৯৩ তম পৃঃ।

পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ বাসুদেব এক-এক দিবারাত্রিতে এক-একজন ঋষিকে মোক্ষলাভের পথ প্রদর্শন করিতে যে শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই পঞ্চরাত্র-নামে প্রসিদ্ধ। নারদীয় পঞ্চরাত্রে সবশুদ্ধ সাতটি প্রস্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—ব্রাহ্ম, শৈব, কৌমার, বাশিষ্ঠ, কাপিল, গৌতমীয় ও নারদীয়। অন্যত্র বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয় এই পাঁচটি পঞ্চরাত্রপ্রস্থানের নাম পাওয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্র নামে একখানি তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থও আছে। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ঈশ্বরসংহিতা, কপিঞ্জলসংহিতা, জয়াখ্যসংহিতা, পরাশরসংহিতা পাদ্মতন্ত্র, সাত্বতসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, প্রভৃতি পঞ্চরাত্রগ্রন্থ মুদ্রিতই পাওয়া যায়। নারদীয়সংহিতা, পরমসংহিতা, অনিরুদ্ধসংহিতা প্রভৃতিও হস্তলিখিত পুঁথিরূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাইতেছে। বরোদার ওরিয়্যাণ্টেল ইনস্টিটিউট্ হইতে প্রকাশিত জয়াখ্য-সংহিতার মুখবন্ধে অনেক গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

চতুর্ব্যূহ-বাদ—পাঞ্চরাত্রমতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, এবং অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহবাদ প্রচলিত। তন্মধ্যে বাসুদেবই জগৎকারিণীভূত বিজ্ঞানরূপ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম। বাসুদেব হইতে দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি। সঙ্কর্ষণ হইতে তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মন এবং প্রদ্যুম্ন হইতে চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধনামক অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ত্রিবিধ ব্যূহও ভগবান্ বাসুদেবেরই লীলাস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন। এই কারণে সঙ্কর্ষণাদিকে তাঁহারই অবতার বলিয়া মানিতে হয়। সংক্ষেপতঃ ইহাই সাত্বতসিদ্ধান্ত।[২] সাত্বতসংহিতা, পৌষ্করসংহিতা, পরমসংহিতা, শাণ্ডিল্যসূত্র প্রভৃতি এই মতের প্রামাণিক গ্রন্থ।

পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য—ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের পরিসমাপ্তিতে শাঙ্করভাষ্যে পাঞ্চরাত্রমত বা ভাগবতমতকে যুক্তিতর্কের দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাঁহার অনিত্যত্ব স্থির করা হয়। পরন্তু ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতিবাক্য হইতে জীবের নিত্যত্বই পাওয়া যায়। ভগবান্ ব্যাসদেব "নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ

২ নিত্যং হি নাস্তি জগতি ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্।
ঋতে তমেকং পুরুষং বাসুদেবং সনাতনম্। ইত্যাদি। শা ৩৩৯।৩২-৪২
বাসুদেব ত্বদেতত্তে ময়োদ্‌গীতং যথাতথম্। ইত্যাদি। ভী ৬৫।৬৯-৭২

তাভ্যঃ" (ব্র, সূ, ২।৩।১৭) এই সূত্রে জীবের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ভাগবতশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, শাণ্ডিল্য চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াও তাহাতে পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে না পারায় সাত্বতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই উক্তি দ্বারা বেদের নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং ভাগবতশাস্ত্রীয় কল্পনা অসঙ্গত। ঐ শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ভাষ্যকার আচার্য্য রামানুজ শঙ্করের ভাষ্যবচনে দোষ দেখাইয়া যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে পঞ্চরাত্রের সাধুত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। রামানুজাচার্য্য মহাভারতের বচনকেই প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের বেত্তা স্বয়ং ভগবান্।[৩] রামানুজভাষ্যে উদ্ধৃত মহাভারতবচনের পাঠান্তর লক্ষিত হয়। সেখানে বলা হইয়াছে, ভগবান্ শুধু বেত্তা নহেন, তিনিই পঞ্চরাত্রের বক্তা। "পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্।" নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত বিশিষ্ট কর্ত্তার নাম উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রগুলিকে প্রশংসা করা হইতেছে।[৪] সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ, পাশুপত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রকেই জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে।[৫] পঞ্চরাত্রশাস্ত্রও ভগবৎপ্রণীত—ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অপৌরুষেয়ত্ব-নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার ভ্রমপ্রমাদশূন্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। সাংখ্য ও যোগ একই শাস্ত্র। বেদ এবং আরণ্যকও পরস্পর ভিন্ন নহে। পাঞ্চরাত্ররূপ ভক্তিশাস্ত্রও এইগুলির সহিত জড়িত। অর্থাৎ ভক্তিবাদকে ছাড়িয়া দিলে সাধনা চলে না। সকল শাস্ত্রেরই চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ।[৬]

পঞ্চরাত্রের উদ্দেশ্য—শ্রুতিপ্রধান, বিচারপ্রধান ও ভক্তিপ্রধান সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বরকে চরম উপেয়রূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শাস্ত্রীয় পদ্ধতি-অনুসারে বিচার করিলে বলিতে হয়, প্রস্থানভেদ-প্রদর্শনের নিমিত্ত বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্নপ্রকার আলোচনা থাকিলেও তত্ত্ববিশ্লেষণের পরে দেখা যায় যে,

৩ পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্। শা ৩৪৯।৬৮

৪ প্রামাণ্যসিদ্ধয়ে বিশিষ্টকর্তৃকত্বেন সর্ব্বাণি স্তৌতি। ইত্যাদি। নীলকণ্ঠ, শা ৩৪৯।৬৫-৬৮

৫ সাংখ্যং যোগং পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥ শা ৩৪৯।৬৪

৬ এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পাঞ্চরাত্রঞ্চ কথ্যতে॥ শা ৩৪৮।৮১

একমাত্র ঈশ্বরের তত্ত্বনিরূপণ এবং মোক্ষের উপায় প্রদর্শনই আস্তিক শাস্ত্রসমূহের তাৎপর্য্য। সমুদ্র হইতে প্রসৃত জলরাশি যেরূপ পুনরায় সমুদ্রেই প্রবেশ করিয়া স্থিরতা এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, নিখিল জ্ঞানরাশিও সেইরূপ নারায়ণ হইতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণেই সার্থকতা লাভ করে। ইহাই সাত্বতশাস্ত্রের মর্ম্মকথা। ভগবান্ নারদ এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন।[৭]

বেদান্তভাষ্যকার আচার্য্য রামানুজ বলিয়াছেন যে, সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, যোগশাস্ত্রের সাধনপ্রণালী এবং বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের সত্যতা সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। এইসকল শাস্ত্র এবং আরণ্যক-শাস্ত্রসমূহ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই স্বরূপ বুঝাইতে প্রযুক্ত। পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেও এই সত্য ব্যতীত অপর কোন বর্ণনীয় বিষয় নাই। শারীরকসূত্রে সাংখ্যাদি-শাস্ত্রের তত্ত্ব প্রভৃতির ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, উহাদের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। অন্যান্য শাস্ত্রের বেদবিরুদ্ধ মতবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব কোথাও খণ্ডিত হয় নাই। এই কারণেই মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপতশাস্ত্রের সাধুতা সম্বন্ধে আত্মাই প্রমাণ, অথবা আত্মবিচারাংশেই ইহাদের সর্ব্বজনসিদ্ধ প্রামাণ্য। অতএব তর্ক দ্বারা এইসকল শাস্ত্রকে 'ন স্যাৎ' করিতে নাই। মহাভারতের বঙ্গবাসী-সংস্করণে উক্ত বচনের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ অন্যরূপ। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এইসকল শাস্ত্রও জ্ঞানের হেতু, শাস্ত্র নানাপ্রকার বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানের বিভিন্নতা নাই। সকল শাস্ত্রই প্রমাণ।[৮]

পঞ্চরাত্রের উপাদেয়তা—মোক্ষধর্ম্মের ৩৩৫ তম অধ্যায়ে পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রক্রিয়া ও প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চরাত্রবিদ্ ভাগবতগণ যাঁহার গৃহে উপস্থিত হন, তাঁহার গৃহ পবিত্র হইয়া

৭ সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে।
যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ইত্যাদি। শা ৩৪৯।৬৮-৭০
যথা সমুদ্রাৎ প্রসৃতা জলৌঘাস্তমেব রাজন্ পুনরাবিশন্তি। ইত্যাদি। শা ৩৪৮।৮৩-৮৫

৮ সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥ শা ৩৪৯।৬৪
(আত্মপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥ রামানুজসম্মত পাঠ)

যায়।[৯] পঞ্চরাত্রশাস্ত্র চতুর্ব্বেদের সমান। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সাতজন ঋষি এবং স্বায়ম্ভুব হইতে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রকাশ।[১০] নারায়ণের আজ্ঞায় দেবী সরস্বতী জগতের হিতের নিমিত্ত তপোধন ঋষিদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা পঞ্চরাত্রের প্রকাশ করেন।[১১] মোক্ষপর্ব্বের নারায়ণীয়-অধ্যায়সমূহে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক-গুলি ভাগবত-তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে, সেইগুলি সাত্বতদর্শনেরই অন্তর্গত। বিশ্বোপাখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সাধুচরিত্র শূদ্রগণ স্ব-স্ব কর্ম্মের দ্বারা সাত্বত বিধি-অনুসারে দ্বাপরযুগের অন্তে এবং কলিযুগের প্রারম্ভে বাসুদেবকে পূজা করিবেন।[১২] মহাভারতে পঞ্চরাত্রকে অবৈদিক বলিয়া উল্লেখ না করিলেও টীকাকার নীলকণ্ঠ পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তকে অবৈদিক বলিয়াছেন।[১৩] আবার নীলকণ্ঠই বলিয়াছেন যে, "বৈদিক শাস্ত্রসমূহের বর্ণনা-পদ্ধতির সহিত মিল না থাকিলেও শেষ সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্রই এক। নারায়ণই সর্ব্বব্যাপী এবং সকল তত্ত্বের সার, অনাদি অনন্ত স্বরূপ, এই বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই"।[১৪]

সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ, আরণ্যক প্রভৃতি শাস্ত্র একই পরম পুরুষের মাহাত্ম্য বর্ণনের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। সকল আস্তিক শাস্ত্রেরই চরম প্রতিপাদ্য সেই বিরাট্ পুরুষ। যাঁহারা ভক্তিমার্গের অনুসরণ করেন এবং একান্তভাবে উপাসনাতে রত থাকেন, তাঁহারা হরির সহিত এক হইয়া যান।[১৫] ভগবদারাধনা ব্যতীত চিত্তের একাগ্রতা জন্মিতে পারে না, একাগ্রতা না আসা

৯. পঞ্চরাত্রবিদো মুখ্যাস্তস্য গেহে মহাত্মনঃ।
প্রায়াণং ভগবৎপ্রোক্তং ভুঞ্জতে বাগ্রভোজনম্॥ শা ৩৩৫।২৫

১০. বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সমিতং কৃতং মেরৌ মহাগিরৌ। ইত্যাদি। শা ৩৩৫।২৮-৩২

১১. নারায়ণানুশিষ্টা হি তদা দেবী সরস্বতী।
বিবেশ তানৃষীন্ সর্ব্বান্ লোকানাং হিতকাময়া॥ ইত্যাদি। শা ৩৩৫।৩৫-৩৮

১২. বাসুদেব ইতি জ্ঞেয়ো যন্মাং পৃচ্ছসি ভারত। ইত্যাদি। ভী ৬৬।৩৮-৪০

১৩. পাঞ্চরাত্রমতস্যাবৈদিকস্য। ইত্যাদি। নীলকণ্ঠ, শা ৩৭১।২২
পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রস্য পুম্প্রণীতত্বং বেদবিরুদ্ধত্বঞ্চ সূচিতম্। নীলকণ্ঠ, শা ৩৪৯।৭৩

১৪ তথাপি অবান্তরতাৎপর্য্যভেদেহপি পরমতাৎপর্য্যং ত্বেকমেব। নীলকণ্ঠ, শা ৩৪৯।৭৩

১৫. পঞ্চরাত্রবিদো যে তু যথাক্রমপরা নৃপ।
একান্তভাবোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ॥ শা ৩৪৯।৭২,১,২

পর্য্যন্ত বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অপ্রতিষ্ঠিতা চঞ্চলা বুদ্ধি সাধককে পথভ্রষ্ট করে। ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া পরমতত্ত্বের পথে অগ্রসর হইতে হয়, শুধু জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতাতেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে। এই কারণেই ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র পঞ্চরাত্রের এত আদর।[১৬]

অবৈদিক মত

পূর্ব্বপক্ষরূপে এবং প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন স্থানে অবৈদিক মতবাদেরও কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও সেইসকল আলোচনাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই।

লোকায়ত-মত ও চার্ব্বাক (?)—দুর্য্যোধনের একটি উক্তিতে পাওয়া যায়, চার্ব্বাক-নামে তাঁহার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি পরিব্রাজক এবং বাক্য-বিশারদ। মৃত্যুকালে দুর্য্যোধন বন্ধুর নাম ধরিয়াও বিলাপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বাক্যবিশারদ পরিব্রাজক বন্ধু চার্ব্বাক অন্যায় যুদ্ধে আমার এই-প্রকার শোচনীয় মরণের সংবাদ জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই ইহার প্রতীকার করিবেন"।[১] টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণবেষধারী রাক্ষসবিশেষের নাম চার্ব্বাক।[২]

যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর সমুপস্থিত ব্রাহ্মণগণ জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহার কল্যাণ কামনা করেন। পুণ্যাহশব্দে আকাশ যখন মুখরিত, ঠিক সেই সময়ে সেই সভায় একজন ভিক্ষুবেষধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের মুখপাত্ররূপে স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য জ্ঞাতি-বান্ধবাদি ক্ষয়ের জন্য যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্যবাণে ব্যথিত হইয়া যুধিষ্ঠির সমাগত ব্রাহ্মণদের নিকট কাতরস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

---

১৬ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ভী ৪২।৫৫
তস্মাদ্ভক্তৌ কৃৎস্নস্য শাস্ত্রফলস্যান্তর্ভাবোঽস্তি। নীলকণ্ঠ, শা ৩৫১।২২

১ যদি জানাতি চার্ব্বাকঃ পরিব্রাড়্ বাগ্‌বিশারদঃ।
করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং সোঽপচিতিং মম। শল্য ৬৪।৩২

২ চার্ব্বাকো ব্রাহ্মণবেষধারী রাক্ষসঃ। নীলকণ্ঠ, ঐ।

তাঁহারা ভিক্ষুর অশিষ্ট ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই ব্যক্তি আমাদের মুখপাত্র নহেন ; ইনি যাহা বলিলেন, তাহা মোটেই আমাদের অনুমোদিত নহে"। তারপর তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা ধ্যাননেত্রে সেই ভিক্ষুর স্বরূপ জানিতে পারিয়া মহারাজকে বলিলেন, "রাজন্, ইনি দুর্য্যোধনের সখা চার্ব্বাক-রাক্ষস, পরিব্রাজকের বেশভূষা ধারণ করিয়া দুর্য্যোধনেরই প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকেন"। অতঃপর ক্রুদ্ধ ব্রহ্মবাদীদের তেজঃপ্রভাবে সেই ভিক্ষু বজ্রদগ্ধ পাদপাঙ্কুরের মত ভস্মরাশিতে পরিণত হইলেন।[৩] সেই ব্রাহ্মণের 'চার্ব্বাক' এই নামের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যঞ্জনা আছে কি না, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। বেদবিৎ তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে হত্যা করিলেন, এই উক্তির মধ্যে চার্ব্বাকমতের খণ্ডনের আভাস আছে কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। জনকবংশীয় জনদেবের মিথিলাস্থ রাজসভা শাস্ত্র-চর্চ্চার একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল ; শত শত আচার্য্য সেখানে অবস্থান করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের রশ্মিতে সমস্ত দেশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন। রাজর্ষির সভা সকল সময়ই শাস্ত্রবিচারে মুখরিত থাকিত। আস্তিক এবং নাস্তিক দর্শনের মহারথী পণ্ডিতদের মধ্যে বিচার চলিত। নাস্তিকমত-নিরাসে লব্ধ-কীর্ত্তি শাস্ত্রজ্ঞদের বিশেষ সম্মান ছিল।[৪]

লোকায়ত পণ্ডিতদের মধ্যেও নানারূপ সিদ্ধান্ত প্রচলিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দেহের নাশেই আত্মার নাশ। কেহ কেহ দেহকেই অবিনশ্বর বলিয়া মনে করেন। একদল আবার দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।[৫] পার্থিব, বায়বীয়, তৈজস এবং জলীয় পরমাণুগুলি মিলিত হইয়া দেহরূপে প্রকাশিত হয়। এইগুলি একত্র হইলেই সুরার মাদকতা-শক্তির ন্যায় দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সেই চৈতন্য স্বভাবের নিয়মানুসারে শরীরেই উপস্থিত হয়, ঘটাদি জড়াপদার্থে তাহার আবির্ভাব ঘটে না। দেহরূপ আত্মার বিনাশ হইলেও আত্মা-নামে অপর পদার্থের অস্তিত্ব যে আগমে স্বীকৃত হয়, সেই আগম অপ্রমাণ, যেহেতু

৩ শা ৩৮ শ অঃ।

৪ তস্য স্ম শতমাচার্য্যা বসন্তি সততং গৃহে
দর্শয়ন্তঃ পৃথগ্‌ধর্ম্মান্ নানাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ শা ২১৮।৪। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

৫ স তেষাং প্রেত্যভাবে চ প্রেত্যজাতৌ বিনিশ্চয়ে।
আগমস্থঃ সভূয়িষ্ঠমাত্মতত্ত্বেন তুষ্যতি ॥ শা ৩১৮।৫

প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ।[৬] লোকায়তত্তন্ত্রে প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণরূপে স্থান দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষের অগোচর কোন বস্তুর সত্তা স্বীকার করা তাঁহাদের মতে অসম্ভব। ক্লেশ, দুঃখ, জরা, ব্যাধি প্রভৃতিই মৃত্যুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থাবিশেষ। ইন্দ্রিয়াদির বিনাশে দেহের যে হানি ঘটে, তাহাও আংশিক মৃত্যু বটে। আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকারে প্রয়োজন কি? অগ্নিহোত্রাদি শ্রুতির প্রামাণ্য-কল্পনা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ এবং তাহাতে শ্রদ্ধা পোষণ করা একশ্রেণীর লোকের স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত। সুতরাং শ্রুতি সর্ব্বথা অপ্রমাণ।[৭] অন্যান্য দার্শনিকদের স্বীকৃত অনুমানাদির মূলে ত প্রত্যক্ষকে স্বীকার করিতেই হইবে, তবে আবার প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণের অস্তিত্ব কেন মানিতে যাইব?[৮]

ঈশ্বর, অদৃষ্ট প্রভৃতি পদার্থকে অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করাই ভুল। শরীর হইতে শরীরের সৃষ্টি, ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অপর কতকগুলি অদৃশ্য বস্তুবিষয়ে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন পণ্ডশ্রমমাত্র।[৯] দেহ হইতে জীব পৃথক্ পদার্থ, এই মতকে খণ্ডন করিতে যাইয়া চার্ব্বাকমতে বলা হইয়াছে যে, সম্ভাবিত বৃহৎ বটবৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল প্রভৃতি যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবে বীজের মধ্যেই নিহিত, সেইরূপ শরীরের কারণীভূত শুক্রবীজের মধ্যেই মন বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীরের আকৃতি প্রভৃতি বস্তু প্রচ্ছন্ন থাকে, যথাসময়ে এইগুলির আবির্ভাব হয়। গাভী ঘাস খায়, কিন্তু তাহার পরিণতি দুগ্ধ-রূপে। তণ্ডুল, গুড় প্রভৃতি নানা দ্রব্যের কল্ক মিলিত হইলে দুই তিন দিনের মধ্যেই যেমন তাহাতে মাদকতা-শক্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নানাগুণ-বিশিষ্ট শুক্র হইতে অথবা চতুর্ভূত-সংযোগ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। কাষ্ঠদ্বয়ের সংযোগবিশেষ হইতে যেরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভূতচতুষ্টয়ের যোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। অয়স্কান্তমণি যেমন লৌহকে সঞ্চালিত করিতে

৬ দৃশ্যমানে বিনাশে চ প্রত্যক্ষে লোকসাক্ষিকে।
আগমাৎ পরমস্তীতি ব্রুবন্নপি পরাজিতঃ॥ শা ২১৮।২৩

৭ অনাত্মা হ্যাত্মনো মৃত্যুঃ ক্লেশো মৃত্যুর্জ্জরাময়ঃ।
আত্মানং মন্যতে মোহাত্তদসম্যক্ পরং মতম্॥ ইত্যাদি। শা ২১৮।২৪,২৫

৮ প্রত্যক্ষং হ্যেতয়োর্মূলং কৃতান্তৈতিহ্যয়োরপি।
প্রত্যক্ষেণাগমো ভিন্নঃ কৃতান্তো বা ন কিঞ্চন॥ শা ২১৮।২৭

৯ যত্র যত্রানুমানেঽস্মিন্ কৃতং ভাবয়তোঽপি চ॥
চান্যো জীবঃ শরীরস্য নাস্তিকানাং মতে স্থিতঃ॥ শা ২১৮।২৮

পারে, সেইরূপ সমুৎপন্ন চৈতন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে তাহাদের বিষয়গ্রহণে নিযুক্ত করিয়া থাকে। সূর্য্যকান্তমণির সহিত সংযোগ হইলে সূর্য্যরশ্মি হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়, মাটি বা জলের সহিত সংযোগে হয় না, সেইরূপ পার্থিবাদি অংশগত ভেদেই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের ভেদ হইয়া থাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত যোগ হইলে গন্ধই গৃহীত হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত যোগ হইলে রূপ গৃহীত হইবে। এইরূপে বিশেষ-বিশেষ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়েরও প্রভেদ হইয়া থাকে। ভোগ্য বস্তুর ভোক্তৃত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত শরীরাতিরিক্ত জীব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। অগ্নির মধ্যে যেমন জলশোষকত্ব গুণ স্বতঃই বর্ত্তমান, সেইরূপ ভূতসঙ্ঘাত বা শরীরের মধ্যেও ভোক্তৃত্ব-গুণ সকল সময়েই থাকে।[১০]

বনবাসের সময় অতি দুঃখে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতেও চার্ব্বাকমতের আভাস আছে। ভগবানের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দ্রৌপদী অনেক কিছুই বলিয়াছেন।[১১] দ্রৌপদীর কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, "তোমার বাক্যগুলি খুব শোভন এবং সুকুমার হইলেও নাস্তিক-মতবাদই প্রকাশ করিতেছে"।[১২] লোকায়তগণ পাপ এবং পুণ্য মানেন না। "যতদিন পৃথিবীতে শরীর থাকিবে, ততদিন আনন্দ কর"; ইহাই তাঁহাদের উপদেশ।[১৩] যাঁহারা নাস্তিক, তাঁহাদের নরকভোগ অবধারিত, ইহা মহাভারতের অনুশাসন।[১৪] লোকায়ত-মতবাদগুলি খুব নিপুণতার সহিত নিরাকৃত হইয়াছে।

সৌগতাদি-মত—সৌগত-মতেরও কতকগুলি সিদ্ধান্তের আলোচনা

১০ রেতো বটকণীকায়াং ঘৃতপাকাধিবাসনম্।
জাতিঃ স্মৃতিরয়স্কান্তঃ সূর্য্যকান্তোঽম্বুভক্ষণম্॥ শা ২১৮।২৯। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।
ঊর্দ্ধং দেহাদ্বদন্ত্যেকে নৈতদস্তীতি চাপরে। অশ্ব ৪৯।২

১১ ন মাতৃপিতৃবদ্ রাজন্ ধাতা ভূতেষু বর্ত্ততে।
রোষাদিব প্রবৃত্তোঽয়ং যথায়মিতেরো জনঃ॥ ইত্যাদি। বন ৩০।৩৮-৪৩

১২ বল্গু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং যাজ্ঞসেনি ত্বয়া বচঃ।
উক্তং তচ্ছ্রুতমস্মাভির্নাস্তিক্যন্তু প্রভাষসে॥ বন ৩১।১

১৩ পুণ্যেন যশসা চান্যে নৈতদস্তীতি চাপরে। অশ্ব ৪৯।৮

১৪ হিংসাপরাশ্চ যে কেচিদ্ যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ।
লোভমোহসমাযুক্তাস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ॥ অশ্ব ৫০।৪

'পাষণ্ডখণ্ডন'-অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। সৌগত-মতাবলম্বিগণ রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার নামে পাঁচটি স্কন্ধ স্বীকার করেন। ঐ পাঁচটি স্কন্ধ স্বীকারেই তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত ব্যবহারের উপপত্তি হইতে পারে। নিত্য-চৈতন্য নামে কোন পদার্থ তাঁহারাও স্বীকার করেন না। স্কন্ধপঞ্চক এবং চিত্তের আধার বলিয়া শরীরের নাম ষড়ায়তন। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদনা, দুঃখ ও দুর্ম্মনস্তা—এই আঠারটি পদার্থ কোথাও সংক্ষেপে কোথাও বা বিস্তৃতভাবে বৌদ্ধানুশাসনে স্থান পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পদার্থগুলি পর-পর পদার্থের নিমিত্ত বলিয়া স্বীকৃত। কোন কোন সৌগত অবিদ্যাদিকে দেহান্তর প্রাপ্তির কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অবিদ্যার নাশে দেহের নাশ বা সত্ত্বসংক্ষয় ঘটে, তাহাই মোক্ষ-নামে কথিত হইয়াছে।[১৫] শূন্যবাদী সৌগতগণ শূন্যকেই জগতের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী ক্ষণিকবিজ্ঞানের জগৎকারণত্ব সংস্থাপনে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া থাকেন।[১৬]

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণকে ক্ষপণক বলা হইত। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, ক্ষপণক শব্দের অর্থ পাষণ্ড ভিক্ষু।[১৭] পাষণ্ড শব্দ বেদনিন্দক নাস্তিক অর্থেই প্রযুক্ত হইত। মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে দেখিতে পাই যে, কলিযুগে অনেকে এড়ূকের পূজা করিবেন। যে স্তম্ভ বা ভিত্তির অভ্যন্তরে মৃত ব্যক্তির অস্থি স্থাপিত হয়, তাহাকে এড়ূক বলে। অস্থি বা ভস্মস্থাপন বৌদ্ধদের প্রবর্ত্তিত। ইহা বৈদিক কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। মহাভারতের বচনে এই বিষয়ে নিন্দা করা হইয়াছে।[১৮] বর্ণ এবং আশ্রমব্যবস্থার দ্বারা কোন ধর্ম্ম হইতে পারে না, ইহা বৌদ্ধমত। তাঁহাদের মতে স্তম্ভাদির পূজন এবং চৈত্যবন্দনাদি ধর্ম্মের বহিরঙ্গ।[১৯]

---

১৫ অবিদ্যা কর্ম্মতৃষ্ণা চ কেচিদাহুঃ পুনর্ভবে।
কারণং লোভমোহৌ তু দোষাণান্তু নিষেবণম্॥ ইত্যাদি। শা ২১৮।৩২-৩৪। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

১৬ নাস্ত্যস্তীত্যপি চাপরে। ইত্যাদি। অশ্ব ৪৯।৩। বন ১৩৪।৮

১৭ সোঽপশ্যদথ পথি নগ্নং ক্ষপণকমাগচ্ছন্তম্। আদি ৩।১২৬

১৮ এড়ূকান্ পূজয়িষ্যন্তি বর্জ্জয়িষ্যন্তি দেবতাঃ। ইত্যাদি। বন ১৯০।৬৫-৬৭

১৯ আশ্রমাস্তাত চত্বারো যথা সঙ্কল্পিতাঃ পৃথক্।
তান্ সর্ব্বাননুপশ্য ত্বং সমাশ্রিত্যেতি গালব॥ শা ২৮৭।১২। দ্রঃ নীলকণ্ঠ।

পশুহননের দ্বারা যে-সকল যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, অতি কঠোরভাবে সেইসকল যজ্ঞের নিন্দা করা হইয়াছে। ইহাতেও বৌদ্ধপ্রভাবের ছায়াপাত সুস্পষ্ট। হিংসা নিন্দিত হইলেও বৈদিক শাস্ত্রে বৈধ হিংসার প্রশংসাই করা হইয়াছে। যাগযজ্ঞাদিতে যে হিংসা করা হয়, তাহারই নাম বৈধ হিংসা।[২০] বৈধ হিংসাকেও বলা হইয়াছে, 'ক্ষত্রযজ্ঞ'। ক্ষত্রযজ্ঞের নিন্দা হইতে সেইসকল অধ্যায়ে যেরূপ বৌদ্ধপ্রভাবের কল্পনা করা যাইতে পারে, সেইরূপ যৌগিক আত্মযজ্ঞরূপ তপস্যার উৎকর্ষ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে সেইগুলির সার্থকতা-কল্পনা অযৌক্তিক নহে। কারণ বাহ্যিক যাগযজ্ঞের নিন্দা করিয়া পরে বলা হইয়াছে যে, আত্মাই যজ্ঞভূমি, তাঁহার তত্ত্বানুশীলনই মহাযজ্ঞ, স্থানবিশেষে যজ্ঞানুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই।[২১]

যাজ্ঞিকগণ বৃথামাংস ভক্ষণ করেন না, এই নিয়মও খুব প্রশংসনীয় নহে। কারণ একেবারে মাংস ভক্ষণ না করাই অহিংসার উত্তম আদর্শ।[২২] এই উক্তিতেও বৌদ্ধপ্রভাব আছে বলিয়া নিশ্চিত বলা যায় না। যেহেতু বৈদিক শাস্ত্রেও মাংসভক্ষণের নিবৃত্তির প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মের নাম করিয়া সুরা, মৎস্য, মধু, মাংস, আসব, কৃসর প্রভৃতির ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত।[২৩] প্রকৃতপক্ষে এই উক্তিতেও কোনরূপ সৌগতগন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতে এইসকল আলোচনা দেখিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করেন যে, মহাভারত শাক্যসিংহ বুদ্ধের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। এই মন্তব্যের মূলে কোন দৃঢ় যুক্তি পাওয়া যায় না। শাক্যসিংহের জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও বৌদ্ধমত প্রচারিত ছিল। শাক্যসিংহ এই মতের আদি প্রচারক নহেন, তিনি এই পথের পরবর্ত্তী অন্যতম সাধক ও প্রচারকমাত্র। এই কথা বুদ্ধদেব নাকি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। বৈদিক নিবৃত্তিমার্গেও অহিংসাদির

২০ শা ২৭১ তম অঃ।
পশুযজ্ঞৈঃ কথং হিংস্রৈর্মাদৃশো যষ্টুমর্হতি। ইত্যাদি। শা ২৭৬।৩২, ৩৩

২১ জাজলে তীর্থমাত্মৈব মাস্ম দেশাতিথির্ভব। শা ২৬২।৪১

২২ যদি যজ্ঞাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ যূপাংশ্চোদ্দিশ্য মানবাঃ।
বৃথামাংসং ন খাদন্তি নৈষ ধর্ম্মঃ প্রশস্যতে॥ শা ২৬৪।৮

২৩ সুরাং মৎস্যান্মধু মাংসমাসবকৃসরৌদনম্।
ধূর্ত্তৈঃ প্রবর্ত্তিতং হ্যেতন্নৈতদ্বেদেষু কল্পিতম্॥ শা ২৬৪।৯

যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। 'অহিংসা' শব্দ দেখিলেই সৌগতমত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে না।

অশ্বমেধপর্ব্বের গুরুশিষ্য-সংবাদে দেখিতে পাই, বিভিন্নরকমের মতবাদ দেখিয়া সন্দিহান ঋষিগণ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, "ভগবন্, ধর্ম্মের গতি বিচিত্র, কোন মতকে অবলম্বন করিয়া চলিব? দেহের নাশের পরেও আত্মা থাকেন, ইহা এক সম্প্রদায়ের অভিমত। একদল তাহা স্বীকার করেন না (লোকায়ত)। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সমস্তই সংশয়িত (সপ্তভঙ্গীনয়বাদী জৈনগণ)। এক সম্প্রদায় সকল বস্তুকেই নিঃসংশয় অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে অবস্থিত বলিয়া মনে করেন (তৈর্থিক)। কেহ কেহ অধিকাংশ বস্তুরই সৃষ্টি এবং প্রলয় স্বীকার করিয়া থাকেন (তার্কিকাদি)। অন্য সম্প্রদায় জগৎপ্রবাহের নিত্যতা স্থাপনে প্রয়াসী (মীমাংসক)। কেহ কেহ শূন্যবাদের সমর্থন করেন (শূন্যবাদী সৌগত)। অপর সম্প্রদায় বস্তুমাত্রেরই ক্ষণিকতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন (সৌগত)। এক বিজ্ঞানই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃরূপে দ্বিধা বিভক্ত, ইহাও একদলের অভিমত (যোগাচার)। কেহ কেহ সকল বস্তুকেই পরস্পর ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন (উড়ুলোম)। একদল আচার্য্য একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন না। কেহ কেহ অসাধারণ কর্ম্মকেই কারণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক সম্প্রদায় দেশ ও কালের সর্ব্বকারণত্ব স্বীকার করেন। দৃশ্যমান জগৎ স্বপ্নরাজ্যের মত মিথ্যা, ইহাও সম্প্রদায়বিশেষের সিদ্ধান্ত। আচারের দিক দিয়া লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়, কেহ কেহ জটা ও অজিন ধারণ করেন। কেহ কেহ মুণ্ডিত মস্তকে বিচরণ করেন। কেহ বা নগ্নতার পক্ষপাতী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যই একদলের প্রিয়, অপর সম্প্রদায় গার্হস্থ্যকে উচ্চ আসন দিয়া থাকেন। কোনও সম্প্রদায়ের মতে উপবাসাদি কৃচ্ছ্রাচারের দ্বারা শরীরের পীড়ন ধর্ম্মরূপে গণ্য। কেহ কেহ এইরূপ আচরণের বিরোধী। কেহ কেহ কর্ম্মলিপ্ততার পক্ষপাতী, সম্প্রদায়বিশেষ সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। মোক্ষই এক সম্প্রদায়ের নিকট চরম পুরুষার্থ। অন্য দল ভোগকেই সর্ব্ববিধ সুখের হেতু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। অকিঞ্চনতার প্রশংসাবাদে একদল লোক মাতিয়া থাকেন। অন্যদল অর্থকেই মোক্ষের আসনে বসান। কেহ কেহ বৈদিক হিংসাকে দূষণীয় বলিয়া মনে করেন না। অপর সম্প্রদায় এইপ্রকার হিংসাকে ও নিন্দা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ পুণ্যজনক কর্ম্মে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকেন। অপর

সম্প্রদায় পুণ্যের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। কেহ যজ্ঞ, কেহ তপস্যা, কেহ জ্ঞান, কেহ বা সন্ন্যাসের প্রশংসা করিয়া থাকেন"।[২৪]

তৎকালে সাধনা ও দার্শনিক সিদ্ধান্তাদি বিষয়ে যে-সকল মতবাদ প্রচলিত ছিল, উল্লিখিত বিভিন্ন মতের আলোচনায় তাহার একটা সাধারণ ধারণা করা যাইতে পারে। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে নাস্তিক্যবাদের খণ্ডন করিয়া আস্তিক মতবাদসমূহের সুনিপুণ সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে।

মহাভারত এক বিস্ময়কর গ্রন্থ। ইহাকে অতলস্পর্শ সুধাসমুদ্র বলা যাইতে পারে। যতই আলোচনা করা যায় না কেন, ইহার অফুরন্ত রস নিঃশেষ হইবার নহে। এই গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে বহুমুখী আলোচনা অনন্তকাল চলিতেছে ও চলিবে।

আমাদের এই আলোচনা বিশাল মহাভারতসমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ-মাত্র।

২৪ অশ্ব ৪৯শ অঃ।

নির্দ্দেশিকা